পরিচয়

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৩ হইতে পৌষ, ১৩৪৩

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়

সূচিপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—প্রথম খণ্ড; শ্রাবণ—পৌষ, ১৩৪৩

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচি

অনুবাদ—

পুনরুজ্জীবন (নাটিকা) ১৪৮

ভালবাসা (গল্প) ৫৩

৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ—

কেন? ১০১

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ৫২৭

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত—

অধ্যায় (কবিতা) ৬০৩

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য—

পুস্তক-পরিচয় ৯৮

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—

পুস্তক-পরিচয় ৪০৯

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত—

পুরানোকথা ১৫, ১১২, ২৪৬, ৩৪৭, ৪৬২, ৫৬৯

পুস্তক-পরিচয় ৩০০, ৫০০

শ্রীছায়া দেবী—

আনমনা (কবিতা) ৪৯১

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র—

পুস্তক-পরিচয় ৯৫, ১৯৯

শ্রীদেবকুমার চৌধুরী—

পাঠক-গোষ্ঠী ৪১২

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

আবর্ত্ত (উপন্যাস) ৩২, ১২৬, ২২০, ৩২৫, ৪৭৪, ৫৩৭

পুস্তক-পরিচয় ৮৬, ২৮৮, ৬০৮

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—

পাঠক-গোষ্ঠী ৫২০

পুস্তক-পরিচয় ৭৭, ৫১২, ৬০৫

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ২৪

নিশীথ সঙ্গীত (কবিতা) ২৭৮

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র—

সঙ্গ (কবিতা) ৩৮৫

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়—

কোজাগরী (কবিতা) ৩৮২

বিরোধ (কবিতা) ৬৬

পুস্তক-পরিচয় ২০১

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী—

পুস্তক-পরিচয় ৩৯০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য—
বিধাতার বিচার (গল্প) ৫৬৩
পুস্তক-পরিচয় ৫০৮

শ্রীপাঁচুগোপাল ভাদুড়ী—
পুস্তক-পরিচয় ৬১৮

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী—
অধ্যাপক আঁতোয়ান মেইয়ে ৫৭৬
অধ্যাপক প'ল পেলিও ১৪০
পুস্তক-পরিচয় ৯৩, ৩০৬, ৪০৭

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—
পাঠক-গোষ্ঠী ৪১৭
মার্ক্স্-এর ডায়ালেক্‌টিক ৪৬

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন—
পুস্তক-পরিচয় ৩০৩

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ—
মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ৩০৯
শব্দ ও বাক্য ১০

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—
পুস্তক-পরিচয় ৫০৩

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—
'আজ রজনীতে···' (কবিতা) ২৭৯

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—
ভারতী (কবিতা) ২৭৮
দীপ্তিব মোহ (গল্প) ৫৮৮
ট্রায়াড্‌স্ (কবিতা) ৪৯৫
পুস্তক-পরিচয় ১৮৯, ৫১৪

শ্রীবিষ্ণু দে—
ঘোড় সওয়ার (কবিতা) ৬৪
পুস্তক-পরিচয় ৮৯

শ্রীবীণাপাণি রায়—
দুটি চিঠি (গল্প) ৪৩৬

শ্রীযুবনাশ্ব—
চিনি (কবিতা) ৫৯৮
শবরীর নৈরাশ্য (কবিতা) ৬৮
স্বাহা (গল্প) ৩৫৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—
আধুনিক বাংলা কাব্য ৪৭০
আমি (কবিতা) ১৭২
সাহিত্যের স্বরূপ ৩৫৩

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়—
'দেহের দাবীর তীরে' (কবিতা) ৪৯২

শ্রীশেলী দত্ত—
'সেদিনো এমনি রাতে' (কবিতা) ৬০১

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ—
পুস্তক-পরিচয় ৩৯৯

শ্রীসমর সেন—
নাগরিক (কবিতা) ৩৮০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—
কোথা শেষ ? (কবিতা) ৪৮৯

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত—
ডব্লু-বি য়েট্‌স্ ও কলাকৈবল্য ৪২৩
সম্পাদকী ৭১, ১৭৫, ২৮১, ৩৮৮

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—
বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ২০৪

শ্রীসুমন্ত্র মহলানবীশ—
রাজকন্যা (কবিতা) ৬৮

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী—
পুস্তক-পরিচয় ৬২১

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র—
পুস্তক-পরিচয় ৬১১

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা—
অপ্সরা (কবিতা) ৩৮৩

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ—
রাত্রির কবিতা (কবিতা) ৪৯৪

শ্রীসুশীলকুমার দেব—
সাহিত্য ও সমাজ ১৬২

শ্রীসুশোভন সরকার—
পুস্তক-পরিচয় ৮১, ১৯৫, ৪০৪, ৪৯৭

শ্রীসুশোভন সরকার—
স্পেনে অন্তর্বিরোধ ২(...)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল—
পুস্তক-পরিচয় ৩০৭, ৩৯৪, ৫০৬
বসুধৈব কুটুম্বকং (গল্প) ২৬৪

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—
পুস্তক-পরিচয় ১৮২
রাসলীলা ১, ১১৯, ২৩৩, ৩৩৮, ৪৫১, ৫৫২

হুমায়ুন কবির—
পুস্তক-পরিচয় ৮৪, ২৯৭, ৪০৩

সে যাহা হউক, তাঁহার পূর্ব্বে ভারতসংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল—ইহা নিঃসংশয়।

শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের নায়ক নহেন। মহাভারতের মুখ্য বিষয় কুরুপাণ্ডবের ভারতযুদ্ধ—তবে ঘটনার গতিকে মহাভারতকার সময় সময় শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন অর্থাৎ "He is introduced on the stage when the exigencies of the narrative require it"। সেই জন্য মহাভারতের খিলপর্ব্ব রূপে (as supplementary section) হরিবংশ রচিত হইয়াছিল। এই হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ বিবরণ আছে। হরিবংশের প্রারম্ভে জনমেজয় বলিতেছেন,—

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরং
কথিতং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরেণ ময়া শ্রুতম্।
×　　×　　×
ভবান্ চ বংশকুশলস্তেষাং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
কথয়স্ব কুলং তেষাং বিস্তরেণ তপোধন॥ —১।১।১২,১৬

শৌনকের উক্তি আরও স্পষ্ট—

তত্র (মহাভারতে) জন্ম কুরূণাং হি ত্বয়োক্তং লোমহর্ষণে!
ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্ ভবান্ ব্যক্তুর্মহতি॥

এই গ্রন্থে যদু বংশের সবিস্তার বিবরণ আছে—তাই গ্রন্থের নাম হরিবংশ।

মহাভারত ও হরিবংশ ব্যতীত, কয়েকখানি পুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের কিছু কিছু বিবরণ আছে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ব্যাসদেব আদিতে প্রচলিত আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পাদি সংগ্রহ করিয়া এক "পুরাণসংহিতা" সংকলন করেন এবং তাঁহার তিন শিষ্য পরিশিষ্টরূপে তিনখানি উপ-সংহিতা সঙ্কলন করেন। উহা হইতেই অষ্টাদশ পুরাণের উৎপত্তি।

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈ র্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥

এই সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত আমাদের সম্প্রতি আলোচ্য নহে। মহাভারতে, হরিবংশে ও ঐ সকল পুরাণে রাসের কিরূপ বিবরণ আছে তাহারই আমরা আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাভারতে রাস বা গোপীর কোনই ব্যাপার নাই ; তবে সভাপর্ব্বের একটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে "গোপীজনপ্রিয়" বলা হইয়াছে। দ্রৌপদী কুরুসভায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক বস্ত্রহরণ চেষ্টা দ্বারা লাঞ্ছিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করিয়া কাতরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা শ্চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ ! দ্বারকাবাসিন্ ! কৃষ্ণ ! গোপীজনপ্রিয় !
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন !
কৌরবার্ণবমগ্নাং মাম্ উদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥

মহাভারতের সকল সংস্করণে এ পাঠ নাই—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ তাঁহার প্রপিতামহ ৺রাধানাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া সটীক ও সানুবাদ মহাভারত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ঐ পাঠ ধৃত হয় নাই ; তবে মহাভারতের প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠের টীকায় 'গোপীজনপ্রিয়' এই পাঠই গৃহীত হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও মহাভারতের কয়েকস্থানে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে—যেমন পূতনাবধ, গোবর্দ্ধনধারণ, অরিষ্ট ও ধেনুক-ধ্বংস এবং কংসবধ—কিন্তু মহাভারতে রাসলীলার কোন ইঙ্গিত বা উল্লেখ নাই।*

---

* মহাভারতের যে যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ আছে—আমরা এই পাদটীকায় তাহার যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া দিলাম—

সংবর্দ্ধিতা গোপকুলে বালেনৈব মহাত্মনা।
বিখ্যাপিতং বলং বাহ্বোঃ ত্রিষু লোকেষু সঞ্জয় !
উচ্চৈঃশ্রবস্তুল্যবলং বায়ুবেগসমং জবে।
জঘান হয়রাজং তং যমুনাবনবাসিনম্॥
দানবং ঘোরকর্ম্মাণং গবাং মৃত্যুমিবোত্থিতং।
বৃষরূপধরং বাল্যে ভুজাভ্যাং নিজঘান হ॥
প্রলম্বং নরকং জম্ভং পীঠং বাপি মহাসুরম্।
মুরুং চানস্তসঙ্কাশম্ অবধীৎ পুষ্করেক্ষণঃ॥
তথা কংসো মহাতেজা জরাসন্ধেন পালিতঃ।
বিক্রমেণৈব কৃষ্ণেন সগণঃ পাতিতো রণে॥

—দ্রোণপর্ব্ব—১২।২-৬

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৪৩

পরিচয়

রাসলীলা

ইতিহাস না রূপক ?

গতবারের পরিচয়ে আমরা রাসলীলার আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, রাসলীলার প্রচলিত বিবরণ কামায়ন-প্রচুর (full of eroticism)। শ্রীকৃষ্ণ—

> বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন
> কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।

তিনি মদনমোহন, 'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ'। এই অপ্রাকৃত মদনে প্রাকৃত কাম-ক্রীড়া, ব্রজগোপীদিগের সহিত তাঁহার যৌন সম্মিলন সম্ভব কি ? এই সন্দেহে রাস কতটা ইতিহাস, কতটা রূপক (spiritual allegory)— তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। গহণ প্রত্নতত্ত্বারণ্যে প্রবেশ কঠিন নয়, কিন্তু নির্গমন ? চক্রব্যূহ হইতে নিষ্ক্রমণ বোধ হয় ইহার তুলনায় অনায়াসসাধ্য। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।

যে সকল প্রচলিত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে মহাভারত প্রাচীনতম। এই মহাভারত 'শতসাহস্রী' অর্থাৎ লক্ষশ্লোকাত্মক—ইহা উগ্রশ্রবা-সৌতি-বিরচিত। সৌতি বলেন, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব (ইনি শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক), ২৪০০০ শ্লোকাত্মক 'ভারত সংহিতা' নামে যে আদি গ্রন্থ রচনা করেন,—চাতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন উহার সম্প্রসারণ করিয়া অর্জ্জুন-পৌত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ সম্প্রসারিত গ্রন্থই মহাভারত। পরে সৌনকের নৈমিষারণ্যে-অনুষ্ঠিত দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞে সেই মহাভারত সৌতি কর্ত্তৃক সমবেত ঋষি-সভায় পঠিত হইয়াছিল। আদিম ভারতসংহিতার এই

দ্বিতীয় সংস্করণই প্রচলিত মহাভারত। পরবর্ত্তীকালে উহাতে যোগবিয়োগ হয় নাই তা' বলি না—তবে মোটের উপর প্রক্ষেপ সত্ত্বেও প্রচলিত মহাভারত সৌতি-রচিত মহাভারতই বটে।

ভারত-সংহিতা সম্প্রসারিত হইয়া কবে মহাভারতে পরিণত হইয়াছিল? নিঃসংশয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না—কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে, খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকে পাণিনির সময় মহাভারত প্রচলিত ছিল। পাণিনিতে যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, কুন্তি, দ্রোণ ও বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) প্রভৃতির শুধু উল্লেখ আছে*, তাহা নয়—পাণিনি 'মহাভারত' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণ-গৃষ্টীষ্বাস-জাবাল-ভার-ভারত-হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু
—পাণিনি সূত্র, ৬।২।৩৮

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের উল্লেখ আছে—

সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়নপৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যা ;
যে চান্যে আচার্য্যাস্তে সর্ব্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

আশ্বলায়নের সময়ে সম্ভবতঃ ভারত ও মহাভারত উভয়ই বিদ্যমান ছিল, কারণ, তিনি যাঁহাদিগের তর্পণ করিতে বলিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে ভারত ও মহাভারত-ধর্ম্মাচর্য্যাঃ। প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ব্যুলার সাহেব বলেন আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে রচিত। কাহারও কাহারও মতে আশ্বলায়ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

---

* এ সম্পর্কে পাণিনির নিম্নোদ্ধৃত সূত্রগুলি দ্রষ্টব্য :—

গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ—৮।৩।৯৫
(এ সূত্রে যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ)

স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ—৪।১।১৭৬
(এ সূত্রে কুন্তির উল্লেখ)

বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্—৪।৩।৯৮
(এ সূত্রে অর্জ্জুন ও বাসুদেবের উল্লেখ)

নভ্রাণ্নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসক নক্ষত্রনক্রনাকেষু—৬।৩।৭৫
(এ সূত্রে নকুলের উল্লেখ)

দ্রোণপর্ব্বত জীবন্তাদন্যতরস্যাম্—৪।১।১০৩
(এ সূত্রে দ্রোণও দ্রোণায়ন—অশ্বত্থামার উল্লেখ)

শল্যপর্ব্বে দেখি, দুর্য্যোধন উরুভঙ্গের পর শ্রীকৃষ্ণের গ্লানি করিয়া তাঁহাকে 'কংসদাসের দায়াদ' বলিতেছে—

> দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্মিরুগ্রাভিরার্দ্দয়ৎ ।
> কংসদাসস্য দায়াদ ! ন তে লজ্জাঽস্ত্যনেন বৈ ॥

(কংসদাস শব্দে এখানে খুব সম্ভব নন্দগোপকে লক্ষ্য করা হইয়াছে)

সভাপর্ব্বে দেখি, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানে উত্তেজিত হইয়া নানা ভাবে তাঁহার নিন্দা করিতেছে—তাঁহাকে 'গোঘ্ন' 'স্ত্রীঘ্ন' বলিয়া গালি দিতেছে। ঐ নিন্দার মধ্যে পূতনাবধ, অশ্বরূপী কেশি ও বৃষরূপী অরিষ্ট বধ, শকটভঞ্জন, গোবর্দ্ধন-ধারণ ও ভূরি ভোজনের প্রসঙ্গ আছে—কিন্তু রাস বা গোপীর (পরদারাভিমর্ষের) কোন উল্লেখ নাই।

> যত্ত্বনেন হতা বাল্যে পূতনা চিত্রমত্র কিম্ !
> তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম ! যৌ ন যুদ্ধবিশারদৌ ॥
> চেতনারহিতং কাষ্ঠং যত্ত্বনেন নিপাতিতম্ ।
> পাদেন শকটং ভীষ্ম ! তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্ ॥
> বল্মীকমাত্রঃ সপ্তাহং যত্ত্বনেন ধৃতোঽচলঃ ।
> তদা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ! ন তচ্চিত্রং মতং মম ॥

> অনেন হি হতা বাল্যে পূতনা শকুনী তথা ।
> গোবর্দ্ধনো ধারিতশ্চ গবার্থে ভারতর্ষভ ॥
> অরিষ্টো ধেনুকশ্চৈব চাণুরশ্চ মহাবলঃ ।
> অশ্বরাজশ্চ নিহতঃ কংসশ্চারিষ্টমাচরন্ ॥ —উদ্‌যোগপর্ব্ব, ১৩০।৪৬-৭
> তং ঘোষার্থে গির্ভিরিন্দ্রাঃ স্তুবন্তি
> স চাপীশো ভারতৈকঃ পশূনাম্—অনুশাসন, ১৫৮।১৮
> ততোগ্রসেনস্য সুতং সুদুষ্টং
> বৃষ্ণ্যন্ধকানাং মধ্যগতং সভাস্থম্ ।
> অপাতয়দ্ বলদেব-দ্বিতীয়ো
> হত্বা দদৌ উগ্রসেনায় রাজ্যম্—উদ্‌যোগপর্ব্ব, ৪৮।৭৮
> বাল এব মহাবাহুশ্চকার কদনং মহৎ ।
> কংসস্য পুণ্ডরীকাক্ষো জ্ঞাতিত্রাণার্থকারণাৎ ॥—অনুশাসন, ১৪৮।৫৭

ভুক্তমেতেন বহ্বন্নং ক্রীড়তা নগমূর্দ্ধনি !
ইতি তে ভীষ্ম শৃণ্বানাঃ পরে বিস্ময়মাগতাঃ ॥
যস্ত-চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ! ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতত্তু মহাদ্ভুতম্ ॥—সভাপর্ব্ব, ২৪।৭-১১

সে সময়ে রাসে গোপীসঙ্গমের কথা প্রচলিত থাকিলে শিশুপাল নিশ্চয়ই 'পারদারিক' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিত। পরবর্ত্তী গ্রন্থে দেখিতে পাই, শিশুপালের পক্ষ হইতে এবং রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মি-রাজা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ঐ অপবাদ উল্লিখিত হইতেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের ১০৬ অধ্যায়ে রুক্মিণীহরণের সময় রুক্মি রাজা বলিতেছে,—

সাক্ষাৎ জারশ্চ গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজকঃ।
জাতেশ্চ নির্ণয়ো নাস্তি ভক্ষ্যমৈথুনয়োস্তথা ॥

ঐ গ্রন্থে শিশুপাল বধাধ্যায়ে—শিশুপালদূতের মুখেও ঐ তিরস্কার ঘোষিত হইয়াছে।

কৃত-গোপবধূরতে ঘ্নতো বৃষম্ উগ্রে নরকেঽপি সম্প্রতি।
প্রতিপত্তিরধঃকৃতৈনসো জনতাভিস্তব সাধু বর্ণ্যতে ॥ —১৬।৮

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসঙ্গত নয় যে, মহাভারত-রচনার সময় রাস বা গোপী-ঘটিত ব্যাপার ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু মহাভারতে না থাকিলেও হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বের ২০শ অধ্যায়ে রাসের বিবরণ আছে—যদিও সেখানে রাসের নাম নাই। ঐ অধ্যায়ের শেষে লিখিত সুচি এইরূপ—ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি হল্লীশকক্রীড়নং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ। এই হল্লীশ শব্দ লক্ষ্য করিতে হইবে। 'হল্লীশ' কি ? হল্লীশ চক্রাকারে নৃত্য (CircularDance)।

মণ্ডলেন চ যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীশকং তু তৎ—হেমচন্দ্র
হল্লীশং স্ত্রীণাং সহ নর্ত্তনমিতি—ত্রিকাণ্ড শেষ

ইহাই রাসের প্রাচীন নাম।

গোপীনাং মণ্ডলীনৃত্যবন্ধো হল্লীশকং বিদুঃ ইতি কোষাৎ—নীলকণ্ঠ
নর্ত্তকীভিরনেকাভির্মণ্ডলে বিচরিষ্ণুভিঃ।
যত্রৈকো নৃত্যতি নটো তদ্ বৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥
—ইতি বৃহৎতোষিণীধৃত বচন।

হরিবংশ ছাড়া—ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণেও রাসের বিবরণ আছে। ঐ সকল পুরাণে 'হল্লীশ' শব্দ নাই—গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঐ মণ্ডলীবদ্ধ নৃত্যের নাম সেখানে রাস। এই সকল বিবরণের কোন্‌টি প্রাচীনতম? আমার বিশ্বাস, হরিবংশের বিবরণই প্রাচীনতম। কেন তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। *

হরিবংশে হল্লীশের বিবরণ এইরূপ ঃ—

কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো বনম্।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥—২০।১৫
(যৌবনং কান্তিমত্ত্বম্—নীলকণ্ঠ)

'শ্রীকৃষ্ণ মনোরম শারদীয়া নিশা এবং নিশাকরের মনোহর কান্তি দর্শন করিয়া রমণেচ্ছু হইলেন।'

যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সংকাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ॥—২০।১৮

'কালজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিকালে যুবতী ও কুমারী গোপীদিগকে একত্রিত করিয়া নিজের কিশোর বয়সের সম্মান করতঃ তাহাদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের কান্ত (Beloved) ছিলেন—তাঁর 'কান্ত' চন্দ্রমুখ তাহারা নয়ন দ্বারা পান করিত—'Drink me only with thine eyes'.

তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তাগোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাং গতং শশিনং যথা ॥—২০।১৯

---

* আমি এ কথা বলি না যে, হরিবংশ এখন যে আকারে প্রচলিত আছে, উহা সর্ব্বাংশে ব্রহ্ম-বা বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্ববর্ত্তী—তবে হরিবংশে বর্ণিত রাসের বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী বটে। এ সম্বন্ধে আমার এক বন্ধুর ইংরাজী গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণে'র ভূমিকায় আমি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ লিখিয়াছিলাম—

If we were to compare the narratives in the Harivansa and the Vishnu Purana respectively, of, for instance, Putana-badha, Kaliya-damana, Jamalarjuna-bhanga etc, we shall find that the Harivansa account is in every case more elaborate, more ornate and less realistic than the account given in the Purana. The account of the Rasalila is, I believe, the only exception.

তাই গোপীরা কৃষ্ণের আহ্বান অবহেলা করিতে পারিল না—পতি, ভ্রাতা, মাতার বারণ সত্ত্বে তাহারা রাত্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইল।

তা বার্য্যমানাঃ পতিভিঃ ভ্রাতৃভির্মাতৃভি স্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ॥—২০।২৪

গোপীগণ মণ্ডলে মিলিত হইলে কি হইল ?

তাস্তং পয়োধরোত্তুঙ্গৈঃ উরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রমিতাক্ষৈশ্চ বদনৈঃ নিরীক্ষন্তে বরাঙ্গনাঃ॥ ২৩
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সংপ্রমত্তং করেণবঃ॥ ৩০ *
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রসলালসাঃ॥ ৩২
তাসাং গ্রথিতসীমন্তাঃ রতিং নীত্বাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংশিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্॥ ৩৪
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলংকৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥ ৩৫

(নিশাসু—তবে কি অনেক দিনই রাত্রিতে রাসক্রীড়া হইয়াছিল ?)
চক্রবালৈঃ মণ্ডলৈঃ হল্লীশকক্রীড়নং একস্য পুংসো বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ ক্রীড়নমেব রাসক্রীড়া
—নীলকণ্ঠ

"সেই বরাঙ্গনাগণ তুঙ্গস্তনশোভিত বক্ষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পীড়ন করিতে লাগিল এবং চঞ্চল কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। করেণুগণ যেমন মত্ত করিবরকে রমণ করায় গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণকে রমণ করাইতে লাগিল, এবং রতি-লালসায় সেই যামিনীতে সুরতাবসানে তৃষিত হইয়া তাঁহার মুখকমল-মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। গোপিকাগণ রতিশ্রমে আকুল হইলে তাহাদের গ্রথিত-সীমন্ত চিকুরদাম কুচাগ্রে বিস্রংসিত হওয়ায়, তাহা অতীব মনোরম হইল। এইরূপে কৃষ্ণ গোপীমণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চন্দ্রশোভিতা শারদীয়া যামিনীতে ইচ্ছানুসারে আনন্দানুভব করিলেন।"

পাঠক লক্ষ্য কবিবেন, এ বর্ণনায় প্রচুর কাম-চেষ্টা (eroticism) রহিয়াছে, কিন্তু গোপীদিগের মধ্যে শ্রীরাধার উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। আরও লক্ষ্য করিবেন, হরিবংশের বিবরণে রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক অন্তর্ধানেরও কোন

---

* ভাগবতে তুল্যোক্তি—রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ—ভাগবত, ১০।৩৩।২৩
চচার ভৃঙ্গ প্রমদাগণাবৃতো যথা মদচ্যুদ্ দ্বিরদঃ করেণুভিঃ—ভাগবত, ১০।৩৩।২৪

প্রসঙ্গ নাই—যে অন্তর্ধান পুরাণে বর্ণিত রাসলীলার একটি প্রধান অঙ্গ। এ সম্পর্কে আমার উক্ত ভূমিকায় আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম ঃ—

We find it related in the Brahma (and other) Puranas, that after the first meeting, Sri Krishna gives the slip to the Gopies who in their bewilderment imitated his actions until he reappeared and thereafter the Rasa—the circular dance, takes place. The Harivansa does not mention anything about the temporary disappearance of Sri Krishna but only describes the meeting and the dance which is there called Hallisa. ... ... it is quite possible that this factor of the Rasa-Lila (the temporary disappearance of Sri Krisna) is a subsequent addition and was made with a view to heighten the effect of the Rasa and......to enforce the spiritual verity underlying it,

হরিবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণের তুলনায় ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসের বিবরণ বিস্তৃত—যদিও ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের তুলনায় ঐ বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত। ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে কোন বিবরণ প্রাচীনতর ?

এই বিবরণদ্বয় পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে দৃষ্ট হয় যে, ব্রহ্মপুরাণের বিবরণ বিষ্ণুপুরাণের বিবরণের সহিত অবিকল এক—শ্লোকে শ্লোকে—প্রায়ই অক্ষরে অক্ষরে অভিন্ন—কেবল বিষ্ণুপুরাণে কয়েকটি অতিরিক্ত শ্লোকের যোগ আছে। ঐ সকল শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মপুরাণের রাসের কামায়ন (eroticism) আর একটু রঞ্জিত করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, উভয় বিবরণই কোন প্রাচীনতর বিবরণ হইতে (হয়ত বেদব্যাসের পুরাণ-সংহিতার বিবরণ হইতে) গৃহীত—একে অন্যের অনুকরণ নহে—এবং বিষ্ণুপুরাণকার ঐ প্রাচীন বিবরণে নিজের অভিমত কতকগুলি শ্লোক সংযুক্ত করিয়া রাসকে আরও চমৎকার করিয়াছেন। আগামীবারে এ সম্পর্কে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দ ও বাক্য

বাক্যের সংজ্ঞা লইয়া সভ্যতার আদি যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বাগবিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই যাহাতে সকল শ্রেণীর সম্মতি পাওয়া গিয়াছে। বাক্যের একটি সম্পূর্ণ সন্তোষ-জনক সংজ্ঞা দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে প্রথমতঃ কেবল বাক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কতকগুলি মতামত ও বাক্যের কতকগুলি গুণ আলোচিত হইবে, যাহা হইতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যাইবে যে "বাক্য" যতই সর্ব্বজন-পরিচিত ও নিত্য-ব্যবহার্য্য হউক না কেন, তাহার নিগূঢ় ধর্ম্ম হয়তো কোন দিনই মানুষের বুদ্ধির নিকট ধরা পড়িবে না। বাক্য সর্ব্বতোভাবে মানুষের সৃষ্টি, তথাপি তাহা মানবের বুদ্ধির অতিরিক্ত, ইহা বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। কিন্তু আসলে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, কারণ ভাষার সকল অংশের মত বাক্যও মানুষের সচেতন চেষ্টার ফল নহে। মানুষ তাহার সচেতন চেষ্টার দ্বারা আপনি যাহা গড়িয়া তুলে কেবল তাহাই সম্পূর্ণরূপে তাহার উপলব্ধি-গোচর হয়। তদতিরিক্ত যাহা কিছু তৎসম্বন্ধে মানুষের কেবল অনুমানই ভরসা।

পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত আলোচনা করিয়া বিশেষ লাভ নাই, কারণ তাঁহারা সকলেই প্রায় বাক্য ভাষায় তাহার পরিণতরূপ গ্রহণ করিলে, তবে তাহাকে আলোচনার বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের আলোচনার কিন্তু ঐখানেই শেষ, কারণ তাহার পরে কেবল বাক্যের রূপের কথাই উঠিতে পারে, বাক্য সে আলোচনার একটি সিদ্ধ সত্য। দার্শনিক Erdmann (Logik, Vol. 1, p. 435) বাক্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা Brugmann প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকেরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইঁহার মতে ভাষার প্রথমাবস্থায় মানুষ কর্ত্তা হইতে কর্ম্মকে (=কার্য্য) বা কর্ম্ম (=কার্য্য) হইতে কর্ত্তাকে পৃথক করিয়া ভাবিতে শিখে নাই,—এক একটি শব্দই তখন এক একটি বাক্যের কাজ করিত। এই আদিম শব্দবাক্যগুলি Interjection হইতে প্রায় অভিন্ন,—পার্থক্য কেবল এইটুকু যে এগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক অনুভূতি-প্রসূত (Gefuhlsreflexe) বলিয়া মনে করা চলে না। অপর দিকে এই প্রকার বাক্যের মধ্যে মানুষের মননশীলতারও

কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাতাস বহিতেছে দেখিয়া বৈদিক ঋষিরা বলিলেন "বাতি"। কেবল মাত্র বাতাস-বহা রূপ কার্য্যটাই তাঁহাদের সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল, এই স্পষ্টানুভূত কার্য্যের পিছনে কোন কর্ত্তার অন্বেষণ করিবার কথা তাঁহাদের মনেও আসিল না। এই প্রকার শব্দবাক্য "বাতি"-কে বাস্তবিকই বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? এ প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, ঐ নৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণনা করিবার জন্য ঋষিরা যখন বলিতে আরম্ভ করিলেন "বাতো বাতি", তখন কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে প্রকৃত বাক্য ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কারণ "বাতো বাতি" এই দুইটি কথার মধ্যে মানুষের মননশীলতার পরিচয় অতি সুস্পষ্ট। যে নৈসর্গিক ব্যাপারটি বর্ণনা করিবার জন্য এই দুইটি শব্দের ব্যবহার সেটিতো আসলে একটি মাত্র ঘটনা, যাহার জন্য ধূলা উড়ে, গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে, নদীতে তুফান উঠে, ইত্যাদি। এই একটি মাত্র ঘটনা প্রকাশ করিবার জন্য একটি মাত্র শব্দ প্রয়োগই তো যথেষ্ট এবং বাস্তবিকই ভাষার প্রথমাবস্থায় এই ঘটনাটি "বাতি" এই একটি মাত্র শব্দের সাহায্যে প্রকাশিত হইত; কিন্তু ক্রমে মানুষ ধূলা উড়া, পাতা পড়া, তুফান ওঠা ইত্যাদি নৈসর্গিক ঘটনার কারণ অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল, এবং তখনই মানুষ বলিতে আরম্ভ করিল "বাতো বাতি"। কার্য্য হইতে পৃথক একটি কর্ত্তাকে তখন অনুমান করিয়া লইতে হইল। এই অনুমান মানুষের মননশীলতার পরিচায়ক, কাজেই "বাতো বাতি" একটি বাক্য।

"বাতো বাতি" এই বাক্যের মধ্যে অনুমান অতি সুস্পষ্ট, কারণ বায়ু কেহ কখনও দেখে নাই, তাহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্রই অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু "গৌঃ শব্দায়তে" বা "অশ্বো ধাবতি" এই প্রকার উক্তির মধ্যেও কি অনুমানের কোন অবকাশ আছে? যদি অনুমানের অবকাশ না থাকে তবে এই সকল ক্ষেত্রেও যে মননশক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাইবে, আর মননশক্তি প্রয়োগের প্রমাণ না পাওয়া যাইলে এগুলিকে বাক্যই বা বলা যাইবে কিরূপে? বস্তুতঃ এই সকল উক্তিও মননশক্তি-প্রসূত, যদিও সর্ব্বত্রই উক্তিকালে যে এই মননশক্তি সুপ্রকট থাকে তাহা নহে।

মনে করিয়া লওয়া যাউক একজন লোক ধাবমান অবস্থায় ভিন্ন অপর কোন অবস্থায় কখনও কোন ঘোড়া দেখে নাই; এমন কি ঘোড়ার অনুরূপ কোন জীবকেও সে কোনদিন এমন কোন অবস্থায় দেখে নাই যাহাতে ঘোড়ার পক্ষেও যে

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব একথা তাহার মনে আসিতে পারে। এইরূপ একজন লোক যদি "অশ্ব" এই কথাটি উচ্চারণ করে তবে তাহার অর্থ কি? অবশ্যই তাহার অর্থ "অশ্বো ধাবতি"। একই ঘোড়াকে কখনও স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে এবং কখনও দৌড়াইতে দেখিয়া তবে অশ্বের বিশেষণ স্বরূপ "ধাবতি" এই ক্রিয়া প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করিল; এবং অশ্বেতর নানাপ্রকার জীবজন্তুকেও ধাবনরূপ এই সাধারণ কর্ম্মটি করিতে দেখিয়া ক্রমে মানুষ অশ্ব ও ধাবন এই দুইটি বিষয় পৃথক করিয়া ভাবিতে শিখিল। কাজেই "অশ্বো ধাবতি", "গৌঃ শব্দায়তে" এইরূপ উক্তিও মননসাপেক্ষ, সুতরাং এগুলি বাক্য।

এই বিষয়টিই অপরদিক হইতে বিবেচনা করিলে বাক্য সম্বন্ধে আর একটি কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। "অশ্ব" এবং "ধাবতি" এই দুইটি শব্দের যোগে একটি বাক্য নিষ্পন্ন হইল, কিন্তু বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে শব্দ দুইটির প্রত্যেকটিরই অর্থ পরিবর্ত্তিত হইল; কারণ এই বাক্যান্তর্গত অশ্ব শব্দটি কেবল ধাবনশীলন অশ্ব সম্বন্ধে প্রযুজ্য এবং তদন্তর্গত ক্রিয়াপদটির দ্বারা কেবল অশ্ব নামক এক বিশেষ জীবেরই ধাবনকার্য্য সুচিত হয়। বাক্যবদ্ধ হইয়া "অশ্ব" এবং ধাবতি" এই শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটি তাহার অর্থগত স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল এবং তাহাদের সমন্বয়ে এমন একটি নূতন বাক্যার্থের সৃষ্টি হইল যেটি "অশ্ব" এবং "ধাবতি" পৃথক পৃথক প্রয়োগ করিলে পাওয়া যাইত না। Van Ginneken এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। বাক্যান্তর্গত শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন:

Ils ont d'une facon immediate besoin l'un de l'autre pour etre compris exactement; en d'autres termes...ils se penetrent si intimement que la signification de l'un change la signification de l'autre et vice versa. Je dis d'une facon immediate, non mediate. Mediatement on a basoin aussi de la construction precidente, du milieu, de la culture et des connaissances acquises, d'une maniere de penser dans une direction determinee etc. (Principes de Linguistique Psychologiques, p. 495).

প্রাচীন বৈয়াকরণগণও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বাক্য-মধ্যে শব্দের সমন্বয়ে নূতন একটি অর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। Dionysios Thrax, Priscian প্রমুখ গ্রীক ও রোমক বৈয়াকরণগণ এই সমন্বয়ের—synthesis—উপর বিশেষভাবে জোর দিয়া গিয়াছেন। এখন বিবেচ্য, বাক্য যে স্থলে বিভিন্ন শব্দসম্ভূত সে স্থলে এই

সমন্বয় বা synthesis নিশ্চয়ই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু বাক্য যে সর্ব্বত্রই বহ্ববয়ব হইবেই তাহা নহে। "বাতো বাতি", "অশ্বো ধাবতি" ইত্যাদি স্থলে অবশ্য বহ্ববয়বতা বাক্যত্বসিদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ নতুবা তন্মধ্যে মননশক্তি প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনুজ্ঞা বা আদেশবাচক একটি মাত্র শব্দের মধ্যেও তো মননপ্রচেষ্টা সুপরিস্ফুট, তবে অনুজ্ঞাবাচক একটিমাত্র শব্দ দ্বারাই বাক্যত্ব সিদ্ধ হইবে না কেন? অবশ্য বলা যাইতে পারে যে এক শব্দাত্মক সম্বুদ্ধি বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের মধ্যে সর্ব্বত্রই অপর এক বা একাধিক শব্দ উহ্য থাকে, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে সে বাক্য এক শব্দাত্মক বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা এক শব্দাত্মক নহে; অর্থাৎ "কুরু" এই একটি মাত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ "ত্বং কুরু"; এবং "সখে" বলিয়া সম্বোধন করিলে তাহারও অর্থ "সখে আগচ্ছ" বা ঐরূপ একটা কিছু। কিন্তু বাক্যের অনুক্তাংশকে আশ্রয় করিয়া সম্বুদ্ধি বা অনুজ্ঞাবাচক শব্দের বাক্যত্বসিদ্ধির চেষ্টা ঠিক যুক্তিযুক্ত হইবে না, কারণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিব্যক্তির দিক হইতে সকল উক্তিই অনুক্তাংশ। যাহা সকল উক্তিরই সাধারণ ধর্ম্ম তাহারই উপর নির্ভর করিয়া একটি বিশেষ শ্রেণীর উক্তির উপর বাক্যত্ব আরোপ করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সচেতন মননচেষ্টাপ্রসুত হইলেও সম্বুদ্ধি বা অনুজ্ঞাবাচক শব্দকে বাক্যরূপে গ্রহণ না করাই শ্রেয়ঃ।

বাক্য এক বা বহু শব্দাত্মক যাহাই হউক না কেন, তাহার অর্থ সর্ব্বত্রই সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া প্রয়োজন, নতুবা তাহা বাক্যরূপে পরিগণিত হইবে না। গ্রীক ও রোমক দার্শনিকগণ বাক্যকে সেই জন্য autoteles, perfecta বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অর্থ পূর্ণাঙ্গ হইলেই বাক্যত্ব সিদ্ধ হইবে কি? তাহা হইলে শব্দ ও বাক্যের মধ্যে প্রভেদ করাও সকল সময়ে সম্ভব হইবে না।

অতএব বাক্যকে যদি শব্দ হইতে পৃথক একটি সত্তা রূপে স্বীকার করা হয় তবে শব্দার্থের পূর্ণাঙ্গত্বের ও বাক্যার্থের পূর্ণাঙ্গত্বের মধ্যেও পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমার মনে হয়, শব্দার্থ ও বাক্যার্থের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা অসম্ভব নহে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, শব্দার্থ সর্ব্বত্রই সিদ্ধান্ত কিন্তু বাক্যার্থ সর্ব্বত্রই অনুমান। ধরিয়া লওয়া যাউক যে প্রত্যেক সচেতন উক্তির মূলে আছে কোন আবেগ বা বেদনার অভিব্যক্তির প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা (= অনুমান) যখন একটি নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তখন ভাষায় তাহা একটি মাত্র শব্দ দ্বারা প্রকাশিত

হইয়া থাকে, বায়ুবেগ অনুভব করিয়া মানুষ এই অবস্থায় বলিবে "বাতঃ"। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায়, যখন বায়ু সম্বন্ধে অনুমানই মনোমধ্যে প্রবল—তখন মানুষ বলিবে "বাতো বাতি"। এক্ষেত্রে "বাতি" এই ক্রিয়াপদের ব্যবহারে ইহাই সূচিত হয় যে বায়ু বহা রূপ ঘটনাটিকে তাহার সূচনা হইতে উক্তিকাল পর্য্যন্ত মনশ্চক্ষে পর্য্যালোচনা করা হইতেছে, বক্তার মনে তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। যে ব্যক্তি বায়ু অনুভব করিয়া কেবল মাত্র "বাতঃ" বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল সে ব্যক্তি যে বায়ুবেগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন একথা মনে করিবার কোনই কারণ নাই (বিশেষ যখন বায়ুর বেগ হইতেই বায়ুর অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে); তাহার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে বায়ু কতক্ষণ ধরিয়া কি ভাবে বহিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার অনুসন্ধিৎসার অভাব আছে—যেমন করিয়াই হউক, বায়ু বহা সম্বন্ধে সে একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং সেই সিদ্ধান্তই সে ধরিয়া থাকিতে চায়। বস্তুত "বাতঃ" এবং "বাতো বাতি" এই দুইটি উক্তির মধ্যে যে অর্থগত বৈষম্য আছে, "সে যায়" (aoristic) এবং "সে যাইতেছে" (durative) এই দুইটি বাক্যের মধ্যেও ঠিক সেই পরিমাণ অর্থগত বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। "সে যায়" এইরূপ একটি উক্তি যেন সর্ব্বপ্রকার জাগতিক সম্বন্ধের অতীত, তাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান ইহার কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। কিন্তু "সে যাইতেছে" বলিলেই কার্য্যটির সম্ভাবনাক্ষেত্র স্থান ও কাল উভয়ত্রই সঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমানে পরিণত হইল। কেবল মাত্র "বাতঃ" সেইরূপ সকল প্রকার জাগতিক সম্বন্ধের অতিরিক্ত স্বাধীন একটি ঘটনা, "বাতি" এই পদটির দ্বারা জাগতিক জীবনের সহিত তাহার যোগ সাধিত হয় মাত্র।

গোঁড়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা স্বীকার করিবেন না যে বিশেষ্য বাচক শব্দকেও durative বা aoristic নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু দুইটি ক্রিয়াবাচক পদের অর্থগত বৈষম্যটুকুও যে সর্ব্বত্র ক্রিয়াত্মক হইবে তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। সুতরাং "বাতঃ" এই উক্তিটিকে aoristic মনে করা কোন ক্রমেই দূষণীয় নহে। এবং "বাতঃ" aoristic হইলে "বাতো বাতি" যে durative তৎসম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনার পর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

পশ্চিম ভারতে ছপ্পরবন্দ ও কায়খাড়ীদের মতন আরও অনেক Criminal Tribes আছে, যাদের জাতিগত ধর্ম্ম চুরী করে দিন গুজরান করা। এদের সকলের সঙ্গে কিছু আমার সাক্ষাৎ জানা-শুনো হয় নেই। যাদিকে চিনি তাদেরই গল্প করছি। ফাঁস-পার্ধী বা হরিণ-শিকারী বলে এক জাত আছে। তারা বনজঙ্গলে ফাঁদ পেতে খরগোস, তিত্তির, বটের, এমন কি হরিণ-ছানা পর্য্যন্ত ধরে, আর গাঁয়ে গাঁয়ে, শহরে শহরে ঘুরে সেইগুলো বেচে বেড়ায়। এদের আসল উৎপত্তি-স্থান গুজরাত, কিন্তু এখন পাকা ভবঘুরে। বেশ চটপটে চালাক মানুষ এরা। কথা-বার্ত্তা মিষ্টি, দেখতে সুপুরুষ, কায়খাড়ীদের মতন কালো মুস্কো জোয়ান নয়। দিনের বেলায় গ্রামের ঘরদোর রাস্তাঘাট নজর করে দেখে যায়। রাত্রে চুরী করতে বেরোয়। তবে এরা ছিঁচকে চোর, এদের দৌড় ঘটিটা বাটিটা পর্য্যন্ত, দামী জিনিস বড় একটা ছোঁয় না। তাই ধরাও সহজে পড়ে না। আমি কখন কখন এদের কাছ থেকে শিকারের পাখী-টাখী কিনতাম, কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল যখন পুলিস এক gang case এনে উপস্থিত করলে। তখন বুঝলাম যে এদের পেটে পেটে কত বুদ্ধি!

কিন্তু যত চোর ডাকাতের জাত আমি দেখেছি, তার মধ্যে সেরা হচ্ছে রাজ-পুতানার মীনা-বাউরীরা। এরা চুরী ডাকাতী করে বেড়ায় সারা পশ্চিম ও মধ্য-ভারত জুড়ে। এদের দল উত্তরে পঞ্জাব, দক্ষিণে কর্ণাট, পশ্চিমে গুজরাত ও পূর্ব্বে নাগপুর এলাকা, সর্ব্বত্র দেখা যায়। প্রকাশ্যে সবাই নানা রকম খুচরো ধান্দা করে, কিন্তু এদের মধ্যে সত্যি একজনও সদ্‌গৃহস্থ আছে কি না সন্দেহ। কায়খাড়ী কি ছপ্পরবন্দদের চেয়ে এরা সংখ্যায় অনেক বেশী। ছিঁচকে চুরী, সিঁদ কাটা, দল বেঁধে ডাকাতী, সবেতেই এরা সিদ্ধহস্ত। প্রত্যেক দল কতকগুলো চুরী-চামারী করে দিন কয়েকের জন্য দেশে ফিরে যায়। সেখানে চোরাই মালের ব্যবস্থা করে, দিনকতক আরাম করে আবার সফরে বেরোয়। চোরাই মাল পাচার করতে এদের

বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। আজমের ইত্যাদি বড় বড় শহরে গোটা কয়েক বাঁধা দোকান আছে। সেইখানে মাল নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়। এই দোকানদারেরা জাতে মীনা-বাউরী না হলেও কার্য্যতঃ তাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত। মাল সমস্ত ধীরে-সুস্থে বিক্রী করে দামটা তহবিলে জমা করে দেয়। এই সম্প্রদায়ের ভেতরের ব্যবস্থা অতি চমৎকার, কায়খাড়ীদের চেয়েও পাকা। কাজ কর্ম্ম সমস্ত একট বাঁধা নিয়মে চলে। বিশ্বাসঘাতককে হাতে হাতে সাজা পেতে হয়। পয়সা কড়ি সব জমা হয় সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের হাতে। তাঁরা বুঝে সুঝে প্রত্যেক দলকে খরচা জোগান, দরকার মত অস্ত্র শস্ত্রের বন্দোবস্ত করেন, মোকদ্দমা মামলা চালান, বিধবা অনাথদের খেতে পরতে দেন। সেকালের Mafia Carbonari-রাও এদের চেয়ে গূঢ়মন্ত্র ছিল কি না সন্দেহ। মীনা-বাউরীদের চেহারা কতকটা রাজপুত ধাঁচার। বেশ জোয়ান কিন্তু কায়খাড়ীদের মতন চোয়াড় নয়। অসাধারণ বুদ্ধিমান। এদের এক gang case আমি মাস তিনেক ধরে করেছিলাম। সেই মোকদ্দমাতে বেচর সিং নামে এক আসামী ছিল। লোকটা নিজের ও অন্য কয়েকজন আসামীর তরফে যে সাক্ষীর জেরা করেছিল, তা আমার আজও মনে আছে। সে রকম জেরা সকল উকীলেও করতে পারে না। এক পুলিস সাহেবকে সওয়াল করতে করতে বললে, "একবার সাত বছর জেল খেটে এসেছি। এবার ত কালাপানি জানা কথা! তবে আমি দেখাতে চাই যে এই পুলিসওয়ালারা কি চীজ!" শেষ পর্য্যন্ত কালাপানির সাজাই সে পেলে। কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র ত নয়, খুব হেসে বললে, "এ আমার সাক্ষী জেরা করার পুরস্কার না কি, হুজুর!"

এ সব ত হল পেশাদার চোর ডাকাত। চুরী-চামারী এদের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম পালনে নিধনের সম্ভাবনা আছে, জেনেও এরা ভয়াবহ পরধর্ম্ম পরিগ্রহ করে না। সেজন্য এদিকে বেশী দোষ দেওয়া যায় কি? আর চুরী জিনিসটা কি সত্যিই একটা মহাপাপ! যে দেশে বা যে যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোন পদার্থ নেই, সেখানে চুরীও থাকতে পারে না। আগেকার দিনে এ দেশে বা বিলেতে চোরকে দেহান্ত সাজা দেওয়া হত। সে আইন গড়েছিলেন তাঁরা, যাঁদের চুরী করার কখন দরকার হয় না। আজ আমাদের মতি-গতি অন্য রকমের হয়েছে। চোরকে শূলে চড়াতে আমরা আর রাজী নই। কে জানে, হয়ত এমন দিন আসছে যখন মানুষে মানুষে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া আর থাকবে না। আমাদের চোখের

সামনে হাবসীদের সারা দেশটা চুরী হয়ে গেল, কেউ কিছু করতে পারলে কি। ঘটি বাটি চুরীর কথা নিয়ে নাক সিটকে ফল কি।

ভারতবর্ষ নানা রকম অর্দ্ধ-সভ্য জাতে ভরা। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম সম্বন্ধে তাদের নিজে-দের একটা ধারণা আছে। সাধারণতঃ তারা ভাল মানুষ, হেসে খেলে নেচে গেয়ে শিকার করে কাটিয়ে দেয় এক রকম। কিন্তু দেশে অকাল পড়লে ক্ষিদের তাড়নে তারা পাহাড় থেকে নেমে এসে লুট-পাট করে যায়। তেমন দরকার পড়লে রীতি-মত ডাকাতের দলও পাকায়। এটা তারা অধর্ম্ম মনে করে না। তবে এদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম, সহজে ধরা পড়ে যায়। এদিকে জেলে পোরবার জন্য পুলিসকে gang case করতে হয় না। এ রকম জাত আমি যাদিকে ভাল করে জানি তারা হচ্ছে সাতপুরা পাহাড়ের ভীল, পশ্চিম ঘাটের কাতকরী ও বিজাপুর অঞ্চলের বেডর। এই বেডররা আগেকার আমলে সেপাই-গিরি করত। বে-ডর নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন যে এরা নির্ভীক সেপাই ছিল। এখন কালের পরিবর্ত্তনে এরা অস্ত্র ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে ; তবে ভয় পদার্থটার সঙ্গে এদের আজও পরিচয় হয় নেই। Meadows Taylor-এর "তারা" বলে উপন্যাসটা পড়লে পাঠক এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

বিজাপুর জেলায় আমার প্রথম সেরেস্তাদার ছিলেন জাতে বেডর। ইংরেজী না জানলেও ভদ্রলোক কাজকর্ম্ম করতেন ভালই। কিন্তু চেহারাখানা ছিল সত্যি ভয়াবহ। মিশ কালো রঙ্গ, ভাটার মতন বড় বড় দুটী লাল চোখ, বিশাল ছাতি, দীর্ঘ বাহু, সেরেস্তাদারের গদীতে বসে সব সময় মানাত না, বিশেষতঃ একটু অন্ধকার হলে। ঐ আপিসে বুদন সাহেব নামে আমার এক কেরানী ছিল। বেশ চালাক-চতুর, ফিটফাট, কলেজে পড়া ছোকরা। কিন্তু একটা বড় দোষ ছিল তার। যখন তখন, "We Muslims are a backward community, sir. The Hindus ইত্যাদি ইত্যাদি," বলে তার স্বজাতির প্রতি আমার দরদ উদ্রেক করার চেষ্টা করত। আমার সেরেস্তাদার রাও সাহেব নিতান্ত backward বেডর জাতের লোক হলেও তাঁর অযথা বিনয় এতটুকু ছিল না। তিনি বুদনের নাকি-সুরে কান্না বরদাস্ত করতে পারতেন না। একদিন আমার সামনেই খুব বকুনি দিলেন ছোকরাকে। হঠাৎ আপিস তাঁবুর ভেতরে ঢুকে রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ফের সাহেবকে দিক্ করছ! কেবল দিবারাত্র backward, backward! আরে আমার চেয়ে backward

ত নস্! আমি কি ঘ্যান ঘ্যান করি! মানুষের নিজের ইজ্জৎ নিজের হাতে।" বুদন সাহেব সভ্য-ভব্য ভদ্রবংশীয় ছেলে; মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি সেরেস্তাদারকে বললাম, "আচ্ছা, রাও সাহেব, আপনি একটু বাহিরে অপেক্ষা করুন। আমি বুদনের ফাইলটা (দপ্তরটা) শেষ করে নিই।" আমি বিজাপুর ছাড়বার আগে এই মুসলমান ছোকরাটীকে একটা হাকীমী জোগাড় করে দিতে পেরেছিলাম। এ বিষয়ে আমার বেডর রাও সাহেব, বাধা দেওয়া দূরে থাক, অনেক সাহায্য করেছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু হলে এতটা পারত কি না, সন্দেহ।

লমানী বলে এক ভবঘুরে জাতের সঙ্গে আমার বিজাপুরে পরিচয় হয়। শুধু পরিচয় কেন, এরা আমাকে একটু জব্দও করেছিল। গল্পটা মন্দ নয়। এই লমানীরা আসলে কোন প্রদেশের লোক তা আমি আজও জানি না। তবে কথা-বার্ত্তা কইত এক রকম জঙ্গলী হিন্দীতে। মেয়েরা পোষাক পরত, মধ্য-প্রদেশী বা রাজপুত ধরণের রঙ্গ-বেরঙ্গের ঘাঘরা, কাঁচুলী, ওড়না। বছর দুই তিন আগে এরা এসে আমার এলাকাতে মুদ্দেবিহাল বলে এক ছোট শহরের বাহিরে ঘাস পাতার কুড়ে বেঁধে বাস করেছিল। এই শহর থেকে রেল ছিল ক্রোশ দশেক দূরে। ষ্টেশন পর্য্যন্ত বরাবর পাকা সড়ক। লমানীদের বসতি ছিল এই সড়কের কাছাকাছি গোটা দুই টিলার উপর। বেচারারা ভিক্ষা মেগে মজুরী করে খেত। এক-আধজন সামান্য রকম চাষবাসও করেছিল। এদের যে কোন আয়েব আছে তা কেউ মনে করত না। আমি এই মহকুমার ভার নেবার পর কিন্তু ষ্টেশনের সড়কে একটার পর একটা রাহাজানি হতে আরম্ভ হল। প্রথম গরীব গুরবো পথিকের উপর অত্যাচার, শেষ গাড়ী লুট পর্য্যন্ত হতে লাগল। একদিন ডাক্তার বাবুকে মেরে ধরে তাঁর সর্ব্বস্ব লুটলে। আর একদিন শহরের একজন বড় উকীলের গাড়ী ধরে মেয়ে ছেলেদের অঙ্গ হতে গহনা-পাতি ছিনিয়ে নিলে। আমি কানাঘুসো শুনলাম যে লমানীরা এই কীর্ত্তি করছে। নিজে লুকিয়ে রাত্রিবেলা সড়কে টঙ্গায় চেপে একদিন গেলাম। এক নির্জ্জন জায়গায় কতকগুলো লোক দেখলামও। কিন্তু কাউকে ধরতে পারলাম না। তালুকার দারোগা বাবু ধার্ম্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। রোজ দু তিন ঘণ্টা পূজা করতেন। তাঁকে পীড়াপীড়ি করতে তিনি বললেন, "প্রমাণ কিছু পাচ্ছি না, হুজুর। ধরব কাকে!" এ রকম মনোবৃত্তি জজ ব্যারিষ্টারের শোভা পায়, কিন্তু পুলিস পাহারাওয়ালার চলবে কেন। লজ্জা

স্ত্রীলোকের ভূষণ, কিন্তু সলজ্জাঃ গণিকাঃ নষ্টাঃ। যাই হোক, অত বড় একটা সড়কে ক্রমাগত রাহাজানিও ত হতে দিতে পারি না। পুলিস কর্ত্তাদের ধরে দারোগাকে বদলী করালাম। মাধোরাও বলে যিনি নূতন দারোগা হয়ে এলেন, তাঁকে ঠিক ধর্ম্মভীরু বলা চলে না। খুব কাজের লোক। তাঁকে সহায় করে এক শুভদিনে লমানী গ্রামের সমস্ত শক্ত-সমর্থ পুরুষদের ধরে আনালাম। সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ টাকার জামীন দিতে হুকুম করলাম। জামীন কোথা হতে দেবে! সব জেলে গেল। কিন্তু রাহাজানি যাদুমন্ত্রের মত বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে লমানীরা জেলা-হাকীমের এজলাসে আপীল করলে। জেলা-হাকীম ছিলেন D, যাঁর কথা আগে আপনাদিকে বলেছি। তিনি কাগজ পত্র দেখে আমাকে এক চিঠি লিখলেন, "এ কি করেছ! Decency-র (ভব্যতার) একটা সীমা আছে ত! কোন প্রমাণই নেই যে তোমার এই মোকদ্দমাতে!" আমিও জানতাম, সাক্ষী-সাবুদ কি রকমের উপস্থিত করেছিল মাধো দারোগা। বড় সাহেবকে লিখলাম, "আপনি ওদের ছেড়ে দিন। আমার কাজ হাসিল হয়েছে।"

আমার কিন্তু সত্যি এই বকুনি খেয়ে বিশেষ লজ্জা হয় নেই। এই Chapter করে জামীনের হুকুম দেওয়ার ব্যাপার পরে সিন্ধের সীমান্তে যা দেখেছি, তার তুলনায় আমার লমানী-দমন অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আর শুধু কি তাই! পরে জজের আসনে বসে যে সব gang case করেছি সেই বা কি! এই জাতীয় মোকদ্দমাগুলো কি তা আমার পাঠকেরা সবাই বোধ হয় জানেন না। বুঝিয়ে বলি। ধরুন কতকগুলো লোক গোপনে দলবদ্ধ হয়ে স্থির করলে যে তারা যেখানে সুবিধা পায় চুরী ডাকাতী করবে। সব তোড়জোড় ঠিক করে চুরী আরম্ভ করলে। একটার পর একটা চুরী হতে লাগল। অথচ এমন হুশিয়ার চোর, এমন আট-ঘাট বেঁধে তারা কাজ করছে যে পুলিস তাদের কোন পাত্তাই পাচ্ছে না। এক বছর, দু বছর, তিন বছর পর্য্যন্ত এই ভাবে চলল। খবরের কাগজে লেখালেখি হতে লাগল। হয় ত কাউন্সিলে দুই একটা সওয়ালও হল। তখন সরকারের টনক নড়ল। জেলায় জেলায় কড়া হুকুম জারী হল, চোর ধরতেই হবে। অবিলম্বে সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করে এক গাদা লোককে gang বা গুপ্তদল বলে চালান করা হল। এ মোকদ্দমাগুলো সবই প্রায় এক রকমের হয়। গোটা দুই বিভীষণ বা Judas জাতীয় সাক্ষী সব ভেতরের কথা ফাঁস করে দিচ্ছে, আর গণ্ডা কয়েক ছোট বড় সাক্ষী এসে হলপ পড়ে বলছে যে

অমুক দিন অমুক স্থানে এই দলের লোক আমার ঘরে চুরী করেছে, বা আমাকে চড় মেরে আমার পয়সা কড়ি কেড়ে নিয়েছে। জজ সাহেব ও তাঁর জুরী এই প্রমাণের উপর নির্ভর করে দলের অন্ততঃ বারো আনা লোককে জেলে বা কালাপানিতে পাঠাচ্ছেন। সংসার নিরুপদ্রব হচ্ছে, যতদিন না আবার একটা দল গড়ে ওঠে। সাক্ষীসাবুদ মিথ্যা, তা আমি বলছি না। বলতেও পারি না, কারণ এই রকম প্রমাণের জোরে বহু লোককে কালাপানি পার করেছি। তবে এই gang case গুলো যে ঠিক ইংরেজী Evidence Act সম্মত তাই বা কি করে বলি। আর এক কথা। সমাজের পয়সাওয়ালা লোকদিকে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচাতে হবে ত! নইলে কার জন্য সমাজ, কার জন্য রাষ্ট্র? পাঠক শুধু এইটুকু বিচার করুন যে আমার ছেলেবেলাকার লমানী দমনের সঙ্গে এই gang case-এর কোন জাতিগত পার্থক্য আছে কি? মোট কথা, এই সব ব্যাপার পুলিসের থানাতে কি মেজিষ্ট্রেটের খাস-কামরাতে সমাধা হওয়াই ভাল। জজ জুরীকে এর ভেতর টানাটানি করা কেন! এই সম্পর্কে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। মফস্বলে জুরী বা এসেসার যাঁরা হন, তাঁরা দেখেছি, চুরী ডাকাতির ব্যাপারে জজের চেয়েও কড়া হাকীম। একেবারে দয়ামায়া-হীন। অথচ তহবিল তছরুপ, কি দলীল জাল করা, কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এ সবের মোকদ্দমাতে তাঁদের আসামীর প্রতি অসীম দয়া। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে চোরের gang-কে জুরীর সামনে খাড়া করলে তাদের বিশেষ উপকার করা হয় না।

একটা কথা, বোধ হয়, এত কাল হাকীমী করার পরে আমার মুখে শোভা পাবে না। কিন্তু আদালতের সূক্ষ্ম বিচারের উপর আমার বড় একটা আস্থা নেই। সালিশী নিষ্পত্তিতে ন্যায় বিচার হয়, সীমান্তে জিরগার বিচারেও যথেষ্ট হয়, কিন্তু জজের এজলাস সম্বন্ধে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। আমি নিজে যদি কখনও ন্যায় করতে পেরে থাকি, ত সে আদালতের বাহিরে। বিজাপুরে থাকতে এই রকম একটা সৎকর্ম্ম করবার সুবিধা পেয়েছিলাম। গল্পটা শুনলে আপনাদের হয় ত আমার উপর ভক্তি চটে যাবে। তা হোক, তবু বলি। আমার এলাকাতে এক বড় জায়গীর ছিল। জায়গীরের যথার্থ মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধা দেশাইনী। তাঁর এক সৎছেলে ছিল, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সে ভদ্র-লোক পৈত্রিক সম্পত্তির অতি সামান্য অংশই পেয়েছিলেন। মাতাপুত্রে এতটুকু

বনি-বনাও ছিল না। আমি যখন এলাকার ভার নিলাম, তখন প্রায় পঁচিশ বছর নাগাদ মায়ে ছেলেতে নানা আদালতে, মায় বিলেত পর্য্যন্ত, মামলা-মোকদ্দমা চলেছে। কিছু দিন বাদে এক পুলিস রিপোর্ট এল আমার কাছে, অমুক দেশাইনী নালিশ করেছিলেন যে তাঁর পুত্র অমুক দেশাই তাঁর পঁচিশটা বাবলা গাছ কেটে চুরী করে নিয়ে গেছেন, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে বাবলা গাছের মালিকী সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে আজও কিছু নিষ্পত্তি হয় নেই, দেশাই সাহেব বলেন তিনি স্বয়ং গাছের মালিক, অতএব মামলা খারিজ করার জন্য হুজুরের হুকুম প্রার্থনা করি। আমি এদের পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটির সব ইতিহাস জানতাম। মনে করলাম, একটা সুযোগ পেয়েছি, দেখি কিছু পাকা ব্যবস্থা করতে পারি কি না। হুকুম দিলাম যে চুরীর মোকদ্দমা আমার এজলাসে চলবে। চালালাম মোকদ্দমা একটী মাস ধরে। দুই পক্ষে দুজন বড় উকীল, দুজন ছোট উকীল। বড়রা নিচ্ছিলেন রোজ একশো টাকা, ছোটরা রোজ তিরিশ টাকা। উকীলেরা সকলে মিলে আরম্ভেই দরখাস্ত করেছিলেন যে মোকদ্দমা সদরে চালালে তাঁদের বড় সুবিধা হয়। সে দরখাস্ত আমি পাঁচ রকম ভেবে মঞ্জুর করলাম না। ক্যাম্পেই মোকদ্দমা শুরু করে দিলাম। যথারীতি পাঁচ ছয় দিন অন্তর ক্যাম্প বদল হতে লাগল। উকীল ও সাক্ষীর দল সঙ্গে সঙ্গে চললেন। একদিন ধুম করে সদল-বলে সরেজমান গিয়ে কাটা বাবলা গাছের খুঁটোগুলো দেখা আসা গেল। জায়গাটা কৃষ্ণানদীর মাঝে এক দ্বীপে। ফুট তিন চার জল ভেঙ্গে যেতে হল। কারোই তেমন উৎসাহ ছিল না, তবে আমি নাছোড়বান্দা। এই রকম করে দিন পঁচিশেক শুনানি হওয়ার পর আমি দেশাইনী সাহেবার কেল্লার কাছে তাঁবু ফেলে তাঁকে তলব করলাম। তাঁর উকীল দরখাস্ত করলেন—ফরিয়াদী পদস্থ ব্যক্তি, অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলা, কমিশনে তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হোক। তাতে ত আমার কাজ হাসিল হয় না। ভদ্রমহিলাকে সশরীরে উপস্থিত হতে বলে দিলাম। পর দিন তিনি এলে পর তাঁকে আমার বৈঠকখানা তাঁবুতে পরদার আড়ালে বসিয়ে কথাবার্ত্তা কইলাম। জোর করে আদালতে হাজির করায় তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি খুব বিনয় করে বললাম, "আমার ত গত্যন্তর নেই, বাই সাহেব। আপনার ছেলে পদগৌরবে আপনারই সমকক্ষ। তাঁকে যদি চুরীর মোকদ্দমাতে আসামী করা হল ত তাঁর মাকেই সাক্ষী বলে না ডাকা হবে কেন!" আরও

দুচার মিনিট কথা কওয়ার পর অতি সন্তর্পণে বললাম "তবে যদি আপনি মোকদ্দমা আর না চালাতে চান, ত সাক্ষ্য দেওয়ায় দরকার হবে না। কিন্তু এই একটা ব্যাপার নয়, আপনাদের দুজনের মধ্যে যত মোকদ্দমা চলছে সব মিটমাট করে ফেলতে হবে।" তিনি নানা রকম ওজর আপত্তি করতে লাগলেন—আমার ছেলে অত্যন্ত দুষ্ট লোক—আমার হক্ আমি ছাড়ব কেন—তাহলে আমার মান ইজ্জৎ থাকবে না, ইত্যাদি। আমি তাঁকে একটা দিন ভেবে চিন্তে দেখতে বললাম। পরদিন আবার তিনি পাল্কী চেপে চোপদার বরকন্দাজ সঙ্গে নিয়ে এলেন। আবার গিয়ে বৈঠকখানা তাঁবুতে আমার স্ত্রীর কাছে বসলেন। আমি অনুমতি নিয়ে আসামী দেশাই সাহেবকে তাঁর সামনে হাজির করলাম। দেশাইকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলাম। তিনি সোজা গিয়ে তাঁর মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বললেন, "মা, আমাকে ক্ষমা কর।" মায়ের মন গলতেও দেরী হল না। এর পরে উকীল সাহেবদের সাহায্যে দুই পক্ষের মধ্যে একটা পাকা রকম মিটমাট দিন দুয়েকের মধ্যেই করে ফেলা গেল। উকীলরা এই বাড়তি দুদিনের জন্য কিছু পয়সা নিলেন না। সকলেই খুশী হল। বৃদ্ধা দেশাইনী কিন্তু একটু চিপটেন কাটতে ছাড়লেন না, "তোমার গোড়া থেকেই এই দুষ্টবুদ্ধি ছিল, না, সাহেব?" আমি তখন কেল্লা মেরে দিয়েছি, জোড়হাত করে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" সেখান থেকে ক্যাম্প ওঠবার আগে একদিন দেশাইদের কেল্লাতে খুব জলসা, খাওন-দাওন হল।

এই দেশাইদের গল্প করতে করতে আর এক দেশাই-এর কাহিনী মনে হচ্ছে। দক্ষিণ দেশে এসে অবধি অনেক চেষ্টা করছিলাম, ভাল মরাঠী লাবণী (Ballad) শোনবার। কিন্তু বিজাপুরে মরাঠা খুব কম বলে লাবণী গানও সে রকম প্রচলিত নয়। একবার এক ক্যাম্পে সাতারা জেলার একজন গায়ক এসেছিলেন। তিনি দুটো একটা পুরানো পোবাড়া (গাথা) গেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "একটা এই দেশের পোবাড়া শুনবেন, রাও সাহেব?" আমি খুব আগ্রহ দেখাতে সে নুরগুন্দ-এর দেশাইদের এক গাথা গাইলে। যখন ইংরেজ সরকারের নূতন অস্ত্র আইন জারী হল তখন এই দেশাইও হুকুম পেলেন—অমুক দিনে একজন সরকারী অফিসার আপনার কেল্লায় যাবেন, আপনার সমস্ত হাতিয়ার তাঁর কাছে হাজির করবেন। বৃদ্ধ দেশাই হুকুম পেয়ে অনেক কাঁদলেন। কিন্তু উপায় ত কিছু নেই! হুকুম এসেছে, অস্ত্র ছেড়ে

দিতেই হবে। ছেলেকে ডেকে সেই রকম হুকুম দিলেন। ছেলে বাপের মুখের পানে সোজা তাকিয়ে বললে, "বাবা! যদি আমরা আমাদের হাতিয়ার না ছেড়ে দিই!" বাবা মাথা হেঁট করে উত্তর দিলেন, "না ছেড়ে দিই, ত জেলে যেতে হবে। বুড়ো বয়সে তা পারব না। ওসব পাগলামি বুদ্ধি ছাড়।" ছেলে গুম খেয়ে গেল। কোন কথাই বললে না। কিন্তু তার পর কয়েক দিন ধরে নিজের বিশ্বস্ত বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কি পরামর্শ আঁটিতে লাগল। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোরের বেলায় হঠাৎ বাপকে ধরে এক ঘরে বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিলে। সেপাই বরকন্দাজদের হুকুম দিলে, "ফটক বন্ধ করে দাও। কেউ এলে আমাকে খবর দিও।" যখন সরকারের প্রতিনিধি দ্বারে এসে উপস্থিত হল, সে কেল্লার দেওয়ালের মাথার উপর থেকে হেঁকে বললে, "সাহেব আপনি চলে যান। আমরা হাতিয়ার দেব না।" সাহেব উত্তর দিলেন, "তোমাকে আমি চিনি না। দেশাই সাহেবকে খবর দাও।" তরুণ দেশাই বললে, "আমিই এখন দেশাই। আমার বাবাকে আমি কয়েদ করে রেখেছি।" তখন কর্ম্মচারী বললেন, "তোমাকে আমি দেশাই বলে মানি না। তুমি ডাকু। আমি হাতিয়ার নিতে এসেছি, জোর করে নিয়ে যাব।" "বেশ! এস।" বলে দেশাই নেমে গেলেন। ফটক-গোড়ায় দুই দলে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হল। সরকারী লোক সংখ্যায় খুব কম ছিল, হেরে গেল। সেনানী মারা গেলেন। দুচার দিনে জঙ্গী পলটন এসে পৌছল। পাগলা কেল্লা রাখতে পারলে না, কিন্তু হাতিয়ার হাতেই মল, যোদ্ধার শেষ অপমান তাকে সহ্য করতে হল না। পোবাড়ার গল্পটা ছিল এই। খুব দরদ দিয়ে লোকটা গেয়েছিল। একদিন এই সব যোদ্ধা জাতের বড় আঁতে ঘা দিয়েছিল অস্ত্র আইন। তারা সেকেলে লোক, license পরোয়ানার কথা বুঝত না। ভাবলে, আর কখন অস্ত্র ধরতে পাব না, মান ইজ্জৎ সব গেল! উত্তর ভারতে সেই সময় একটা গান লোকে গাইত তার মাত্র দুই ছত্র মনে আছে,

শাহান শাহকা হুকুম অব তলোয়ার ন বাঁধো,
সব চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরৎ বনো, রে ভাই,
চুড়ীয়াঁ পহেনো আওর আউরৎ বনো।

Mediaeval mentality! আমরা তলোয়ার না বেঁধেও কত সুখে আছি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

রোহিণীর প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে। রোহিণীর চরিত্রকে উপলক্ষ ক'রে বঙ্কিম যে সমস্যার অবতারণা ক'রেছিলেন, সমাজ-ব্যবস্থায় আজও তা অব্যাহত র'য়েছে—কিন্তু বঙ্কিম যে ভাবে এর সমাধান ক'রেছিলেন, তা ইতিমধ্যেই প্রায় ঐতিহাসিক হ'য়ে গেছে। কিন্তু কেন?

রোহিণীকে যে ভাবে চিত্রিত করা হ'য়েছে তাতে তার ওপর আমরা আদৌ রুষ্ট হ'তে পারি না—বরং তার সম্পর্কে বঙ্কিমের অন্যায়াচারণই আমাদেরকে সমধিক পীড়া দেয়। রোহিণী বাল-বিধবা—নারী-জীবনের যে মুহূর্ত্তটিকে বলা হ'য়ে থাকে বিশেষ মুহূর্ত্ত, সেই বয়সে আমাদের সমাজ জোর ক'রে তার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল পবিত্রতার লেবেল। কিন্তু রোহিণীর চিত্তে এর বিরুদ্ধে ছিল একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ —অসৎ চরিত্র হরলাল তাহাকে বিবাহ করার প্রলোভন দেখিয়ে এই বীজাকার বিদ্রোহকে অংশতঃ অঙ্কুরিত ক'রে তুলেছিল—এরই ফলে রোহিণীর উইল-চুরি। উইলের জন্যেই রোহিণী উইল চুরি করে নি—রোহিণীকে লেখক ততটা খেলো ক'রে আঁকেন নি—সে ক'রেছিল হরলালের জন্যে! তার পর ধরাপড়া ও প্রকাশ্যভাবে অপমান। এই অপমান রোহিণীর জীবনের তত বড় ট্র্যাজেডি নয়, যত বড় ট্র্যাজেডি হরলালের প্রত্যাখ্যান।

তারপর রোহিণীর অবস্থা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়—বন্ধন-মুক্ত বুভুক্ষা তাকে উন্মাদ ক'রলো। এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে তার চোখে পড়ল গোবিন্দলাল—তাকে রোহিণী চাইলো আত্মসাৎ ক'রে নিতে। কিন্তু গোবিন্দলাল ছিল ভ্রমরের আত্মহীন একনিষ্ঠ ভালোবাসায় কেন্দ্রবদ্ধ—কাজেই রোহিণীর সামনে একমাত্র পথ আত্ম-হত্যার। সেই বাঁকাপথে রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের মুখোমুখি দেখা—তার পরিণাম গোবিন্দলালের মানসিক কেন্দ্রচ্যুতি।

ভ্রমর ছিল আবেগ-সর্ব্বস্ব। রূপ তার ছিল না—যেটা ছিল তা গোবিন্দলালের চাক্ষুষ মোহ। রোহিণীর অনিন্দ্য রূপ তাই গোবিন্দলালের রক্তে চাঞ্চল্য আন্‌লো —গোবিন্দলালের জীবনেও জাগলো বিদ্রোহ! ভ্রমর এই বিক্ষোভের মুখে অপটু কাণ্ডারীর মত হাল ছেড়ে দিলে—অভিমান ক'রে সে গেলো বাপের বাড়ী চ'লে— গোবিন্দলাল গেলো রোহিণীর আয়ত্তে!

রোহিণীর জীবনের ট্র্যাজেডি ন্যায্যতঃ এখানেই শেষ হবার কথা। যে নিষ্ফল দুরাশা রোহিণীকে তার সুপরিচিত আবেষ্টনীর ভেতর থেকে নিয়ে এলো দুর্গমের দিকে—তাই যখন অপ্রত্যাশিতভাবে হ'ল সার্থক, তখন রোহিণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সুরু হ'ল না—কাজেই ভ্রমর বা গোবিন্দলালের জীবনে যে অনিবার্য্য পরিণতি দেখা দেবার কথা, তাও হ'য়ে রইলো সুদূরপরাহত। রোহিণী প্রসাদপুরের কুঠীতে বিলাসিনী হ'য়ে রইল...ভ্রমর বাপের বাড়ীর নিভৃত কক্ষে আশাহতা প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা হ'য়ে রইলো আর গোবিন্দলাল হ'য়ে দাঁড়ালো উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী।

কিন্তু এই মহা সঙ্কটের চড়াই উৎরাবার পথে যে বিরাট অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হবার কথা, বঙ্কিম তাকে অতি সহজেই মীমাংসা ক'রে ফেললেন। রোহিণীর চোখে সহসা এনে ফেল্‌লেন নিশাকরকে...ফলে গোবিন্দলাল তাকে গুলি ক'র্‌লো। তার পর অনুতপ্ত পলাতক অধঃপতিত গোবিন্দলালকে এনে ফেল্‌লেন জ্যোৎস্নালোকিত অতি নাটকীয় সমারোহমণ্ডিত ভ্রমরের মৃত্যুশয্যার পাশে। এর পর তার সন্ন্যাস।

অর্থাৎ রোহিণী যদি এই আখ্যানের কেন্দ্রশক্তি হয়, ত তাকে আশ্রয় ক'রে ভ্রমর ও গোবিন্দলালের জীবন যে দুর্য্যোগময় আবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে অখণ্ড পরিণতিতে পৌঁছুবার কথা, লেখক হয় তা আন্দাজ ক'র্‌তে পারেন নি, নয় তা ইচ্ছা ক'রে প্রতিরোধ করেছেন। ফলতঃ একদিকে রূপ ও আর একদিকে হৃদয়াবেগ...এই দুইয়ের বিপুল আকর্ষণের ভেতর গোবিন্দলালের নির্ভরশীল মন যে পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হবার কথা তা না হওয়ায় তার চরিত্রে সম্ভাব্যতা স্ফূর্ত্ত হয় নি। সে যেন গল্পের প্রয়োজনে যোগান দিয়ে চলেছে—তার প্রয়োজনে গল্প এগুচ্ছে না।

ভ্রমরকে অবশ্য লেখক অনেকটা কাগজের ফুল ক'রেই এঁকেছেন, কাজেই তার জীবনে দ্বন্দ্বের অভাবকে আমরা হিসাবের মধ্যেই ধরি না। স্বামীর অপরিমিত ভালবাসা যেদিন তার কাছে সন্দেহের বিষে নীল হ'য়ে উঠলো, সেদিন সে কাঁদলো···সে অভিমান ক'রলো···সে বিদ্রোহের অভিনয় করলো, কিন্তু সত্যিকার বিদ্রোহ ক'রতে পারলো না···কারণ তার আত্মায় ছিল না বিদ্রোহের পুঁজি···বস্তুতঃ কোন পুঁজিই ছিল না তার। গতানুগতিক ধারায় গোবিন্দলাল তাকে অবলম্বন ক'রেছিল—এই অবলম্বন সাগ্রহ আশ্রয়-গ্রহণ নয়···কারণ গোবিন্দলালের রুচি পরস্পর-বিরোধী আকর্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ছিল না···যেই সেই পরীক্ষা এলো, গোবিন্দলাল যেন ইচ্ছা ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়ল···ভ্রমর তাকে

রুখতে পারলো না, চেষ্টা ক'রলো না, বরং পরোক্ষ ভাবে সমর্থনই ক'রলো। কারণ ভ্রমর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজকে নিষ্প্রভ বুঝলো, সুতরাং অক্ষমের অস্ত্র অভিমান, সে তারই শরণাপন্ন হ'ল। অতএব শেষকালে ভ্রমরের সতীত্ব-মাহাত্ম্য ফোটানোর জন্যে বঙ্কিমকে অত বেশী প্রয়াস ক'রতে হ'ল···আর গোবিন্দলালকে গৈরিক পরানো ছাড়া উপায়ান্তর রইলো না। অর্থাৎ ভ্রমর বা গোবিন্দলাল কারুর মধ্যে বঙ্কিম সত্যিকার মানবত্ব আরোপ ক'রতে পারলেন না···। গোবিন্দ-লালের সামনে দুটো রাস্তা ছিল—হয় গ্রহণ নয় বর্জ্জন; ভ্রমরেরও তাই—হয় পোষণ নয় বিদ্রোহ। কিন্তু এরা ন যযৌ ন তস্থৌ হ'য়ে রইলো···এবং একে ম'রে, অপরে ফেরার হ'য়ে অব্যাহতি পেলো।

কিন্তু রোহিণী? তার দিক থেকে প্রতিক্রিয়া সুরু হওয়া স্বাভাবিক ছিল গোবিন্দলালের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধিতে···নিজের আদর্শের বিলুপ্তি ও বাস্তবের ব্যর্থতায় তার ট্র্যাজেডি···কিন্তু বঙ্কিম সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রেখেছেন রোহিণীর প্রতি যাতে কারুর সহানুভূতি না জাগে···কারণ সে ভ্রষ্টা! অতএব হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব এই প্রাচীন প্রবচনানুযায়ী সে উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়ানুগামী হ'ল এবং অপমৃত্যুতেই তার সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হ'ল। বঙ্কিমের মতে এই হল poetic justice এবং এই উপন্যাসে বঙ্কিম যে মোটা কথাটা ব'লতে চাইলেন, তা হ'ল এই যে ইন্দ্রিয়াসক্তি অত্যন্ত মন্দ জিনিষ···বিধবার পদ-স্খলন অতি ভয়াবহ···অতএব সাবধান।

বলাবাহুল্য তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়···শুধু আর্ট হিসাবে তাঁর এই সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত বইখানাও যে অসার্থক এইটুকু দেখানোর জন্যেই এই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

এর থেকে মোটের ওপর আমি যা প্রতিপন্ন ক'রতে চাইছি তা হচ্ছে এই যে বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পী অপেক্ষা সংস্কারকের প্রাবল্য ছিল বেশী। তাঁর শিল্পী-মন যে সমস্ত চরিত্রকে তাঁর আখ্যানের অঙ্গরূপে কল্পনা করত, তাঁর সংস্কারক মন তাদেরকে নিজের পথে হাঁটতে না দিয়ে আপন আদর্শের পথে হাঁটাত—তাই তাদের মধ্যে আসে নি ব্যক্তিত্ব, এসেছে লৌকিকতার অন্ধ অনুবৃত্তি। মানুষ তাই বঙ্কিমের হাতে যন্ত্রবদ্ধ···তার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি তাই নৈর্ব্যক্তিক আচারের দ্বারা প্রতিহত, শিক্ষক বঙ্কিম তাই শিল্পী বঙ্কিমকে প্রতিমুহূর্ত্তে পরাভূত ক'রে চ'লেছেন।

আমরা দেখেছি প্রতাপ-শৈবলিনীর একনিষ্ঠ ভালবাসার মধ্যেও বঙ্কিম একই অবাঞ্ছিত উপায়ে চন্দ্রশেখরকে এনে ফেলেছেন···একদিকে সহস্র প্রলোভনময় মুহূর্ত্তেও প্রতাপকে অবিচলিত রেখে তাকে 'দধীচির গৌরব' দিতে উদ্যত হয়েছেন··· অন্যদিকে সাময়িক চিত্তবিক্ষোভ শৈবলিনীকে আশ্রয় করায় তাকে নরক দর্শন না করিয়ে বঙ্কিমের Nemesis-প্রীতি নিরস্ত হয়নি···এসবের মূলেও ঐ একই রকম আদর্শবাদ—মানুষকে মানুষরূপে না দেখে তাকে কতকগুলি আদর্শের বাহন ক'রে দেখা। বস্তুতঃ দেশাচারের অকুণ্ঠ অনুবর্ত্তনের খাতিরে শিল্পকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করার ইচ্ছা বঙ্কিমের কেন হয়েছিল, কোথায় তার মূল—সে কথা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য।

যে যুগে বঙ্কিমের আবির্ভাব, সেটা জাতীয় জীবনের পক্ষে একটা ওলট-পালটের যুগ·· ইংরাজাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় আদর্শ দেশে এসেছিল ; দেশীয় আদর্শ তখন বহু বিক্ষোভে বিপর্য্যস্ত, ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জের সেই নিরবলম্ব শূন্যতাকে পরিহার ক'রে দেশ তখন ঝাঁপিয়ে পড়্ছিল বিদেশীয় আদর্শের কঠিন মৃত্তিকার দিকে। ফল যা হবার তাই হ'য়েছিল—নকল সাহেবিয়ানা সাময়িকভাবে দেশকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল—আচারে ব্যবহারে, কথায় কাজে, চিন্তায় চেষ্টায় বাঙালী তখন উঠে প'ড়ে লেগেছিল সাহেব হ'তে—অর্থাৎ অতীতের ধ্বংসাবশেষকে ধূলিসাৎ ক'রে ভবিষ্যতের সৌধকে গড়ে তুলতে। কিন্তু সেটা যে শূন্যে সৌধ-নির্ম্মাণ তা বঙ্কিমই স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করেন এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাও প্রধানতঃ এইখানে। তিনি বুঝলেন একান্তভাবে বিদেশীয় অনুকরণে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মারা যাবে, তার শিক্ষা সংস্কৃতির স্বকীয়তা লুপ্ত হবে···সুতরাং কিসে জাতিকে বড় ক'রে তোলা যায় এই হ'ল তাঁর লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যে বদ্ধদৃষ্টি হ'য়েই তিনি জাতীয় ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত ক'রতে লাগলেন—আদর্শকে মহান ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, তীব্র ক'রে ফোটাতে লাগলেন—ক্ষুদ্র দুঃখ-দৈন্য বেদনাকে অগ্রাহ্য ক'রে বৃহৎ কল্যাণের দিকে চোখ রেখে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রচারের কাজে লাগলেন। কিন্তু বর্ণহীন নীরস প্রচার-কার্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে না, এটা বোঝার মত দূরদর্শিতা তাঁর ছিল ; তাই তিনি উপন্যাসের আশ্রয় নিলেন। বাংলায় তখন উপন্যাস ছিল না—সীতার বনবাস, কাদম্বরী, টেলিমেকস্ জাতীয় উপকথা ছিল, আর ছিল বাবুবিলাস, আলালের ঘরের দুলাল

জাতীয় খেলো স্যাটায়ার···তাই তিনি দেশে কোন ঐতিহ্যের আশ্রয় পেলেন না, তা'কে ধার ক'রতে হ'ল বিদেশের কাছে। আদর্শস্বরূপ তিনি বেছে নিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কটকে···যদিও ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট তিনি পড়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। নানাদিক থেকেই স্কট তাঁর ওপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার ক'রলেন··· তাঁরই আদর্শে বঙ্কিম ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে সূচনা করলেন। শৌর্য্য, মহত্ত্ব, ত্যাগ, তিতিক্ষা প্রভৃতি মহৎগুণের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি যাদের গ'ড়ে তুললেন, তারা আসলে রাংতামোড়া মাটির পুতুল হ'লেও তৎকালে তাদের উপযোগিতা কম ছিল না। দেশাত্মবোধ নামক পদার্থকে প্রাত্যহিক চিন্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কাজে তারা প্রচুর সহায়তা ক'রলো—আর ক'রলো পূর্ব্বকথিত উপকথা ও স্যাটায়ার দুইয়ের মাঝখানে একটা সংযোগ স্থাপনে। অর্থাৎ উপন্যাস সাহিত্যের কাঠামোটা গড়ার কাজ বঙ্কিম একাই প্রায় শেষ করে গেলেন।

বঙ্কিমের দেশাত্মবোধ বাঙালীর সংস্কৃতির পক্ষে অতি বৃহৎ দান সন্দেহ নাই, যদিও তা ত্রুটি-হীন নয়। যে সন্তানদল হরেমুরারে ব'লতে ব'লতে নিরীহ কোম্পানীর সিপাই মারে, আবার বন্দেমাতরম বলতে বলতে কাঁদে, তাদের আমরা কোনদিন প্রত্যক্ষ জগতে দেখবো আশা করি না··যে দেবীরাণী সহস্র সহস্র ডাকাতের ওপর সর্দ্দারি ক'রে জলে স্থলে তুমুল হট্টগোল ক'রে বেড়ায়, তাকে পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে দেখলে নিশ্চয় আমরা আঁৎকে উঠবো। অবশ্য এই নিষ্কাম কর্ম্মবাদের জন্য বঙ্কিম স্কটের কাছে ঋণী নন—দেশীয় কৃষ্টিও তাঁকে এ বিষয়ে বড় বেশী সাহায্য করে নি। এর পেছনে ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষা—রিচার্ডসন, ডিরোজিওর প্রভাব! মিল-বেন্থাম, রুসো-ভল্‌টেয়ার, কোঁৎ—উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির এই ত্রি-ধারার মিশ্রণে তিনি যে একটা যৌগিক আদর্শ গ'ড়ে তুলেছিলেন, সেই রসায়নের সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে গীতা মিশিয়ে তিনি দেশীয় ইতিহাসকে বাঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' 'ধর্ম্মতত্ত্ব' এই চেষ্টার স্থূল রূপ, আর আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী এর প্রচ্ছন্ন রূপ—বস্তুতঃ ও দুইই এক জিনিষ—লক্ষ্য দুয়েরই জাতিকে মানুষ ক'রে তোলা, রস-পরিবেশন করা নয়। প্রয়োগের দিক থেকে এ ব্যবস্থা বেশ সময়োপযোগী হ'য়েছিল, ভবিষ্যৎ সাহিত্যের দিক থেকেও।

সীতারাম শ্রেণীর Despotদেরকেও রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত ক'রে বঙ্কিম এই কথা

বলতে চেয়েছেন যে জাতীয়তার সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য। সেই স্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাস-গন্ধী এই সব চরিত্র এবং এদের বিপরীত-পন্থী নিষ্কামধর্ম্মী সন্ন্যাসীরা বঙ্কিমের কল্পনায় প্রাধান্য লাভ ক'রেছিল। এ দুয়ের সমবায়ে তিনি চেয়েছিলেন জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন ক'রতে। বস্তুতঃ সত্যিকার দেশ-প্রেমিক বা সত্যিকার সন্ন্যাসী প্রত্যক্ষ জীবনেই পাওয়া যায়—কিন্তু বঙ্কিম তাদের সংগ্রহ ক'রেছিলেন কল্পনা থেকে—তাই তারা শুধু আদর্শ হয়েছে, মানুষ হয় নি। বলা বাহুল্য বঙ্কিম সাহিত্য মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক ব'লেই এ সব কথা ব'লছিনে—এখন নিঃসংশায়িতরূপে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে এলিজাবেথীয় নাট্য-সাহিত্য ছিল মোটের উপর উদ্দেশ্য-মূলক। হিউগো থেকে আরম্ভ ক'রে গোর্কি হাম্‌সুন্‌, আপ্টন সিন্‌ক্লেয়ার পর্য্যন্ত সেরা ঔপন্যাসিক সবাই উদ্দেশ্যকে সাহিত্যে রীতিমতো প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে উদ্দেশ্য বা সমস্যা সাহিত্যে থাকে জীবদেহে কঙ্কালের মতো। বিশ্লেষণের সাহায্যে তাদের খুঁজে বের ক'রতে হয়—কিন্তু যে সব স্থলে এই কঙ্কালগুলো তাদের বিকট প্রত্যক্ষ সত্তা নিয়েই উপস্থিত থাকে, সে সব সৃষ্টি যে ব্যর্থ তা না ব'লে উপায় কি? অর্থাৎ সোজা ক'রে ব'ললে এই ব'লতে হয় যে সন্ন্যাসই হ'ক্‌, দেশাত্মবোধই হ'ক্‌, কোনটাতেই বঙ্কিমের আত্মার যোগ ছিল না; তাই এরা কেউ তাঁর সাহিত্যের অঙ্গীকৃত হ'য়ে যায় নি।

আর সত্যিকার আদর্শের দিক থেকে দেখলেও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দেশাত্মবোধ বা প্রবৃত্তি-নিরপেক্ষ সন্ন্যাসকে অবাস্তব ব'লেই মনে করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা আগেই ব'লেছি যে বঙ্কিমী সাহিত্যের উৎস হচ্ছে Ethics, Æsthetics নয়—কাজেই তিনি অবিমিশ্রতাকে অস্বীকার করতে পারেননি—তাই তাঁর সাহিত্যে দারিদ্র্যের বিন্দুমাত্র আভাস নেই, বরং সে সম্বন্ধে বক্রোক্তির আতিশয্য আছে; প্রবৃত্তির সঙ্ঘাতে মানুষের রক্তাক্ত বাস্তবতা নেই, আছে অলৌকিক উৎকর্ষের মাহাত্ম্য! এ জন্যে যুগ-ধর্ম্ম কিছুটা দায়ী সন্দেহ নেই—কিন্তু লেখকের চিত্ত-ধর্ম্ম কি আদৌ দায়ী নয়? বস্তুত ডিকেন্স, বা থ্যাকারে তাঁর মনে অণুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি কেন? সাহিত্যের ভোজে তিনি আসল মানুষকে অনাচরণীয় ব'লে মনে করতেন বলেই কি এমনটি হয় নি? কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসে খানিকটা কাহিনী সৃষ্টির অবকাশ আছে। সামাজিক উপন্যাসে এ টেক্‌নিক অচল। রাষ্ট্রের ব্যাপক

ক্ষেত্র থেকে গৃহের সংক্ষিপ্ত গণ্ডীতে এসেও বঙ্কিম তাঁর দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারেন নি—তাই তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখি তাঁর হৃদয় যে দিকে যেতে চাইছে, তাঁর সংস্কৃতি তার উল্টো দিকে যেতে চাইছে। তাই মনোরমা-পশুপতি সমস্যা ও গোবিন্দলাল-রোহিণী সমস্যার মধ্যে মূলতঃ আমরা কোন বিরোধ দেখি না।

বলা বাহুল্য আমরা বিংশ শতাব্দীর বস্তুতন্ত্র বা প্রজ্ঞাবাদকে বঙ্কিম সাহিত্যের ভেতর থেকে খুঁজে বের ক'রতে উদ্যত হই নি—তাহ'লে ডিকেন্স, থ্যাকারেরই বা নাম ক'রবো কেন? আমরা ব'লছিলাম সাহিত্যের সার্থকতা জীবনের দিক থেকেই—সে জীবন, নিরন্ন দরিদ্রেরই হ'ক্, আর বিলাস-লালিত অভিজাত-বর্গেরই হক্ এই নিয়েই উপন্যাস। মতবাদ তার ভিতর অজস্র থাক্‌তে পারে, বর্ণনা-বিশ্লেষণের প্রচুর অবকাশ থাকতে পারে—তবু তার ভেতর সত্যিকার জীবন থাকা চাই—যে জীবন ঘটনার আবর্ত্তে চঞ্চল, বিরোধের আঘাতে ক্রিয়াশীল, সম্ভাব্যতার স্পর্শে জীবন্ত! টেক্‌নিক্ নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত লড়াইই হ'ক্, উপন্যাসের প্রাণ-বস্তু সম্বন্ধে এটুকু কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই মাপকাঠি নিয়ে বঙ্কিম সাহিত্য বিশ্লেষণ ক'রলেই আমরা বঙ্কিমের দৃষ্টির ভেতর সমগ্রতার অভাব দেখতে পাই, যার ফলে জীবনকে তিনি সত্যের দিক থেকে দেখতে পারেন নি, সত্যকে দেখেছিলেন জীবনের দিক থেকে—তাই জীবন তাঁর সাহিত্যে হয়েছে গৌণ গোছের, সত্যই হয়েছে মুখ্য! এর ফলে তাঁর সাহিত্য প্রায়শঃ শিল্প হতে পারে নি।

কিন্তু এখানে বলা দরকার যে এই প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমের অগৌরব ঘোষণা করতে উদ্যত হই নি। রসের দিক থেকে বিচার ক'রলে এক যুগের সাহিত্য আরেক যুগের প্রসন্নদৃষ্টি থেকে অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিত হ'য়েই থাকে। কিন্তু তাই বলে জীবনের উপর তার প্রভাব কে অস্বীকার করবে? জাতীয় সংস্কৃতিকে গ'ড়ে তুলে, মানুষের দৃষ্টি ও চিত্তবৃত্তিকে বৃহত্তর সম্ভাবনার নির্দ্দেশ দিয়ে, সে যুগের সাহিত্য তার কাজ শেষ ক'রে গেছে—আজকের সাহিত্য যে সুযোগ ও অনুকূল আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হ'তে পেরেছে, সে যুগের সাহিত্য তা পারে নি—কিন্তু সেই বনিয়াদের ওপরই যে এযুগের সাহিত্যের ইমারত সংস্থিত, এ কথা মেনে না নিয়ে উপায় কি? বিশেষ ক'রে আমাদের মনে রাখতে হবে বিগত শতাব্দী

বলতে আমাদের দেশে বুঝায় একা বঙ্কিমকেই—যিনি বনিয়াদই স্থাপন করেন নি, একটা চলনসই গৃহও গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাই আর্টের দিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাস সম্বন্ধে আমরা যে অভিমতই আজ পোষণ করি না কেন, কৃষ্টির দিক থেকে আমরা বঙ্কিমকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে বাধ্য।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আবর্ত্ত

উপক্রমণিকা

হরিদ্বারের আশ্রমে এসেই খগেন বাবুর জ্বর রীতিমত ফুটল। লছমন ঝোলা থেকে ফেরবার পথে একজন বাঙ্গালী সাধুর প্রতিষ্ঠিত আতুরালয়ে আধ আউন্স অ্যামন কুইনিন গলাধঃকরণ করে সামলে যান, কিন্তু তার পর মোটর ব্যাসের ঝাঁকানি এবং যাত্রীদের কণ্ঠের কোলাহল ও গায়ের দুর্গন্ধে তিনি রীতিমত কাতর হয়ে পড়েন। টলতে টলতে আশ্রমে পৌঁছেই শয্যা নিলেন। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা আর হাড়ভাঙ্গা কাঁপুনি নিয়ে জ্বর বাড়ল—বর্ষা শেষের বাংলা জ্বর পাহাড়তলীতে বায়ুপরিবর্ত্তনে এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে, লোকালয় তার চিরপরিচিত, ভাদ্র মাসের পচা গরম, জলীয় বাষ্পের সঙ্গে উত্তাপ মেশানো, মশকের দল সোনার বাংলার মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে উত্তেজিত এবং গলদঘর্ম্ম হয়ে উঠেছে। পাহাড়ী হাওয়ায় জ্বরের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে এইটুকুই যা পার্থক্য।

একজন অবসর-প্রাপ্ত ডাক্তার আশ্রমের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। অ্যালোপাথি কেন সব ওষুধেই তিনি বীতশ্রদ্ধ। গরম জলে একটা আস্ত লেবুর রস গুলে খাবার পর ভুটিয়া কম্বলে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শোবার ব্যবস্থা দিলেন। পাহাড়ে জ্বর বেশী দিন থাকেনা শুনেও খগেন বাবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। ডাক্তার বাবু চলে যাবার পর খগেন বাবু ব্রহ্মচারীকে ডেকে ইংরেজীতে বল্লেন, দেরাদূনের সিভিল সার্জ্জেনকে এখনই তার কর, মোটরে চলে আসবে। বিজ্ঞানে অবিশ্বাসী ডাক্তার বৃদ্ধা অসতী গৃহিণীর মতন। যার পয়সায় এতদিন ভরণপোষণ হোলো তার প্রতি একটা কর্ত্তব্য থাকাটাই কর্ত্তব্য। যে স্বামীর পয়সায় খায়নি, পরেনি, তার কথা স্বতন্ত্র। যখন চাকরী করতেন তখন কি কর্ম্মকর্ত্তা এঁর ন্যাচুরা-প্যাথী বরদাস্ত করত? কখনই না। তার চেয়ে সিভিল সার্জ্জেনের চিকিৎসা ভাল। রোগীর উত্তেজনা দেখে ব্রহ্মচারী মাথায় ভিজে কাপড়ের টুকরো রাখল। 'ও-ডি-কোলন এক শিশি আনান, বাজারে পাওয়া যাবে না? জলটল বাজে জিনিষ, একটি মাত্র গুণ তার বীজাণু বহন করা, টাইফয়েড, কলেরা, আরো কত কি'র। আপনাদের বিশুদ্ধ গঙ্গাজলের অদ্ভুত গুণাবলী আমি মানিনা। তার চেয়ে কলের

জলই ভাল, আরো ভাল ও-ডি-কলোন। যার যাতে উপকার হয় সে নিজে বোঝে, ডাক্তারে বোঝে না, সন্ন্যাসীও বোঝে না। 'আদিম প্রকৃতি' মিথ্যা কথা, অর্জ্জিত অভ্যাসটাই প্রকৃতি, নচেৎ আপনি ব্রহ্মচারী কেন? বিয়ে থা' করে ঘরকন্না করবেন কোথায়, আর এ সব কি! রোগীর সেবা, সকালে বিকালে পূজো আচ্ছা, সব ধাতে বসে? 'ধুত্তোর' বলতে ইচ্ছে হয় না! সভ্যতাটা প্রায় দশ হাজার বছরের, সেটাই প্রাথমিক—তারই তৈরী ডাক্তারী, তারই সৃষ্টি সমাজ, সমাজেরই দশকর্ম্ম-বিধান, সমাজ রক্ষার জন্যই বিবাহ। হয় বিবাহ, না হয় মাত্র একত্র বসবাস—তাও, তাও পৃথক হওয়ার চেয়ে সমাজের পক্ষে হিতকর। ডাকুন আপনাদের মহারাজকে।'

ব্রহ্মচারী খগেন বাবুকে শান্ত করবার চেষ্টায় বিফল হয়ে আশ্রম-কর্ত্তাকে ডেকে আনলেন। তাঁর আগমনে রোগীর উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল, খাড়া হয়ে বিছানায় বসে খগেন বাবু বলতে লাগলেন, "অনুগ্রহ করে 'বৎস' বলে ডাকবেন না, বাছুরের কথা মনে হয়, ভ্যা ভ্যা করে ডাকছি যেন! শুনুন, গোটাকয়েক সাফ্ কথা। জীবনের এ কটা দিন নষ্ট করেছি, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে, টাকা উড়ে গিয়েছে তাতে দুঃখ নেই, আপশোষ এই যে নিজেকে ঠকিয়েছি। বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করি, কারণ বিজ্ঞান পরকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ধাতে বসাতে প্রথমে পারিনি, এখনও ভয় পাই, তবু নাস্তি গতিরন্যথা ভেবে সাধনা করতে হবে—তুক্‌তাকে চলবে না। আপনারা সব তুক-তাক ও তাবিজের কারবারী। আপনাদের কাজই হোল সীজোফ্রেনয়েড সৃষ্টি করা, বিশ্বাসীদের মনের খোরাক যোগান। কিন্তু আমি ছাড়া আর একজন রয়েছে যে! তার দাবী মেটাবেন কি করে?'

মহারাজের মুখে হাঁসি ফুটে উঠল—'কে সে? তিনিও না হয় আশ্রমবাসী হোন।'

'একজন কেন, দশজনও হতে পারেন। একজন নয়, দশজনও নয়, আমি ও আমরা ছাড়া বাইরের প্রত্যেকে, যারা ধাতুগত আশ্রমবাসী নয়; তাদের আশ্রমে ঢোকাবেন? আশ্রমে আর সংসারে তফাৎ রইল কোথায়?'

'আশ্রম হল আদর্শ সংসার।'

'তাই বটে! আপনাদের জমিদারীর আয় কত এ বৎসরে! অন্ততঃ বিশ হাজার টাকা, তা ছাড়া খুচরো চাঁদাও আছে। সেই চাঁদা ফেরৎ চাই না—তবে অনুগ্রহ

করে সিভিল সার্জ্জনকে ডাকুন, আমিই-তাঁর টাকা দেব, তার পর সেরে উঠে চলে য়াব, আর আসব না। ভুটিয়া কম্বলে হিমালয়-ভ্রমণ চলে, এখানে চাই ক্যামেলহেয়ারের কম্বল। নিয়ে যান, কাউকে দিয়ে দিন। নিজেকে পরের থেকে গুটিয়ে রাখতে পারি না আর আলগোছে জীবনযাত্রা নিতান্ত কৃত্রিম। আমার নতুন অধ্যায় স্থরু হোল।'

সকালে জ্বরের বহর দেখে সিভিল সার্জ্জনকে ডাকতে হোল। ডাক্তার সাহেব চলে যাবার পর খগেন বাবু ব্রহ্মচারীকে বল্লেন যে তিনি ব্রোমাইড খাবেন না কিছুতেই, অতএব প্রেস্‌ক্রিপশন মত ওষুধ আনা যেন না হয়, তাঁর মস্তিষ্কের বিকার হয় নি, দেহের ওপর প্রভুত্ব তাঁর হয়ত চলে গিয়েছে, কিন্তু মাথা তাঁর নিজের—'ছাখ, ব্রহ্মচারী, তোমার ডাকনাম কি? তোমার মা তোমাকে কি বলে ডাকতেন? তোমার দাদা-দিদিরা? ভুলু…ছাখ ভুলু, সব বিশ্বাস খোয়ালেও নিজের মাথার ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না, মারা পড়বে।'

'একজন না একজনের ওপর আস্থা রাখতেই হয়, আপনার বিজ্ঞান, ডাক্তার, আমাদের গুরু, গুরুই ব্রহ্ম।'

'ভুলু, আমি বিজ্ঞানও মানি না, সব সমান করে দেয়, তবে তোমাদের মন্তরের চেয়ে ভাল। আমি ব্রোমাইড খাবনা…সাপের মাথায় লাঠি পড়ল কিন্তু মরল না, ডিউক অব মনমাথের গলায় কটা চোপ পড়ে মনে আছে? সে বুঝি অন্য ভদ্রলোক যে বলেছিল দাড়িটা কি দোষ করলে? মাথায় একটু ও-ডি-কোলোন দাও, ইতিহাসের ঘটনাগুলো ঠিক মনে থাকছে না, ভুলে যাচ্ছি কেবল; ন্যাকড়া দিও না, ভারী ঠেকছে…বড় ভারী এই বোঝা, অবান্তরের স্তূপ, প্রয়োজনীয়কে চাপা দেয়, কি চায় মানুষে বুঝতে দেয় না। কত জ্বর হে? নিশ্চয় চার হয়েছে। বড় ভাল লাগছে আমার। ভাল চিম্‌নী কি করে জান? কাঁচা কয়লার ধোঁয়া পর্য্যন্ত হজম করে ফেলে। নতুন চিম্‌নী পারে না, ইটগুলো পুড়ুক, চিম্‌নী গরম হোক, হু হু করে হাওয়া টেনে নেবে, তখন ধোঁয়া যাবে উড়ে, খুব উঁচুতে, ঊর্দ্ধে, তোমাদের ভগবানের কাছে। তিনি থাকেন কৈলাসে, কয়লার ধোঁয়া তাই যায় না, থাকতেন কোলকাতায়, বুঝতেন সব মানুষে পয়সায় অভাবে ভাল চিম্‌নী তৈরী করতে পারে না তাদের রান্নাঘরে! তোমাদের ভগবান গ্রামবাসী, গ্রামে বসে স্থদ কষছেন। রাগ হোলো, ভুলু? কিন্তু সত্য কথা, তিনি সহুরে নন, ভিড় সহ্য করতে পারেন

না, তাই পালান মহাপ্রস্থানে। ধূলো, ঘাম, ধোঁয়া, ভিড় নিয়ে সংসার, তারই প্রয়োজনে তাঁর আবিষ্কার, অস্তিত্ব এবং পরিপূর্ণতা। অথচ আশ্রম করছ তোমরা সহরের দুহাজার মাইল দূরে! যাও ফিরে সব গ্রামে যেখানে পচাপুকুরে পাট পচে, সহরে, যেখানে আস্তাকুঁড়ের খোসা কুড়িয়ে মায়েরা ছেলেদের খাওয়ায়। পূজা করতে হয়ত' সেখানে···এখানে আমি থাকব না।'

'আপনি সুস্থ হলেই দেশে যাবেন।'

'দেশ? দেশ ঠিক আমার নেই, আমি কোলকাতার ভদ্রলোক—আমার আত্মীয় স্বজন বড় বেশী কেউ নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা ব্যস্ত হবেন।'

'তাঁদের টেলিগ্রাম করব?'

'কি হবে!' খগেন বাবু পাশ ফিরে মুড়ি দিয়ে শুলেন। 'ভুলু, অন্য কম্বল আন।' ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছ থেকে দুটি নরম বিলেতী কম্বল এনে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় জ্বর বাড়ল, খগেন বাবু কেবল জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আমার মাথায় কি হোলো? ব্রহ্মচারী লুকিয়ে ব্রোমাইড খাইয়েছিলেন। খানিকটা অঘোরে নিদ্রার পর রাত প্রায় তিনটের সময় খগেন বাবু জেগে উঠলেন। গলা শুকিয়ে গেছে, মাথার দিকের জানলা বন্ধ, উঠে জল খাবার ও জানলা খুলে দেবার ইচ্ছা হোলো; কিন্তু বুকের ওপর হাতটা পাথরের মতন ভারী ঠেকল, গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না, পাও নাড়তে পারলেন না, মাথাটা যেন লোহার ফুটবল, নিতান্ত অলস ও নিষ্কর্ম্মা, বুক যেন ধসে গিয়েছে, নীচে নেমে যাচ্ছেন, গভীর খাতের মধ্যে, পিছল ঢালু, আঁকড়বার জন্য গাছপালার শিকড় পর্য্যন্ত নেই, নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জুল জুল করে চেয়ে থাকা, নিরাসক্ত মমতাহীন আশাশূন্য মতিহীন গতি, প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণে লীন হয়ে গেল বুদ্ধির উত্তুঙ্গ দাম্ভিকতা···নিমজ্জনই জীবন··· জীবনের শেষ···কপালে স্বেদ-বিন্দু ফুটে উঠে কেন? ভয়ে? জ্বর ছাড়বে? বড় তৃষ্ণা পায়, জিব পর্য্যন্ত নড়ে না···বহু উদ্যমে খাত থেকে শব্দ উঠে আসে··· 'শুনছ ভুলু, জল দাও।' ব্রহ্মচারী শুনতে পায় না। ঘুমুক্ বেচারী, জনসেবায় কাতর, আত্মসংযমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, যেন জাপানী থালা-বাগানের বট, উপবাস করান হয়েছে, তলায় নুড়ি আর ফণী-মনসার গাছ···ফুকো কাচ, ফুকো মানুষ, মিথ্যা দ্যুতি, ধার করা আলো, অন্ধকারে মিশে যাক, ঘুমুক, বেচারী ঘুমুক।

সাবিত্রী ঘুমুতো দেহটা গুটিয়ে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ; সঙ্কুচিত হয়েই কাটিয়ে গেল তার ছোট্ট জীবনটুকু, বিছানার এক পাশে রাত্রে, আর গ্রীষ্মকালের দুপুরে মাটি ভিজে গামছায় মুছে ঘরের একটি গোপনতম কোণে, ট্রাঙ্কের আড়ালে, আলমারীর পাশে ; একদিন বলেছিল, ওগো, তুমি টেবিলে বসে পড়, আর আমি টেবিলের তলায় ঘুমুব···কী মধুর লেগেছিল তখন···কিন্তু সেও এক রকম মাথায়-হাঁটা সম্পত্তিজ্ঞান, পরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করেছিল। তবু এক রকম ছিল, রাতে তেষ্টা পেলে জল দিত। কেনই বা আত্মঘাতী হ'ল ? নিশ্চয়ই মনে বুঝেছিল যে রমলাই তার জিনিষ কেড়ে নেবে···কিংবা বুঝেছিল যে তার স্বামী মনে মনে অন্যকে, রমলাকেই চায়···বুঝেছিল ভাষার পিছনকার রক্ত দিয়ে। যখন বিষ খাচ্ছে তখনও কি একবার চুপি চুপি মুখ দিয়ে রক্তের ঝলক বেরোয় নি, একবার চুপি চুপি বলে ওঠেনি যে—না, পারেনি, নিশ্চয়ই পারেনি বোধ হয়, বেচারীর গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, হাত ওঠেনি শিশি তুলতে মুখে, জিব নড়েনি স্বীকার করতে যে তার স্বামী রমলার, তার নয়। স্বীকার করা বড় শক্ত, সত্যকে স্বীকার মানে নবজন্ম, তার মানে পুরাতনের মৃত্যু। কোথায় জন্মেছে আবার কে জানে ? এবার নতুন সত্যে সে যেন জন্মগ্রহণ করে। স্বীকারে বিরোধের অবসান, শান্তি, মিথ্যার মৃত্যু, দ্বিজত্ব লাভ।

রমলা দেবী, না, স্বীকার করা যাক, রমা, রমার মধ্যে পুরুষালী ভাব আছে, সে যা অনুভব করেছে তা মনের কাছে গোপন করে নি, মুখ ফুটে অন্তত নিজের কাছে বলেছে, ডেকেছে বিছানায় শুয়ে 'ওগো এস'—তাই সে সৎ, আচারে সতী, তাই সমাজ তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য, নতুন সমাজ, এই মাখন তোলা বাজারের দুগ্ধপোষ্য সমাজ নয়। রমলা স্বীকার করেছে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে, জেনেছে নিজের ধর্ম্মকে, তাই সে শান্ত, তার ব্যবহার রাজকীয়, ক্লিওপ্যাট্রার মতন 'রয়াল'। সে চাইছে জোর করে, নদীর খাত চায় যেমন ঝরণাকে। জারসোপা জলপ্রপাতের মতন হাজার ফুট নীচে এক ধারায় লাফিয়ে পড়া, ঠোক্কর খেতে খেতে খুঁড়িয়ে চলা নয়, মনে কোন দ্বিধা নেই, সংযমের বালাই নেই, ধর্ম্মের, সংস্কারের শিলাখণ্ড তার পথ রোধ করে না।

তাঁর নিজের মন হরিদ্বারের পরবর্ত্তী জাহ্নবীর মতন, ঢালু জমিতে তার বহতা। গোড়া পর্য্যন্ত প্রায় নৌবাহ্য—ভরা নৌকা, বিদ্যার সংস্কারের ধর্ম্মবুদ্ধির সাধনার চিত্ত-শুদ্ধির বোঝাই করা গাধাবোট। গুণ টেনে ওপরে ওঠান হয়েছে এবার স্রোতের টানে

ভেসে আসছে, গুণ গেল ছিঁড়ে, হালে পানি পায় না, গলা ওঠে শুকিয়ে। হরিদ্বারের গঙ্গার স্রোতে খল খল শব্দ হয়, অ্যানিকাটের জলে স্রোত নেই, শব্দও নেই। তারপর নির্ঝরিণী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হ'ল—তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ নয়, সে প্রতিবাদ করে না, কেবল বলে না, না, না। সেও দ্বিধাশূন্য, কিন্তু আগ্রহহীন। নিরাগ্রহতা মানুষের ধর্ম্ম নয়, নেতিধর্ম্ম জীবনের অপমান। এই স্রোতস্বিনীতে জোয়ার আসে সমুদ্র যখন দম্ভের সহিত আপন রাজ্য বিস্তার করে। রমা কি জোয়ার আনবে? কবে?

মস্তিষ্ক অবশ হয়ে আসছে, আবেশ দেহের অন্য অঙ্গকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে, ওষুধ পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসতে চায়। খগেনবাবু চেঁচিয়ে জল চান। ব্রহ্মচারী উঠে জল দেন, কপালে হাত দিয়ে জ্বরের উত্তাপ দেখেন। জ্বর কমে নি। খগেনবাবুর চিন্তাসূত্র জট পাকিয়ে যায়, অন্তঃস্থলী ওলট পালট হয়, যেন রূপী-বাঁদরী ঘাঘরা পরে কেবলই ডিগবাজি খাচ্ছে।

গা ঘিন্ ঘিন্ করে ওঠে মহারাজের কথাবার্ত্তা শুনে। তিনি বলেছিলেন, 'বৎস, তোমার অবিশ্বাস তেজীয়ানের, তাই এত মূল্যবান, তোমার সত্যবাদিতা আমাকে মুগ্ধ করে, আশ্রমের পক্ষে তোমার সততা অমূল্য, আজ যদি তোমার আদর্শ ভারতবর্ষের আশ্রমে আশ্রমে!…' ভারতবর্ষ=আশ্রমের জ্যামিতিক শ্রেণী; ভারতবাসী=আশ্রমবাসীর ভিড়, আশ্রমের কর্ত্তারা মিলে সোভিয়েটতন্ত্রানুযায়ী এক মহাকর্ত্তা নির্ব্বাচন করলেন, তিঁনিই মহারাজ। সমীকরণটি চমৎকার! শাঁসালো শিষ্যের প্রতি গুরুর বিশেষ কৃপা, তাঁর আপত্তি সততার লক্ষণ, তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারই সৎ! আর খোরপোষী গরীব শিষ্য রোজ রবিবারে ঝাণ্ডা নিয়ে পচা কমলালেবু রংএর আলখাল্লা পরে ভাঙ্গা হারমনিয়মের সঙ্গে 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক'-এর সুরে ছন্দহীন গান গাইতে গাইতে হ্যাণ্ডবিল বিলোতে বিলোতে ভিক্ষা করে বেড়াক, আর পিতৃমাতৃহীন গরীব শিষ্যারা রান্নাঘরে বেলা চারটে পর্য্যন্ত হাঁড়ি ঠেলুক! সুন্দর ব্যবস্থা! খাঁটি ভারতীয় অনুষ্ঠান!

অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে সন্ধ্যাবেলার বক্তৃতা শুনে। হিন্দু দর্শনের সঙ্গে য়ুরোপীয়ান ফিলজফির মূলগত পার্থক্যের ওজস্বিনী বক্তৃতা; আমাদের হোলো আর্ট, ওদের হোলো সায়েন্স, আমাদের অনুভূতি, ওদের বিচার বুদ্ধি, আমাদের আত্মজ্ঞান, ওদের কথার কচকচি, আমাদের আত্মা, ওদের দেহ…মহারাজ, মহারাজ, আমাদের

অধীনতা ওদের আধিপত্য, আমাদের দৌর্ব্বল্য, ওদের বীর্য্য, আমাদের ম্যালেরিয়া, ওদের এভারেষ্ট জয় করবার জন্য প্রতি বৎসরের শোভাযাত্রা।

একটু বেশী উঁচুতে উঠলে মাথা ঘোরে, পেট গুলিয়ে ওঠে বেশী নীচুতে নামলেও তাই, সমুদ্রের লোণা জল ভেতরে যায়। বেশী উঁচু আর বেশী নীচুতে থাকার ফল একই? কোথায় যেন পার্থক্য রয়েছে। কেদারনাথের কাছবরাবর চটিতে শুয়ে একরাত্রে তাঁর কামনা সহস্রাফণা বিশিষ্ট বাসুকীর মতন খিদের চোটে জেগে উঠল—খাদ্য তার যতেক রমণী···বায়ুভুকেরও ব্যাঙ চাই মধ্যে মধ্যে—সংযম গেল টুটে, নগ্ন-বক্ষ তুষারাবৃত চূড়া-যুগলের আভাসে ইঙ্গিতে। কী দুর্নিবার, অথচ কত স্বাভাবিক, সভ্যতার গণ্ডীর বহির্ভূত এই উচ্চ গিরিশ্রেণী অদীক্ষিত মানস প্রকৃতির পক্ষে! চেতনার বিক্ষেপ নেই, জীবনের উত্তাপ নেই, ভিড়ের গন্ধ ও ধূলো নেই, বিক্ষোভের গুরুত্ব নেই এই পার্ব্বত্য শান্তি ও সত্যে, হিমালয়ের নির্ম্মল হাল্‌কা হাওয়ায়। গল্প মনে পড়ে; গল্প না সত্য? একটি য়ুরোপীয়ান মহিলা টাট্টুর পিঠে চড়ে অদৃশ্য হোলো, ল্যাজ ধরে চলেছে পথপ্রদর্শক্, যেন ঈগলপাখী সূর্য্যের আলোয় মিশে যায়,···তারা কোথাও না কোথাও তাঁবু গাড়বে, রাতে মেয়েটির শীত করবে, ঠক ঠক করে কাঁপবে, তখন ঐ শের্পাই হবে মানুষ ও প্রকৃতি এই দুটি আদিমতার যথার্থ সেতু। মনে পড়ে সে রাতের কথা, কিন্তু নিতান্ত বিচ্ছিন্ন ভাবে। সে রাতে রমলাকে প্রয়োজন হয়েছিল। বোধ হয়, রমলারও। তাই হয়, মনের বেতার-বার্ত্তায় মিলন ঘটে। আজ কিন্তু রমলার চেহারা অন্যরূপে ফুটে ওঠে।

লাল ডগ্‌ডগে সাড়িতে ফ্ল্যামিঙ্গো; ময়ূরকণ্ঠিতে মাছরাঙ্গা, নীলকণ্ঠ; নীল সাড়িতে কস্‌মস, কমলা রঙের সাড়িতে পাড় নেই, যেন ভিক্ষুণী; চীনে কালির মোটা পাড়, যেন তারই ভুরু ও তারার রঙে ছোপান; হলদে রঙের পাড় আর শ্বেতশুভ্র জমীনে চলন্ত শিউলী ফুল। বড় ঢ্যাঙা দেখায় স্কার্ফ পরলে, মূর্ত্তিমতি যুক্যালিপ্‌টাস্। এক দিন জর্জ্জেটের ওপর লেস ঝলমলায়, যেন আমলকী ডালের পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়া লেগেছে। চোখের পালকে জলের ছিটে লেগেছে।

রমলা ফুঁপিয়ে কাঁদে সাবিত্রীর ঘরে, তারই চাবি নিয়ে বাক্স গোছাতে বসে—চুড়ি ও চাবির আওয়াজ কানে আসে, ছোট্ট সেতারের তরফের তারে ঝঙ্কারের মতন। রমলা

গলির মোড়ে ডাষ্টবিনের পচাগন্ধ সহ্য করতে না পেরে নাকে কাপড় দিয়ে সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে আসে, সাবিত্রীও তাই নাকে রুমাল দিতে শিখেছিল···।

সাবিত্রী নকল-রমলা, ভেক রাজকুমারী। ভেক না হলে ভিখ মেলে না।

সেদিনকার এক ঘটনা মনে পড়ে। আশ্রমের সামনে মোটর-ব্যস হাজির, হুড়মুড় করে জনকয়েক পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক নেমে সরাসরি মহারাজের ঘরে এসে তাঁকে বল্লে যে তাদের কূলবধূ নিস্তারিণী দেবী পালিয়ে এসে এই আশ্রমে স্থান পেয়েছে, তার একমাত্র কন্যা মা মা করে কেঁদে আকুল, এবং নিস্তারিণী যদি তৎক্ষণাৎ তাদের সঙ্গে বাড়ী না ফেরে, তবে তার স্বামী পুনরায় বিবাহ করবে। নিস্তারিণী দেবী, আশ্রমের ভগিনী চন্দ্রাবলী, একজন পাচিকা।· খগেন বাবু তাঁর ইতিহাস জানতেন না, মহারাজ তাঁকে ডেকে পাঠানোর পর ব্যাপারটা আন্দাজ করলেন। লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী বৌএর মতন এক হাত ঘোমটা টেনে উপস্থিত। মহারাজ তাকে প্রশ্ন করলেন যে সে ভদ্রলোকদের চেনে কি না—উত্তর দিল নীচু গলায় যে সে জানে, তারই দেওর, ননদাইরা।

'তুমি যেতে চাও ফিরে?'

ভগিনী চন্দ্রাবলী মহারাজের চোখের দিকে চাইল··মহারাজের দৃষ্টি কঠিন··· মন্ত্রমুগ্ধের মত ভগিনী উত্তর দিল যে সে যাবে না।

মহারাজ বল্লেন, 'এখন ইনি সাবালিকা।' ভদ্রলোকেরা পুলিশে খবব দেবার ভয় দেখিয়ে চলে গেল। ছু তিন দিন পরে ঘাটে নিস্তারিণী দেবী ওরফে ভগিনী চন্দ্রাবলী স্নান করতে যায়, সঙ্গে আর একজন বৃদ্ধা ছিলেন, ফেরবার পথে আত্মীয়রা নিস্তারিণীকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে উধাও। বৃদ্ধা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেন মহারাজকে, তিনি ছুর্ব্বৃত্তদের পিছনে হুলিয়া ছাড়বেন বলেন। খগেন বাবু সেদিন মহারাজকে বেশ ছু'কথা শোনান আশ্রমের বিপক্ষে। পূর্ব্বসঞ্চিত আপত্তি-গুলি প্রাণ খুলে খরচ করে আশ্বস্ত হন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আকাশে জ্যৈষ্ঠশেষের মেঘের মতন ধীরে ধীরে আশ্রমের বিপক্ষে তাঁর আপত্তিগুলি জমে উঠছিল, বর্ষণ হয় নি—সেদিন হোলো আষাঢ়ের ধারার মতন। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণটাই সত্য সম্বন্ধ, মরুভূমি বৃষ্টি চায়, তাই বালিও সৎ, বৃষ্টিও সৎ; বৃষ্টি না হওয়াটাই অসৎ। জোর করে চাওয়াটাই সৎ। অভদ্র ভিক্ষা এবং কৃপা ছুইই অসৎ। আশ্রম মানবপ্রকৃতির আকাঙ্ক্ষাকে ভয়

করে, তাই যুবকদের ব্রহ্মচারী থাকতে হয়। তারও বেশী পাপ সমাজের চাহিদাকে ভয় করা। সমাজের দোষ আছে, কিন্তু তাই বলে পালিয়ে আসবে! খগেন বাবুর মনে আসে তিনি নিজেই তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে উন্নত করতে যান এবং রমলার কাছ থেকে পালিয়ে এলেন, অন্যের পৃথক সত্তা স্বীকার করবার ভয়ে। নিজের প্রতি ঘৃণা শত মুখ হয়ে ওঠে আশ্রমের বিপক্ষে। ভুলুর প্রতি, ভগিনী চন্দ্রাবলীর প্রতি, তাদের সম্বন্ধের প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে এই আশ্রম।

এই ব্রহ্মচারীকেই খাবার সময় নিস্তারিণী পাখার হাওয়া করছে দেখে মহারাজ তিরস্কার করেন। দেখা সাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়, তবু নিস্তারিণী ভুলুকে না খাইয়ে নিজে খেত না। সেটা মহারাজের চোখে পড়েনি, খগেন বাবুর চোখে পড়ে। খগেন বাবু বুঝলেন যে দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট—একদিন বলেওছিলেন, 'ব্রহ্মচারী, যদি কোনও কারণে তোমাদের আশ্রমবাস অসম্ভব হয় তবে চলে এস। আমার সমাজে তোমাদেরই প্রয়োজন—সেখানে সস্ত্রিয়ম্ ধর্ম্মমাচরেৎ। অ-সামাজিক পাপে আশ্রমই আশ্রয় দেয়, অনাশ্রমিক ব্যবহারের পাপে আমার, আমাদের সমাজ তোমাকে আশ্রয় দেবে।' ব্রহ্মচারী তখন চোখ নীচু করে থাকে।

কিন্তু যেদিন ভগিনী চন্দ্রাবলী অদৃশ্য হোলো, সেদিন বিকেলে ভীমগোদার নীচে একটা বড় পাথরের ওপর বসে ব্রহ্মচারীর চোখে খগেন বাবু জল দেখলেন। নিস্তারিণীর সঙ্গে যে বৃদ্ধাটি স্নানে যান, যিনি এসে দুর্ঘটনার সংবাদ দেন, তাঁকে গোপনে জেরা করে ব্রহ্মচারী বুঝেছে যে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে। কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয় নি, জোর-জবরদস্তী,ধ্বস্তাধ্বস্তি করে গাড়িতে তুলতে হয় নি, কেবল চোখ ছলছল করেছিল—ঘরণী গৃহিণী মেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় যতটুকু ছলছলে চোখ দেখানো ন্যায্য বিবেচনা করে।···সব ভেক···। বৃদ্ধা কিন্তু মহারাজকে বলেছিলেন অন্য কথা—ভগিনী যেতে চায়নি, তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে গেছে, মাথা গেল ফেটে, রক্তগঙ্গা, মাগো—খগেন বাবু ব্রহ্মচারীর মুখে সত্য বিবরণ শুনেই উঠে পড়েন, তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে ঘরের দরজায় খিল দেন। ভেক নয়—দুর্ব্বল মস্তিস্ক মেয়েটির। গৃহত্যাগ করলি যদি, আর ফিরিস নি, এলিই বা কেন আশ্রমে, ভুলুকে খাবার সময় পাখার বাতাস করারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মেয়েরা যখন যার তখন তার। রমলা কি তাই? বুকটা কেঁপে ওঠে, হাত পা ঠাণ্ডা হয়। না, না, রমলা ভিন্ন ধরণেরই, ওরকম ছিল সাবিত্রী। সে তার স্বামীকে

হেগেল-দর্শনের, আর পরে Marx কর্তৃক তার বিকারের পরিচয় দেব। কিন্তু প্রথমেই দুটি কথা বলে রাখি। রুশিয়ার Communism এ-দর্শন থেকে উদ্ভূতও নয়, তার উপর প্রতিষ্ঠিতও নয়। কোন নূতন সামাজিক ব্যবস্থা কোন পুরোনো ideaর কথায় কথায় অনুবাদ হয় না। এই নব Communismএর সঙ্গে Dialectical Materialismএর সম্পর্ক হচ্ছে দেহের সঙ্গে বেশের যে সম্পর্ক, সেই জাতীয়।

Marxএর গুণগ্রাহী জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক Croce বলেছেন যে—"Quella bizzarra proposizione di storia della filosofia, che il proletariato sia l'erede della filosofia classica tedesca" (Materialismo Storica, p. 116)। উপরোক্ত কথা ক'টি ইতালীয়, কিন্তু যিনি ইংরাজী জানেন তিনিই এর মানে বুঝতে পারবেন। এই কথা ক'টিকে ভুল বানানের ইংরেজী মনে করতে পার। দুটি শব্দের অর্থ বলে দিচ্ছি। Erede = উত্তরাধিকারী, আর tedesca = জার্ম্মান। এখন হেকার সাহেব এই bizarre propositionই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং Communismএর পাশ কাটিয়ে দর্শনের পরিচয় দেব।

আর একটি কথা মনে রেখো। বিলেতি দর্শনকে বাঙলা করা অতি কঠিন। ভাষার সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ এক একটা বিশেষ দর্শন তার রূপ-ধারণ করে, কতকটা জাতীয় মনের চরিত্র ও কতকটা জাতীয় ভাষার চরিত্র অনুসারে। সুতরাং কোন একটি বিশেষ দর্শনের ভাষা মুখ্য কিম্বা ভাব মুখ্য, তা বলা কঠিন। তারপর দার্শনিক ভাষামাত্রেই এখানে ওখানে দানা বাঁধে, আর এই দানাগুলোর নাম পারিভাষিক শব্দ। এক ভাষার পারিভাষিক শব্দ অপর ভাষার পারিভাষিক শব্দে ঠিক অনুবাদ করা যায় না। যায় শুধু ব্যাখ্যা করা, তাও অনেক কথায়। মোদ্দা কথা dialectical শব্দের বাঙলা আমি জানিনে।

[৩]

হেগেল-দর্শন dialectical idealism বলেই পরিচিত। আর এই idealismএর স্থলে materialism বসিয়ে দিয়েই Marx তাঁর নব-দর্শন খাড়া করেন। তাই হেগেল-দর্শনের পরিচয় প্রথমে দেব। আমার মত অদার্শনিক সাহিত্যিকের

পক্ষে হেগেল দর্শনের আলোচনা করা দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু যে কাজ একবার করা যায়, সে কাজ দ্বিতীয়বার করতে ভয় হয় না। আমি যৌবনে একবার হেগেলের মত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাধ্য হয়েছিলুম, ৺বিপিনচন্দ্র পালের কোনও লেখার প্রতিবাদ সূত্রে। সেকালে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আমাকে বলেছিলেন যে, আমার কথা মোটামুটি ঠিক। তাই সেই প্রবন্ধ থেকে আমার কথা তুলে দিচ্ছি :

"তিনি (বিপিনবাবু) এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় করা যায়। হেগেলের thesis, antithesis ও synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভুক্ত সকল লোক যে ধরা পড়বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, ভাব (being) ও অভাব (non-being), এ দুটি পরস্পরবিরোধী, আর এ দুটির সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে স্বভাব (becoming)। মানুষের মনের সকল মননক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কারণ এ জগৎ চৈতন্যের লীলা।" (নানা কথা পৃঃ ১৮৮)

অর্থাৎ "আছে" কথাও নিরর্থক, "নেই" কথাও নিরর্থক ; "হচ্ছে" এই কথাই সত্য কথা। এই "হচ্ছেই" progressএর মূল। এবং progress করতে আমরা বাধ্য, কারণ তাই হচ্ছে আমাদের কপালের লেখা। আমি অবশ্য একথা মানিনে, কারণ কপালের পুঁথি যে হরফে লেখা, সে অক্ষরের বর্ণপরিচয় আমার হয়নি। তিনের মায়া মানুষে কাটাতে পারে না, কি ধর্ম্মে কি দর্শনে। বোধহয় Triangle হচ্ছে আমাদের মনের প্রকৃতি-দত্ত কাঠামো, যার ভিতর আমাদের সকল জ্ঞান পুরতে হবে। এ হচ্ছে একরকম বিলেতি সাংখ্যদর্শন।

[৪]

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে হেগেল সম্বন্ধে আরও দু-চার কথা বলেছি, অবশ্য ভক্তিভরে নয়। সে সব কথা আর এখানে তুলে দিলুম না, পাছে পুঁথি বেড়ে যায় এই ভয়ে। আর কি বলেছি যদি জানতে চাও ত উক্ত প্রবন্ধ পড়ে দেখো। Dialectical Materialismএর কুলের খবর দিতে গেলে এর চেয়ে বেশি হেগেল-দর্শনের আলোচনার প্রয়োজন নেই। হেগেল একজন মহাদার্শনিক, কিন্তু

ভাল করেনি। হিমালয় হ্যামলেটকে বিনয়ী করত। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের প্রথম ও শেষ পুরুষ হ্যামলেট, তারই সন্তান-সন্ততি রাশিয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বস-বাস করেছে, এখন ও-দেশে তার বংশ লোপ পেয়েছে, চীন দেশে আর ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাংলা দেশে তার গোষ্ঠীবর্গ চাএর দোকানে আড্ডা দেয়, মাসিকের পাতা ভরায়, নভেল ও কবিতা লেখে, নিষ্ফল দুঃসাহসিকতা দেখায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আগ্রহাতিশয্যেই নিঃশেষিত হয়। কথা, আর কথা, বাক্‌সর্ব্বস্বের দল, নিজের নিজত্বটুকুই তাদের সমগ্র বিশ্ব। আত্মম্ভরিতারই লক্ষণ তাদের আত্মবিশ্লেষণ। খগেন বাবুর নিজের মধ্যেই হ্যামলেটিয়ানা। কিন্তু এরাই পথপ্রদর্শক, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ এদের চেষ্টাতেই হয়। কেন এরা মহাপ্রস্থানে আসে না—আত্মসর্ব্বস্বতা ঘুচে যাবে মহাপ্রস্থানের পথে। বিনয় শিখবে হিমালয়ের কাছে। বিনয় মানে আপনকে ছাড়া, পরকে স্বীকার করা, তার অস্তিত্বকে বরণ করা। বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যের সত্তাকে শ্রদ্ধার ফলেই ব্যক্তি পুরুষ হয়। হ্যামলেটের শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁর নিজেরও ছিল না, নইলে সাবিত্রী মরবে কেন? সাবিত্রীকে উন্নত করতে তিনিই বা যাবেন কেন? রমলার কাছ থেকে কেনই বা পালিয়ে যাবেন পনের হাজার ফুট ওপরে? নিষ্ক্রমণটাই সব চেয়ে বড় অহঙ্কার। আশ্রমবাসীদেরও শ্রদ্ধা নেই অন্য মানুষ ও সমাজের ওপর, থাকলে মানুষকে উন্নত করতে তাঁরা সচেষ্ট হতেন না। দোষেগুণে মানুষ, দশে মিলে সমাজ। আশ্রম থাক সমাজের বুকের মধ্যে, আর না হয় বনের মধ্যে। তখন কিন্তু তার জনহিতকর উদ্দেশ্য প্রোষণ ও বিজ্ঞাপন না করাই শোভন।

বিনয় চাই, শ্রদ্ধা চাই। বস্তুসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকার দরুণই না রামায়ণের হনুমান বানর সেনা রাক্ষসবৃন্দ বীভৎস হয়নি! কবির ভাষায়, তারা যেন জলের মধ্যে ব্যাঙ। রাশিয়ান নভেলের পাগলগুলোও স্বাভাবিক, ভারত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে খগেন বাবুর নিজের উত্তেজনা যেমন ধরণের। হিমালয়ের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই, পাহাড়তলীরই মাটি ফাটে। তাই হিমালয় বিনয়ী করে। হিমালয়ের ভিতরকার যে কোন একটা পাহাড়কে সহযাত্রীদের একজনও যদি গন্ধমাদন বলেন তখনই তাই বিশ্বাস হবে। পাহাড়ের নামকরণ শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ। কতদিন ধরে সেই নামের আশ্রয়ে শ্রদ্ধার স্তূপ গড়ে উঠেছে, তাকে অবিশ্বাস করা অসম্ভব। নামোচ্চারণের পর বিনয়ের সঙ্গে দেখলেই মনে হবে গন্ধমাদনই তার নাম হওয়া

উচিত ছিল, তার প্রতি লতাগুল্মকে মনে হবে ওষধি বনস্পতি, তার প্রতি খাঁজকে মনে হবে ঋষির উপযুক্ত বাসস্থান।

নিজেদের পাহাড়তলীর আশ্রমের কথা ভাবতেই খগেন বাবুর মন বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় যেন প্রাসাদের গায়ে ঘুঁটে শুকুচ্ছে। হিমালয়ের বিপুলতায় আশ্রম যেন প্রক্ষিপ্ত, গীতার নিষ্কামধর্ম্ম যেমন মহাভারতের স্বাভাবিক ক্ষাত্র-ধর্ম্মে প্রক্ষিপ্ত, যেমন প্রকৃতির ওপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পরমাত্মা প্রক্ষিপ্ত। হরিদ্বারের আশ্রমটি যেন ত্রিয়ানন, সুরের ওস্তাদী আর তালের বাটোয়ারা, জ্যামিতিক চিত্র, যান্ত্রিক স্থাপত্য। এত গরব সমাজ সহ্য করবে না। এত গরব সাবিত্রী সহ্য করে নি, রমলাও করবে না, খগেন বাবুর নিজের ক্ষতি হবে। পুরুষসিদ্ধি পৌরুষ, আত্মম্ভরিতা নয়। খগেন বাবু মনঃস্থ করেন আশ্রম পরিত্যাগ করতে।

রমলা এখন নিশ্চয় কোলকাতায়—মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের কোণের গলিতে, কিংবা অন্য কোথাও চলে গেছে, আপন গৌরবে। কিংবা হয়ত সেও অপেক্ষা করছে তাঁরই জন্য, কাংড়া চিত্রের অভিমানিনীর মতন। সুজন বিজন এখন কোথায়? নিশ্চয়ই তারা সন্ধ্যাবেলায় তাদের রমলাদির বাড়ীতে আড্ডা জমায়। সেখানে ছেলে ছোকরার সমাগম হয়, যৌবন উপছে পড়ে তাদের ভাবভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায়, বিজনের টেনিস খেলাতে। সুজন অল্প বয়সেই গম্ভীর, বাপমামরা ছেলে, পরের অন্নে প্রতিপালিত, বিজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সন্তান, মাতৃহারা, বাপের আদুরে ছেলে।

সুস্থ হবার সঙ্গেই কোলকাতা যাবার ইচ্ছা হয়।

তবু বাধা ওঠে, কিসের? ভয়? সংযম? আশ্রমবাসের সুফল? এখনও কোলকাতা যাওয়া হবে না। মাসীমা থাকেন কাশীতে, সেই খানেই ভগ্নস্বাস্থ্যের উদ্ধার হবে, মাসীমার আদরযত্নে।

জ্বর ছাড়ল খগেন বাবুর—শরীর এখনও দুর্ব্বল, মনও দুর্ব্বল। কিন্তু ইচ্ছা এখন স্বচ্ছ হয়েছে। মহারাজকে বল্লেন যে তিনি পরশুই হরিদ্বার ত্যাগ করবেন। 'তোমার জন্য আশ্রমের দ্বার সদা উন্মুক্ত থাকবে।'

'আমি কিন্তু আর আসব না। সমাজে ফিরে যাব, দেখি যদি থাকতে পারি, যদি তারা থাকতে দেয়।' আশ্রমকর্ত্তা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

দুদিন পরে সকালের ট্রেণে খগেন বাবু রওনা হলেন এলাহাবাদের দিকে—লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন, তার পর বিন্ধ্যাচল, চুণার, পথে কাশীতে মাসীমাকে দেখে গেলে

হয়, কতদিন খোঁজ খবর নেওয়া হয় নি। প্ল্যাটফর্ম্মের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে খগেন বাবু বল্লেন, 'ভুলু, তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। যদি দরকার পড়ে তোমারও, আমার খোঁজ নিও। ঠিকানা পাওয়া শক্ত হবে না, এবার।'

ব্রহ্মচারী ফিরতী পথে গঙ্গার ঘাটে ছাতার তলায় সারা সকালটাই কাটিয়ে দিল। ঘাটের মন্দির-গাত্রে ছবিগুলি কি বীভৎস, অস্বাভাবিক রকমের বড়, কুৎসিত, কিন্তু গঙ্গা শব্দ করতে করতে সমতলের দিকেই ছোটে। দূরে দেখা যায় বরফ ঢাকা পাহাড়ের চূড়া, যেন বরের রাংতা মোড়া টোপরটি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মার্ক্‌স্‌-এর ডায়ালেক্‌টিক

কল্যাণীয়েষু

তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে রুশিয়ার Communismএর পিছনে একটি ফিলজফি আছে—যা ইতালীর Fascismএর পিছনে নেই।

এ ফিলজফির নাম Dialectical Materialism। এ ফিলজফি যে কি, তা তুমি আমাকে সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করেছ। আমি তোমার সে অনুরোধ রক্ষা করতে চেষ্টা করব। যদিচ আমি ঐ জোড়ানামের দর্শন নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। তবে আমি যখন একজন সাহিত্যিক, তখন, জানি আর না জানি, সব বিষয়েই কথা কইবার আমার অধিকার আছে। যদি ভাল করে বোঝাতে না পারি, তাহলে তার জন্য লজ্জিত হব না, কেন না আমি দর্শনের অধ্যাপক নই।

Dialectical Materialismএর সন্ধান তুমি বোধহয় Moscow Dialogues নামক পুস্তকের অন্তরে পেয়েছ। এ বই পড়ে তুমি এ দর্শনের মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারনি। আমিও সে বইয়ের পাতা উল্টেছি, কিন্তু তার ফলে কোনও জ্ঞান লাভ করিনি। গ্রন্থকার নিজে Socratov অর্থাৎ Socrates সেজে Platoর Dialogues অনুকরণ করেছেন। ও বই পড়ে আমি এই মাত্র বুঝেছি যে উক্ত ভদ্রলোক মহাদার্শনিক হতে পারেন, কিন্তু লেখক হিসেবে আর্টিষ্ট নন। আর Moscow, Athens থেকে বহু দূরে—কালের হিসেবে ও দেশের হিসেবে। উক্ত লেখক শুনতে পাই, জাতিতে রুশীয় ও মানুষ হয়েছেন আমেরিকায়; এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়ে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রফেসারী করছেন। বইখানি লিখেছেন বোধহয় আমেরিকান পাঠকদের জন্য, তাই তাঁর লেখার গায়ে সাহিত্যিক গুণ নেই।

[২]

আলোচ্য দর্শনের জন্ম জার্ম্মানীতে, আর জন্মদাতা হেগেল। পরে Marx তার নাম বদলেছেন—আর সঙ্গে সঙ্গে রূপ। আমি আগে সংক্ষেপে এই পুরোনো

তিনি আমার গুরু নন। সুতরাং তাঁর কথা বেশী বলতে গেলে অনেক বাজে কথা বলব।

হেগেলের আবিষ্কৃত এই ত্রিপদী লজিক এবং progressএর idea সেকালে বহু দার্শনিককে চমৎকৃত করেছিল। কারণ এ লজিক Aristotleএর লজিককে অতি-ক্রম করে। আর progressএর এই অনিবার্য্যতা progressকামী বহু লোকের মনে বিরাট আশার সঞ্চার করে।

তবে হেগেল তাঁর লজিকের যে সব উদাহরণ দিয়েছেন—তা হজম করা কঠিন। ফুল thesis, পাতা antithesis, আর ফল synthesis। আর এর থেকে বোঝা যায় হেগেল contradictionএর সঙ্গে distinction ঘুলিয়ে ফেলেছেন। আর এই ক্রমবিকশিত এবং ক্রমবর্দ্ধমান progress রাষ্ট্রক্ষেত্রে কোথায় গিয়ে পৌঁচেছিল জান? Croce বলেন—"But an example fitting our case better is that of the supreme philosopher of the age of which we are speaking, Hegel. More profoundly than any other man, he thought about and treated of dialectics and history. Defining spirit in terms of liberty and liberty in terms of spirit. Yet because of certain of his political tendencies and theories, he deserved to be called servile rather than liberal. (History of the Nineteenth Century, p. 10)

গত বৎসর Croce যে কথা বলেছেন, আমি প্রায় বিশ বৎসর আগে সেই কথাই বলি, যথা:

"হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া রাজ্যে বিগ্রহবাণ হয়েছিলেন।" (নানাকথা, পৃঃ ১৯১)

[৫]

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে হেগেল তাঁর এই নূতন মত প্রচার করেন। আর এই Dialectical Idealismকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Marx Dialectical Materia-lismয়ে রূপান্তরিত করেন।

এ Materialismএর মানে কি? আমরা বাঙলায় materialismকে জড়বাদ বলি। এ অনুবাদ ঠিক নয়। সে যাই হোক, materialism শব্দ বিলেতি দর্শন শাস্ত্রে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তার আনুপূর্ব্বিক বিচার Langeএর Materialismএর ইতিহাস নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু সে গ্রন্থেও dialectical materialismএর উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। এর কারণ বোধহয় এ-materialism—metaphysical materialism নয়। তা হবারও কোনও কারণ নেই কারণ Marx metaphysics লেখেন নি, শুধু সমাজের হ্রাসবৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়ের বিচার করেছেন।

যাকে mechanistic materialism বলে, অর্থাৎ এ সৃষ্টি matter এবং motionএর লীলা—এই মতই আমাদের কাছে সুপরিচিত ও সহজবোধ্য। আর বর্ত্তমানে এ মত শিক্ষিত সমাজের মন অল্পবিস্তর দখল করেছে। প্রমাণ, যখন দার্শনিকরা এ মতের প্রতিবাদ করতেন, তখন আমরা বলতুম যে তাঁরা অনধিকারচর্চ্চা করেছেন—কেননা তাঁরা বৈজ্ঞানিক নন। এবং এ যুগে যখন কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক উক্ত মতের প্রতিবাদ করেন, তখন আমরা বলি তাঁরা দার্শনিক নন।

Marxএর materialism—mechanistic materialism নয়। তবে তা কি?—এ যুগে দার্শনিক মহলে তা economic materialism বলেই পরিচিত। Economic materialism যে কি, তা যিনি Marxismএর ক, খ, জানেন তিনিই বুঝবেন।

[৬]

তবে তা dialectical নামে পরিচিত কেন?—এই জন্যে যে, হেগেলের বিশ্ব-লজিকের সাহায্যেই সিদ্ধ বলে এ মতের মর্য্যাদা আছে, অন্ততঃ দার্শনিকদের কাছে। হেগেলের মতে ideaর দ্বারা facts নিয়ন্ত্রিত (determined)। Marx বলেন তা নয়—facts দ্বারাই idea নিয়ন্ত্রিত। এ একটা মস্ত বদল। এ দুই মতবাদের ভিতর আসমান-জমিন ফারক্। তবে এর থেকে মনে করো না যে এ মত হেগেলের মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

হেগেলের মৃত্যুর পর হেগেলপন্থী দার্শনিকরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এক দক্ষিণমার্গী হেগেলিয়ান, আর এক বামমার্গী হেগেলিয়ান। এ মার্গভেদ যে

হয়েছিল, তার কারণ হেগেল নিজেই নানা উল্টাপাল্টা কথা বলেছেন, সুতরাং হেগেল-দর্শনের এই দুই ভাষ্যেরই অবসর আছে। এই বামাচারী হেগেলিয়ানদের মধ্যে Marx অগ্রগণ্য। সে যুগে জার্ম্মানীতে ideaর চাষ অনেক হয়েছিল এবং মনোজগতে দেদার আকাশকুসুম ফুটেছিল। কিন্তু সে ফুল আকাশেই ঝুলে ছিল; মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনকে তিলমাত্র পরিবর্ত্তিত করতে পারেনি। সুতরাং বহু জার্ম্মান যুবকের মতে উক্ত idealism নিতান্ত ক্লীব দর্শন, অর্থাৎ নিষ্ফল দর্শন।

Marx বলেছেন যে-দর্শনের উদ্দেশ্য বিশ্ব বোঝা নয়, জীবন পরিবর্ত্তন করা। তাই যে দর্শন হেগেল মাথার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই দর্শনকে তিনি পায়ের উপর খাড়া করলেন। পা চলতে পারে, কারণ তার চলৎশক্তি আছে। এ দেশের ভাষায় বলতে হলে, হেগেলের জ্ঞানকাণ্ড তিনি কর্ম্মকাণ্ডে রূপান্তরিত করেন।

[৭]

Marx চেয়েছিলেন জীবনকে পরিবর্ত্তিত করতে আর সে পরিবর্ত্তন সাধনের উপায় হচ্ছে কর্ম্ম অর্থাৎ action। কারণ শক্তি উদ্বুদ্ধ করা যায় একমাত্র কর্ম্মের দ্বারা। আর তিনি dialectical পদ্ধতিকেই সে কর্ম্মের একমাত্র পদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ইতিহাস কিসের পরিচয় দেয়?—এই dialectical নিয়মের। ইতিহাসের অন্তরে তিনি যে dialectics আবিষ্কার করেন, তাকে তিনি materialistic history বলেন। ধনসৃষ্টিই হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্ম্ম; আর এ যুগে যখন প্রচুর ধনসৃষ্টি হচ্ছে, তখন এ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনও বদলে যাচ্ছে। ইংরাজীতে যাকে বলে production, তারই ফলাফল হচ্ছে Marx-এর প্রধান বিচার্য্য বস্তু।

ইউরোপে প্রথম ছিল Feudalism, (thesis) তারপর এল তার antithesis capitalism, আর এই negationএর negation হচ্ছে socialism। সুতরাং সমাজ socialist হতে বাধ্য। প্রকৃতির এই নিয়ম অনুসারে মানুষের এ যুগে হাতেকলমে socialistic সমাজ গঠন করা কর্ত্তব্য। আমি এ পত্রে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সহজে dialectical materialismএর জন্মকথা বলতে চেষ্টা করেছি। এবং সেই সূত্রে হেগেল-দর্শনের হালচালের কথাও বলেছি। তোমার প্রশ্নের আমার উত্তর যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তার কারণ, কি হেগেল-দর্শন কি Marx এর সমাজ-দর্শন সহজে ও সংক্ষেপে বলা অসম্ভব। তার প্রমাণ, এ দুই

মতবাদ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। আমি এই উভয় দর্শনের সুধু কঙ্কালের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু হেগেল-দর্শন ও Marx-দর্শন কঙ্কালসার নয়। এ উভয় দর্শনেরই বিশাল রক্তমাংসের দেহ, আর উপরন্তু Marx-দর্শনের বুকে muscle আছে।

[৮]

কোনও দার্শনিক মতবাদ বোঝবার আর এক উপায় আছে, তার criticism পড়া। অবশ্য সে criticism যদি কোনও বিশেষজ্ঞ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখকের হয়। Criticism করতে হলে, পূর্ব্বপক্ষের মতের আগে স্থাপন করতে হয়, তারপর তার খণ্ডন করতে হয়।

আধুনিক দার্শনিকরা কেউ dialectical materialismএর অনুকূল, কেউ প্রতিকূল; অতএব তার অনেক সমালোচনা করেছেন। তার দু-একটি পড়লেই উক্ত মতবাদ যে কি, তা অনেকটা বুঝতে পারবে। অবশ্য criticএর সঙ্গে একমত হবার প্রয়োজন নেই।

এ criticismশাস্ত্র বিপুল, তার মধ্যে একখানি গ্রন্থের এক অধ্যায় তোমাকে পড়তে অনুরোধ করি। সে বই হচ্ছে Bertrand Russellএর সম্প্রতি প্রকাশিত Freedom and Organisation.

এ বইয়ের প্রধান গুণ হচ্ছে যে এখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত—যে ভাষা আমরা লিখতে না পারি, পড়তে পারি। তারপর Bertrand Russell হচ্ছেন অসাধারণ বুদ্ধিমান লেখক। তিনি মনোজগতে কোন দলের লোক তা বলা কঠিন, তবে তিনি যে capitalismএর Advocate General নন, সে কথা নিঃসন্দেহ। উক্ত গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে তিনি dialectical materialism বিচার করেছেন। উক্ত সমালোচনা যে চূড়ান্ত, এমন কথা আমি বলতে চাইনে; তবে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। সেকালে ভারতবর্ষের সভ্যতার শেষ কথা ছিল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ—আর একালে ইউরোপের সভ্যতার গোড়াকার কথা হচ্ছে অশান্তিঃ অশান্তিঃ অশান্তিঃ—মনোজগতেও, সামাজিক জীবনেও। এর কারণ বোধহয় বিলেতি সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার antithesis, আর এ দুই সভ্যতার synthesis হবে পরকালে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ভালোবাসা

জাহাজঘাট থেকে যে-রাস্তাগুলো খাড়া শহরের মুখে চলে গেছে, তাদের একটার মাঝবরাবর ৪৭ নম্বর বাড়িখানা নদী থেকে আসতে ডান হাতে পড়ে। এই পাটকিলে রঙের সরু ইমারৎটা এতই নগণ্য যে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে তাকে চেনাই দায়। তার নিচের তলায় একটা ছোট দোকানঘর, সেখানে রবারের বরষাতী জুতো আর কড্‌লিভার অয়েল কেনা যায়। তার পর দেউড়ি পেরোলে একটা উঠান যেথায় পাড়ার উঞ্ছ বিড়ালগুলো শিকার খোঁজে। উঠানের ওদিকে জীর্ণ কাঠের অপ্রশস্ত সিঁড়িটা দারিদ্র্যের অকথ্য দুর্গন্ধে ভেপ্‌সে উঠেছে। দোতলার বাঁ হাতে এক ছুতোরের বাস আর ডান হাতে এক ধাত্রীর, তেতলার এক পাশে একজন মুচির আশ্রয় এবং অন্য ধারে যে-মহিলাটি থাকেন, সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনলেই তাঁকে গানে পায়। চৌতলার বাঁ দিকটা খালি, কিন্তু ডান দিকে মিণ্ডার্নিকেল্ পদবীধারী এক ভদ্রলোকের বাসা, যার নিজ নাম টোবিয়স্। এই লোকটির প্রসঙ্গে একটা আজব গল্প প্রচলিত আছে। সেটা বলা দরকার, কারণ তা শুধু সমস্যামূলক নয়, অভাবনীয় রকমের লজ্জাকরও বটে।

মিণ্ডার্নিকেল্-এর বহির্ভাগ যথার্থই অবিস্মরণীয়, যেমন বিসদৃশ, তেমনি হাস্যকর। তাকে যখন বেড়াতে দেখা যায়, তখন তার আপাদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকা থাকে, এবং একটা কালো বেতের উপরে সেই লম্বা রোগা দেহটার সমস্ত ভার চাপিয়ে সে আপন মনে এগিয়ে চলে। তার সাবেকী ধরণের টুপিটা ঠিক একটা ঘণ্টার মতো, বেজায় উঁচু আর বিষম এবড়ো-খেবড়ো; তার কোটের ঝুল যদিও হাঁটু পর্য্যন্ত, তবু গায়ে সেটা নেহাৎ আঁট-সাঁট আর বয়সের গুণে দারুণ চকচকে; এবং তার পাজামা-জোড়া কদর্য্যতায় এই কোটেরই সমকক্ষ বটে, কিন্তু লম্বায় এতই খাটো যে তাতে তালি-লাগানো বুট-দুপাটিও চাপা পড়ে না। তাহলেও একথা না মেনে উপায় নেই যে এই অদ্ভুত বেশ-ভূষার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত যত্নবান। নিচু কলারের ভাঁজে গজিয়ে উঠে তার লম্বা গলা আরো লম্বা দেখায়, শাদা চুলগুলোকে সন্তর্পণে আঁচড়ে সে কপালের উপরে তুলে রাখে, এবং তার তাল-গাছ-প্রমাণ টুপির কিনারা থেকে যে মুখখানা উকি মারে, তা ফ্যাকাসে আর টোল-

খাওয়া হলেও তাতে মসৃণ ক্ষৌরকার্য্যের অভাব নেই। তার ফোলা ফোলা চোখ-দুটো মাটি ছেড়ে বড় একটা উপরে তাকায় না, এক জোড়া গভীর খাত তার নাক বেয়ে ঢালু ঠোঁটের দু কোণে মেশে, এবং এর ফলে তার বিরস মুখের অটুট বিষাদ বাড়ে বই কমে না।

মিওার্নিকেল্ কদাচিৎ বাড়ির বার হয়, এবং এর একটা কারণও আছে। সে রাস্তায় পা দিলেই একপাল ছেলে তার পেছু নেয়, এবং হাসতে হাসতে, ছড়া কাটতে কাটতে, এমন-কি তার জামার পাড় টানতে টানতে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাকে অনুসরণ করে। এই সময়ে আশ্-পাশের দরজা-জানালাগুলোতে বয়স্থ দর্শকেরাও যেকালে ভিড় জমায়, তখন এ-দৃশ্য তাদের নিশ্চয়ই উপভোগ্য ঠেকে। সে নিজে কিন্তু কোনদিনই আত্মরক্ষায় উৎসাহ দেখায় না, লাজুক চোখে চার পাশে চাইতে চাইতে, কাঁধ উঁচিয়ে, মাথা বাড়িয়ে, কেবলি হন্‌হনিয়ে হাঁটে, হঠাৎ যেন বিনা-ছাতায় বৃষ্টির মধ্যে পড়েছে; এবং লোকে যদিও তার সাক্ষাতেই হাসে, তবু একে, ওকে, তাকে সদরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সে সর্ব্বদা বিনম্র সৌজন্যে তাদের অভিবাদন জানায়। তারপর ছেলেরা যখন পিছিয়ে যায়, এবং সে পৌঁছয় এমন কোনো অজানা পল্লিতে যেখানে দু-এক জনের বেশী তার দিকে ফিরে তাকায় না, তখনও তার আচার ব্যবহার বিশেষ বদলায় না, তখনও সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চেয়ে খেদানো কুকুরের মতো ঊর্দ্ধশ্বাসেই চলে, তখনও মনে হয় হাজার জোড়া চোখের বিদ্রূপ তারই উপরে ন্যস্ত। সেই সময়ে তার দ্বিধাদুর্ব্বল চোখে নজর করলে বোঝা যায় যে মানুষের সঙ্গে অচপল দৃষ্টিবিনিময়ে সে অক্ষম, এমন-কি শান্ত, সুস্থ অবস্থায় জড়বস্তুর পর্য্যবেক্ষণও তার অসাধ্য। অনুমানটা যদিও আজগুবী শোনায়, তবু তার সমস্ত হাব-ভাবে কেবল এই কথাই ফুটে ওঠে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের মানবোচিত উৎকর্ষে সে বঞ্চিত, সাধারণ মানুষ যে-চোখে জগৎ-প্রপঞ্চ দেখে, তা তার স্বভাববিরুদ্ধ। সম্ভবত সে নিজে মানে যে প্রত্যক্ষমাত্রেই তার অগ্রগণ্য, এবং এইজন্যে তার আতুর দৃষ্টি জীব ও জড়ের মুখে আত্মগ্লানির কারণ সন্ধানে উদ্ভ্রান্ত।

এই চিরনিঃসঙ্গ ও অদ্বিতীয় দুঃখী মানুষটি কোন্ ঘটনাচক্রে চালিত? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদ তাকে মোটেই মানায় না, এবং থেকে থেকে সে এমন সাবধানে নিজের দাড়িতে হাত বুলোয় যে মনে হয় যাদের মধ্যে তার বসতি,

আপনাকে তাদের দলভুক্ত ব'লে চালাতে সে কোনমতেই রাজি নয়। ভগবানই জানেন অদৃষ্টের কোনো খামখা খেয়ালে সে বিড়ম্বিত কি না। তাকে দেখলে লাগে যেন জীবন অবজ্ঞার হাসি হেসে তার গালে এক বিরাশী শিক্কার চড় কষিয়েছে। কিন্তু এও হ'তে পারে যে কোনো দৈবদুর্ব্বিপাকই সে আজ পর্য্যন্ত পোহায়নি, সর্ব্বনাশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার যোগ্যতাই তার নেই। তার শোকাবহ অপকর্ষ আর হতবুদ্ধি আকার-প্রকার এই ক্লেশকর বিশ্বাসেরই অনুকূল যে বীর্য্য, বিবেচনা, মেরুদণ্ড ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সম্বলগুলো থেকে প্রকৃতি তাকে তফাতে রেখেছে ব'লেই সে আজ উদ্‌গ্রীব জীবনযাত্রায় অশক্ত।

কালো ছড়ির পোষকতায় নিয়মিত নগরপরিক্রমা শেষ ক'রে সে যখন সেই ঢালু রাস্তা বেয়ে বাড়ি ফেরে, তখন ছেলের দল আবার ঠাট্টা-তামাসা দিয়েই তার সম্বর্দ্ধনা সারে। কিন্তু মিণ্ডার্নিকেল্ সে-উপদ্রব গায়ে মাখে না, সিঁড়ির ভেপ্‌সা গন্ধ পেরিয়ে যথাসত্বর নিজের ঘরে ঢোকে। ঘরখানায় আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, দারিদ্র্যের চিহ্ন তার সর্ব্বত্র; কেবল পিতলের হাতলওয়ালা সেকেলে দেরাজটাই নিঁখুৎ আর দামী। তার এক পাশে একটা জান্‌লা আছে বটে, কিন্তু সেটার দৌড় সামনের বাড়ির উঁচু দেওয়াল পর্য্যন্ত, বাতায়নিকের কৌতূহল সেখানেই মাথা ঠুকে মরে। তাহলেও সেই জান্‌লাতে মাটি-ভর্ত্তি একটি ফুলের টব বসানো থাকে, এবং তাতে যদিও কিছুই জন্মায় না, তবুও টবিয়স্ মাঝে মাঝে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়, তন্ময় ভাবে তার দিকে তাকায়, তার ভিতরকার বাঁঝা মাটি শুঁকে বিশেষ আরাম পায়। এই ঘরের সংলগ্ন অন্ধকার কুঠরিখানায় মিণ্ডার্নিকেল্ ঘুমোয়। ঘরে গিয়েই সে তার টুপি আর ছড়ি দেরাজের উপরে রাখে, তার পর ধূলিগন্ধী সোফার সবুজ ঘেরাটোপের উপরে ব'সে গালে হাত দেয় আর ভুরু কপালে তুলে মেঝের দিকে চোখ নামায়। তখন মনে হয় এ-ছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কিছুই তার করণীয় নেই।

মিণ্ডার্নিকেল্-এর চারিত্র্যবিচার অত্যন্ত শক্ত। নিম্নোক্ত ঘটনার পক্ষপাত আপাতত তারই দিকে। একদিন এই অসামান্য মানুষটি যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমবেত বালক-বালিকার হাসি-টিটকিরি কুড়োতে কুড়োতে দু-দশ কদম চলেছে, অমনি একটি দশ বছরের ছেলে আর এক জনের পায়ের ঠোক্করে এমন জোরে আছাড় খেলে যে তার কাটা নাক আর ফাটা কপালের রক্ত সহজে থামতে চাইলে

না, এবং বেচারা উঠতে না পেরে শুয়ে শুয়েই কান্না জুড়লে। তাই শুনে টোবিয়স্ ফিরে দাঁড়ালো, এবং ছেলেটিকে ভূপতিত দেখে ত্রস্তপদে এগিয়ে এসে, তার উপরে ঝুঁকে প'ড়ে কাঁপা গলায় গুন্‌গুনিয়ে দরদ জানাতে সুরু করলে।

সে বলতে লাগলোঃ "আহা, বাছারে আমার! লেগেছে বুঝি? রক্ত পাড়িয়েছো? সর্ব্বনাশ, রক্তে যে কপাল ভেসে গেলো! তোমায় ওই রকম প'ড়ে থাক্‌তে দেখে প্রাণে যে কেমন বাজছে, কী বলবো! ওর কি লাগে না, না কি? বেচারা শুধু-শুধুই কাঁদছে? সত্যি, আমার কষ্ট হচ্ছে। দোষ তোমার নিজেরই। তা হোক গে, আমার রুমালেই, এসো, তোমার কপাল বাঁধি। এই তো হয়ে গেলো! এইবার দেখি একবার কত বড় জোয়ান, দাঁড়াও উঠে পায়ের উপর!"

এই কথাগুলো বলতে বলতে সে রুমালখানা ছেলেটির মাথায় জড়ালে, এবং তার পর তাকে সযত্নে তুলে দাঁড় করিয়ে নিজের গন্তব্যে চলে গেলো। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ভাব-ভঙ্গিতে কেমন একটা অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটলো; সে হাঁটতে লাগলো ঋজু দেহে, দৃঢ় পদক্ষেপে, আবক্ষ নিঃশ্বাসে পরিচ্ছদ পরিস্ফীত ক'রে। সহসা তার চোখ-ছুটো বড় আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হঠাৎ সে মনুষ্যসংসার আর জড়বিশ্বের দিকে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাইতে পারলে, এবং সেইসঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে ফুটলো অনভ্যস্ত আনন্দের অস্পষ্ট অস্বস্তি!

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরে পাড়া-পড়শীর উৎফুল্ল ব্যঙ্গ-কৌতুকে কিছুকাল একটু মন্দা পড়লো। কিন্তু ছু-চার দিন যেতে না-যেতে তার রোমাঞ্চকর কীর্ত্তির কথা প্রায় সকলেই ভুলতে বস্‌লো, এবং আবার অসংখ্য কণ্ঠের সুস্থ, সবল ও নিষ্ঠুর চীৎকার এই অনিশ্চিত, আবর্জ্জিত মানুষটির পশ্চাদ্ধাবনে ঠিক আগের মতোই মেতে উঠলো।

একদিন বেলা এগারোটার সময়ে মিওার্নিকেল্ বাসা থেকে বেরিয়ে সারা শহর ছাড়িয়ে লের্হেন্‌বের্গ্ নামক দিগন্তবিস্তীর্ণ পাহাড়ের দিকে চল্‌লো। এইটা ছিলো স্থানীয় সৌখীন লোকেদের সান্ধ্য ভ্রমণের জায়গা। কিন্তু তখন বসন্তকাল, অর্থাৎ ঋতুটা বেশ উপভোগ্য; এবং সেদিন সাত সকালেই সে-অঞ্চলে লেগেছিলো রথী-পদাতিকের ভিড়। হয়তো সেইজন্যেই রাস্তার ধারে সারবন্দী গাছের নিচে এক পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক যাত্রীদের শুনিয়ে শুনিয়ে একটা শিকারী কুকুরের

বাচ্ছা বিক্রির ইচ্ছা প্রকাশে হয়েছিলো ব্যস্ত। কুকুরটা ছিলো ছোট, বয়স খুব জোর মাস চারেক, তার পেশীবহুল গায়ের রং হল্‌দে, একটা চোখে গোলমতন কালো দাগ, একটা কান কৃষ্ণবর্ণ।

দশ কদম দূর থেকে এই জীব-দুটি টোবিয়স্‌-এর নজরে আস্‌তেই সে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়্‌লো; এবং দাড়িতে বার-কতক হাত বুলিয়ে মানুষটির হাত-পা নাড়া আর কুকুর ছানাটার সজাগ ল্যাজ দোলানো চিন্তাকুল চোখে দেখে নিলে। তার পর সে আবার চল্‌তে সুরু করলে; কিন্তু দু পা এগিয়েই মুখের উপর ছড়ির বাঁট চাপতে চাপতে, যে-গাছটায় কুকুরওয়ালা ঠেস দিয়েছিলো, সেটাকে তিন বার ঘুরে, তার কাছে এসে থামলো, এবং নিচু গলায় তাড়াতাড়ি শুধোলে: "কত দাম?"

মানুষটি জবাব দিলে: "দশ মার্ক।"

টবিয়স্‌ কিছুক্ষণ নীরব রইলো, তার পর সন্দেহের সুরে আবৃত্তি করলে: "দশ মার্ক"?

লোকটি বল্‌লে: "হ্যাঁ।"

তখন টোবিয়স্‌ তার পকেট হাৎড়ে একটা কালো চামড়ার থলি বার করলে, এবং তার থেকে একখানা পাঁচ মার্কের, একখানা তিন মার্কের আর একখানা দু মার্কের নোট নিয়ে টাকাটা বিদ্যুদ্বেগে কুকুরওয়ালার হাতে গুঁজে দিলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই বেচা-কেনার ব্যাপার জন-কয়েকের নজরে আসাতে তারা হাসি জুড়েছিলো। মিণ্ডার্নিকেল্‌ একবার সন্ত্রস্ত চোখে তাদের দিকে তাকালে, তারপর জন্তুটার চেঁচামেচি, ছট্‌ফটানি না মেনে, তাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বাড়ি ফিরলো। কুকুরটা সমস্ত পথ নূতন প্রভুর সঙ্গে লড়্‌লে, মাটিতে পা গেড়ে গেড়ে প্রতিপদে প্রতিবন্ধক জোটালে, বারম্বার উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে অপরিচিতেব মুখাবলোকন করলে। কিন্তু সে-জিজ্ঞাসায় মিণ্ডার্নিকেল্‌-এর মৌন কাটলো না, প্রাণপণ বলে চেন টানতে টানতে সম্পত্তি-সমেত সে নিরাপদে সারা শহর পেরোলো।

টোবিয়স্‌ আর তার কুকুরছানাটা দৃষ্টিগোচরে আসতেই রাস্তার ছেলের দলে একটা বিরাট কলরবের সূত্রপাত হলো। কিন্তু টোবিয়র্‌ তাতে দম্‌লো না; কুকুরটাকে দু হাতে জড়িয়ে ধ'রে, তাকে মাথার আড়ালে লুকিয়ে, হাসি, ঠাট্টা, কাপড় টানাটানির মধ্যে দিয়ে সে তীরবেগে নিজের ঘরে গিয়ে উঠলো। সেখানে ঢুকে টোবিয়স্‌ কুকুরটাকে নামালে; কিন্তু তাতেও তার ঘ্যান্‌ঘ্যানানি থামলো না।

তখন প্রসাদ বিতরণের ভাব দেখিয়ে, তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মুরুব্বীর মতো সে বল্‌লেঃ "বিলক্ষণ ! বিলক্ষণ ! জানোয়ার ব'লেই কি ও-রকম ভয় পেতে হয় ? অতখানি সমীহার কোন দরকার নেই।"

তারপরে টোবিয়স্ দেরাজের টানা থেকে একথালা রান্না মাংস আর আলু বার ক'রে খানিকটা তাকে দিলে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কান্না থেমে গেলো, এবং ল্যাজ নাড়তে নাড়তে, ঠোঁট চাট্‌তে চাট্‌তে সে অবিলম্বে আহারে মাতলো।

খাওয়া শেষ হতেই টোবিয়স্ বল্‌লেঃ "তোর নাম দিলুম ইসাও। বুঝলি ? ইসাও। এই সহজ শব্দটা নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবি।" তারপর সামনের মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে হাঁকলেঃ "ইসাও !"

কুকুরটা নিশ্চয়ই ভাবলে তার ভাগ্যে আরো খাবার জুট্‌বে ; তাই ডাকৃতেই সে কাছে এলো। তখন টোবিয়স্ তার পাঁজরা চাপড়ে বাহবা দিয়ে বললেঃ "সাবাস ! সাবাস ! এই তো চাই, বন্ধু ! গুণ না গাইয়ে ছাড়বিনে, দেখছি !"

তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে; মাটির দিকে দেখিয়ে সে আবার হুকুম দিলেঃ "ইসাও !"

এতক্ষণে জানোয়ারটার মেজাজ বেশ খুশি হয়ে উঠেছিলো, তাই এবারেও সে এক লাফে কাছে এসে মুনিবের পা চাট্‌তে লাগলো।

অন্ততপক্ষে বার কি চোদ্দ বার এই খেলা খেলেও টোবিয়স্-এর সাধ মিটলো না ; আদেশজ্ঞাপনে ও বশ্যতাপ্রতিগ্রহে সে প্রত্যেক ক্ষেপে সমান আমোদ পেলে। শেষকালে কুকুরটারই অবসাদ জাগলো, দেখে বোধ হলো সে একটু জিরোতে চায়, খাবার হজমের প্রয়োজনই তাকে উপস্থিত ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আর পাঁচটা শিকারী কুকুরের মতো সুশ্রী পা-জোড়াকে সামনে এলিয়ে দিয়ে সে হঠাৎ সেয়ানা ঢঙে মেজের উপরে ব'সে পড়লো।

টোবিয়স্ ডাকলেঃ "ইসাও ! আর একবার !"

কিন্তু ইসাও মাথা ফিরিয়ে নিলে। নড়বার কোনো লক্ষণই দেখালে না।

চড়া গলায় টোবিয়স্ চেঁচালেঃ "ইসাও ! ও-সব চালাকি চলবে না, থ'কে গেলেও আসতে হবে।"

কিন্তু তাতেও ইসাও উঠলো না, থাবার উপরে মাথা রাখলে মাত্র।

এবারে অবরুদ্ধ বিভীষিকায় টোবিয়স্-এর কণ্ঠস্বর বিকট হয়ে উঠলো ; সে বললে : "ভালো চাস্ তো কথা শোন্, নচেৎ বুঝ্‌বি আমায় চটানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

কিন্তু উত্তরে কুকুরটা শুধু একটু ল্যাজ নাড়লে। তখন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড প্রকোপের অপরিসীম অসঙ্গতি মিগুার্নিকেল্-কে ছেয়ে ফেল্‌লে ; এবং তার ঘাড় ধ'রে শূন্যে তুলে সে সেই কালো ছড়ির বাড়ি আর্ত্ত জন্তুটার উপর আঘাত বৃষ্টি সুরু করলে। ভীষণ রাগে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে সে সাপের মতো ফুলে ফুলে গর্জ্জাতে লাগ্‌লো : "আমায় অমান্য ? এত বড় সাহস যে আমায় অমান্য ?"

বেশ কিছুক্ষণ বাদে হাতের ছড়িগাছা টান মেরে ফেলে দিয়ে টোবিয়স্ কাঁদুনে কুকুরটাকে নামিয়ে রাখলে, এবং পিছন দিকে দু হাত জুড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কিন্তু ক্রমশ তার পদচারণের বেগ কমলো, অবজ্ঞার ভ্রূকুটি সরল হয়ে এলো, এবং চিৎপাত কুকুরটার পা নাড়ার কাকুতি দেখে সে শেষ পর্য্যন্ত তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ন্তী হারিয়ে ফিরলে পরে নেপোলিয়ন্ যেমন কঠোর কণ্ঠে তাঁর সৈন্যদলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেন, সেই রকম হিম গলায়, জমাট চোখে সেও ইসাওকে শুধোলে : "জিজ্ঞাসা করতে পারি কি আচরণটা কেমন হলো ?"

কিন্তু কুকুরটা এইটুকু অনুগ্রহকে দাদন ভেবে ইতিমধ্যেই বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিলো। কাজেই সে গুড়ি মেরে আরো কাছে স'রে গেলো, এবং মালিকের পায়ে প'ড়ে নিঃশব্দ অনুনয়ে একজোড়া চক্‌চকে চোখ তার মুখের পানে তুলে ধরলে।

টোবিয়স্ তাতেও তেমন নরম হলো না ; নীরব উপেক্ষায় আরো কিছুকাল সেই দর্পচূর্ণ জন্তুটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু আস্তে আস্তে পদানত পশু-দেহের উত্তাপ তার মন গলালে ; এবং অবশেষে ইসাও-কে কোলে টেনে নিয়ে সে ব'লে উঠলো : "বেশ ! শুধু এইবারটা মাপ করলুম।"

তারপর কুকুরটা আদর কাড়িয়ে তার মুখ চাট্‌তে আরম্ভ করতেই তার উষ্মা বিষণ্ণ করুণায় বদ্‌লে গেলো ; এবং মর্ম্মান্তিক স্নেহে সে তাকে বুকে চেপে ধরলে। তার চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠলো, এবং বার বার কথার খেই হারিয়ে ফেলে সে চাপা গলায় কেবলই বলতে লাগলো : "বুঝিসনে কেন তুই আমার একমাত্র— আমার একমাত্র——" অতঃপর সে অতি সন্তর্পণে ইসাও-কে সোফায় নামিয়ে

রাখলে, নিজে তার পাশে বসলো, এবং গালে হাত দিয়ে শান্তিভরা কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো।

এর পর থেকে টোবিয়স্-এর বহির্গমন আগের চেয়ে আরো বিরল হলো; কেননা ইসাও-এর সঙ্গে সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা তার আদৌ ছিলো না। কিন্তু এখন থেকে তার সমস্ত মনোযোগ সে অর্পণ করলে ওই কুকুরটাকেই। অন্য সব কাজে জলাঞ্জলি দিয়ে সকাল থেকে বিকেল অবধি সারা সময়টা সে কাটাতে লাগলো ইসাও-এর সেবা-শুশ্রূষায়। তার চোখ মুছিয়ে এবং খাবার জুগিয়ে, তাকে ব'কে ধম্‌কে এবং হুকুম খাটিয়ে, খাঁটি মানুষী রীতিতে তার সঙ্গে প্রাণের কথা ক'য়ে সে একেবারে কুণো হয়ে উঠলো। অবশ্য তাহলেও প্রত্যহ মালিকের সন্তোষবিধান করা ইসাও-এর সাধ্যে কুলোতো না; কারণ খোলা হাওয়া আর যথেষ্ট মেহেনতের অভাবে ঝিমোতে ঝিমোতে জড়ানো চোখে মাঝে মাঝে তার মুখে তাকানো ছাড়া তার মন পাওয়ার আর কোনো উপায়ই ছিলোনা। তাই যেদিন একেবারে মুস্‌ড়ে প'ড়ে ইসাও তার পাশে গিয়ে শুতো, শুধু তখনই টোবিয়স্-এর আত্মপ্রসাদ আর আঁটা যেতো না; সেইদিনই সৌম্য মূর্তিতে সে সোফায় ব'সে আস্তে আস্তে ইসাও-এর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে অনুকম্পার সুরে বল্‌তো: "আমার দিকে অমন অভিভূত দৃষ্টিতে কি দেখছো, বন্ধু? পৃথিবীটা যে কত শোচনীয় জায়গা, তা এই কাঁচা বয়সেই তুমিও ধ'রে ফেল্‌লে, নাকি?"

কিন্তু জন্তুটা যখন খেলার নেশায় অন্ধ হয়ে, শিকারের প্রবর্ত্তনায় সহবৎ হারিয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে বেড়াতো, পুরানো চটি নিয়ে হেঁচড়া-হেঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি করতো, লাফিয়ে লাফিয়ে কৌচ-কেদারা ধাম্‌সাতো, অথবা আনন্দের আতিশয্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিতো, তখন দূর থেকে এই সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখে টোবিয়স্-এর বুদ্ধি যেতো গুলিয়ে। তার চোখে জাগতো সংশয় আর অসম্মতি, এবং তার মুখে ফুটতো বিরক্তির ম্লান হাসি, অমঙ্গলের সূচনায় ভারাতুর। শেষ পর্য্যন্ত সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারতো না, কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বল্‌তো: "বাঁদরামি থামা, অমন দৌরাত্ম্যের কিছুমাত্র কারণ নেই।"

একদিন এমনও ঘটলো যে ইসাও হঠাৎ ঘর থেকে পালিয়ে, এক নিঃশ্বাসে সিঁড়ি ভেঙে, সটান রাস্তায় গিয়ে হাজির হলো, এবং সেখানে বিড়াল তাড়িয়ে,

ময়লায় মুখ দিয়ে, ছেলেদের সঙ্গে খেলা জুড়ে, নিজেকে একেবারে ভুলতে বসলো। তারপর টোবিয়স্ যখন দুঃখে, কষ্টে, অপমানে মুখ বাঁকিয়ে রঙ্গমঞ্চে নামলো, এবং রাস্তার অর্দ্ধেক লোক সমস্বরে হেসে আর হাততালি বাজিয়ে তার অভ্যর্থনা করলে, তখন সেই শোচনীয় ব্যাপারের ষোলো কলাই পূরলো—লাফাতে লাফাতে কুকুরটা তার মুনিবের নাগাল এড়ালে। সেদিন ইসাওকে অনেক ক্ষণ ধ'রে প্রাণ খুলে মেরেও টোবিয়স্ তার সমস্ত ঝাল ঝাড়তে পারলে না।

কুকুরটা তার আয়ত্তে আসার কয়েক হপ্তা বাদে টোবিয়স্ একদিন দেরাজ থেকে একখানা পাঁউরুটি বার ক'রে, ইসাও খাবে ব'লে সেটাকে ছোট ছোট ফালিতে কেটে, টুক্‌রোগুলো মাটিতে ছড়াতে লাগলো। কিন্তু হাড়ের বাঁটওয়ালা যে-প্রকাণ্ড ছুরিটার সাহায্যে সে সচরাচর এই রকমের কাজ সারতো, তার নিপুণ ব্যবহার কোনোদিনই টোবিয়স্-এর অভ্যাস হয়নি। তাই ক্ষুধার তাড়ায় বিবেচনা হারিয়ে ধড়ফড়ে কুকুরটা যেই একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠলো, অমনি তার ডান কাঁধে ছুরির ফলাটা গেলো ব'সে, এবং মেঝেতে লুটোতে লুটোতে ইসাও রক্ত ছুটিয়ে দিলে।

ভয়ে সিটিয়ে টোবিয়স্ সব ছেড়ে আহত জন্তুটার উপরে ঝুঁকে পড়লো। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তার হাব-ভাবে একটা হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেলো, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের আভাসে ইঙ্গিতে তার মুখ চোখ ভাস্বর হয়ে উঠলো, এবং কাতর কুকুরছানাটাকে সাবধানে সোফায় শুইয়ে সে কী অভিনিবেশের সঙ্গে তার পরিচর্য্যা সুরু করলে, তা অনির্ব্বচনীয়। এক পা না ন'ড়ে সে সারা বেলা কাটাতে লাগলো ইসাও-এর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রির পর রাত্রি ইসাও তারই বিছানায় স্থান পেলে। অশেষ উদ্বেগে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, ঘা ধুইয়ে আর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আর দরদ জানিয়ে মিণ্ডার্নিকেল্-এর দিনগুলো ছুটে চল্‌লো অক্ষয় আনন্দে।

সে থেকে থেকে তাকে শুধোতো: "বড্ড লাগছে? আহা, বেচারা আমার! জানি কী ভয়ানক তোর কষ্ট। কিন্তু পরোয়া নেই, বাঁচা মানেই ভোগা।" এই কথা বলার সময়ে টোবিয়স্-এর মুখে ফুট্‌তো একটা শান্ত বিষাদের ছবি, কিন্তু তাতে সন্তোষের ছাপও থাকতো সুস্পষ্ট।

কিন্তু ইসাও-এর রোগ মুক্তি ও শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে টোবিয়স্-এর চাল-চলনে আবার অধীরতা ও অতৃপ্তি দেখা দিলে। ক্রমশ তার বিশ্বাস হলো যে বর্ত্তমান অবস্থায় দুশ্চিন্তা অনুচিত, মুখের কথায় কিম্বা পিঠ চাপ্‌ড়ে সহানুভূতি

জানালেই সে এবার তার দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু ইসাও-এর স্বাস্থ্য ছিলো উৎকৃষ্ট, তাই বিনা-যত্নেও তার ঘা সেরে এলো, এবং অবিলম্বেই সে আবার ঘরের মধ্যে হুড়োহুড়ি সুরু করলে। একদিন এক বাটি দুধ-রুটি খাবার পর তার শরীরে আর কোনো দোষ রইলো না; এবং এক লাফে সোফায় চ'ড়ে, উল্লসিত কোলাহলে ঘর-দুটো মাতিয়ে তুলে, একটা আলুকে এ-দিকে ও-দিকে খেদিয়ে, নিছক স্ফূর্ত্তিতে ও সাবেকী অসংযমে সে অনবরত ডিগবাজি খেতে লাগলো।

টোবিয়স্ তখন ফুলের টবটার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। ইসাও-এর কাণ্ড-কারখানা দেখে সে জানলাতেই থম্‌কে রইলো, বিস্ময়ের ব্যাকুলতা তার অপ্রতিভ চেহারা-খানাকে সাম্‌নের শাদা দেওয়ালের ভূমিকায় যেন কালির আঁচড়ে চিত্রার্পিত ক'রে দিলে। শুধু মাঝে মাঝে ছেঁড়া-আস্তিন-ঘেরা একখানা রোগা চিম্‌সে হাতে সে কলের পুতুলের মতো তার তুলে-আঁচ্‌ড়ানো চুলগুলো ঘাঁটতে লাগলো; এবং মনস্তাপে তার বিবর্ণ মুখখানা বিকৃত হয়ে গেলেও, তার চোখের কোণে জম্‌তে থাক্‌লো হিংসা, কুটিলতা আর অনিষ্ট। কিন্তু হঠাৎ সে নিজেকে বশে আন্‌লে, এবং ধীরে ধীরে ইসাও-এর কাছে এগিয়ে, তাকে কোলে নিতে নিতে মর্ম্মান্তিক স্বরে বলতে আরম্ভ করলে: "আহা, বেচারা আমার –" কিন্তু ইসাও তখন আমোদে এমনি মেতে উঠেছিলো যে এ-রকম ব্যবহার সে আর নিরীহ ভাবে সইতে পারলে না; যে-হাত তাকে চাপড়াতে যাচ্ছিলো, তার উপরে সে খেলাচ্ছলে দাঁত বসালে; যে-বাহু তাকে আট্‌কে রেখেছিলো, তার থেকে সে পিছ্‌লে বেরিয়ে পড়লো; এবং তার পর এক লাফে মেঝেতে নেমে, দুরন্ত আহ্লাদে ডাকতে ডাকতে সে পাশ কাটিয়ে পালাতে চাইলে।

এর পরে যা ঘটলো, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, সে-ঘটনা এতই জঘন্য যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতেও আমি অনিচ্ছুক। টোবিয়স্ মিণ্ডানিকেল্ খানিকক্ষণ ধ'রে সামনে হেলে, হাত দুটোকে দু পাশে ঝুলিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলো। তার চাপা ঠোঁট আল্‌গা হলো না, চোখের কোটরে তারা-দুটো থেকে থেকে কেমন এক রকম অতিপ্রাকৃত ধরণে কাঁপতে লাগলো। তারপর হঠাৎ পাগলের মতো লাফিয়ে সে জন্তুটাকে জড়িয়ে ধরলে, কি একটা লম্বা চক্‌চকে জিনিস তার হাতের মধ্যে ঝক্‌-মকিয়ে উঠলো, এবং চোখের নিমেষে কাঁধ থেকে বুক পর্য্যন্ত হাঁ হয়ে গিয়ে ইসাও

জমি নিলে। কুকুরটার মুখে একবার একটা শব্দ বেরোলো না, যে-পাশে পড়েছিলো, সেই পাশে শুয়েই সে হাঁপাতে হাঁপাতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিলে।

পর মুহূর্ত্তে তাকে সোফায় শুইয়ে টোবিয়স্ হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসলো, এবং ক্ষতের উপরে একখানা ন্যাক্ড়া চাপতে চাপতে বাধো-বাধো স্বরে বল্‌তে লাগলো: "আহা, বেচারা আমার! বাছা রে! জীবনটাই শোচনীয়, আমাদের দু জনের কপালেই ভোগের অন্ত নেই! লাগছে? হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছি বড্ড লাগছে—ওঃ কী ভয়ানক কষ্টকর তোর ওই চুপ ক'রে শুয়ে থাকা। কিন্তু আমি পাশেই রয়েছি। আমিই তোর যন্ত্রণা ঘোচাবো। আমার সেরা রুমাল দিয়ে—"

কিন্তু ততক্ষণে ইসাও-এর গলা ঘড়ঘড়াতে সুরু করেছিলো। সে জিজ্ঞাসু চোখে তার প্রভুর দিকে একবার তাকালে মাত্র, কিন্তু তার আতুর দৃষ্টিতে অবগতির আলো জ্বল্‌লো না। পলকের মধ্যে সে-নিরপরাধ নয়নের নির্ব্বাক অভিযোগও নিবলো—তারপর একবার পাশমোড়া দিয়েই সে তার ভবলীলায় পূর্ণচ্ছেদ টান্‌লে।

টোবিয়স্ নড়লো না, ইসাও-এর গায়ের উপরে মাথা রেখে বুক-ফাটা কান্না জুড়লে।

[Thomas Mann-এর Tobias Mindernickel-নামক গল্পের অনুবাদ]

কবিতাগুচ্ছ

ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন করো ভয় ? বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারেবারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে।
হৃদয়ে আমার চড়া।

অঙ্গে রাখি না কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
দানপ্রতিদান কখনো হয় না গড়া ?
শশকবিষাণ দূরাদিগন্তে ডাকি ?
আত্মআহুতি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো!
সাগরের পারে নেমেছে লবণজল,
হৃদয়ে আমার চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে—
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

২

হাল্‌কাহাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হাল্‌কাহাওয়ায় হৃদয় দুহাতে ভরো।
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কাহাওয়ায় বোনে
তুষার-মেঘের দুরন্ত আশা মনে।
আমার কামনা ছায়া-মূর্ত্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর-ঘেঁষে।
কামনার তাপে বায়ু কাঁপে থরোথরো
কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার্।
হাল্‌কাহাওয়ায় হৃদয়ে আমার ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দৃপ্ত ঘোড়সওয়ার!

ললাটে তোমার সূর্য্য তিলক হানে।
নিঃশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ দূরে অমরলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
মেরুচূড়া জনহীন
হাল্‌কাহাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

বিষ্ণু দে

বিরোধ

আকাশে মেঘ জমেছে,
তোমার মুখেও, তাই আমার মনে।
আমার অপরাধ আমি এসেছি আজ,
না এসে যেদিন তুমি ডাক দিয়েছিলে।
ব্যর্থ হোল শত চেষ্টা তোমার মুখে জ্যোৎস্না ফোটানোর,
তোমার সেই ছড়ানো নরম হাসি, ফ্লাড-লাইটের আভার মতো।
বিদ্রূপের কাঁটা-বিদ্যুতে বিদ্ধ হলুম ক্ষণে ক্ষণে,
রক্তাক্ত মন পারলে না আর সইতে তোমার নির্দ্দয় অভিযান ;
দেখি, ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসে আমি দাঁড়িয়ে আছি পথে,
ফেরার উপায় নেই, সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ।

এ তুমি কখনই চাও নি,
ব্যথা দিয়ে ব্যথা হয়ত বেশীই পেলে আমার চেয়ে,
নতুন নয় এ অভিজ্ঞতা ;
বারবার তবু এ বিরোধ, তুচ্ছ অকারণে।

অবাক হয়ে ভাবি, কেন এমন হয়।
দিতে আর কী বাকী আছে তোমাকে আমার আমাকে তোমার
দুটি প্রাণী জড়িয়ে গেছি যেন বাইনারি তারা,
একের অভাবে অন্যে নিরাশ্রয়
বিপুল আকাশ ভরা অসংখ্য নক্ষত্রের প্রাচুর্য্যেও।
কোথা থেকে আসে তবে এ ভুল বোঝার ঘূর্ণাবর্ত্ত ?

আমার অতীত ?
অনেক নারীর আসা যাওয়ার জোয়ার ভাটায় যেখানে পড়েছে পলি ?
তার উর্ব্বরতায় আজ ফলেছে

তোমার প্রেমের সোনার ফসল সুপ্রচুর,—
এত তুমি মানো।

তোমার অতীত ?
সূর্য্য কবে ঈর্ষ্যা করে পূর্ব্বগামী শুকতারাকে, সারথি অরুণকে ?
তারা আজ হতজ্যোতি ;
কিন্তু তারা শ্রদ্ধা পায়
জন দি ব্যাপটিষ্ট যেমন ত্রাণকর্ত্তা যিশুখৃষ্টের।

খৃষ্টের জীবনাদর্শ—মরলোকে স্বর্গরাজ্য—
আমার সমস্ত অস্তিত্বের অভীপ্সা।
এর দুর্নিবার আকর্ষণ আমার সত্তাকে দেয় ঐক্য,
ভুলিয়ে দেয় বর্ত্তমানের ক্লেদ,
তুচ্ছ করায় জাগতিক অবিচার,
রঞ্জিত করে ভবিষ্যতের চিত্র তোমার আমার সম্মিলিত জীবনের,
একই তারায় স্থির লক্ষ্য যে মিলনের মূল সূত্র।

এই কি গোড়ার কথা, তোমার তারা বিভিন্ন ?
তোমার দৃষ্টি যে-স্বর্গে তার কেন্দ্রে আছি আমি,
আমার অভীপ্সা নয়।
তবু তোমার আশা ছাড়তে পারি নে,
তোমাকে আমার চাই ;
তুমি নইলে আমার স্বর্গ আমার কাছে মিথ্যে ফাঁকা।
বসে আছি, তোমার তারায় আমার তারায় মিশে যাবে কবে,
যেমন যাবে তোমার দেহ আমার দেহে
একটি পরম সঙ্গমে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

শবরীর নৈরাশ্য

নিভে আসে আলো নয়নের সীমানায়
নভোতল নীল নিষ্ফল নিরাশায় !
নিঃসীম নিঃসঙ্গ নীরব নিশা,—
শিহরে সভয়ে সমীরণ হারাদিশা ।

রোরুদ্যমানা অরুন্ধতীর ব্যথা
সপ্তর্ষির নির্ব্বাক মুখরতা
পম্পার বুকে বিস্তারে প্রতিছবি ।
আজ মনে হয় অলীক স্বপ্ন সবি !

ব্যর্থ অলীক অপার্থিবের তরে
অতন্দ্রযাম যাপন জনম ভরে ।

অমাবস্যার সশরীরী তমসার
অবগুণ্ঠন উন্মোচনের ভার
শ্রান্তা শবরী অশক্তা বহিবারে,—
নয়নাভিরাম ! ক্ষমিয়ো অক্ষমারে !

যুবনাশ্ব

রাজকন্যা

ছেলেটি কিছুই করে না ;
ছাদের একটি ঘরে একলা একলা দিন কাটায় ।
এই ঘরখানি আর সামনে একটু ছাদ,—
এই নিয়ে তার জগৎ ।

বর্ষায় যখন বৃষ্টির ধারা নামে—
ছাদের উপর জলগুলো এঁকে বেঁকে নানা গতিতে ছোটে,
সে চেয়ে চেয়ে তাই দেখে ;

দেখে আর ভাবে।
এলোমেলো ভাবনাগুলো, শরৎকালের হাল্‌কা মেঘের মত,
ঘর আর ছাদটুকুকে ছাড়িয়ে ছুটে চলে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে—
সেখানে সে রাজপুত্তুর।
দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার গুণের কথা ;
কত নদী পর্ব্বত পেরিয়ে দূত আসে কত রাজকন্যার সম্বন্ধ নিয়ে ;
রাজপুত্তুর শোনে তাদের রূপবর্ণনা, আর ভাবে
এর মধ্যে কোন্‌টি ভালো।
পায়ের শব্দে স্বপ্ন টোটে, চাকর এসে চিঠি দেয়,—
রাজকন্যা নয়, গেরস্ত ঘরের শাম্‌লা মেয়ে, সহরে থেকে পড়ে।
লিখেছে দেখা করতে।
বাইরে ঝুপ্ ঝুপ্ করে' বৃষ্টি পড়ে, অকারণে বিধুর হয়ে ওঠে মন।
বিরক্ত হয়ে সিগারেট ধরায়, ভাবে কেন এমন সুন্দর স্বপ্নে
ব্যাঘাত করল।
মুঠির ভেতর কুঁকড়ে ওঠে চিঠিখানা—অনধিকার আগমনে যেন
সঙ্কুচিত।

ফেলে দিতে যায়, আবার কি ভেবে পকেটে রাখে।
সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে ওঠে,
ধোঁয়ার ভেতর ঝাপসা দেখা যায় কার মুখ ঃ
এই তো সেই রাজকন্যা, হাসিতে যার মাণিক ঝরে।
মনটা খুসী হয়ে ওঠে।

কিন্তু না এ তো রাজকন্যা নয়—এ তো সেই,
যার চিঠি এসে এমন করে' ভেঙে দিল তা'র স্বপ্ন।
বিরক্ত হ'তে চায়—
কিন্তু মনটা কই রাগ তো করে না। বুঝতে পারে না।
আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরাতে যায়,
আরাম করে' বসে।

—হঠাৎ উঠে বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে নীচে নেমে যায়।
বাড়ীর লোকের প্রশ্নসূচক দৃষ্টি এড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে ওঠে ট্রামে
রাজকন্যার সন্ধানে !

সুমন্ত্র মহলানবিশ

সম্পাদকী

এই বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর পেরোলেন। সারা পৃথিবীর সকল কাব্যামোদীর সঙ্গে আমরাও তাঁর দীর্ঘ আয়ু আর অটুট স্বাস্থ্য কামনা করি। কিন্তু তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অত অল্পে চুকবে না। কারণ রসিকের অবসরবিনোদনের জন্যে একাধিক অনবদ্য কবিতা লিখেই তিনি বাঙালীকে কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধেন নি, তাঁর সেবা ও সহায়তায় বঙ্গভারতী আজ জাত্যাভিমানের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ডিঙিয়ে সার্ব্বজনীন সাহিত্যের সভাসীন। উপরন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হলেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ব্ববিধ বিভাগেই তাঁর সিদ্ধি যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান অসংখ্য। সেইজন্যেই স্বকীয় প্রতিভার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধিসমাজই উজ্জ্বল নয়, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও সে-উপচ্ছায়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও হাল আমলে আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ সাহিত্যেরও মূলধন। অবশ্য মানুষের মর্ম্মানুসন্ধানে আজকাল বিদেশী পরকলাই আমাদের মুখ্য সম্বল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আবালবৃদ্ধ বাঙালীর পরিচয় এখনো নিশ্চয় রৈবিক উপক্রমণিকার নিয়ম মানে; এবং রবীন্দ্রনাথের শালীন মাত্রাজ্ঞান বর্ত্তমান প্রগতিবিলাসীদের চোখে অস্বাভাবিক ঠেকলেও, তাঁর উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই ইদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যপদেশ।

সুতরাং অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বগামী মনীষীরা যে-সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন মাত্র, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশের কার্য্যক্রমে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই আবহেরই বুদ্বুদ, তাই তার গতি-অগতির বিচার অথবা উপকার-অনুপকারের আলোচনা আমাদের পক্ষে শুধু অশোভন নয়, সুদুষ্করও। কারণ আধিজৈবিক শ্রেয়োবোধ তো দূরের কথা, সাম্প্রতিক বিজ্ঞান আনুপূর্ব্বিক প্রবৃত্তিতেও আস্থা হারিয়েছে; সমাজতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি যন্ত্রবাদে না-পৌছলেও, মানুষমাত্রেই যে

অভ্যাসের দাস, তাতে ভাবুকদের আর সন্দেহ নেই ; এবং তথাকথিত তুলামূল্য যেকালে অনুশীলনেরই নামান্তর, তখন আজকের বাংলায় জন্মে রবীন্দ্রপ্রতিভার যাচাই করা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতোই নিষ্ফল ও হাস্যকর।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ; এবং সম্প্রতি কোনো এক আধুনিক বাঙালী কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা করেছেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে-সমীকরণ উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা। কারণ সাধারণত অপাঠ্য হলেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত অন্ততপক্ষে প্রাক্‌মোগল যুগে ; এবং প্রাদেশিকতার প্রকোপে এই অঞ্চল যদিও সর্ব্বদাই আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভুক্ত থেকেছে, তবু অনার্য্য আর অসভ্য চিরদিনই ভিন্নার্থবাচক। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীর উৎপাদক বলতে আমার ইতিহাসবোধে বাধে ; এবং যখন অলঙ্কারনির্ম্মাণের তাগিদে আমিও তাঁর প্রতিরূপ খুঁজি, তখন আমার মানসচক্ষে গোমুখী গিরিরাজের চিরন্তন চিত্র ভেসে আসে না, ফুটে ওঠে কোনো কাল্পনিক শৈল-শৃঙ্গের অবচ্ছিন্ন ছবি যা হয়তো নগাধিরাজের মতোই সমুচ্চ ও শাশ্বত, কিন্তু যার সঙ্গে পারিপর্শ্বিক সমভূমির সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক, গঙ্গাকে যে জটার জালে জড়িয়ে রাখে নি, পায়ের আঘাতে নূতন পথে চালিয়েছে।

কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন একা এরিষ্টটল্‌-এর ভগবান, তিনি ছাড়া আর সকলেই পরজীবী, তাঁকে বাদ দিলে আর কারো পক্ষেই নিছক আত্মচিন্তায় কালাতিপাত সম্ভব নয়। সেইজন্যেই নিঃসম্পর্ক পাহাড়ের নিচেও পদাশ্রিত স্রোতস্বিনীর স্বেদবিন্দু জমে, প্রতিবেশী শস্পে তার সানুদেশ জড়ায়, এবং যে-অনাবাসিক উৎপাত তার চারদিকে ধ্বংস ছড়ায়, তাতেই ঘটে তার বৃদ্ধি। অতএব যাঁরা রৈবিক কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারাকে অন্তঃসলিলা ব'লে ভাবেন, তাঁদের অনুমান যেমন নির্ভুল, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্যে যাঁরা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থী মতিগতির প্রতিবিম্ব দেখেন, তাঁরাও নিতান্ত নির্ব্বোধ নন ; এবং উভয় সিদ্ধান্তই শুধু আংশিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনো দলই তাঁর সমগ্র সত্তার সাক্ষাৎ পান নি। কিন্তু সমগ্রতা যতই অসম্পৃক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে অতিমর্ত্ত্যের সম্বন্ধ নেই ; এবং রৈবিক ব্যক্তিস্বরূপ যে-ধাতুসমূহে গঠিত, তার প্রত্যেকটিই যদিচ তন্মাত্র-পদবাচ্য, তবু উপাদানের গুণে তিনি আমাদের থেকে পৃথক নন, পানের জোরেই তিনি সাধারণ ভঙ্গুরতা কাটিয়েছেন। ফলত কালস্রোতের বুদ্বুদ হয়েও আমাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের

মূল্যবিচার একেবারে অসাধ্য নয়, শুধু দুঃসাধ্য ; কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা প্রাক্তন সাদৃশ্য তো আছেই, এমন-কি আধুনিক দার্শনিকদের মতে ভাব ও অভাব যেহেতু একই সত্যের এ-দিক আর ও-দিক, তাই আমাদের স্বভাবে যা নেই, তা জানলেই আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝবো।

বলাই বাহুল্য যে উল্লিখিত উপমাসঙ্করের সঙ্গে বৈদান্তিক নেতিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। রহস্যঘনতা ব্যক্তিস্বরূপের প্রধান লক্ষণ বটে, কিন্তু সেই কৈবল্যই যে সকল স্বতোবিরোধের তীর্থসঙ্গম, এমন অন্যায় মীমাংসায় আমি অবিশ্বাসী। অতএব ভণিতা বাদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে প্রামাণ্যস্তাবক প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন ; এবং এই আত্মনিষ্ঠা যেমন তাঁকে জাতিচ্যুত করেছিলো, তেমনি এরই জোরে তিনি স্থান পেয়েছিলেন আন্তর্জ্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে। অবশ্য উক্ত স্বাধিকারবোধ থাকলেই মহাকবি হওয়া যায় না, তার জন্যে আরো পাঁচটা গুণের সঙ্গে একটা নিরুপাধিক ঐশী ক্ষমতাও অপরিহার্য্য। উপরন্তু রাসিন্ থেকে ল্যাণ্ডর পর্য্যন্ত কাব্যরচয়িতাদের ধ্রুপদী উৎকর্ষে যার আস্থা আছে, তার কাছে পরোক্ষ অনুভূতি শুধু মহার্ঘ্য নয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হয়তো প্রত্যক্ষকে সাধ্যপক্ষে এড়িয়েই চলে। কিন্তু অতিবৃদ্ধি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব'লেই কূপমণ্ডূকের অনীহা প্রশংসনীয় নয় ; এবং বিদেশী বিগ্রহে স্বদেশী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠাই যদিচ মাইকেলী রূপদক্ষতার নিরুপম নিদর্শন, তবু আলঙ্কারিকের উপদেশমতো নৈষধ রচনা অথবা ধারাবাহিক মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা প্রকৃত ঐতিহ্যের পরিপোষক কিনা সন্দেহ।

কারণ ঐতিহ্য আর প্রথার মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বৈষম্যই হয়তো বেশি ; এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন জাতির নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারে, তেমনি জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্ম্মে। কিন্তু নাৎসী মতবাদে শ্রদ্ধা হারিয়েও জাতিরূপের উপলব্ধি যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু অন্তত রোজর বেকন্-এর যুগ থেকে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎকারে দার্শনিকমাত্রেই বৈফল্য কুড়িয়েছেন। অবশ্য তাহলেও প্রত্যয় হিসাবে বিশ্বমানবের মূল্য প্রায় অপরিমেয় ; এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানায় তার সাক্ষ্য না-মিল্‌লেও, কার্য্যত স্বয়ং সোহংবাদী সুদ্ধ এই অনেকান্ত মানবজাতির প্রকৃতগত সাম্যে নিঃসংশয়। সেইজন্যেই পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে নির্ব্বিকার অধিকারভেদে বেড়ে উঠেও আমরা এখনো ভাবি যে অনুরূপ অবস্থায় বৈচিত্র্যের

বিলুপ্তি ঘটে, এবং শিক্ষা ও প্রতিবন্ধের তারতম্যেই বাঘ-ছাগল এক ঘাটে জল খায় না। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে গতানুগতিক প্রথাই শ্রেণিসংঘর্ষের জনক ও প্রাদেশিকতার উদ্যোক্তা; এবং মানুষ যেখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সহজ প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব স্বার্থ ও মৌল পুরুষকার সংঘসঙ্কীর্ণ সমাজের তত্ত্বাবধানে সঁপে দেয় নি, সেখানে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল নিঃসার মরীচিকা নয়, সেখানে সদ্ভাব স্বাভাবিক ও শাসন অনাবশ্যক, সেখানে চিরাচার মৃত কিন্তু ঐতিহ্য প্রবৃদ্ধ। কারণ ভূপঞ্জরবিদ্যার বিচারে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অবর্ত্তমান; চামড়ার রঙে, ভাষার তাগিদে, ভৌগোলিক অসুবিধায় আমরা আপাতত যতই বিবাদ বাধাই না কেন, তবু আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারই এক ও অভিন্ন; এবং সেই বিশ্বস্ত ও বহু পরীক্ষিত অধিকর্ম্মার উপরে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের ভার চাপালে, আমাদের সংসারযাত্রাই শুধু অবাধে চলবে না, ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতও হয়তো নির্ব্বিকল্পের নির্দ্দেশে নির্দ্বন্দ্ব হবে। সম্ভবত সেইজন্যেই ব্যক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বমানবের উদ্বোধন কেবল যুক্তিযুক্ত নয়, এমন-কি আবশ্যিকও বটে।

দুঃখের বিষয়, ভূতত্ত্ব নূতন বিজ্ঞান, এবং এ-দেশে সভ্য মানুষের বাস অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধ'রে। উপরন্তু ন্যূনকল্পে তিন হাজার বৎসর যাবৎ পরদেশী বিজেতাপরম্পরার পদান্তে প'ড়ে আদিম ভারতবর্ষ অনবরত স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছে। এ-অবস্থায়, এই রাজনৈতিক নিগ্রহের চাপে প্রস্তরিত প্রথার অপর্য্যাপ্তি প্রত্যাশিত ও অনিবার্য্য; এবং বাঙালী কবিকিশোরদের কাছে সত্যটা যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক, তবু সাহিত্য যেকালে অবিকল জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র, তখন এখানকার সাহিত্যেও আমাদের মজ্জাগত জাড্য অন্তঃপ্রবিষ্ট। যে-জাতি একদিন কোমর বেঁধে নিরুক্তের নির্দ্দেশ-অনুসারে একটা সাধু ভাষা বানিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণস্বরূপ অতগুলো বিরাট কাব্য লিখে গেছে, আধুনিক বাঙালী হয়তো তাদের বংশধর নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃতেরই উঞ্ছজীবী, এবং প্রাক্‌খৃষ্টীয় সংস্কৃত কবিদের মতোই বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপজীব্যও উদ্‌বৃত্ত। হয়তো সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় লেখকের এত দিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারিনি; তাঁর স্বাবলম্বনের প্রতিযোগিতা না ক'রে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অগণ্য

শাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেছে। তাই 'মানসী'র অপূর্ব্বতা আর ইদানীন্তন পাঠকের নজরে পড়ে না, 'গীতাঞ্জলি'র অতুল ঐশ্বর্য্য আজ আট্‌পৌরে আসবাবপত্রের সামিল, এবং সম্ভবত 'বলাকা'র পুনরাবৃত্তিতে থ'কে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকেই সম্প্রতি রৈবিক গদ্য-কবিতার মক্সয় হাত পাকাচ্ছি। আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই, কাজেই বল্‌তে পারি না এই কীর্ত্তনের জন্মভূমিতে রাগ-রাগিণীর শুচিবায়ু প্রশ্রয় পেয়েছে কিনা; কিন্তু আমাদের কাব্যপ্রচেষ্টা যে চিরকাল বর্ণাশ্রমের সম্ভ্রম বাঁচিয়েই পথ চলেছে, তাতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাষ্যপ্রণয়নই হিন্দুস্থানের সনাতন অভ্যাস; এবং সুদূরপরাহত ব'লে বেদ-বেদান্তের টীকা-টিপ্পনী আর আমাদের টানে না বটে, কিন্তু যুগধর্ম্মের তাগিদেও নিজস্ব চোখ-কানের ব্যবহার আমরা আজ পর্য্যন্ত শিখিনি।

সৌভাগ্যক্রমে কতকটা অবস্থাগতিকে এবং অংশত রুসো-পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য লেখকদের নাটকী আত্মোপলব্ধির দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথ আবাল্য নিজেকে ব্রাত্য হিসাবেই দেখে এসেছেন। তাই তিনি কোনদিন পদাঙ্কপরিক্রমায় স্থিতি খুঁজে পান নি, এমন-কি স্বরচিত রীতিকে মুদ্রাদোষে প্রতিষ্ঠা দিতেও তাঁর রূপকারী বিবেক আপত্তি তুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুই আত্মসচেতন পুরুষ, তিনি অচেতন মানুষ নন; এবং উৎকর্ণ উন্মুখিতাই যেকালে রৈবিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহের বিশেষ গুণ, তখন তাঁর মনে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত সম্ভাবনীয়। কিন্তু তাহলেও তাঁর ইচ্ছা-বা অনিচ্ছা-কৃত ঋণপরিগ্রহ দৈন্যবিরহিত ও বিলাসবর্জ্জিত, তাতে অকর্ম্মণ্যতার কোনো আভাস নেই, তাঁর হাতচিঠির আষ্টেপৃষ্ঠে আন্তরিক প্রয়োজনের সুস্পষ্ট সাক্ষর বিদ্যমান। ফলত গদ্য-কবিতারূপ তাঁর আধুনিকতম কাব্যপ্রকরণের অন্তঃরালে সম্প্রতিবেত্তার বাক্‌সর্ব্বস্ব ভূত রাসা বাঁধেনি, পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপের লীলাবৈচিত্র্যেই তা উন্মুখর। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও কিছু সব সময়ে গদ্যচ্ছন্দের সদ্ব্যবহার করেন না, মাঝে মাঝে এমন বিষয়কে এই নববিধান মানান্, যা 'পূরবী'র—এমন কি 'মহুয়া'র অলঙ্কারবাহুল্যেই বেশি আরাম পেতো। কিন্তু এই রকম অপপ্রয়োগের মধ্যেও স্বেচ্ছাচার বা শৈথিল্যের সূচনা নেই, তাঁর স্বাধীন মনের অবশ্যম্ভাবী বিকাশই সেখানে স্ফূর্ত্ত। পারিবারিক নির্ব্বন্ধে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিলো যে জগৎ আনন্দময় এবং চূর্ণমর্ত্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিরাজমান। দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় এই অন্ধ

বিশ্বাসের অপসারণই বোধহয় রবীন্দ্রসাধনার মূল কথা। সেইজন্যেই এই স্বভাব-কবির নিসর্গনিরত কবিতাতে সুদ্ধ মানুষী মর্য্যাদার যে-পরিণতি মিলে, আজকালকার লোকায়তিক সাহিত্যের সমুদয় উচ্ছ্বাসেও তার তুলনা নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথ এখনো যদিচ রূপের ধ্যানে পূর্ব্ববৎ তন্ময়, তবু সুন্দর সম্বন্ধে তাঁর মোহ ঘুচেছে; তিনি বুঝেছেন যে সুন্দরের মতো কুৎসিৎও মানুষেরই সৃষ্টি, সুতরাং পারমার্থিক নিকষে উভয়ের মূল্যই সমান। এইখানেই তাঁর পদ্যবৈরাগ্যের সার্থকতা; এবং ছন্দ-মিলের চুৎমার্গে যে-বীভৎসতার প্রবেশ স্বভাবতই ব্যাহত, তার সঙ্গে মাধুর্য্যের সন্ধি-স্থাপন সম্পাদ্য শুধু গদ্য-কাব্যের নৈরাজ্যে। বলাই বাহুল্য যাঁর মনীষা এই দুরূহ নিষ্পত্তির সম্মুখীন, তিনি সংস্কারমুক্ত বটে, কিন্তু ঐতিহ্যভ্রষ্ট নন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠাই তাঁকে নিরবধি প্রমিতির পুনরাবিষ্কারে নামিয়েছে, এবং জাতীয় অনুবৃত্তির প্রতিকূল হলেও তাঁর স্বকীয়তা মনুষ্যধর্ম্মেরই পুনরুক্তি।

পুস্তকপরিচয়

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর অত্যধিক প্রসার তাঁর বহুবিচিত্র গদ্যগ্রন্থাবলীকে কিয়ৎ পরিমাণে আড়াল করেছে। তাঁকে আমাদের দেশ জানে প্রধানতঃ কবি বলে—কিন্তু গয়টে বা ভিক্টর হিউগোর মতো রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বড় না পদ্যে বড় তার সমাধান হওয়া কঠিন। তাঁর গদ্য-গ্রন্থাবলীর কিয়দংশ, তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর অনুপূরক সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি ও মনীষার পরিচায়ক প্রবন্ধসাহিত্যেরও যে একটা অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের দাবী আছে, এ কথা তেমন ভাবে আমরা প্রণিধান করিনি। কৈশোরে লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে সুরু ক'রে 'রাজা প্রজা', 'শিক্ষা', 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্র পূজা', জীবন স্মৃতি', 'শান্তিনিকেতন', 'লিপিকা', 'ছিন্নপত্র' 'রাশিয়ার চিঠি' পর্য্যন্ত কত অসংখ্য গদ্য গ্রন্থই না তিনি লিখেছেন—এবং বিষয়ের দিক থেকে, দৃষ্টি-ভঙ্গিমার দিক থেকে, প্রকাশ-ভঙ্গীর দিক থেকে তাদের নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব কত বেশী! গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কাব্য যদি তিনি আদৌ না লিখতেন, কেবল মাত্র এই গ্রন্থাবলীই তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকের আসন দিত! তিনি যে রাস্কিন্, এমার্স'ন্, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির চেয়ে বড় গদ্য লেখক সে বিষয়ে ত আর সন্দেহ নেই।

কাব্যে যাঁর উৎকর্ষ গদ্যে তাঁর হাত চলে না এমনি একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা গিয়ে থাকে। কিন্তু এর চেয়ে অমূলক কথা আর হতে পারে না। মিল্টনের Areopagitica অবশ্য পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডী কোন দিন অতিক্রম করবে না, কিন্তু শেলীর Defence of Poetry বা কোল্‌রিজের Biographia Literaria রীতিমতো সাহিত্য! হাল আমলের সুইনবার্ণ বা লরেন্সের গদ্যও কোন মতেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নয়। প্রতিভা যাঁর আছে, তিনি গদ্যেই লিখুন আর পদ্যেই লিখুন, কৃতিত্ব তাঁর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। কারণ গদ্য বা পদ্য হচ্ছে রীতি মাত্র—ওটা স্বকীয় রুচি অনুযায়ী অনুশীলনের বস্তু। যিনি দু'দিকেই সমান ভাবে হস্ত-চালনা করেছেন তাঁর হাতে দুইএরই উৎকর্ষ স্বাভাবিক। মাইকেল মধুসূদন গদ্য লিখতে গিয়ে কৃতকার্য্য হন্‌নি, তার কারণ শেষ জীবনে তিনি এ বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন—কিন্তু নবীন সেন বা দ্বিজেন্দ্রলাল চমৎকার গদ্য লিখতেন। আধুনিক কবিদের মধ্যে কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার বা যতীন্দ্র সেনগুপ্তের গদ্য রচনায় বেশ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অবশ্য এঁরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নন্—আমরা

দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি মাত্র। অসাধারণ শক্তিমান রবীন্দ্রনাথের তুলনা দুর্লভ, সে গদ্যেই হ'ক আর পদ্যেই হ'ক—তিনি কারো আদর্শও নেন্‌নি, কোন বাঁধা পথেও হাঁটেননি। তাঁর সৃজনী মন তাঁর প্রতিভাকে নিত্য নূতন উদ্ভাবনের পথে চালিয়েছে—গদ্য তারই একটা পর্য্যায় মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সুরু হয় 'ভারতী'র আমলে—তখন সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। মেঘনাদ বধ কাব্যকে উপলক্ষ ক'রে তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য সুরু হয় এবং তারই পরবর্ত্তী পরিণতি হচ্ছে 'শকুন্তলা', 'রামায়ণ', 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'কাদম্বরী', 'বঙ্কিমচন্দ্র'! 'সাধনা' ও 'বঙ্গ-দর্শন' দিয়ে তাঁর গদ্য রচনার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—তখন সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম—নানা দিককার অসংখ্য সমস্যাকে আশ্রয় করে তাঁর এই পর্য্যায়ের রচনা—'শিক্ষার বাহন', স্বদেশী সমাজ', 'বিলাসের ফাঁস' প্রভৃতি প্রসঙ্গাত্মক রচনার জন্ম এই সময়ে। প্রথম পর্য্যায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের তফাৎ হচ্ছে প্রকাশ-ভঙ্গীতে—গাঢ়বদ্ধ তালমান-সুসঙ্গত অলঙ্কারাঢ্য সংস্কৃতানুগ গদ্যে 'কেকাধ্বনি', 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রভৃতি লেখা কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। আবার শাণিত তরবারির মতো উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ সতেজ ভাষায় পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ-গুলিকে লেখাও তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এমন সাদৃশ্য আরোপ ও উপমা প্রয়োগের কৌশল, এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও বক্রোক্তির কায়দা, অন্যত্র দুর্লভ! যুক্তির ফাঁক হয়ত অনেক স্থানে বেরুতে পারে, কিন্তু উক্তির বিশেষত্ব বিস্ময়কর।

তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ে। তিনি আলোচ্য বিষয়কে আশ্রয় করে দাঁড়ি ধ'রে হিসেবী লোকের মতো চুলচেরা বিচার করেন না—ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক প্রসঙ্গের সমাবেশ করে, শেষ কালে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন না। তাঁর সমালোচনা সম্যক্ আলোচনা নয়—তা অবলম্বিত বিষয়ের ওপর নূতন সৌন্দর্য্যের আরোপ, নূতন সৃষ্টি। মূলে তা ছিল কি না ছিল সে প্রশ্ন হয়ে পড়ে অপ্রাসঙ্গিক, তিনি যা করছেন তাতেই মনপ্রাণ হয়ে যায় মুগ্ধ। একে বলা যেতে পারে রসাত্মক সমালোচনা!

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের তৃতীয় পর্য্যায়ের সূচনা 'সবুজপত্রে'—তখন তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ! পূর্ব্বের সেই কাব্যধর্ম্মী রসাঢ্য রচনা-রীতিকে পরিহার ক'রে তিনি অবলম্বন করলেন তীক্ষ্ণ স্পষ্ট কথ্য ভাষা—বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্য্য-বহুল নব-যৌবন রূপান্তরিত হ'ল পৌরুষ-পুষ্ট মধ্য বয়সে! রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গদ্য-সাহিত্যে তীব্রতা ও তিক্ততার আমেজ আছে—কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গীণ প্রাণবন্ত গদ্য তিনি ছাড়া আর কে সৃষ্টি করতে পারত! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কবির এই তিন পর্য্যায়ের গদ্যের কোন পর্য্যায়ই পরবর্ত্তী কালের লেখকরা কেউ কিয়দংশেও আয়ত্ত করতে পারেন নি। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্র সুন্দর, প্রিয়নাথ সেন ও বলেন্দ্র ঠাকুরে প্রথম দুই পর্য্যায়ের অনুসরণ দেখতে পাই, আর তৃতীয় পর্য্যায়ের আভাস পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত প্রভৃতির রচনা-ভঙ্গীতে। অবশ্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্র চমৎকার গদ্য-ভঙ্গীর অবতারণা করেছেন—কিন্তু আমরা এখানে প্রবন্ধের কথা বলছি।

গদ্যে পদ্যে মূলতঃ প্রভেদ কোনখানে, আত্মায় না দেহে? যথেষ্ট সুরেলা কাব্য-তন্ত্রীয় গদ্য আছে, আবার পরিপূর্ণ গদ্যাত্মক কবিতারও অভাব নেই। তবে মোটের ওপর এইটুকু বলা যেতে পারে যে কাব্যের পারম্পর্য্য ভাবাবেগের দিক থেকে, আর গদ্যের পারম্পর্য্য যুক্তি-শৃঙ্খলার দিক থেকে—কিন্তু কেন্দ্র বিশেষে পরস্পর মিশ্রণও যেমন সম্ভব, তেমনি প্রতি যুগে সাহিত্যের মাপকাঠিও বদলানো সম্ভব। Lyrical Ballads-এর ভুমিকায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এ বিবাদের এক ধরণের সমাধান করে ফেলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' লিখে আর এক ধরণে এর সমাধান করেছেন। বস্তুতঃ গদ্য বললেই যে কাটাছাঁটা কাঠখোট্টা কাজের কথা—যা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে লাগে—বোঝায়, রবীন্দ্রনাথ তা কখনো লেখেন নি। অর্থাৎ পাঠকের গোচরে বক্তব্যকে পেশ করা মাত্রই তাঁর লক্ষ্য নয়—তাঁর সাহিত্যে ভঙ্গীটাই সবার বড় জিনিষ! এটা তাঁর হাতে সর্ব্বদাই রূপে রসে অভিনব…তারই গুণে তাঁর হাতে সাময়িক প্রসঙ্গও যেমন চিরন্তন শিল্প-সৃষ্টিতে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি গদ্যের আকারে খাঁটি কাব্যও বাঁধা পড়ে যায়। তাঁর আধুনিক গদ্য কবিতা এই গদ্য ও পদ্য দুই-এর মাঝখানকার মিলন-সেতু—কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

নিছক কাজের কথা পূর্ণ Didactic লেখার প্রাত্যহিক মূল্য কিছু আছে সন্দেহ নেই—কিন্তু তার সাহিত্যিক দাবী নেই। পক্ষান্তরে অতি তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় সাধারণ কোন জিনিষকে নিয়েও সাহিত্য করা যায়—ল্যাম্ব্‌ তার দৃষ্টান্ত-স্থল। আমাদের দেশের কাজের কথা ভরা গদ্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এই হাল্‌কা সুরটিকে প্রবেশ করান্—'পায়ে চলার পথ', 'মেঘদূত', 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' প্রভৃতি লিখে। 'কাগজ ফেলার টুক্‌রী', 'গ্যাস্‌পোষ্ট্', নিয়ে তিনি লেখেন নি কোন দিন—কারণ এ যুগের ঐতিহ্যকে তিনি স্বীকার করেন না—কিন্তু আমরা যাতে লিখ্‌তে পারি এমন ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে! এই প্রসঙ্গে 'ব্যঙ্গ-কৌতুকের' উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে।

আর একটু ব'ল্‌লেই হ'য়ে যায়—তাঁর পত্র-সাহিত্য! ওগুলো নৈর্ব্যক্তিক। টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি, ছোটখাটো ইঙ্গিত, ছোটখাটো সুর…এই নিয়েই ওদের জন্ম। বাইরন বা শেলীর চিঠির মতো উন্মাদনা নেই ওতে—কীটস্‌এর চিঠির মতো বিহ্বলতাও নেই। সুন্দর ছোট ছোট হাল্‌কা সুরের কবিতার মতো এরা! 'রাশিয়ার চিঠি' প্রবন্ধ…কিন্তু 'ছিন্নপত্র' কবিতা! এই পত্রাত্মক প্রবন্ধের সূত্রপাত 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে'—এই বইটি ইদানীং দুর্ল্লভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাবলীর অগ্রদূত এই বইখানি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এর ভেতর অপরিণত মনের ছাপ আছে নিঃসন্দেহ—কিন্তু তা অপরিমিত নয়। আর সে মন অন্য কারুর নয়, রবীন্দ্রনাথের। আশ্চর্য্য এই যে মধ্য বয়সে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-রচনায় ক্ল্যাসিকাল্ ভঙ্গীর পক্ষপাতী হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু একেবারে প্রথম বইয়ে তিনি আধুনিকতম কথ্যভাষার ধরণটিকেই অনুসরণ ক'রেছিলেন। এর ভাষা যেমন ঝর্‌ঝরে, তেমনি স্বচ্ছন্দ!

পঞ্চভূত ও বিচিত্র প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ সমস্ত কথা কিয়ৎ পরিমাণ অবান্তর ঠেক্‌তে পারে। কিন্তু আমার প্রতিপাদ্য বিষয় আমি আগেই ব'লেছি। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে একটা আলোচনা করার সুযোগ নিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। আর এর উপযোগিতাও আছে, কারণ এ সম্বন্ধে এখনো বিশেষ ভাবে আলোচনা সুরু হয় নি। তা ছাড়া পঞ্চভূত আগে যে আকারে ছিল, তখন এর একটা বিশেষ রূপ ছিল—এখন এও আর একখানা বিচিত্র প্রবন্ধই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—নানা বিষয়ক প্রবন্ধই এতে সংগৃহীত হ'য়েছে, যেমন বিচিত্র প্রবন্ধে হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল শ্রেণীর প্রবন্ধের নমুনাই এই দুটি বইয়ে পাওয়া যায়। তবে সময়ানুক্রমে গোড়া থেকে অধুনাতন কাল পর্য্যন্তকার লেখা থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে এতে দেওয়া হয় নি—কারণ নূতন সংস্করণে এদের মধ্যে অনেক ওলটপালট করা হ'লেও বই দুটি আসলে পুরাতন। আর পুরাতন ব'লেই এদের অবলম্বিত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন কম। যদিও কবি 'শব্দতত্ত্ব' পর্য্যন্ত লিখেছেন, তবু তিনি যে পদার্থ-বিজ্ঞান বা রসায়ন-শাস্ত্র বোঝার জন্যে পঞ্চভূত লেখেন নি, এ কথা প্রায় সবাই জানে। আর বিচিত্র প্রবন্ধের পরিচয়ের পক্ষে তার নামই ত যথেষ্ট—যতদূর মনে হয় পত্রাংশগুলো এর সঙ্গে নূতন সংযোজিত হ'য়েছে—এই পত্রগুলো রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম গদ্য রচনার নিদর্শন।

পঞ্চভূতে রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যদৃষ্টি সম্বন্ধে রূপাকারে যে প্রবন্ধগুলি স্থান পেয়েছে, সেইগুলিই আগে ছিল পঞ্চভূতের উপাদান—এখন এদের সঙ্গে নরনারী, পল্লীগ্রাম, ভদ্রতার আদর্শ প্রভৃতি আরো কয়েকটা নূতন প্রবন্ধের সংযোগ করা হয়েছে। গোড়ার 'পরিচয়' প্রবন্ধে সমস্ত নিবন্ধের মূল সূত্রটিকে কবি পরিস্ফুট ক'রে দিয়েছেন—যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠক, তাঁদের পক্ষে কবির গ্রন্থাবলীকে অনুশীলন করার ধ্রুব পন্থা হিসাবে এটি যেমন খুব মূল্যবান, তেমনি নির্ব্বিশেষে রসতত্ত্ব উপলব্ধির পক্ষেও এর কার্য্যকারিতা কম নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের কবি, আনন্দের কবি—তাঁর রসতত্ত্বও তাই একান্ত ভাবে মর্ম্মধর্ম্মী। আধুনিক প্রজ্ঞাতন্ত্রকে তিনি বহুবার আঘাত ক'রেছেন, এই প্রবন্ধগুলির ভেতরও তার আভাস আছে।

বিচিত্র প্রবন্ধের বেশীর ভাগ রচনাই চিত্রজাতীয়—ছোটনাগপুর, সরোজিনী প্রয়াণ, আষাঢ় ইত্যাদি। কয়েকটি কাব্য-গোত্রীয় রচনাও আছে—কেকাধ্বনি তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এর ভেতর যে গুরুগম্ভীর শব্দ-মন্ত্র আছে, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। কয়েকটা হাল্‌কা লেখাও এতে স্থান পেয়েছে—অসম্ভব কথা, পনেরো আনা ইত্যাদি। অর্থাৎ এক কথায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-বৈচিত্র্যকে বিচিত্র প্রবন্ধ যথাসম্ভব বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছে।

দু'খানি বইয়েরই নূতন সংস্করণ হ'ল। এত দিন যে এদের বহু সংস্করণ হয় নি, তার কারণ এ বই দুটির পাঠক-সংখ্যা দেশে এখনো আশাতীত রকম কম। গোয়েন্দা কাহিনী ছাড়া আর সকল শ্রেণীর বইয়েরই পাঠক এ দেশে কম। দুর্ভাগ্য আমাদের, রবীন্দ্রনাথের নয়! এই শ্রেণীর

পাঠকরাই ব'লে থাকেন রবীন্দ্রনাথের গদ্যে ভল্‌টেয়ারের মতো পৌরুষ নেই—অবশ্য ভল্‌টেয়ার বা রবীন্দ্রনাথ কারুকেই না পড়ে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

A History of Europe—by H. A. L. Fisher. (Eyre and Spottiswoode). Volumes I. II. and III.

সুদূর প্রস্তর-যুগের কথা বাদ দিলেও ইয়োরোপের ইতিহাস যে অন্ততঃ গ্রীক সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল, একথা অস্বীকার করা চলে না; এবং সেই সময় ও আমাদের আধুনিক কালের মধ্যে ব্যবধান তিন হাজার বছরের কম নয়। এই ত্রিশ শতাব্দীর কাহিনী বার শ' পাতায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা সাধারণ লেখকের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাহসিক, বিশেষতঃ যখন সে লেখার উদ্দেশ্য কোনও সভ্যতার স্বরূপ বর্ণনা নয়, যখন এক সমগ্র মহাদেশের বহুযুগব্যাপী পোলিটিকাল ঘটনাবর্ত্তের পরিচয় ও সংক্ষিপ্তসার সে গ্রন্থের বিষয়বস্তু। ইয়োরোপের অতীত সম্বন্ধে আবার এত জ্ঞান সঞ্চিত রয়েছে এবং এত পণ্ডিত তার নানা অংশের বিবরণ স্বকীয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত করেছেন যে স্বল্পায়তনের ভিতর তার সম্যক আলোচনা দুঃসাধ্য। কিন্তু হার্ব্বার্ট ফিশার সামান্য ঐতিহাসিক নন—বহু পূর্ব্বেই তাঁর খ্যাতি বোনাপার্টিজম্ প্রভৃতি বই লেখার ফলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁর নাম সকলেরই সুপরিচিত, তাঁকে আধুনিক ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদের গুরুস্থানীয় বলা যেতে পারে। বৃদ্ধবয়সেও তিনি যে এক দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করলেন এর জন্য সকলেই তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাবে। বিশেষতঃ যারা অক্সফোর্ড বিদ্যাপীঠের সঙ্গে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট তারা অধ্যাপক ফিশারের অধুনাতম গ্রন্থ প্রকাশে আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করতে বাধ্য। লয়েড জর্জ্জ যখন তাঁর মন্ত্রিসভায় বিশেষজ্ঞদের সাদরে আসন দিয়েছিলেন তখন ফিশারই শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন এবং শিক্ষা বিষয়ে তাঁর ধারণার কিছু কিছু আইনের আকারে তখন দেশে বিস্তারলাভও করেছিল। কিন্তু অক্সফোর্ডের সকলে তাঁকে নিউ কলেজের অধ্যক্ষরূপেই ভাবতে ভালবাসে, সেখানেই বহুকাল তাঁর স্মৃতি দীপ্যমান থাকবে, যেমন জাওয়েটের নাম এখন বেলিয়ল্ কলেজের সঙ্গেই সংযুক্ত হয়ে গেছে!

তিন খণ্ডে সমাপ্ত ফিশারের এই গ্রন্থ ইংরাজি সাহিত্যের একটা অভাব পূর্ণ করল—ঠিক এই আয়তনের ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্ত এতদিন ছিল না। এই কয়েক মাসের মধ্যেই তাই ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত সমাজ বইখানির সমাদর করেছে। এ দেশে ইতিহাসভক্ত পাঠকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলেই আমার ধারণা—তাদের মধ্যে আবার অনেকেই হয়ত বিদেশ সম্বন্ধে উদাসীন। তবু আমাদের দেশেও অন্ততঃ দুশ্রেণীর লোক এ বই পড়লে উপকৃত মনে করবে। ইতিহাস পড়ানো যাঁদের বৃত্তি, এর প্রতি অধ্যায় তাঁদের চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে—আর যে মেধাবী ছাত্রেরা ইয়োরোপ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পড়তে গিয়ে বিষয়বস্তুর একটা সুস্পষ্ট ধারণা আয়ত্তে আনতে পারে

না, তাদেরও এর থেকে লাভ হওয়া উচিত। আলোচ্য গ্রন্থের দুটি গুণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই এর প্রতি প্যারাগ্রাফে অসংখ্য ফ্যাক্টের আভাস পাবেন অথচ এর স্বচ্ছন্দ লিপিচাতুর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করবে।

কিন্তু বইখানির একটি ত্রুটি আমাকে পীড়া দিয়েছে, ছিদ্রান্বেষ বলে মনে হওয়ার বিপদ সত্ত্বেও সেকথার উল্লেখ তাই করতে হচ্ছে। ইতিহাসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সকলের এক মত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ফ্যাক্ট (যেমন ঘটনার তারিখ বা পারম্পর্য্য) নির্ভুল রাখা ইতিহাস-লেখকের অবশ্যকর্ত্তব্য। আলোচ্য গ্রন্থে দ্রুত লেখা এবং সংশোধন কার্য্যের ও প্রুফ দেখার অসাবধানতার জন্য কতকগুলি প্রমাদ থেকে গেছে—পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখক এবং প্রকাশকের এবিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

এর কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ৬২, ৭৭ ও ৯৭ পাতায় কেম্ব্রিজ্ থেকে প্রকাশিত প্রাচীন ইতিহাসমালার নামের বদলে কেম্ব্রিজ্ আধুনিক ইতিহাসখণ্ডগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। ৭০৯ পৃষ্ঠায় চল্লিশ বছর হিসাবে হয়ে গেছে পঞ্চাশ, ৮৭৩ পাতায় তেত্রিশ বছর হয়েছে তেইশ। জার পিটারের মৃত্যু এবং ডিস্‌রেলির অভ্যুদয় উভয় তারিখেই ভুল দেখা যাচ্ছে (৭২১ ও ১০৪৪ পৃষ্ঠা)। রুষদেশে সাম্যবাদকে সেখানকার শ্লাভ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাও ঠিক ন্যায়সঙ্গত নয় (৭২২ পাতা)। তৃতীয় খণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের শেষভাগের সঙ্গে সে পরিচ্ছেদের বিষয়-বস্তুর কোন সংস্রব নেই, আবার দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনামায় যে বিষয়গুলির উল্লেখ আছে, তাদের ভিতর অনেক কথাই সে অধ্যায়ে আলোচিত হয় নি। অষ্ট্রিয়ার প্রসিদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ নিশ্চয়ই স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, ইতিহাসে তাঁর শাসন পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—ফিশারের বইএ একছত্রে তাঁর নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন কথাই নেই।

অপ্রত্যাশিত হলেও এজাতীয় ত্রুটি অবশ্য মারাত্মক নয়। ফিশারের লেখার গুণ দেখাতে হলে আলোচ্য গ্রন্থের যে কোন অধ্যায় খুললেই চল্‌বে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে ইয়োরোপের সকল যুগ সম্বন্ধেই তিনি সমান জ্ঞান ও লিপিকুশলতা দেখিয়েছেন। ফিশার বইখানির মধ্যে কোথাও চমকপ্রদ বিশেষত্ব কিম্বা অভিনব থিওরি প্রকাশের প্রয়াস পান নি, এতে তাঁর বিচক্ষণ ধীর বুদ্ধি ও লেখনীর সংযমেরই পরিচয় আমরা পাই।

দুক্ষেত্রে এর অন্যথা হয়েছে বলে আমার মনে হয়, সেই প্রশ্ন দুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি এ গ্রন্থ-পরিচয় শেষ করব।

মুখবন্ধে ফিশার বল্‌ছেন যে একজাতীয় বিশ্বাস থেকে তিনি বঞ্চিত, তিনি মনে করতে পারেন না যে ইতিহাসের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা, ছন্দ বা রূপ (plot, rhythm, pattern) আছে। এখানে তিনি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সকল প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করেছেন এবং সে উপহাস বস্তুবাদী মার্ক্স ও ভাববাদী ক্রোচে উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য। কিন্তু এর উত্তরে বলা সম্ভব যে ইতিহাস-লেখক মাত্রেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোনও বিশেষ ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন নতুবা অগণিত ফ্যাক্টের

ভিতরে কতকগুলিকে নির্ব্বাচন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফিশার লিখেছেন যে উন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। উন্নতি কথাটাতে আপত্তি থাকতে পারে কিন্তু গতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা শক্ত আর ঐতিহাসিকের চোখে সে গতির একটা রূপ বা ঝোঁক ধরা পড়াই স্বাভাবিক। ফিশার কি নিজেই সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্বাস পরিহার করতে পেরেছেন? তাহলে গত দেড়-শতাব্দীর অনেকখানি নীরস বর্ণনায় তিনি গ্রন্থের এক-তৃতীয়াংশ ভরালেন কেন? তাঁর তৃতীয় খণ্ডের নামকরণেই (The Liberal Experiment) একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গী ধরা পড়ে না কি? ইতিহাসে এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা ত' প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই হয়ে এসেছে, তার মধ্যে একটির প্রতি এ মমতা কেন?

ভূমিকাতে ফিশার ইয়োরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ইয়োরোপের সভ্যতা জাতীয় ঐক্য বা ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের উপর নির্ভর করে না, তার রূপ হল আধ্যাত্মিক—অর্থাৎ চিন্তা, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের উপর তার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ কথা ত অল্পবিস্তর সকল সভ্যতার বেলাই সত্য। ফিশারের সংজ্ঞা সভ্যতারই বর্ণনা মাত্র, তার দ্বারা ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ কিছু এগোয় না। ফিশারের মতে আবার ইয়োরোপীয় সভ্যতা এক ও অখণ্ড যদিও তার ভিতর যথেষ্ট বৈচিত্র্য প্রকাশের অবকাশ আছে। ঠিক আজকের দিনেই কিন্তু আর একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক, আর্ণল্ড টয়েনবি, বিশ্বাস করেন যে পূর্ব্ব ইয়োরোপ ও পশ্চিম ইয়োরোপ, সনাতনী খ্রীষ্ট সমাজ ও লাটিন সমাজ, পৃথক ও স্বতন্ত্র; তিনি প্রাচীন হেলেনিক ও বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতার মধ্যেও গণ্ডি টেনেছেন। তারপর ফিশার ঘোষণা করেছেন যে ইয়োরোপের সভ্যতা মূলতঃ হেলেনীয়। গ্রীক ও রোমক বহুদেববাদ ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য আছে বটে কিন্তু য়িহুদীদেশে প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম যাদের কল্যাণে তার সংকীর্ণ জগৎ ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ল তারা সকলেই অন্ততঃ শিক্ষা দীক্ষায় হেলনিক এবং এশিয়ার লোকেরা ত এ ধর্ম্মকে গ্রহণ করল না। আমার কিন্তু মনে হয় যে ইয়োরোপীয় সভ্যতায় হেলেনিক প্রভাবকে অনেক সময় অযথা বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। শুধু তিনটি যুক্তির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানের যে-রূপ ইয়োরোপের ইতিহাসে ফুটে উঠেছে তার ভিতর আমরা যাকে গ্রীক মন বলি তার পরিচয় অনেক সময় বড় ক্ষীণ নয় কি? ইয়োরোপকে সম্পূর্ণ হেলেনিক বললে সুবিশাল মধ্যযুগের প্রতিও বোধ হয় সুবিচার হয় না। বিভিন্ন যুগের জনমনের উপর গ্রীক প্রভাব কতখানি বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল সে কথাও ভাবা উচিত।

অবশ্য এ সব প্রশ্নের সমাধান প্রায় অসম্ভব, সংক্ষেপে আলোচনাও সহজ নয়। ফিশার তাঁর নিজের মত ও বিশ্বাস অনুসারে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন মাত্র। তবুও এ গ্রন্থে সমস্যা কয়েকটির আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা ও সমালোচনা থাকলে বোধ হয় পাঠকেরা বেশী কৃতজ্ঞ বোধ করতেন।

শ্রীসুশোভন সরকার

Shakespeare—by John Middleton Murry (Jonathan Cape)

শেক্সপিয়ারের সম্বন্ধে নূতন বই লেখা দুঃসাহসের ব্যাপার। আজ দুশো বছরের ওপর তাঁকে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, এত আলোচনা পৃথিবীতে আর কোনদিন কোন মানুষ সম্বন্ধে হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনার প্রতিছত্র, প্রতিশব্দ পণ্ডিতেরা বিচার করে দেখেছেন, প্রত্যেকটী ঘটনা, প্রত্যেকটী চরিত্র নানা সমালোচক নানা ভাবে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেও তৃপ্ত হন নি। শেক্সপিয়ারের বিজ্ঞান, শেক্সপিয়ারের দর্শন, শেক্সপিয়ারের প্রেততত্ত্ব, শেক্সপিয়ারের ইতিহাস প্রভৃতি নানা সম্ভব এবং অসম্ভব বিষয়ে এত আলোচনা হয়েছে যে কেবলমাত্র তার হিসাব রাখাও যে কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কষ্টসাধ্য। বহুদিন আগে ভিক্টর হ্যুগো সমুদ্রের সঙ্গে শেক্সপিয়ারের তুলনা করেছিলেন—মানুষের মনোরাজ্যে তাঁর অধিকার এবং প্রভাবের কথা মনে করলে আজো সে তুলনাকে সঙ্গত বলে মানতে হয়। সমুদ্র নিয়েও অনেক শিল্পী, অনেক সাহিত্যিক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক সাধনা করেছেন, তবু সমুদ্রের রহস্য আজো রহস্যই রয়ে গেছে।

হ্যুগোর এ উপমাটীকে আরো একটু বিশ্লেষণ করলে শেক্সপিয়ারের সত্যিকারের আকর্ষণ আমাদের কাছে খানিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমুদ্র সম্বন্ধে অনেক শুনে, পড়ে, ছবি দেখেও সমুদ্রের ঠিক ধারণা হয় না—প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা কল্পনাকে এমন করে নাড়া দেয় যে সমস্ত জীবনের ওপর তার ছায়া পড়া বিচিত্র নয়। সে অভিজ্ঞতার মর্ম্মই এই যে প্রতি মানুষের পক্ষে তা বিভিন্ন অথচ এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও সে অভিজ্ঞতার এমন একটা বিশ্বরূপ আছে যে আমরা পরস্পরের কাছে তার আবেদন প্রকাশ করতে প্রয়াস পাই। শেক্সপিয়ারের বিষয়েও তাই বলা চলে যে আমরা প্রত্যেকেই বিচিত্র ভঙ্গিতে তাঁকে দেখি, অথচ এ ব্যক্তিবৈচিত্র্যের মধ্যেও এমন একটী সাধারণ মনুষ্যরূপ আছে যে আমাদের পরস্পরের অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেকখানি আদান প্রদান সম্ভবপর।

এ কথাটীকে ঘুরিয়ে বলা চলে যে শেক্সপিয়ার আমাদের কাছে চিরন্তন রহস্য—অশেষ ভাববার খোঁজবার, বোঝবার উপাদান তাঁর মধ্যে নিহিত। ব্যক্তিবৈচিত্র্যের সঙ্গে বিশ্বজনীনতার এ রকম অপূর্ব্ব সমন্বয় আর কোনদিন বোধ হয় হয়নি, তাই শেক্সপিয়ারকে আমরা বিশেষ করে মানুষের কবি—জগতের কবি বলে জানি।

শেক্সপিয়ার তাই অনির্দ্দিষ্ট—আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, অথচ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। তাই বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন চোখে লোকে তাঁকে দেখেছে, রোমান্তিক পরিকল্পনার সময়-অতীত, নির্ভুল এবং অতিমানব শেক্সপিয়ারের পাশাপাশি রয়েছে ট্রেডিশন-বিরোধী নাস্তিক সমালোচকের এলিজাবেথীয় শেক্সপিয়ার। এ দুয়ের মধ্যে মিল নেই—অথচ জীবনে যেমন বহু দ্বন্দ্ব, বহু বিরোধ, বহু বৈচিত্র্যের অবকাশ ও সমন্বয় অবিসংবাদিত, শেক্সপিয়ারের বিপুল রচনা-রাশির মধ্যেও তেমনি এ দুই মূর্ত্তিরই সমান প্রকাশ। মারী তাঁর রচনায় এই সমন্বয়কেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, বলেছেন যে রোমান্তিক শেক্সপিয়ারের কল্পনায় অতিমানুষের দাবীতে

শেক্সপিয়ারের মনুষ্যত্ব চাপা পড়ে, অতিমানুষ কখন অজানিতে অমানুষ হয়ে দাঁড়ায়, আবার অরোমান্তিকের সুনির্দ্দিষ্ট, যুগধর্ম্মী শেক্সপিয়ারের পরিকল্পনাও তেমনি অসম্ভব। শেক্স-পিয়ারের রচনার সমষ্টি আমাদের মনে যে মূর্ত্তিকে প্রতিফলিত করে, সে মূর্ত্তি এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়, একথাও যেমন সত্য, অন্যদিকে সে মূর্ত্তির মধ্যে এলিজাবেথীয় যুগের বহির্ভূত অনেক উপাদান সুস্পষ্ট, এ কথাও সমানই সত্য।

এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের মতন শেক্সপিয়ারও বহুরূপী। আগে বলা হ'ত কেবলমাত্র মহামানুষের সম্বন্ধেই একথা খাটে, তাঁরা এক একটা যুগকে নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ করে তার অবসান করেন, অথচ নতুন যুগের সম্ভাবনাও তাঁদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। নতুন এবং পুরোনো, অতীত ও অনাগত—এ দুয়ের সংমিশ্রণেই তাঁদের চরিত্র সমৃদ্ধ, সেই সমৃদ্ধিই তাঁদের মহত্ত্বের ভিত্তি। একটু বিবেচনা করলেই কিন্তু মনে হয় যে সাধারণ মানুষের বেলায়ও একথা সমানই সত্য, কারণ সাধারণ মানুষের চরিত্রেও অতীতের প্রভা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সমানই রয়েছে। তফাৎ কেবলমাত্র মাত্রা নিয়ে। মহামানুষের বেলা যে সমন্বয় বহু-ব্যাপী এবং গভীর, সাধারণের পক্ষে তার প্রভাব অগোচর এবং অপ্রসার। শেক্সপিয়ার সম্বন্ধেও তাই আমরা বলতে পারি যে তাঁর চরিত্রে এ বহুরূপের সমন্বয় যত সহজে ধরা পড়ে, আর কারু বেলায় তা হয়েছে কিনা সন্দেহ। মানুষের চিত্তবৃত্তির অসংখ্য প্রকাশের ভঙ্গি ও লীলা তাঁর হৃদয়ে সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছিল, সে জন্যই তাঁকে বলা হয় myriad-minded শেক্সপিয়ার।

মারীর প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বেশী মতভেদ হবে না—মতভেদ হবে তাঁর রচনাভঙ্গি ও আলোচনার ধারা নিয়ে। মারীর রচনাভঙ্গি আমার নিজের ভাল লাগেনা—সোজা কথাকে তিনি যে কেবলমাত্র ঘুরিয়ে বলেন, তা নয়, অকারণ পাণ্ডিত্যের ছড়াছড়ি তার মধ্যে সময় সময় এত বেশী হয়ে পড়ে যে আসল কথাই তাতে বাদ পড়ে যায়। সাহিত্য এবং দর্শনের মধ্যভূমি অনির্দ্দিষ্ট, তাই সাহিত্য-আলোচনায় দর্শনের বিচার অহেতুক নয়, কিন্তু তাই বলে কেবলমাত্র দর্শনের শব্দ-ভাণ্ডার সাহিত্য-ক্ষেত্রে উজাড় করে দিলে ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। মারীর Keats and Shakespeare পড়ে আমায় যে কথা মনে হয়েছিল, এ নতুন বইখানি সম্বন্ধেও বোধ হয় তা খাটে। এমন একটা ধোঁয়াটে ঘোলা আবহাওয়ার তিনি সৃষ্টি করেন যে তার মধ্যে কথাগুলি তাদের নিজস্ব রূপ হারিয়ে ফেলে, সমস্ত আলোচনা লক্ষ্যহীন এবং অনির্দ্দিষ্ট হয়ে পড়ে। সাহিত্যিক রচনা বা সমালোচনায় দর্শনের তীক্ষ্ণতার স্থান নেই, সুস্পষ্টতার তাগিদে হৃদয়াবেগের আলোড়ন এবং স্পন্দন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে, একথা সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র অস্পষ্টতার মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের ছবি ধরা দেয় না, ঝাপসা হয়ে কুয়াসায় মিলিয়ে যায়।

সাধারণ রচনাভঙ্গি বা দার্শনিক দৃষ্টির কথা ছেড়ে দিলে মারীর বইখানিতে সাহিত্য হিসাবে উপভোগ্য জিনিষের অভাব নেই। অনেক জায়গায়ই তিনি নিছক সাহিত্যিক এবং নিছক সাহিত্যিক হিসাবে তিনি শেক্সপিয়ারের নাটকগুলির বিষয়ে যে কথা বলেছেন, তাতে অন্তর্দৃষ্টি

এবং দরদ দুই প্রকাশ পেয়েছে। ম্যাকবেথ, ওথেলো বা মার্চেন্ট অব ভেনিসের মত পরিচিত এবং বহু আলোচিত বই সম্বন্ধে নতুন কথা বলা সহজ নয়—মারী তা পেরেছেন। প্রত্যেক নাটক সম্বন্ধেই মারীর দুয়েকটী নতুন কথা বলবার রয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও মারীর বড় কৃতিত্ব এই যে নাটকগুলির ক্রমবিকাশের মধ্যে তিনি শেক্সপিয়ারের মানসজীবনের ধারা ও পরিচয় পেয়েছেন। শেক্সপিয়ার সাংসারিক সামাজিক মানুষ ছিলেন, তখনকার সমাজের রীতি-নীতি ও আদর্শ তাঁর নিজের জীবনে কখন অস্বীকার করেন নি। সাংসারিক এ সাফল্যের সঙ্গে তাঁর মানস অভিযানের সম্বন্ধ যে কী, তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হবে, কিন্তু মারী যে রকম কৃতিত্বের সঙ্গে কবি শেক্সপিয়ারের সাংসারিক সাফল্যের বিবরণ দিয়েছেন, তাতে সত্যিকার সাহিত্যিক অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কবির বক্তব্য ও ভঙ্গি, বিষয়-বস্তু ও রূপান্তরণ নিয়ে মারী যে সব কথা বলেছেন, সে কথা কেবল মাত্র শেক্সপিয়ারের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, সমস্ত সাহিত্যিকের বিষয়েই তা সত্য।

হুমায়ুন কবির

Studies in the Land Economics of Bengal—By Sachin Sen. (The Book Company Ltd)

Land Problems of India—By Radhakamal Mukerji, Calcutta University Readership Lectures. (Longmans)

আমাদের দেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে প্রতীতি জন্মেছে যে জমিই আমাদের সভ্যতার ভিত্তি। চাষবাস ও জমিদারবর্গের মধ্যকার সম্বন্ধই আমাদের অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধের নিয়ন্তা এবং ভূমি ও ভূম্যাধিকারীর ন্যায্য সংযোগই সকল উন্নতির ভূমিকা। আজ ধনোৎপাদনের নতুন উপায় ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে নিশ্চয়, তারই ফলে ভারতবর্ষের কোথাও ধনিকতন্ত্রের এবং শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষণের পর দেখা যায় যে তাদের শিকড় জমিতেই বিস্তৃত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কাঁচামাল রপ্তানীর দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী করতে থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত শ্রমিকরা প্রধানতঃ গ্রামবাসী ও চাষী থাকবে, ততদিন ধনিক-তন্ত্র ও শ্রমিক-সমস্যার সাথে জমির যোগ অক্ষুণ্ণ থাকতে বাধ্য। এতদূর পর্য্যন্ত বোধহয় বলা চলে যে ধনিকতন্ত্রের রূপ-পরিবর্ত্তনও নির্ভর করবে জমিস্বত্বের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনেরই ওপর। আমাদের বড় ছোট জমিদার মাত্রেই মধ্যস্বত্বোপভোগী, তাঁদের বর্ত্তমান দৈন্যদশার জন্যই তাঁরা ভূমির ওপর অধিকার ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। চাষী সম্প্রদায়ের অবস্থাও নিতান্ত খারাপ। সকলে মিলে চাকরীর প্রার্থী—শিক্ষিতেরা গবর্ণমেন্টের অফিসের দ্বারে, এবং নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিতেরা কলের ফাটকে হত্যা দিচ্ছেন। লোক-সংখ্যার দিক থেকেও জমির সাথে যোগের গুরুত্ব ধরা পড়ে। একে জমি হচ্ছে টুকরো, তার ওপর অন্ন-সংস্থানের জন্যে উপায় সঙ্কীর্ণ, কুটির-শিল্প নেই বল্লেই চলে, তাই লোক-সংখ্যা

বৃদ্ধির হার অন্য একাধিক সভ্য জাতির অপেক্ষা কম হলেও এদেশে এক বিষম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই দেখি—কাঁচামাল রপ্তানী করাটাই যেন আমাদের একমাত্র কাজ, তাইতে বোম্বাইএর কলাধিপতির বিক্ষোভ এবং আরো অনেকের অভিমান; সেই রপ্তানী ও আমদানীর মূল্যের পার্থক্যটুকু আবার দেশে থাকেনা; আমরা চাই দেশে রাখতে; জমি থেকে বিতাড়িত যাঁরা অথচ চাকরী যাঁদের হাতে আমলকীর মতন নয়, চাঁদেরই মতন, তাঁরা হয়েছেন ভীষণ অসন্তুষ্ট। তাঁদের অসন্তোষই নাকি রাজনৈতিক আন্দোলনের খোরাক যোগায়; তাঁদের সন্তোষ-বিধানেরই জন্য আজ সরকার বাহাদুর বদ্ধপরিকর। অতএব জমি আমাদের পায়ের তলায় এবং সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের অন্তরে। রক্তে এবং আকাশেও, কারণ সহরে কিছু পয়সা করেই জমি-জারাৎ করব সকলেই ভাবে, এবং সর্দ্দার পাটেল বাহাদুরের মতে—তাঁর মতটি যে কত শক্তিশালী আমি জানি—স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা মূলতঃ চাষী। গুজরাটী চাষীকেই এখানে আদর্শ হিসাবে ধরতে হবে, প্রাদেশিকতার নিদর্শন হিসাবে নয়। তদ্‌ভিন্ন, মন্ত্রীব দল প্রায় সব প্রদেশেই জমিদার শ্রেণীর। তাঁরা সহরবাসী হলেও তাঁরা যে জমিদার সেই জমিদার। অর্থাৎ ভোট তাঁদের প্রজার, এবং মনোভাব জমির অধিকারীর। প্রজা-পার্টি প্রভৃতির কথা নাই উল্লেখ করলাম।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য যদি সত্য হয় তবে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হোলো জমির অধিকার, উন্নতি প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করা। চিন্তা করা—জমি চাষ করা নয়, কারণ এদেশের জমিতে ফসল না জন্মালেও সমস্যা, একাধিক সমস্যা জন্মাচ্ছে। সেই সমস্যাগুলির নিরাকরণ চাই। যাঁরা নিরাকরণে তৎপর তাঁদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম। সেই কমের মধ্যে ডাঃ রাধাকমল শীর্ষস্থানীয়। শচীন সেন মহাশয়ের স্থান তাঁর নিম্নে। তাঁদের পুস্তক দুখানি ঐ হিসেবে এক গোত্রের, নচেৎ একত্র সমালোচনার গুণগত সীমা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

বিষয়-ক্ষেত্রের পার্থক্য অবশ্য লক্ষ্যণীয়। শচীনবাবু বাংলা এবং রাধাকমলবাবু সারা ভারতবর্ষের জমিস্বত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, অন্যত্র হয় আপেক্ষিক-চিরস্থায়ী, না হয় রায়তোয়ারী, দু একস্থানে 'ভাইচারা' এবং বেডেন্-পাওয়েল যাকে জয়েন্ট-ভিলেজ বলেছেন তাই। অতএব শচীন বাবু প্রধানতঃ ১৭৮৯ সালের এবং তার পরবর্ত্তী কালের আইন-সম্মত বন্দোবস্তের ইতিহাস নিয়েই ব্যস্ত। রাধাকমলবাবুর পটভূমি অত্যন্ত ব্যাপক, এবং মাত্র প্রজাস্বত্ব-আইনের ক্রমবিকাশ দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। শচীনবাবুর ইঙ্গিত অর্থ-নৈতিক, রাধাকমলবাবুর সামাজিক। দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ ব্যবস্থার ধারণাও সম্পূর্ণ পৃথক। শচীনবাবু জমিদারী আইনের সংশোধন চান—বিশেষতঃ প্রজাস্বত্ব-আইনের, কারণ তাঁব বিশ্বাস যে প্রজাস্বত্ব-আইনের জন্যই আজ জমিদারবর্গের এবং দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা। রাধাকমলবাবু চান প্ল্যানিং এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপের প্রবর্ত্তিত নিতান্ত আধুনিক উপায়। শচীনবাবু একটি নতুন প্রপীড়িত, অবদমিত, নিষ্পিষ্ট শ্রেণী আমাদের সমাজে আবিষ্কার করেছেন—নাম তার জমিদারবর্গ। রাধা-

কমলবাবুর সে কৃতিত্ব নেই। শচীনবাবু কেন্দ্রিক শাসন-পদ্ধতিতে অবিশ্বাসী—তাঁর আদর্শ-রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তার প্রাণ হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাধীনতা। রাধাকমলবাবুর বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের না হলেও, এবং তিনি কম্যুনিষ্ট কিংবা আমলাতন্ত্রবাদী না হলেও তাঁর মতবাদ গৃহীত হবার জন্য বর্ত্তমান শাসন প্রক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন চাই। শচীনবাবুকে তাই বলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার তরফদার এবং রাধাকমল বাবুকে বিপ্লবপন্থী ভাবা অত্যন্ত ভুল হবে। শচীনবাবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপোষক হলেও, তার দোষ সম্বন্ধে সদাজাগ্রত, এবং রাধাকমল বাবু প্ল্যানিংএ আস্থাবান হলেও তাঁর মূল্যবান সৃষ্টি-নির্দ্দেশের কার্য্যকরী ভবিষ্যৎ নিয়ে মাতামাতি করতে প্রস্তুত নন্।

পুস্তক দু'খানি সত্যই আমাদের অমূল্য সম্পদ। শচীন বাবুর বইএর প্রত্যেক ছত্রে সযত্ন পরিশ্রমের পরিচয় আছে। তিনি প্রায় সব রিপোর্টগুলিই ব্যবহার করেছেন, এবং তাঁর ব্যাখ্যাতেও কোন কারচুপী নেই। তবু তাঁর সঙ্গে আমি অনেক ক্ষেত্রেই একমত নই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যত গুণই থাক, তবু তারই জন্য, প্রধানতঃ, দু তিনটি ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করতে হবে; (১) গ্রামের যৌথ-অধিকারের সঙ্কোচ, এবং (২) 'দর-দর'-ধারে মধ্য-স্বত্বোপভোগীর সৃষ্টি। এবং অনেকে সন্দেহ করেন যে হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান সমস্যার মূল হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা এবং তার রক্ষা, ও অন্যধারে মুসলমানদের মধ্যে সেই সম্প্রদায়ের অভাব এবং পরবর্ত্তী বিকাশের জন্য স্বার্থ-পার্থক্যই যদি হয় তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে, আংশিক ভাবে, বাংলা দেশের একটি সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী করা অযথা নয়। পরিচয় মাসিক হোলো, অতএব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এইটুকু বলে শেষ করি যে রাধাকমল বাবু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে অর্থাৎ আমাদের সমগ্র সামাজিক ইতিহাসের এবং অন্যান্য প্রদেশ ও দেশবিদেশের ভূমিগত ও সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন, এবং তাঁর বিবরণ সেই জন্যই অত্যন্ত সার্থক। বিচার এবং রায়ের আপীলে তিনি জিতবেন কিনা বলা আমার সাধ্যাতীত।

শচীনবাবুর পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে আমার তিনটি আপত্তি আছে। শচীন বাবু 'নজীর' দেখান নি, যেটা দেখান খুবই উচিত ছিল। তাঁর পুস্তকের মধ্যে পুনরাবৃত্তি আছে। বইখানিতে কোনো সূচিপত্র নেই। আমার বিশ্বাস যে পুস্তকের অধ্যায়গুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা। রাধাকমল বাবুর পুস্তকে প্যারাগ্রাফগুলি যথাযথ ভাবে বিভক্ত হয় নি, এবং তাদের হেডলাইনগুলির বড় বড় অক্ষর আমার খারাপ লেগেছে। বাংলা দেশে ওর চেয়ে ভাল ছাপায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। বই দু খানির দামও একটু বেশী।

সে যাই হোক—শচীনবাবুর এবং রাধাকমল বাবুর বই না হলে আমাদের কারুর চলবে না। মত-পার্থক্য থাকবেই—কিন্তু তাই বলে বই দুখানির সার্থকতা কমবে না। রাধাকমল বাবুর

কাছেও আমাদের অনেক শেখবার আছে—তাঁর বিশেষ দান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Poet's Tongue—Edited by W. H. Auden and J. T. Garrett (Bell)

The Faber Book of Modern Verse—Edited by Michael Roberts (Faber)

The Progress of Poetry—Edited by J. M. Parsons (Chatto and Windus)

The Year's Poetry 1935—(John Lane)

বিদেশী সাহিত্যে প্রবেশ স্বভাবতই আয়াসসাধ্য। প্রবেশচেষ্টায় আমরা বহুবছর কাটাই কিন্তু ছাড়পত্র শেষে যদিই বা জোটে ত সে শুধু কাছারিবাড়ীতে বসবার জন্য কারণ অন্দরে যাবার প্রশ্ন আমাদের শিক্ষাকর্ত্তাদের মনেই ওঠে নি। সেই জন্যে আমাদের পড়তে হয় যে সব কাব্য-চয়নিকা, তাতে চলা যায় ইংরেজি কাব্যের একটিমাত্র পাকা সড়কে। সে সড়ক আবার প্রায়ই অজ্ঞরুচির নির্দ্দেশে হয়ে পড়ে খানাখোন্দল মাত্র। তাই যৌবনরূপ বিষম কালের পরে আমরা আর কবিতা পড়ি না। যদিই বা পড়ি ত পলগ্রেভের সোনালি টাকশাল বা কুইলরকুচ্ নামক ভদ্রলোকের অক্সফোর্ড কেতাব পড়ি। অথচ রডডেনড্রনগুচ্ছের তলায় যে পড়া উচিত The Weekend Book বা The Major ও Minor Pleasures of Life অথবা Come Hither সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

এই পাঠসঙ্কটে অডেনের সৎসাহস একান্ত প্রশংসনীয়। অডেন যে বহু কবিতা সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্যই বিস্ময়কর। লিডগেট্ বা স্কেল্টনই যে শুধু এখানে জিহ্বা প্রদর্শন করেছেন, তা নয়, এংলোস্যক্সন কবিতার অনুবাদ, ক্যারল, ব্যালাড, ব্রডশীটগাথা, সীশান্টি, প্যারডি, নার্শরি লোককবিতা ও গান ইত্যাদিও আমাদের ইংরেজি কাব্যের অন্দরমহলে নিয়ে যায়। যে লুইস্ ক্যারল আমাদের স্কুলে কলেজে অজ্ঞাতনাম অথচ ইংরেজি বিজ্ঞানের বা অর্থ-নীতির বইএ যাঁর কাব্যাদি থেকে উপমা পাওয়া যায়, তাঁরও বিস্তর প্রলাপকবিতা অডেন সংগ্রহ করেছেন।

প্যারাডাইজ লষ্ট বা এপিসাইকিডিয়নের পেশীবহুলতা বা পক্ষসঞ্চার ছাড়াও ইংরেজ কবি-স্বভাবের যে খামখেয়ালী হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনার লীলা আমরা অনেকে বুঝি নে, তার সঙ্গে পরিচয় করানো এ সংগ্রহের একটা বিশেষ কাজ। এবং এ সংগ্রহ পাঠে এ তথ্যও কারো কারো হৃদয়ঙ্গম হতে পারে যে দ্বীপপ্রেম ও সাগরপ্রীতি ইংরেজি কাব্যের নাড়ীতে বইলেও রোমান্টিক

নবজাগরণই তার চরম কথা নয় এবং ভিক্টোরিয়া যুগের আদিকালে কতিপয় ইংরেজ মহাপুরুষ আমাদের জন্যে শিক্ষায় যে সীমানির্দ্দেশ করে' দিয়ে গেছেন, তা ভ্রান্ত না হোক, সঙ্কীর্ণ বটে। অডেন্ নিজে অসমান হলেও উৎকৃষ্ট কবি আর এদিকে মাষ্টারি করেন্। তাই তাঁর বই ইংরেজ বালক ও বয়স্কদের জন্যে সঙ্কলিত হলেও যতদিন না হিন্দি আমাদের রাজভাষা হচ্ছে, ততদিন এই রকম বই স্কুল কলেজে আর বিশেষ করে শিক্ষকশিক্ষালয়ে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। কারণ কাব্যে অডেনদের রুচি আশ্চর্য্য শুদ্ধ এবং তিনি উচুঁ কপালে না হওয়ায় বহুধাবিচিত্র।

যে দুটি আপত্তি এ বই সম্বন্ধে হতে পারে, তার একটি প্রায় অর্থহীন—যে কবিতাগুলি অডেন দিয়েছেন সে সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভালো কিন্তু ঐরকম ভালো কবিতা ত আরো বিস্তর আছে, সে সব বাদ কেন? কিন্তু পাঁচখণ্ডের English Poets গোছের বিরাট ব্যাপার ছাড়া এ কথার জবাব হয় না। অবশ্য আরেক কথাও আছে। স্থানাভাবেই বহু কবি বাদ পড়েছেন এ কথা সত্য হলে কলিন্ ফ্রান্সিস বিশেষত ডে লুইস ও স্পেণ্ডর্ কেন? বন্ধুকৃত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অডেন যে জীবন সম্বন্ধে মতামতের দ্বারা চালিত সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাঁর পক্ষে বক্তব্য এইটুকু যে সংগ্রহণে তাঁর মতামত তাঁর রুচিকে বিকৃত করে নি, করেছে শুধু বর্জ্জনে। এবং বন্ধুপ্রীতি কার না আছে?

তাই, স্বকুমার রায়ের ছড়াটা মনে পড়লেও অডেনের প্রশংসনীয়তা কমে না। শেষ পর্য্যন্ত আমরা সবাই কি বলি না—তুমিও ভালো আমিও ভালো কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়?—আর, ডি লা মেআরের স্বপ্নালু পলায়নলিপ্সার চেয়ে আমি হয়ত অডেনের সংস্কারক কর্ম্মঠ ভাবটা অপেক্ষাকৃত পছন্দই করব—প্রথমত এ চালটা নতুন বলে', দ্বিতীয়ত এ চালে ছেলেমানুষিটা আপাতবোধ্য, স্বতরাং প্রভাবটা কম বিপজ্জনক।

আর সংস্কারক হলেই যা হয়, কবিতার স্বধর্ম্মগত আবেদন বিড়ম্বিত হয় স্বরের উচ্চতায় ও মতের বাদ্‌বিতণ্ডায়। ফলে পাঠকের মনে হয় সন্দেহ, নবদেশের নবসাক্ষরিত নবকাব্যের উপদেশ-বাণীতে ভক্তি পায় লোপ। এঁদের একজন বলেন যে মার্কস্ ও ফ্রয়েড আসলে এক, আরেক-জন বলেন যে মনস্তত্ত্বের গভীরে ডুবলে সমাজ গঠনের চূড়ারোহণ অসম্ভব। স্পেণ্ডর বলেন যে এমন নরাধমও আছে যে নিজের ছেলে হলে ব্যক্তিগত ভাবে খুসি হয়। ডেলুইস্ কিন্তু বলেছেন যে এমন নির্ব্বোধও আছে যে তাঁর সন্তান জন্মোপলক্ষ্যে লেখা মহাকাব্যটা সমষ্টিবাদের অবতারের স্বাগতভাষণ বলে ভেবেছে! ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রবার্টসের দীর্ঘ ভূমিকায় বিস্তর গালভরা শব্দ ও গভীর সুরের ভাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর রুচি নয়, তাঁর মতামতে কোনো আস্থা থাকে না। হপকিন্‌সকে পছন্দ করা এক কথা আর রবার্টসের উচ্ছ্বাস মানা স্বতন্ত্র। আসলে পার্সন্সের কথা সত্য মনে হয় যে হপকিন্‌স্ নিতান্তই ভিক্টোরীয় কবি ও তাঁর সমস্যা নেহাৎ সেই কালের বিশেষ একজন ধর্ম্মিষ্ঠ সংসার-ভীরু নীড়-প্রত্যাশী মঠ-বাসীর; কাজেই

সেদিক দিয়ে তিনি মডার্ণই নন। আর তাঁর প্রভাবও আসলে এলিয়টের তুলনায় নগণ্য। শেষোক্তের প্রভাব মজ্জায় মজ্জায় ছড়ায় আর হপকিন্‌সের শুধু অলঙ্কারে—অনুপ্রাসাদিতে। রবার্টসেব ভালো লাগবার ক্ষমতা অবশ্য অসাধারণ—সুকুমার রায়ের ছড়াটা বোধ হয় রবার্টসের জন্যেই লেখা - রবার্টসের ভালো লাগে সব কবিই, অবশ্য যারা নেহাৎ জনপ্রিয়, তাদের ছাড়া। কিন্তু হপকিন্‌সকে এই আধুনিকম্মন্যদের ভালো লাগার কারণ আমার বিশ্বাস হপকিন্‌সের কাব্যের কাংস্যকণ্ঠ ও উচ্চস্বর। এবং এই কণ্ঠ ও স্বরের সাধনই আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য। বারে বারে লক্ষ্য করেছি এঁদের কবিতায় বাক্যে বাক্যে imperative।

জীবনের প্রয়োজনে কাব্যের মূল্য আমিও দিই। রিচার্ডসের সঙ্গে আমিও এক মত। কিন্তু মনোবৃত্তিকে যে শুদ্ধি কাব্য দিতে পারে, সে শুদ্ধি আপাতবোধ্য কর্ম্মঠতা নয় বলেই বিশ্বাস। কাব্যকে আমি মোর্'র মতো, ফ্রাইএর মতো ধ্যানধারণার গোত্রেই ফেলি। কিন্তু কান্তিবিস্তার অবান্তর প্রশ্ন তোলা—মাসিক পত্রের রিভিউতে বিশেষ করে—অর্থহীন। শুধু এইটুকু বলা যায় যে আজকের দিনে আমরা ক্যাম্বেলের চড়া গলায় তৃপ্তি পাই নে—বরং প্রেলুডে খুঁজতে যাই সেই গভীর আনন্দ, যাতে করে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো অসতর্ক কবি, অপ্রিয় ব্যক্তিও আত্মীয় হয়ে ওঠেন। সেই জন্যেই এই কবিদের সম্বন্ধে মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ হয় না। এমন কি মনে হয় যার ভাষা হয় উগ্র, গলা হয় কর্কশ, তার গায়ের জোর হয়ত কমই। তাই এই সব ভালো ভালো কথাও জোলো বা খেলো লাগে—

Readers of this strange language,
We have come at last to a country
Where light equal, like the shine from
snow, strikes all faces,
Here you may wonder
How it was that works, money, interest,
building, could ever hide
The palpable and obvious love of man for man.
Oh comrades, let not those follow after
—The beautiful generation that shall
spring from our sides—

ইত্যাদি

অথবা

You who go out alone, on tandem or on pillion
Down arterial roads riding in April,
Or sad beside lakes where hill-slopes are reflected
Making fires of leaves, your high hopes fallen,
Cyclists and hikers in company, day excursionists,
Refugees from cursed towns and devastated areas ;
Know you seek a new world, a saviour to establish
Long-lost kinship and restore the blood's full establishment.

অথবা

Comrades to whom our thoughts return,
Brothers for whom our bowels yearn
when words are over ;
Remember that in each direction
Love outside our own election
Holds us in unseen connection :
O trust that ever.

স্পেণ্ডর, লুইস্, অডেন্ শুধু নয় তাঁদের অন্যান্য বন্ধুরাও এই একঘেয়ে নাটুকেপণায় দক্ষ, যথা ওয়ার্ণার-এর

Nor will my mind permit me to linger in the love,
The motherkindness of country among ascending trees
Knowing that love must be liberated by bleeding,
Fearing for my fellows, for the murder of man.

রবার্টস্ অনেক কায়দা করে' ওকালতি করেছেন—পাউণ্ড এবং এলিয়ট নাকি য়ুরোপীয়, এঁরা নাকি ইংরেজ। রখ্যান্ বা নাট্‌শিজর্জ্জর জার্ম্যান্ বল্লেও না হয় বোঝা যেত। এবং এম্‌প্‌সন্ বৈজ্ঞানিক, তাঁর আবেদন সুতরাং ঐ য়ুরোপীয় বৃদ্ধদের চেয়ে সহজবোধ্য, সর্ব্বজন-বোধ্য ও মূল্যবান্। মাত্র দুটি উপাদেয় ছত্র তুলে' দেখলেই এম্‌পসনের সর্ব্বজনবোধ্যতা বোঝা যাবে—

Only have we space, commonsense in common,
A tribe whose lifeblood is our sacrament,
Physics or metaphysics for your showman,
For my physician in this banishment ?
Too non-Euclidean predicament.—

এবং

Professor Eddington with the same insolence
Called all physics one tautology ;
If you describe things with the right tensors
All law becomes the fact that they can be
described with them ;
This is the Assumption of the description.
The duality of choice thus becomes the
singularity of existence :
The effort of virtue the unconsciousness
of foreknowledge

রবার্টসের ভূমিকার মতো গভীর-ছল ভ্রান্তিবিলাস সত্ত্বেও—কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা দলীয় কারণে বাদ পড়া সত্ত্বেও তাঁর সংগ্রহটিকেই প্রকাশিত বইএর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ও ভালো বলতে হয়। সুখের কথা, এতে কৃতী আমেরিকান্ কবিরাও আছেন এবং জীবিত কবিদের মধ্যে ইয়েটস থেকে গ্যাসকয়ন অবধি কবির একসঙ্গে পরিচয় দেওয়া সত্যিই

ধন্যবাদার্হ। তা ছাড়া, বাস্তবিক ঐ কয়েকজন সংস্কারক ছাড়া অন্য বিষয়ে রবার্টসের রুচি মোটা-মুটি নির্ভরণীয়। বিশেষ করে' মারিআন্ মূর, ওয়ালেস্ ষ্টীভেনস্, রোজেন্‌বর্গ, ওয়েন্, র‍্যানসম্, টেট, ক্রেন্, রাইডিং, গ্রেভস ইত্যাদির অনেক কবিতাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগবে। এবং ঐ সংস্কারক কবিদের নানাকারণে নামডাক বেশি হলেও ইংরেজি কবিতার ভবিষ্যৎ যে তাঁদের হাতেই শুধু নেই, এ আশ্বাসও হয় এই সংগ্রহ পাঠে।

আমার পক্ষে অন্তত এ আশ্বাসের প্রয়োজন। স্থানাভাবে এই কবিকিশোরদের কাব্যের নানা বিরক্তিকর কাব্যগত ত্রুটি, অনুকরণ ও মুদ্রাদোষের বিস্তৃত তালিকা না দিয়েও বলতে পারি যে পার্স‌ন্সের মতো আমার মতে যাঁরা আত্মসংস্কারে বিশ্বাস করেন তাঁদের কবিতা জাতহিসাবেই বহিঃসংস্কারে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কবিত্বের চেয়ে বড়ো। কারণ আমি মনে করি যে-জীবনে মৃত্যুর ছায়া নেই, সে জীবন অসম্পূর্ণ, ছেলেমানুষী। কারণ অসত্যের প্রবল প্রতাপে আমার বিশ্বাস। তাই আমার বিশ্বাস যে মহাকবির কবিতামাত্রেই না হোক, তার কবিদৃষ্টি হবে tragic। তাই কিং লিয়ার আমার স্নায়ুকে ছিন্নভিন্ন করে নিয়ে যায় মানবজীবনের চরম উপলব্ধিতে, তাই জেম্‌সের নভেল আমার প্রিয়পাঠ্য, তাই এই অডেনাদির প্রায়ই চতুর কুশলী কাব্যে এমন লাইন না পেয়ে হতাশ হই—

> Eyes I dare not meet in dreams
> In death's dream kingdom
> These do not appear :
> There, the eyes are
> Sunlight on a broken column
> There is a tree swinging
> And the voices are
> In the wind's singing
> More distant and more solemn
> Than a fading star.

তাই অডেনের দক্ষতা এবং স্পেণ্ডরের সৌকুমার্য্য পছন্দ করেও খুসি হয়েছি তরুণতর বার্কর, টমাস্ ইত্যাদির মনস্তাত্ত্বিক মননশীলতায়।

বিষ্ণু দে

দাদূ—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত ; প্রকাশক—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

মীরাবাঈ—স্বামী ভূমানন্দ প্রণীত ; পি ৬৪ মনোহরপুকুর রোড হ'তে শ্রীশিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন বাবু যে খবর রাখেন সম্ভবতঃ বাঙ্গলাদেশে আর কেউ তা রাখে না। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি বাংলা অনুবাদসহ কবীরের দোহাসংগ্রহ প্রকাশ

করেন, সে বই সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর "মধ্যযুগের সাধনার ধারা" নামক গ্রন্থ হ'তে সাধনার ধারার বিশেষ খোঁজ না পেলেও মধ্যযুগের সাধকদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি। "দাদূ" প্রকাশ করে ক্ষিতিমোহন বাবু যে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন তাতে সন্দেহ নাই। এই বিরাট গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপক্রমণিকায় দাদূ সম্বন্ধে বহু তথ্য-সঙ্কলিত হয়েছে। উপক্রমণিকায় দাদূর পরিচয়, তাঁর গুরু ও শিষ্যদের কথা, তাঁর সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা গুছিয়ে না বললেও বিশদ্‌ভাবে বলা হয়েছে। মূলগ্রন্থে "দাদূবাণী", "দাদূ শব্দ" (সঙ্গীত), "প্রশ্নোত্তরী" ও "মাধুকরী" সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দাদূর দোহা-সংগ্রহ হচ্ছে দাদূবাণী, এ বাণী ছয় ভাগে বিভক্ত—জাগরণ, উপদেশ, তত্ত্ব, সাধনা, পরিচয় ও প্রেম। এই দোহা ব্যতীত দাদূর শব্দ ও সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরের আকারে তত্ত্বকথা ও মাধুকরী কতকগুলি ছোট ছোট পরস্পর অসংলগ্ন পদের সমষ্টি। প্রত্যেক পদের বাঙ্গলা অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যা মূলতঃ অনুবাদ ও ভূমিকার পুনরুক্তি হলেও দোহাগুলির বাংলা অনুবাদ যে মূলানুগত অথচ সরস হয়েছে তা প্রতি পাঠকই স্বীকার করবেন।

এ গ্রন্থে যে সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তা ক্ষিতিমোহন বাবুর নিজের সংগ্রহ। উপক্রমণিকার ১৭২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন—"এই গ্রন্থে যে বাণী ও শব্দ প্রকাশ হইতেছে তাহা সাধুদের কণ্ঠ হইতে নেওয়া। তবু তার প্রত্যেকটি আমি পুঁথির সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়াছি। যে সব পদ ও ও গানের কাছাকাছি কিছুই কোনো পুঁথিতে নাই অর্থাৎ যে সব ভাব পুঁথিতে গৃহীত হয় নাই তাহা আপাততঃ প্রকাশ করিলাম না।" পূর্ব্ববর্ত্তী সংগ্রহকর্ত্তাদের প্রকাশিত গ্রন্থকেই তিনি পুঁথি বলছেন মনে হয় (উপক্রমণিকা—১৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)—আর এ ধারণা যদি সত্য হয় তা হলে ক্ষিতিমোহন বাবুর মৌলিক সংগ্রহ অর্থাৎ যে সব পদ অন্যত্র পাওয়া যায় না সেই সব পদ পেলেই আমরা বেশি উপকৃত হতাম, কারণ তিনিই বলেছেন তাঁর অপ্রকাশিত সংগ্রহে "অনেক বহুমূল্য ও চমৎকার পদ" আছে। অন্যান্য পুঁথির পদ ও তাঁর সংগৃহীত পদের মধ্যে পাঠভেদ থাকা সম্ভব, পাঠান্তর দিলে ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিশেষ উপকৃত হতেন। ক্ষিতিমোহন বাবু আরও বলেছেন যে "একটি কি দুইটি পদ ছাড়া সব পদ ও গানই কোনও না কোনো পুঁথিতে আছে" অথচ সে "দুইটি পদ" যে কোন দুটি পদ তা' তিনি কোথাও বলেন নি।

গ্রন্থকার দাদূর সাধনার কথা বলতে গিয়ে মধ্যযুগের মর্ম্মবাদের কথা আলোচনা করেছেন—অথচ সে মর্ম্মবাদের মর্ম্মস্থানীয় তত্ত্বকথার বিশেষ উল্লেখ না করে তিনি পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। তিনি যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—"যোগ পরিভাষার অর্থও আছে তাহা আর এখানে দিলাম না" (পৃঃ ১৯৭)। এই জন্য তাঁর আলোচনা হয়েছে অনেক পরিমাণে "শূন্য-গর্ভ"। শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত আলোচনাও সেই পদবাচ্য। এ ছাড়া তিনি যে-ভাবে দাদূর 'ব্রহ্মসম্প্রদায়', 'সীমা ও অসীম' প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন তার

মধ্যে আধুনিক চিন্তার ধারা ও মধ্যযুগের চিন্তার ধারার মধ্যে অনাবশ্যক সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা রয়েছে। হয়ত ক্ষিতিমোহন বাবু 'মরমিয়াদে'র মর্ম্মকথা অনধিকারীকে শোনাতে চান না। তবুও তিনি এ গ্রন্থে যেটুকু দিয়েছেন তার জন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

"মীরাবাঈ" লিখেছেন এমন একজন লেখক যিনি নিজে সাধন-বিষয়ে অধিকারী। কবীর, দাদু, মীরাবাঈ এঁরা সকলেই ছিলেন সাধক। সুতরাং সাধক তাঁদের পদের যে ব্যাখা করেন সে ব্যাখ্যা সমাদরণীয়, কারণ তাঁর সাহায্য ব্যতীত আমরা এই সব মরমিয়াদের মর্ম্মবাদ সম্পূর্ণ-ভাবে বুঝতে পারি না। গ্রন্থকার প্রথমে মীরাবাঈয়ের সত্য পরিচয় দিয়েছেন, তারপর তাঁর জীবনী, সাধন', প্রভৃতি আলোচনা করে কতকগুলি নির্ব্বাচিত পদ এবং সব পদের বাংলা অনুবাদ দিয়েছেন। এ অনুবাদ মূলানুগত-ও সরল হয়েছে। সাধক প্রথমেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন না, সহজাবস্থায় উন্নীত হন না। তাই "মীরা প্রথমে তাঁহার গিরিধারীলালকে পরিচ্ছিন্ন দেবতাকারে ভজনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই গিরিধারীকে আর তিনি 'মোর মুকুট পীতাম্বর গল বৈজংতী মাল' 'নন্দদুলালা' বলিয়া ধারণা করেন নাই। তাঁহার গিরিধারীকে তখন তিনি পূর্ণব্রহ্ম (তুম্ প্রভূ পূরণ ব্রহ্মহো) বলিয়াই স্বহৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। সাধক মাত্রেরই চরমে এই জ্ঞান জন্মে"। এ কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে কবীর দাদূ প্রভৃতি সকল সাধকই প্রথমে সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার সমস্তই তাঁদের মানতে হত, গুরুর মুখাপেক্ষী না হলেও তাঁদের চলত না। সহজসিদ্ধ ও সংস্কারমুক্ত হতে তাঁদের হয়ত সারা জীবন কেটে যেত। স্বামী ভূমানন্দ যে দৃষ্টিতে মধ্য যুগের এই সাধকদের সাধনার ধারা দেখেছেন সেই দর্শনভঙ্গী গ্রহণ না করলে আমরা সাধকদের বাণী কখনই বুঝতে পারব না।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

The Tale of Genji—By Lady Murasaki (George Allen and Unwin Ltd)

মনে পড়ে জাপান-যাত্রী রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে বলেছিলেন জাপানের ধর্ম্ম সংস্কারমূলক আধ্যাত্মিকতামূলক নয়, এবং তাদের চরম লক্ষ্য ঐহিক কৃতকর্ম্মতা। তাদের শিল্প, কারুকলা, সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু উল্লেখ করে প্রসঙ্গক্রমে একটা দরকারী কথা তিনি বলেন, যে, সেখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ পরস্পরের দৃষ্টিকে ভয় পায় না। এর পর থেকে জাপানীদের জীবনায়ন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পাকাপাকি রকমের হয়ে দাঁড়ায়। তাদের চারিত্রিক দৌর্ব্বল্য যে একেবারে নেই একথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, আমরাও বলি না। বরঞ্চ বলি, জাপানীদের নৈতিক স্খলন পতন তাদের জীবনকে ভেতরে বাইরে কাব্যমণ্ডিত করবার সুযোগ দিয়েছে যথেষ্ট। কথাটার মধ্যে হয়ত কিছু গলদ রয়ে গেল। কারণ নৈতিক স্খলন পতন মাত্রই যে 'কাব্য' নয় এটাও ভাল করে বোঝা দরকার। এ সত্যটা আধুনিক জাপান সম্বন্ধে যতটা না খাটুক, মধ্যযুগের

জাপান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে খাটে। আলোচ্য বইটা পড়ে এটা আমার কাছে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে মধ্যযুগের জাপান তার দেহচক্রের দ্বারা যে রস-সমুদ্র মন্থন করেছিল তা' থেকে অনেক অমৃত অনেক রত্নই মিল্‌লো, শুধু সুনীতির জন্যে একটু কষ্ট করে হাতড়ে ফিরতে হল তার মধ্যে। কিন্তু জাপানীদের কাব্যমণ্ডিত জীবনাদর্শের ব্যাপক ও সুচারু ভঙ্গী দেখে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

বইটার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হলে লেখিকার সম্বন্ধে আগে কিছু বলা দরকার। কারণ সমস্ত বইটাতে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বৈদগ্ধ্য ছড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ডায়েরীতে নিজের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক উপাদেয় ও দরকারী খবর দিয়ে যান। দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁর জন্ম। শৈশবকাল থেকেই তিনি অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুকঠিন চৈনিক ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেন। এ সম্পদটুকু অনেক দিন পর্য্যন্ত লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন নানা কারণে। পরে যখন Tale of Genji সম্রাটের সভায় পঠিত হয় তখন সকলেই অবাক হয়ে যায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভায়। স্বয়ং সম্রাট একদিন এ বিষয়ে উল্লেখ করেন এবং লেখিকার প্রতিভায় মুগ্ধ হন। কিন্তু কয়েকজন শুধু ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক দুর্নাম রটিয়ে বেড়ায়। তাঁকে বলে দাম্ভিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী। পরে ডায়েরীতে লেখিকা নিজেই এক জায়গায় বলেছেন--কিন্তু যখন তারা আমাকে সত্যিকারের চিনলো তখন দেখলো তারা আমাকে যতখানি উদ্ভট জীব ভেবেছিল আমি মোটেই সে রকম নই। লেডী মুরাসাকীর ডায়েরীতে আরও অনেক মজার খবর পাওয়া যায়। জাপানের প্রধান মন্ত্রীর প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটি তার মধ্যে একটি। ডায়েরীটা আগাগোড়া বিস্ময়কর চরিত্রাঙ্কনে ভরা। দশম শতাব্দীর জাপানের অনেক দরবারী ও দরকারী খবরও এতে পাওয়া যায়। এদিক দিয়েও এটা বহুমূল্য।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১০২০ খৃষ্টাব্দে) যখন তিনি 'গেন্‌জি-পুরাণ' লেখা শেষ করেন তখন তাঁর বয়স খুব বেশী হয় নি। বইটা পড়লে আরও বিস্মিত হতে হয় যে প্রায় হাজার বছর আগে এত অসাধারণ সমীক্ষাপূর্ণ বই লেখা কি করে সম্ভব হল যেটা বিংশ শতাব্দীতেও সমান উপভোগ্য। আধুনিকাদের মধ্যে, রেবেকা-ওয়েষ্ট বা ভার্জিনিয়া-উল্‌ফের মত কোনো লেখিকা এ রকম একটা বই লিখতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন নিশ্চয়ই। সমস্ত বিংশ শতাব্দীর পক্ষেও সেটা গৌরবের বিষয় হয়ে থাকত। বইটা প্রকাণ্ড; ছয় বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত। এতবড় বইকে ক্লান্তিকর করে তুলতে না পারাটাই একটা মস্ত শক্তির পরিচয়। তারপর এর চরিত্রাঙ্কনের চমৎকারিত্ব এবং খুটিনাটি বিশ্লেষণের নিপুণ কারুকার্য্য এ যুগের লেখকদের মধ্যেও বড় বেশী দেখি না, টলষ্টয়, হেন্‌রী জেম্‌স্ বা প্রুস্ত ছাড়া।

এই প্রকাণ্ড বইটার গল্পকাণ্ড বলা বড় সহজ ব্যাপার নয়, যার খুটিনাটিগুলোও ঠিক বাদ দেওয়া চলে না, বইটার ওপর অবিচার না করে। প্রিন্স গেন্‌জি এর প্রধান নায়ক। তার জন্মের পূর্ব্ববৃত্তান্ত থেকে মৃত্যুর পরও অনেক দূর পর্য্যন্ত এর আখ্যান ভাগ। এবং আরও বহু

নায়ক-নায়িকা, নাগরিক-নাগরিকাদের ভীড়ে এর স্থাপত্য। স্বয়ং মকরকেতন এদের সূত্রধার, ভাগ্যনিয়ন্তাও বলা যেতে পারে। দেখি, তাঁর পুষ্পধনুর অত্যাচারে সকলেই অল্পবিস্তর উৎপীড়িত ও অধঃপতিত। প্রিন্স গেন্‌জির জন্মবৃত্তান্তও অদ্ভুত। তিনি জাপান সম্রাটের জারজ সন্তান। এরকম ধরণের জন্ম-সঙ্করতার নিদর্শন এ বইতে বহু মেলে, সম্রাট পরিবারের ভেতরই। গেন্‌জির মাতৃদেবী লেডী কিরিৎসুবো সম্রাটের বিশেষ অনুরাগের পাত্রী ছিলেন। ফলে অন্যান্য সম্রাজ্ঞীদের পৈশুন্যের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হল। পৈশুন্য বা অমঙ্গল চিন্তা যে মৃত্যু ঘটাতে পারে, এ সংস্কার জাপানীদের মধ্যে ছিল। এরও বহু দৃষ্টান্ত বইতে মেলে। এ ব্যাপারটা অনেকটা আমাদের মারণ-মন্ত্রের মত। কোনো আধি বা ব্যাধির উপশমও এই তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারাই ঘটত। অন্যান্য আদিম সভ্য ও অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই আয়ুর্ব্বেদ, ম্যাজিক ও ধর্ম্মাচরণের নিবিড় সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এ বইতে ফুজিৎসুবো, আওই বা গেন্‌জির রোগের সময় শান্তি স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা তার প্রমাণ। আমাদের দেশে হিন্দুদের ভেতর এখনও এ ব্যবস্থা সুপ্রচলিত। এই ধরণের আদিম জাতিদের সংস্কারঘটিত উৎকৃষ্ট গল্প লিখতে এক সমারসেট মোমকেই দেখি সাম্প্রতিকদের ভেতর।

তার পর গেন্‌জির জীবনালোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই সেটা একটানা প্রেমাভিসারের ইতিহাস এবং এই সব অভিসারের লীলায় ছিল মাধুর্য্য, কাব্য আর তীব্র কামুকতা। গেন্‌জির কামমৃগয়ায় অনেক তরুণীকেই কবলিত হতে দেখা যায়। স্বয়ং সম্রাজ্ঞী ফুজিৎসুবো ছিলেন তার মধ্যে একজন। এবং ফুজিৎসুবোর যে পুত্র পরে সম্রাট হন, তিনি আসলে ছিলেন প্রিন্স গেন্‌জিরই পুত্র। এ রহস্যটি অনেকদিন পর্য্যন্ত অপ্রকাশিতই ছিল। পরে সম্রাট রাইওজেন তাঁর জন্মের এ গুপ্ত রহস্যটি এক বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে জান্‌তে পারেন। তো-নো-শুজো প্রমুখ গেন্‌জির বন্ধুবর্গের ভেতরেও এই কামজ আবেগ ও প্রণয়াভিসারের লীলা দৃষ্ট হয়। তদানীন্তন জাপানের সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে ও রাজকীয় কৃত্রিম আচার ও সমারোহের অন্তস্তলে এই প্রচণ্ড কামুকতার স্রোত প্রবাহমাণ ছিল। প্রিন্স গেনজির এদিক দিয়ে খুব সুবিধাও ছিল। তিনি ছিলেন সম্রাটের ও ভগবানের প্রিয়পাত্র। রূপে, গুণে, ব্যক্তিত্বে অদ্বিতীয়। সমগ্র জাপানের তরুণ তরুণীদের পূজ্য ও কাম্য। এ অবস্থায় তাঁর ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা যে খুব প্রশস্ত পথ ও প্রশ্রয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। সমস্ত বইটা এই সব অভিসারের ইতিহাস। বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর গেন্‌জির ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটলো। তিনি শত্রু পক্ষীয় লোকদের চক্রান্তে নির্ব্বাসিত হলেন এক সমুদ্রতীরে। এই ষড়যন্ত্রের ভেতর গেন্‌জির বিমাতা সম্রাজ্ঞী কোকিদেনও লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু গেন্‌জির নির্ব্বাসনের কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে নানা অশান্তি ও দৈবদুর্য্যোগ ঘটতে থাকে। ফলে গেন্‌জি রাজধানীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। রাজধানীতে ফেরবার পর ফুজিৎসুবোর এবং তার কয়েক বছর পর তাঁর প্রিয়তমা পত্নী লেডী মুরাসাকীর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে গেন্‌জির জীবনের ধারা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হতে দেখা

যায়। তিনি বহুকালিমা-লিপ্ত অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে পড়েন। তাঁর পারত্রিক জীবনের শাস্তির ও প্রায়শ্চিত্তের বিভীষিকা তাঁকে শান্তি দেয় না কোথাও। ফলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তাঁর লীলাবসান হল।

কিন্তু প্রধান নায়কের মৃত্যুর পরও গল্প থামলো না। এবং গল্প না থামলেও গল্পের সূত্র অনুসরণ করতে একটুও ক্লান্তি এলো না। প্রধান নায়কের মৃত্যুর পরও গল্প চালানো মহা-শক্তিশালী স্রষ্টাদের ভেতরই দেখা যায়। এইটা শেষ করার পর জাপানের শিল্প-বোধ ও রস-বোধের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তাদের ভেতর প্রেমালাপ চলতো ছোট ছোট লঘুদেহী কবিতায়। তার মধ্যে দুই একটা কবিতা খুব ভালও লাগলো। ওদের ঋতু-উৎসব, সঙ্গীত, নৃত্যকলা অনেক কিছুতেই মুগ্ধ হবার আছে। এ সবের বিশদ রূপায়ণ 'গেন্‌জি-পুরাণে' পাওয়া যাবে। জাপানে বৌদ্ধ প্রভাব এবং তাদের কর্ম্মবাদও দ্রষ্টব্য। কিন্তু অজাচারী, বৌদ্ধ জাপান কর্ম্মবাদী হলেও তাদের প্রাণ যাত্রার মাংসল উচ্ছ্বাস পারত্রিক জীবনকে ঢেকেই রাখতো। তাই তার জীবনে এত ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বিলাস। অবশ্য 'অজাচারী' কথাটা খুব কড়া শোনালেও তার পেছনে আক্রোশ কিছুমাত্র নেই। এই সূত্রে একটা কথা মনে পড়ে গেল। বইয়ের চরিত্র-গুলির লাম্পট্য অনেক সাবধানী পাঠককেই শৃঙ্গার রসের লোভ দেখিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। এর বেগে হাজার পাতা অতিক্রম করাও সম্ভব হবে। এর গূঢ় তাৎপর্য্য মনোসমীক্ষকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া গেল।

লেডী মুরাসাকীর সাহিত্যিক তপশ্চর্য্যার আদর্শ এখনও ফুরোয় নি আমাদের কাছে। তিনি যে এখনও অনেক রসতান্ত্রিকদের গুর্ব্বীস্থানীয়া সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দুঃখ হয় আমাদের সাহিত্যিক মণ্ডলীকে দেখে। তাঁদের তপশ্চর্য্যাও নেই, আদর্শও নেই। আর যদিও বা কোথাও একটু শক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, বড় রকমের কিছু কাব্য-সৌধ, যা শুধু এ যুগের নয় ভাবী যুগেরও—, রচনা করা পারিশ্রমিকে কুলিয়ে ওটে না। অবশ্য, এত বড় দুঃখ নিয়েও একেবারে হতাশ হবার সময় এখনও আসেনি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

হঠাৎ আলোর ঝলকানি—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত (গুপ্ত ফ্রেণ্ডস্)

বাসর ঘর—শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত (ডি. এম্. লাইব্রেরী)

বুদ্ধদেব বাবুর গল্পের বইগুলি থেকে যে প্রত্যাশা আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর পূর্ব্ব প্রকাশিত উপন্যাস তার যথেষ্ট মর্য্যাদা রাখতে পারেনি বলে বার বার আমাদের মনে হয়েছে। কিন্তু "বাসর ঘর" এ অভিযোগ দূরীভূত করতে পারবে এ কথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে। বাসর ঘরের আখ্যান বস্তু পূর্ণাবয়ব, পাত্র-পাত্রী নায়ক-নায়িকার সংস্থিতি মানব চরিত্রের

আবেগ ও রহস্যময় একাংশের সুষমিত চিত্রণে ভাস্বর। এর নায়িকা কুন্তলার মিলনানন্দের মাধুর্য্যে পাঠককে তন্ময় হতে হবে, আবার এর বিবাহিত দম্পতির অপ্রত্যাশিত বিরোধ ও সংঘর্ষের কঠোর নিয়তি পাঠককে ক্ষুব্ধ বেদনার স্পর্শ এনে দেবে। নায়িকার সখী শোভা সেই জাতীয় সুকুমার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে যা নিজেকে বিকশিত যতটা না করে তার চেয়ে বেশী করে পাত্র পাত্রী ও ঘটনা সংস্থাপনকে। পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারে, এমন কি সারা বইটি ভরে সেই আকর্ষণ বজায় রাখতে পারে যে কোন নভেলের পক্ষে একথা যথেষ্ট প্রশংসার বস্তু। আমাদের মনে হয় এ প্রশংসা "বাসর ঘরে"র লভ্য। এর ওপর গ্রন্থকারের ভাষার পারিপাট্য বইটির ঘটনাবলির সঙ্গে চমৎকার সঙ্গতি সংস্থাপন করেছে। এই শেষোক্ত প্রসঙ্গে কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের প্রকাশিত উপন্যাস "চার অধ্যায়" ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদের "অন্তঃশীলা" থেকে বুদ্ধদেব বাবু ভাষার দুই বিভিন্ন টেক্‌নিক্. সংগৃহীত করেছেন। যদি একথা প্রকৃত হয় আমাদের কাছে তাতে কোন লাঘবতা বোধ হবে না কেননা কেবল সেখানেই এ বোধ স্পষ্ট হয় যেখানে সংগৃহীত ষ্টাইল শুধু বহিরাবরণ ও কৃত্রিমতার ছাপ বহন করে। কিন্তু যেখানে আসল গল্প পাঠকের মনকে ভুলিয়ে রাখতে পারে ও তল্লাস করতে অবসর দেয় না এ ষ্টাইল নিজস্ব কিংবা সংগৃহীত, সেখানে গ্রন্থকারেরই জয়।

"বাসর ঘরে"র আখ্যানভাব সামান্য ঃ—মাত্র এক আধুনিক তরুণ দম্পতীর বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের পালা। বিবাহের পূর্ব্বেই পরস্পরের জানাশুনা হয় ও ফলে উভয়ের মধ্যে অসামান্য আকর্ষণ হয়। এই আকর্ষণ-কাহিনী পাত্র পাত্রীর মুখে বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে আবেগ-গর্ভ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। পাত্র পরাশর মানুষ হয়েছিল ধনী মামার বাড়ীতে, সে বাড়ীতে গোষ্ঠীবর্গের বিরাট জনসমাগমের মধ্যে পরাশর কতকটা নিঃসম্পর্কিতভাবেই প্রাগ-বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। এরই ফলে বিবাহের পরিকল্পনার সময় থেকে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে শহর থেকে দূরে বাড়ী ভাড়া নিয়ে আলাদা জীবন যাপন করার জন্য। কুন্তলা সাগ্রহে পরাশরের এই নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে অন্বেষণের প্রয়াসে যোগ দিল কিন্তু সে জানত না যে পরাশরের নিঃসঙ্গতাস্পৃহার দৌড় কতদূর, সে জানত না যে সামান্য গৃহ আসবাব পর্য্যন্ত তার এই নিঃসঙ্গ জীবনব্রতের কণ্টক স্বরূপ হতে পারে। পরাশরের মনোভাব শুধু কুন্তলাকেই চাই—অপর অনেক কিছুই অন্তরায় মাত্র, কুন্তলা এ ভাল হৃদয়ঙ্গম করে না, সে ভালবাসে ফুলের সঙ্গে লতা-পাতা ডাল-পালা, বাগানের পরিশোভা। এই ক্ষুদ্র ব্যাপার থেকে মনান্তরের সুরু হয় ও তা ক্রমে নিষ্ঠুর কলহের পালায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। পরাশরের আচরণ অদ্ভুত বটে কিন্তু পাঠককে বলে দিতে হয় না যে প্রেমের মধ্যেই তীব্র সংঘর্ষ স্বস্থানেই অবস্থিত। আধুনিক যুগে আমাদের শিক্ষা ও সামাজিক অসঙ্গতি এমনই ভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের যুবকদের মানসিক অন্তর্বিরোধ ও অতৃপ্তি একেবারে অস্বাভাবিক নয়। আসবাব আড়ম্বরেরে দৌরাত্ম্যও এমন বিপুল ও ক্লান্তিদায়ক হয়েছে যে ভাবপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রেরই

তার বিরুদ্ধে উষ্মাপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। নানা ভাবে নিত্য এ বিরোধ অসহিষ্ণুতা ও নৈরাশ্যে আত্ম-বিকাশ করছে এবং "বাসর ঘরে"র গ্রন্থকার যে সাহস করে এর ওপর তাঁর উপন্যাস প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটা তেমন আশ্চর্য্যের কথা নয়, আশ্চর্য্য এই যে আমাদের গল্প উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে ইদানীং বিরোধ যথেষ্ট পরিমাণে রূপায়িত হয় নি। গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটা নালিশ আছে—যা অবান্তর তাকে তিনি সচ্ছন্দচিত্তে পরিহার করতে পারেন না, অথচ আর্টের ক্ষেত্রে যোজনা যেমন সার্থকতা আনে অযোগ্যকে পরিহার না করলেও তা তেমনি সার্থকতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

অপর বইটি "হঠাৎ আলোর ঝলকানি" গ্রন্থকারের নানারূপ রচনার সংগ্রহ। রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের হাত একেবারে পাকা ; আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পারি যে এ বইয়ের রচনাগুলি আমরা বিমুগ্ধ চিত্তে পাঠ করেছি। দু'তিনটি সমালোচনার বিষয়ও এ সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। নানা কারণে মনে হয় রচনায় বুদ্ধদেব বাবু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাব অবলম্বন করতে পারেন, গল্প উপন্যাসের অবান্তর অসঙ্গতি ও অসমাপ্তির অভিশাপ এখানে ঠাঁই পায় না। এ বই নিশ্চয়ই সাহিত্যসেবীর আদরণীয় হবে। বিশেষ করে পুরানা পল্টন, ক্লাইভ ষ্ট্রিট, কলকাতা ও ছাদ পাঠকের চিত্ত মুগ্ধ করবে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৪৩

পরিচয়

কেন ?

'কেন'র তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াং' বলিয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ক্ষান্ত হইয়াছেন। এমন কি পাশ্চাত্য চিকিৎসায় যেমন ম্যালেরিয়ার অর্থ এমন জ্বর যাহা কুইনাইনে সারে, তেমনি পাশ্চাত্য মতে বৈজ্ঞানিকতা এমন বস্তু যাহা 'কেন'র তত্ত্বকে দূরে রাখে। যিনি যত বড় পণ্ডিত তিনি তত জোরের সহিত বলিয়াছেন ও প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে এ তত্ত্ব আমাদের আয়ত্ত হইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিক সোজাসুজি বলিতে চাহেন ঘটনা 'কেন' ঘটে তাহা বলিতে পারি না, তবে কি ভাবে কোন্ প্রণালীতে ঘটে তাহা জানি ও বলিতে পারি, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান-শক্তি (যদি তাহাকে ব্যাখ্যান না বলিতে চাও ক্ষতি নাই) এই পর্য্যন্ত। আম কেন মাটিতে পড়ে তাহা জানি না, তবে আম পড়ে, জাম পড়ে, এমন কি চন্দ্রও ঘুরিয়া ঘুরিয়া পৃথিবীতে পড়ে পড়ে করে, পৃথ্বী স্বয়ং সূর্য্যে পড়িবার জন্য লালায়িত,—এই সব দেখিয়া বলিতে পারি বড়র প্রতি ছোটর একটা অনিবার্য্য আকর্ষণ আছে, এবং এ আকর্ষণ যে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান তাহারও সাক্ষী জোয়ার-ভাটায় হাজির আছে। সুতরাং বলিতে পারা যায় পরস্পরকে আকর্ষণ করাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মবলেই আম পৃথিবীতে নামিয়া আসে ; যদি আমটি সূর্য্যের মত বড় হইত তাহা হইলে পৃথিবীটাই আমের দিকে সরিয়া যাইত, এখনও যাইতেছে, তবে তাহা এত সূক্ষ্ম অপসরণ যে তাহার অস্তিত্ব অনুমেয় মাত্র, পরিমেয় নহে। এই বলিয়াই বৈজ্ঞানিক চুপ। একটা ছোট সংসারকে আর একটা বিরাট সংসারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দেখাইয়া দেওয়াই তাঁর ব্যাখ্যান। চোর যদি আদালতে নিজ দোষ সপ্রমাণ দেখাইয়া এই বলিয়া অব্যাহতি চায় যে "আমি ধরা পড়িয়াছি বলিয়াই

চোর, কিন্তু বাস্তবিক চোর কে নয়? আমার যে চৌর্য্য তাহা মানব সাধারণেরই ধর্ম্ম, আমি এই ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ অনুশীলন করিয়াছি মাত্র"—তাহা হইলে চোরের যেমন সাফাই হয়, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অনেকটা সেইরূপ সাফাই দিয়াই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, অবৈজ্ঞানিক লোক নিজেরাই অপ্রস্তুত হইয়া তাঁহার বিরাট গাম্ভীর্য্য টলাইতে সাহস করিতেছেনা, ঘাড় হেঁট করিয়া বলিতেছে "হাঁ ব্যাখ্যান বটে।" আরও দেখা যায়, নামী রাজা ও বৈদ্যের প্রজা ও রোগী মরিলে নিন্দুক ছাড়া কেহই দণ্ড বা অস্ত্রচালনার দোষ দেয় না। দার্শনিক এই নিন্দুক জাতীয় লোক, তাহারা বড় অশিষ্ট প্রকৃতি, উদ্ধতভাবে বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করিতে যায় "কেন"র তত্ত্ব যদি অজ্ঞেয় তবে তাহার জন্য আমরা এত বিব্রত কেন? নিষিদ্ধ ফল বলিয়াই কি আদম-সন্ততিগণের ঐ দিকে এত লালসা? ইহা কি সৃষ্টির একটা দুরন্ত পরিহাস মাত্র? শিশু ছায়া ধরিতে চায়—বড় হইয়া সে ছায়ার স্বরূপ জানিয়া নিবৃত্ত হয়। বৃদ্ধ শিশু অমরত্ব চায়—কিন্তু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেহরূপ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগে তাহার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু এই 'কেন'র তত্ত্ব, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, যাহা হইতে কত প্রেতলোক, কত দেবলোক, কত গন্ধর্ব্বলোকের সৃষ্টি হইতেছে, এবং যাহার সন্ধানে বাহির হইয়া মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কত নিরেট উপাদান আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে,—সে তত্ত্ব যে তিমিরে সেই তিমিরে। পাছে সৃষ্টির বিকাশ থামিয়া যায় এই ভয়েই কি সৃষ্টিকর্ত্তা এই সুপ্রাচীন রহস্যটিকে পরম যত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন? ইহার সহিত তুলনীয় আর একটি তত্ত্ব আছে, তাহা জীবন-তত্ত্ব। জীবন যে কী, ইহার গতি যে কোন্‌দিকে,হঠাৎ জীবন চলিতে চলিতে মরণের দ্বারে ঠেকিয়া সে গতি যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন উহা রূপান্তরিত হইয়া অন্যভাবে আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে কি না, এ সকল অনন্ত রহস্যের কোন মীমাংসা হয় নাই, অথচ মানুষ দুর্নিবার বেগে একান্ত যত্নে সেই সন্ধানেই চলিতেছে। অনুসন্ধেয় তাহার সাত রাজার ধন এক মাণিক, অথচ সন্ধানের ফলে মিলিতেছে মাত্র কাঁটা গাছ—সে তাহাতেই তখনকার মত সন্তুষ্ট থাকিয়া হঠাৎ আবার সামান্য আঘাতেই জাগ্রত হইয়া পুনরায় জীবন রহস্যের উদ্‌ঘাটনে ছুটিতেছে। যুগের পর যুগ, পিতার পর পুত্র—অক্লান্তভাবে এই যাত্রাপথের রহস্য ভেদের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যাত্রার বিরাম নাই। তবে কি 'কেন'র তত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের মধ্যে কোন মূলগত সম্বন্ধ আছে? দেখা যাউক।

'কেন' বলিলে বুঝায় কি উদ্দেশ্যে বা কি কারণে। উদ্দেশ্য ও কারণ নামক দুইটি বস্তুর বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আর নৈয়ায়িকের গর্ত্তে পা দিয়া কাজ নাই। উদ্দেশ্য বা কারণ কোনটিই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না—যদি দেখাইতে না পারা যায় যে তাহা বুদ্ধিমান (Rational) মানবের উপযুক্ত উদ্দেশ্য বা তাহাদের গ্রহণীয় কারণ। অর্থাৎ 'কেন'র অর্থ—Give Reason—যুক্তি দেখাও। যুক্তির আক্রমণ যত তীব্রই হউক না কেন, তাহার শেষ আছে—গণিতে তাহা আমরা দেখিতে পাই,—সেই স্থানটিতে পৌঁছিলে আর তার্কিক নূতন প্রশ্নের অবসর খুঁজিয়া পান না, "প্রমাণ পাওয়া গেল" বলিয়া নিরস্ত হন। গণিতের মত জাগতিক বিষয়েও যদি আমরা দুইটি ব্যাপার বা ঘটনার মধ্যে একত্ব-সম্পর্ক (Relation of Identity) দেখাইতে পারি তাহা হইলে সেই দুই দলের (side) অভিন্নতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। অর্থাৎ যদি আমরা দেখাইতে পারি যে জাগতিক দুইটি ব্যাপার একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র, তাহা হইলে আর তাহাদের মূলগত ও মূল্যগত অভিন্নতা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। ইহাই তর্ক নিরসনের চূড়ান্ত উপায়, এইখানেই 'কেন' প্রশ্নের নিবৃত্তি। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ যত কঠোর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না, এই প্রশ্নের অবকাশ সততই থাকিবে যে এমনতর ঘটনা-সমবায় আসিয়া পড়িতে পারে যেখানে কার্য্যটি ঠিক বর্ত্তমান অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলির মধ্যে এ পর্য্যন্ত যাহা কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নাই। অতএব এই ভাবী আশঙ্কার মূল-চ্ছেদ করিতে হইবে। যতদিন আমরা বর্ত্তমানের তথ্য হইতে কোন সনাতন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইব, অর্থাৎ যেখানে inductive leap থাকিবে, সেখানে এ মূলচ্ছেদ সম্ভব হইবে না। কবে কোথায় কি ব্যতিক্রম ধরা পড়িবে কে বলিতে পারে?—কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী। কে বলিতে পারে যে সান্ত ভিত্তির উপর সনাতনের প্রতিষ্ঠা হইবে না?

মূলে সংশয়ের বীজ থাকিলে ফলে তাহা নিরাকৃত হইবে কিরূপে? সুতরাং নিঃসংশয় তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে প্রয়োজন হইবে ৫ যে ভাবে (৩+২) এর সঙ্গে সমান সেইভাবে সমানতার প্রতিষ্ঠা। এখানে দুইটি দিক একই বস্তুর রূপান্তর মাত্র। বিশ্লেষণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই "এক"এর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে, পার্থক্য খালি রূপগত, বস্তুগত নহে। অতিবড় তার্কিকও এখানে প্রশ্ন তুলিতে পারিবেন না "৫ কেন (৩+২) এর সমান।" অতএব 'কেন'র অর্থ

show cause, state object, give reason, বা যাহাই হউক না, যদি দুইটি ঘটনার মধ্যে এক-বস্তুত্ব-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় তাহা হইলে পূর্ব্বটি হইতে পর-বর্ত্তীটির উৎপত্তি আর প্রশ্নের বিষয়ীভূত হইতে পারিবে না।

কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে প্রমাণের এই চূড়ান্তও থাকিতে পারে কি? দুইটি প্রশ্ন লইয়া অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্‌। প্রথমতঃ যেন জিজ্ঞাসা করা গেল "বাঘ দেখিয়া তুমি পলাইলে কেন?" তুমি বলিবে "বাঘে মানুষ খায়, আমার পূর্ব্বপুরুষদের সময় বাঘের প্রকৃতি এইরূপ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রকৃতি পরি-বর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখি নাই বা সংবাদও পাই নাই। আমি নিজে বাঘের খাদ্য হইতে ইচ্ছা করি না, আর নিরস্ত্র অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিলে জোর করিয়াও বাঘকে খাদ্য সংগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতাম না—বাঘ ও মানুষের আপেক্ষিক দৈহিক বল সম্বন্ধে আমার ধারণা বদল করিবার কোন কারণ ঘটে নাই, তাই ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ঘর ভাঙ্গিয়া বাঘে কিছু করিবে ইহাও আমার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত, এবং বাঘেরও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং ঘরের মধ্যেই নির্বিঘ্নতা স্থির করিয়া ছুটিয়া-ছিলাম। ছুটিবার পথে হয়ত আমার গতি রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারিত, হাত পা হয়ত হঠাৎ নিজ কার্য্যে জবাব দিয়া বসিত, কিন্তু দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে তাহাদের দ্বারা আকস্মিক এ বিদ্রোহের কল্পনাও আমার মনের মধ্যে আসে নাই। কাজেই দৌড়িয়াছিলাম। মানুষ যাহা করে তাহা ঠিক অভীষ্টপ্রদ হইবে জানিয়া করিতে পায় না, ততদূর সূক্ষ্ম হিসাবের শক্তি তাহার নাই,—যাহা অত্যন্ত সম্ভব তাহাই সে করে, আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। দৌড়িবার সময় এত কথা মোটেই আমি চিন্তা করি নাই, আমি যে মানব জাতির সন্তান সেই জাতি নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যাঘ্র দর্শনের পর এইরূপ আচরণ এত কল্পনাতীত কাল হইতে করিয়া আসিয়াছে, যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য নিরূপণে চিন্তার সময়ের প্রয়োজন হইলেও আমার আর সে প্রয়োজন হয় না, নিরস্ত্র অবস্থায় ব্যাঘ্র দর্শন ও হস্তপদের উক্তরূপ আচরণ যেন স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—আমি না ভাবিয়া চিন্তিয়াই ছুটিয়াছিলাম, গায়ে মশা বসিলে যেমন আমরা ঘুমের ঘোরেও নিঃসংশয়ে ঠিক পীড়িত স্থানটিতেই হস্তচালনা করিয়া থাকি, এখানেও তাহাই করিয়াছিলাম, এত কথা কেন ইহার একটি কথাও ভাবিবার আমার অবসর বা প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ব্ব পুরুষেরা এসব ভাবনা আমার জন্য ভাবিয়া রাখিয়া আমাকে তাঁহাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী করিয়া পৃথিবীতে

পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং বাঘ দেখিয়া ছুটিবার মত একটা অতি সামান্য ব্যাপারের কোন কৈফিয়ৎ দিবারই প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এ আচরণ মানব জাতির, সুতরাং আমারও প্রকৃতিসিদ্ধ।" এ উত্তর আপাতদর্শনে একেবারে চরম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখনও প্রশ্ন চলে। (১) কেন আমার জীবনে এই মমতা? (২) পরমুহূর্ত্তেই যখন সব শেষ হইয়া যাইতে পারে তখন 'কেন' এত কষ্ট স্বীকার? এখন উত্তর পাওয়া যাইবে ঃ—"আমি যে এতদিন ধরিয়া বাঁচিয়া আছি ইহা অপেক্ষা অধিক সত্য আমার সম্বন্ধে আর কিছুই নাই। আমার হাত পা শ্বাসযন্ত্রাদি সব এক যোগে কাজ করিয়া আমার এই প্রাণ ধারণ ও তাহাদের নিজেদের দেহ ধারণ ব্যাপার সম্ভব করিয়াছে। দেখা যায় চিন্তাশক্তি না থাকিলেও তাহাদের এই চেষ্টার ত্রুটী হয় না। তাহার উপর আবার আমার চিন্তাশক্তি আসিয়া যোগ দিয়াছে—কোন্‌খানে যে তাহাদের অভ্যস্ত কর্ম্মে বাধা হইবে তাহা সেই চিন্তার সাহায্যে ধরা পড়ে। আজ এই বাঘের দ্বারা হস্তপদাদির অভ্যস্ত কর্ম্ম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, তাই তাহারা আমার বিনা অনুরোধেই আমাকে লইয়া দৌড়িল। চলিষ্ণু গোলক যেমন চলিতেই থাকে, সেইরূপ যে বাঁচিয়া আসিয়াছে, সে বাঁচিতেই চায়, হস্তপদাদি যাহারা কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা কাজই করিতে চায়, কোন বিঘ্নের আশঙ্কা থাকিলে যতক্ষণ পারে তাহার পরিহার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রেও তাহা করিয়াছিল। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই যম পরমুহূর্ত্তেই বহু স্থলে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়াছি। সেখানে আমার বন্ধুগণ পলাইতে না পারিলেও ইচ্ছা করিয়া দেবতাটির অনুগমন করেন নাই, বরং মনে বহু আপত্তিই করিয়াছেন,—কে জানে এই আপত্তির ফলে ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে তাঁহাদের পুনর্জন্মের ব্যবস্থা দ্বারা বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে কিনা? পরমুহূর্ত্তেই সব শেষ হইতে পারে একথা যে আমারও মনে হয় না তাহা নয়, তাহাতে যে আমার প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষাকেও কিছু ম্লান করিয়া দেয় না তাহাও নয়,—কিন্তু তাহা ভাবিয়া বর্ত্তমানে নিশ্চেষ্ট থাকি কিরূপে? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কোথায়? যদি পরপারের খবর ঠিক জানা থাকিত এবং সেখানকার চিত্র যদি এখানকার অপেক্ষা মনোরম হইত তাহা হইলে না হয় বর্ত্তমানকে ভুলিতাম, কিন্তু সে দেশের খবর যে কেহই দিতে পারে না? যাঁহারা সে খবর পাইয়াছেন তাঁহারা যাহা করেন শোভা পায়, আমার পক্ষে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই পরম সত্য। অন্তিম

"পরম মুহূর্ত্তটি" কখন আসিবে জানি না,—কিন্তু আমি স্থির জানি তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তগুলির ভিতর দিয়া আমাকে চলিতে হইবে—কাজেই, সেই যাত্রারই আয়োজন করিতেছি। আর অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য আয়োজনই বা কি করিব? সে ত কাজ বন্ধ করা মাত্র, তাহা ত আপনিই হইবে। যদি জানিতাম সে মুহূর্ত্ত নিবার্য্য বা তাহার পরবর্ত্তী কাল সুস্পষ্ট তাহা হইলেও একটা চেষ্টা হইতে পারিত, কিন্তু ঐ শেষ মুহূর্ত্তও যেমন অনিবার্য্য তাহার উত্তর কালও তেমনি কুহেলিকাবৃত। অতএব অনর্থক বর্ত্তমানের স্থূল উপলব্ধিগুলিকে উপেক্ষা করিব কেন?" ইহার পর আর একটিমাত্র প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে: "অনিশ্চয়ের মধ্যে কাজের এত তাড়া কেন?" "অনিশ্চয়ের মধ্যে কাজ করা কি আমার সাধ? সর্ব্বজ্ঞতা ও অমরত্ব কোনটিই আমার কম আদরের নহে, কিন্তু পাই কোথায়? কাজেই 'অর্দ্ধং ত্যজতি' ভাবে যতদিন পারি বাঁচিয়া থাকি ও যতটা পারি জানিয়া ও বুঝিয়া কাজ করি। সর্ব্বজ্ঞতার তুলনায় আমার এই অর্দ্ধজ্ঞতার মূল্য কিছুই নয় জানি, কিন্তু অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা অল্প নিশ্চয়তার জোরেই যথাজ্ঞান কাজ করা অনেক ভাল বলিয়া মনে মরি।" ইহার পর আরও প্রশ্ন চলে বলিয়া মনে হয় না। এতক্ষণে সমস্ত উত্তরটি যেন গণিতের মত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উত্তরের প্রধান কথা এই:

(১) নিশ্চয়তার উপর কাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।
(২) অভাবে অল্প নিশ্চয়তার উপর কাজ ভাল।
(৩) অজ্ঞতার উপরও কাজ করা বরং ভাল।
(৪) অজ্ঞতার দোহাই দিয়া বসিয়া থাকা সর্ব্বনিকৃষ্ট।

সুতরাং জাগতিক ব্যাপারে গণিতের সমানতা সূত্র যতখানি প্রয়োগ করিতে পারা যায় এখানে তাহা আছে, সুতরাং প্রশ্নের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ চরম উত্তর পাওয়া যায় না। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় কেন?"—তাহা হইলেই বিপদ। কিরূপে অর্থাৎ কি প্রণালীতে তাহা বলা যায়, কিন্তু কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না যে অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব। শুনিয়াছি অনুবীক্ষণ দ্বারা অঙ্কুরকে লক্ষ্য করিলে তাহারই মধ্যে সমস্ত গাছটিকেই, মায় পাতা ও ফল, লক্ষ্য করা যায়। অঙ্কুরের মধ্যেই ভাবী বৃক্ষটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—তাপ, আলোক ও রসের সাহায্যে কেবল তাহাকে ফুটাইয়া তোলা চাই। এইখানে যদি প্রশ্ন করা

যায় "কেনই বা ছোট হইতে বড়র উৎপত্তি হয়, কেনই বা অঙ্কুর তাপ আলোকাদি হইতে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে?" তাহা হইলে সে প্রশ্নের আর উত্তর হইবে না, কেবল বৈজ্ঞানিকের মত গম্ভীর ভাবে বলা চলিবে "এসব প্রশ্ন অতি অবৈজ্ঞানিক।" এবং শত করা ৯৯.৯ টা ক্ষেত্রে এইরূপ অর্দ্ধেক জবাব দিয়াই নিবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু দার্শনিকের হাতে নিস্তার নাই। তিনি বলেন— "What we ought we can"। সুতরাং এই কেনর তত্ত্ব যদি অনিবার্য্য ভাবে আমাদিগকে পীড়িত করিতে থাকে, আমরা যদি বোধ করি যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমাদের উচিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সে উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ। কিন্তু উত্তর কোথায়? বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে যদি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া না যায় ত কোথায় তাহার সন্ধান মিলিবে?

জগতে কি দুইটি জিনিষ ঠিক এক আছে যে একটি হইতে অপরটির—পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পরবর্ত্তীটির—উৎপত্তি অনিবার্য্য ভাবে আসিয়া পড়িবে? এই দুইটি বস্তু অতি সামান্য অংশেও যদি বিভিন্ন হয়, এবং এ বিভিন্নতা যদি প্রকৃত হয়, অর্থাৎ যদি দৃষ্টি-গত ভ্রম মাত্র না হয়, তাহা হইলে কোন রূপেই সেই পার্থক্যের উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে না। অঙ্কে যখন দক্ষিণ ও বামবর্ত্তী দুইটি রাশিকে এক বলিয়া ঘোষণা করি তখন বিভিন্নতা কেবল বাহ্য মাত্র, চক্ষের দেখিবার দোষে দুটি দিককে স্বতন্ত্র দেখায়, অভ্যস্ত চক্ষু হইলে দুই দিককেই অভিন্ন বলিয়া ধরিতে পারে এবং এই চক্ষু লাভ করিবার জন্য রীতিমত শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যেখানে পার্থক্য প্রকৃত, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই—সেখানে তাহার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিবে কিরূপে?

আম+যাম=কাঁঠাল হইতে পারে না, সুতরাং বৈজ্ঞানিকের মত কেবল বলিতে হইবে এই রকমই সর্ব্বত্র হয় ও সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই,—অতএব গোলযোগের কোন কারণ নাই, উপযুক্ত উদ্দেশ্য, কারণ বা যুক্তির অনুসন্ধান করিতে যাওয়া কালক্ষয় মাত্র। মানুষের বুঝিবার মত একটা উদ্দেশ্য দেখাইয়া দিতে হইলে সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের মূলে এমন একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব বাহির ও প্রমাণ করিতে হইবে যিনি ঠিক মানুষের মতই চিন্তা করেন; সুধু আবার তাই নয়, তিনি অসভ্যের মত মোটামুটি উদ্দেশ্য রাখিয়াও কাজ করিতে পারেন, আবার নৈয়ায়িকের মত সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যেও কাজ করিতে পারেন,--কাজ অথচ উভয়

ক্ষেত্রেই একরূপ হয় (কারণ একই কাজের ব্যাখ্যা তুই জাতির পক্ষে তুইরূপ)। কিন্তু কে সেইরূপ কর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণের দায়িত্ব স্বীকার করিবে ? কে বলিবে জগতের নিয়ন্তা ঐরূপ এক রহস্যময় চৈতন্য পদার্থ ? তাহা লইয়া দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আস্তিকগণের মধ্যেও স্বীকৃত হয় না যে তিনি সভ্যাসভ্য সর্ব্ববিধ মানবের যত উদ্দেশ্য রাখিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

সুতরাং সে পন্থা ত্যাগ করিয়া দেখা যাউক অন্যরূপে এই 'কেন' তত্ত্বের এই জিজ্ঞাসা প্রবৃত্তির নিরসন হয় কিনা। পূর্ব্বেই দেখানো গিয়াছে জগতে যতদিন একাধিক বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন একটি হইতে অপরটির উৎপত্তি নিঃসংশয়িতরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হইবে না,—কেন'র তত্ত্ব রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে। তবে উপায় কি ? এ তত্ত্ব নিরসন করা যদি What you ought you can এই theoryর উপর সম্ভব বলিয়া বিবেচিতই হয় তাহা হইলে একমাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে। প্রমাণ করিতে হইবে জগতে তুইটি বস্তু নাই, একমেবাদ্বিতীয়ং।

কিন্তু সে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার ভারও বহু পূর্ব্বে বেদান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সেখানে বাচালতার কোন প্রয়োজন নাই। আমি খালি এইটুকু দেখাইব যে ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে 'কেন'র হাঙ্গামা মিটিয়া যায়,—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

যে কোন জিজ্ঞাসার মূলে আছে জিজ্ঞাসু আত্মার অতৃপ্তি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র আত্মা থাকিলে এ অতৃপ্তি কোন মতেই জন্মিতে পারে না। থাকার অর্থ অন্ততঃ "টিঁকিয়া থাকা"—যাহাতে টিঁকিয়া থাকা যায় এরূপ কিছুর অভাব সে বস্তুতে ঘটিলে তাহার পক্ষে টিঁকিয়া থাকা অসম্ভব—কারণ সে অভাব দূর হইবার আর উপায় নাই। আমরা সীমাবদ্ধ জীব যে অভাব অনুভব করি, বাহির হইতে কোন মতে তাহা পূরণের চেষ্টা করি; যতদিন তাহা পারি ততদিন টিঁকি, তাহার পরই ক্ষয় ও শেষে মরণ আইসে। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যিনি একক তাঁহার অভাব কে পূরণ করিবে ? কোন বস্তু বা ব্যক্তি যাঁহার বাহিরে নাই, তাঁহার অভাব পূরণের উপায়ও নাই। সুতরাং তিনি টিঁকিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে তাঁহার অভাব হয় না, তিনি পূর্ণ। আর অভাব হওয়া সম্ভবও নহে। অভাবের প্রকৃতি কি তাহা অবশ্য মানবীয় অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতে হয়। ভূমিষ্ঠ শিশু জন্মের খানিক পরেই কাঁদিতে আরম্ভ

করে। ইহার কারণ হয়ত বাতাস আলোকাদির সহিত সংঘর্ষ, অথবা ভিতরের ক্ষুধা তৃষ্ণা। এখানে দুইটারই মূল বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব। বাতাস প্রভৃতি অপরিচিত নূতন বস্তুর আঘাত সে সহিতে না পারিয়াই হয়ত কাঁদিয়া উঠে,—অথবা তাহার যে জীবশরীরটিকে বহুদিন বাহির হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে হইবে, ভিতর হইতে তাহা পাইবার জন্য কান্না উঠে। তুলনার বস্তু না থাকিলে যেমন ছোট বড়, ধনী দরিদ্র ইত্যাদি বোধ জন্মে না—আমার মনে হয় বাহিরের বস্তু না থাকিলে শিশুও পূর্ব্বোক্ত রূপ আঘাত বা আকাঙ্ক্ষায় চাঞ্চল্য অনুভব করিত না। ভিতরটা বাহিরের মত করিয়াই প্রস্তুত হয়—ভিতর বাহির দুইটাকে লইয়াই পূর্ণতার সৃষ্টি—ভিতরে আকাঙ্ক্ষা বাহিরে চিকিৎসা দুইয়ে মিলিয়া শান্তি—অন্ততঃ সাময়িক ভাবে। বৈজ্ঞানিক বলেন আমরা গঠিত হইয়াছি বাহিরের দ্বন্দ্বে, কাহারও কাহারও মতে, আমাদের হাত পা হইতে মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত সমস্তই বাহিরের সহিত সংঘর্ষের ফল। যেখানে বাহ্য নাই অথচ বস্তুটি আছে—সেখানে সে বস্তু স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর। এরূপ কোন বস্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে স্বীকার করে কিনা জানি না, কিন্তু প্রামাণ্য যদি মানিতেই হয় তাহা হইলে বেদান্তকারের সাক্ষ্য তাঁহাদের অপেক্ষা কম প্রামাণ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারাও কেহ কেহ কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে সাপের গর্ত্তে আসিয়া পড়িতেছেন,—জড়-বিজ্ঞানের পথে চলিয়া শেষে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। Lord Kelvin প্রভৃতি Oliver Lodge-কে Great scientist gone mad বলিয়া এখন উপেক্ষা করেন, ইহার মধ্যে সত্যের যে একটা ইঙ্গিত আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। Lodge-এর ঐ সিদ্ধান্ত তাঁহার একলার নহে, তাঁহাকে পাগল বলিতে হইলে প্রাচ্য পণ্ডিত অনেককেই পাগল বলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকের মত সাহস বা দুঃসাহস আমার নাই—যতটুকু পাইয়াছি ততটুকু বিশ্বাস করিব ও যতটুকু নিজে পাই নাই ততটুকুকে ভুল বলিব এ ঔদ্ধত্য বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও মার্জ্জনীয় বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক আমি এখানে হয় তূষ্ণীম্ভাব নয় বিশ্বাস এ দুইয়ের একটিতে রাজি—অবিশ্বাস করিতে পারিব না। Lodge সাহেব এতদিন কিছু ভুল করিলেন না, সকলেই তাঁহাকে পরম পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনি যাহা শেষে বাহির করিলেন তাহা পরীক্ষাগারের বাহিরে। এই জন্যই তাহা অবিশ্বাস্য হইবে? আর তিনি ঘুষ খাইয়া মানব সমাজকে ঠকাইতে বসিয়াছেন এটাও কেহ বলেন না। সুতরাং আমি

বিশ্বাসই করিব।—আমি বলিব অভাবশূন্য আত্মবস্তু আছে—তাহা এক ও অব্যয়। এখানে আর এক কথা উঠিতে পারে। কেহ বলিবেন সেই পূর্ণ বস্তু যদি কোন মতে নিজেকে আহত করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ মানুষ যেমন ঘুমের ঘোরে নিজের হাতকে চাপিয়া পরে বেদনা অনুভব করিতে পারে, সেই ভাবে কোন বেদনা বা অভাব বোধ কি সেই বস্তুর পক্ষে সম্ভব নহে? নিশ্চয়ই নহে। এখানেও অভাব-বোধের মূলে বাহিরের বিছানা, যাহা এক বস্তুর পক্ষে অস্তিত্বহীন। কেহ বলিতে পারেন মানুষ যেমন নিজের হাত নিজের দাঁতে কাটিয়া কষ্ট বোধ করিতে পারে, সেইরূপ অভাব-বোধও কি ঐ অদ্বিতীয় আত্মবস্তুর পক্ষে সম্ভব নহে? ইহারও উত্তর—না। এখানেও দংশনে শরীরের যেটুকু অভাব ঘটিল তাহা বাহির হইতেই পূরণ করিতে হয়। অন্ততঃ 'কাল' নামক বাহ্য বস্তুর সহায়তায় শরীরকে নিজ চেষ্টাতেই ঐ অভাব দূর করিতে হয়। কিন্তু উভয়ত্রই 'বাহ্য' বস্তুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। যেখানে বস্তু 'একটি' মাত্র সেখানে দাঁতের দ্বারা হাত কাটিলেও হাতের ঘা সঙ্গে সঙ্গে শুকাইবারও ব্যবস্থা হইবে, সুতরাং অভাব বোধ থাকিবে না। কিন্তু চিকিৎসার ব্যবস্থা ভিতর হইতে চলিলেই কি আঘাতের বেদনা বোধটাও চলিয়া যাইবে? আমার মনে হয় "বেদনা বোধ অনেকটা ঘোড়া দেখিলে খোঁড়া" হওয়ার মত। সহরে যতদিন ট্রাম ছিল না ততদিন লোকে বেশ পায়ে হাঁটিয়াই যাতায়াত করিত, এখন ট্রাম দেখিলেই পা যেন আপনা হইতেই নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। খুব স্বাস্থ্যবান না হইলে লোকে খাবার দেখিলেই ক্ষুধা (অর্থাৎ খাইবার ইচ্ছা) অনুভব করে। মদের দোকান না থাকিলে যে কত লোক মদ ছাড়িত তাহার আর সংখ্যা নাই; বৈকালে যাহাদের 'দারুর' মৌতাত বহু পুরাতন, তাহারাও হয়ত ঐ দারুরই কৃপায় জেলে গিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বিকাল বেলাটা কাটাইয়া দেয়। ইংরাজ দেশে নিজের হাটবাজার সবাই নিজে করে,—কিন্তু ভারতে আসিয়াই তাহাদের Boy চাপরাশী খানসামা খিৎমৎগার নানারকম দরকার হয়, দেশে গিয়া আবার সব ঠাণ্ডা। গ্রীষ্মে তৃষ্ণা সর্ব্বত্রই পায়, কিন্তু সহরে সরবৎ সম্মুখে থাকিলে তৃষ্ণা যেন ছাড়িতেই চায় না, এদিকে মরুভূমির বণিকদল দিনের পর দিন বিনা জলে কাটাইয়া দেয়। তাই মনে হয় বেদনা বোধ অনেকটা বেদনা-দূরীকরণের উপায়-সাপেক্ষ; দেখা যায় সে উপায় যত অধিক বা অল্প, বোধও তত অধিক বা অল্প—সুতরাং বলিতে পারা যায় ঐ উপায়ের আত্যন্তিক অভাব ঘটিলে বেদনা বোধের

আত্যন্তিক অভাব ঘটে। তা ছাড়া উক্ত বোধ আমাদের আসে বা থাকে কেন? একই জিনিষ অবস্থা ভেদে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করে। স্বেচ্ছায় অঙ্গুলিদংশনে বেদনার বড় কিছু নাই, কিন্তু অকস্মাৎ ঘটিলে কষ্ট দেয়, তখনই আমরা নিজেদের সসীমতা বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইবার চেষ্টা করি। কারণ যাহা আকস্মিক বলিয়া বোধহয় তাহা কোন অপ্রত্যাশিত বা অভিনব কারণ-পরম্পরার সমবায়ে উৎপন্ন। এরূপ আকস্মিকতার অবসর ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর পক্ষে নাই। যেখানে বাহিরের, সুতরাং অপরিচিত, কিছুই নাই, সেখানে সমস্ত পরিবর্ত্তন সুবিদিত ঈপ্সিত কারণেই উৎপন্ন, অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে "স্বপ্রকাশত্ব" ও "ইচ্ছাময়ত্ব" আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এখানে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। মানুষ বৈদান্তিকের সোঽহং স্তরে উত্তীর্ণ হইলে যখন ইচ্ছাময়ের সহিত মিশিয়া যায়, তখন জাগতিক সমস্ত পরিবর্ত্তনকেই সে নিজ ইচ্ছা অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা-প্রসূত বলিয়া অনুভব করে; সুতরাং সংশয়ের অবসরও ঘুচিয়া যায়—তাহার "ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।" 'কেন'র পীড়ন হইতে সে তখন চিরকালের মত মুক্তিলাভ করে। সসীম জীবনের অনন্ত প্রহেলিকাও সেইদিন ঘুচিয়া যায়, ক্ষুদ্র মানুষ বুঝিতে পারে সে বিরাট্ হইতে পৃথক নহে, তাহাকে কোন বিশেষ অভাবের হাত এড়াইয়া আবার এক নূতন অভাবের পীড়ন ঘাড়ে করিতে হইবে না,—সে নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ অসীমত্বকে সসীম করিয়াই অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে,—এই অভাবই তাহার, অর্থাৎ সেই অসীম লীলাময়ের, সসীম লীলা। ইহা চক্ষুষ্মাণের সাধ করিয়া অন্ধ সাজার মত খেলা, ইহাতে মারাত্মক (serious) কিছুই নাই।

তাই বলিতেছিলাম 'কেন'র তত্ত্ব ও জীবন-তত্ত্ব একসূত্রে গ্রথিত, একই কারণে উভয়ের উৎপত্তি এবং একই সত্য প্রতিষ্ঠায় উভয়ের অবসান। দুটিই মায়িক ও মিথ্যা।

৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গেল বারে তলোয়ার বাঁধা সম্বন্ধে যা বলেছি, সেটা বস্তুতঃ বাজে কথা। মানুষের মনোবৃত্তি সেই আদিম কাল থেকে বিশেষ কিছু বদলায় নেই। আবেষ্টন বদলেছে, তাই মানুষ এখন মুখোস পরে বেড়াতে শিখেছে। ক্রিকেট, ফুটবল খেলাতে যে আনন্দ, যে মজা, বন্দুক তলোয়ার চালানতে তার চেয়ে বরং বেশী আনন্দ পাওয়া যায়! এ ব্যাপারের সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক নেই। অপব্যবহার ত সব জিনিসেরই আছে!

আহমদাবাদ ছাড়বার সময় আমি একটী সুন্দর হালকা দেখে রাইফেল বন্দুক কিনেছিলাম। ভালই করেছিলাম, কেন না বিজাপুরে এসে দেখি, যেখানে সেখানে অজস্র হরিণ। মনের আনন্দে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ক্ষেতের শস্য ধ্বংস করছে। সকাল বেলায় যখন আমি আমার নিত্যকর্ম্মে বেরোতাম, এই বন্দুকটী সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত। সময় পেলেই হরিণের পেছনে ধাওয়া করতাম, নসীবে থাকলে এক আধটা মেরে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরতাম। এতে চাষীরাও খুশী হত শত্রুনাশ হল বলে, আমার লোকজনও খুশী হত পেট ভরে মৃগমাংস খাবে বলে। কদাচ কখন হরিণ মেরে গ্রামের লোককেও দিয়ে আসতাম। গরীব দুঃখী আনন্দ করে খেত। দুবছর ক্রমাগত এই কীর্ত্তি করে হাতটা বেশ পাকল। ছেলেবেলায় রাইফেল ছুড়তে শিখি নেই বলে মনে একটা আপসোস ছিল। কিন্তু শুধু কি রাইফেল ছুড়তে শিখলাম! আরও কত রকম অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল!

বিজাপুরের হরিণ অধিকাংশই কালিয়র বা কৃষ্ণসার। নরগুলোর রঙ্গ কালো, কিন্তু মাদীর রঙ্গ পাটকিলে। হরিণীর শিঙ্গ নেই, কিন্তু হরিণের মাথায় লম্বা লম্বা ইস্ক্রুপ প্যাঁচের মতন এক জোড়া শিঙ্গ। দূর থেকে দেখায় যেন রাজার মাথায় শির-পেঁচ। চলেও তেমনি, মাথা তুলে বুক ফুলিয়ে, গজেন্দ্রগমনে। প্রত্যেক পালে এই রকম এক একটি মহারাজ থাকে। একটী মাত্র, বাকী সব মাদী। মাদীগুলো রাজার বাঁদী। তাঁকে আদর যত্নও করে, পাহারাও দেয়। রাজা যখন শস্যক্ষেতে

চরে বেড়ান, কি সবুজ ঘাসের উপর গা ঢেলে দিয়ে বিশ্রাম করেন, তখন তিনি নির্ব্বিকার, বে-পরোয়া, কোন দৃকপাত নেই। কিন্তু তাঁর পার্শ্বচরীরা সদাই সজাগ। কোথায় একটু খুট করে আওয়াজ হল, কোথায় হাওয়ার সঙ্গে একটু বারুদের গন্ধ উড়ে এল, কি অমনি চট করে প্রভুকে সাবধান করে দিয়ে এক নিঃশ্বাসে ছুট! শিকারীর সৌভাগ্য যে সামাল করে দেওয়ার পরেও রাজা মহাশয় একবার ঘাড় বেঁকিয়ে নিজে দেখে নেন যে সত্যি ভয়ের কারণ আছে কি না। সেই সময়টুকুর মধ্যে বেশ তাক করে গুলি চালান যায়।

বাচ্চা হরিণ বাপের দলে থাকতে পায়, যতদিন না তার রঙ্গ কালো হয়, শিঙ্গ লম্বা হয়। কিন্তু বয়সপ্রাপ্ত হলে তাকে দল ছেড়ে যেতেই হবে, কেন না হরিণ-রাজ্যে Dyarchyর ব্যবস্থা নেই। তবে এই নির্ব্বাসন ব্যাপারটা সব সময় সহজে সমাধা হয় না। কখন কখন বাপ-বেটায় ভীষণ সংগ্রাম হয় সিংহাসনের জন্য। একবার এই রকম একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সকাল বেলায় এক পাহাড়ে রাস্তায় ঘোড়ায় চেপে চলেছি। কোলে নিত্য সহচর রাইফেলটী। সামনে দৌড়চ্ছে একজন ভুঁইয়া আমাকে পথ দেখিয়ে। এমন সময় দূরে উপর পানে দেখতে পেলাম এক মস্ত দল Doe (মাদী হরিণ) চরছে। নরটা নজরে পড়ল না। আমার হাতে কাজ-কর্ম্ম সেদিন কম ছিল। টপ করে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে, বন্দুক হাতে ছুটলাম সেই মৃগযূথের সন্ধানে। ঘোড়া-টাকে সেইখানেই রেখে গেলাম ভুঁইয়ার হেপাজতে। কিন্তু হরিণশিকারে ত অনেক ঘুরে ফিরে লুকিয়ে চুরিয়ে এগোতে হয়। খানিকটা পথ গিয়ে এক শুকনো ঝোরা পেলাম। সেইটা ধরে গুড়ি মেরে পাহাড়ের মাথা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছে একখানা বড় পাথরের চাঙ্গড়ার পেছনে লুকিয়ে চারিদিকে নজর করতে লাগলাম। দেখি, শখানেক কদম দূরে সেই Doeগুলো, প্রায় কুড়িটা হবে, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাঝখানে যেন সার্কাসের আসর। সেই আসরে তুই কালিয়রের যুদ্ধ হচ্ছে। যখন প্রথম নজর পড়ল তখন মাথা নীচু করে শিঙ্গে শিঙ্গ আটকে তুজনে তুজনাকে প্রাণ-পণে ঠেলছে, পিছু হটাতে চেষ্টা করছে। একবার এটা তু পা হটছে, আবার ওটা তু পা হটছে। এই ভাবে চলেছে। একটার রঙ্গ মিশ কালো, প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা শিঙ্গ। অন্যটা তার চেয়ে কম বয়সের, শিঙ্গ ছোট, রঙ্গ ফিকে। তুজনার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে। হঠাৎ শিঙ্গ ছাড়িয়ে নিয়ে তুজনেই পিছু হটে গেল। একটুক্ষণ

ঘুরে ঘুরে পরস্পরকে পাশ থেকে বুকে পেটে ঢু মারতে চেষ্টা করলে কিন্তু কেউই সুবিধা করতে পারলে না। তখন আবার দুজনে শিঙ্গে শিঙ্গ লাগিয়ে কুস্তী করতে লেগে গেল। মাদীগুলো চারিদিকে নীরবে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখছে। আমি বন্দুকে টোটা ভরেছি, কিন্তু মারতে হাত উঠছে না। মুগ্ধ হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখতে লাগলাম। প্রায় পনের মিনিট ধস্তাধস্তির পর বুড়ো কালিয়রটা হার মানলে। শিঙ্গ ছাড়িয়ে নিয়ে একটু তফাতে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়াল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে, তার পর ধীরে ধীরে আপন মনে একদিকে বেরিয়ে চলে গেল। মাদী-গুলো তার দিকে ফিরেও চাইলে না। নূতন রাজার কাছে ঘেঁষে গিয়ে সোহাগ করে তার গা চাটতে আরম্ভ করলে। আমার মনে বড় আনন্দ হল। পশুর রাজ্যে এ রকম একটা নাটক, tragedy বা comedy, দেখার সৌভাগ্য ত বড় একটা হয় না! টোটা খুলে নিয়ে খালী বন্দুক কাঁধে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেলাম।

একদিন কিন্তু আমি নিজেই এক ভীষণ tragedyর হাত হতে বেঁচে গেছলাম। গল্পটা শুনুন। বৈশাখ মাস, বেলা প্রায় বারোটা, প্রখর রোদ। চারিদিকের পাথর-মাটি ভীষণ তেতে উঠেছে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। মাটির উপরকার রোদটা যেন নাচছে। আমি সারা সকালবেলা খেটেখুটে শ্রান্ত হয়ে টঙ্গা হাঁকিয়ে ক্যাম্পে ফিরছি। হঠাৎ বাঁ পাশে প্রায় একশো দেড়শো কদম দূরে দেখি এক জওয়ারী ক্ষেতের কিনারায় দাঁড়িয়ে এক কৃষ্ণসার মনের সুখে জওয়ারী ধ্বংস করছে। কাছা-কাছি হরিণী একটাও দেখলাম না। এমন সুবিধা কি ছাড়া যায়! তাড়াতাড়ি সহিসের হাতে রাশ ফেলে দিয়ে, নেমে পড়লাম বন্দুক নিয়ে। চুপি চুপি সহিসটাকে বললাম "তুই গাড়ী হাঁকিয়ে খানিকদূরে এগিয়ে যা। তা হলে হরিণের নজর তোর দিকে থাকবে।" আমি রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাটির উপর দুই কনুই রেখে খুব যত্ন করে নিশানা করলাম হরিণের ছাতি বরাবর যেখানটায় পিঠের কালো রঙ্গ শেষ হয়ে পেটের সাদা রঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। সবে একশো কদম দূর, মাটির উপর কনুই, আমার হাত পাথরের মত অটল স্থির, এ হরিণের আর রক্ষা নেই! এই না ভেবে যেই বন্দুকের ঘোড়া টিপতে যাচ্ছি কি আমার কৃষ্ণসার হঠাৎ পেছনের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। নগ্ন কালো দেহ, পরনে সাদা ধুতি, হাতে কাস্তে। আমার বুক দুড় দুড় করে উঠল। কি ভয়ানক! বন্দুক ফেলে দিয়ে দু হাতে চোখ ঢেকে মিনিট-ভর শুয়ে রইলাম। একটু সুস্থ মনে হতেই দাঁড়িয়ে

উঠে লোকটাকে কাছে ডাকলাম। চেঁচিয়ে তাকে ধমকালাম, "হতভাগা বদমায়েশ, এই রোদে কাস্তে হাতে ওখানে কি করছিলি ?"

লোকটা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় ভাবলে, "হাকীমটা পাগল হয়েছে না কি! রাস্তার উপরে বন্দুক নিয়ে শুয়ে করছিল কি ?"

আমি তখন রীতিমত বোকা বনে গেছি। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ঝনাৎ করে লোকটার সামনে ফেলে দিয়ে টঙ্গার দিকে পালালাম। গাড়ীর কাছে যেতেই সহিসটা আবার মেজাজ বিগড়ে দিলে। উল্লুকের মতন হেসে বললে, "সাহেব! ও হরিণটা ত হরিণ ছিল না, মানুষ!"

"চুপ রহো, উল্লুক!" বলে আমি টঙ্গায় চড়লাম। রাশ হাতে নিয়ে ঘোড়া দুটোকে এমন চাবুক কষলাম যে তারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। এই ঘটনার পরে প্রায় একটি মাস বন্দুক ছুঁই নেই।

আমি ত নসীবের জোরে এক ভীষণ অপকীর্ত্তির হাত থেকে রক্ষা পেলাম! কিন্তু এই বিজাপুরেরই আমার পূর্ব্ববর্ত্তী এক হাকীম এই রকম একটা ব্যাপারে বড় নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের বন্দুকের নিশানা যে অব্যর্থ ছিল, এ কথা তাঁর অতি বড় দুশমনও কোন দিন বলতে পারত না। হয়ত তাঁর কখন শিকারে না বেরোনই উচিত ছিল। কিন্তু বড় সাহেব, রাজার জাত, বন্দুক না ধরলেও নয়। ভবিতব্য! একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিয়ে এলেন। এ রকম ক্ষেত্রে কিছু মোটা রকম পয়সা খরচ করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু কর্ত্তাটি আবার পয়সা খরচ করা পছন্দ করতেন না। কাজেই চোখ রাঙ্গিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করবার উদ্যোগ করলেন। এতে ত স্থায়ী ফল হয় না! হঠাৎ একদিন পুণার "কেশরী" কাগজে সাহেবের দুষ্কর্ম্মের কথা সব জাহির হয়ে গেল। তার ফলে তাঁকে বড় সাহেবদের কাছে অনেক রকম কৈফিয়ৎ দিতে হল, অল্পবিস্তর ধমকানিও খেতে হল। শিকারের অনেকগুলো নিয়ম কানুন আছে—যাকে বলে unwritten laws। সেগুলো লোকে পালন করে কি না, দেখবার ভার থাকে জেলা হাকীমের উপর। সাধারণতঃ জেলাহাকীমেরা এ বিষয়ে খুব কড়া নজরও রাখেন। কিন্তু যেখানে হাকীম স্বয়ং দোষী, ও সেই দোষ ঢাকবার জন্য নানা কারোয়াহি করেন, সেখানে আমলা মহলের কারও তাঁর উপর দরদ থাকে না। এঁর তাই বড় বদনাম হয়েছিল। আমি বিজাপুর পৌঁছেই এ গল্প ক্লাবে শুনেছিলাম আহমদী

ও অন্য সাহেবদের কাছে। তাঁরা আমাকে সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ত গল্পটা আমাকে বলেছিলেন।

এই সময়ে বিজাপুরে K বলে এক তরুণ উকীল ছিলেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তিনিই "কেশরী"র খাস সংবাদ্‌-দাতা। উপরি উক্ত হাকীম মহাশয় এই Kর উপর নানা রকম জুলুম করার চেষ্টা করেন, রাগের মাথায়। কিন্তু কমিশনার বা সরকারের সহানুভূতির অভাবে কিছু নোকসান করতে পারেন নেই। আমার সঙ্গে Kর খুব ভাল করেই আলাপ হয়েছিল। নিজে চেষ্টা করে আলাপ করেছিলাম। ভদ্রলোককে যথার্থ দেশপ্রেমিক বলে আমার মনে হয়েছিল। বিজাপুর আহমদাবাদের মত জায়গা ছিল না, সেখানকার অনেক বড় বড় লোকই কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। তবে তাঁদের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে আমার কিছু মনের মিল ছিল না। তাঁরা ছিলেন "আবেদন আর নিবেদনের থালা, বহে বহে নতশির"। K. ছিলেন অন্য প্রকারের লোক। হাকীম যখন তাঁকে রাজদ্রোহ অপরাধে জড়াতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি হাকীমকে স্পষ্টই বলেছিলেন, "আপনি ত রাজা নন যে আপনার কাজের প্রতিবাদ করা নিষিদ্ধ বা আইন-বিরুদ্ধ মনে করব। আর, মৌখিক রাজদ্রোহে আমার কোন আস্থা নেই, এটা স্থির জানবেন।" K-র সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেশ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হত। তাঁর রাষ্ট্রনীতি দেখলাম বেশ পরিষ্কার খোলাখুলি রকমের, তাতে কোন ঘোর পেঁচ ছিল না। ভদ্রলোক জাতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁর স্বপনের রাষ্ট্রে বিন্দুমাত্র জাত বা সম্প্রদায় ভেদ ছিল না। এ রকমের মনোভাব দাক্ষিণাত্যে আজও বিরল। K বারবার বলতেন যে যথার্থ দেশ-সেবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় তিনি আছেন। পরে ১৯০৬-৭ সালের আন্দোলনে, শুনলাম, ইনি আপন জেলায় স্বদেশী প্রচারের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতারা এঁর একনিষ্ঠ কাজ দেখে যথার্থ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তবে ভদ্রলোককে জেলে-টেলে যেতে হয়েছিল কি না, মনে নেই।

হ—বলে আর একজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে বিজাপুরে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর কর্ম্মের ধারা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের। বস্তুতঃ তাঁকে কর্ম্মী বলাই ভুল। তিনি ছিলেন পেশাদার বাগ্মী, বাক্যে ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস। গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, নানা রকম আবোল-তাবোল বকতেন, যত বা গালাগালি দিতেন সরকারকে, ততই দিতেন কংগ্রেস-নেতাদিকে। পুলিস রিপোর্ট

থেকে প্রথম তাঁর অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম। একটু আশা হল। তরুণ কর্ম্মী, লেখাপড়া জানা মানুষ, কষ্ট সহ্য করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়ত সত্যি কাজের লোক ! কিন্তু অল্পদিন খবরাখবর নিয়েই বুঝতে পারলাম যে বানর বিশেষ। শেষ একটা সামান্য বিষয়ে আমার সঙ্গে সোজাসুজি বিরোধ বাধল। সে বছর অনাবৃষ্টির দরুন বৈশাখ মাস পড়তে না পড়তেই নানা জায়গার ইঁদারা শুকিয়ে যাবার খবর আসতে লাগল। আমার এলাকার এক শহরে অত্যন্ত জলকষ্ট হল। কলেকটর সাহেবের কাছে কিছু টাকা চাইলাম ইঁদারাগুলোর তলা বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেবার জন্য। সাহেব লিখলেন—আপাততঃ হাতে টাকা নেই, হপ্তা দুই বাদে হয়ত দিতে পারব। আমি চাঁদা তুলে টাকা সংগ্রহ করলাম। অবশ্য নিজেকেও কিছু দিতে হল। সুড়ঙ্গের কাজ আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে বন্ধুবর হ— সেই শহরে এসে পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলেন, জুলুম করে টাকা আদায় হচ্ছে, তোমরা চাঁদা দিও না, ইত্যাদি। রাগ হল। লোকটীকে ক্যাম্পে ধরে আনালাম। তিনি মাতৃভূমি সম্বন্ধে অনেক লম্বা চওড়া কথা কইলেন, আমাকে দেশদ্রোহী সরকারী লোক বলতেও ছাড়লেন না। আমি তাঁকে জানালাম যে আমার কাছে তাঁর নামে যে সমস্ত রিপোর্ট দাখিল হয়েছে তার উপর তাঁকে সহজেই চালান করা চলে—তবে তিনি যদি আমার এলাকা থেকে এক্ষণই সরে পড়েন ত আমি কিছু বলব না। ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল একটু ঘেবড়েছেন। আমি খুব নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি যদি সত্যি দেশ-সেবক তবে এ সব সার্ব্বজনিক কাজে বাখড়া দিতে আসেন কি করে ?" আমাকে নরম দেখে তিনি আবার বক্তৃতা জুড়ে দিলেন—সরকার আমাদের কাছ থেকে ত খাজনা নিচ্ছেন, আবার আমরা চাঁদা দেব কেন ইত্যাদি। আমি বললাম, "দেখুন মশায়, আমি পুণায় খবর নিয়েছি। লোকমান্য তিলক আপনাকে চেনেনও না। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। আপনি যদি কথা না শোনেন, আপনাকে জেলেও পুরব, কংগ্রেস থেকেও দূর করাব। আমাকে অসহায় ছোকরা ইংরেজ সিবিলীয়ান পান নেই !" শেষ পর্য্যন্ত লোকটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল, মাপ-টাপ চেয়ে সেই দিনই সরে পড়ল, একেবারে জেলা ছেড়ে পালাল। আশা করি এই জাতীয় দেশসেবক আর এদেশে নেই।

আমার মহকুমাতে দত্তাত্রেয় বলে একজন তরুণ মুনসেফ ছিলেন, তাঁর মতন

লোক আমি আর কখন দেখি নেই। সারা হপ্তা আদালতের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে শনিবার দিন ভদ্রলোক এক তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, দুদিন নিকটের কোন গ্রামে চাষীদের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার দিন সদরে ফিরতেন। সদরে ইস্কুলের ছেলেদিকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে বসতেন, গীতা পাঠ করতেন, পৌরাণিক ঐতিহাসিক গল্প বলতেন, নানা রকম সদুপদেশ দিতেন। ইঁদারা মেরামতের জন্য টাকা সংগ্রহে ও অন্য অনেক সার্ব্বজনিক কাজে ইনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। দেশভক্ত হ—কে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। হ—ও সর্ব্বত্র এঁর নিন্দা করে বেড়াত। কিন্তু দুজনের তুলনাই হয় না।

বিজাপুরের আর একটা মজার গল্প আপনাদিগকে বলা হয় নেই। ব্যাপারটা ঘটেছিল গত মহাযুদ্ধের প্রায় বারো চৌদ্দ বছর আগে। S বলে একজন জার্ম্মান একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হল বিজাপুরে। কর্ত্তাদের জানালে যে সে ফোটো ব্যবসায়ী, পুরানো আদিলশাহী ইমারতগুলোর ছবি তুলতে এসেছে। হুকুম নিয়ে ডাক বাঙ্গলাতে ডেরা করলে। বিজাপুর শহরে ছবি তুললে না, তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে থাকত। নিজাম রাজ্যেও খুব যাতায়াত ছিল। হঠাৎ একদিন লোকটা অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল। একদিন চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরল না। ডাক বাঙ্গলার ভাড়া বাকী রয়েছে। মাসখানেক অপেক্ষা করে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার ঘরের তালা ভাঙ্গলেন। ঘরে একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক ছিল সেটা ভেঙ্গে চুরে খুললেন। খালী সিন্দুক, কিছুই নেই। অনেক দিন পর্য্যন্ত পুলিস এই S-এর সন্ধান পায় নেই আমি জানি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে লোকটা জার্ম্মান গুপ্তচর। কিন্তু মহাযুদ্ধের এত বছর আগেও কি জার্ম্মানী এদেশে চর পাঠাত! কে জানে!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রাসলীলা

ইতিহাস না রূপক ?

'রাসলীলা কতটা ইতিহাস কতটাই বা রূপক' গতবারের পরিচয়ে আমরা এই প্রশ্নের আলোচনা করিতেছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম, যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে—অর্থাৎ মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ—তন্মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম। ঐ মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার প্রসঙ্গ সত্ত্বেও রাস বা গোপীর কোন ব্যাপারই নাই। মহাভারতের খিলপর্ব্ব-স্বরূপ হরিবংশে গোপীদিগের সহিত কামচেষ্টা-বহুল রাসক্রীড়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিলেও ঐ হরিবংশে রাসের নাম রাস নয়—'হল্লীশ' এবং গোপীদিগের মধ্যে রাধার নাম গন্ধ নাই।

ইহার পর পুরাণের বিবরণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ সকল বিবরণ আলোচিত হইবে। এ আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাইব, ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের বিবরণ ভাগবত অপেক্ষা প্রাচীন এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণের বিবরণ ভাগবতের তুলনায় অর্ব্বাচীন।

প্রথম প্রশ্ন এই—ব্রহ্মপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের মধ্যে কোন বিবরণ প্রাচীনতর ?

ঐ বিবরণদ্বয় পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায়, উহারা অবিকল এক—শ্লোকে শ্লোকে, অক্ষরে অক্ষরে প্রায় অভিন্ন। কেবল বিষ্ণুপুরাণে কয়েকটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে—যাহা ব্রহ্মপুরাণে নাই এবং যদ্দ্বারা ব্রহ্মপুরাণের কামায়ন বিষ্ণুপুরাণে একটু নিবিড়তর হইয়াছে। খুব সম্ভব উভয় বিবরণই কোন প্রাচীনতর বিবরণ হইতে গৃহীত।

ব্রহ্মপুরাণোক্ত বিবরণ ঐ পুরাণের ১৮৯ অধ্যায়ের ১৪ হইতে ৪৫ শ্লোকে নিবদ্ধ। সে বিবরণ এইরূপ :—

কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লাম্‌আমোদিতদিগন্তরাম্॥ ১৪

বনরাজীং তথা কূজদ্‌ভৃঙ্গমালামনোরমাম্‌।

বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫

(ইহা বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৪ ও ১৫ শ্লোক। ইহার পর বিষ্ণু-পুরাণে ঐ অধ্যায়ের ৬১ শ্লোক পর্য্যন্ত রাসের বিবরণ)

'শ্রীকৃষ্ণ বিমল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা ও দিগন্ত-আমোদকারী ফুল্লা কুমুদিনী এবং ভ্রমর-গুঞ্জন-মুখরিত মনোহর বনরাজী দর্শন করিয়া গোপীদিগের সহিত রমণেচ্ছু হইলেন।'

সহ রামেণ মধুরম্‌ অতীব বনিতাপ্রিয়ং।

জগৌ কলপদং শৌরিঃ নাম তত্র কৃতব্রতঃ ॥* ১৬

তখন শ্রীকৃষ্ণ 'বনিতাপ্রিয়' কলপদ গান করিলেন।

(জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌—ভাগবত)

সেই রম্য গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপবধূগণ স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে শ্রীকৃষ্ণের সকাশে সমাগত হইল।

রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।

আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥ ১৭

কোন কোন গোপী গুরুজনের বাধায় রাসস্থলীতে আসিতে না পারায় নিমীলিত নেত্রে তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিল—

কাচিদাবসথস্যান্তঃ স্থিত্বা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্‌।

তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥ ২০

ইহার পর বিষ্ণুপুরাণে ঐ অবরুদ্ধা গোপীর সম্বন্ধে দুইটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে—

তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা ইত্যাদি

—যাহা ব্রহ্মপুরাণে নাই।† কিন্তু যে সকল গোপী রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারিল, তাহাদের প্রচেষ্টা উভয় পুরাণই অভিন্ন শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—

শনৈঃ শনৈর্জ্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগা।

দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্‌ ॥ ১৮

কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।

যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বম্‌ অবিলজ্জিতা ॥ ১৯

---

* বিষ্ণুপুরাণের পাঠ একটু ভিন্ন—জগৌ কলপদং শৌরির্ণানাতন্ত্রীকৃতব্রতম্‌।

† ঐ শ্লোকদ্বয় 'পরিচয়ে' পূর্ব্বপ্রকাশিত রাসলীলা প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি।

'কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের লয়ের অনুসরণ করিয়া অনুচ্চে গান করিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া অন্যমনস্ক হইল। কেহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, কেহ প্রেমান্ধা হইয়া নির্লজ্জভাবে তৎপার্শ্বচারিণী হইল।'

তখন শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন—

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥

(ইহা ব্রহ্মপুরাণের ২১ ও বিষ্ণুপুরাণের ২৩ শ্লোক)

'তখন 'রাসারম্ভরসোৎসুক' শ্রীকৃষ্ণ গোপী-পরিবৃত হইয়া শরচ্চন্দ্রমনোরমা রাত্রির সম্মান রক্ষা করিলেন।'

ইহার পর একটি নূতন রস-সম্পাত দেখি, যাহা হরিবংশে নাই—শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল হইতে সাময়িক অন্তর্ধান।

গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টা-ভ্যায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশগতে কৃষ্ণে চেরু র্বৃন্দাবনান্তরম্॥

(ইহা ব্রহ্মপুরাণের ২২ ও বিষ্ণুপুরাণের ২৪ শ্লোক)

'শ্রীকৃষ্ণ অন্যদেশে অন্তর্হিত হইলে গোপীরা তাঁহার চেষ্টার অনুকরণ করিয়া দলে দলে বৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল।'

ইহার পর বিষ্ণুপুরাণ ২৫ হইতে ২৮ শ্লোকে গোপীদিগের কৃষ্ণচেষ্টার অনুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন—

কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজামালোক্যতাং গতিঃ॥ ইত্যাদি

এই কয়টি শ্লোক ব্রহ্মপুরাণে নাই। ব্রহ্মপুরাণের উদ্ধৃত ঐ ২২ শ্লোকের পর এই শ্লোক—

বভ্রমুস্তাঃ ততো গোপ্যঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।
কৃষ্ণস্য চরণং রাত্রৌ দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনে দ্বিজাঃ॥

এই শ্লোক বিষ্ণুপুরাণে নাই। ইহার পর ব্রহ্মপুরাণের ২৪ শ্লোক। ইহা বিষ্ণুপুরাণের ২৯ শ্লোক—

এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাসু চ।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্॥

'নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টার অনুকরণ করিয়া গোপীরা ব্যগ্রমনে সমবেত হইয়া বৃন্দাবনের রমণীয় বনে বিচরণ করিতে লাগিল।'

ইহার পর বিষ্ণুপুরাণে ১১টি অতিরিক্ত শ্লোক—৩০ হইতে ৪০।

ঐ কয়টি শ্লোকে দেখা যায়—গোপীরা ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, 'এই যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভঙ্গি-যুত পদচিহ্ন। এ কি! ইহার সহিত এ কোন সুকৃতকারিণীর চরণচিহ্ন মিলিত হইয়াছে?'

কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ॥

পাঠকের স্মরণ হইবে এই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া ভাগবতকার রাসপঞ্চাধ্যায়ে কি সুন্দর কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন! ভাগবতের বর্ণনা এইঃ সেই বনোদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে গোপীরা তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন—ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ। আর কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন সেই চরণচিহ্নের সহিত এক রমণীর পদচিহ্ন মিশ্রিত হইয়াছে—কস্যা পদানি চৈতানি যাতায়াঃ নন্দসূনুনা? তাঁহারা বলিলেন, এই রমণীটি নিশ্চয়ই শ্রীহরির সবিশেষ আরাধনা করিয়াছিল—নহিলে সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইহার সহিত নির্জ্জনে গেলেন কেন?

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥—ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকৃতই আর এক গোপীকে লইয়া রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন? হরিবংশে বা ব্রহ্মপুরাণে ইহার কোন ইঙ্গিত নাই। ইহা বিষ্ণু-পুরাণের অতিরিক্ত touch—ঈর্ষাকষায়িতা গোপীদিগের কল্পনার বিজৃম্ভণ হওয়াও বিচিত্র নয়।

হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১৩।৩৮

ভাগবতকার কিন্তু এই ঘটনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীর দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়া

গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ব্যথিতা ও অনুতপ্তা হইয়া সেই গোপবধূ বিলাপ করিতে লাগিল—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

কৃষ্ণান্বেষণকারিণী অন্যান্য গোপীরা ইতিমধ্যে সেই বিরহবিধুরা, শোকার্ত্তা গোপীকে দেখিতে পাইলেন। তখন সকলে শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার মধুর আলাপ ও লীলার ধ্যানে তদ্গত হইরা দেহ গেহ সমস্তই বিস্মৃতা হইলেন এবং যমুনাপুলিনে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে লাগিলেন।

ইহাই ভাগবতের প্রসিদ্ধ গোপীগীত। ইহার ভিত্তি ব্রহ্মপুরাণের নিম্নোক্ত ২৫ শ্লোক—

নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যঃ নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগম্য জগুস্তচ্চরিতং দ্বিজাঃ॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বিরহিণী গোপবধূদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন—

ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্॥

ইহার পর ব্রহ্মপুরাণে ২৭ হইতে ৪১ শ্লোক পর্য্যন্ত রাসক্রীড়ার বর্ণনা। বিষ্ণু-পুরাণেও অবিকল সেই শ্লোকগুলি দৃষ্ট হয়। সে বর্ণনার সার এই—

তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্॥
গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সংমুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্॥
স তথা সহ গোপীভীররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ॥

'উদারচরিত শ্রীহরি রাসগোষ্ঠীতে সেই প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রমণ করিলেন। কোন গোপী বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ গীতস্তুতিব্যাজে তাঁহার মুখচুম্বন করিল। রাসের নৃত্য আরম্ভ হইলে তাহারা বঙ্কগতিতে সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রতিলোম ও অনু-লোম ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিল। মধুসূদন সেই গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন।

তাঁহার বিরহে তাহাদের নিকট নিমেষ কল্প বলিয়া বোধ হইল'—ত্রুটিঃ যুগায়তে—যুগায়িতং নিমেষেণ।

এ বর্ণনায় যথেষ্ট কামচেষ্টা লক্ষিত হয়, কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ঐ erotic touch আরও ঘনীভূত হইয়াছে। রাস-লীলা প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রাসে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে হরিবংশে কোন apology বা explanation নাই—কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে আছে।

অপাপবিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলীতে বিহার করিলেন—রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ। ইহার কৈফিয়ৎ কি? Justification কি?

ব্রহ্মপুরাণ বলেন—

তদ্‌ভর্ত্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বম্ অবস্থিতঃ॥—ব্রহ্মপুরাণ, ১৯০।৪৪

এই শ্লোক বিষ্ণুপুরাণে অবিকল দৃষ্ট হয়—(বিষ্ণুপুরাণ ৫।১৩।৬১)।

ভাগবতে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥—ভাগবত, ১০।৩৩।৩৫

'গোপিকাগণ, তৎপতিগণ, এমনকি দেহীমাত্রেরই হৃদয়াকাশে যিনি নিয়ন্তাভাবে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাধ্যক্ষ ভগবান্ কেবল ক্রীড়ার নিমিত্তই ইহলোকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছেন।'

ইহা পরীক্ষিতের সংশয়-প্রশ্নের শুকদেব-প্রদত্ত উত্তর—

স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্‌ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের সেতু—ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তাঁহার অবতার। তিনি পরদারাভিমর্ষণ-রূপ বিপরীত আচরণ কিরূপে করিলেন?

শুকদেবের ঐ উত্তরের ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ পারমার্থিক নহে, প্রতিভাসিক—এ রাসক্রীড়াও প্রাকৃত ব্যাপার নহে, অপ্রাকৃত লীলামাত্র। শুকদেব আরও বলিয়াছেন যে, গোপীদিগের পতিগণ কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া স্ব স্ব বনিতাকে

শয্যাপার্শ্বেই অবলোকন করিতেন—সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের অসূয়া হইত না। তাহাই যদি হয়, তবে রাসলীলাকে ইতিহাস বলা যায় কিরূপে?

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

—ভাগবত, ১০।৩৩।৩৭

সে যাহা হউক—হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, এমন কি ভাগবতে পর্য্যন্ত রাধিকার নাম নাই—যদিও ভাগবতে 'অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ' এই কথাগুলি আছে।

অথচ বর্ত্তমানে রাসের সহিত শ্রীরাধা অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। Prince of Denmarkকে ছাড়িয়া বরং হ্যামলেট হইতে পারে—কিন্তু রাসেশ্বরীকে বাদ দিলে আধুনিক দৃষ্টিতে রাসবিহারীরই অস্তিত্ব থাকে না।

রাসের বিবরণ মধ্যে রাধা কবে প্রবেশ করিলেন?

প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে প্রশ্নটি বেশ গুরুতর। এ প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথাই বলিতে হইবে। অথচ প্রবন্ধ ইতিমধ্যেই দীর্ঘ হইয়াছে। অতএব এ আলোচনা আগামী বারের জন্য স্থগিত রাখিলাম।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আবর্ত্ত

[১]

কাশীর একটি তেতলা বাড়ির একতলায় দুটি পরিবার মিলে মিশে থাকে। দোতলায় রমলাদেবী একলা থাকেন, তেতলায় বৃদ্ধ গৃহকর্ত্তা ও প্রৌঢ়া গৃহিণী। সুজন রমলা দেবীকে কাশী আনবার এক দিনের মধ্যেই বাড়ি ঠিক করেছে, তার আত্মীয় অক্ষয় এঞ্জিনীয়ারের সাহায্যে ; পরের দিন সংসারের নিতান্ত প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, খাট, লণ্ঠন প্রভৃতি কিনে আনলে। আপাততঃ একমাসের বাড়িভাড়া অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। নীচের তলার বৌটি পাচিকা ঠিক করেছেন। ওপরতলার গৃহিণী রমলা দেবীর তত্ত্বাবধান করবেন শুনে সুজন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে কাশী সহর দেখে বেড়ালে। আত্মীয় অক্ষয়ের নানা কাজ, সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাই সুজন সময় পেলেই একলা যায়, এধার ওধার, কখনও তাঁকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে বসে থাকে। তাঁকে পৌঁছে দেবার পরও সে বসে খানিকক্ষণ গল্প করে। নীরবতা যখন অসহ্য হয় তখন সুজন বাড়ি ফেরে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুজনের আসবার কথা। এধারে সন্ধ্যা নামে। রমলা দেবী মুখহাত ধুয়েছেন কিন্তু বেশ পরিবর্ত্তন করেন নি। কি প্রয়োজন ? যদি সুজন ঘাটে বেড়াতে নিয়ে যায় তখন না হয় সাড়ি বদলান যাবে। দোতলার কলে জল আসে না, একটি ছোট ঘরে ঝি দু'বালতী জল রেখেছিল, তার বেশী দরকার হয় নি। নীচের তলার ছোট বৌটি ফর্সা সাড়ি ও কাচপোকার টিপ পরেছে, সন্ধ্যারতি দেখতে যাবে। অন্য পরিবারের বৌটি রুটি সেঁকে ঢাকা দিয়ে রাখলে, সেও এবার সাজবে—সেজে স্বামীকে আঁচলে বেঁধে যাবে বায়োস্কোপে, রাতের শো'তে বোধহয়। এরা সন্ধ্যার সময় খেয়ে নেয়, সকালের রান্না তরকারি থাকে, তোলা উনুনে গুঁড়ো কয়লা দিয়ে আগুন রাখে, তাইতে খাবার গরম করে নেয়। শনিবার মাংস হয়েছিল, তার সঙ্গে লাল আটার রুটি, প্রত্যেকটি ফোলা থাকে, ঘি মাখান হয় না। গোছানি মেয়েরা, লক্ষ্মী বৌ সব, স্বল্পে সন্তুষ্ট। কারুর আবার কিছুতেই মনঃপূত হয় না, খাঁই বেশী, তাই সাজ-সরঞ্জামের ঘটা, ফালতোর আধিপত্য, দশের দাসত্ব। ছেঁটে ফেল এই জড়ের আগাছাগুলোকে।

সুজন এখনও আসেনি। আলো ঢালে পড়েছে পাশের বাড়ির ছোট্ট ছাদে, এইবার তারা উঠবে—একটি তারা, তার পর দুটি, তিনটি, তারপর অগণিত, এক-সঙ্গে, তখন আর চাওয়া যাবে না আকাশের দিকে—এখনও দেরী আছে। এইবার সানাই বেজে উঠবে, বেশ শোনা যাবে এখান থেকেই। গান শিখেছিলেন নিজেকে বিকুতে, গান শেখায় ঘেন্না ধরে। তবু ভাল লাগে গান, দূর থেকে ভেসে আসে যে সুর তাতে আঁশ মেটে না, যে বাজাচ্ছে তাকে দেখা যায় না। মানুষ বাদ দিয়ে যে গান তাতে মনে হয় উদাস। চোখের সামনে রাখাতে বেশী সুখ—তৃপ্তি বেঁধে ফেলায়, চোখের শক্ত পালক দিয়ে। সুজন এল।

'এত দেরী করলে যে!'

'প্রয়োজন ছিল।'

'নিশ্চয়ই, অবশ্য…দয়া করে কৈফিয়ৎ দিওনা। অনুশোচনা একটি উৎকৃষ্ট মনোভাব।'

'অনুশোচনা।'

'হাঁ, আমাকে কাশী আনার জন্য। হাসছ কেন?'

'চল রমাদি, বেড়াতে যাই। দেরী কোরোনা।'

'না, তা করব কেন! সে-কাজ তোমাদের। কিন্তু, কি হবে গিয়ে?'

'ঘাটে বসবে না?'

'সেজন্য আসিনি।'

'তবু, চলই না, ভাল লাগতে পারে। কত লোক বেড়ায়।'

'যদি না ভাল লাগে রাগ কোরো না যেন। করবে না জানি। বেশ, এখনই আসছি। কাশী এসে সিগারেট খেতে শিখেছ, তাই খাও ততক্ষণ।'

'ওটা তীর্থযাত্রীর বদভ্যাস, সময় কাটান চাই।'

রমলা দেবী শীঘ্রই সুজনের সঙ্গে ঘাটে এলেন। দশাশ্বমেধের ঘাটে ভ্রাম্যমাণের ভিড় দেখে একটু দূরে, নদীর কিনারায়, শেষ ধাপে বসলেন। নৌকা বেয়ে একদল যুবক চলে গেল, পিছনে আর একটি নৌকা, বাচ্ খেলা হচ্ছে বোধহয়। বাঙ্গালী ছেলে পশ্চিমে এসেও নদী চায়, যুবকেরা সাঁতার কাটে, নৌকা চালায়, বৃদ্ধারা স্নান করে—রক্তের সাড়ায়।

'সুজন, সাঁতার জান?'

'জানি।'

'কাটবে?'

'কাপড় গামছা আনি নি। তুমি জান রমাদি?'

'নাইতেও জানি না। ডুব দিতে পারি না হাঁপ লাগার ভয়ে।'

'এবার শেখ।'

'না, এ বয়সে হবে না। তার চেয়ে ধারে বসে থাকা নিরাপদ নয়?'

'তাতে মনস্তুষ্টি হবে না। না নাইলে শুদ্ধ হয় না—অবগাহন।'

'অনেকেই ধারে বসে পূজো করে।'

'সেটা ধাতে নেই।'

'ধাতে কোনটাই বা কার থাকে!'

সানাই বেজে উঠল, প্রথমে মোটা সুর, একটানা, তৈলধারাবৎ, চামড়ার যন্ত্রের আওয়াজ এল, তারপর সুর সুরু হোলো।

রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন—'কি সুর এটা?'

'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশী।'

'না।'

'সুরের নাম জানি না রমাদি। কি হবে জেনে নামটুকু!'

'শোন।'

নদীর ওপাশের বালুখণ্ডে তখনও অন্ধকার নামে নি। ভরা নদী সবটা তার খেয়ে ফেলেনি, কাসগুচ্ছের বন দেখা যায়, কাকচক্ষুর মতন আকাশের রঙ। সুরের প্রথম ধ্বনিতে এক ঝাঁক পাখী আকাশে উড়ল, দূরের নৌকার আলো ফুটল, ঘাটবিহারীদের কোলাহলে মুহূর্ত্তের জন্য ছেদ পড়ল···গলা আটকে ধরেছে কে এসে, কান্না চাপতে গেলে যেমন হয়। পাখীরা ওপরে উঠে সারি বেঁধেছে তীরের ফলার মতন, ঘাটের আলোয় মালা গাঁথছে, আকাশে তারার মেলা। লোকজন প্রাণ পেয়ে হাঁটতে সুরু করলে। সুর তখন পঞ্চম ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার জন্য উন্মুখ, স্বরগুলি পূর্ব্বেকার মতন স্থির নয়, অধীর হয়েছে, চোখের জল বুঝি বা গড়িয়ে পড়ল। পাশে কে একজন গলা মেলাতে চেষ্টা করেছে সানাইএর সঙ্গে।

সুজন বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'অসম্ভব! অসহ্য এই অনুকরণের ইচ্ছা, অন্যের সাথে মেলবার প্রাণপণ প্রয়াস!'

'তা হোক, আমার ভাল লাগে। উপযুক্ত শিষ্য তুমিই।'

একজন ভদ্রলোক বলছেন, এর জন্য চিত্তরঞ্জনই দায়ী, প্যাক্‌ট্ করতে যাওয়া কেন ?···হুঁ !

সুর তখন ওপর সপ্তকে উঠেছে। হঠাৎ সানাইএর আওয়াজ চিরে গেল, একজন ছোকরা হেসে উঠল, অন্যজন জিজ্ঞাসা করলে, 'কি সুর জানিস ? মূলতান। আজ নিশ্চয়ই বুড়ো বাজাচ্ছে না'। 'কেয়া রাগজ্ঞান ! মূলতান বুঝি বেলা পাঁচটার পর বাজায় ? ছটার পর পূরবী, তারপর পূরিয়া—যার যা সময় ! মাষ্টার মশাই সেদিন আখড়ায় বলে দিলেন না ! এরই মধ্যে ভুলেছিস' ? এরা কাশীর ছেলে, থিয়েটারের সখী সাজে, দন্ত্য স উচ্চারণ করে ইংরেজী এস্-এর মতন—ফয়জাবাদ, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী পর্য্যন্ত ভাড়া খাটে বাঙ্গালীর পূজা-সংক্রান্ত বারোয়ারী-অভিনয়ের জন্য, তাল-দুরস্ত, গলাভাঙ্গা।

সুজন রমলা দেবীকে উঠতে অনুরোধ করলে। কিন্তু রমলা দেবী অসম্মতি প্রকাশ করলেন, 'বাড়ি গিয়ে কি হবে !' খানিকক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন, 'সুজন, তোমার সঙ্গে গান বাজনা শোনা যায় না দেখছি। ভাল না লাগলেও চুপ করে থাকাটাই ভদ্রতা।'

'না, আমার ভাল লাগে বলেই অধীর হই। অবশ্য বুঝি না গান বাজনা, কিছুই জানি না।'

'আমিও তথৈবচ। আমিও অধীর হই, তবে মুখ বুজে থাকতে হয় আমাদের। অধীর হলে চলে না জানি, কিন্তু পারি কৈ ?'

'যে জন্য আসা হোলো তার কিছুই করে উঠতে পারছি না।'

রমলা দেবী অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। সুজন বললে, 'কাল রামকৃষ্ণ আশ্রমে খোঁজ নিয়েছিলাম। ওরা চেনেন না। আজ তোমাকে বাড়ি পৌছে অন্য দুএক জায়গায় যাব।'

'যদি না পাও খবর দিয়ে যেও।'

'পেলে দিয়ে যাব।'

'যত রাত্রেই হোক'···

'আগে পাই। কিছুই আশা নেই, ঘোরাঘুরির কসুর করছি না। ঠিক বুঝি

না ব্যাপারটা। ডায়েরী পড়ে মনে হয় এক কথা, ব্যবহারে বিপরীত। শিরা উপশিরা মাংসপেশী ওঁর নিজের বশে নয়, নয় কি ?'

'হয়ত, তোমার বোঝবার দরকার নেই। আচ্ছা থাক, রাতে আর আমাকে খবর দিতে হবে না। বাড়ি গিয়ে বাকি কাজটা, যেটা অসমাপ্ত রেখে এসেছিলে সেটা করে ফেল। কেমন ? সেই ভালো, নয় ? রাগ করছি না. হাসি পাচ্ছে। কাশী এলাম বেড়াতে তোমার তাড়ায়, আর...'

'নিশ্চয়ই।'

'তা ছাড়া আমি নিজে এসেছি নাকি ? মনে করে দেখ, তুমিই বল্লে কাশীতে তোমার আত্মীয় থাকে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

'নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই নয় ? তুমি আনলে, ট্রেনে কত উপদেশ দিলে...' রমলা দেবী খিল-খিল করে হেসে উঠলেন।...

'দোষ স্বীকার করছি।'

'দোষ নয়, তাই বলছি, তোমার ওপর আমার কত বিশ্বাস, নির্ভর...না হলে উপদেশ শুনি ? সেই যে গাড়ীতে কত উপদেশ দিলে !'

'সব না পারেন, তার মধ্যে যেটা পছন্দ হয় বেছে নেবেন। আপাততঃ উঠুন। আমার সঙ্গে কোনো, গান শুনে, সুখ নেই।'

'আমাকে কি করতে হবে ? তুমি বড় বিরক্ত হয়েছ। মাসীমার বাড়ি খোঁজ নেওয়া হয়েছে ? হয়ত, সেইখানেই অসুখ করে পড়ে আছেন, আর মুকুন্দর সেবা চলছে।'

'মাসীমার ঠিকানা পাব কি করে ?'

'তুমি পুরুষ না মেয়ে ?'

'আচ্ছা, আবার দেখছি চেষ্টা করে।'

'কেবল চেষ্টাই চলছে, চেষ্টাই চলছে, রবার্ট ব্রুস !'

সুজন ও রমলা দেবী উঠে পড়লেন।

'চল সুজন, বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখি গে...সেখানে অনেকে যায়—যত সব গিন্নীরা।'

'তাই ভাল।'

বিশ্বেশ্বরের গলি, স্বর্গের পথের মতন সরু আকারের, মোড়ে চা ও সরবতের দোকান, ভেতরে পিতল কাঁসা, পান-জরদা, পেঁড়া ও সিল্কের দোকান, দোকানীদের পুরুষ্টু চেহারা, গিলে করা আদ্দীর জামা, মুখে বাংলা বুলি, ভাঙ্গাভাঙ্গা···মহিলারা সাড়ি কিনছেন ষাঁড় ঠেলে, মাড়োয়ারী, ক্ষেত্রী মহিলাদের রঙ বেরঙের সাড়ি, কনুই পর্য্যন্ত সোনারূপার ভারি চুড়ি বালা, পায়ে মস্ত মল, নাকে ফাঁদি নথ, তাতে হীরে মুক্তা ঝোলে, একটি হাত ঘোমটা ফাঁক করে ধরে আছে, অন্য হাতটি দুলছে, ভারি চলন ; মাদ্রাজীর দলের কালো চেহারা, মালকোঁচা-মারা, হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত সাড়ি উঠেছে, এ ওর কোমর ধরে এগিয়ে চলেছে, কোলে খোকা ; সিল্কের দোকানের মালিক বাঙ্গালী, প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন, টেরিকাটা···টলিউডের ভাবী অভিনেতা···।

রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, কিছু পেঁড়া কেন, রাতে খাবে।'

'আপনি একটা ভাল রঙ্গীন সাড়ি কিনুন।'

'পরে কিনব, যখন তুমি সংসারী হবে। পেঁড়া কেনত' আগে।'

একজন দোকানী হাঁক দিলে, 'এই যে মাইজী, আসুন এধারে, বিশ্বনাথের পেঁড়া, অনেকদিন দর্শন পাইনি যে!'

এক টাকার পেঁড়া কেনা হোলো, অন্য দোকানে। সুজন বল্লে, 'বইবে কে?' দোকানদার সমস্যা পূরণ করে দিলে, 'আচ্ছা বাবুজি, আনেকো বরুৎ লিয়ে যাবেন।' সুজন কৃতজ্ঞ হোলো, 'সেই ভাল। এবার সাড়ি কেনা হোক্।'

'তর সইছে না? আগে পুতুল কিনে দিই খোকা বাবুকে। তোমার আজ কি হয়েছে বলত'?'

'আমার? কিছুই হয় নি। কি হবে! কি হতে পারে?'

'চল এগিয়ে।'

মন্দিরের মধ্যে ভিড়, সকলে ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ভীষণ কলরোল, দীপের আলোর বহুলতা, বিজলী বাতি মন্দিরে! একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে রমলা দেবী সুজনের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। সুজনের হাতে ঠোঙা, মুখে বিরক্তির চিহ্ন। রমলাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল লাগছেনা বইতে?'

'না। ঠোঙা নয়, ভিড়। কেন লোকের ভাল লাগে না বুঝি। চিনতে পারলেন মাসীমাকে?'

'কি করে পারব ?'

'চেহারার মিল অনুমান করে ?'

রমলা দেবী ভ্রূকুটি করলেন। গলির মোড়ে এসে রমলাদেবী বল্লেন, 'আগে ভিড় ভাল লাগত বুঝি ?'

'না। তবে তখন ভাবতাম দশে মিলে সমাজ, সমাজে জন্মেছি, তার ঋণ পরিশোধ চাই।'

রমলা দেবী স্বপ্নাবিষ্টের মতন বল্লেন, 'এত ভেবে পার্টিতে যেতে ?'

'আমি! পার্টিতে! খাবার নিন···আপনার কথা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। রাতে কি খান ?'

'রাতে ? খাই না, যা পাই তাই খাই।'

সুজনের কণ্ঠে মাধুর্য্য পরিস্ফুট হোলো···'তবে এত খাবার কিনলে কেন রমা দি ?'

'নীচের তলার বৌদের দেব। ছোট বৌটি কি বলছিল জান ?—ও ছেলেটি কে দিদি ? আমি বলেছি, আমার দেওর।'

'সত্যি কথা কইতে শিখেছ দেখছি। কাশীর মাহাত্ম্য আজও তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। চল, বাড়ি পৌঁছে বেরুব।'

রমলা দেবীর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দিলে, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিষাদের যবনিকা অপসৃত হলো। সুজনের লক্ষ্যে বাদ পড়ল না আলোছায়ার হোলিখেলা। কেন এই বিষাদ ? রমাদি বাড়ি ফিরতে চায় না, ভয় পায়, খালি বাড়ি, অন্ধকার বাড়ি, স্মৃতির টুকরোগুলি চামচিকের আকার নিয়ে ঘোরে, কেবল ঘোরে, পাখনার পতপতানি বুকের পরতে পরতে বেজে ওঠে, রমাদি ভয় পায়, আর চায়, কেবল চায়, শুধু চেয়ে থাকে, অন্ধকারের সাথে মিশে গিয়ে···'রমা দি, বাড়ির সব আলো জ্বেলে বোসো।'

'ফিরে আসবে ? নীচের তলার ছোট বৌ খুশী হবে।' সুজন রমলা দেবীকে বাড়ির দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সদর রাস্তা ধরলে। ছোট বৌএর কাছে দেওর পরিচয় দিয়েছেন—তা হলে দিদি, রমা-দি বলা চলবে না। নীচের তলার ছোট বৌ ঘোমটা ঢেকে লুকিয়ে থাকে। তার কৌতূহল কেন ? স্বভাব তার সম্পর্ক টেনে বার করা। ফুটপাথের ওপর সুজন উঠল, দুটো এক্কা রাস্তার ওপর মোড়

ফিরছে। কি সঙ্কীর্ণ ওদের মন। ওদেরই বা দোষ কি! সন্দেহই ত মেয়েদের সমাজের ওপর প্রতিশোধ। কিংবা হয়ত কেবল জানতেই চেয়েছে। দেখতে কেমন কে জানে!

সুজন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলে, ঘাম হচ্ছিল। চৌরাহাতে এক্কাওয়ালারা হাঁকছে। এক ধারে পানের দোকান, একজন দাঁড়িয়ে কি দেখছে, চেনা মনে হোলো, মুকুন্দ, 'মুকুন্দ!'

মুকুন্দ মাথা নীচু করে প্রণাম করলে। কিন্তু তার চোখে পরিচয়ের চিহ্ন নেই। 'কি হে! তুমি এখানে কোত্থেকে? তোমার বাবু কোথায়?'

'আজ্ঞে, রাতে ভাল দেখতে পাই না, আলোগুলো যেন পিদ্দিম, তাই চিনতে পারিনি, মাপ করবেন।'

'এখানে কি করছিলে?'

'গিন্নী মন্দিরে ঢুকেছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

'এখানে কোন্ মন্দিরে!'

'কে জানে বাপু আর পারি না, সব জিনিষের সীমে আছে।'

'তোমার বাবু কেমন আছেন? কোথায়?'

'বাবু গিয়েছেন ঠাকুরদের সঙ্গে। কেমন আছেন জানিনা।'

'কবে আসবেন? খবর জান?'

'বাবুর মাসীমারে শুধোবেন।'

'মুকুন্দ, পান খাও না।'

'না বাবু, দেখছিলাম কেমন করে সাজে। খোট্টাদের পানে বড় ঝাল। বাংলা দেশের মতন মিষ্টি নয়। খয়ের বড় তেতো বাবু, খাবেন না। ঐ দোকানটায় কোলকাত্তার খয়ের পাওয়া যায়। এনে দিই? কিন্তু মাসীমা যে এইখানে দাঁড়াতে বলে গেছেন, বুড়ো মানুষ, আমাকে খুঁজে না পেয়ে একলা বাড়ি গিয়ে হাজির হবেন, আর আমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব যে!'

'না, না, না, আমিই না হয় এনে দিচ্ছি তোমার জন্য।'

'আমার কি অকল্যাণ করতে চান? এই যে ঠাকরুণ এসেছেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, পা ধরে গেল, এত রাত পর্য্যন্ত টহল না দিলে চলে না—বাবু বলেছেন সঙ্গে থাকতে, তাই—এই বাবুটি আমাদের বাবুর খোঁজ নিচ্ছিলেন।'

'কে বাবা? খগেন কবে আসবে জান?'

'না, আমিই ত মুকুন্দর কাছে খোঁজ করছিলাম।'

'তুমি কি আমাদের কাশীর ছেলে?'

'না। খগেন বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় কোলকাতা থেকে।'

'তুমি বুঝি এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছ?'

'অমনি, কোলকাতার জলহাওয়া ভাল নয়, একটা না একটা লেগেই আছে।'

'আরতি দেখেছ?'

'দেখলাম।'

'ভাল লাগে না বুঝি? আচ্ছা, এখন আসি, খগেনের খবর পাও ত' আমাকে দিও।'

'আমিই যে আপনার কাছে চাইছি।'

'আমি কি ছাই চিঠি পাই, সেই একখানা পোষ্টকার্ড কবে এসেছে, তারপর চুপ চাপ আমিই কেবল ব্যস্ত হয়ে মরি! একি জ্বালা, আমি এলাম এখানে নিশ্চিন্ত হতে, এখানেও সেই হাঁকোচ পাঁকোচ, এখানে ছুটছি ওখানে ছুটছি, কেউ খবর জানে না। তুমি যদি পাও...'

'নিশ্চয় তখনি গিয়ে দিয়ে আসব। চলুন আপনার বাড়ি দেখে আসি—আপনি একলা যাবেন কেন?'

মুকুন্দ বলে উঠল, 'না, না বাবু, আমি রয়েছি. আপনার শ্রম করতি হবে না।'

'মুকুন্দ তুই থাম্। একটু যদি বুদ্ধি থাকত ত আমার এই বয়সে ছুটোছুটি করতে হোতো না। চল বাবা, কাছেই বাসা।'

দরজার সামনে এসে বৃদ্ধা বল্লেন, 'খবর পেলে দিও বাবা।'

যাবার সময় সুজনকে মুকুন্দ প্রণাম করে বল্লে, 'সকাল দুটোর পর আর পাঁচটার মধ্যে, আর সন্ধ্যা আটটার পর এলেই পাবেন। গিন্নী দুপুরে ঘুমোন না, আমারও ছুটি নেই, রাতে সেই ন'টার পর আমার ছুটি। দরজায় মুকুন্দ মুকুন্দ বলে কড়া নাড়লেই আমি বেরিয়ে আসব। এখন আসুন গে।'

সুজন যখন রমলা দেবীর বাড়ির দিকে ফিরলে তখন প্রায় নটা বাজে। কাশীর রাস্তা তখন জেগে উঠেছে। ধূলো তখনও সারা অঙ্গে ঘুমের মতন জড়িয়ে আছে, কিন্তু চোখ খোলা। বিজলী বাতি মিট্ মিট্ করছে, পোকাগুলো কেবলই ঘোরে,

কিন্তু তাদের পরিধি স্থির মনে হয়। পোকার বিস্তৃত কোণ এড়িয়ে পথিক রাস্তায় নামে, এক্কাও তার পাশ কাটিয়ে যায়···চৌরাহার চঞ্চলতা বাড়ে···ছাতহীন এক্কা অর্জ্জুনের রথের মতন, ঘোড়ার মাথায় পালক, গলায় লাল ফিতে ও পেতলের ঘণ্টা বাঁধা, পা মুড়ে বসে বেনারসের বাবুরা হাওয়া খেতে বেরোন, গিলে করা আদ্দির কুর্ত্তা, গলায় ফুলের মালা—টকির সামনে লোক জমে গান শুনতে, চার আনা টিকিট ঘরের সামনে লোক ধরে না, কানপাতা যায় না, জানলা বন্ধ হয়ে গেল, আর বিক্রী হবে না। আজ-রমাদির মন খারাপ, কিন্তু এক দিনেই কি সন্ধান মেলে? জোর করে তাঁকে আনা উচিত হয়নি···জোর? তাঁরই ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল, কেবল মুখ ফুটে বলেননি···তবে, আগে নিজে কাশী এলেই হোতো। তবে মৈত্রীর অর্থই হলো সমন্বয় সাধন—রমাদি কষ্ট পাচ্ছিলেন, খগেন বাবুও অসম্পূর্ণতা ও অশান্তির উল্লেখ করেছিলেন তাঁর ডায়েরিতে। ওঁদের মিলনই স্বাভাবিক। দুনিবার গতিতে এই দুটি প্রকৃতি পরস্পরের দিকে ছুটেছে, রুখবে কে? মানুষের কাজই প্রকৃতির নিয়ম বুঝে তাকে সাহায্য করা, তবেই পরিশ্রম ও বন্ধুত্ব সার্থক। খগেন বাবু লিখেছিলেন যে তাঁর জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিসের পরিবর্ত্তন? বিযুক্ত হবার প্রয়াসের প্রয়োজনই বা কি ছিল? পারলেন না অবশেষে, গোড়া থেকেই বোঝা উচিত ছিল বিযুক্ত হওয়া যায় না এখানে। আর একটা ল্যাম্প-পোষ্ট, আবার পোকা···দেওয়ালী পোকা বৃত্তের মধ্যে প্রত্যেকে, দূর থেকে অবিশেষ, সাধারণের ঐক্য। দূরত্বের ওপর একত্ববোধ নির্ভর করে? হয়ত পোকাগুলো এক জাতের বলেই। অন্য পোকা এলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়, তখন বৃত্তবোধও যায় ভেঙ্গে। মুকুন্দর সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হোলো! বড় সহরেই দেখা হয় আচমকা। আচম্‌কা আর কি? পূর্ব্বেই ব্যগ্রতা ছিল, আকস্মিক পরিচয় সেই ধারারই পরিশেষ। এখন না দেখা হলেও পরে হোতো, মধ্যকার সময়টুকু অন্তর্হিত হয়েছে ভাবলেই চলে। কোনো বিষয়ের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন অধ্যাপক, সমস্যার কূল কিনারা মিলছে না, লাইব্রেরীতে অবান্তর বই ঘাঁটছেন, পাতাই ওলটাচ্ছেন, চোখে পড়ল হঠাৎ কয়েকটি ছত্র-যাতে বন্ধগলির মুখ গেল খুলে। অধ্যাপক ধন্যবাদ দিলেন দৈবকে—কিন্তু বইখানি অবান্তর ছিল না, অন্যমনস্কভাবে প্রয়োজনীয় বইএর পাতাই দেখছিলেন। সব ঠিক ; কিন্তু রমাদির প্রয়োজনে মুকুন্দ তার সামনে আসে কি করে? রমাদিকে বোধ হয় খবরটুকু না দেওয়াই ভাল, সারারাত জেগে বসে

থাকবেন। মাসীমাও ব্যগ্র কিন্তু···না, বেশ অপ্রতিভ···সোজা কথাবার্ত্তা, রমাদির বাড়ির নীচের তলার ছোট বৌটির মতন তাঁর কৌতূহল নেই, বোধ হয় বয়সের গুণে।

সুজন বরাবর ওপর তলায় উঠছে এমন সময় রমলা দেবীর ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের আওয়াজ এল···বৌটি নিশ্চয়ই কথা কইছে, রমাদি খাবার দিচ্ছেন। তেতলা থেকে মোটা ভাঙ্গা গলায় প্রশ্ন এল—'এত রাত্রে কেগা বাছা?' রমলা দেবী ঘরের বাইরে এসে বল্লেন, 'সুজন, একটু বাইরে দাঁড়াও···তুমি ভাই বসবে? আর এখন তোমাকে রাখা যাবে না।' চাপা গলায় উত্তর শোনা গেল, 'অনেক রাত হয়েছে যাই দিদি, উনি এখনই ক্লাব থেকে ফিরবেন, কাল খাব।' বৌটি নিতান্ত জড়সড় হয়ে নীচে নেমে গেল। আবার তেতলা থেকে প্রশ্ন এল, 'কে গা বাছা?' রমলা দেবী একট জোরে বল্লেন, 'কেউ নয়। এস সুজন।'··· রমলা দেবী শব্দ করে দরজা বন্ধ করলেন। সুজন থতমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবী তাকে বসতে হুকুম করলেন।

'খাবার ভাগ হচ্ছিল বুঝি?'

'হাঁ, আর, তোমার কথাই। দেওরটিকে সামলান দায় হোলো দেখি।'

'এবার থেকে আপনি বলব? আগেকার মতন?'

'কেন?···বৌদিকে সকলেই তুমি বলে।' সুজন একটু হাসল।

'হাসছ যে! তুমি আমাকে একটি পরিষ্কার উত্তর দেবে? তোমার অনুশোচনা হচ্ছে আমাকে কাশীতে এনে?'

'না'।

'তবে তোমার কি মনে হচ্ছে, বল আমাকে। ছাখ সুজন, এখানে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই, অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। তুমি যদি মন খুলে না কথা কও, তবে, আমাকে আনলে কেন কাশীতে?'

'ছোট বৌটি কি বলছিলেন?'

'ঠাট্টা রাখ। কেন আমাকে আনলে, যদি না···'

'যদি না···কি?···আচ্ছা রমাদি, খগেন বাবুর সঙ্গে যদি না দেখা হয় কি করবে ঠিক করেছ?'

'ফিরে যাব।'

'তা জানি, কিন্তু তার পর ? মনকে বাঁধতে পারবে ?'

অনেকক্ষণ রমলা দেবী নীরবে বসে রইলেন

'কৈ উত্তর দাও ?'

'কাল বলব।'

'আর, যদি পাও ?'

'তুমি আমাকে খেলাচ্ছ ?'

'না, গম্ভীরভাবে প্রশ্নটি করছি। ভেবে চিন্তে পরশু না হয় দিও।'

'আচ্ছা, বোসো, এখনই দিচ্ছি। তুমি সহ্য করতে পারবে ?'

'পারব মনে হয়।'

'দেখা হলে, আমি তাকে নিজের করব, মানব না।'

শান্ত, সুস্পষ্ট, পাথরে কোঁদা ভাষা, দান্তে-এর উপযুক্ত; ব-উচ্চারণে কেবল ঠোঁট জোড়া লাগল, নচেৎ সমগ্র শরীর থেকে যেন অনাহত ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। চোখের তারা চক্ চক্ করে, শীঘ্রই তার আর্দ্রতা যায় শুকিয়ে। পরে পলক পড়ল দুতিন বার, চোখের কোণে তবু জল এলনা এক ফোঁটা। রমলা দেবী পুনরায় বল্লেন, 'ভাবছ সুজন, তোমার সদুপদেশ এত শীগগির জলাঞ্জলি দিলাম কোন প্রাণে ? কিন্তু প্রাণ আমার নেই, বড় ফাঁকা মনে হচ্ছে। সন্ধ্যায় সানাইএর সুর বলাকা হয়ে উড়ে গেল, আধখানা চাঁদের মতন নদীর ওপারে, কাল বন ছাড়িয়ে, এপারের লোক কি তাকে ধরে রাখতে পারলে ? তুমি পাশে বসে রইলে, অপরিচিতের মতন। আমার শূন্যতা জমাট বাঁধল না, রূপ নিলে না। আমার স্মৃতি আশ্রয়হীনের মতন ঘুরে বেড়াতে লাগল মর্ত্ত্য থেকে দেবলোকে যাবার গোলক-ধাঁধায়। কিন্তু আমি প্রেতাত্মার মতন ঘুরে বেড়াতে নারাজ। আমি জন্মাতে চাই, এই দেহেই। আমার এই শরীরেই চলবে। এখনও আমার গায়ে জোর আছে, দেখবে ?' রমলা দেবী সুজনের হাত থেকে দিয়াশালাইএর বাক্সটা কেড়ে নিয়ে মুঠোর এক চাপে মড় মড় করে ভেঙ্গে দিলেন। সুজন নির্ব্বাক হয়ে বসে রইল।

'তুমি সুজন বোধ হয় আমার উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলে না ? বল ?'

'না'।

'তা হলে তুমি কোলকাতা ফিরে যাও। চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলো দিয়ে ফেল, তার পর কোনো কলেজে সেঁধিও।...লক্ষ্মীটি ভাই মাপ কর। আমার যেন মাথা খারাপ

হয়েছে...এই ছোট্ট বৌটিকে দেখে। ওর কি স্বাস্থ্য! স্বামীকে রাত নটার আগে ফিরিয়ে আনে। বলে কি জান?—সাধ্যি কি! থাকুন দেখি একবার ন'টার পর! মজাটি টের পাবেন না!—অথচ, অথচ তোমার বেলাতেও আগ্রহ। ওর যেন কি একটা উপছে পড়ছে, তাই স্বামীকে সব দিয়েও বাকী থাকে। কি সেটা বল ত সুজন? কেন আমার তা থাকবে না? নয় কেন? আমার কি অন্যায়টা হয়েছে? বঞ্চিত হব কোন দোষে? তুমি কেন বলবে দূরে রাখতে, আপনি বলতে? আমি তোমার কথা শুনব না। দেখা হলেই প্রথমেই তুমি বলব···না হলে, পরে বলতে পারব না...ভারি ইয়ে একেবারে! আপনি বলবে না ছাই!···কিছু মনে কোরো না ভাই, সুখের সংসার দেখলে জ্বলে খাক হই···আমার কি বেশী দোষ?'

'না। তুমি, রমাদি, নিজের ওপর অবিচার করছ। ওটা নিতান্ত স্বাভাবিক।'

রমলা দেবী অধীর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বল্লেন,—'বড় বড় কথা কয়ো না···'

'কেন? আমার মুখে মানায় না বলে?'

'না, তুমি বুঝলে না বলে। মানুষে স্বভাবকে দায়ী করে না। থাক্···'

'থাক্ কেন? আমি অবশ্য খগেন বাবু নই।'

'তা নও। যার ধর্ম্ম তারে সাজে। তুমি চুপ কর—তুমি কিছু বোঝো না।'

'আমি বোধ হয় তাঁকে ধরতে পেরেছি। খগেন বাবু আত্মসন্ধানী। ভেতরে তিনি মানুষ, অর্থাৎ ধার্ম্মিক। ধর্ম্ম অবশ্য মানব-ধর্ম্ম।'

'না, না, আমি জানি। মানুষকে ভালবাসলে সে পালাবে কেন, সুজন? ধর্ম্ম তার, ভয় করা।'

'এত দিনে এই বুঝলে?'

'ভুল বুঝেছি! সংশোধন করবার উপায়, সুবিধা কোথায় পেলাম বল ভাই? ···যেন তোমার কথাই ঠিক হয়!'

'আচ্ছা, এবার বল, দেখা না হলে কি করবে।'

'সে দেখবে তখন। তোমাকে বলব কেন? তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়।'

'আমার? না, পাইনি। অত নিশ্চয় হয়ো না।'

দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে বাড়ির মালিক-গৃহিণী প্রবেশ করলেন। রমলা দেবী সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন। সুজন অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে রইল। বৃদ্ধা চলে গেলেন, দরজাটা খোলা রেখে।

সুজন বল্লে, 'আমার এখানে রাতে আসা চলবে না।'

'কেন ?'

'এটা কোলকাতা নয়, কাশী, তীর্থস্থান, পাছে গৃহের অকল্যাণ হয় !'

'ভয় পাও যদি এস না।'

'দিনে আসব, এখন চললাম।'

সুজনের বলা হোলো না যে মুকুন্দর সঙ্গে দেখা ও মাসীমার বাড়ি চেনা হয়েছে। কোথা থেকে বাধা সৃষ্টি করলে ঐ সঙ্কীর্ণ সংস্কারের প্রতিমূর্ত্তি, ঐ প্রবীণা প্রথাটি। বিপত্তি জমিয়েছিল অনধিকার চর্চ্চার উল্লেখ. প্রতীক্ষার আক্ষেপ, নৈরাশ্যের বিক্ষোভ। রমলা দেবী আজ নিজের চাহিদায় সজ্ঞান। কে আশা করেছিল নুয়ে পড়া মানুষটি সোজা হয়ে দাঁড়াবে, জোর করে চাইবে ! এই ত কোলকাতায় ছিল নম্রতা, ভদ্রতা, আপন ভুলে পরের চিন্তা ! একি হল ! পনের দিন যে অপেক্ষা করতে পারে না সে কি করে সামনে রেখে নিজেকে সামলাবে ! কোথায় যেন ভব্যতার অভাব ঘটল, সংযম টুটল, সভ্যতার আবরণ খসল ! খগেন বাবু নেমে যাবেন, তলিয়ে যাবেন স্রোতের টানে, সংযমের ভাঁটার টানে, জোয়ারের চেয়ে যার জোর বেশী। হয়ত বা রমলাদির জীবনে জোয়ার এল। তবু খগেন বাবুকে টেনে ফেলবে মেলষ্ট্রমের গর্ত্তে। সে আবর্ত্তে সোনার তরী ডুবে যায়, অন্তঃসার-শূন্য পিপেই ভাসে। খগেন বাবু পারবেন কি ওপরে ভেসে আসতে ? তিনি কি শক্তি সঞ্চয় করেছেন অন্তরের খাদ ফেলে দিয়ে, উজাড় করে ? কে তাঁকে রক্ষা করবে প্রকৃতির এই উদ্দামতা থেকে ? ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে যাবেন। রমলা দেবীর নতুন রূপ—স্বভাব পুরাতন, প্রকৃতির উন্মোচন। কেন রমলা দেবী এতদিন একলা থাকতে পেরেছেন সুজন আজ বুঝলে। তাঁর এই সত্য রূপকে সুজনের ভাল লাগে, সে ভয় করে।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক প'ল পেলিও

(Paul Pelliot)

[১]

অধ্যাপক প'ল পেলিওর নামের সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নয়, তার কারণ তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন তা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নয়—চীন, ইন্দোচীন, মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন ভাষা ও জাতির ইতিহাস। এ সব বিষয়ের আলোচনা আমাদের দেশে এখনো স্থুরু হয় নি, কেননা আমাদের বিশ্ব-মানবিকতার গণ্ডী সীমাবদ্ধ। আর একথা বললেও হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স হচ্ছে একমাত্র দেশ যেখানে এই বিশ্বমানবিকতার সম্পূর্ণ পরিস্ফুরণ বহুদিন পূর্ব্বেই হয়েছিল—কারণ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই ফরাসী পণ্ডিতেরা নানা প্রাচ্যদেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা আরম্ভ করেন। সে সব দেশের সঙ্গে তাঁদের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ না থাকলেও তাঁরা সে সব দেশের ভাষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। সেই জন্যই ফরাসী আঁকতিল্ ছ্যুপেরোঁ (Anquetil Duperron) ইরানীয় ধর্ম্মশাস্ত্র 'আবেস্তা' ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাম্‌নে উপস্থিত করলেন ও তার আলোচনার মূল-সূত্র ধরিয়ে দিলেন, দ' গিঙ্গ্ (De Guignes) চীন দেশের প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ করে চীন ও মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের প্রথম খসড়া তৈরী করলেন। শাঁপোলিওঁ (Champollion) মিশরের চিত্রলিপির পাঠোদ্ধার করে একটী প্রাচীন জগতের ইতিহাস উদ্ভাসিত করলেন।

প'ল পেলিও ১৮৭৮ সালে পারিসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ঔপনিবেশিক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করবার জন্য Ecole Coloniale-এ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং সেই সময়েই চীনা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অনুশীলনে মনোযোগ দেন। পরে ঔপনিবেশিক কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হয়ে তিনি ১৮৯৯ সালে চীন দেশে যান। পরবর্ত্তী বৎসরে বক্সর বিদ্রোহে বৈদেশিকেরা বিপন্ন হয়ে পড়ে, এবং ফরাসী Embassy রক্ষা-কল্পে পেলিওকেও সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ

করতে হয়। বিদ্রোহীদের হাত হ'তে ফরাসীরা এ যাত্রায় পেলিওর জন্যই রক্ষা পান, কারণ চীনা ভাষায় আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি থাকার জন্যই তিনি সহজে বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটা আপোষ করতে পেরেছিলেন।

যে কারণেই হোক্ এই বৎসরে তিনি ঔপনিবেশিক কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করবেন বলে ইন্দোচীনে আসেন। সেই বৎসরে লুই ফিনোর চেষ্টায় হানয়ে প্রাচ্য-বিদ্যাপীঠ (Ecole Francaise d' Extreme Orient) স্থাপিত হয়, ও পেলিও চীনা ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। হানয়ে পেলিও পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি চীনা, আনামী, জাপানী, মঙ্গোলীয়, তুর্কী, তিব্বতী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে তিনি যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে এই বহুমুখী পাণ্ডিত্যের বিশদ্ পরিচয় রয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ হ'তে ইউরোপে সংবাদ পৌঁছে যে মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হয় ভগ্ন মন্দির না হয় পর্ব্বত-গুহা বা মরুভূমির বালুকা-স্তরের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। রুশীয়, জার্ম্মান ও ইংরাজ পণ্ডিতেরা তাঁদের স্বদেশবাসী বা সরকারের সাহায্যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই মধ্য-এশিয়া থেকে নানা লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করে ফিরলেন। এই শুভ মুহূর্ত্তে পেলিওর দৃষ্টি মধ্য-এশিয়ার পুরাতত্ত্বে আকৃষ্ট হ'ল। তাঁর বিশেষ চেষ্টায় ফরাসী সরকার ও ফ্রান্সের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এ বিষয়ে মনোযোগী হলেন ও ১৯০৬ সালে পারিসে Comité de l'Asie Francaise নামক একটী সমিতি গঠিত হ'ল। এই সমিতি ও ইন্দোচীনের ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তায় পেলিওর মধ্য-এশিয়ায় অভিযান সম্ভব হ'ল। এ অভিযানে পেলিওর দুজন মাত্র সহকর্ম্মী জুটলো, একজন হচ্ছেন ডাক্তার ও naturalist আর একজন photographer।

পেলিও ১৯০৬ সালের ১৫ই জুন পারিস্ হ'তে রওনা হলেন ও মস্কো থেকে রেলপথে তাস্কেন্দে (Tashkend) পৌঁছিলেন। তাস্কেন্দ হচ্ছে রুশীয় তুর্কিস্তানের রাজধানী। তাস্কেন্দে তিনি ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ একমাসকাল অতিবাহিত করলেন। পেলিওর উদ্দেশ্য ছিল সে দেশের প্রাচ্য তুর্কীদের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বুঝে নেওয়া। তাস্কেন্দ থেকে রেলপথ পরিত্যাগ করে পেলিও ও তাঁর সহকর্ম্মীরা ঘোড়ার পিঠে জিনিষপত্র তুলে নিয়ে কাশগর (Kashgar) অভিমুখে রওনা

হলেন। কাশগর পৌঁছিতে তাঁদের প্রায় তিন দিন লাগলো। কাশগরে পৌঁছে পেলিও তাঁর পথ-ঘাট ও অনুসন্ধানের উপায় ঠিক করে ফেললেন। মধ্যএশিয়ার দক্ষিণ দিকে বিশেষতঃ খোটান অঞ্চলে অনুসন্ধান করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করলেন, তার কারণ সে দিকে ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) বহুদিন ধরে বিশেষ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন ও তিনি যে সব উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তা ছাড়া হয়ত সে-দেশে আর কোন উপলভ্য উপাদান ছিল না। মধ্যএশিয়ার উত্তর ভাগে যে সব প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ছিল পেলিও সেই দিকে তাঁর অনুসন্ধান চালানো ঠিক করলেন।

কাশগরের নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে একমাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন সংগ্রহ করে পেলিও কুচার (Kuchar) অভিমুখে রওনা স্থির করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে কুচারের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে বহু প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ আছে, সে সব স্থানে অনুসন্ধান চালাতে পারলে বহু নূতন উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কাশগর থেকে কুচারের মধ্য পথে মারালবাশি (Maralbashi)। মারালবাশির নিকটবর্ত্তী তুমশুক (Tumshuq) গ্রামে প্রাচীনকালের বহু ধ্বংস-স্তূপ ছিল। পেলিওর পূর্ব্ববর্ত্তী অনুসন্ধানকারীরা মুসলমান যুগের ধ্বংসস্তূপ মনে করে এগুলি পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু পেলিও এই ধ্বংসস্তূপগুলি খনন করে যে সব প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করলেন সেগুলি হচ্ছে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের, আর্টের নিদর্শন হচ্ছে সেই রচনাশৈলীর যাকে বলা হয় ইন্দো-গ্রীক্। তুমশুকের খনন কার্য্য সমাধা করে পেলিও কুচার অভিমুখে রওনা হলেন ও ১৯০৭ সালের ২রা জানুয়ারী কুচারে পৌঁছিলেন। কুচারে তিনি প্রায় ৮ মাস কাল অতিবাহিত করলেন। কুচার প্রাচীনকালে ছিল একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের রাজধানী, আর সেই জন্য তার নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে প্রাচীন দুর্গ, বৌদ্ধমন্দির বৌদ্ধস্তূপ প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে সব চাইতে প্রসিদ্ধ ও দর্শনীয় প্রতিষ্ঠান ছিল মিং-উই। মিং-উই হচ্ছে তুর্কী কথা, অর্থ 'সহস্র মন্দির'। কুচার উত্তরে থিয়েন্-শান্ পর্ব্বতের পাদদেশে পাথর কেটে এই হাজার বৌদ্ধ গুহামন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল--সে সব মন্দিরে প্রাচীর চিত্র, মূর্ত্তি প্রভৃতি শিল্পের নমুনা ও প্রাচীন পুঁথিপত্রের খণ্ডিতাংশ সংগ্রহ করতে ও প্রাচীন পথঘাটের সন্ধান নিতে পেলিওর অনেক সময় অতিবাহিত হ'ল।

১৯০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পেলিও কুচার পরিত্যাগ করে—অক্টোবর মাসে উরুম্চী (Urumchi) পৌছিলেন। উরুম্চি হচ্ছে চীনা তুর্কীস্তানের রাজধানী ও ব্যবসায়ের কেন্দ্র, এখানে যানবাহনের ব্যবস্থা করতে ২।৩ মাস কেটে গেল। উরুম্চি থেকে ডিসেম্বর মাসে রওনা হয়ে—পেলিও ফেব্রুয়ারী মাসে তুন্-হোয়াং পৌছিলেন। তুন-হোয়াং হচ্ছে মধ্যএশিয়ার নানা পথের সন্ধিস্থল, কাশগর থেকে কুচার কারাশর প্রভৃতি স্থান হয়ে যে পথ থিয়েন-শান্ পর্ব্বতের পাদদেশ দিয়ে মরুভূমি অতিক্রম করে চীন দেশের প্রান্তভাগে পৌছেছে সে পথ শেষ হয়েছে তুন্-হোয়াং-এর নিকটবর্ত্তী স্থানে। কাশগর থেকে অন্য পথ মরুভূমির দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে খোটান হয়ে শেষ হয়েছে তুন্-হোয়াংএর নিকটবর্ত্তী স্থানে। সুতরাং প্রাচীন কালে তুন্-হোয়াং ছিল এমন একটী সমৃদ্ধিশালী স্থান যেখানে এই দুই পথ বেয়ে নানা দেশের লোক চীন দেশের রাজধানীতে যাবার পথে তুন-হোয়াংএ আশ্রয় পেত। এই কারণে তুন্-হোয়াংএ পাহাড় কেটে খৃষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে হাজার বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। এই সব মন্দিরই ছিল পেলিওর শেষ গন্তব্যস্থল। তুন্-হোয়াংএর মন্দির-শ্রেণী ইতিপূর্ব্বে ষ্টাইনও দর্শন করেছিলেন ও প্রাচীর চিত্র ও নানা মূর্ত্তির ছবি নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পেলিওর ভাগ্য-দেবতা অনেক বেশী প্রসন্ন ছিলেন বলে এই পরিত্যক্ত গুহামন্দিরে পেলিও যে সব পুঁথিপত্র খুঁজে বের করলেন তা' অন্য কেউ পায় নি।

খৃষ্টীয় একাদশ শতকে আরব আক্রমণের প্রক্কালে এই মন্দিরগুলি পরিত্যক্ত হয়। পুঁথিপত্রগুলিকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করিবার জন্য একটী ছোট গুহার মধ্যে সে-গুলি রক্ষিত হয় ও গুহার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পেলিও তুন্-হোয়াং পৌঁছে এই গুহার সন্ধান পেলেন ও সে সব পুঁথিপত্র পরীক্ষা করতে বসে গেলেন। প্রায় তিনমাস ধরে পেলিও প্রায় ১৫০০০ পুঁথি পরীক্ষা করলেন। এই সমস্ত পুঁথিই একাদশ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী, নানাভাষায় লিখিত—সংস্কৃত, তিব্বতী তুর্কী, চীনা ইত্যাদি। এ সব পুঁথি নানা বিষয়ের, বৌদ্ধসাহিত্য, মধ্য-এশিয়া ও চীনের ইতিহাস, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, চীন দেশের কনফুসীয় ও তাও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি। এই সমস্ত পুঁথি ও সমস্ত গুহার ভাস্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতির ছবি সংগ্রহ করে পেলিও ১৯০৮ সালের মে মাসে তুন্-হোয়াং পরিত্যাগ করলেন ও অক্টোবর মাসে পেকিং পৌছিলেন।

পেলিও প্রায় আড়াই বৎসর মধ্য এশিয়ার নানাস্থানে অতিবাহিত করেন— আর তাস্কেন্দ থেকে পেকিং পর্য্যন্ত মধ্য এশিয়া দিয়ে তাঁকে প্রায় দু' হাজার মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে অতিক্রম করতে হয়। এই পথের কষ্ট আমাদের কল্পনাতীত, এ পথ সুগম নয়, এ দেশে বৃষ্টিপাত নাই বললেই হয়। শীতকালে temperature ৩৫° ডিগ্রীতে দাঁড়ায়, আর গ্রীষ্মে মরুভূমির তপ্ত বালুকাকণায় পথ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ পথের কষ্ট স্বীকার করে কাশগর থেকে তুন্-হোয়াং পর্য্যন্ত নানা প্রাচীন স্থান থেকে পেলিও মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার যে সব নিদর্শন সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন তা'তে পারিসের জাতীয় পুস্তকাগার (Bibliothèque Nationale) এমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে যার অন্যত্র তুলনা নাই। চীন দেশের প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা করবার জন্য যে সংগ্রহ পেলিও করেছেন তা শুধু যে ইউরোপেই দুর্লভ তা' নয়, চীন দেশেও দুষ্প্রাপ্য।

[২]

মধ্য-এশিয়া হ'তে ফিরবার পর পেলিওর পুনরায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জীবন সুরু হ'ল। তিনি ১৯১১ সালে Collège de Franceএ মধ্য-এশিয়ার ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন এবং সহকর্ম্মীদের সঙ্গে নিজের সংগৃহীত এই বিপুল উপাদান আলোচনায় মনোনিবেশ করলেন। পেলিও এ পর্য্যন্ত কোন বই লেখেন নি, আর কোন দিন যে বই লেখা তাঁর সম্ভব হবে তাও মনে হয় না, তার কারণ নানা ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার থাকবার জন্য যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তিনি যে বিপুল উপাদান সংগ্রহ করেন তা থেকে কোন সুসংবাদ গ্রন্থ হ'তে পারে না। তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন আর কোন কোন প্রবন্ধ প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এই সকল প্রবন্ধে তিনি যে সব বিষয় আলোচনা করেছেন সেগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) ভাষাতত্ত্ব, (২) চীনা-সাহিত্য, ধর্ম্ম ও দর্শনের ইতিহাস, (৩) ইন্দোচীনের প্রাচীন ইতিহাস, (৪) মধ্য এশিয়ায় ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাচীন ইতিবৃত্ত, (৫) প্রাচ্য দেশসমূহের প্রাচীন শিল্প সম্বন্ধে নানা আলোচনা।

ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁ'র আলোচনা বহুমুখী। তাঁ'র নানা প্রবন্ধে চীনা ভাষার প্রাচীনরূপ উদ্ধারের প্রথম চেষ্টা দেখতে পাই। গত দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে

চীনা ভাষার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে, সেই জন্য চীনা অক্ষরের বর্ত্তমান উচ্চারণ গ্রহণ করলে প্রাচীন চীনা ইতিহাসে দেশ-বিদেশের নামের যে সব উল্লেখ আছে সেগুলি অবোধ্য থেকে যায়। এই কারণেই পেলিওকে চীনা অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ উদ্ধারে মনোযোগ দিতে হয়। তাঁ'র আলোচনা থেকে আমরা প্রথম বুঝতে পারি যে বর্ত্তমানে যে চীনা অক্ষরের উচ্চারণ 'ফো' দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার উচ্চারণ ছিল 'বুৎ' বা 'বুদ' এবং সেই জন্যই সে সময়ে ঐ অক্ষর 'বুদ্ধ' শব্দকে রূপান্তরিত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এই প্রণালীতে পেলিও বহু অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ উদ্ধার করেন—এবং চীনা ভাষায় রূপান্তরিত বৈদেশিক শব্দগুলির সেই সঙ্গে খোঁজ পাওয়া যায়, উদাহরণ ;—বর্ত্তমান চীনা—শো-লি-ইউ = প্রাচীন-শিল্প, লিয়েই-ইয়ুত = শারিবুত = সংস্কৃত শারিপুত্র ; পান্-চান্ = প্রাচীন-পন্-চম্ = সংস্কৃত পঞ্চম ; তিয়েন্-না-উ = প্রাচীন—দ'ন-না-ইউব = পহ্লবী-দেনাবর ইত্যাদি। এই আলোচনায় পেলিও যে পথ নির্দ্দেশ করলেন সেই পথ অনুসরণ করে মাস্পেরো ও কার্লগ্রেন চীনা ভাষার প্রাচীনরূপ সম্বন্ধে যে অনুশীলন চালালেন তা'তে দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনা ভাষার যে রূপ ছিল তা সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রাচীন চীনা ভাষা সম্বন্ধে এই নূতন আলোক পাত করতে পেরেছিলেন বলেই মধ্য-এশিয়ার অনেক ভাষার প্রাচীন ইতিহাস তিনি সুসঙ্গতভাবে আলোচনা করতে পেরেছেন, যা তাঁর পূর্ব্বে অন্যের সম্ভব হয় নি। এই কারণে তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতকে মঙ্গোলীয় ও তুর্কী ভাষার রূপ কি ছিল তার যে আলোচনা করেন এবং সে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন (Les mots à H initial dans le mongol des XIIIe et XIVe siècles) তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি এ প্রবন্ধে সুসঙ্গতভাবে প্রমাণ করেন যে বর্ত্তমানে মঙ্গোলীয় ভাষায় 'আরবন', 'অরন', 'উকর' ইত্যাদি শব্দ প্রাচীন কালে 'হরবন', 'হরন', 'হুকর' ভাবে উচ্চারিত হত। প্রাচীন উচ্চারণ উদ্ধার করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন যে প্রাচীন তুর্কী, তুঙ্গুজ, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি ভাষা একই ভাষাগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত।

মধ্য এশিয়া হ'তে পেলিও যে সব পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে আনলেন তার মধ্যে যেগুলি প্রাচীন কুচীয় ভাষায় লিখিত তার পাঠোদ্ধার করলেন অধ্যাপক লেভি, এবং যেগুলি প্রাচীন সুগ্দীয় (Sogdian) ভাষায় লিখিত তার পাঠোদ্ধার করলেন

গোথিও (Gauthiot) এবং গত যুদ্ধে গোথিওর মৃত্যুর পর পেলিও নিজে। এ ছাড়া তুর্কী, উইগুর, তিব্বতী ও প্রাচ্য-ইরানীয় (Eastern Iranian) প্রভৃতি ভাষায় লিখিত অনেক পুঁথিপত্রের পাঠোদ্ধার ও আলোচনা পেলিও নিজেই করেছেন এবং তাঁর আলোচনা থেকেই পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা অনেক স্থলে পথ খুঁজে পেয়েছেন।

মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে পেলিওর নানা প্রবন্ধে অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। La vie religieuse en Asie centrale এবং Un traité Manichéen retrouvé en Chine এই দুই প্রবন্ধে পেলিও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধ ও মানিকীয় (Mani) ধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ থেকে বুঝতে পারি যে প্রাচীন সুগ্দীয় জাতি মধ্যএশিয়ার নানাস্থানে উপনিবেশ বিস্তার করেছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম তা'দের হাতেই নানাস্থানে প্রচার লাভ করে। মধ্যএশিয়ার নানা জাতির ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে তা'দের প্রভাব বহু দিন ধরে অব্যাহত ছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধ চীনা-ভাষায় পেলিওর শিক্ষাগুরু শাবানের (Chavannes) সহায়তায় লিখিত। 'মানি'র ধর্ম্ম বহুদিন লোপ পেয়েছে, সে ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস যেটুকু জানতে পারি তা'র উপাদান হয় গ্রীক্ খৃষ্টান পাদ্রীদের লেখায় না হয় চীনা সাহিত্যে নিবদ্ধ। চীনা সাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব উল্লেখ রয়েছে পেলিও ও শাবান সেগুলির অনুবাদ করেছেন ও সেগুলির উপর যে টিপ্পনী করেছেন সে টিপ্পনীতে মধ্যএশিয়ার নানা সাহিত্য, গ্রীক, লাতিন ও ইরানীয় সাহিত্য হ'তে বহু উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই কারণে এ প্রবন্ধ মানিকীয় ধর্ম্মের আলোচনায় প্রধান গ্রন্থহিসাবে গৃহীত হয়েছে।

প্রাচীন চীনা ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে পেলিও ভারতের সঙ্গে চীনের যোগসূত্রের ইতিহাস উদ্ধার করলেন। তিনি প্রথম বয়সে তিনটী প্রবন্ধ লেখেন, Le Fou-nan, Mémoires sur les coutumes de Cambodge এবং Deux itinéraires de Chine en Inde à la fin du VIIIe siecle ; শেষ প্রবন্ধটী প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। এ তিনটী প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন চীনা সাহিত্য থেকে যে বিপুল উপাদান সংগ্রহ করেছেন তা' হতে আমরা আসাম, বর্ম্মা, শান রাজ্য, দক্ষিণ চীন, শ্যাম, কম্বুজ, চম্পা, যবদ্বীপ ও সে অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস, প্রাচীন পথঘাটের বিবরণ, ভারতবর্ষ ও চীনদেশের সঙ্গে সে সমস্ত দেশের যোগাযোগ ও সে সমস্ত দেশের প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত

পাই তা তার পূর্ব্বে বা পরে কোন পণ্ডিতই অঙ্কন করতে পারেন নি, সেই কারণে এই তিনটী প্রবন্ধ ঐ সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় মূল-সূত্র হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

আর্টের ইতিহাসে পেলিওর আর একটী বড় অবদান রয়েছে। তিনি মধ্য এশিয়ার নানা স্থান থেকে প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য্য ও চিত্র বিদ্যার যে সব উপাদান সংগ্রহ করে আনেন তা আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। টীকা টিপ্পনীসহ সেগুলিকে প্রকাশ করেই পেলিও নীরব নাই। তিনি চীনা ইতিহাস থেকে প্রাচীন যুগের শিল্পীদের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বের করেছেন, বিশেষতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতক হতে নবম শতক পর্য্যন্ত যে সব ভারতীয় শিল্পী চীনদেশে গিয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় আর্টের ইতিহাসের বহু উপাদান পাই। (Artistes des six dynasties et des T'ang).

পেলিওর সমস্ত কাজের খবর দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং এ প্রবন্ধে তা' সম্ভবও নয়। যা বলেছি তা থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা কতটা বহুমুখী। নানা প্রাচ্যদেশের ভাষা ও সাহিত্যে তাঁ'র যে অধিকার তা আর কারু নেই এবং সেই জন্যই তিনি সে সব দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যা লেখেন বা বলেন তার বিরুদ্ধে অন্যের আর বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে না। তাঁর আলোচনায় ভারতবর্ষের ইতিহাসও নানা ভাবে লাভবান হয়েছে, মধ্য-এশিয়া ও ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার, ভারতীয় আর্ট, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও মধ্য-এশিয়ার নানা ভাষায় যে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রচলিত ছিল তার সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসও ব্যাপকভাবে আলোচনা করতে চাইলে পেলিওর অবদান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করে আমাদের উপায় নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

পুনরুজ্জীবন

[রঙ্গমঞ্চ আবৃত। তার দক্ষিণে তিনজন গায়ক উপবিষ্ট। নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি বলতে বলতে তারা যবনিকা উন্মোচন ক'রে আবার স্বস্থানে ফিরে যায়]

[১]

ডায়োনিসাসের মৃত্যুতীর্থে কে এক কুমারী নারী
মৃত দেবতার বক্ষে প্রহারে দৃষ্টির তরবারি ;
তার পরে সেই ছিন্ন হৃদয়
শবসাধনায় ক'রে নেয় জয়।
অবাক্ জগৎ চমকি অমনি ধরে তার জয়গান,—
দেবতানিপাত, সে যেন বিলাস, রঙ্গের অবসান ॥

[২]

উদিবে অপর ট্রয় নিশ্চয়, আবার অস্তে যাবে ;
আবার বীরের বংশ উজাড়ি শকুনি পথ্য পাবে ;
আরো নিঃসার তৈজস তরে
ভিড়িবে আর্গো নব বন্দরে।
স্বপ্নগর্ভ আঁধারে উঠেছে অচিন ভাগ্যতারা,
সসাগরা রোম শাসনবিমুখ, আর্ত্তিতে মৃতপারা ॥

[মঞ্চে কোনো দৃশ্যপট নেই, তার তিন পাশে কতকগুলো রঙীন পর্দা ঝোলানো, বামে শুধু একটা নির্গমের পথ, তাও পর্দায় ঢাকা। রঙ্গমঞ্চে একা হিব্রু আসীন, তার হাতে একটা তলোয়ার বা বল্লম। দর্শকবৃন্দের মধ্যে থেকে বাঁ দিক দিয়ে গ্রীকের প্রবেশ]

হিব্রু : কিসের হট্টগোল জানতে পারলে ?

গ্রীক : হ্যাঁ, একজন য়িহুদি উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলুম।

হিব্রু : ভয় পেলে না ?

গ্রীক : সে কেমন ক'রে জানবে, আমার উপাধি খৃষ্টান ? এলেক্জাণ্ড্রিয়া থেকে যে টুপি এনেছি, সেইটা আমার মাথায় ছিলো। লোকটি বল্‌লে, নগরে

ডায়োনিসাস্-ভক্তদের মিছিল বেরিয়েছে, ঢাক-কাঁশি, খোল-খত্তালের বিরাম নেই। ব্যাপারটা এ-অঞ্চলে এই প্রথম, তাই সশঙ্ক রোমান কর্ত্তৃপক্ষ সুদ্ধ তাতে হস্তক্ষেপে অনিচ্ছুক। ডায়োনিসাসের দল ইতিমধ্যেই নাকি খোলা মাঠে একটা আস্ত পাঁঠাকে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে, তার রক্ত খেয়েছে। তারপর থেকে তাদের দশায় পেয়েছে, তারা রাস্তা চ'ষে বেড়াচ্ছে যেন একপাল হন্যে নেকড়ে বাঘ। ফলে সারা শহর এখন তটস্থ, ভিড়েরও সাহস নেই তাদের ঘাঁটায়। অথবা এটাই বেশি সম্ভব যে সম্প্রতি সকলে খৃষ্টান শিকারে ব্যস্ত, আজ আর কারো মরবারও সময় নেই। খবর নিয়েই চ'লে আসছিলুম, কিন্তু ভদ্রলোকের ডাকে আবার ফিরতে হলো। এবারে সে জানতে চাইলে আমি কোথায় থাকি; এবং যখন বল্লুম নগরপ্রাচীরের বাইরে, তখন আবার শুধোলে সত্যিই আজ সমস্ত শব সমাধিমুক্ত কিনা?

হিব্রু: অন্তত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমরা ভিড় ঠেকিয়ে রাখবো, আর ও-এগারোজন নিশ্চয়ই সেই সুযোগে ছাদ দিয়ে পালাতে পারবেন। রাস্তা থেকে এখানে ওঠার সিঁড়িটা খুবই সরু, যতক্ষণ না মরি, ততক্ষণ আমিই সে-পথ আগলাবো। তারপর তুমি আমার জায়গা নিও। সীরিয়ান এখানে নেই কেন?

গ্রীক: দরজায় তাকে দেখে একটা সন্ধানে পাঠিয়েছি, সে অবিলম্বেই ফিরবে।

হিব্রু: বলাই বাহুল্য, আমাদের কর্ত্তব্যপালনের জন্যে তিনটি প্রাণীও যথেষ্ট নয়।

গ্রীক [বামপার্শ্বস্থ নির্গমপথের পানে তাকিয়ে]: ওঁরা এখন কি করছেন?

হিব্রু: তুমি যখন নিচে ছিলে, তখন থলি হাতড়ে জেম্স্ একখানা রুটি বার করেন, আর ন্যাথানেল্ এক মশক মদ এনে টেবিলের উপরে রাখেন। বহু কাল যাবৎ কারো পেটে অন্ন পড়েনি। কিন্তু সে-কথা ভুলে সকলে হঠাৎ নিচু গলায় আলাপ জোড়েন। জন্ তোলেন সেইদিনকার প্রসঙ্গ যখন ও-ঘরে ওঁদের শেষ পংক্তিভোজন হয়েছিলো।

গ্রীক: সেদিন কিন্তু খেতে বসেছিলো তেরো জন।

হিব্রু: জন্ সকলের মনে পড়িয়ে দেন যে সেদিন মদ-রুটি বেঁটেছিলেন স্বয়ং যীশু। হয়তো তাই জন্ থামলে, সকলে আবার মুখ বোজেন, পানাহার যেমন পড়েছিলো, তেমনি প'ড়ে থাকে। এইখানে দাঁড়াও, ওঁদের দেখতে পাবে। জানলার ধারে নতমস্তকে ব'সে আছেন পীটার, কতক্ষণ নড়েননি, তার ইয়ত্তা নেই।

গ্রীক ঃ সৈন্যদের প্রশ্নোত্তরে উনি নিজেকে যীশুর শিষ্য ব'লে স্বীকার করেননি, এ অপবাদ কি সত্য ?

হিব্রু ঃ হ্যাঁ, সত্য। আমি শুনেছি জেম্‌সের মুখে। কারণ পীটার নিজের কুকীর্ত্তি ঢাকেননি, সবাইকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আসল সময়ে সকলেই তো সমান ভয় পেয়েছিলো। কাজেই শুধু একজনকে দূষলে চলবে না। আমি নিজেই কি ওঁদের চেয়ে বেশি সাহস দেখাতে পারতুম ? আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাই আজ নিরাশ্রয় কুকুরের মতো; আমরাও আমাদের প্রভু হারিয়েছি।

গ্রীক ঃ কিন্তু ভিড় যদি এদিকেই ঠেলা মারে, তবে তুমি আমি প্রাণ দেবো, তবু সিঁড়ি ছাড়বো না।

হিব্রু ঃ ওঃ ! সে-কথা আলাদা। আমি পর্দ্দাটা টেনে দিচ্ছি ; এর পরে যা বলবো, ওঁদের কানে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ। [সে নির্গমপথের পর্দ্দা টেনে দেয়]

গ্রীক ঃ তোমার মনের ভাব আমি জানি।

হিব্রু ঃ উপস্থিত বুদ্ধির অভাবেই ওঁরা আজ ভয়ে অভিভূত। যীশু যেকালে ধরা পড়লেন, তখন আর তাঁকে যুগাবতার বলা ওঁদের সাধ্যেও কুলোলোনা। আমরা, যারা দিনগত পাপক্ষয়ে কাল কাটাই, তাদের পক্ষে সান্ত্বনা খুঁজে নেওয়া হয়তো সহজ। কিন্তু ওই এগারোজনার চোখে অম্লান আলো আর অসীম অন্ধকার, এ-দুয়ের সন্ধি অসম্ভব।

গ্রীক ঃ কারণ বয়সে ওঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

হিব্রু ঃ না, না। ওঁদের মুখ দেখলেই বুঝবে যে ওঁরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের সগোত্র। মাহাত্ম্যই ওঁদের বিধিলিপি, তাছাড়া অন্যপ্রকার জীবনযাত্রার যোগ্যতা ওঁদের একেবারে নেই। হাসছো কেন ?

গ্রীক ঃ জান্‌লা দিয়ে একটা মজার জিনিস দেখতে পাচ্ছি। ওই যে, যেখানে আঙুল দেখাচ্ছি, রাস্তাটার শেষ সীমায়। [তারা পাশাপাশি দাড়িয়ে দর্শকবৃন্দের শিয়র দিয়ে বাইরে দেখে]

হিব্রু ঃ কই ? কিছুই তো নজরে পড়ে না !

গ্রীক ঃ ওই যে পাহাড়টা।

হিব্রু ঃ ওটা ! ওটা তো ক্যাল্‌ভারি—ক্রুসতীর্থ !

গ্রীক ঃ একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে ক্রুস। [পুনরায় হাস্য]

হিব্রু : চুপ করো। জানোনা কি করছো। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। ক্যালভারি দেখে হাসি ?

গ্রীক : না, না, সেজন্যে নয়। আমি হাসছি, কারণ সকলের বিশ্বাস যে ওই ক্রুসে পেরেক ঠুকে যার হাতজোড়া টাঙানো হয়েছিলো, সে-ব্যক্তি জীবন্ত ; কিন্তু আসলে ওখানে ঝুলেছিলো মানুষেরই মানসপ্রতিমা, মরীচিকার মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

হিব্রু : তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময়ে আমি নিজে উপস্থিত ছিলুম।

গ্রীক : এ-রকম জিনিস শুধু আমরা গ্রীকরাই বুঝি। দেবতার সমাধিসৎকার, দেবতার যন্ত্রণাভোগ। সে আবার কেমন কথা ! খৃষ্টের জন্ম, তাঁর আহার-বিহার, নিদ্রা-জাগরণ, তাঁর মৃত্যু, এগুলোর কোনোটাই সত্য নয়, সবই সত্যাভাস। কিন্তু প্রমাণ পাবার আগে কিছুই তোমায় বলবোনা, ভেবেছিলাম।

হিব্রু : প্রমাণ ?

গ্রীক : রাত্রির আগেই প্রমাণ পাবো।

হিব্রু : তুমি প্রলাপ বকছো। কিন্তু যে-কুকুরের প্রভু নেই, চাঁদ দেখে চেঁচানোই তার স্বভাব।

গ্রীক : এ-সকল ব্যাপার বোঝা য়িহুদিদের কর্ম্ম নয়।

হিব্রু : বুঝতে পারছোনা তুমিই। আমি আর ওই ঘরের লোক-কটি, আমাদের বুদ্ধিই হয়তো এতদিনে সবে খুলছে। যীশু মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু মানুষের বেশি নন্। মানুষী দুঃখের এত বড় অনুকম্পায়ী ইতিপূর্ব্বে আর কখনো জন্মায়নি। সেইজন্যেই তিনি অবতারবাদ প্রচার করেছিলেন ; ত্রাণকর্ত্তা মানুষের দুর্ভোগ নিজের স্কন্ধে তুলে নেবেন, এই ছিলো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ঐকান্তিক আশা। তারপর একদিন, হয়তো যখন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে তাঁর দেহ শ্রান্তিতে অবসন্ন, তখন নিজেকে তিনি সেই অনাগত অবতারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই আত্মপ্রবঞ্চনা তাঁর করুণারই সাক্ষ্য। সম্ভব অসম্ভব সকল রকম দুরদৃষ্টের মধ্যে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর ভবিতব্য আর কি থাকতে পারে ?

গ্রীক : মানুষ কি ক'রে নিজেকে ত্রাণকর্ত্তা ব'লে ভাবতে পারে ?

হিব্রু : আদিকাল থেকে আপ্তবাক্য চ'লে আসছে যে তাঁর অভ্যুদয় নারীর গর্ভে।

গ্রীক ঃ নারীদেহে দেবতার উৎপত্তি, নারীগর্ভে তাঁর বৃদ্ধি, নারীদুগ্ধে তাঁর পরিপুষ্টি, সাধারণ শিশুর মতো তাঁর লালন-পালন, অঙ্গপ্রক্ষালন—এ রকম ভয়ানক দেবনিন্দা অতিবড় পাষণ্ডের মুখেও বাধবে।

হিব্রু ঃ নারীর গর্ভে না-জন্মালে তিনি মানুষের পাপের ভাগী হবেন কেমন ক'রে? প্রত্যেক পাপে এক একটা দুঃখনদীর উৎপত্তি; কিন্তু তিনিই সে-সমস্ত প্রবাহের সঙ্গমস্থল।

গ্রীক ঃ মানুষের পাপ তার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি, তাতে আর কারো অধিকার নেই।

হিব্রু ঃ আতসী কাচের শোষণে বিক্ষিপ্ত সূর্য্যরশ্মি যেমন একটা জ্বলন্ত বিন্দুতে দানা বাঁধে, তিনিও তেমনি সকল মানুষের সমস্ত দুঃখকে সংস্থিত করেন নিজের মধ্যে।

গ্রীক ঃ তোমার কথায় আমার গা কেঁপে উঠছে। দুঃখের পরাকাষ্ঠাকে অর্ঘ্যনিবেদন! এ-রকম চিত্তবিক্ষেপ, বহিরাশ্রয়ের এতখানি অভাব শুধু সেই জাতির পক্ষেই সহজ, যাদের জীবনে প্রতিমার স্থান নেই।

হিব্রু ঃ তোমার কাছে যে-মনোভাবের পরিচয় দিলুম, ওটা আমার সম্বন্ধে খাটতো তিন দিন আগে পর্য্যন্ত।

গ্রীক ঃ আমি বলছি যে সমাধির ভিতরে কিছুই নেই।

হিব্রু ঃ তাঁকে পাহাড়ে চড়িয়ে যখন চৈত্যে স্থাপন করা হয়, তখন আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলুম।

গ্রীক ঃ সমাধিমন্দির যে শূন্য, এই কথা প্রমাণ করবার জন্যেই আমি সীরিয়ানকে পাহাড়ে পাঠিয়েছি।

হিব্রু ঃ তুমি জানো, আমাদের অবস্থা কি রকম সঙ্কটাপন্ন, প্রহরী-সংখ্যা কমাতে তবু তোমার সঙ্কোচ হলো না?

গ্রীক ঃ এর ফলে ওই এগারোজনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, বুঝি। কিন্তু সিরিয়ানকে যে-তদন্তে পাঠিয়েছি, তা অনেক বেশি আবশ্যিক।

হিব্রু ঃ আজ আমরা কেউই প্রকৃতিস্থ নই। আমার নিজের মাথাতেও এমন কতকগুলো চিন্তা জুটেছে যে আমি আপনিই চমকে উঠছি।

গ্রীক ঃ এমন কিছু, যা তুমি মুখে আনতে চাওনা?

হিক্রু ঃ যীশু যে অবতার নন, সে-আবিষ্কারে আমি আরাম পেয়েছি। আমাদের প্রবঞ্চনা আমরণ চলতে পারতো। অথবা এমন সময়ে সে-ভুল ভাঙতে পারতো, যখন আর তার প্রতিকারের উপায় থাকতোনা। দৈব প্রসাদের জন্যে নিজেকে গ'ড়ে তোলা, সে কি সহজ কথা ? ঐশী বেদনার অবরোহণ যে সর্ব্বনাশের পথেই সম্ভব ; ত্যাগের, স্বার্থবলিদানের চূড়ান্তে না পৌঁছলে চিত্তশুদ্ধির আশাই বিড়ম্বনা। [তার কথার ফাঁকে ফাঁকে খোল-খত্তালের বিচ্ছিন্ন আওয়াজ ক্রমশ অবিশ্রান্ত হয়ে ওঠে] সে-সাধনায় বিষয়বুদ্ধি, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, নিজের ইচ্ছা, এর প্রত্যেকটাই বিঘ্ন ; সেখানে পরমার্থ বাদে আর কিছুই যথার্থ নয়, ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই অনন্য গতি। বার্দ্ধক্য যখন কেশে ধরেছে, মোড় ফিরলেই হয়তো যমের সঙ্গে দেখা হবে—এমন অবস্থায় নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলোর স্মৃতি নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর রকম কষ্টকর, সে-বয়সে নারীর ধ্যান নিশ্চয়ই নিতান্ত দুঃসহ। আমি এখন সংসার পাততে চাই, আমার মন আজ পুত্র-কলত্রের জন্যে উৎসুক।

গ্রীক [দর্শকদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তাদের মাথার উপরে তাকাতে তাকাতে] ঃ এ যে ডায়োনিসাস্‌-ভক্তদের মিছিল, আমাদের জানলার ঠিক নিচেই থেমেছে। ওদের মধ্যে একদল মেয়ে একখানা খাট কাঁধে ক'রে, তাতে নিহত দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বইছে। না, ওরা মেয়ে নয়, স্ত্রীবেশী পুরুষ। এলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতে কতকটা এই রকমই দেখেছিলুম। সকলেই একেবারে চুপ, কী একটা যেন ঘটলো ব'লে। ত্রাহি ভগবান ! কী দৃশ্য ! এলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতেও কোনো কোনো পুরুষ ঠোঁটে আল্‌তা লাগায়, কচিৎ কদাচিৎ মেয়েদের অনুকরণ করে, যাতে উপাসনায় স্ত্রীসুলভ আত্ম-নিবেদন তাদের আয়ত্তে আসে। তাতে খুব বেশি ক্ষতি হয় না—কিন্তু এখানে! নিজে এসে দেখো একবার।

হিক্রু ঃ ও-রকম পাগলদের দিকে আমি চাইবো না।

গ্রীক ঃ বাজনা যদিও থেমে গেছে, গুটিকতক লোকের নাচ তবু থামছে না। কয়েকজন আবার ছুরি দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে বোধহয় বা ভাবছে যে তারা একাধারে নিহত দেবতা এবং দেবনিহন্তা অসুর। একটু দূরে রাস্তার একেবারে মাঝখানে একজোড়া স্ত্রী-পুরুষ প্রকাশ্য মৈথুনে মত্ত। স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস, নাচের উন্মাদনায় যে-পুরুষ দৈবাৎ তাকে বাহুপাশে বেঁধেছে, তার হাতে নিজেকে সঁপে দিলেই বুঝি মৃত দেবতা আবার বেঁচে উঠবেন। ওদের হাব-ভাব, বেশ-ভূষা দেখলে

আর সন্দেহ থাকে না, ওরা সকলেই বিদেশী পল্লির বাসিন্দা, গ্রীক বটে, কিন্তু এসিয়ার পালিত সন্তান, যেমন অজ্ঞ, তেমনি উত্তেজনাপ্রবণ, জনতার সব নিচু স্তরে উৎপন্ন, জীবনের মলা। ও-রকম মানুষ নিদারুণ যাতনা পায় আর পৈশাচিক অনুষ্ঠানে বিস্মৃতি খোঁজে; ওঃ, এইজন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা। ভিড় দু ভাগ হয়ে একজন গায়িকাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। না, ও তো মেয়ে নয়, যাত্রার দলের একটি ছেলে। ওকে আমি চিনি। ও সর্ব্বদা মেয়ের ভূমিকায় নামে। কিন্তু ছেলেটি মেয়ে সাজলেও ওর নখগুলোয় সোনালী রং, পরচুল সোনালী সুতোর তৈরি, যেন কোনো দেউলপলাতক বিগ্রহ। মনে হচ্ছে এলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতেও এ-জিনিস দেখেছিলুম। পূর্ণিমার তিন দিন বাদে, চৈত্রী পূর্ণিমার তিন দিন পরে তারা দেবতার মৃত্যুগাথা গেয়ে তাঁর পুনরুজ্জীবন কামনা করে।

[গায়কদের একজন উঠে নিম্নলিখিত গান গায়]

ঝুম্‌ঝুমি বাজে বিজন বনে।
অদিতির শিশু মানে না মানা,
ছুটে মরণের আকর্ষণে।
সে-সাংঘাতিক সঙ্গোপনে
ওত পেতে আছে দৈত্য, দানা॥

[প্রতি কথার সঙ্গে সঙ্গে ও পরে পরে মৃদঙ্গধ্বনি]

পথিকসেবিকা রমণী মোরা
কোনো ছলা, কলা রাখিনি বাকি।
তবু সে থামেনি, সহেনি ত্বরা।
বৃথাই আমরা স্বয়ম্বরা,
মুরজমন্দ্রে বৃথাই ডাকি॥

[পূর্ব্ববৎ মৃদঙ্গধ্বনি]

কান্তারে যেথা ঘনায় ছায়া,
সেথা নৃশংস অসুর যত
সংবৃত ক'রে পিশাচী মায়া,

অদিতিসুতের পেলব কায়া
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় পশুর মতো ॥
[পূর্ব্ববৎ মৃদঙ্গধ্বনি]

কুমারী অদিতি, চরণে তব
অনাথারা আজ শরণ মাগে !
হে আদি জননী, কেমনে সবো
এ-বিরহব্যথা নিত্যনব ;
শিয়রে পূর্ণ চন্দ্র জাগে ॥
[পূর্ব্ববৎ মৃদঙ্গধ্বনি]

গ্রীক ঃ এ-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাতার নাম যদিও গ্রীক, তবু এদের আত্মসমর্পণ, এদের আত্মলাঘব, আমার বিবেচনায়, গ্রীক স্বভাবের পরিপন্থী। আকিলিস্-এর বিরুদ্ধে দেবী যখন যুদ্ধে নেমেছিলেন, তখন তিনি তার কেশাকর্ষণ করেছিলেন মাত্র, তার আত্মায় হাত দেন নি। লুক্রিশিয়াসের বিশ্বাস যে দেবতারা আমাদের দিবা-নিশার স্বপ্নে আবির্ভূত হন বটে, কিন্তু মানুষের ললাটলিখনে তাঁদের সাক্ষর নেই। এ-কথা অবশ্য একজন রোমান আলঙ্কারিকের অতিকথন ; কারণ ধ্যানে তাঁরা ধরা পড়েন, তখন তাঁদের চোখে জ্বলে অমৃতের উত্তুঙ্গ জ্যোতি, বাদুড়ের ডাকের মতো তীক্ষ্ণ আর তীব্র। বীরের বীর্য্যবান দেহ ছাড়া অন্য কোনো মর্ত্যশরীরে তাঁদের লোভ নেই ; ক্ষত্রিয়ই যেন যদৃচ্ছার একমাত্র প্রতিলিপি, দৈবী প্রকীর্ত্তির অদ্বিতীয় অভিনেতা। যেটা তাঁদের ঔদাসিন্য ব'লে ঠেকে, সেটা আর কিছুই নয়, দেবতাদের সনাতন স্বায়ত্তশাসন। মানুষও চিরদিন স্বতন্ত্র, সে তার আত্মা বিকোয় না, ব্যক্তিরহস্য আগলে রাখে।

[মৃদঙ্গের শব্দে দ্বারে করাঘাতের অনুকরণ]

হিব্রু ঃ কে একজন দরজা ঠেলছে। কিন্তু রাস্তায় ওই ভিড় থাকতে খিল খোলার সাহস আমার নেই।

গ্রীক ঃ ভয় পেওনা। জনতা চলতে সুরু করেছে। [বাঁ দিক দিয়ে দর্শকদের মধ্যে হিব্রুর অবতরণ] আমাদের প্রধান প্রধান দার্শনিকদের নির্দ্দেশে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে দেবতাদের পক্ষে মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন অত্যন্ত সহজ, তার

সম্পদ ব স্বাস্থ্যহরণ আদৌ শক্ত নয়; কিন্তু তাহলেও মানুষ কখনোই নিজের ব্যক্তিরহস্য খোয়ায় না। আগন্তুক যদি আমাদের সীরিয়ানই হয়, তবে ও হয়তো এমন সাক্ষ্য নিয়ে আসছে যে মনুষ্যজাতি ওর বাণী কোনোদিন ভুলবে না।

হিক্রু [দর্শকদের মধ্যে থেকে]ঃ সীরিয়ানই বটে। কিন্তু একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে; হয় ও অসুস্থ, নয় নেশা করেছে। [সীরিয়ানকে সযত্নে ধ'রে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্ত্তন]

সীরিয়ানঃ আমার অবস্থা মাতালের মতো। আমি আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি না। একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে। তাই সারা পথ এসেছি ছুটতে ছুটতে।

হিক্রুঃ কী?

সীরিয়ানঃ এগারোজনাকে এখুনি বলতে হবে। তাঁরা ভিতরেই আছেন তো? এ-সংবাদ থেকে কাউকে বাদ দিলে চলবে না।

হিক্রুঃ কি হয়েছে, নিঃশ্বাস নিয়ে বলো।

সীরিয়ানঃ আমি সমাধিমন্দিরে যাচ্ছিলুম। পথে যীশুর মা মেরী, জেম্‌সের মা মেরী, আর অন্যান্য গ্যালিলীয় মহিলাদের দেখা পেলুম। অল্পবয়স্কাদের মুখ উত্তেজনায় একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছিলো, তারা আর থাকতে না-পেরে সমস্বরে কথা জুড়লে। কে কি বলছে, বুঝতে পারলুম না। তাই জেম্‌সের মা জানালেন যে রাত্ত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চৈত্যে গিয়ে দেখেছেন সেটা শূন্য।

গ্রীকঃ আঃ!

হিক্রুঃ সমাধি খালি হতে পারে না। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

সীরিয়ানঃ চৈত্যদ্বারে একজন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবির্ভূত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে খৃষ্টের পুনরুত্থান ঘোষণা করেছেন। [মৃদঙ্গের মৃদু আওয়াজ ও করতালের অস্পষ্ট ধ্বনি] পাহাড় থেকে ফেরার পথে একটি মানুষ এসে হঠাৎ তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন; তিনি স্বয়ং যীশু। তাঁরা ঝুঁকে প'ড়ে তাঁর পদচুম্বন পর্য্যন্ত করেছেন। এইবার আমায় পথ দাও, পীটার, জেম্‌স্‌, জন্‌, সবাইকে জানাই গে।

হিক্রু [ভিতরে যাবার পর্দ্দাঢাকা দরজা আগলে]ঃ না, আমি পথ ছাড়বো না।

সীরিয়ানঃ শুনতে পেলেনা কি বললুম! ভগবান আবার পুনর্জ্জীবিত।

হিক্রুঃ মেয়েলী খেয়ালের খবরে ওঁদের বিরক্ত করতে দেবোনা।

গ্রীকঃ মেয়েরা স্বপ্ন দেখেনি। তারা তোমায় সত্য বলেছে। তাহলেও

হিব্রুর সঙ্কল্পই ঠিক। এখানকার রক্ষণাবেক্ষণ ওরই দায়িত্ব। এগারোজনাকে জানানোর আগে আমাদের সকলের সন্দেহ ভাঙতে হবে।

সীরিয়ান ঃ এগারোজনার বিচারবুদ্ধি আমাদের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

গ্রীক ঃ বয়সে আমরা তাঁদের কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু আমাদের সাংসারিক অভিজ্ঞতা তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি।

হিব্রু ঃ এ-গল্প শুনলে তাঁরাও আমার মতোই অবিশ্বাস করবেন; কিন্তু এর ফলে পীটারের অনুতাপ বহুগুণ বেড়ে যাবে। তাঁকে আমি তোমার চেয়ে বেশি দিন চিনি, কাজেই কি ঘটবে, জানি। পীটারের মনে পড়বে যে সত্যের সামনে মেয়েরাও সঙ্কুচিত হয়নি, তারা তাদের প্রভুকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছে; এ-স্বপ্ন সেই প্রেম, সেই নিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ। তিনি ভুলতে পারবেন না যে দরকারের সময়ে তাঁর নিজের মধ্যে ঠিক ওই দুটো গুণেরই অনটন পড়েছিলো, হয়তো সেইজন্যেই জনের চোখ-জোড়া ঘুরে ঘুরে কেবলই তাঁর উপরে থেমেছে। তখন মাথা ফিরিয়ে নিয়ে তিনি হাতের মধ্যে মুখ লুকোবেন।

গ্রীক ঃ আমি তো বলেইছি, প্রথমে আমাদের নিজের সন্দেহভঞ্জন আবশ্যক; কিন্তু ওঁদের কিছু না-বলার অন্য কারণও আছে। আর একজন দূত আগতপ্রায়। আমি নিশ্চয় জানি যে যীশু মনুষ্যদেহের অতীত, তিনি মনোময় পুরুষ, তাঁর ছায়া-মূর্ত্তি এই প্রাচীরের বাধায় ব্যাহত নয়; এই ঘরের মধ্যে দিয়েই তিনি শিষ্যসম্ভাষণে অগ্রসর হবেন।

সীরিয়ান ঃ না, যীশু অশরীরী নন। সমাধির মুখে আমরা একখানা প্রকাণ্ড পাথর চাপা দিয়েছিলুম; মেয়েরা বল্‌লে সে-পাথরখানাকে কে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

হিব্রু ঃ রোমানরা কালই শুনতে পেয়েছিলো যে পরাজয়ের কলঙ্ক মোছবার জন্যে আমাদের দলের কেউ কেউ মনস্থ করেছে, চৈত্য থেকে শব সরিয়ে, তারা লোকসমক্ষে খৃষ্টের পুনরুজ্জীবনবার্ত্তা রটাবে। তারাই হয়তো রাতারাতি দেহ নিয়ে পালিয়েছে।

সীরিয়ান ঃ রোমানরা দ্বারে প্রহরী বসিয়ে রেখেছিলো; কিন্তু যখন মেয়েরা গেলো, তখন তাদের সকলেই নিদ্রিত। যাতে তারা তাঁকে পাথর সরাতে না-দেখে, তাই ভগবান যীশুই তাদের ঘুম পাড়িয়েছিলেন।

গ্রীক ঃ একখানা স্নায়ুহীন, নিরস্থি হাত পাথর নাড়তে পারে না।

সীরিয়ান ঃ এ-ঘটনা যদি সমস্ত মানুষী জ্ঞানকে নিষ্প্রমাণ করে, তাহলেই বা ক্ষতি কি ?—অপর আর্গো আবার হিরণ্ময়ের সন্ধানে বেরোবে, আবার চূর্ণ হবে অপর ট্রয়ের দর্প।

গ্রীক ঃ হাসছো কেন ?

সীরিয়ান ঃ মানুষী জ্ঞান ! সে আবার কি ?

গ্রীক ঃ আর কিছু নয়, শুধু সেই অভিজ্ঞতা যার কল্যাণে এখান থেকে পারস্য পর্য্যন্ত রাজপথ আজ দস্যুমুক্ত, যার যত্নে একাধিক সুন্দর সুদক্ষিণ নগর গ'ড়ে উঠেছে, সারা আধুনিক জগৎ যার সৃষ্টি, যার মধ্যবর্ত্তিতা ব্যতীত বর্ব্বরদের সঙ্গে আমাদের আর তিলমাত্র প্রভেদ থাকবে না।

সীরিয়ান ঃ কিন্তু যদি এমন কিছু থাকে, যা তার ব্যাখ্যার বাইবে, এমন কিছু যার মূল্য অন্য সবের চেয়ে বেশি—তাহলে ?

গ্রীক ঃ তোমার কথার ভাব যেন বর্ব্বরদেরই ফিরিয়ে আনতে চায়।

সীরিয়ান ঃ যদি সকল যুগেই এমন কিছু থাকে, যাকে জ্ঞানের গণ্ডিতে, বিধি-ব্যবস্থার শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না ? ঠিক যে-মুহূর্ত্তে মনে হয় প্রজ্ঞা আর পরিমিতি চূড়ান্তে পৌঁছেছে, তখনই যদি প্রজ্ঞাপারমিতা আবির্ভূত হয়,—তাহলে ?

[পুনরায় হাস্য]

হিব্রু ঃ হাসি থামাও।

সীরিয়ান ঃ যদি অসঙ্গতি আবার ফিরেই আসে ? যদি কালচক্র একবার আত্মপ্রদক্ষিণ সেরে আবার পুনরাবৃত্তি করে—তাহলে ?

হিব্রু ঃ চুপ ! জানলা দিয়ে ক্যাল্‌ভারি দেখতে পেয়ে ও একবার হেসেছিলো, আবার এখন তুমি সুরু করলে।

গ্রীক ঃ ওরও আত্মসংযম ঘুচেছে।

হিব্রু ঃ থামো, বলছি। [ঢাক ও করতাল]

সীরিয়ান ঃ কিন্তু আমি তো হাসছি না। বাইরে যারা ভিড় জমিয়েছে, ও-হাসি তাদের।

হিব্রু ঃ না, ওরা খত্তাল বাজাচ্ছে আর ঢাক পিটছে।

সীরিয়ান ঃ আমার বোধ হচ্ছিলো ওরা হাসছে। কী ভয়ানক !

গ্রীক [দর্শকদের উপর দিয়ে বাইরে চেয়ে]ঃ ডায়োনিসাস্‌-ভক্তেরা আবার এদিকে আসছে। ওরা ওদের মৃত দেবতার মূর্ত্তি এখন লুকিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার জুড়েছে ‘জাগ্রত ভগবান! জাগ্রত ভগবান!’ [গায়কত্রয়ের ‘জাগ্রত ভগবান’ আবৃত্তিতে বিরাম] ‘জাগ্রত ভগবান’ ব’লে চেঁচাতে চেঁচাতে ওরা প্রত্যেক রাস্তা মাতিয়ে তুলবে। ওদের ইষ্টদেবতাকে ওরা ইচ্ছামতো বাঁচাতে, মারতে পারে। কিন্তু হঠাৎ সকলে চুপ করলে কেন? সবাই নিঃশব্দে নাচছে, নাচতে নাচতে আমাদের দিকে এগোচ্ছে। কৈ ও-রকম পদক্ষেপ তো এলেক্‌জাণ্ড্রিয়ায় দেখিনি, ও-চাল যেন কোন্‌ প্রাচীন কালের। ভিড় প্রায় আমাদের জানলার নিচে এসে পড়েছে।

হিব্রু ঃ ওরা আমাদের ব্যঙ্গ করতে এসেছে, ওদের দেবতা যে বৎসরে বৎসরে বেঁচে ওঠেন, আর আমাদের ভগবান মৃত, চিরদিনের মতো মৃত।

গ্রীক ঃ ওদের নাচের তাল যত দ্রুত হচ্ছে, কাজলটানা চোখগুলোও ঘুরছে সেই অনুপাতে—ঠিক যেন চরকি! ভিড় একেবারে জানলার নিচে এসে পড়েছে। কিন্তু সকলে হঠাৎ স্তম্ভিত কেন? অতগুলো নিশ্চেতন চোখ এ-বাড়ির উপরে নিবদ্ধ! এ-বাড়িখানাতে কি আশ্চর্য্য মাখানো আছে?

হিব্রু ঃ কে ঘরে ঢুকলো!

গ্রীক ঃ কোথায়?

হিব্রু ঃ জানিনা; কিন্তু মনে হলো, পায়ের শব্দ শুনলুম।

গ্রীক ঃ আমি জানতুম, ভগবান আসবেন।

হিব্রু ঃ এখানে কেউ নেই। সিঁড়ির মুখের দরজা আমি নিজে ভেজিয়ে এসেছি।

গ্রীক ঃ ওই পর্দ্দাটা যে নড়ছে।

হিব্রু ঃ মোটেই নড়েনি। তাছাড়া ওর পিছনের দেওয়ালটায় ফুটো পর্য্যন্ত নেই।

গ্রীক ঃ দেখো, দেখো!

হিব্রু ঃ হ্যাঁ, পর্দ্দা সত্যই নড়তে সুরু করেছে। [অতঃপর সভয়ে সে এক পা এক পা ক’রে মঞ্চের বাম কোণে পিছোতে থাকে]

গ্রীক ঃ ওর ভিতর দিয়ে কে একজন আসছে। [পর্দ্দার মধ্যে মুখোশপরিহিত খৃষ্টমূর্ত্তির আবির্ভাব। এগারোজনার ঘরে যাবার দ্বার যে-পর্দ্দার আড়ালে, সীরিয়ান সেটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে রঙ্গমঞ্চের বাঁ পাশে গিয়ে অন্য দুজনের সঙ্গে দাঁড়ায়। যীশুর মূর্ত্তি দক্ষিণে, মঞ্চের পশ্চাদ্‌ ভাগে]

গ্রীক ঃ এ তো ভগবানের ছায়ামূর্ত্তি। তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? তাঁর ক্রুসযন্ত্রণা, সমাধিসৎকার, সে সমস্তই মায়া; প্রভু আবার আমাদের মধ্যেই বিরাজমান। [হিব্রু নতজানু হয়ে বসে] এই দেহপরিগ্রহ আমাদেরই কপোল-কল্পনা, এতে রক্ত-মাংশের লেশমাত্র নেই। এ সত্য আমার অবিদিত নয় ব'লেই আমি আজ নির্ভয়। এই দেখো, আমি ভগবানের অঙ্গস্পর্শ করছি। প্রতিবিম্বটি হয়তো আমার হাতে ঠেকবে মর্ম্মরের মতো শক্ত—এমন ঘটনাও ঘটতে শুনেছি—হয়তো আমার হাত মরীচিকার মধ্যে দিয়ে অবাধে চলে যাবে—কিন্তু রক্ত-মাংসের নাম-গন্ধও মিলবে না। [ধীরপদে প্রতিমূর্ত্তির সামনে গিয়ে পঞ্জরে হস্তার্পণ] প্রতিভাসের প্রাণস্পন্দন! প্রতিভাসের প্রাণস্পন্দন! [গ্রীকের আর্ত্ত চিৎকার। রঙ্গমঞ্চ পেরিয়ে খৃষ্টমূর্ত্তির নেপথ্যে গমন]

সীরিয়ান ঃ ভগবান শিষ্যমণ্ডলে আসীন। তাদের অনেকেই ভীত। কিন্তু প্রভুর দৃষ্টি নিবদ্ধ পীটার, জেম্‌স্‌ আর জনের মুখে, তাঁর ওষ্ঠাধর স্মিত হাস্যে সৌম্য। প্রভুর অনাবৃত বক্ষে একটা প্রকাণ্ড ক্ষত; তার উপরে ন্যস্ত টমাসের কৌতূহলী করপুট। সে-হাতে দেবহৃদয়ের দুরুদুরু কম্পন সঞ্চারিত হয়েছে।

গ্রীক ঃ এথেন্স, এলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, রোম, আজ তোমাদের উচ্ছেদের দিন! আজকে প্রতিভাসের বক্ষে জেগেছে প্রাণস্পন্দন। মরলোকের আয়ু আজ সমাপ্ত-প্রায়। এতদিনে তোমার বাণী সার্থক হলো হেরাক্লাইটাস্‌। ভগবান আর মানুষ পরস্পরে পরস্পরের মৃত্যুতে বাঁচে, উজ্জীবনে মরে।

[গায়কত্রয় উঠে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতে করতে রঙ্গমঞ্চের উপরে যবনিকা টেনে দেয়]

[১]

ভাবনার ঘোরে ভ্রান্ত ভুবন, মানুষ দ্বিধায় দীর্ণ,
আজ অরাজক রাজপথ-মাঝে
প্রত্ন পশুর চিৎকার বাজে,
অনুকম্পায়ী ভগবান তাই গ্যালিলিতে অবতীর্ণ॥

নাক্ষত্রিক ব্যাবিলন্ আজি কল্পতিমিরে লুপ্ত,
প্রাজ্ঞ প্লেটোর ক্ষমা নিষ্ফল,
বিফল, গ্রীসের সাধনা বিফল,
পুরাণপুরুষ নিহত যীশুর শোণিতসাগরে সুপ্ত ॥

[২]

মানুষী অর্ঘ্য নিমেষে শুকায়, শতমারী তার শ্রদ্ধা,—
উধাও করে সে প্রেমেরে রভসে,
দ্রষ্টা রূপের ব্যবসায়ে বসে,
দিগ্বিজয়ের পাথেয় দিতেই হৃতবিক্রম যোদ্ধা ॥

মর্ত্তমহিমা শূন্যকক্ষ বন্দীর আতিশয্য।
তারি মানসিক, সালরসসম,
হানে মাঝে মাঝে নিরাকৃত তম ;
নিরবলম্ব ক্ষুধায় আপন হিয়াই নরের ভোজ্য ॥
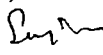
(W. B. Yeats-এর The Resurrection-নামক নাটিকার অনুবাদ)

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ আছে। তাই বলে যাঁরা বলেন, সাহিত্য সমাজের দর্পণ বিশেষ তাঁরা একচোখোমির পরিচয় দেন। একচোখোমি এইজন্যে যে সাহিত্য সমাজকে প্রতিফলিত করে ঠিক, কিন্তু সাহিত্য শুধু সমাজের প্রতিচ্ছবিই হবে—এমন বিধান সাহিত্য মেনে নেয় না। সমাজ তো নয়ই, বরং সাহিত্যে যা স্পষ্ট প্রস্ফুটিত হয় সেটা হচ্ছে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব। আধুনিক সাহিত্যে সমাজের ভাব এবং কর্ম্মধারা সঠিক প্রতিফলিত নয় বলে কেউ-কেউ এই সাহিত্যকে নিঃসার প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু যদি মনে রাখি যে, সাহিত্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একটি প্রবাহ তাহলে সমালোচকদের আপত্তিটাকে অবাস্তব বলে প্রথমেই নাকচ করে দেওয়া চলে। সাহিত্য বস্তুত ব্যক্তিমূলক ; তবে ব্যক্তি যতোখানি সমাজের মুখপাত্র সাহিত্য অবশ্যই ততোখানি সামাজিক।

অনেককে নিয়ে সমাজ। অনেকের ব্যক্তিগত বিভিন্নতাকে যথাযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করে দিয়েই তবে সমাজের ঐক্য বিহিত হয়। সেইজন্য কোনো সমাজে যেমন একটি সাধারণ সাহিত্য থাকে তেমনি তারি সঙ্গে সেই একই সমাজের মধ্যে বহু সাহিত্যিকের দ্বারা রচিত বহু বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যও পাশাপাশি তাদের স্থান অধিকার করে থাকতে পারে। এমন কোনো সাহিত্যিকের সাহিত্য অন্তত বাঙলা সাহিত্যে নেই যার মধ্যে সমগ্র সমাজ প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে কিন্তু সাহিত্যিকতায় কিছু কমতি পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাঙালী সমাজের প্রভাব যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে তাই তাঁর সাহিত্যে নিয়েছে রূপ। তিনি সমাজের যে স্তরের জীবন সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ—প্রেমেন্দ্র মিত্রের সান্নিধ্য অতি ক্ষীণ। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যদি বিত্তহীন নিঃস্ব সমাজের নিম্নস্তরের মুখপাত্র সাহিত্যিক বলি, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় বিত্তশালী জমিদার তথা সুখী স্বাচ্ছন্দ্যভোগী ভদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তেমনি আবার শরচ্চন্দ্র মধ্যবিত্ত দরিদ্র অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণত গ্রাম্য ভাবাপন্ন জীবনের

চিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ। দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার বিভেদের জন্যে এঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিও স্পষ্টত বিভিন্ন।

সাহিত্য তাই প্রধানত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের একটি উপায়। তবে আরো একটা কথা আছে। সাহিত্য-স্রষ্টা জন্ম-সম্পর্কে কোনো একটা বিশেষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে সেই সমাজের চিন্তা-স্রোত ভাব-স্রোত ও প্রাণ-স্রোতের সঙ্গে সংস্পর্শও তাঁর অবশ্যম্ভাবী। অথচ এই সংস্পর্শের দ্বারা অভিভূত হলে তাঁর সাহিত্যিকতার সমাধি ঘটবে। যে সাহিত্যিক নিজের সামাজিক পরিপার্শ্ব ও ঘটনা-বিবর্ত্ত দ্বারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ তার দুর্ভাগ্য এই যে সঙ্কীর্ণ পরিধির মানবতা ও জীবন-লীলার স্বল্পসংঘাত ব্যতিরেকে বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে আর তার কোনো যোগ রইলো না। এমনি ধারা আবদ্ধ আবেষ্টনের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দেশে দেশে বিভিন্ন সমাজে নানা লোক-সাহিত্য (folk literature) গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন গ্রাম, জনপদ, বিভিন্ন সমাজ বা বিভিন্ন দেশের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঐ সকল সাহিত্য সুচিহ্নিত।

সাহিত্যের দুটো দিক—এক বস্তু, অপর ভাব বা রস। বস্তুর দিক থেকে অথবা কথা-বিবৃতির দিক থেকে লোক-সাহিত্যের রচনা অত্যন্ত স্বল্প পরিসর এবং পদ্ধতিতে অসামান্যতার অভাবে স্পষ্টত নিঃস্ব। কিন্তু রসের দিকে লোক-সাহিত্যে এমনি ভাব-পরিকল্পনা রয়েছে যাতে করে কালের বা দেশের বা জাতির একমুখিতা বা ক্ষুদ্রতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত রূপে প্রতিভাত হয়। সার্ব্বভৌমিক ভাবে ভাবুক সাহিত্যিক হয়ত তাঁর গানে বা ছড়ায়, আখ্যায়িকায় বা "বুরঞ্জী"তে যে কোনো দূর বা নিকট, পুরাতন বা নূতন দেশের অথবা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে কোনো জাতির লোকের যে-কোনো উন্নত, সংস্কৃত হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারেন। নৃতত্ত্বের লোক-সাহিত্য সমালোচনা বিভাগে এমনি প্রাচীন রোম গ্রীস ঈজিপ্ট ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা দেশের নানা কালের সাহিত্য-গবেষণা দ্বারা কতকগুলি সাহিত্য-সাধারণ নিয়ম বার করার চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়। এর থেকে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় যে সামাজিক সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও সাহিত্যে একটি লোকায়ত মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় যা অতীতকে বর্ত্তমানের সঙ্গে এবং দেশকে বিদেশের সঙ্গে শুভদৃষ্টিতে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়। এই মনের এমনি ধর্ম্ম যে, এ ষ্ট্র্যাট-ফর্ড-অন-এভন নিবাসী শেক্সপীয়রের সঙ্গে তপোবন-নায়িকা শকুন্তলার শিল্পী

কালিদাসকে সমপঙ্‌ক্তিভুক্ত করে হোমারকে বাল্মিকীর দোসর বলে প্রতিপন্ন করে। অথচ এই বৃহৎ মনের ক্ষেত্রে সমুন্নত হবার আগে পর্য্যন্ত ব্যক্তির মন যে আত্ম-প্রকৃতি অনুসারে প্রগতিশীল হয় সে বিষয়ে কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

আবার সাহিত্যে রস অগ্রগণ্য হলেও বস্তু নেহাৎ নগণ্য নয়। এই বস্তুর ব্যাপারে আধুনিক সাহিত্যে একটা চমৎকার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এসেছে। তার হেতু হচ্ছে—বর্ত্তমান কাল আন্তর্জ্জাতিক সাম্যের কাল। সমাজের স্থলে জাতি, জাতির স্থলে নেশন এবং নেশনের স্থলে বিশ্ব—এমনি ক্ষুদ্র থেকে মহতে, অল্প থেকে বিরাটে ক্রম-বিস্তৃয়মাণ মানবতাকে নিয়ে আধুনিক সভ্যতা সৃষ্ট হয়ে চলেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক শিল্প বিশ্বে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিধাতা; যা-কিছু সেই ঐক্যের পর্য্যায়-ভুক্ত নয়, তাকেই আমরা বাহুল্য বলে বিবেচনা করতে আরম্ভ করেছি। এই আন্তর্জ্জাতিক মানসিকতা বর্ত্তমান শতাব্দীর সাহিত্যকে নিত্য নব সম্ভাবনায় ভরপূর করে রেখেছে। যারা দোষারোপ করে বলেন যে, আধুনিক কথা-সাহিত্য এমন কি পদ্য-সাহিত্যও য়ুরোপীয় প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আপনার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে যাচ্ছে, তারা দেখেন না যে, বাঙালী সাহিত্যিক তার সরস্বতীর মন্দিরের সিংহদ্বার জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিচারে যাবতীয় সাহিত্য-তীর্থকামী আগন্তুকদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে। আজ বেশ কিছুদিন হলো সেই দ্বারপথে ইংরেজ ফরাসী রুষ জার্ম্মান নরোজীয় প্রভৃতি য়ুরোপীয় এবং আমেরিক্‌ বহু সারস্বত সমাজের নায়ক-নায়িকাগণ এসে মন্দিরের বেদীতলে ভিড় করে বসেছেন; তাঁদের সম্মিলিত অর্চ্চনার সঙ্গে সমচ্ছন্দে বাঙালী তরুণ সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের বন্দনা পাঠ করবেন। এর জন্যে বঙ্গ সরস্বতীর মন্দির থেকে যদি সাহিত্যিক অস্পৃশ্য-তাকে চিরতরে দূর করে দিতে হয় তাতে দেবীর পদ-গৌরবের প্রসারই হবে, গ্লানির কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে না। সাহিত্যকে শুধু একটিমাত্র সমাজের সঙ্কীর্ণতা থেকে শনৈঃ শনৈঃ মুক্তিদান করে বস্তু ও রসের সুবিশালতার মধ্যে আন্ত-র্জ্জাতিক বৈচিত্র্য-সম্ভারের অধিকারী করে তোলা তরুণ সাহিত্যিকের স্বপ্ন। বাঙলা সাহিত্যের উৎকর্ষের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সামাজিকতাকে ক্রমশ অতি-ক্রম করে যাওয়ার প্রয়াস। প্রাদেশিক ভাষায় অপ্রাদেশিক সাহিত্য-রচনা আধুনিক-বৈশিষ্ট্য। এই অপ্রাদেশিকতার চেতনা বস্তুত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবের সংঘাতজনিত নব উদ্বোধনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ।

তাছাড়া আধুনিক সাহিত্য সমাজকে বিশুদ্ধ করতেও চেষ্টা করে। সমাজের রীতি নীতি পদ্ধতিকে লিপিবদ্ধ করেই নিঃশেষিত হয় না। ফরাসী বিপ্লবের গোড়ায় ভলটেয়ার প্রভৃতি সাহিত্য-রথিগণের তদানীন্তন সমাজের কঠিন সমালোচনা কিরূপ কার্য্যকরী হয়েছিলো তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। আধুনিক যুগে বার্ণার্ড শ এই হিসেবে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে যেমন ঔপন্যাসিক শরচ্চন্দ্র। এঁদের কাছে সাহিত্য সমাজের নিয়ামক, সমাজের প্রতিচিত্র মাত্র নয়। আবার যাঁরা বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাকেই সাহিত্যের আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন, এমন দু' একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত নিলেও (যেমন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি বা রবীন্দ্রনাথ) এই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে, যা আছে তারই বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ও সমর্থন সাহিত্যস্রষ্টার উদ্দেশ্য আদৌ নয়। তিনি চান, যা নেই বা যা থাকা উচিত এমন সম্ভাব্য সৌন্দর্য্যের বাস্তব প্রতিষ্ঠা। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান সমাজ সাহিত্যিকের বিষয়বস্তু নয়। বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিভূমির 'পরে আদর্শ যে সমাজ সৌন্দর্য্যের দাবীতে সুসঙ্গত তাই সাহিত্যের পরিশীলনের সামগ্রী। সাহিত্যিক তাই পুরোপুরি সমাজ-সংস্কারক নন—সুসংস্কৃত সুসমঞ্জস সুন্দর সমাজের তিনি পরিকল্পয়িতা।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের একটা মিল আছে—এরা দুটিই প্রবাহিণী নদীর মতো নিত্যচঞ্চল ও বেগবান। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ভূলোকে কেউ বেঁচে নেই কিন্তু সমাজ বেঁচে চলেছে। স্রোতোবাহিত জলকণা পুনরাগত হয় না, কিন্তু নদী বয়ে চলে—তার বাঁকে বাঁকে উপকূলে কতো নতুন আবাসিকদের ভিটা তৈরী হচ্ছে আবার উঠে যাচ্ছে, তার ঠিক নেই। তেমনি কতো যে অসংখ্য রসবেত্তা রচয়িতার রচনার বিন্দু বিন্দু সংমিশ্রণে বিপুলায়তনী সাহিত্য-স্রোতস্বতীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তারও কিছু ঠিক নেই। সাহিত্যে যাকে বলি সাময়িক—সার্ব্বকালিক সাহিত্যের গতিবেগ নিয়মনে তারও অবদান সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে নিতে হয়—যদিও সময়ের ছায়া সর্ব্বকালের আলোকের পাশে নিতান্ত সামান্য, নিতান্ত তুচ্ছ।

সাময়িক সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সাংবাদিকতা। সাংবাদিক সমাজেতিহাস হেন সুবৃহৎ যাদুঘরের দ্বার-রক্ষক। তার প্রসাদে সমাজের রকমারি ধরণ-ধারণের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে। সমাজের যে-সব নায়ক-

নায়িকায়া গ্রামে দলাদলি ও সহরে পলিটিক্সের চর্চ্চা দ্বারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন, সাংবাদিকের মধ্যবর্ত্তিতায় সাময়িক সাহিত্যে তাঁদের স্থান অন্তত উপস্থিত কালের জন্যে একটুখানি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাকে। সাংবাদিক সাহিত্যের মুখ্য গুণ বৈচিত্র্য। এই নিত্যনৈমিত্তিক বৈচিত্র্য গ্রামিক ও নাগরিকগণের দৈনন্দিন রুচির পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে বলে এর প্রয়োজন খাদ্যের মধ্যে ডাল-ভাতের মতন অপরিবর্জ্জনীয়। আবার, তুতান্‌খামেনের গোরস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য লাভ বা মহেঞ্জোদাড়োতে আর্য্য-পূর্ব্ব পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার আবিষ্কার অথবা ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রমগ্ন মহাদেশের অস্তিত্ব-সন্ধান ইত্যাদি অনেকানেক রহস্যময় খবর জন-সাধারণের কাছে খাদ্য-তালিকায় ডাল-ভাতের স্থলে রুটি-মাখন ও মধুর মতন অসাধারণ ও রসাল। তবু সংবাদ-সাহিত্য প্রাত্যহিক খাদ্যের অন্তর্গত।

এমন একটি সাহিত্যের বিভাগ আছে, যা প্রাত্যহিকও বটে আবার চিরন্তনও বটে;—ইতিহাস পুরাণের কথা বল্‌ছি। সংবাদ-সাহিত্যের মধ্যে ইতিহাস-পুরাণও নিশ্চিত ধর্ত্তব্য। খণ্ড খণ্ড সমাজের পূর্ণ বা অর্দ্ধ-সমাপ্ত অনুবৃত্তি হয়েও ইতিহাস পুরাণ মানব-মনের ওপর এমনি প্রভাব বিস্তার করে যে, অতীত ও লুপ্ত নানা সমাজ-কাহিনী আমাদের কাছে নিত্য সুখ-পাঠ্য ও অনুকরণীয় নানা কীর্ত্তি-কলাপের চিত্র-শালারূপে নিত্য আদরণীয়। সুতরাং ইতিহাস ও পুরাণ সংবাদ-সাহিত্যের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত হয়েও সার্ব্বকালিক প্রভাব বিস্তারের পক্ষে চমৎকার উপকরণ বিশেষ।

২

সাহিত্যের মধ্যে সময়ের ছাপ না থেকেই পারে না; কিন্তু সাময়িকতাই যে-সাহিত্যের শাঁস, সার্ব্বকালিক সাহিত্যের মাপকাঠিতে তাই অকেজো ছোবড়ারূপে পরিগণিত। এই কারণে সমাজ-সংস্কারক সাহিত্যিক অথবা সমাজের প্রতিচ্ছবি-চিত্রী সাহিত্যিক নিজের প্রতিভাকে বর্ত্তমানের সংক্ষিপ্ত সীমায় প্রক্ষেপ করে চিরন্তনের স্তরে সমুন্নত হবার পক্ষে নিজেই বাঁধা জন্মান। যিনি শুধু বর্ত্তমানকে সাম্‌নে না রেখে সমগ্র মানবতার উদ্দেশে সাহিত্য-সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত, বিশ্ব-সভায় তাঁরই স্থান। রাস্যায় গগল্‌ টলষ্টয় ডষ্টয়েভ্‌স্কী এবং গর্কী রুস চরিত্রকে কথা-সাহিত্যের মধ্যে সমগ্র য়ুরোপে যেমনটি সুজানিত করে তুল্‌তে পারেন নি—প্যারিসে এসে তুর্গেনিভ য়ুরোপের নাড়ির গতি যথাযথ অনুভব করে নিয়ে এমনিতরো রচনা সুরু

করলেন যে, রুস-চরিত্রের অভিনবত্ব য়ুরোপীয় পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে দুর্ব্বোধ্য কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে আর রইলো না। যে-ই তুর্গেনিভ্ পড়লে সে-ই দেখলে যে রুসের নরনারী তারই মতন মানুষ। তুর্গেনিভের লেখায় রুস-জীবন নেহাৎ ফটোতোলা ছবি গোছের সঠিক হয়ে না-ই বা উঠল ; কিন্তু লেখনীর আঁচড়ে বিবরণের একটু অদলবদলের ফলে এমন সুন্দর ও রসাল লেখা পড়ে রাসিয়ানই হোক অথবা যে-কেউ য়ুরোপীয়ান হোক্, সমজদার মাত্রেই মাথা দুলিয়ে স্বীকার করলে, হেঁ, লেখা বটে! অতঃপর ভারতবর্ষেও তাঁর আদর বাড়ছে। সবরকম উগ্র গ্রাম্যতা, সামাজিকতা, প্রাদেশিকতা বা সাময়িকতার বন্ধন থেকে যিনি মুক্ত সেই সাহিত্যিকই সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনীন রস-পরিকল্পনায় পটু।

আধুনিক বাঙলা কথা-সাহিত্যে নাকি বিশ্ব-সাহিত্যের ওস্তাদিপনা তাল ঠুকে চলেছে। শুধু ঢং বজায় রাখার জন্যে ঝুলি কাঁধে করে বেড়ালেই সাধু হওয়া যায় না। সাহিত্যের প্রাণ কোনো বাঁধা ভড়ং-এর মধ্যে নেই। সাহিত্য উৎসারিত হয় ব্যক্তির কল্পনা ও প্রজ্ঞা-মূলক অভিজ্ঞতা থেকে। অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো চোখ ঠারাঠুরি নেই, মিথ্যাবাদিতা নেই, অনুকরণ নেই! এই অভিজ্ঞতাকে প্রাণবন্ত করে গদ্যে ও পদ্যে প্রকাশ করার চাতুর্য্যের মধ্যে সাহিত্য-কলার অস্তিত্ব। বার্ণার্ড্ শ বলেছেন, "All art is gratuitous ; and the will to produce it, like the will to live, must be held to justify itself"। রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ্' যে ফ্রান্সে একজন লোকবরেণ্য সঙ্গীত-স্রষ্টারূপে বিখ্যাত হলেন তার কারণ এই নয় যে, রাগ-রাগিণী তৈরী করে তিনি তাঁর জীবিকার্জ্জনের পথ অবশেষে সুচারুরূপে পরিষ্কার করে তুলেছিলেন। অর্থ বা যশ তাঁর সৃষ্টির কাছে ছিলো অতি স্থূল। ছান্দসিক মনের ঝোঁক তাঁকে রাগ-রাগিণীর সৃষ্টিতে অবলীলাক্রমে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেছে। এই স্বাভাবিক ও আন্তরিক প্রবৃত্তিই সাহিত্য রচনার উৎস। এই প্রবৃত্তি না থাকা সত্ত্বেও যাঁরা অর্থ বা খ্যাতির জন্যে সাহিত্যের মন্দিরে দোকান খোলেন তাঁদের পসরার চাকচিক্যে ক্রেতাদের ভিড়ের অবশ্যি কিছু ঘাটতি হয় না। কিন্তু এই চটকদার মালের মনোরঞ্জনী শক্তি অতি ক্ষণস্থায়ী। অবসর-ভোগী ক্রেতাগণ যারা ঈদৃশ সাহিত্য নিয়ে শুধু অবসর বিনোদন করে কাল কাটায় তাদের কাছে সাহিত্যের মূল্য কতোটুকু, এর থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। এমন একদল পাঠক-মণ্ডলী সব সময়েই সমাজে থাকেন যাঁদের

কাছে সর্ব্ববিধ উত্তেজনা-মূলক সাহিত্যই অতি উপাদেয়। অবশ্য জীবন যাপনে উত্তেজনারও প্রয়োজন আছে এবং এমন কি আনন্দ-বোধের মধ্যেও উত্তেজনার স্থিতি মেনে নিতে হয়। কিন্তু তাহলেও উত্তেজনা এক, আনন্দ আর; এবং আনন্দই সাহিত্যের সার বস্তু, উত্তেজনা নয়। ফরাসী বিপ্লবের কালে যখন ফ্রান্সে রোবস্পীয়র্‌কে সভা করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রেজল্যুশন্‌ পাশ করতে হয়েছিলো, সেই সময়ে ফ্রান্সে একদল সাহিত্যিকের উত্তেজনা ও কুরুচি-মূলক সাহিত্য কেমন কচুরিপাতার মতো ইতস্তত: ভুরভুর করে গজিয়েছিলো ঐতিহাসিকের কাছে তা অবিদিত নয়। কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে? আজ কেউ সেই সাহিত্যিকদের খোঁজ করে না, তাদের গোরস্থান থেকে তাদের প্রেতাত্মাকে মানব-জগতে টেনে তুল্‌বার কোনো চেষ্টাই করে না। যে-সাহিত্য বাগানে ব্যাঙের ছাতার মতো আলো-বাতাসহীন কদর্য্য ক্লিন্ন পরিবেষ্টনে ভুঁইফোড় হয়ে মাথা উঁচু করে ওঠে, ব্যাঙের ছাতার মতোই তা একদিন মালীর হাতে সমূলে উৎপাটিত হয়ে মর্‌বে।

সমাজের একদল পাঠক-গোষ্ঠীর বিনোদনের জন্যে মুখ্যত যাঁরা মুখরোচক সাহিত্য রচনা করেন তাঁরা বিস্মৃত হন যে, সাহিত্য মূলত অসামাজিক। কারণ, ব্যক্তিগত প্রতিভার মূলে সাহিত্য, যিনি সাহিত্যিক তিনি একটি ব্যক্তি মাত্র। সমাজের সকলেই সাহিত্যিক নন, সাহিত্য-রসিকও নন। নির্জ্জন অবসরে কল্পনা ও বুদ্ধির পরিমণ্ডলে সাহিত্যের জন্ম। তবে কিনা একবার ভূমিষ্ঠ হলে শঙ্খ-ঘণ্টা চাই-কি তুরী-ভেরী বাজিয়ে তাকে কোনো-না-কোনো সময় বরণ না করলে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই বরণের মাঙ্গলিক সুসম্পন্ন হবার পক্ষে নিশ্চয়ই আবশ্যক একটি সাহিত্যের আসর; কিন্তু সুশিক্ষিত পরিমার্জ্জিত সমাজ নিয়েই এই আসর চিরকাল রচিত হয়ে এসেছে; এবং এতাদৃশ সমাজের শিক্ষা ও আদর্শের অপেক্ষা করা সু-সাহিত্যের ধর্ম্ম। দুর্য্যোগাচ্ছন্ন ভ্রষ্ট সমাজে সাহিত্যিক বড়োই নিঃসঙ্গ। একা একা বা নিতান্ত ক্ষুদ্র দলের মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে তিনি যে সৃষ্টি করেন, হয়তো বা শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবুও তাঁর নির্জ্জন চিন্তা জন-সমাজে আদৃত ও অঙ্গীকৃত হবার পক্ষে বহু বিঘ্ন থেকেই যায়। সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের মৃত্যুর পরবর্ত্তী বৎসরগুলির সঙ্গে তাঁদের সমাদর সমাজে বেড়ে চলেছে।

সাময়িক সাহিত্যের আরো একটি প্রকার রয়েছে—pamphleteering, ছোটো

ছোটো বইএর ভেতর দিয়ে প্রচার। যে কোনো সমিতি, সম্মিলন, পরিষৎ বা ব্যক্তি বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা দ্বারা কার্য্য-মূলক বা আদর্শ-মূলক ভাবের প্রচার করতে সমর্থ। অনেক বৈজ্ঞানিক নবাবিষ্কারও এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জন-সমাজে প্রথম প্রচারিত হয়েছে।

সার্ব্বকালিক সাহিত্যের মধ্যে হয়তো সর্ব্বাগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি—যে-সব রচনার সহায়ে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী পরস্পরের মধ্যে তত্ত্বের আদান-প্রদান দ্বারা বিজ্ঞানকে ক্রমসমৃদ্ধতর করে তোলেন। একদা যেদিন বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি তেমন সম্পূর্ণতা লাভ করেনি, তখনকার একটি ধারণা আজো কিছু কিছু আমাদের মনে গ্রথিত হয়ে আছে, যে, বিজ্ঞান যতোখানি সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রগতি সাধন করতে পারে না, সাধারণ সাহিত্য ততোখানি করতে সক্ষম। এ প্রশ্ন তার্কিকদের বিচারের জন্যে মুল্‌তুবি থাক। আমাদের এইটুকু জানলেই যথেষ্ট যে, বিজ্ঞান আমাদের বাহ্যিক পরিবেশকে পরিবর্ত্তিত ও আকারিত করতে যত্নশীল বেশী, আমাদের মানস জগতে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য বিধান করতে যত্নশীল কম ; অপরপক্ষে সাহিত্য মানুষের মনকে ভাবে ও রসে সিঞ্চিত করে সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্যের আদর্শে মণ্ডন করতে সচেষ্ট ; এই আভ্যন্তরীণ মণ্ডনের দ্বারা বাহ্যত ও কার্য্যত কতোখানি পরিবর্ত্তন হবে না হবে সাহিত্যের পক্ষে তা গৌণ। কিন্তু এও ঠিক যে, বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির সাম্য ও সজ্জা রচনা দ্বারা সাহিত্যের মনোপ্রকৃতির রূপ-প্রসাধনে সহায়তা করে ; সাহিত্যও তদ্রূপ অন্তর্লোক থেকে বিজ্ঞানের বহির্লোকে আপনার সৌন্দর্য্য-বোধকে রূপায়িত করতে বিজ্ঞানকে পরোক্ষে সাহায্য করে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই বন্ধুত্ব আধুনিকতার একটি স্পষ্ট অভিজ্ঞান। তাই অধুনাতন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহিত্যিক ও দার্শনিক হওয়া যেমন খুবই স্বাভাবিক, সাহিত্যিকের দিক থেকেও বৈজ্ঞানিকের ভাব ভাষা ও ভঙ্গীকে রচনা-ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর পুষ্পিত ও ফলিত করে তোলাও নিতান্ত সমীচীন। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকের মধ্যে যেমন আইনষ্টাইন্, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যেমন "Space Time Deity"র লেখক অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার, তেমনি সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে এইচ-জি-ওয়েল্‌সের নাম করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টির অভাবের কারণ বোধ করি সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের প্রতি ঔদাস্য। "নিরবধি-কাল ও বিপুলা পৃথ্বী"র জন্যে যে সাহিত্য সঙ্কল্পিত, বিজ্ঞানের বায়ুমণ্ডলেও তাকে

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচতে হবে। বাণিজ্য কৃষি শিল্প প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাজ-জীবনে যতো বিস্তৃত ভাবে প্রকর্ষ লাভ করবে সাহিত্যও তদনুযায়ী বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ না হয়ে পারবে না।

ম্যাথু আর্ণল্ড বলেছেন, যে আর্টে "grand style" (মহান ভাব ও ভঙ্গী) আছে তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং উদাহরণ স্বরূপ এমন কয়েকটি রচনার উল্লেখ করেছেন যার থেকে বোঝা যায় যে, যাকে সার্ব্বকালিক সাহিত্য বল্‌ছি তা ঐ 'style'এর হওয়া উচিত। আরিস্ততলও আর্ট সম্বন্ধে গবেষণা করে "higher truth" এবং "higher seriousness" এর কথা বলেছেন। মর্লিও এই উপলক্ষে "final and superlative impression"এর অবতারণা করেছেন। একথা সত্য যে সভ্যতার মধ্যযুগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে কোনো না কোনো ঐশ্বর্য্যকে চরম করে তোলা অনেকটা প্রথা হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কালেও বিষয়-বস্তুর অসামান্যতা আদর্শ সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ জিনিষের জন্যে সাহিত্যে প্রচুর স্থান ছিলো না। অধুনা কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিষয়বস্তুর সামান্যতা বা অসামান্যতার ওপর সাহিত্যের শালীনতা রক্ষার কোনো চেষ্টা দেখা যায় না। বরঞ্চ এককালে যদি বা সাহিত্য উচ্চবর্ণীয় ধনীর শিক্ষাভিমানের সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হতে পারত, তবু আজ জন-মনের শিক্ষা ও ক্রম-বিকাশের ফলে সাহিত্য সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর একচেটে উপভোগ্য সম্পত্তি নয়। অধিকন্তু সেদিন আর এখন নেই যে, পদ্যচ্ছন্দী না হলে নাটক লেখার উপায় থাকবে না, কাব্য রচনা করতে হলে মহাকাব্য বা তেমন কিছু একটা বিরাট রচনা করতে হবে অথবা যতোখানি সম্ভব রাজা-রাজড়া বা গন্ধর্ব্বকিন্নর দেবতাকে রচনার কেন্দ্রে না হোক প্রান্তদেশে যোগ্য স্থান দিতেই হবে। সমাজে সাম্য ও সমন্বয়ের ভাব প্রসারের ফলে বাঙলা তথা অন্য দেশীয় সাহিত্যে ক্রমেই এই ভাবটি অঙ্গীকৃত হচ্ছে, যে কোনো বিশেষ একটি নীতি বা বিশেষ একটি রুচি প্রতিষ্ঠা করায় সাহিত্যের উচ্চাবচ মোটেই নির্ভর করে নেই। মন ও প্রকৃতির সঙ্গমে যে অভিজ্ঞা ভাষার আবরণে মানুষকে মানুষের সঙ্গে এমন কি মানুষেতর প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত করে তাই সাহিত্য। টলষ্টয় বলেছেন "Art is one of the means of intercourse between man and man"। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাব বিনিময়ের ভাষা

ও ভঙ্গী সব সময়েই যে 'grand', 'high', 'serious' বা 'superlative' হবে তার কোনো মানে নেই, তা 'single', 'popular', 'light' বা 'ordinary' হলেই বা দোষ কী—যদি তাতে আন্তরিকতা, সরসতা, সৌন্দর্য্য ও উদ্দীপনার অভাব না থাকে। আর্টের এই যথাযথ রূপটির বিষয়ে রোমাঁ রোলাঁ অতি সুন্দর করে বলেছেন ঃ

"The highest art, the only art which is worthy of the name, is above all temporary laws ; it is a comet sweeping through the infinite. It may be that its force is useful, it may be that it is apparently useless and dangerous in the existing order of the workaday world : but it is force, it is movement and fire : it is the lightning darted from heaven : and for that very reason it is beneficent. The good it does may be of the practical order : but its real, its Divine benefits are, like faith of the supernatural order. It is like the sun whence it is sprung. The sun is neither moral nor immoral. It is that which Is. It lightens the darkness of space. And so does art. (John Christopher. Vol. IV. P. 365.)

বাঙলা ভাষার বাঙলা অক্ষর বদলে ফেলে তার জায়গায় রোমান অক্ষর প্রবর্ত্তন করার কথা উঠেছে। এতে বাঙালী সমাজের বাইরেও যে বাঙলা সার্ব্বভৌম সাহিত্যরূপে পরিগণিত হবার পক্ষে প্রভূত অবকাশ পাবে তা ঠিক।

শ্রীসুশীলকুমার দেব

কবিতাগুচ্ছ

আমি

আমারি চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্ব'লে উঠল আলো
পূবে পশ্চিমে।

গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,
সুন্দর হোলো সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়,—
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।

মানুষের অহঙ্কারপটেই বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি।

ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করছেন সীমার সাধনা
মানুষের সীমায়
তাকেই বলে "আমি"।

সেই আমির গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সঙ্গম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
না কখন ফুটে উঠে' হোলো হাঁ, মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।

এ'কে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।

পণ্ডিত বলছেন
প্রাচীন চন্দ্র মৃত্যুদূতের মতো আসছে ঘেঁষে ঘেঁষে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।

একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্ব্বতে;
মর্ত্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,

গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ;
মানুষের কীর্ত্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।

মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস।

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায়-যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা র'বেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই
"তুমি সুন্দর",
"আমি ভালোবাসি"।

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে;
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন,
"কথা কও, কথা কও,"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর,"
বলবেন, "বলো, আমি ভালোবাসি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকী

পরাধীন দেশ উদারনীতির শ্রীক্ষেত্র; এবং তীর্থের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ যেহেতু সনাতন, তাই মনস্তত্ত্ব এই সহজ ধর্ম্মের কদর্থ ক'রে বলে যে নির্জ্জিত মানুষের মুক্তিমন্ত্র অবদমিত আত্মম্ভরিতার নামান্তর, তার মূলে নিষ্কাম আদর্শের প্রেরণা নেই। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ, সাধারণ্যে আস্থাবান্। কাজেই আমার কাছে মনোবিকলনের সিদ্ধান্ত প্রায়ই অবিশ্বাস্য ঠেকে, সন্দেহ হয় বৈজ্ঞানিক আভিজাত্যের অভাবেই হয়তো এই অকুলীন বিদ্যা কালাপাহাড়ের পদাঙ্কে চলেছে। কিন্তু আত্মপ্রসাদকে সব সময়ে কিছু প্রতর্কের আড়ালে আগলে রাখা যায় না; এবং সংশয়ের বেড়া একবার ডিঙলে সমর্থন একেবারে অসীমে পৌঁছয়। ফলত যখন কয়েক বছর আগে আমাদের প্রগতিবিলাসী বুদ্ধিজীবীদের মুখে অস্‌ভাল্ড্‌ স্পেংলার-এর গুণকীর্ত্তন শুনি, তখন য়ুং-কথিত সামবায়িক অচৈতন্যে আমার শ্রদ্ধা বাড়েনি বটে, কিন্তু দুধের অনটন ঘোলেও না-মিটলে জাতিরাও যে ব্যক্তির মতোই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙে, সে-সম্বন্ধে দ্বিধা ঘুচেছিলো। অবশ্য সেদিন আজ অতীত; সাম্প্রতিক রাষ্ট্রনেতারা আর উদাসীন রাজপুরুষদের সামনে অস্ত-দেশের অমোঘ অধঃপতনের বিভীষিকা আঁকতে ব্যস্ত নন, মার্ক্‌স্‌-সংহিতার পাঠোদ্ধারে শাসকসম্প্রদায়ের কাণ্ডজ্ঞান হরণেই এখন তাঁরা বদ্ধপরিকর। তা-হলেও এই রুচি-পরিবর্ত্তনে আমার মন কোনো সান্ত্বনা পায় না, বরং প্রমাদ গণে; কেননা ভারতভূমিতে জন্মালেও আমি স্বভাবতই স্বতোবিরোধী ব্রহ্মসাযুজ্যে বঞ্চিত; এবং আর পাঁচ জনের মতো আমার পক্ষেও যদিচ অসঙ্গতির অস্বীকার অসাধ্য, তবু হাওয়াবদল যে হেতুবাদের সপত্নী নয়, তা আমি জানি। সেইজন্যেই অন্তত এ-ক্ষেত্রে আর না-মেনে উপায় থাকে না যে মার্ক্‌স্‌ বা স্পেংলার-এর মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে ভারতবাসী নিরাগ্রহ, তাঁদের কথামৃতে আমরা কেবল এই আশ্বাসই খুঁজি যে আমরা তো গেছিই, আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তারাও আর বেশি দিন নেই। অর্থাৎ পশ্চিমের উপক্ষয় আর প্রোলেটেরিয়েট্-এর অভ্যুদয়, এই উপনিপাত-দুটোর

সাহায্যে আমাদের উপস্থিত অক্ষমতার জ্বালা জুড়য় ব'লেই ভারতীয় চরমপন্থায় মার্ক্‌স্‌-স্পেংলার-এর একত্র সমাবেশ শোভন ও সম্ভব।

তাহলেও উল্লিখিত মন্তব্যে স্পেংলারী বিসংবাদের সাক্ষ্য খোঁজা ভুল; এবং প্রাচ্য জাতিসমূহের দৈন্যগ্রন্থিই উক্ত মনীষিদ্বয়ের একমাত্র যোগসূত্র নয়, এখানকার রাজনৈতিক দুর্গতির অন্য প্রতিকার থাকলেও আপাতত তাঁদের সমপাংক্তেয় লাগতো। কারণ কেবল অদৃষ্টবাদ আর আত্মবিশ্বাসের আতিশয্যেই তাঁরা হরিহরাত্মা নন, আশু ভবিষ্যতের সমাজ সম্বন্ধেও উভয়ের পরিকল্পনা ভয়াবহ রকমের এক। সে-সমাজ পিপীলিকাধর্ম্মী, তাতে ব্যক্তিবৈচিত্র্যের অবকাশ নেই, স্তরভেদের সুযোগ নেই, ভৌগোলিক পরিস্থিতি তার ভাগ্যবিধাতা, পরিণামী যন্ত্রশিল্পের নিষ্ঠুর নিয়মে তার গতিবিধি চিরকালের মতো নির্দ্দিষ্ট। পক্ষান্তরে এ-দুর্দ্দশা শুধু জনসাধারণেরই ভোগ্য নয়, যে-স্বেচ্ছাচারী লোকনায়ক এই ক্রীতদাসী সাম্যের অধিষ্ঠাতা, সেও যদৃচ্ছার বাহন, ঘটনাচক্রের ফল। সেইজন্যেই এই স্বৈরী যুগাবতারেরা জগৎ জুড়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবে, লুট-তরাজে নাগরিক সভ্যতাকে উৎসন্নে পাঠাবে, মানুষকে অনিকাম পশু-পক্ষীর মতো মাটির অধিকারে ফিরিয়ে আনবে; কিন্তু কারো চেষ্টাতেই বিধ্বস্ত সমাজে প্রাগৈতিহাসিক শান্তি-শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। কারণ মানুষী সঙ্কল্প মায়া-মরীচিকার চেয়েও অসার: কারুকলা তো দূরের কথা, অন্বীক্ষার মতো নিরপেক্ষ শাস্ত্রও কালধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি; এবং তথাকথিত নির্ব্বাচনশক্তির ব্যবহারে আমরা আমাদের অবস্থান্তর ঠেকাতে পারি না, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ববিধানের পথই পরিষ্কার করি। সংক্ষেপে বলতে গেলে মার্ক্‌স্‌ আর স্পেংলার, দুজনেই, জড়বাদী ও প্রজ্ঞাবিমুখ; এবং জন্মসময়ের পার্থক্যবশত প্রথম প্রবক্তার হেতুপ্রত্যয় যদিও শেষোক্তের জ্যোতিষে 'এন্ট্রোপি'-র আকার ধরেছে, তবু স্থানে অস্থানে বিজ্ঞান-শব্দের অপপ্রয়োগে উভয়ের মহামূল্য রচনাবলীই দুষ্পাচ্য ও দুষ্পাঠ্য।

কিন্তু তাঁদের সৌসাদৃশ্য ওই পর্য্যন্তই; এবং য়িহুদি বংশে জন্মেও মার্ক্‌স্‌ শুভবাদী, আর নিজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্পেংলারী দূরদৃষ্টিতে হিব্রুসুলভ নৈরাশ্যই সুপ্রকট। কিন্তু এজন্যে বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত; কারণ অনেকের মতে সংঘর্ষমাত্রেই ঐক্যসূচক, এবং নর্ডিক জার্ম্মানী যেহেতু সেমিটিক পরশ্রীকাতরতারই উত্তরাধিকারী, তাই সে-বৃত জাতি তার অসহ্য। উপরন্তু স্বকীয়তা আর স্বতঃসঙ্গতি

কখনো একাধারে ধরা দেয়নি; এবং আর্য্য দার্শনিক স্পেংলার আজীবন আপন পথে চললেও, গন্তব্যে পৌঁছে আর একজন য়িহুদী ভাবুকেরই কুসঙ্গে পড়েছেন। সে-ব্যক্তি ফ্রয়েড্ এবং তাঁর অতিজটিল মনস্তত্ত্ব যে-মৌল মুমূর্ষার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই প্রাথমিক জাড্য, সেই আদিম ইনর্শিয়াই বোধহয় স্পেংলারী তত্ত্বজিজ্ঞাসারও ভিত্তি। সম্ভবত সেইজন্যেই অচির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ও মার্কস্-এর মধ্যে খুব বেশি মতদ্বৈত না-থাকলেও, শেষ অবধি তাঁরা একেবারে বিপরীত; এবং আগামী খণ্ড প্রলয়ের উপসংহারে মার্ক্স্ যেখানে খুঁজে পেয়েছেন মৈত্রীময় স্বর্গরাজ্য, স্পেংলার সেখানে প্রত্যক্ষ করেছেন ভূতবিদ্যাবর্ণিত 'তাপমৃত্যু'। ইতিমধ্যে মার্ক্স্ সমন্বয়সাধক ডায়ালেক্‌টিকের ভক্ত, পরিণামী কৈবল্যে নিষ্ঠাবান; এবং স্পেংলার অবিকল মনাডের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, কালাবর্ত্তজাত বুদ্বুদপরম্পরার বিচ্ছেদ প্রমাণে যত্নপরায়ণ। অতএব ন্যায়শাস্ত্রের উপরে কোনো পক্ষেরই বিশেষ আস্থা নেই; এবং ভাষ্যকারের জীবনেতিহাস যেমন ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা থেকে বাদ যায়, তেমনি জাতিসমূহের ঐকান্তিক কমঠবৃত্তি স্পেংলারী সর্ব্বজ্ঞতার অন্তরায় নয়। কিন্তু সত্য যে এক ও অদ্বিতীয়, এ-মতপোষণের সময় এখনো আসেনি; এবং ব্যতিক্রমই নিয়মের প্রাণ না-হোক, অন্তত অপরিহার্য্য লক্ষণ বটে। সুতরাং এ-উভয়সঙ্কটে পক্ষপাতপ্রদর্শন মারাত্মক। তার চেয়ে বরঞ্চ এই কথা বলাই ভালো যে যাথার্থ্য মধ্যপন্থার পথিক; এবং পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত একে অন্যের সর্ব্বনাশ সাধে না, সম্পূর্ণতা আনে।

তাছাড়া অকালমৃত্যুর অত্যাচারে স্পেংলারী চিন্তাধারার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় আজ শুধুই অনুমেয়; এবং এতে যদিচ সন্দেহ নেই যে তাঁর শেষ পুস্তক 'দি আওয়ার অফ্ ডিসিশন্' নাৎসী নিগ্রহনীতিরই পরিপোষক, তবুও রাজনৈতিক সংক্রামে তত্ত্ববিচার একেবারে মরে না ব'লেই আমার ধ্রুব বিশ্বাস। অবশ্য স্পেংলার নিজে এ-ধারণার প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু হেগেল্-এর সাক্ষ্য তাঁর বিরুদ্ধে; এবং সেই রক্ষণশীলের তর্কবিদ্যা যেমন বামাচারী বিপ্লবীদের বীজমন্ত্র, তেমনি তাঁর সমসাময়িক ও সহকর্ম্মী, স্বাধীনতাসেবী ফিশ্‌তে-ই নাকি ফাশিষ্টদের দীক্ষাগুরু। সম্ভবত সেই-জন্যে দর্শনের নামে কৃতকর্ম্মাদের মুখে হাসি ফোটে; এবং অজানিতে হিউম্ প্রভৃতি দার্শনিকদের প্রতিধ্বনি ক'রেই তারা চড়া গলায় রটায় যে পরাবিদ্যা বুড়ো বয়সের ছেলেখেলা। তাহলেও দর্শন আছে, কেবল এই অভিমতে আসার জন্যেই

দর্শনালোচনা আবশ্যক নয়, দর্শন নেই, এ-মীমাংসাও দর্শনসাপেক্ষ; এবং তথ্য-বিমুখ তত্ত্ব উপহাস্য বটে, কিন্তু তত্ত্ববিরহিত তথ্য নিরুপাখ্য। অতএব স্পেংলার-এর বিপক্ষে এমন আপত্তির কোনো মানে নেই যে তাঁর স্বাভাবিক মতিগতি তাঁকে যে-বিশ্ববীক্ষার অন্তর্ব্বর্ত্তী করেছে, তাতে তথ্যমাত্রেই বিকারগ্রস্ত। কারণ অনুরূপ অভিযোগ তো সকল ঐতিহাসিকের সম্বন্ধেই খাটে, এমন-কি অতগুলো তথ্যের অমন সামঞ্জস্যসিদ্ধি যেহেতু অন্যত্র বিরল, তাই গ্রন্থখানির শত দোষ সত্ত্বেও 'দি ডিক্লাইন্ অফ্ দি ওয়েষ্ট্'-এর অনাদর হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। উদাহরণত আর্নল্ড্ টয়েন্‌বি-র নাম নেওয়া যেতে পারে, এবং স্পেংলারী অবচ্ছেদবাদের খণ্ডনে তিনি দ গোবিনো, এডুয়ার্ড্ মেইয়ার, গিল্‌বর্ট্ মারে ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষণে যে-সেতুবন্ধ-নির্ম্মাণে অগ্রসর, তাতে ইংরেজদের ভাবালু উদারনীতির হস্তাক্ষর যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন, তথ্য ও তত্ত্বের নির্দ্বন্দ্ব হয়তো আরো দুর্ঘট।

অবশ্য বিভিন্ন দেশ-কালের পৃথক পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে এক ও অবিভাজ্য মানবজাতির ক্রমবিকাশ খুঁজলে কোনো বিশেষ পক্ষপাত ধরা পড়ে না, বরং জাত্যভিমানের প্রত্যাহারই প্রকাশ পায়; এবং এ-দিক থেকে টয়েন্‌বি যেমন প্রশংসনীয়, পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের প্রচারক ফিশার-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ তেমনি নিন্দাভাজন। তাহলেও দার্শনিকের কাছে এ-নিরাসক্তির বিশুদ্ধতা তর্কাতীত নয়; এবং এর সাহায্যে মনুষ্যজাতির প্রতিপত্তি সুপরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্বতা নিপাতে যায়, বিবর্ত্তন আর লীলার সীমাসন্ধি মোছে, সম্পর্কের বালাই ঘুচিয়ে ব্যক্তি এরিষ্টটেলীয় ভগবানের পাশে বসে; আর সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি-বাদেরও কোনো সার্থকতা থাকে না। কারণ এ-কথা যদিও নিশ্চিত যে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে একটা আদান-প্রদানের সম্বন্ধ আছে ব'লেই পারিপার্শ্বিক বদ্‌লালে মানুষও বদ্‌লাতে বাধ্য, তবু সমাজের পরিবর্ত্তনে প্রতিবেশের স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটলে শুধু যে ভাবী স্থিতিস্থাপনের প্রবর্ত্তনা চোকে, তা নয়, সেইসঙ্গে বস্তুজগতের অস্তিত্বও শূন্যে মেশে। আমার বিবেচনায় মার্কস্-এর মতো সূক্ষ্মদর্শী প্রগতি-সাধকও এই প্রাথমিক ভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেননি, এবং সেইজন্যেই তাঁর সাবধান জড়বাদ শেষপর্য্যন্ত বর্ক্লি-প্রস্তাবিত অবরোধপ্রথার অন্তরালে আত্মগোপন করে, অন্ততপক্ষে কাণ্ট্-কীর্ত্তিত অনির্ব্বচনীয়তার অগাধে তলায়। অর্থাৎ এখানেও বিষয়কে নিরুপাধিক জেনে বিষয়ী নিজেই বিশ্বম্ভরের পদ নেয়; এবং এর ফলে উধাও

মনোরথে লোকায়ত উৎরিয়ে প্রমিতি পৌঁছয় নিরবলম্ব লোকোত্তরে। কিন্তু যে-জীব বাইরের খেয়ে বাঁচে, পরিপাকের পূর্ব্বেই সে নিশ্চয় খাদ্যসচেতন; নচেৎ সে তো অনাহারে মরবেই, এমন-কি মৃত্যুর সন্নিকর্ষও কোনোদিন বুঝবে না।

বলাই বাহুল্য, প্রগতির প্রথম পুরোধা হেগেল্ এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন; এবং বাস্তব ও বোধ্যতাকে তুল্যমূল্য ভাবার দরুণ তাঁর মতে ভূমাই যদিও একমাত্র সত্য আর সংসার সত্যাভাস, তবু তাঁর কাছে নির্গুণ সত্তা যেকালে অসদেরই সমান এবং ডায়ালেক্‌টিক প্রসর্পণ জ্ঞানার্জ্জনের অনন্য উপায়, তখন জগৎপ্রপঞ্চকে তিনি আবশ্যিক ব'লেই মানতেন, তিনি জানতেন যে অমৃত বিরাজমান মর্ত্ত্যের সোপান-শিখরে। খুব সম্ভব এই রকম একটা অমরাবতীর সন্ধানেই টয়েন্‌বির অভীপ্সাও সঞ্চরণশীল। কিন্তু তাঁর বিচারে প্রাকৃতিক প্রভাবের মতো প্রত্যয়ের উন্নয়নও অনির্দ্দিষ্ট, এবং মানুষ আপন ভাগ্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ধরে। ফলত তিনি শুধুই সভ্যতার আনুপূর্ব্বিকতা দেখিয়েছেন, একাধিক সংস্কৃতির সমকালীন প্রতিযোগও হয়তো প্রমাণ করেছেন; কিন্তু পর্য্যায়-বিশেষের জরা বা মৃত্যুর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। অথচ জীবনযাত্রার অনন্ত পথ যে পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুর, তা সর্ব্ববাদিসম্মত; এবং সমুদয় জাতির স্বতন্ত্র পুরাবৃত্তে সাদৃশ্য ও বৈষম্য যে অন্তত সমানুপাতিক, এ-সম্বন্ধেও বোধহয় কারোই কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানও আজ কার্য্যকারণের শৃঙ্খলমুক্ত; এবং কোনো অবস্থার যথাযথ পুনরাবৃত্তি যেহেতু অঘটনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে, তাই নির্ব্বিকল্প ন্যায়ের মতো নিত্য প্রকৃতিও হয়তো একটা আদর্শ, অসাধ্য আদর্শ। তাহলেও ইতিহাসে গণগণিতের প্রচলন হাস্যকর; এবং কার্য্যত আমরা হেতুবাদের সমর্থন পাই বা না-পাই, নিমিত্তে ভক্তি হারালে ইতিহাসও রূপকথার ভেক পরবে।

আমার বিশ্বাস অস্‌ভাল্ড্ স্পেংলারই সে-মায়াবাদের পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক। কারণ তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতা হেগেলীয় উল্লম্ফনে অন্বয়ের সোপান পেরিয়ে অখণ্ড ভূমার দিকে অনবরত ছোটে না, তার ঘূর্ণ্যমান আয়ুর কম্বুরেখা তাকে অবশেষে নাস্তিতে বিলীন করে। স্পেংলার-এর অনুসারে সভ্যতা ব্যক্তিস্বভাব, তার স্বাস্থ্যও সুপরিমিত, জরা-যৌবন, ক্ষয়-বৃদ্ধি, জন্ম-মৃত্যু, এ-সমস্তই তাকে অর্শায়; এবং তাঁর মতে এই উপমা কেবল অলঙ্কার নয়, এক একটি সভ্যতাব্যষ্টি আসলে এক একজন মানুষের মতোই নশ্বর ও সাবকাশ। তবে সেই অসম্পৃক্ত চক্রগুলো

যদিও স্বাবলম্বী, তবু তাদের প্রাণধর্ম্ম বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত ; এবং কোনো সাধিতপূর্ব্ব সাম্যে তাদের অধিকার না-থাকলেও তারা সকলেই একটা নির্ব্বিকার প্রতিমানের অনুবাদক। সেইজন্যেই প্রত্যেক সভ্যতার মৌলিক উপকরণ মোটামুটি এক রকম, প্রত্যেকের বিভিন্ন দশাই সকলের মধ্যে অনুক্রমিত, প্রত্যেকের প্রধান সংস্কারগুলো অঙ্কশাস্ত্রের মতো যার তথ্যসমূহ প্রামাণ্য বটে, কিন্তু প্রমাণ-নিরপেক্ষ নয়। উপরন্তু সকল সভ্যতার মুখ্য অবস্থাগুলো যেমন অনুরূপ, তেমনি সেই সমস্ত ঘটনাগতিকে যত সব মহাপুরুষ গ'ড়ে ওঠে, তারাও আচারে ব্যবহারে, এমন-কি আকারে-প্রকারে অভিন্ন ; এবং গ্রীসের এলেক্জাণ্ডার রোমের সীজাররূপে পূজা পেয়ে, আবার ফরাসী নেপোলিয়ন-এর দেহে অম্লানবদনে আশ্রয় নেয়। সুতরাং স্পেংলার-এর বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত সমীচীন যে সভ্যতাও মানুষের মতোই পুনরাবৃত্তিপ্রিয়, এবং মরণই যেহেতু পুনরাবৃত্তির চূড়ান্ত, তাই মানুষ বা সভ্যতা কেউই আজ পর্য্যন্ত অমৃত-নিকেতনের উদাত্ত আহ্বানে কান পাতেনি।

কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্যাবর্ত্তনস্পৃহা প্রবৃত্তিঘটিত; ফ্রয়েডী অচৈতন্যের ব্যাপার, এবং সভ্যতা মানবসমষ্টির সম্মিলিত চিৎপ্রকর্ষের নাম। সুতরাং ব্যক্তির বেলায় যে-চালনা প্রবৃত্তি থেকে আসে, সভ্যতার পক্ষে সে-প্রেরণা জন্মায় প্রত্যয়ে ; এবং ব্যক্তি যেমন ক্রমান্বয়ে প্রাক্তন অবস্থা খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে আদিম জাড্যে ফিরে যায়, সভ্যতাও তেমনি কতকগুলো সার্ব্বভৌম প্রত্যয়ের নিষ্কর্ষণ করতে করতে অবশেষে বিষয়বিবিক্ত অনর্থে পৌঁছয়। তখন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ঘৃত-লোভীকে ঋণপরিগ্রহের পরামর্শ জোগায়, প্লেটো-প্রোক্ত ক্ষমা খৃষ্টানসংহারে বাধা দেয় না, স্বাধীন বাণিজ্যের সংরক্ষণে বৃটিশ সাম্রাজ্য দিগ্বিজয়ে বেরোয়। কারণ সভ্যতাও ব্যক্তির মতোই অহংসর্ব্বস্ব ; তার ঐতিহাসিক দৃষ্টি নেই ; সে ভাবে না, অন্যদের উপরে তার প্রভাব ছড়াতে পারে ; পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্তির পুনরভিনয়ে সেও যে সর্ব্বনাশের দিকে এগোচ্ছে, এমন সংশয়ের স্থান তার দুঃস্বপ্নেও নেই। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতি আর প্রত্যয়ের সতরঞ্চ খেলার অন্ধ ঘুঁটি মাত্র ; এবং নির্ব্বিকার প্রকৃতি ও আত্মরত প্রত্যয় এত সমবল যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রত্যেক ক্ষেপেই চালমাৎ অনিবার্য্য। অবশ্য এটা একটা প্রতীক ; এবং এই চিত্রকল্পের পিছনে কোনো পরমার্থ লুকিয়ে আছে কিনা, সে-বিষয়ে নানা মুনির নানা মত সহজ ও সম্ভবপর। তাছাড়া এ-প্রসঙ্গে স্পেংলার নিজেই হয়তো নিজের মন বোঝেননি ;

কখনো বা সকল সভ্যতার মধ্যে একই আদর্শের স্বায়ত্তশাসন দেখিয়ে বলেছেন যে এই আদর্শ প্রারম্ভে মানসলোকে জন্মালেও, ক্রমশ সমস্ত বস্তুজগৎ গিলে, অন্তিমে অজীর্ণরোগেই মরে ; আবার সময়ে সময়ে তাঁকে টেনেছে এর বিপরীত সিদ্ধান্ত। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত তিনি জড়বাদ বা জীববাদ যে-দিকেই ঝুঁকুন না কেন, তার ফলে তাঁর গভীর গবেষণা, বিরাট দৃকশক্তি ও নিষ্প্রমাদ কালজ্ঞানের মূল্য এক তিল কমবে না ; এবং এই তিন দুর্লভ গুণের সংমিশ্রণেও তাঁর যুক্তিজালের নাতিবহুল ফাঁকগুলো ভরবে না বটে, তবু এ-কথা বলার দুঃসাহস অন্তত আমার নেই যে অবিচল ন্যায়নিষ্ঠাই সত্য-মিথ্যার একমাত্র ব্যাবর্ত্তক।

পুস্তকপরিচয়

Dohakosa (দোহাকোষ)—with notes and translations by Prabodh Chandra Bagchi (Calcutta University Press).

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধগান ও দোহা' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত করেন। তৎপূর্ব্বে অধ্যাপক বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে সংগৃহীত যে "সুভাষিত-সংগ্রহ" প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই গ্রন্থের পরিশিষ্টে তিনি ২৮টি দোহা টীকা-টীপ্পনী সমেত দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধগান ও দোহা'তে সরহপাদের দোহাকোষ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষ ব্যতীত 'ডাকার্ণব' ও সংস্কৃত টীকাসহ অনেকগুলি বৌদ্ধ সহজিয়া মতের পদ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় সরহপাদের দোহাকোষের উপর অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকা এবং কৃষ্ণপাদের দোহাকোষের উপর মেখলা নাম্নী সংস্কৃত টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ডাঃ সহিদুল্লা কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাগুলি তাহাদের তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত মেলন করিয়া একটী critical সংস্করণ প্রকাশ করেন—তাঁহার গ্রন্থের নাম—"Les chants Mystiques de Kanha et de Saraha"।

ইহার পর ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯২৯ সালে নেপালে অবস্থান কালে রাজগুরু হেমরাজ শর্ম্মার গ্রন্থাগারে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত দোহাকোষ প্রাপ্ত হন। ঐ পুঁথির বয়ঃক্রম ৭০০ বৎসরের অধিক। উহাতে সরহপাদের দোহা ব্যতীত সংস্কৃত টীকাসহ তিল্লোপাদের এক অপরিজ্ঞাত দোহাকোষ লিখিত ছিল। আলোচ্য গ্রন্থে ডাঃ বাগচি তিল্লোপাদের ঐ দোহা প্রথম প্রকাশিত করিলেন। তা' ছাড়া ডাঃ বাগচী নেপাল দরবারের গ্রন্থাগারে একখানি খণ্ডিত হস্তলিপি প্রাপ্ত হন—তাহায় তারিখ ১১০১ খৃষ্টাব্দ। ঐ খণ্ডিত পুঁথিতেও সরহপাদের কয়েকটি অজ্ঞাত দোহা লিখিত ছিল। ডাঃ বাগচীর প্রকাশিত দোহাকোষে ঐ সকল অভিনব দোহা সংগৃহীত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে প্রকাশিত সবহপাদ ও কৃষ্ণপাদের সংস্কৃত টীকা সমেত দোহাকোষও মুদ্রিত হইয়াছে। তা' ছাড়া ডাঃ বাগচীর সংস্করণে অন্যান্য মুদ্রিত বা হস্তলিখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত সরহপাদের ১৩টী দোহা এবং একটি 'সঙ্কীর্ণ' দোহা-সংগ্রহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ডাঃ বাগচী পণ্ডিত লোক। বিশুদ্ধপাঠ উদ্ধারেব পক্ষে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার স্বরচিত টিপ্পনীতে তিব্বতীয় অনুবাদের সহিত তুলনা করিয়া কূটার্থ দোহার অর্থ নির্ণয়ে প্রভূত প্রযত্ন করিয়াছেন। এজন্য তিনি পণ্ডিত সমাজের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু তিনি এইরূপ অসম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া পাঠককে 'বঞ্চিত' করিলেন কেন? তিল্লোপাদের দোহাকোষের তিনি স্বকৃত টিপ্পনী ও ইংরাজী অনুবাদ দিয়াছেন;—কিন্তু সরহপাদীয় সাতটি দোহা ব্যতীত অপর

কোন দোহার টিপ্পনী বা অনুবাদ দেন নাই কেন? এমন কি, অষ্টম দোহার টিপ্পনী আছে কিন্তু অনুবাদ নাই। গ্রন্থের শেষে দুরূহার্থ শব্দের সূচি এবং টীকাটিপ্পনীতে উদ্ধৃত গ্রন্থাদির নাম-সংগ্রহ নাই কেন? তাঁহার টীপ্পনীতে মধ্যে মধ্যে তৎকৃত Introduction-এর দোহাই আছে ('for the discussion on 'Sahala' see the introduction')—অথচ সে Introduction নাই কেন? তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে দোহা সম্বন্ধে তাঁহার বিস্তৃত গ্রন্থ Calcutta Sanskrit Series-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত হইবে। আমরা সেই গ্রন্থের আশা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

ডাঃ বাগচী নির্ব্বন্ধ সহকারে লিখিয়াছেন যে দোহাকোষের ভাষা—'অপভ্রংশ' ভাষা—'M. M. Haraprosad Sastri was the first to discover and publish the Buddhist Dohas but he failed to recognise the language as Apabhransa'। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধগান ও দোহার" মুখবন্ধে দোহার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন বেণ্ডাল সাহেব দোহার ভাষাকে কোথাও প্রাকৃত ভাষা, কোথাও প্রাচীন অপভ্রংশ ভাষা বলিয়াছিলেন। কিন্তু অপ্রভ্রংশ ভাষা বলিলে কি বুঝায়? প্রাকৃত ব্যাকরণে দেখা যায়, যে ভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আনিতে পারেন না—তাহাই 'অপভ্রংশ'। খৃষ্ট ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বে দণ্ডী তাঁহার 'কাব্যাদর্শে' লিখিয়াছিলেন ভাষা চতুর্বিধ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র। ভরত নাট্যশাস্ত্রের ভাষাবিভাগ অন্যরূপ – সংস্কৃত, ভাষা ও বিভাষা। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যে ভাষা, তাহাই 'ভাষা' এবং যে ভাষাগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয়—তাহারা 'বিভাষা' (যেমন অন্ধ, বাহ্লীক ইত্যাদি)। ভরতের নাট্যশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনি ব্যাকরণে ভাষার দ্বিবিধ বিভাগ দৃষ্ট হয়।—ছন্দঃ (বৈদিক ভাষা) ও ভাষা (কথিত ভাষা)। অর্থাৎ, পাণিনির পূর্ব্বেই (পাণিনি সম্ভবতঃ খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতকে বিদ্যমান ছিলেন) আর্ষ সংস্কৃত (যে ভাষার বৈদিক মন্ত্র রচিত হইয়াছিল) দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল এবং এখন যাহাকে আমরা 'সংস্কৃত' বলি কথোপকথনের ভাষা সেই সংস্কৃত ছিল—কালিদাসের সংস্কৃত বা বাণভট্টের সংস্কৃতের মত সংস্কৃত নয় কিন্তু সম্ভবতঃ রামায়ণের অথবা পুরাণাদিতে রক্ষিত সংস্কৃত গাথার অনুরূপ সংস্কৃত। ক্রমশঃ লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষায় প্রয়োগগত একটা ভেদ সৃষ্ট হইল—যেমন আধুনিক জার্ম্মান বা বাঙলা ভাষায় হইয়াছে। প্রথমতঃ কথিত ভাষার নাম হইল প্রাকৃত এবং লিখিত ভাষার নাম হইল সংস্কৃত। পালি (যে ভাষায় হীনযান বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটক রচিত) ঐ প্রাকৃতেরই এক রূপ। ক্রমশঃ মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি প্রাকৃতের ভেদ সৃষ্ট হইল। যখন বররুচি 'প্রাকৃত-প্রকাশ' রচনা করেন তখন ঐ চারিটি প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষের কথিত ভাষা ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, অপভ্রংশ ঐ সকল প্রাকৃতেরই পরবর্ত্তী রূপ। বাস্তবিক অপভ্রংশ কোন নির্দ্দিষ্ট ভাষা নয়। বুঁদির রাজার চারণ সুরজমল্ যে বলিয়াছেন—যে ভাষায় বেশী বিভক্তি নাই সেই ভাষা অপভ্রংশ—এ কথা ঠিক্।

শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দোহার ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা। এই মত সমর্থন জন্য তিনি তাঁহার 'বৌদ্ধগান ও দোহাতে' অনেক কথাই বলিয়াছেন। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, দোহার ভাষা বাংলাও নয় হিন্দীও নয় কিন্তু উভয় ভাষার পূর্ব্বরূপ এক 'প্রাকৃত' ভাষা। এ ভাষা পরে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একদিকে হিন্দী এবং একদিকে বাংলার খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। এ ভাষাকে অপভ্রংশ বলিতে হয় বলুন—কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, বাংলা ও হিন্দী এই ভাষা-জননীর যমজ কন্যা। অতএব বাঙ্গালী যেমন ইহাকে প্রাচীন বাংলা বলিয়া দাবী করিতে পারেন—বেহারী সেইরূপ ইহাকে প্রাচীন হিন্দী বলিয়া দাবী করিতে পারেন। যদি এ ভাষার একান্তই নামকরণ করিতে হয় তবে আমি ইহাকে 'অপভ্রংশ' বলিব না—ভরতমুনির অনুকরণে ইহাকে 'বিপ্রাকৃত' বলিব। সে যাহা হউক একথা নিশ্চিত যে, যখন সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষার বিবর্ত্তনের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন এই সকল বৌদ্ধপদ ও দোহা আমাদের বিশেষ কার্য্যে লাগিবে। এ দিক্ হইতে ইহাদিগের এই প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা ইহাদিগের একটা গুরুতর প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটী বৌদ্ধ 'সহজ' মতের ক্রমবিকাশ এবং 'সহজ' কি রূপে কামসঙ্কুল 'সহজিয়া'তে পরিণত হইল এবং কবে এবং কি রূপে তাহার মধ্যে তান্ত্রিক মিষ্টিসিজম্ প্রবেশলাভ করিল। এ তথ্যের নির্দ্ধারণে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ধর্ম্মেতিহাসের ক্রমনির্দ্দেশনে—এই সকল দোহা প্রভৃত উপকারে লাগিবে।

'সহজ' কি? দোহাকোষ হইতে সহজের কি পরিচয় পাই? সহজ অনুত্তর (transcendental)—জহি তহি দিঢ় কর অনুত্তর সিদ্ধউ।

সহজ সমরস, নিরঞ্জন, ভাবাভাবের অতীত—এক কথায় 'শূন্য'।

সহজে ভাবাভাব ণ পুচ্ছহ।
সুণ্ণ করুণ তহি সমরস ইচ্ছিঅ॥

সহজে স্কন্ধ নাই, ভূত নাই, আয়তন নাই, ইন্দ্রিয় নাই—'সহজ স্বভাবে সকল বিবন্দি' (everything is negatived)—

কন্ধ ভুঅ আঅত্তণ ইন্দি।
সহজ সহাবেঁ সঅল বিবন্দী॥

অতএব আপন-পর ভ্রান্তি করিও না—'পর অপ্পাণ ণ ভন্তি করু'—দেখ, সমস্তই শূন্য। তিহুঅণ সুণ্ণ নিরঞ্জন পলিআ।

হউ (অহং) সুণ্ণ, জগু সুণ্ণ তিহুঅণ সুণ্ণ
ণিম্মল সহজে ণ পাপ ণ পুণ্ণ।

মরীচিকা, গন্ধর্ব্বনগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ অলীক, বিচিত্র বিশ্বও সেইরূপ।

মরুমরীচি গন্ধব্বনঅরী দাপতি বিম্বু জইসা

এ যেন বন্ধ্যার কেলি করা—যেন বালি হইতে তৈল নিষ্কাষণ, শশকের শৃঙ্গ-উত্তোলন এবং আকাশকুসুম রচন !

বাঁঝি সুআ জিম কেলি করই, খেলই বহুবিধ খেলা।
বালুআ তেলে সসর-সিংগে আকাশ ফুলিলা।

অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত ও মহাযান বৌদ্ধের সেই প্রচলিত কথা—প্রতীতিমাত্রমেবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।

জলপ্রপাতানি পদানি পশ্যতঃ
খ-পুষ্পমালা রচনাঞ্চ কুর্ব্বতঃ।

যে সহজ এইরূপ—তাহা (বৈদান্তিকের নির্গুণ নেতি নেতি ব্রহ্মের ন্যায়) যে অবাচ্য—ইহা বলাই বাহুল্য।

জো অবাচ তহিঁ কাঁহি বাখানে।

সহজ সম্পর্কে উপদেশ (উএস)—যেন বোবা কর্তৃক বধিরকে উপদেশ—

কালে বোব সংবোহিঅ জইসা।
আলে (ব্যর্থ) গুরু উএসই সিস (শিষ্য)।
বাক্ পথাতীত কাহিব কীস ?

যদি সহজ স্বভাবে সুস্থিত হইতে চাও—'সহজ সহাবে স বসই হোই ণিচ্চল'—তবে সাধন চাই।

অরে সহজে সই পর রজ্জহ
মা ভবগন্ধ বন্ধ পড়িচজ্জহ

দেখ, গাছের উপর ফল দৃষ্টি করা নিষ্ফল, তাহার আঘ্রাণ করা চাই – বৈদ্য ডাকিলেই হইল না, ঔষধ সেবন করা চাই।

তরুফল দরিসণে ণউ অগ্ঘাই (আঘ্রাণ)
বেজ্জ দেক্খি কি রোগ পলাই ?

অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সেই কথা—'তৎকর' হও

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো
ন তক্করো হোতি নরো পমত্তো।

সহজের কি সাধন ? উহা বরগুরু-বক্ত্র গম্য—

আই (আদি) রহিঅ এহু অন্ত রহিঅ
বর গুরুপাঅ অদ্বঅ কহিঅ
মূলরহিঅ জো চিন্তই তত্ত (তত্ত্ব)
গুরু উবএসেঁ এথ বিয়ত্ত।

*　*　*

দেখ—
দীসই গুরু উবএসেঁ ণ অণ্ণে।
কিং তহ তিত্থ (তীর্থ) তপোবণ জাই
মোক্খ কি লব্ভই পাণী ন্হাই ?

মন্ত (মন্ত্র) ণ তন্ত ণ, ণ ধেঅ ণ ধারণ
সব্ববি বঢ ! বিব্ভম কারণ
দেব ম পুজহু তিথ ণ জাবা
দেব পূজাহি ণ মোক্খ পাবা
বহ্মা বিহ্ণু মহেসুর (মহেশ্বর) দেবা
বোহিসত্ব ম করহু সেবা

যদিই আরাধনা করিতে হয়—তবে

বুদ্ধ আরাহহু অবিকল চিত্তে
কিন্তু—ভবণিব্বাণে ম করহু রে থিত্তেঁ (স্থিতি)।

ভব ও নির্ব্বাণ—সংসার ও মোক্ষ, তোমাকে তুল্য মূল্য করিতে হইবে এবং ধর্ম্মাধর্ম্মে সমদৃষ্টি হইতে হইবে—ধম্মাধম্ম সো সোইঅ খাই অর্থাৎ ত্যজ ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ (মহাভারত)। কিন্তু তথাপি করুণা ছাড়িও না—বরং প্রাণ ছাড়িও কিন্তু করুণা ছাড়িও না। দেখ চিত্ততরুর করুণাই ফুল্ল ফল—

পর উআর ন করউ অথি ন দীঅউ দাণ
এহু সংসারে কবণ ফলু, বরু ছড়্‌হু অপ্পাণ
করুণা ছড্ডি জো সুন্নহি লগ্‌গু
ণউসো পাবই উত্তিম মগ্‌গু
অদ্বয় চিত্ত তরুবরই গউ তিহুবণে বিথার
করুণা ফুল্লী ফল ধরই নাউ পর-উআর

সহজ-সিদ্ধির প্রকৃত সাধন ধ্যান ও জ্ঞান—ঝাণ ও জাণ।

জাণ রহিঅ কি কীঅই ঝাণে
জো অবচ তঁহি কা'হ বক্খাণে।
অসমল চিত্ত ম ঝাণই খরড়হ।
সুহ অচ্ছন্ত ম অপ্পণু ভগড়হ॥

অতএব,

জহি মন পবন ন সঞ্চরই, রবি সসি নাহ পবেশ,
তহি বট চিত্ত বিসাম করু, সরহে কহিঅ উবেশ।

সে অবস্থায় সব একাকার ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই—

জব্বেঁ মণ অথমণ জাই, তণু তুট্টই বন্ধণ।
তব্বেঁ সমরস সহজে বজ্জই ণউ সুদ্দ ণ বহ্মণ॥

সহজ পরিভাষায় এ অবস্থাকে 'জ্ঞানমুদ্রা নৈরাত্মা' বলে। অন্যান্য মিষ্টিকদিগের ন্যায় সহজাচার্য্যেরাও অনেকস্থলে 'সন্ধ্যাভাষার' প্রয়োগ করেন। ঐ ভাষায় এ জ্ঞানমুদ্রার নাম হরিণী—তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ। টীকাকার এই হেঁয়ালীর অর্থ করিতে বলিতেছেন, 'হরিণীতি

সন্ধ্যা-ভাষয়া সৈব জ্ঞানমুদ্রা।' এই সন্ধ্যাভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—'সহজিয়া ধর্ম্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে, আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না অর্থাৎ এই সকল উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্ম কথার ভিতরে একটা অন্যভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়।'

এই হরিণী ক্রমশঃ শবরীতে পরিণত হইয়াছে, জ্ঞানমুদ্রায়া শবরীরূপায়াঃ। ইনিই সহজ-সাধকের ঘরণী—'পবণ ঘরিণী তঁহি নিচ্চল বজ্জই' এবং সে ভাবে সহজ-সাধক বজ্রধর শবর।

বর গিরি সিহর উত্তুঙ্গমুণি
সবরে জঁহি কিঅ বাস।

শবরী অর্থে চণ্ডালী—তাহার উপর ডোম্বী। চণ্ডালীতে দ্বৈতজ্ঞান থাকে কিন্তু ডোম্বীতে নির্ভাঁজ অদ্বৈত। ডোম্বীর অপর নাম বঙ্গালী।

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥
বাজণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ॥

অর্থাৎ বজ্রযান নৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখালে বাহিলাম এবং অদ্বয় বঙ্গালে (পঞ্চ-) ক্লেশ লুটাইয়া দিলাম।

এই ডোম্বীই পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা—ডোম্বীতে 'পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা'—

আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জো'ই লাগ।
ডাহ ডোম্বী ঘরে লাগেলি আগি
সহষলি লই সিঞ্চহ পাণি।

টীকাকার বলেন, মহাসুখরাগদাহযুক্তো হগ্নিঃ ডোম্বীপরিশুদ্ধাবধূতি-গৃহে লগ্নঃ। তেন মহা-সুখরাগাগ্নিনা ময়া সকলবিষয়াদিবৃন্দাশ্রয়ো দগ্ধঃ।

কাহ্নপাদ ইহার উপর আর একটু রঙ চড়াইয়া বলিলেন—দুন্দুভি বাজাইয়া ডোম্বীর বিবাহে চলিলাম। সেই যোগিনীর সাথে অহর্নিশি সুরতে গোঙাইব—আমি কাপালিক হইব,—

জঅ জঅ দুন্দুই সাদ উছলিআ
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ।
অহি নিশি সুরত পসঙ্গে জাঅ
জোগিনী জালে রঅণি (রজনী) পোহাঅ।
মারিঅ শাসু ননন্দ ঘরে শালি
মাঅ মারিআ কাহ্ন ভইঅ কবালি।

রূপক দীর্ঘকাল রূপক থাকে না। আরম্ভে যাহা আধ্যাত্মিক রূপক, বিস্মৃতির ফলে পরিণামে তাহা ভৌম যৌন ব্যাপার। রাসের রূপকতায় আমরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সহজিয়াদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মপাদ বলিলেন,—

জোইনি! তুঁই বিণু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমল রস পীবমি॥

তখন সহজিয়ারা বলিতে লাগিলেন,—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু।

এই রূপেই কি সহজ ধর্ম্ম 'সহজিয়া'তে রূপান্তরিত হইয়াছিল?

সহজ ধর্ম্মের মধ্যে ডাঃ বাগচী যাহাকে তান্ত্রিক মিস্টিসিজম্ বলিয়াছেন (আমি ইহাকে তান্ত্রিক ম্যাজিক্ বলিতে চাই)—তাহার স্পষ্ট সমাবেশ দেখিতে পাই। চন্দ্রনাড়ী ও সূর্য্যনাড়ী সমীকৃত করিয়া কিরূপে সুষুম্নায় সুস্থিত হইতে হয়, সে বিষয়ে অনেক ইঙ্গিত আছে।

ললণা রসণা রবি সসি তুড়িঅ বেন্ন বি পাসে
পত্ত-চউট্ট চউ মুণাল টিঅ মহাসুহ বাসে।

সহজাচার্য্যের 'আলি' ও 'কালি' কি ইহাই?

আলিএ কালিএ বাট রুন্ধেলা
তা' দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা।
আলি কালি ঘণ্টা নেউর চরণ
রবি সসী কুণ্ডল কিউ আভরণ।

লুইপাদ এই আলি ও কালিকে 'ধমন চমন' বলিয়াছেন—

ভণই লুই আম্হে ঝাণে দিঠা
ধমণ চমণ বেণি পণ্ডি বইঠা॥

তান্ত্রিকের মৈথুন 'মকার' পূর্ব্বেই প্রবেশ লাভ করিয়াছিল—সহজধর্ম্মে মদ্য 'মকার' কবে প্রবেশ করিল? খুব সম্ভব আরম্ভে মদিরা বারুণী ছিল না—সাধকের সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃত ধারা ছিল।

সহজে থির করী বারুণী সান্ধে।
জেঁ অজরামর হোই দিট কান্ধে॥

শাস্ত্রী মহাশয় ভুসুকু পাদের লিখিত একখানি সহজিয়া পুঁথির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাতে সহজিয়াদিগের কুটীনির্ম্মাণ, ভোজনবিধি, শয়নবিধি প্রভৃতির সহিত মদ্যপান ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারেরও ত্রুটি নাই।

সে যাহা হউক—স্বচ্ছ অবস্থাব সহজ মত যে উচ্চাঙ্গের সাধনমার্গ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। কারণ দেখা যায় সহজাচার্য্যদিগের মতে সহজ সিদ্ধির ফল অতি আজব, অত্যন্ত অদ্ভুত—কহণ ন সকই বথু!

অরে পুত্তো (পুত্র) তত্তো বিচিত্ত রস, কহণ্‌ণ সকই বথ্‌
বপ্পরহিআ সুহঠাণু (সুখ স্থান) বরজগু উঅজ্জই তথ্‌॥

এ সিদ্ধিতে পরম মহাসুখ, একক্ষণে নিখিল দুরিতনাশ এবং ঘোর আঁধারে চন্দ্রমণির স্থায় সমস্ত ভাস্বর।

ঘোরান্ধারে চন্দ্র মণি জিম উজ্জোয়া করই।
পরম মহাসুখে এক্কুখণে দুরিয়া সেস হরেই॥

অতএব,

এথু সে সুরসরি জমুণা এথু সে গঙ্গাসাঅরু
এথু পআগ বণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু।

ডাঃ বাগচীর 'দোহাকোষের' পরিচয়ে অনেক কথা বলিলাম। এতকথা না বলিলেও চলিত। আমার বলিবার উদ্দেশ্যে এই, যদি ডাঃ বাগচী দোহাকোষের বৃহত্তর সংস্করণে এই সকল বিষয়ের সমুচিত আলোচনা করেন। যদি না করেন, অথবা তাঁহার আলোচনা যদি নিষ্ফল হয়, তবে আশা করি ভবিষ্যতে এই বাংলা দেশে এমন কোন প্রজ্জোজ্জ্বল প্রতিভাশালীর (synthetie genius-এর) উদয় হইবে, যিনি এই সকল সমস্যার সুমীমাংসা করিবেন। কালো হ্যয়ং নিরবধিঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

We have been warned—By Naomi Mitchison (Constable)
Nothing Like Leather –By V. S. Pritchett. (Chatto and Windus)

এই দুখানি বই আধুনিক উপন্যাস এবং এদের মধ্যে নায়োমি মিচিসনের বইটী নাম-করা। শ্রীমতী মিচিসনের বইয়ে উপন্যাসের সবগুলি উপকরণই বর্ত্তমান, কিন্তু একে বিশুদ্ধ উপন্যাস বলা চলে না। অবশ্য সে হিসাবে আধুনিক কালের অনেক রচনাকেই খাঁটি উপন্যাস-সাহিত্য বলে অভিহিত করা যায় না। We have been warned সেই জাতীয় বই, যা অতি-আধুনিক কালকে কেন্দ্র করে প্রকৃত ঘটনার ওপর কল্পনার রঙ চড়িয়ে রচিত হয়ে থাকে। মুখ্যতঃ এ বইটী সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচার-সাহিত্য। ঠিক সম্প্রদায় বলা উচিত হবে না, কারণ সরকারী লেবার পার্টি অথবা সঙ্ঘবদ্ধ সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে এই বই-এ প্রচারিত সমাজ-ব্যবস্থা অথবা সমাজ-নীতির সাদৃশ্য না থাকতে পারে। তবে উপন্যাসখানি সমাজতন্ত্রের মতবাদ প্রচারেব উদ্দেশ্যেই লিখিত।

নায়োমি মিচিসনকে আমরা জানতুম ছোট গল্পের লেখিকা হিসাবে। তাঁর রচিত The Conquered, When the bough breaks, Black Sparta প্রভৃতি বই ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যা-

মোদীদের যথেষ্ট আনন্দ পরিবেষণ করেছিল। ঐতিহাসিক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল উচ্চাঙ্গের এবং তাঁর গল্পের আবেষ্টনী লেখার গুণে সত্য ও জীবন্ত হয়ে উঠত। এই কারণে রোম্যান্ ব্রিটেনের ওপর তাঁর আখ্যানগুলি আমাদের কাছে উপাদেয় বোধ হয়েছিল।

কিন্তু একদা তাঁর মতি-পরিবর্ত্তন হয়। ১৯৩৩ সালের শেষ ভাগে তিনি বালক বালিকাদের জন্যে একখানি বিশ্বকোষ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। সে সময়টা ছিল 'আউটলাইন্'এর যুগ, কাজেই গোলান্জ্ তাঁর বইখানি প্রকাশিত করলেন। বইখানি পাঠানো হ'ল বড় বড় সমালোচক ও নামকরা পাদ্রীদের কাছে। তাঁরাও উৎসাহিত হয়ে সার্টিফিকেট দিলেন, সাময়িক পত্রিকায় প্রশংসমান সমালোচনা বেরুল, নইলে কাগজ চালানো মুস্কিল। এমন সময়ে, যতদূর স্মরণ হচ্ছে, লান্ প্রথমে ইংলিশ রিভিয়্যুতে বইখানির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল, পাঠক ও সমালোচকবর্গ লক্ষ্য করলে যে সমস্ত বইখানি অনুপাত-দোষে দুষ্ট। শ্রীমতী মিচিসন বালক-বালিকাদের অনেক জিনিষ বুঝিয়েছেন যা অবান্তর, আর এমন সব দরকারী বিষয় বাদ দিয়েছেন—যা অবশ্যই জ্ঞাতব্য। সযত্নে উদাহরণ উদ্ধৃত করা হ'ল যে তিনি বই-খানিতে যৌন সম্বন্ধ নিয়ে সরল ও বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু সমগ্র পুস্তকের মধ্যে যীশু খৃষ্টের নামোচ্চারণ করেছেন মাত্র দু তিন জায়গায়। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বরাবরই ছিদ্রান্বেষী। তারা ভুলে গেল যে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে চার্চ্চের প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং Materialistic Conception of God য়ুরোপীয় চিন্তা-জগতের ইতিহাসে বিরল নয়। সে যাই হোক্, অনেক মহারথী তাঁদের প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র প্রত্যাহার করলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ওয়েলস্-সাহেবের ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট মতান্তর হয়েছিল, এমন কি বেলক্-সাহেবের হিতৈষণায় একখানি ক্যাথলিক ইতিহাস রচিত হবে এমন কথাও শোনা গিয়েছিল। গোলান্জ্ পেছিয়ে গিয়ে আমতা আমতা করলেন, অপ্রীতিকর ব্যাপারটার ওপর যবনিকা-পাত হ'ল। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ, মানব সমাজে ও সভ্যতায় যীশু খৃষ্টের দান কতখানি তা' অমীমাংসিত রয়ে গেল। সেই সূত্রে নায়োমি মিচিসনের প্রতিপত্তির প্রসার হ'ল।

বিলাতে ইদানীং অনেকেই উপন্যাস ক্ষেত্রে নেমেছেন ও নামছেন যাঁদের মুখ্যতঃ হওয়া উচিত ছিল সমালোচক ও প্রবন্ধকার অথবা কবি ও দার্শনিক। কারণ গল্পের যুগে উপন্যাসের সাহায্যে আপন মতামত প্রকাশ করা সহজসাধ্য এবং বোধ করি লাভজনক। বিজ্ঞাপনের হুম্‌কির জোরে দিন কতকের মধ্যেই বইয়ের কাট্‌তি এত বেশী হয়, যে পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। সেক্‌স ও সোশ্যালিজম হল আধুনিক কালে সেল্‌সম্যানসিপের নিদর্শন। আর আমাদের সেই সব বই পড়তে হয়, কারণ কালধর্ম্মের সঙ্গে পরিচয় বৈদগ্ধ্যের লক্ষণ। শ্রীমতী মিচিসন যদি এত বড় দীর্ঘ উপন্যাস না লিখে সোজাসুজি প্রবন্ধ বা ট্র্যাক্‌টস্ লিখতেন, তা হলে পাঠকদের সময়-ক্ষেপ হত না। তবে উপন্যাস রচনা করে তিনি কোনও মারাত্মক দোষ করেন নি, যেহেতু মিল্‌টন থেকে মিডলটন মারী সবাই অল্পবিস্তর স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়েছেন।

আখ্যান ভাগের পরিচয় অল্প কথায় লেখা সম্ভব নয়, যেহেতু গল্পের ঘটনাস্থল একাধিক। প্রকৃতপক্ষে গল্পের প্রথমাংশ স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম কূলে, আর দ্বিতীয়াংশ অক্সফোর্ডের একটী শ্রমিক-সঙ্কুল স্থানে সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া একটী সম্পূর্ণ অধ্যায় সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ে রচিত। তারপর উপন্যাসের চরিত্র অনেক ও বিবিধ, মোটামুটি সত্তর পঁচাত্তর জন হবে।

টম গ্যাল্‌টন ও তাঁর স্ত্রী ডিয়ন গল্পের প্রধান চরিত্র। স্বামী হলেন ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ্, অক্সফোর্ডের অধ্যাপক এবং লেবার পার্টির সদস্য আর স্ত্রী হলেন তাঁর সহকর্ম্মিণী। এই দুটী নর-নারীর চারপাশে বিস্তর আত্মীয় স্বজন ভিড় করে আছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই সোশ্যালিষ্ট মতবাদ স্বীকার করেন। তাঁদের শিক্ষা, দীক্ষা ও কার্য্যাবলী হল গল্পের বিষয়বস্তু। কেউ বা আধুনিক চিত্রকর, কেউ বা কাঠ খোদাই করেন, কেউ বা কম্যুনিষ্ট শ্রমিক, কেউ বা লেবার পার্টির প্রতিনিধি। এই সব বিভিন্ন ও অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই অপরিস্ফুট রয়ে গেছে, কারণ তাদের সার্থকতা প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক। তবু তারি মধ্য থেকে ফিব, ডোনাল্‌ড ম্যাক্‌লীন ও স্ট্যান্‌লী মেসনের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। বইএর ভিতর টমের চেয়ে তার স্ত্রীর চরিত্র আরও বিশদ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, সুতরাং পাঠকের চিত্ত সেই দিকেই ঝুঁকবে। ডিয়নের চরিত্রের দুটো দিক্ আছে। একদিকে তার আভিজাত্য ও প্রবল জাতীয়তা-বোধ, অপর দিকে তার বিদ্রোহ-লিপ্সা এবং বিশ্বমৈত্রী ও শ্রেণি-বিরোধহীন সাম্য-প্রচেষ্টা। একদিকে সে বিশ্বস্ত ঘরণী ও চারটী সন্তানের জননী, অপরপক্ষে সে ডোনাল্‌ডের কম্রেড এবং ইড্‌রিশের প্রেমিকা। এই ডিয়নের চরিত্র এত ভালো ফুটেছে তার কারণ বোধ হয় অনেক স্থলে তাতে লেখিকার আপনার ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত হয়েছে।

উপন্যাসের যে সমগ্র অধ্যায়টী সোভিয়েট রাশিয়ার কার্য্যাবলী বর্ণনায় উৎসৃষ্ট হয়েছে, সেটী আমাদের মনঃপূত হল না। স্বদেশী ও বিদেশী মনীষীদের লেখায় যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা যেন ভিন্ন ধরণের। কারণ তাঁদের দৃষ্টিকোণ শ্রীমতী মিচিসনের থেকে স্বতন্ত্র। শ্রীমতী মিচিসন, আমার মনে হয়, সেই জাতীয় সোশ্যালিষ্ট যাঁদের কাছে রাশিয়া হল হজের সামিল। সেই জন্যে বোধ হয় কয়েক স্থলে তিনি সোভিয়েট রাশিয়াকে স্থূল রকমের foil হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যে-যৌন স্বাধীনতার মূলমন্ত্র তাঁর মনকে অধিকার করে আছে তারি সাফল্য প্রমাণ করবার জন্যই যেন তিনি গুটীকয়েক অবাঞ্ছনীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। গল্পের মধ্যভাগে দেখা যায়, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই রাশিয়ায় যেতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। প্রথমে গেলেন স্ত্রী, তাঁর দেশে ফিরে আসার কিছু আগে গিয়ে পৌঁছোলেন টম গ্যালটন। তাঁরা পরস্পরের কাছে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে আত্ম-পরীক্ষায় সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং তারি ফলে টম্ স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ওক্‌সানার সঙ্গে কিছুকাল একত্র বসবাস করে দেশে ফিরলেন। সেখানে তাঁরা দুজনে যা দেখলেন, তার মধ্যে অধিকাংশই যৌন সম্বন্ধীয়, জন্ম-শাসন-সম্পর্কিত চিকিৎসালয়গুলি। দেশে ফিরে এসে তাঁরা কম্রেড হলেন এবং একদা চারটী সন্তানের জননীও দ্বিচারিণী হলেন। এর পরের ঘটনা সন্তান-

সম্ভাবনা। এই রকম আরো অনেক ঘটনা বা দৃশ্য আছে যেগুলি কৃত্রিম ও আনুষঙ্গিক, উপন্যাসের মধ্যে যাদের স্থান ইচ্ছাকৃত জোরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মোট কথা, রাশিয়া দেশটা তাঁদের কাছে বেশ স্ফূর্তির জায়গা, যেখানে কাজও হয় আবার অবাধ স্বাধীনতা আছে, এক কথায় Scotland without John Knox। গল্পের শেষ ভাগে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে বিদ্রোহের ফলাফল চিত্রিত হয়েছে। এবং পরিশেষে, অনতিদূর ভবিষ্যতে কাউন্টার রেভলুশ্যনরূপী আগামী বিপদ ফ্যাসিজ্‌ম আন্দোলনের সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে।

বইখানিতে ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতার সুর আছে। কারণ শ্রীমতী মিচিসন অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আপনার মতবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে বিলাতের রাষ্ট্রিক অবস্থাই এই উপন্যাসের সামাজিক পরিস্থিতি। এ ধরণের উপন্যাসের ন্যায়-সঙ্গত সমালোচনা একটু কঠিন। এ খাঁটি সাহিত্য নয়, আবার পুরোপুরি ইতিহাসও নয়। যেহেতু বিশুদ্ধ ঐতিহাসিকের নিঃসম্পৃক্ত মন লেখিকার নেই। যে-বিচ্ছিন্ন অথচ নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য থাকলে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা যায়, তার অভাব এই সময়োপযোগী বইখানির অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। এই বইয়ের স্বপক্ষে বলবেন তাঁরা, যাঁরা সমাজতন্ত্রে গভীর আস্থা রাখেন, অথবা অগ্রগতি তরুণ সম্প্রদায়, যাঁরা বন্ধনহীনতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলে স্বীকার করেন। আবার এ ধরণের উপন্যাসের বিপক্ষেও অনেক কথা বলা যায় এবং এর সুন্দর, পাল্‌টা জবাব হল "আর্টিষ্টস্ ইন্ য়ুনিফরম্।"

আর একটি মজার কথা। বলশালী ব্যক্তিত্বসত্ত্বেও উপন্যাসের নায়িকা মধ্যে মধ্যে দিবা-স্বপ্ন দেখেন। যখনই সংঘ ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় তাঁর স্নায়ু উৎপীড়িত হয়, তখনই তিনি নানাবিধ বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেন। তার মধ্যে বেশির ভাগ জন্তু-জানোয়ার নিয়ে, বিশেষ করে হাতীর। এই হস্তিচিত্র প্রচ্ছদপটে অঙ্কিত আছে; বলা বাহুল্য সেটী রূপক। তবে এই সূত্রে একটা কথা মনে পড়ল। কোনো এক বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্, যিনি পরম রসিক ছিলেন সন্দেহ নেই, মন্তব্য করেছিলেন যে women and elephants never forget an injury। গ্রন্থকার এবং ইতিহাসের দেবতা উভয়েই নারী, এ কথা স্মরণ রাখার যোগ্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে যে সব উপন্যাস রচিত হ'ত, সেগুলি অধিকাংশই যুদ্ধের পরবর্ত্তী অবস্থা নিয়ে লেখা। যুদ্ধ-প্রত্যাগত যুবকদের ভগ্ন মন ও ভবিষ্যৎ, তাদের গভীর নৈরাশ্য ও জীবনকে উপভোগ করবার তীব্র লিপ্সাই ছিল আখ্যান-বস্তু। তার পরের যুগে অন্য ধরণের উপন্যাস রচিত হচ্ছে, তাতে থাকে সুকঠিন জিজ্ঞাসার চিহ্ন। লীগ্ অফ্ নেশন্‌স-এ বীতরাগ সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিরোধ-পীড়িত মানব-জীবনকে উন্নত, সহজ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করবার প্রয়াস তাতে লিপিবদ্ধ হচ্ছে। সেই হিসাবে নায়োমি মিচিসনের বই সর্ব্বতোভাবে যুগধর্ম্ম মেনে চলেছে।

প্রিচেটের বইও আধুনিক কালের সৃষ্টি। তাতে কোনো বিশিষ্ট রাষ্ট্রিক মত পরিব্যক্ত

হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর উপন্যাস পড়লে আমরা বেশ মার্জ্জিতরুচি খাঁটি ইংরেজ লেখকের মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। নায়োমি মিচিসনের বইএর পাশে প্রিচেটের উপন্যাসখানি এক হিসেবে আরো উপভোগ্য। অর্থাৎ খুব উঁচু দরের রচনা না হলেও এটী উপন্যাস বটে। বইখানিতে গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার পরিচয় বিশেষ রকমের না পাওয়া গেলেও তাতে আধুনিকতার ছাপ আছে এবং মানবতার স্পর্শ আছে। একটী চামড়ার কারখানাকে কেন্দ্র করে গুটী কয়েক মানব চরিত্র অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং গল্প বলার ভঙ্গীতে ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে বইখানি সমৃদ্ধ, একথা স্বীকার করতে হয়।

বাটলার্স এণ্ড নামক জায়গাটীতে একটী চামড়ার কারখানা হ'ল উপন্যাসের ঘটনাস্থল। এই ট্যানারীটী মিঃ পেটওয়ার্থ অতি যত্নে গড়ে তুলেছিলেন। আপনজন বলতে তাঁর ছিল এক মেয়ে —হেনরিয়েটা, আর তাঁর স্ত্রী। জিওফ্রে ছিল তাঁর আশ্রিত ও আত্মীয় যুবক এবং অনেকটা ঠিক ছিল যে স্বত্বাধিকারীর অবর্ত্তমানে সে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ম্যাথু বার্কল্ নামে আর একটি যুবক সেই কারখানায় কাজ করত। উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে এই ম্যাথু। বিলাতের একটী প্রাদেশিক কোণে এই চামড়ার কারখানাকে কেন্দ্র করে ম্যাথু তার আশা ভরসার জাল বুনে চলে। বাল্যকাল তার সুখে কাটেনি; পিতার শাসনদণ্ড ও তাঁর মেজাজে সে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকত। যৌবনের প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সে মানবচরিত্র বুঝতে ও জানতে শিখলে। জিওফ্রে ও হেনরিয়েটা ছিল তার কাছে প্রভুজাতীয় উচ্চস্তরের জীব, কাজেই তাদের কাছে অসঙ্কোচ মেলামেশা ও সহানুভূতি পেয়ে তার মনে একটী উচ্চাশা পুষ্টিলাভ করতে লাগল। এই নিরীহ যুবকটীর জ্ঞানোন্মেষ, বিশেষ করে স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে, হোল উপন্যাসের প্রথমাংশের বিষয়বস্তু।

ম্যাথুর মনে যখন বিষয়বুদ্ধি জাগরিত হল, তখন থেকে তার চেষ্টা সুরু হল কি করে এই সমগ্র ব্যবসায়টীকে সে করতলগত করবে। তার প্রধান অন্তরায় ছিল জিওফ্রে। সর্ব্বদাই ভয় হত কোনদিন এরা দুজনে বিবাহ করে তার অনেকদিনের সঞ্চিত আশা ভরসা ধূলিসাৎ করে দেবে। কিন্তু প্রথমটায় দেখা গেল, অদৃষ্ট তার সুপ্রসন্ন। জিওফ্রে ছিল বিলাসী ধরণের যুবক, হেনরিয়েটাকে সে বোনের মতই স্নেহ করত। তার সঙ্গে প্রেম করে বিবাহিত জীবন যাপন করার কথাটা তার খেয়াল হয় নি, যদিও হেনরিয়েটার প্রথম যৌবনের আদর্শ অনেকটা তাকে ঘিরেই রচিত হয়েছিল। জিওফ্রে ছিল সেই জাতের লোক, যারা জীবনে চিরস্থায়ী শান্তি, বিশ্রাম অথবা স্থিরতা খুঁজলেও পায় না। তার চরিত্রের মধ্যে ছিল অনেক দুর্ব্বলতা, এক-নিষ্ঠতার অভাব তার মধ্যে অন্যতম। জীবনকে সে পুরোপুরি গ্রাস করতে চায়, যা পায় তাই দুহাত দিয়ে প্রবল বাসনাভরে টেনে নেয়। মুহূর্ত্তপরে সে উন্মাদনা নির্ব্বাপিত হলে, তাকে দূরে ঠেলে দেয়। অগ্নিগর্ভ সমুদ্রের সঙ্গে তার চরিত্রের তুলনা চলে, যেমনি অশান্ত, তেমনি বিপজ্জনক। সমস্ত বইখানির ভেতর জিওফ্রেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে রাখে। এই বিরোধী

মনোভাবের দ্বন্দ্বে গড়া মানুষটী যে এই মুহূর্ত্তে জীবনীশক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও প্রাণবান, অপর মুহূর্ত্তে অবসাদগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত—অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। একটী মেয়ের সঙ্গে প্রেম জমবার আগেই জিওফ্রে দেশত্যাগ করলে এবং ফ্রান্সে গিয়ে আত্মগোপন করলে। অসুস্থ শরীর নিয়ে বায়ু পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে সে খবর পেলে তার একটী বোধশক্তিহীন সন্তান হয়েছে। এ সন্তানটী যেন তার কষ্টপীড়িত জীবনের প্রতীক, ঠিক কারণ নয়। ফ্রান্সে গিয়ে সে নূতন জীবন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোল। এমন সময়ে বাধল যুদ্ধ। খেয়ালী মনে জেগে উঠল স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা। ফরাসী দেশের প্রতি তার রোম্যাণ্টিক আকর্ষণ কাটিয়ে উঠে যুদ্ধে যোগদান করাই সে স্থির করলে। কিন্তু সৈনিক হওয়া তার ভাগ্যে ঘটে উঠল না। তার ভগ্ন শরীরের জন্য সে এ্যাম্বুলেন্সের কাজ নিলে। যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে তার মনে এল গভীর নৈরাশ্য ও আদর্শচ্যুতি। হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা করে জটিল জীবনের একটা সমাধান করবার বাসনায় সে ফিরে এল স্বদেশে।

জিওফ্রের বিলাত থেকে চলে যাওয়াতেই হল ম্যাথুর মস্ত সুযোগ। ধীরে ধীরে সে তার কাজ নিয়ে অগ্রসর হল। অত্যন্ত চতুর ভাবে সে হেনরিয়েটাকে বশ করলে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ট্যানারীতে সে হয়ে পড়ল সর্ব্বময় কর্ত্তা, কোনো কাজই তার পরামর্শ ভিন্ন চলে না। কারখানার মালিক হেনরিয়েটা পরিচালনার ভার ম্যাথুর ওপর ন্যস্ত করে দিয়ে আপন জীবন ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে বসল। জিওফ্রের অনুপস্থিতিতে হেনরিয়েটা একটি স্থিরভিত্তি সম্বল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ম্যাথু অতি সন্তর্পণে নিজেকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করলে। তার আচারে ও ব্যবহারে মনে হত সে হেনরিয়েটাকে ভালোবাসে, যদিও ইতিমধ্যে সে ডরোথিকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি, এমন কি প্রেম জ্ঞাপন করে, সে মেয়েটীকে বশ করবার চেষ্টায় লেগে গেল। হেনরিয়েটার প্রতি ম্যাথুর আকর্ষণটা একটু অস্বাভাবিক রকমের। সে তাকে কোনোদিন দৈহিক অধিকার করতে চায়নি, কারণ মনে মনে সে তার সর্ব্বস্বটাই গ্রাস করে বসেছিল। হেনরিয়েটা ছিল তার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাকে বাদ দিয়ে কোনো কাজ করা তার কল্পনার বাইরে। তার জীবনের প্রতি আচরণ ও উদ্দেশ্য হেনরিয়েটার চারপাশে জাল রচনা করে আছে। ফ্যাক্টরীর উন্নতি, সংস্কার, ব্যবসা-বৃদ্ধি, প্রত্যেক কাজ শুধু যে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে, এ কথা ভাবলে ম্যাথুর চরিত্রের প্রতি সুবিচার হবে না। হেনরিয়েটা এক হিসাবে তার আদর্শ স্থানীয়। সে হল তার অনুপলব্ধ জীবনের রূপক বিশেষ, এ ছাড়া আর অন্য সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যে আদর্শের প্রতি তার অপরিসীম আসক্তি, যে কর্তৃত্ব ও অধিকারে তার প্রবল অনুরাগ অথচ নাগালের বাইরে, তারই প্রতিনিধি হচ্ছে এই প্রভু-কন্যা। কাজেই গূঢ়তম স্বার্থের খাতিরে ম্যাথু চেষ্টা করতে লাগল যেন হেনরিয়েটার বিবাহ না হয়। প্রথমে এল এক অপরিণত তরুণ, এরিক মে, তারপর এল রবিন্‌সন—যোদ্ধা, ইঞ্জিনীয়ার ও কেমিষ্ট। হেনরিয়েটা স্বাধীন জেনানা—এরিক্ মের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে সে প্রস্তুত

ছিলো বটে; কিন্তু ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সে ইচ্ছা প্রতিহত হলে সে রবিন্‌সনের অঙ্কশায়িনী হল। ম্যাথুর উচ্চাশা ইতিমধ্যে অনেকটা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। জেনারেল ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সে কারখানার অনেক উন্নতি সাধিত করেছে এবং প্রচুর উপার্জ্জন করেছে। এখন কী উপায়ে কারখানার সমস্ত স্বত্ব তার হস্তান্তরিত হয়, সেই চেষ্টায় সে উদ্‌ব্যস্ত হয়ে উঠল। অনেকটা সাফল্যের দিকে এগিয়েছে, এমন সময়ে এল জিওফ্রে। জিওফ্রের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাথুর মনে পরম উদ্বেগের স্থষ্টি হোল। প্রভুকন্যার কাছে সে বন্ধুর বিরুদ্ধে সুবিধা পেলেই মন্তব্য করত।

কিন্তু বিপদ এল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জিওফ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে হেনরিয়েটা স্থির করলে যে ব্যবসাটী স্বার্থলিপ্সু ম্যাথুর কাছে বিক্রী করা হবে না এবং সে বিয়ে করবে রবিন্‌সনকে। গ্রন্থের আখ্যানভাগের শেষাংশটী অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে। ম্যাথুর প্রলোভন, তার কৌশল, তার অবনতি—সব কটী মিলে নাটকীয়তার প্রচুব উপাদান স্থষ্টি করেছে। কিন্তু কেবল এই নাটকীয়ত্বের জন্যে বইখানির প্রশংসা করি না। যে ভাবে প্রিচেট্ নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অপরাপর চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন, মানব-হৃদয়ের গোপন ও অন্ধকার দিকগুলো উদঘাটিত করেছেন তাতে তাঁর শক্তির পরিচয় পাই। ম্যাথুর চরিত্র সত্যকারের স্থষ্টি। তার বিবেক বুদ্ধি ও তার নীচতা, তার সর্ব্বগ্রাসী অধিকারলিপ্সা ও শিশুসুলভ ভীরুতা তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যদান করেছে। তবে উপন্যাসখানি শুধু নেশায় পাওয়া মানুষের চরিত্র-চিত্রণ নয়, এখানি প্রসঙ্গত সাধারণ জীবনের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা বলাও চলে।

অবশ্য একথা ঠিক যে প্রিচেটের বই কিছু যুগান্তকারী স্থষ্টি নব। সাধারণ ও সুপাঠ্য উপন্যাসের মধ্যেই একে পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। প্রিচেট হলেন ন্যু ষ্টেটসম্যানের নিয়মিত লেখক এবং পুস্তক সমালোচক। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি নতুন নেমেছেন, একখানি বই থেকে তাঁর ভবিষ্যৎ নিরীক্ষণ সম্ভবপর নয়। তবে যে ভাবে তিনি megalomaniaকে স্পিরিচুয়্যাল সাধনায় রূপান্তরিত করেছেন, তাতে মনে হয় যে তিনি লিখতে জানেন এবং সেই অনতি-উৎকৃষ্ট, শান্ত ও সংযত রচনাশক্তির অর্থবোধ সহজ ও সুস্পষ্ট।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Thomas More—by R. W. Chambers (Jonathan Cape)

অত্যল্প-সংখ্যক যে-কয়েকজন লোক ইংরাজরাজ অষ্টম হেন্‌রির যথেচ্ছাচার মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, স্যর টমাস্ মোর তাঁদের মধ্যে প্রধান। মধ্য যুগের সার্ব্বভৌম ক্যাথলিক্ সমাজের ঐক্য ধ্বংস হবার ভয়ে তিনি দেশীয় ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে পোপের বদলে দেশ-শাসকের অধ্যক্ষ হ'বার নূতন দাবী কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন নি এবং সেই মর্ম্মে কোনও শপথ তিনি

গ্রহণ না করাতে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। এক্ষেত্রে ক্যাথলিক্ মহলে তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠা তদবধি পূজা পেয়ে আসবে এ' ত' স্বাভাবিকই ; কিন্তু ইংরাজ প্রটেষ্টাণ্টেরাও বরাবর তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন। এই কারণে যে তাঁদের মতে তিনি মানুষের চিন্তায় স্বাধীনতার জন্য অসীম সাহসে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পেরেছিলেন। তাই টমাস্ মোর মাতৃভূমির কৃতীসন্তানদের মধ্যে গণ্য হয়ে এসেছেন আর তাঁর জীবনীগুলির সংখ্যাও অল্প নয়। তবুও মোরের অনেক লেখা এতদিন পর্য্যন্ত পাঠক সমাজে প্রায় অপরিচিত ছিল ; তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় লাভের পথে আমাদের এ-যুগের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনেকখানি সাহায্য করে এ-বিশ্বাসও সম্ভবতঃ যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি ভাষার অন্যতম অধ্যাপক চেম্বার্স্, গত বৎসর টমাস্ মোরের মৃত্যুর পর চার শতাব্দী পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে, যে-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, সম-সাময়িক সাহিত্যে তার একটি বিশেষ সম্মানের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

টমাস মোরকে মহাপুরুষ নামে অভিহিত করা বোধ হয় নিতান্ত অন্যায় হয় না। ইউটোপিয়া নামক এক কল্পিত রাজ্যের বর্ণনা তাঁর সর্ব্বপ্রধান রচনা ; এর প্রভাব ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এর বহু অনুকরণের মধ্যেই প্রকাশ, উইলিয়াম্ মরিস্ প্রভৃতি অনেকে এ গ্রন্থের নিকট প্রভূত ঋণী, এখনও এক জাতীয় সোশ্যালিজমে মোরের চিন্তাধারার ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে যে-হিউম্যানিষ্ট্ লেখকেরা ইয়োরোপে বিদ্যমান ছিলেন, মোর তাঁদের অন্যতম ; সে-দলের প্রধান রত্ন ইর্যাস্‌মস্ তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও পরম ভক্ত ছিলেন ; ইংল্যাণ্ডে মোরের মতন পণ্ডিত, গুণী ও লেখক নিতান্ত দুর্লভ। মানুষ হিসাবেও তাঁর নির্ম্মল চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার, সহৃদয় অনুকম্পা, অবিচলিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর সুবিচারের খ্যাতি ঘোর-প্রটেষ্টাণ্ট লণ্ডন নগরীতে পর্য্যন্ত বহুদিন অক্ষুণ্ণ থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হাউস্ অব্ কমন্স সভায় স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার সভাপতির আসন থেকে মোরই প্রথম নির্ভীকভাবে দাবী করেন। যে স্বার্থপর নিরর্থক যুদ্ধ বিগ্রহ তখন পশ্চিম ইয়োরোপকে ক্ষতবিক্ষত করছিল, তিনি তার বিরোধী ও আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্মমতের জন্য উচ্চ রাজপদ ত্যাগ করলেও তিনি রাষ্ট্রশক্তির প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা দেশে অন্তর্বিরোধ আনতে চান নি ; অথচ রাষ্ট্রের পক্ষে কোনও লোককে তার বিবেক-বিরোধী শপথ গ্রহণের আদেশ নিতান্ত অন্যায় জ্ঞানে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে' নিয়েছিলেন। সফক্লিস্ এণ্টিগোণি নাটকে যে-সমস্যা তুলেছিলেন, সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্রের দাবীর সামনে মানুষের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মোরের প্রাণদান আমাদের তাব কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

টমাস্ মোর সম্বন্ধে স্মরণীয় এ-সমস্ত কথাই অধ্যাপক চেম্বার্স্ অতি নিপুণভাবে তাঁর সুখপাঠ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। সারগর্ভ আলোচনা যে কত প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা সম্ভব তার সুন্দর উদাহরণ আলোচ্য বইখানির ১২১ থেকে ১৪৪ পৃষ্ঠা। তাছাড়া চেম্বার্স অনেক নূতন কথা লিখে মোর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধিও বাড়িয়েছেন। ডক্টর রীডের গবেষণার ফলে জানা

গেছে যে ইংরাজি নাটকের আদি যুগের সঙ্গে মোরের কিছু যোগ ছিল; মোরকে এখন আর শুধু শক্তিশালী গদ্যলেখক হিসাবে দেখলে চলবে না। সম্প্রতি এ কথাও আমরা জানতে পেরেছি যে উত্তর এমেরিকায় নবাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ জনবিরল ভূখণ্ডে উপনিবেশ গঠনের সংকল্পে মোরের উৎসাহ ছিল; এমন কি জার্ম্মান্ ঐতিহাসিক অন্‌কেন্ তাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রদর্শক-রূপে কল্পনা করেছেন, যদিও চেম্বার্সের মতে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থেকে খৃষ্টীয় ইয়োরোপের ঐক্যের আদর্শই টমাস্ মোরকে বেশী আকৃষ্ট করত। তারপর চেম্বার্স্ দেখিয়েছেন যে অষ্টম হেন্‌রির কৃতিত্বের খ্যাতি কতখানি অমূলক, তাঁর যুদ্ধলিপ্সা ও অত্যাচার ইংল্যাণ্ডের কত ক্ষতি করেছিল; ইর‍্যাস্‌মস্ ও মোরের দল যে-স্বর্ণযুগের কল্পনা করছিলেন, হেনরি তা' সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন। টমাস্ মোরের মানসিক দ্বন্দ্বের জগতেও চেম্বার্স্ আমাদের নিয়ে যেতে পেরেছেন; পাঠকমাত্রের স্মৃতিতেই আমাদের বিশ্বাস তিনটি চিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—যুবক মোর যেখানে সংসারে প্রবেশ করবার আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন কিনা ভাবছেন, প্রৌঢ়াবস্থায় যেখানে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ত্তব্যবোধে রাজকার্য্যে আত্মনিয়োগ করলেন, আর সাতান্ন বছর বয়সে যখন তিনি সামান্য মিথ্যা আচরণের বিনিময়ে নিজের প্রাণরক্ষা করতে সম্মত হলেন না। সক্রেটিসের মৃত্যুর সঙ্গে মোরের শেষ অবস্থার সাদৃশ্য অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

টমাস্ মোরের যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার মধ্যে মতামতের একটা অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে বহুদিনের প্রচলিত ধারণাকে অপ্রমাণ করাই আমার মনে হয় অধ্যাপক চেম্বার্সের প্রধান কীর্ত্তি বলে গণ্য হবে। বিশপ বার্ণেট থেকে আরম্ভ করে ফ্রুড, ক্রাইটন্, সিডনি লি, এমন কি ক্যাথলিক য়্যাক্টন্ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক মহারথিগণ বলে গেছেন যে ইউটোপিয়ার আদর্শের সঙ্গে পোপের প্রভুত্ব অস্বীকার না করে মৃত্যুবরণের কোন মিল নেই; মোর নাকি শেষ জীবনে আগেকার উদার মতবাদ ত্যাগ করে গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়েছিলেন। এ বিশ্বাস কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট সংস্কার ও একদেশদর্শিতার প্রমাণ মাত্র। মোরের বীরত্ব ইংরাজ প্রটেষ্টাণ্টদের এত মুগ্ধ করেছিল যে তাঁরা ভাবতে ভালবাসতেন যে তিনি অন্ততঃ এক সময় তাঁদেরই একজন ছিলেন এবং ১৫১৬ সালে লিখিত ইউটোপিয়াই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। চেম্বার্স দেখিয়েছেন যে ইউটোপিয়ার অর্থ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, সুতরাং মোরের পরিবর্ত্তন কল্পনা মাত্র। ইউটোপিয়ার বর্ণনা আদর্শ রাজ্যের কাহিনী নয়। মধ্যযুগে পণ্ডিতদের মত ছিল যে অখৃষ্টান লোকের পক্ষেও চারটি মহাগুণ (Cardinal Virtues) সম্ভব, হেলেনিক্ যুগে মহাপুরুষদের চরিত্রে এগুলি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রকৃত খৃষ্টানের এ চারিটিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, আরও তিনটি গুণ আয়ত্তে আনাই তাঁদের আদর্শ। অর্থাৎ উচ্চতম সাধনাই খৃষ্টধর্ম্মের সার্থকতা কিন্তু কিছু নিম্নস্তরের সাধু-জীবন অখৃষ্টানদের আয়ত্তে আছে; এর প্রথমটির ভিত্তি হচ্ছে Revelation, দ্বিতীয়টির Reason। তাই দান্তের স্বর্গরাজ্যে পথপ্রদর্শক প্রথমে কিছুদূর পর্য্যন্ত অখৃষ্টান ভার্জিল কিন্তু শেষে শুধু তাঁর খৃষ্টীয় সঙ্গিনী। ইউটোপিয়া রাজ্য নিম্নস্তরের—যেখানে সাধারণ বিচারবুদ্ধি ও প্রথম

চারটি মহাগুণ সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু যীশুর ধর্ম্ম সেখানে পৌছায় নি। যে-মোর সর্ব্বদা তাঁর পরিচ্ছদের নীচে hair-shirt পরে' সারাজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন তাঁর কাছে ইউটোপিয়া কল্পনার রাজ্য, কিন্তু চরম আদর্শ নয়। তিনি এই বল্‌তে চেয়েছিলেন যে শুধু বিচারবুদ্ধি দিয়ে মানুষ যদি এত ভাল সমাজ গঠন করবার কথা ভাবতে পারে তবে প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কত উন্নত হওয়া উচিত, অথচ সমসাময়িক ইয়োরোপের কি অধঃপতন হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের জন্য প্রাণদানের কিছুমাত্র অসঙ্গতি নেই; টমাস্ মোরেব পরিবর্ত্তন তাঁর সমালোচকদের বুঝবার ভুল ভিন্ন কিছু নয়।

চেম্বার্স্ দেখিয়েছেন যে ইউটোপিয়া বইখানিতে পরবর্ত্তী যুগের 'উদার' মতবাদের চিহ্নও প্রচুর নয়। সেই কল্পিত রাজ্যে ভগবানের অস্তিত্ব ও আত্মার অমরত্ব ছিল অবশ্য স্বীকার্য্য; মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকলেও অসামাজিক ও রাষ্ট্রবিরোধী মত প্রচার অবাধে হ'তে পারত না; সেক্ষেত্রে সমালোচককে নীরব রাখা, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত তার নির্ব্বাসন কিম্বা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাও ছিল। মনে রাখতে হবে যে মোর নিজেও অষ্টম হেন্‌রির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন নি; শপথ গ্রহণে অস্বীকার করে' তিনি শুধু নীরব থাকবার স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। ইউটোপিয়াতে পুরোহিতের সংখ্যা অল্প কিন্তু তারা প্রটেষ্টাণ্টদের মত রাষ্ট্রশক্তির ভৃত্য নয়। মেকিয়াভেলি ও তাঁর শিষ্য টমাস্ ক্রম্‌ওয়েল্ রাজার শক্তি অসীম হওয়া উচিত ভাবতেন; মোরের কল্পিত রাজ্যে এই নূতন রাষ্ট্রনীতি অস্বীকার করা হয়েছে। সে-যুগে নূতন আর্থিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হচ্ছিল; ইংল্যাণ্ডের গ্রামে গ্রামে যে যে জমি স্মরণাতীত কাল থেকে সাধারণের ভোগে নিয়োজিত ছিল, সে-সব enclosures এর ফলে অল্প লোকের হাতে চলে আস্‌ছিল; তার প্রতিবাদে তখনকার লোক-সাহিত্য মুখরিত। নবযুগের আর্থিক রীতিনীতি টমাস্ মোর একেবারেই সমর্থন করতেন না; বস্তুতঃ রেফর্ম্মেশন্ ইয়োরোপে যে-নূতন ব্যবস্থা আন্‌ছিল, মোরকে তার সমধর্ম্মী মনে করার কোন হেতু নেই।

অধ্যাপক চেম্বার্স্-এর ধর্ম্মমত কি আমি জানি না কিন্তু তাঁর লেখায় একটা বিশ্বাস বারবার প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। অল্প কথায় তাকে ক্যাথলিক্ দৃষ্টিভঙ্গী বলা যায়, তার অনেক নিদর্শন আধুনিক ইয়োরোপের চিন্তাধারায় প্রকাশ পাচ্ছে। রেনেসাঁসের মধ্যে অমঙ্গলের বীজ ছিল, রেফর্ম্মেশনের সময় ইয়োরোপীয় সভ্যতা ভুল পথে মোড় ফিরেছিল, ফরাসী বিপ্লব অতি শোচনীয় ও মারাত্মক ব্যাপার, মধ্যযুগের আদর্শে প্রত্যাবর্ত্তন মুক্তির উপায়— এই জাতীয় কতকগুলি ধারণা অস্পষ্টভাবে অনেকের মনে বিরাজ করে। ইতিহাসে মূল্য বিচার অতি কঠিন তাই ঐতিহাসিককে বাধ্য হয়ে একটা সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করতে হয়। বড় একটি যুগ ধরে' ইতিহাস-লেখকের তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান ধারা আবিষ্কার করা দরকার যার ফলে ইতিহাসের গতি বা ঝোঁক চোখে ধরা পড়ে। তারপর কোন্ ঘটনা বা ব্যক্তি সে-ঝোঁকের সাহায্য করেছে, কি-ই বা তার পরিপন্থী, এইভাবে আলোচনা করতে হবে। ইতিহাস

আসলে দ্বন্দ্বের কাহিনী অথচ প্রতিযুগে একটা যুগধর্ম্ম বা লক্ষ্য থাকা স্বাভাবিক। তাই টমাস্ মোরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও বলা সম্ভব যে তিনি অনেক বিষয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন, রেফর্ম্মেশনের গতিরোধ তখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। মোরের সমসাময়িক জার্ম্মানিতে তুমুল আন্দোলন সম্বন্ধে চেম্বার্স্ একটি কথাও বলেন নি কেন? ইংল্যাণ্ড কি ইয়োরোপের বাইরে ছিল, না লুথারের জীবনের সাধনা ও সংগ্রাম ছেলেখেলা মাত্র? ইয়োরোপের সকল দুর্ভোগের জন্য ধর্ম্মবিপ্লবকে দায়ী করাও উচিত নয়। লুথারের আগেই ফ্রান্স ও হ্যাপ্স্বার্গদের নিরর্থক যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল; ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের অবস্থা যে কত শোচনীয় হয়েছিল সে-কথাও মনে রাখতে হবে; বিনা বিপ্লবে সংস্কারের কোন চেষ্টা ত সফল হয় নি। ভবিষ্যতে স্বর্ণযুগ সম্বন্ধে মানুষ আশা রাখতে পারে কেননা ভবিষ্যৎ এখনও অনাগত। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কৃপায় অতীতের সত্যযুগ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখা শক্ত। ইয়োরোপের মধ্যযুগের মধ্যেই আধুনিক তথা-কথিত অমঙ্গলের সূত্রপাত সহজেই দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে চেম্বার্স্ ইঙ্গিত করেছেন যে ক্যাথলিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সোশ্যালিজ্‌মের অন্তরঙ্গ মিল আছে, টমাস্ মোর শুধু ক্যাথলিক্‌দের নন, তিনি কমিউনিষ্টদেরও গুরু। মোর শ্রেণীশূন্য সমাজ চেয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাম্যবাদের অনেক পার্থক্য। মার্ক্সের যে-অন্তর্দৃষ্টি সোশ্যালিজমের প্রাণ, মোর কখনও তা' সমর্থন করতে পারতেন না। বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেই দুই মতবাদ এক বলা উচিত নয়। তাছাড়া ক্যাথলিক্ ও সোশ্যালিষ্টদের আদর্শে ও আচরণে মিল কোথায়? প্রথম দলের দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ, দ্বিতীয় দল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। ইতিহাসের ধারা ও রূপ দু'দলের মনে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজকের ক্যাথলিক্ বা ক্যাথলিক্ ভাবাপন্ন বুদ্ধিবাদীদের কালকের সঙ্কটের দিনে ফাশিষ্ট রূপ ধারণ করার সম্ভাবনাই বেশী।

শ্রীসুশোভন সরকার

Byron : The years of fame—
By Peter Quennell : (Faber & Faber)

আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে মানুষের ভেতর তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাই একটা দুশ্চেদ্য জোট ভালর সঙ্গে মন্দের, বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের। সদর্থক বা নঙর্থক কোনো বিশেষ নিরবচ্ছিন্ন রূপ মানুষের নেই। তাই মানুষ নানা বৈপরীত্যের মাহাত্ম্যে শুধু মানুষই। তার ওপর ভাল বা মন্দের মূল্যারোপণ অবান্তর। এটা রুসোর প্রবচন। উনবিংশ শতকের রোম্যাণ্টিক্‌রা এই মন্ত্রোচ্চারণেই উদ্বুদ্ধ। শাতোব্রিয়াঁ প্রমুখ পুরোহিতের দলও এই বুলি আওড়ে গেছেন অল্প বিস্তর। এবং এই সূত্রে চাইল্ড হ্যারল্‌ডের পূর্ব্বপুরুষ রুসো। কিন্তু আস্থা থাকে না এ আদর্শের ওপর

যখন দেখি, অপঘাত ও আত্মঘাতের মাত্রা তাতে বেড়েই চল্‌লো উত্তরোত্তর ; যখন দেখি এরিয়েল-বাহন শেলীর পতন সমুদ্রে এবং দেশত্যাগী বায়রণের পরিণামহীন ভ্রষ্টাচার ও অকাল প্রয়াণ। অতঃপর বায়রণের জীবন-নাট্যে রুসোকে এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আপাততঃ আমাদের বায়রণের জীবনীই বিশেষভাবে আলোচ্য এবং দৃষ্টতঃ বায়রণই ঊনবিংশ শতকের রোম্যান্টিক যজ্ঞের প্রধান বলি।

ক্লাসিসিষ্টরা কিন্তু মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মানতেন না। তাঁরা হয়েছিলেন প্রজ্ঞার শরণাপন্ন এবং তার আশ্রয়ে হয়ত করতে পেরেছিলেন সুষ্ঠু সমন্বয় জীবনের নানা শাখা প্রশাখার। অন্ততঃ একটা কাল্পনিক সমাহিতি ও শান্তি তাঁদের কাম্য ছিল। রুসো বঞ্চিত করলেন মানুষকে এ বেহ্বামী অধিকার থেকে। তিনি প্রাধান্য দিলেন সংপ্লবকে, অঘটনঘটনপটীয়সী জীবনী-শক্তিকে, একটা মিথ্যা প্রশান্তির চেয়ে। বল্লেন এই লোকোত্তর প্রশান্তির অসম্ভব ভণ্ডামীর চেয়ে সংপ্লব সংঘর্ষ ও রক্তপাতও কাম্য। তাই বলছিলাম ঊনবিংশ শতকের পতনের মূলে রুসো। অবশ্য শুধু পতনের দায়িত্বই তাঁর নয়। রোম্যান্টিকদের ঐশ্বর্য্য ও অভ্রংলিহ মিনারের মূলেও তিনি।

বায়রণকে রুসোর গোত্রে বিচার্য্য। এই গোত্রের অনেক কৃতী পুরুষকেই দেখতে পাই বিধাতার হাতে অসহায় শিশু। বায়রণও ছিলেন তাই। এই মাতৃদ্বেষী শিশু যে পরবর্তী প্রিয়া-বহুল জীবনে অমোঘ মাতৃ-স্পর্শ খুঁজে ফিরবে এটাও বিধাতার অভিপ্রেত।

কিন্তু বায়রণের জীবনের যৌনতা, স্বকাম, অদৃষ্টবাদ, পৌরুষ, স্ত্রৈণতা প্রভৃতি বিসদৃশ আপাত-বিষম বৃত্তিগুলি সুবিচার পায় নি তাঁর জীবনী-লেখকদের হাতে। অন্ততঃ টমাস মূরের বন্ধুকৃত্য ও তাৎকাল্যের ওপর ভরসা থাকা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কাব্যধ্বজী মূরের অর্ঘ্যে, বায়রণের প্রেতাত্মা তৃপ্ত হয়েছেন কিনা বলতে পারি না, আমরা বায়রণকে ঠিক ভুল বুঝেই চলেছি। এতদিনে বোধ হয় বায়রণ পরিত্রাণ পেলেন পিটার কোয়েনেলের হাতে। বায়রণের জীবনের আপাত বৈষম্য ও বৈপরীত্যের সুযুক্তি ও সুবিচার খুঁজে পাওয়া গেল। সাক্ষী স্বরূপ বায়রণের ও বায়রণ সংক্রান্ত অনেক প্রামাণিক চিঠি ও ডায়েরী হাজির করা হয়েছে কাঠগড়ায়। এবং এটা সুনিশ্চিত, তথাকথিত প্রাড়্‌বিবাকদের ভ্রূকুটির সামনে এ-গুলোর ভিত্তি দৃঢ় ও সুস্পষ্ট। এ বিষয়ে কোয়েনেলের গবেষণামূলক অধ্যবসায় ও পরিশ্রম যথেষ্ট প্রশংসনীয়। অন্ততঃ পিটার কোয়েনেল এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে বায়রণের কাব্যবস্তু যাই হোক, তার জীবনকে হাল্‌কা ও অন্ধ ভাবে বোঝার চেয়ে, গভীর ভাবে তলিয়ে বোঝার ফলে আমরা লাভবানই হব। সেটা করতে গেলে লঘুপক্ষ মানস-সরোবরচারী আঁদ্রে মোরোয়া বায়রণের যে লোকপ্রিয় বেপরোওয়া নায়কীয় মূর্ত্তি আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাকে ভাল করে ভুলতে হবে। জানি ভোলা সহজ নয়।

ইতিপূর্ব্বে বায়রণের জীবনের আসল ও মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। এবং তার

সম্বন্ধে অনেক দরকারী সত্য ঘটনাই অনাবিষ্কৃত ছিল। পরিশ্রমী কোয়েনেলের কৃপায় জানা গেল বিধর্ম্মী নিরীশ্বরবাদী বায়রণের জীবনের আভ্যন্তরীণ গতি পরমার্থের দিকে এবং তাঁর অনেক চর্য্যাই ধর্ম্ম। বায়রণ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকলেও এটা বেশ টের পেয়েছিলেন, কোনো একটা লোকাতীত অমোঘ শক্তি তাঁকে চালিত করছে জীবনের বিচিত্র পথে। এবং তিনি তার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এই সমর্পণেই ক্যালভিনিষ্ট বায়রণের চরিত্র গভীরতা পেলো। তাঁর বাহ্যিক প্রাগল্‌ভ্য ও শয়তানসুলভ বিদ্রোহ বুঝতে দেয় না যে তিনি আজীবন খুঁজে ফিরেছেন একটা পথ যা নিয়ে যাবে শান্ত ও সুস্থ গার্হস্থ্য আশ্রমের দিকে। অন্ততঃ লেডী হল্যাণ্ডের উৎসবমুখর হট্ট-মন্দিরের দিকে নয়। তাই তিনি লেডী ক্যারোলিনের উদগ্র ও বিষাক্ত প্রেমকে এড়িয়েই গেলেন। কিন্তু শান্তি পাবার অধিকারী তিনি ন'ন্। কারণ তাঁর নিজের ভেতরেই দেখতে পাই সাহজিক আত্মরক্ষণশীল প্রবৃত্তির সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ আত্মঘাতী বিপরীত শক্তির। তাই, পাপী বা উচ্ছৃঙ্খল হবার এবং দুঃখ পাবার একটা অপরিহার্য্য প্রয়োজন বায়রণ নিজের জীবনে বোধ করতেন। যেন এই নরকীয় অধঃপতনের মূলে একটা চরম সার্থকতা আছে যা অন্য কোন উপায়েই উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। এই সূত্রে মনে পড়ে দুশ্চরিত্র বোদ-লেয়ারকে। অবশ্য বোদলেয়ারের প্রতিভার বিকাশ বা কাব্যাদর্শ হুবহু বায়রণী ধরণের না হলেও তার জীবনের সমস্যায় বায়রণের পতন স্মরণীয়; যে বায়রণের ধর্ম্ম, হিরণ্যকশিপুর।

দুঃখের বিষয় বায়রণের কাব্যসৃষ্টি উচ্চাঙ্গের নয়। মননসম্পদ বা পাণ্ডিত্যও তাঁর এমন কিছু ছিল না। বায়রণের কাব্যপ্রতিভা সাহজিক ও স্বাচ্ছ। কিন্তু এই কাব্যবস্তু থেকে বায়-রণকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। কারণ তাঁর সুশিক্ষার মূলে ছিল আত্মানুসরণের প্রয়াস। এই আত্মানুসরণের—যাকে বলা যেতে পারে self-dramatization--বিভিন্ন স্তরেই—চাইল্ড হেরল্ড, ডন জুয়ান বা ম্যানফ্রেডের অস্তিত্ব। এবং কোয়েনেলও বায়রণকে তাঁর কাব্যবস্তু থেকে অনেকখানি টেনে বের করতে সক্ষম হয়েছেন।—ডায়েরী বা পত্রাবলী ছাড়াও।

অশেষ ধন্যবাদ দিতে হয় গ্রন্থকারকে। কারণ বায়রণের জীবনের দিকে তাকিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার যে উপায় আছে এটা তিনি দেখিয়েছেন। তথ্যের দিক ছাড়াও অন্য কোন দিক দিয়ে কটু কাটব্য করার ফাঁক নেই। কারণ বইটা সুলিখিত ও সুধীজনভোগ্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র

Shakespeare's Imagery And What It Tells Us—by Caroline F. E. Spurgeon (Cambridge University Press)

কবি মাত্রেই উপমাপ্রবণ। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। মনে হয় বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আনুরূপ্যের উপলব্ধি অনুভূতিশীল চিত্তে যে গভীর আনন্দ-শিহরণের সৃষ্টি করে

তাহা যোগকথিত ব্রহ্মাস্বাদের সমগোত্র। এই ব্রহ্মাস্বাদের সঞ্চার কাব্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বা ফল বলিয়া স্বীকৃত। তাই বৃহৎ কবিরা উপমা প্রয়োগে অকৃপণ। সরলোপমা ও গূঢ়োপমা—প্রয়োজনমতো উভয়কেই তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কবিতায়—বিশেষ করিয়া মহৎ কবিতায় উপমা আমাদিগকে এমন ভাবে অভিভূত করে যাহার যথোপযুক্ত কারণ ন্যায়যুক্তি আবিষ্কার করিতে অক্ষম। দ্রষ্টা ও প্রবক্তার ন্যায় বড় কবিও জানেন—এ জ্ঞান তাঁহাদের মর্ম্মগত সংস্কারে প্রোথিত—যে জটিল ও বৃহৎ সত্য ভাষায় প্রকাশাতীত, মানব মনের গ্রহণযোগ্য ভাবে তাহা রূপায়িত হইতে পারে কেবলমাত্র উপমার সাহায্যে। ধ্যানলব্ধ মানসমূর্তি যেমন তক্ষণ-শিল্পীর প্রতিভা-প্রভাবে সর্ব্বাবয়ব হইয়া উঠিয়া সর্ব্ব লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, কবি মানসের স্বোপলব্ধ ভাবরাশিও তুলনা-তক্ষণের ইন্দ্রজালে পাঠক মাত্রের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্বাতন্ত্র্য ও স্পষ্টতা অর্জ্জন করে। জড় বাক্যরাশি প্রাণস্পন্দে শক্তিমান হইয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া লোকচিত্তকে আন্দোলিত আলোড়িত করিতে থাকে। ভাষায় এই প্রাণ-সঞ্চার, তক্ষণার দেদীপ্যমানতায় পদসংযোজনকে মন্ত্রের মতো অমোঘ অর্থ-সমৃদ্ধ করিয়া তোলা, কাব্যের মৌল প্রেরণা। ইহারই ন্যূনাধিক্য দিয়া, অনেকের মতে, কবিত্বের উপকর্ষ অপকর্ষ অবধারিত হইতে পারে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিলেও এই মাপদণ্ডের বিচারে, বলা বাহুল্য, শেক্সপিয়ার জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের শীর্ষস্থানীয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি বহু বর্ষ ব্যাপী অসাধারণ, বিস্ময়কর, একাগ্রনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের প্রথম প্রকাশিত ফল। শেক্স্‌পিয়ারের সমগ্র কাব্যগ্রন্থে যত সহস্র তক্ষণার নিদর্শন আছে, লেখিকা তাহা অবিশ্রান্ত আয়াসে একত্রিত করিয়া নানা বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ পর্য্যায়ে সাজাইয়াছেন। তুলনামূলক যে কোন উপায়ে সরলোপমা, গূঢ়োপমা, ব্যক্তিত্বারোপ প্রভৃতি কবির কল্পনা অথবা অভিজ্ঞতা পাঠকের বোধগম্য হইয়াছে, সে সমস্তই, লেখিকার মতে তক্ষণার অন্তর্ভুক্ত। এখানেও তাঁর ক্লান্তি নাই। শেক্স্‌পিয়ারের সমসাময়িক বিখ্যাত লেখকগণের অনেকের রচনাই তিনি এই প্রণালীতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যথা মার্লো, বেকন, বেন জনসন, চ্যাপম্যান, ডেকার, ম্যাসিঞ্জার। এই সুবিশাল আলোচনার অনেক তথ্য পাঁচখানি রঙীন চার্টে সজ্জিত হইয়া পুস্তকখানিকে সুশোভিত করিয়াছে।

-ভাবা অসম্ভব নয় স্বল্পধৈর্য্য ব্যঙ্গপ্রিয় কোনো পাঠক এখানে প্রশ্ন করিতেছেন—কি লাভ হইল ইথে ইত্যাদি? এই সুদুর্লভ সাধনার ফলে জ্ঞান-বৃক্ষের কোন অলব্ধ ফল এতদিনে নরলোকে আবির্ভূত হইল? দেখা যাক ইহার উত্তরে লেখিকার কি বক্তব্য আছে।

সার সিডনে লী, সার ই. কে. চেম্বার্স প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা পণ্ডিতগণের প্রভূত পরিশ্রম সত্ত্বেও ইহা অপ্রতিবাদ্য যে শেকসপিয়ারের নির্ভর-যোগ্য জীবন-চরিত অদ্যাপি রচিত হয় নাই। অধ্যাপক ওয়াল্টার রলি বলেন, প্রয়োজন নাই। কি প্রয়োজন আমাদের জানিবার শেকসপিয়ার কি ধরণে মাথায় টুপি বসাইতেন। শ্রীমতী স্পারজনও বলেন, প্রয়োজন নাই, যেহেতু উক্ত

কবি তাঁহার জীবন কাহিনী নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার কাব্যে ও নাটকে। শুনিয়া মনে হইতে পারে ইহা বুঝি লেখিকার ইচ্ছাকৃত বিপরীতোক্তি। শেকসপিয়ারের স্বেতরতা বিশ্ব-বিশ্রুত। কে না জানে তাঁহার মতো আত্মগুপ্ত কবি আর নাই। যখন যে চরিত্র তিনি আঁকিতে বসিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিত্বকে তাহার মধ্যে কোনো ক্রমে ফুটিয়া উঠিতে দেন নাই, কল্পনায় তাহার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন—ইহাই ত হইল শেকসপিয়ার সমালোচনার প্রথম ও প্রধান সূত্র। ইহা মানিয়া লইয়াও লেখিকা বিশ্বাস করেন, ফ্লবেয়ারের ভাষায়—বিশ্বে যেমন বিধাতা কাব্যেও তেমনি কবি, সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ অপ্রত্যক্ষ। লেখিকার ধারণা, এমন প্রণালী সম্ভব যাহা দ্বারা এই সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথচ অপ্রত্যক্ষ কবিকে জানা যায়; ও তাঁহার এই দাবী যে তিনি এমন একটি প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন।

তাঁহার মতে প্রত্যেক কবি স্বীয় অন্তরকে উদ্‌ঘাটিত করেন তক্ষণার প্রয়োগে। শেকসপিয়ারের বেলায় এ মত বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য কারণ, তাঁহার তক্ষণাবলী সযত্ন অনুসন্ধানের ফল নয়। প্রেরণার তাড়নায় যে চিত্র তাঁহার মানস মুকুরে প্রতিফলিত হইত, তাহাই তিনি তৎক্ষণাৎ ভাষায় রূপান্তরিত করিতেন। কাজেই নাটকীয় আত্মবিলোপে তাঁহার আত্মহত্যা ঘটে নাই, ঘটিয়াছে অজ্ঞাতসার আত্মপ্রকাশ। তাঁহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে যে সমস্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দ, আগ্রহ নিরীক্ষা, বিশ্বাস অবিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আবেগ-ব্যঞ্জনা সুপ্ত থাকিত, তাহারা নানা তক্ষণায় ভাষাশরীর লাভ করিয়া শেকসপিয়ারের ব্যক্তিস্বরূপকে লোকচক্ষুর আয়ত্তে আনিয়াছে।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লেখিকার উদ্দেশ্য শেক্‌স্‌পিয়ারের ব্যক্তিত্ব-নিরূপণ। এই জন্য তিনি বেকন মার্লো প্রভৃতির সহিত শেকসপিয়ারের তক্ষণার পার্থক্য বহুল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন। পরে আছে শ্রেণীবদ্ধ বিবরণ কত বিভিন্ন দিক হইতে শেকসপিয়ার তাঁহার তক্ষণাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে ও প্রাচুর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া লেখিকা পরে আঁকিয়াছেন শেকসপিয়ারের সংহত চিত্র। ব্যাজট ব্র্যাডলির পর এই চিত্রে বিশেষ কিছু নূতন আবিষ্কার চোখে না পড়িলেও, বর্ত্তমান বিজ্ঞানপন্থী প্রমাণাপেক্ষী যুগে ইহার বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, ইহার একটি রেখাও সাহিত্যানুরাগীর মর্ম্মমুদ্রণ মাত্র নয়; প্রত্যেকটি কথা, আদালতের দলিলের মতো, সাক্ষীসাবুদের দ্বারা সমর্থিত।

দ্বিতীয় খণ্ডে আছে আলোচনা, শেকসপিয়ারের শিল্পকলায় তক্ষণার স্থান সম্বন্ধে। সঙ্গীতে যেমন বাদীসুর ও তাহার সহায়ক স্বরবিন্যাস থাকে। লেখিকা দেখাইয়াছেন, শেকসপিয়ারের রচনায়,—হোক তাহা কমেডি কি ট্র্যাজেডি, রোমান্স কি ইতিহাস—সেইরূপ থাকে প্রত্যেক নাট্যে একটি দুটি প্রধান তক্ষণা ও তাহাদের সহায়ক তক্ষণাবলী। সেই জন্য তাঁহার নাটকে আছে একটি ভাবের পরিমণ্ডল যাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। লেখিকার রসবোধের ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় এই খণ্ডে মেলে। যেমন ধরা যাক, তাঁহার ম্যাকবেথ আলোচনায়। তাঁহার

মতো সজাগভাবে না পড়িলে শেকসপিয়ারের তক্ষণার প্রযোগনৈপুণ্য অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এ বিষয়ে লেখিকা আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছেন, এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৪৩

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

"পরিচয়ে"র ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনগুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের রচনার যত দিক দিয়া যত গভীর আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। এই প্রবন্ধে আর্টের দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রথম চারি পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র তিনটি চরিত্রের, গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী চরিত্রের সামান্য আলোচনা করিয়া প্রবন্ধকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শুধু আর্ট হিসাবে তাঁর এই সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত বইখানাও অসার্থক, "মানুষ...বঙ্কিমের হাতে যন্ত্রবদ্ধ", "তারা আসলে রাংতামোড়া পুতুল", "সাহিত্যের ভোজে তিনি আসল মানুষকে অনাচরণীয় বলে মনে করতেন", এমন কি "সন্ন্যাসই হ'ক, দেশাত্মবোধই হ'ক কোনটাতেই বঙ্কিমের আত্মার যোগ ছিল না" এবং "তাঁর সাহিত্য প্রায়শঃ শিল্প হতে পারে নি"। প্রবন্ধকারের মতে "কিসে জাতিকে বড় করে তোলা যায় এই হল তাঁর লক্ষ্য", "কিন্তু বর্ণহীন নীরস প্রচার কার্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না, ..তাই তিনি উপন্যাসের আশ্রয় নিলেন।" প্রবন্ধকার মনে করেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের "নিষ্কাম কর্ম্মবাদের পেছুনে ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষা—রিচার্ডসন, ডিরোজিওর প্রভাব। মিল-বেন্থাম, রুসো-ভলটেয়ার, কোঁৎ—উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সংস্কৃতির এই ত্রিধারার মিশ্রণে তিনি যে একটা যৌগিক আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন, সেই রসায়নের সঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে গীতা মিশিয়ে তিনি দেশীয় ইতিহাস বাঁচিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।" মোটের উপর প্রবন্ধকারের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাও কিছু উঁচুদরের ছিল না, তাঁহার উদ্দেশ্য একজন সাধারণ

স্বদেশ-প্রেম-প্রচারকের উদ্দেশ্য মাত্র এবং তাহাতেও তিনি সম্পূর্ণ sincere ছিলেন না ("বঙ্কিমের আত্মার যোগ ছিল না") আর এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে তিনি যে সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা "শিল্প হতে পারে নি।"

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে এতদিন বাঙালীরা যে তাঁহাকে সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন তাহা গোবিন্দলালের ভ্রমর-প্রেমের মতই "চাক্ষুষ মোহ।" [সেকালে চোখের 'নেশা'ই হইত, "মোহ" বস্তুটার মনের সহিতই সম্বন্ধ ছিল, আজকাল বুঝি nous avons changé tout cela !] "প্রবৃত্তির সঙ্ঘাতে মানুষের রক্তাক্ত বাস্তবতা"-পূর্ণ আধুনিক উপন্যাস পড়িয়া প্রবন্ধকারের এই "মোহ" কাটিয়া গিয়াছে।

"পরিচয়ে"র মত সারবান পত্রে এইরূপ অসম্পূর্ণ অসার আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। সে জন্য যে-যুক্তিপরম্পরার উপর এই সকল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

রোহিণী চরিত্র লইয়া প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে। রোহিণীর উপর প্রবন্ধকারের দরদ অসীম। পতিতা হইলেই আজকাল একশ্রেণীর লেখক ও সমালোচকের মন তাহাদের উপর স্নেহাসিক্ত হইয়া উঠে, গৃহস্থের কুলবধূদের উপরই তাঁহাদের মনে সমবেদনা জাগে না। রোহিণীর প্রতি "বঙ্কিমের অন্যায়াচরণই" তাঁহাকে "সমধিক পীড়া দেয়।" "রোহিণী বালবিধবা—নারী জীবনের যে মুহূর্ত্তটিকে বলা হয়ে থাকে বিশেষ মুহূর্ত্ত সেই বয়সে আমাদের সমাজ জোর করে তার ওপর বসিয়ে দিয়েছিল পবিত্রতার লেবেল। কিন্তু রোহিণীর চিত্তে এর বিরুদ্ধে ছিল একটি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ।" রোহিণীর বয়স কত ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহা লেখেন নাই। সেটা অবশ্য ছিল ভয়ানক। এই সময় না কি নারীর জীবন একটা জোয়ারে উদ্বেল হইয়া উঠে—

> There is a tide in the affairs of women
> Which taken at the flood, leads—God knows where.

আমাদের সমাজ রোহিণীর উপর যে "পবিত্রতার লেবেল বসিয়ে দিয়েছিল" তাহা রোহিণী কিরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অপবিত্রতার লেবেল আঁটিয়া জীবনে জয়যাত্রা করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসখানা ত তাহারই ইতিহাস। ইহাতে

রোহিণী যেরূপ কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছে তাহাতে প্রবন্ধকার নিশ্চয়ই বলিবেন যে তাহার জীবন সার্থক হইয়াছিল! এই পবিত্রতার লেবেল আঁটার বিরুদ্ধে রোহিণীর বিদ্রোহটা খুব প্রচ্ছন্ন-ছিল বলিয়া ত বোধ হয় না। ইহা প্রকাশ পাইত তাহার বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে। সে কালপেড়ে কাপড় পরিত, হাতে চুড়ি বালা পরিত, পান খাইত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বিদ্রোহ প্রকাশ পাইল তাহার পর-পুরুষের সহিত কুলত্যাগে।

রোহিণীকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন হরলালের সহিত তাহার পূর্ব্ব-পরিচয় আছে, দুই তিনবার নিভৃতস্থলে বিপদের সময় তাহাকে উদ্ধার করিয়া হরলাল তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। এই কৃতজ্ঞতাটা একটু অনুরাগের আভায় ইতিপূর্ব্বেই রঞ্জিত হইয়াছে। তাই যখন হরলাল পাকশালায় গিয়া রোহিণীকে বলিল, "তোমার সহিত একটা কথা আছে", রোহিণী শিহরিল। হরলাল সহজেই তাহাকে বিধবা-বিবাহ মতে বিবাহ করিবার প্রলোভন দেখাইয়া উইল চুরি করিতে সম্মত করিল। উইলখানি নিজের হাতে রাখিয়া হরলালকে তাহার চুক্তিমত বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। খেলায় রোহিণী হারিয়া গেল, হরলাল তাহার আভিজাত্য ভুলিতে পারিল না, চোর বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া গেল। প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, দ্বিতীয়বার উইল চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়া ও অপমান "রোহিণীর জীবনে তত বড় ট্র্যাজেডি নয়, যত বড় ট্র্যাজেডি হরলালের প্রত্যাখ্যান।" এই অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অতি দক্ষতার সহিত রোহিণীর নগ্ন স্বরূপ মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাই-ছেন। "রোহিণী সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাথার কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া হর-লালের মুখপানে চাহিয়া" ঝাঁটা মারিবার ভয় দেখাইয়া যে ভৎসনা করিল তাহা কোন ভদ্রমহিলা করে-না, কোন প্রণয়শালিনী রমণী অপরাধী প্রণয়ীকে করিতে পারে না। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ভদ্রতার, লজ্জার, শালীনতার আবরণ খসিয়া পড়িয়া ভদ্রসমাজে বাস করিয়াও রোহিণী কোন স্তরের জীব তাহা দেখাইয়া দিয়া গেল। প্রবন্ধকার ইহাকে ট্র্যাজেডি বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু ইহাতে যে রস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রহসনের কমিক রস বলিলেই বোধ হয় যথার্থ নামকরণ হয়। রমণী-প্রকৃতি-অভিজ্ঞ হরলাল তাই "যাইবার সময়ে একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল।"

রোহিণীর অন্তঃপ্রকৃতিতে যাহা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সমাজ-বিধানের প্রতি বিদ্রোহ নয়, তাহা যুবাপুরুষ-সম্ভোগ-লালসা। এই লালসা চরিতার্থ করিবার প্রথম সুযোগ হইয়াছিল হরলালকে দিয়া। সেখানে প্রত্যাখ্যাতা হইয়া রোহিণীর চোখ পড়িল সুপুরুষ যুবক গোবিন্দলালের উপর। কিন্তু হরলাল যেরূপ রোহিণীর হাতের ভিতর আসিয়া ধরা দিতে চাহিয়াছিল, গোবিন্দলালের অবস্থা সেরূপ নয়। প্রথম প্রতিবন্ধক গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমর। তাই ভ্রমরের উপর রোহিণীর ঈর্ষা ও শত্রুতা। যখন হরলালের আঘাতে রোহিণীর মন রোদনাতুর ও তাহার চিত্তে হরলালের স্থান ধীরে ধীরে গোবিন্দলাল অধিকার করিতেছে, তখনই তাহার মনে উঠিতেছে,—"যাহারা এজীবনে সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলালবাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য?" গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর মনোভাব ক্রমে প্রবল অনুরাগে পরিণত হইল ও গোবিন্দলালের নিকট প্রণয়-নিবেদনেও প্রত্যাখ্যাতা না হওয়ায় তাহা বদ্ধমূল হইতে চলিল। যখন ঘটনা-পরম্পরায় গোবিন্দলালের নামের সহিত রোহিণীর নাম জড়িত হইয়া কলঙ্কের সৃষ্টি হইল, তখন এই ঈর্ষা গভীর বিদ্বেষে পরিণত হইল। রোহিণী স্থির করিল দেশ ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে "ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া" যাইবে। গোবিন্দলালের সহিত কলঙ্কের কথা স্বীকার করিয়া ও ধার করা গিল্‌টির গহনা ও বেনারসী দেখাইয়া ভ্রমরের হাড়ে এমন জ্বালা ধরাইয়া দিয়া গেল যে তাহা শেষে শ্মশানের চিতায় নির্ব্বাণ লাভ করিল। ভ্রমরের সহিত সাক্ষাতের এই দৃশ্যে "সমাজের জোর করে বসিয়ে দেওয়া পবিত্রতার লেবেল" রোহিণী যেরূপ সবল হস্তে ছিন্ন করিয়া তাহার স্থানে অপবিত্রতার জয়টীকা আঁকিয়া দিল তাহাতেও কি প্রবন্ধকার সন্তুষ্ট নহেন?

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক, গোবিন্দলালের প্রকৃতি। গোবিন্দলাল ভ্রমরের প্রেমে আবদ্ধ,—রোহিণী ভাবিয়াছিল এমনই আবদ্ধ যে অন্য কোন রমণীর সে হৃদয়ে স্থান নাই। গোবিন্দলালের এই একনিষ্ঠ প্রেমই তাহাকে রোহিণীর নিকট অধিক কাম্য করিয়া তুলিয়াছিল। রোহিণী বুঝিয়াছিল, যে-গোবিন্দলাল কাল ভ্রমরকে এমন ভালবাসিতে পারে তাহার প্রেম লাভ নারী-জীবনের পরম সৌভাগ্য। গোবিন্দলালের সম্বন্ধে তাহার মনে যে ভাব উঠিয়াছিল তাহাকে গ্রন্থকার প্রণয়

বলিয়াছেন। "রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল।" এই প্রণয়-প্ররোহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু ওকালতি করিতে হইয়াছে। "কেন যে এতকাল পর তাহার এ দুর্দ্দশা হইল তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাহা বলিয়াছি।"

How should Love,
Whom the cross-lightening of four chance-met eyes
Flash into fiery life from nothing, follow
Such dear familiarities of dawn?
Seldom, but when he does, Master of all.

ইহা চিরচপল পুষ্পায়ুধের চিরন্তন দুষ্টামি—

ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনম্।
ললিতমধুরাস্তেতে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাম্॥

রোহিণীর সুপ্ত বুভুক্ষা জাগিয়া উঠিয়া সম্মুখে গোবিন্দলালকে পাইয়া আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। আত্মসাৎ করা সহজ নহে বলিয়া ইহা কতকটা sublimated হইয়া হতাশ-প্রেমে পরিণত হইল। এ প্রেম প্রেমাস্পদের ক্ষতি করিতে চাহে না, নিজের কিছু ক্ষতি হইবার আশঙ্কা থাকিলেও প্রেমাস্পদের প্রতি অন্যায়াচরণের প্রতীকার করিতে চাহে। তাই রোহিণী দ্বিতীয়বার উইল চুরি করিতে গেল। ধরা পড়িয়া নিভৃতে গোবিন্দলালের সঙ্গ পাইবার সুযোগ ঘটিল। এই সুযোগে সে আপনার প্রণয় নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিল না, এই নিবেদনে বাঞ্ছিতের মনে প্রতিধ্বনি জাগাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। "আমি ত মরিতে বসিয়াছি, কিন্তু তোমায় একবার পরীক্ষা করিয়া মরিব।" মিলনের আশা নাই দেখিয়া যে মনোভাব বিশুদ্ধ প্রণয় হইতে পারিত, তাহাতে আবার খাদ মিশিল। এই প্রণয় নিবেদনে গোবিন্দলালের মনে একটু সূক্ষ্মদাগ পড়িল, বুদ্ধিমতী রোহিণীর তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। (বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণীর সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝি বা ইহার প্রথম রেখাপাত হইয়াছিল!) "রোহিণীর কথা কৃষ্ণকান্তের কাছে প্রাতে বলিতে তাঁহার কোন লজ্জা করে নাই—এখন একটু লজ্জা করিতে লাগিল—

কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না।” গোবিন্দলালের কথায় রোহিণী মুক্তি পাইল। অবস্থা বুঝিয়া গোবিন্দলাল যখন তাহাকে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিল তাহা স্বীকারও করিল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে গোবিন্দলালের প্রতি যে আসক্তি ছিল, এই একদিনের সঙ্গ, আলাপ ও প্রণয়-নিবেদনে তাহা বহুগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রোহিণী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। “আমি কলিকাতায় গেলে গোবিন্দলালকে দেখিতে পাইব না।” আসক্তি এখন দর্শনাকাঙ্ক্ষায় দাঁড়াইয়াছে। রোহিণী এইখানে আপনার সহিত একটু সংগ্রাম করিয়াছে, দুর্গা কালী জগন্নাথকে ডাকিয়াছে যাহাতে তাহার সুমতি হয়। কিন্তু ইহা ক্ষণিকের জন্য। এইবার তাহার মনের গুপ্ত কামনা স্পষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইল,— “কখনও ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়া দেশান্তরে পলাইয়া যাই।” রোহিণী গোবিন্দলালকে বলিল, সে কলিকাতা যাইতে পারিবে না। যখন গোবিন্দলাল বলিল,—“বলিতে পারি না। জোর করিবার আমার কোনই অধিকার নাই—কিন্তু গেলে ভাল হইত।” রোহিণী প্রশ্ন করিল, “কিসে ভাল হইত?” রোহিণী পাকা কাণ্ডারী, প্রতিপদে গোবিন্দলালের হৃদয়ে লগি ফেলিয়া দেখিতে চায় কতদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রবেশ। উত্তরে “গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন”—রোহিণী প্রশ্নের মনোমত উত্তরই পাইল।

এই সময় ভ্রমর রোহিণীর প্রণয়-নিবেদনের ও তাহার হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকারের কথা শুনিয়া ক্ষীরোদাকে দিয়া রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিয়া পাঠায়। ভ্রমররূপী বাধা রোহিণীর চোখে অকস্মাৎ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া বোধ হইল। রোহিণী বারুণীতে ডুবিল। গোবিন্দলাল তাহাকে বাঁচাইল ও বাঁচাইতে গিয়া রোহিণীর রূপরাশির সহিত শারীরিক সম্বন্ধ ঘটিল। রোহিণী বাঁচিল ও যে স্পর্শের জন্য তাহার দেহ মন ক্ষুধিত হইয়াছিল, তাহা যে প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছে তাহাও বুঝিল। “অন্তঃকরণ মুক্ত করিয়া সকল কথা বলিবার যে সাধ এতদিন লুক্কায়িত ছিল তাহা আজ পরিতৃপ্ত করিয়া লইল। “আমি পাপ-পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?···রাত্রি দিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।” রোহিণীর সকল প্রণয় নিবেদনই একটা প্রবল

ভাবোচ্ছ্বাসের মুখে ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহার বীজ পূর্ব্বেই মনের ভিতর ছিল তাহাও বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন।

কি হরলাল কি গোবিন্দলাল, উভয়ের সহিত কথাবার্ত্তাতেই রোহিণী কখন "তুমি", কখন 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছে। যেখানে অন্তরঙ্গতার ভাবে নয়ন মন মুকুলিত হইয়া আসিয়াছে, সেইখানেই "আপনি" "তুমি"তে পরিণত হইয়াছে, আর হরলালকে তাহার উদ্ধত অভিজাত গর্ব্ব হইতে নামাইয়া আপনার সহিত সমান পংক্তিতে দাঁড় করাইবার সময়ও "তুমি" আসিয়াছে। কিন্তু যেখানেই রোহিণী আপনাকে সদূর ভদ্রতার ও সম্ভ্রমের আবরণে আবৃত করিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই "আপনি" সম্বোধন তাহার মুখে আসিয়াছে। রোহিণী আপনাকে হরলালের ভাবী পত্নী কল্পনা করিয়া বলিতেছে উইলখানি "তোমার কাছে থাকাও যে, আমার কাছে থাকাও সে", কিন্তু যেই হরলাল আত্মীয়তার স্বর ত্যাগ করিয়া প্রশ্ন করিল, "যদি আমায় উইল দিবে না, তবে উহা চুরি করিলে কেন?" অমনি রোহিণীর স্বর ও সম্বোধন বদলাইয়া গেল,—"আপনারই জন্য ইহা রহিল। যখন আপনি বিধবা-বিবাহ করিবেন, আপনার স্ত্রীকে উইল দিব। আপনি লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।" বারুণীসোপানে প্রদোষান্ধকারে রোরুদ্যমানা রোহিণীকে দেখিয়া যখন গোবিন্দলাল তাহার দুঃখের কথা জানিতে চাহিল ও দুঃখ দূর করিতে চাহিল, তখন রোহিণী গদগদ কণ্ঠে, বলিল, "একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।" রোহিণী যখন চুরি অপবাদের পসরা মাথায় করিয়া গোবিন্দলালকে প্রণয় নিবেদন করিল, তখন তাহার চক্ষে গোবিন্দলাল এত সুদূর অপ্রাপণীয় যে বরাবরই "আপনি" সম্বোধন বজায় রহিল। কিন্তু যেদিন জলমগ্ন রোহিণী নিভৃত উদ্যানবাটিকায় গোবিন্দলালের শুশ্রূষা-স্পর্শে বাঁচিয়া উঠিল, সেদিন আবার তুমি সম্বোধন ফিরিয়া আসিল। এই সম্বোধনগুলি যেন রোহিণীর মনের অবস্থার পরিমাপক। রোহিণীর মন একবার সোহাগে গলিয়া প্রিয় সম্ভাষণে চলিয়াছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই গর্ব্বোদ্ধতা নায়িকার মত মাথা তুলিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রসাদপুরের কুঠিতে যখন রোহিণী গোবিন্দলালকে একান্ত ভাবে আপনার করিয়া পাইল সে সময়ের একটি সম্বোধনও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থে নাই।

রোহিণী জলমগ্ন হইবার পর কিছুদিনের জন্য গোবিন্দলাল তাহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু গোবিন্দলালের নামের সহিত জড়িত হইয়া যে কলঙ্ক উঠিল,

তাহাতে গোবিন্দলালের চিত্র তাহার মনে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ভ্রমরের প্রতি বিদ্বেষ চরিতার্থ করিতে গিয়া রোহিণী নিজেই এই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইল। বন্দরখালি হইতে ফিরিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর ধ্যানে মনোনিবেশ করিল। একদিন বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যান্ধকারে গোবিন্দলালের নিভৃত উদ্যান-মণ্ডপে উভয়ের স্পষ্ট প্রণয়-সম্ভাষণ হইয়া গেল। এই কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ থাকিলে উভয়ের মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সে বিবরণ দিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। "সে রাত্রে রোহিণী গৃহে যাইবার পূর্ব্বে বুঝিয়া গেল যে গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ।" এই প্রথম প্রণয় সম্ভাষণের পর উভয়ের নিভৃত প্রেমলীলার কোন বর্ণনা নাই। "গোবিন্দ-লালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল—কেননা, রূপ-তৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা কেবল কাঁদিতে পারি, অধঃপতন বর্ণনা করিতে পারি না।" কোন কোন আধুনিক লেখক এই স্থানে কিরূপ বর্ণনা করিতেন তাহা সকলেই জানেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মিতভাষিতায় অনেক বস্তু নয়নান্তরালে রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন গোবিন্দলাল কেবল রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াই তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গোবিন্দলাল যখন অপ্রাপণীয় তখন হতাশায় রোহিণীর সম্ভোগলালসা প্রকৃত প্রণয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহা আবার সম্ভোগ-লালসাতেই দাঁড়াইল। এই সময়ই বোধ হয় সংসার সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া নিভৃতে দুজনের প্রণয়-স্বপ্ন সফল করিবার কথাও উভয়ের মধ্যে ঠিক হইয়া যায়।

গোবিন্দলাল বড় সহজেই রোহিণীর জালে ধরা পড়িল। তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা রোহিণীর সম্পূর্ণরূপেই চরিতার্থ হইল। পুরাতন আবেষ্টন ও আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুজনে দুজনের মধ্যে জীবন চরিতার্থ করিবার প্রচুর সুযোগ মিলিল নির্জ্জন প্রান্তরে প্রসাদপুরের কুঠিতে। প্রসাদপুরের কুঠিতে রোহিণী গোবিন্দলালের জীবনযাত্রার বা প্রেমাভিনয়ের কোন বর্ণনা নাই। "যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয় তাহাই বলিব।" এইখানে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মিতভাষিতা অনেক বস্তু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কেবল ভৃত্য সোণার একটি কথায় রোহিণীর চরিত্রের উপর একটি অপ্রত্যাশিত রশ্মিপাত হইয়াছে—"মুনিব মন্দ নয়, কিন্তু মুনিব-ঠাকরুণ বড় হারাম-

জাদা"। রোহিণীর চরিত্রে যে স্নেহ কোমলতার লেশমাত্র ছিল না, তাহা যে শুধুই আত্মসর্ব্বস্ব তাহা হরলালের সহিত ব্যবহারে, ভ্রমরের সহিত ব্যবহারে দেখা গিয়াছে, সোণার কথায় তাহা আরও প্রকট হইল।

এই প্রসাদপুরের জীবন উপলক্ষ করিয়াই প্রবন্ধকারের প্রধান আপত্তি উঠিয়াছে। তাঁহার মতে, "যে নিষ্ফল দুরাশা রোহিণীকে তার সুপরিচিত আবেষ্টনীর ভেতর থেকে নিয়ে এল দুর্গমের দিকে—তাই যখন অপ্রত্যাশিতভাবে হল সার্থক, তখন রোহিণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সুরু হল না।.........রোহিণী প্রসাদপুরের কুঠিতে বিলাসিনী হয়ে রইল।.........তার (রোহিণীর) দিক থেকে প্রতিক্রিয়া সুরু হওয়া স্বাভাবিক ছিল গোবিন্দলালের অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধিতে......নিজের আদর্শের বিলুপ্তি ও বাস্তবের ব্যর্থতায় তার ট্যাজেডি।" [দুরাশা যদি "সার্থকই" হইল ত তাহা "নিষ্ফল" রহিল কিরূপে? "বাস্তবের ব্যর্থতা" বস্তুটা কি? ইহা কি এক প্রকার সান্ধ্য ভাষা?] রোহিণী কোন আদর্শ লইয়া কুলের বাহির হইয়াছিল, তাহা প্রবন্ধকার খুলিয়া বলেন নাই। আমরা ত তাহার মধ্যে কোন আদর্শবাদ দেখিতে পাই না। সে চাহিয়াছিল রূপবান যুবা পুরুষ সম্ভোগ করিতে। তাহাই সে পাইয়াছিল। এই প্রবৃত্তি যদি সমাজের মধ্যে থাকিয়া চরিতার্থ হয় ত ভালই, হরলালকে বিধবা-বিবাহে সম্মত করাইয়া সে সেই চেষ্টাই প্রথমে করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহা বিফল হইল, সমাজ ত্যাগ করিতে রোহিণীর কোন আপত্তি হইল না। তাহার জীবনে এমন কোন স্নেহের বন্ধন ছিল না, যাহা কাটিতে তাহার ব্যথা লাগে। একমাত্র আত্মীয় পিতৃব্য ব্রহ্মানন্দের প্রতি তাহার যে অত্যধিক ভক্তি ভালবাসা ছিল তাহার কোন নিদর্শন নাই। ব্রহ্মানন্দকে তুষ্ট করিয়া রাখিতে মাঝে মাঝে কিছু অর্থ প্রেরণই যথেষ্ট বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। বোধ হয় গোবিন্দলাল সে কথা ঠিক করিয়াই রোহিণীকে লইয়া গিয়াছিল। গ্রন্থারম্ভে ব্রহ্মানন্দের অর্থলোলুপতা দেখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। যে মনোভাব রোহিণী অনায়াসেই হরলালের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দলালের উপর ন্যস্ত করিতে পারিয়াছিল তাহাকে "প্রেম" বলিতে হয় বলুন, কিন্তু তাহার প্রকৃতি যে কি তাহা বুঝিতে গোবিন্দলালের বড় বিলম্ব হয় নাই। "রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে এ রোহিণী ভ্রমর নহে,—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকী-নিঃশ্বাস-নির্গত

হলাহল, এ ধন্বন্তরি-ভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে। বুঝিতে পারিলেন যে, এ হৃদয়-সাগর মন্থনের উপর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছি, তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্য পান করিতে হইবে—নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত সে বিষ তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়া রহিল।” যেখানে কোন আদর্শ ই নাই, সেখানে “আদর্শের বিলুপ্তিতে”তে কোন ট্র্যাজেডিই গড়িয়া উঠিতে পারে না। গোবিন্দলালের ভিতর এমন কোন গভীর রহস্য ত রোহিণী খুঁজে নাই যে গোবিন্দলাল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। গোবিন্দ-লাল তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বোধ হয় নাই। প্রবন্ধকার বলেন যে, রোহিণীর দুরাশা অপ্রত্যাশিতভাবে সার্থক হওয়া মাত্রই রোহিণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। রোহিণী কস্মিনকালেও গোবিন্দলালের ভিতর স্বর্গীয় প্রেম চাহে নাই এবং প্রতিহতও হয় নাই; সে জন্য তাহার কোন প্রবল প্রতিক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

রোহিণীর চরিত্র যে যে উপাদানে গঠিত তাহার জীবনে ত তাহারই পরিণতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রকে আরও জটিল করিয়া কৃষ্ণ-কান্তের উইলকে মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস করিয়া তুলিলেন না কেন তাহার উত্তর নাই। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বাপর সুসঙ্গত সুপরিণত শিল্পসৃষ্টি কি না ইহাই বিচার্য্য। ইহা অন্য লেখকের হাতে যে কত অন্যরূপ ধারণ করিতে পারিত তাহার সীমা নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা আছে তাহা যে পঙ্গু সৃষ্টি ইহাই বা কি করিয়া বলা যায়? অনবদ্যাঙ্গী Venus de Miloর মূর্ত্তিটি অন্য শিল্পীর হাতে যে কত অন্য প্রকার হইতে পারিত তাহার কি সীমা আছে? কেহ বা সুরস ওষ্ঠাধারে একটু ব্যঙ্গের একটু প্রেমের একটু চটুলতার হাসি ফুটাইত, কেহ বা চারুলোচনে বুদ্ধির আনন্দের গর্ব্বের জ্যোতির্লেখা লিখিত, কেহ বা সূক্ষ্ম বসনের বেষ্টনে উজ্জ্বল যৌবনকে বাঁধিতে চাহিত, কেহ বা শূন্য বিলুপ্ত হস্তদুখানিতে পরিপূর্ণ ব্যগ্র আলিঙ্গন ভরিয়া দিত। অন্য কত কি হইতে পারিত ভাবিয়া, যাহা আছে তাহা যে সেরূপ নয় বলিয়া দোষ দেওয়া সুবিচার নহে। সকল “সম্ভাব্যতা”র কল্পনা দূরে রাখিয়া শিল্পী যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা শিল্প হিসাবে সার্থক কি না, আপন গৌরবে বিকশিত বর্ণ-গন্ধ-রসে পূর্ণ প্রোদ্ভিন্ন সৌন্দর্য্য-শতদল কি না ইহাই বিচার্য্য। তাহা যদি হয় ত শিল্পীর রচনা ব্যর্থ হয় নাই।

প্রসাদপুরের কুঠিতে রোহিণী গোবিন্দলালকে বঙ্কিমচন্দ্র রাখিয়াছেন মাত্র এক

বৎসর। ইহার মধ্যে যদি বালবিধবা রোহিণীর রস-সম্ভোগ-তৃষ্ণা না মিটিয়া থাকে, দরিদ্র গৃহে পালিতা রমণীর বিলাস-সম্ভোগস্পৃহা না মিটিয়া থাকে ত তাহা কি অন্যায়? গোবিন্দলালকে পাইয়াই যদি রোহিণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইত তাহা হইলেই কি অশোভন হইত না? যে সমস্ত দৃশ্য, যে সমস্ত কথোপকথন বঙ্কিমচন্দ্র তদানীন্তন রুচি অনুসারে অন্তরালে রাখিয়াছেন তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া বর্ণনা করিলে রোহিণী-গোবিন্দলালের মনস্তত্ত্ব আরও পরিষ্কার হইত ও হয়ত আধুনিক একশ্রেণীব লেখক পাঠকের পরম প্রীতিকর হইত। কিন্তু তাহা না করিয়াও যদি বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প-সৃষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ত তাহাতে দোষ কি? মানুষের রুচির যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হইতেছে। একযুগে যাহা সাহিত্যে সমাজে অবাধে চলিয়া যায়, অন্য যুগে তাহাই অপাংক্তেয় বিবেচিত হয়। এবং একযুগে যাহা অশ্লীল বলিয়া ত্যাজ্য, অন্য যুগে তাহাই উপভোগ্য হইয়া উঠে।

প্রবন্ধকারের যা কিছু সহানুভূতি, যা কিছু শ্রদ্ধা এক রোহিণী চরিত্রই আকর্ষণ করিয়াছে। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের উপর তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত নাই। ভ্রমর "কাগজের ফুল", "তার আত্মায় বিদ্রোহের পুঁজি ছিল না…বস্তুত কোন পুঁজিই ছিল না তার", "প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে নিজেকে নিষ্প্রভ বুঝলো, সুতরাং অক্ষমের অস্ত্র অভিমান, সে তারই শরণাপন্ন হল।" ["আত্মায়" মানুষের কিছুই থাকে না, যা কিছু থাকে মন আর বুদ্ধিতে। সকল চিন্তাশীল সাহিত্যেই "আত্মা" শব্দটা দর্শনানুমোদিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

রোহিণী চরিত্রে প্রবন্ধকার "বিদ্রোহ" দেখিয়াছেন, আর ভ্রমর চরিত্রে তাহার অভাব দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন। যে বিদ্রোহে নিজের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, রূপবান যুবা পুরুষ সম্ভোগ হয়, রাঁধা-বাড়া বাসন-মাজা জলতোলা ত্যাগ করিয়া দ্বিতল সুসজ্জিত অট্টালিকায় হাফ-পর্দ্দানশীন হইয়া সঙ্গীত চর্চ্চা করা যায় রোহিণী সেই "বিদ্রোহ" করিতে জানে। আর ভ্রমর সেই বিদ্রোহ করিতে জানে যাহাতে যে-স্বামী জীবনে প্রাণাধিক প্রিয়তম, একমাত্র অবলম্বন, দিবসের চিন্তা, নিশার স্বপ্ন তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিলে তিলে মরিতে হয়, সেই স্বামী যখন নিরন্ন নিঃসম্বল হইয়া সাহায্যপ্রার্থী তখন চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহার সহিত সাক্ষাতেও অস্বীকার করে। ভ্রমর "কাগজের ফুল"ই বটে!

প্রবন্ধকার বলেন, ভ্রমর রোহিণীর কাছে "নিজেকে নিষ্প্রভ বুঝলো"। রোহিণী

যেভাবে পরপুরুষ আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, সেভাবে ফাঁদ পাতিয়া আপনার স্বামীকেও বশে রাখার কথা ভ্রমরের মনে উঠে নাই, তাই সে নিজেকে কখনও রোহিণীর সহিত তুলনা করে নাই। "ভ্রমর বিক্ষোভের মুখে অপটু কাণ্ডারীর মত হাল ছাড়িয়া দিল।" পরদারনিরত স্বামীকে আপনার আয়ত্তে আনিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ভদ্রবেশে সংসার করিবার কথা তাহার মনে একবারও উঠে নাই। "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি, যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই; বিশ্বাসও নাই।" যে দৃপ্তা রমণী স্বামীকে এই কথা লিখিতে পারে সে কাগজের ফুলই বটে! ভ্রমর কিন্তু একবারও ভাবে নাই বা লিখে নাই যে গোবিন্দলালের প্রতি তাহার ভালবাসা নাই। ভ্রমরের প্রেমে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই, তাই তাহা স্বতঃ উৎসারিত চির-প্রবহমাণ প্রস্রবণ। গোবিন্দলাল যখন পাপ জীবন যাপন করিতে ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে তখন ভ্রমর সাশ্রুনয়নে অপরাধ স্বীকার করিতেছে, শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করিয়া স্বামীকে দিতেছে, স্বামীর বিপদে অধীর হইতেছে; কিন্তু স্ত্রীহত্যাকারী পাপিষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয় নাই। এই ভ্রমর চরিত্র যেমন একদিকে কুসুম অপেক্ষাও কোমল তেমনই অপর দিকে বজ্রাদপি কঠিন। ইহার সহিত ইন্দ্রিয়-লালসার স্রোতে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসমান রোহিণীর চরিত্রের তুলনা হয়!

ভ্রমরের উপর প্রবন্ধকারের যেরূপ অবজ্ঞা গোবিন্দলালের উপর ততোধিক। গোবিন্দলাল "অকিঞ্চিৎকর", ভ্রমরের উপর তাহার ছিল "চাক্ষুষ মোহ," সে ছিল মাত্র "উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী, তার চরিত্রের সম্ভাব্যতা স্ফূর্ত্ত হয়নি", "গোবিন্দলালের জীবন যে দুর্য্যোগময় আবর্ত্তের ভেতর দিয়ে অখণ্ড পরিণতিতে পৌছুবার কথা লেখক হয় তা আন্দাজ করতে পারেন নি, নয় তা ইচ্ছা করে প্রতিরোধ করেছেন।"

গোবিন্দলালকে আমরা প্রথমে দেখি পত্নী-অনুরক্ত, গুরুজনে ভক্তিপরায়ণ, সকল দুঃখীর উপরই অসীম দয়া-পরবশ। এই দয়ার দ্বার দিয়াই রোহিণী তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। গোবিন্দলাল স্বয়ং সুপুরুষ ও তাহার এক দুর্ব্বলতা ছিল রূপতৃষ্ণা। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সুরম্য পুষ্পোদ্যানের, পাষাণ-বেদিকার, সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমার, সুন্দর বৃক্ষ-বাটিকার, সুসজ্জিত প্রমোদ-গৃহের বর্ণনা করিয়া গোবিন্দলাল যে সুন্দরের পূজারী তাহা বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। গোবিন্দলাল যখন

আপনাকে লোক সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রসাদপুরের কুঠিতে রোহিণীকে লইয়া বিলাস-সম্ভোগে রত ছিল, তখনও এই সৌন্দর্য্য-স্পৃহা তাহার গৃহ-সজ্জায়, উদ্যান-রচনায়, সঙ্গীতানুরাগে প্রকাশ পাইয়াছে। "সেই অশোক-বকুল-কুটজ-কুরুবক-কুঞ্জমধ্যে ভ্রমর-গুঞ্জন, কোকিল-কূজন, সেই ক্ষুদ্র নদী, তরঙ্গ-চালিত রাজহংসের কলনাদ, সেই যূথী, জাতি, মল্লিকা, মধুমালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহ মধ্যে নীল-কাচ-প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব্ব মাধুরী, সেই রজত স্ফটিকাদি নির্ম্মিত পুষ্পাধারে সুবিন্যস্ত কুসুম-গুচ্ছের শোভা, সেই গৃহশোভাকারী দ্রব্যজাতের উজ্জ্বল বর্ণ আর সেই গায়কের বিশুদ্ধ স্বরসপ্তকের ভূয়সী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিলাম।" এ সময় তাহার রুচি কিছু বিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সৌন্দর্য্যজ্ঞান ঠিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাবধিই যেন আভাস দিয়া আসিয়াছেন এই সুন্দরের পূজা সুন্দরী রমণী সম্ভোগেচ্ছায় পৌঁছিতে পারে। যেখানেই গোবিন্দলাল রোহিণীকে দেখিয়াছেন তাহার সৌন্দর্য্যই তাঁহার নয়নে পড়িয়াছে। যখনই তাহার কথা ভাবিয়াছেন তখনই "তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী অনন্তপ্রভাশালিনী প্রভাত-শুক্রতারা-রূপিণী রূপতরঙ্গিনী চঞ্চলা রূপসীরূপেই ভাবিয়াছেন। রোহিণীর প্রতি প্রথম তাঁহার মনোভাব ছিল অসীম দয়া। আর এই দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে যখন প্রথম গোবিন্দলালের চোখে ফেলিয়াছেন, তখন তাহাকে অস্ফুট চন্দ্রালোকে নির্জ্জন বাপীতীরে অসহায়া রোদন-বিহ্বলা বেপথুমতী করিয়া আঁকিয়াছেন। জলনিমগ্না রোহিণীকে গোবিন্দলাল "দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।" যখন তাহাকে তুলিয়া আপনার প্রমোদ-গৃহে আনিলেন তখন তাঁহার চোখে পড়িল রোহিণীর অতুল রূপরাশি। "মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন?" রোহিণীর রূপই প্রথম গোবিন্দলালকে আকর্ষণ করিল ও দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাই চিরকাল তাহার প্রধান আকর্ষণ রহিয়া গেল। ঘটনাচক্রে যখন রোহিণী ঘনিষ্ঠভাবে একান্তে গোবিন্দলালকে পাইল, তখন নিজ চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যেই তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। বরং রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের মনে একটা প্রতিক্রিয়াই আরম্ভ হইল। "রোহিণীকে গ্রহণ করিয়াই [গোবিন্দলাল] জানিয়াছিলেন যে, এ রোহিণী, ভ্রমর নহে—এ রূপতৃষ্ণা, এ স্নেহ নহে—এ ভোগ, এ সুখ নহে—এ

মন্দার-ঘর্ষণ-পীড়িত বাসুকী-নিঃশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধন্বন্তরিভাণ্ডনিঃসৃত সুধা নহে।" রোহিণীর চরিত্র মূলতঃ কিরূপ স্নেহহীন কর্কশ তাহা হরলালের প্রতি ভর্ৎসনায়, ভ্রমরের প্রতি ব্যবহারে ও ভৃত্য সোণার কথায় প্রকাশ। গোবিন্দলাল "অকিঞ্চিৎকর" বলিয়া রোহিণীর মনে প্রতিক্রিয়া হইবার হেতু ছিল না, তাই তাহা হয় নাই। রোহিণী অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গোবিন্দলালের মনে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল ও তাহার ফলে ভ্রমর-প্রেম অজ্ঞাতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রোহিণীকে কুলের বাহিরে আনিয়া ত্যাগ করিবেন গোবিন্দলালকে এত হীন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র আঁকেন নাই।

গোবিন্দলালকে গৈরিক পরানো-য় প্রবন্ধকারের বড় আপত্তি। বাস্তবিক কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষ পরিচ্ছেদ ও পরিশিষ্টটি না লিখিলেও গ্রন্থখানির অঙ্গহানি হইত না। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালকে বিদায় দিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। এত গুণে মণ্ডিত এত বড় মানুষটাকে জীবনে একটা ভুলের জন্য সর্ব্বহারা করিয়া শ্মশানে বসাইয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলে তার পূর্ণ পরিণতি হয় না। যাহারা গোবিন্দলালের মত গভীরভাবে ভালবাসিতে পারে, গভীর আঘাত পাইলে তাহাদের প্রেম যে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত হয় ইহা সর্ব্বজন-বিদিত ও ইহা অবলম্বন করিয়া মেরি ম্যাগ্‌দালেন হইতে আরম্ভ করিয়া বিল্বমঙ্গল পর্য্যন্ত প্রচুর শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল যে অশান্ত জীবনের শেষে শান্তি পাইয়াছিলেন, যে-সৌন্দর্য্য পূজা তাঁহার অন্তরের প্রবৃত্তি তাহা যে সকল রূপের উৎস পরমেশ্বরের পূজায় সমাপ্তি পাইয়াছিল ইহা বঙ্কিমচন্দ্র সমীচীন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র একখানি উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের অতি অসম্পূর্ণ একদেশদর্শী অসার আলোচনা করিয়া আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কিরূপ অবিচার হইয়াছে তাহা সুধীমাত্রেই লক্ষ্য করিবেন! "শুধু আর্ট হিসাবে তাঁর এই সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত বইখানাও যে অসার্থক এইটুকু দেখানোর জন্যেই এই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।" "বইখানাও"-এর "ও"-টি লক্ষ্য করিবার বস্তু। প্রবন্ধকারের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ যে অসার্থক তাহা এই আলোচনাতেই প্রমাণিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার দোষ, আদর্শের দোষ, দেশাত্মবোধের দোষ

প্রভৃতি দোষের ফিরিস্তিতে প্রবন্ধের বাকী অর্দ্ধেক কলেবর পূর্ণ হইয়াছে। প্রবন্ধকার দেবী রাণীকে গৃহস্থ বধূরূপে দেখিয়া "আঁৎকে" উঠিয়াছেন, "প্রবৃত্তির সজ্ঘাতে মানুষের রক্তাক্ত বাস্তবতা"র অভাবে শোক করিয়াছেন এবং শেষে পুরোহিত ঠাকুরের পিছন ফিরিয়া বামহাতে অলক্ষ্মী পূজার মত "কৃষ্টির দিক থেকে বঙ্কিমকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার" করিয়া পালা সাঙ্গ করিয়াছেন। তিনি যদি কুলত্যাগিনীর প্রতি সহানুভূতিতে বিগলিত হৃদয় না হইয়া ধীরভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন তাহা হইলে তাহা সর্ব্বথা গ্রহণ করিতে না পারিলেও শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হইত। তাহা না করিয়া আর্টের দোহাই দিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে সুধীসমাজে হেয় করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন মাত্র। বাঙ্গালা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের দান প্রচুর, তাহা শুধু উপন্যাসেই আবদ্ধ নহে, দেশাত্মবোধের পুরোধা বলিয়া তিনি আজ সমগ্র দেশে পূজিত, তাঁহার রচিত "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এরূপ মাননীয় সাহিত্য-সম্রাটকে সম্মান করিতে না পারা একটা দুর্লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশের জলহাওয়ার গুণে কোন কীর্ত্তিই স্থায়ী হয় না। পাণ্ডুয়া মুর্শিদাবাদ যেমন শ্মশান হইয়া গিয়াছে তেমনই সাহিত্যের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি আজ সাহিত্যিকদিগের কাছে অপাঠ্য বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর কীর্ত্তি ধ্বংশের কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী বাঙ্গালীই। তাই আজ বাঙ্গালী সমস্ত দেশের ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়াইতেছে। নিজেদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীন কীর্ত্তি না বুঝিয়া ও তার প্রতি অসম্মান দেখাইয়া, কেবল আর্টের নামে ব্যভিচার বর্ণনা করিলে বাঙ্গালা সাহিত্যও অচিরে সমগ্র দেশের ঘৃণা ও অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আবর্ত্ত

২

সুজনের ঘুম ভাঙ্গল পরের দিন একটু দেরীতে। অক্ষয় এঞ্জিনীয়ার সকালেই রোঁদে বেরিয়ে গেছে। কাজের লোক এই অক্ষয়, হাতকাটা সার্ট ও খাকি সর্ট পরে সারাদিন কর্ত্তব্য করে, অতিথিকে যত্ন করতে পারে না বলে প্রায়ই তার কাছে ক্ষমা চায়। নিয়মিত সময় নেই খাবার দাবার, রাতে বাড়ি ফিরতে দেরী করে—তাতে সুজনের সুবিধা হয়। কিন্তু অক্ষয়কে স্বাস্থ্যের জন্য নিয়ম পালন করবার অনুরোধ না করাটা অভদ্রতা। সুজন যত উপদেশ দেয় ততই যেন অক্ষয়ের অনিয়ম বাড়ে, পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে না, কর্ম্মবীরের সঙ্গে বাক্যবীরের, বস্তুতান্ত্রিকের সঙ্গে আদর্শবাদীর পার্থক্য ঘোষিত হয়। বাইরে রোদ খট্ খট্ করছে, রাত্রে ঘুম হয়নি ভাল, সুজনের দেহে তখনও জড়তা রয়েছে। চাকর বিছানার পাশে চা ও টোষ্ট এনে দিলে। কত পরিবর্ত্তন হয়েছে এই ক'দিনের মধ্যে! কোলকাতায় আগে সে ভোর বেলা উঠে নিজে চা তৈরী করত, বিজনকে দিত, তার পাশে বসে গল্প করত। আজকাল সে অলস হয়েছে। তার যৌবনকালীন অধ্যবসায়ের ও নিয়মানুবর্ত্তিতার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে আলস্যকে সমর্থন করে, সামাজিক ইতিহাসে অবকাশের প্রয়োজন স্বীকার করে। চিরকাল সে ঘড়ি ধরে চলেছে, এখন কাশীতে এসে ঘড়িকে নির্ব্বাসন দিতে চায়, রমলা দেবীর সঙ্গে গল্প ক'রে সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্য্যন্ত সময় কাটাতে চায়। তার মনে সন্দেহ ওঠে যে হয়ত বা বিদ্যা বুদ্ধির চর্চ্চা করে নিজেকে অনেক কিছু উপভোগ্য বস্তু থেকে বঞ্চিত করেছে। সুজন সিগারেট খেতে শিখেছে—কেন সে খাবে না ভেবে।

হাত মুখ ধুতে বেলা সাড়ে আটটা বাজল। কাপড় জামা বদলে সুজন বেরুতে যাবে এমন সময় খুকী এসে হাজির। খুকী অক্ষয়ের একটি মাত্র সন্তান, বয়স চার বছর, মা নেই, অক্ষয়ের পিসীর কাছে মানুষ; পিসী কয়েক দিন হোলো দেশে খাজনা আদায় করতে গিয়েছেন, তাই খুকী বাড়ির পুরানো বাঙ্গালী ঝি-এর তত্ত্বাবধানে থাকে, আর সুজনের সঙ্গে গল্প করে। ভাষা বয়সের তুলনায় স্পষ্ট

হলেও সব ক্ষেত্রে নয়। একটু বেশী রোগা, নানাপ্রকার বিদেশী ফুড খাওয়া সত্ত্বেও। এরই মধ্যে বিনুনি ঝোলে মাথার দুপাশে, গায়ে দোকানের তৈরী ফ্রক্।

'কি গো! আজ যে রাজরাণী!'

'রাজরাণী নই, আমার নাম দীপা, ভাল নাম সুজাতা দেবী।'

'এত প্রাতঃকালে সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

ঘরের দরজার পাশে ঝি ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, বল্লে, 'এই পাশের বাড়ি গেছনু। আজ আপনি রাতে কি খাবেন? মাংস আনাব?'

'শরীরটা ভাল নয়। আমরা বাংলা দেশের বাঙ্গালী, মাংস রোজ সহ্য হয় না। ভাতই কোরো। আর এক বাটি চা করতে বল।'

'আমিই করে দিচ্ছি। মহারাজ বাজারে যাবে, চাপরাশি অফিসে যাবে। এখনই আনছি। খুকী একটু গল্প কর, বিরক্ত করিসনে বাপু।'

ঝি চলে গেল চা করতে।

'কৈগো দীপা দেবী, আজ বন্ধুর সঙ্গে কি গল্প করলে?'

'আজ? এই বলছি,...মোড়ের মাথায় পুতুল এসেছে কিনা...নতুন পুতুল... চোখ এমনি করে চায় আর বোজে, চায় আর বোজে, চায় আর বোজে, সিল্কের জুতো...'

'তা হলে সে ত মানুষ দেখছি, দীপা!'

'না গো না, মানুষ নয়, জ্বালাতন কোরোনা, পুতুল। আমি কিনব। ঠাকুমা যাবার সময় টাকা দিয়ে গেছে, বাবার কাছে আছে। বাবা এলে চাইব, তোমার কাছে নেবোনা, বাবা মানা করেছে, চুরি করা হয়, বাবা বকবে।'

'বেশ, বিকেলে কিন 'খন। কি গল্প করলে?'

'গল্প? বলছি। কাকাবাবু, তুমি একটা গল্প বল না?'

'কিসের?'

'রাজা-রাণীর।' সুজন আরম্ভ করল, দীপাকে বিছানায় তুলে নিয়ে।

'এক ছিল এক দেশের রাজা, আর এক ছিল আরেক দেশের রাণী, রাজারও খোকা নেই, রাণীরও খুকী নেই। কি করে! মনের দুঃখে রাজা মশাই বই পড়ে, হাসিখুশি, খোকার দপ্তর; রাণী আর কি করে? রান্নাবান্না করে, ঘরদোর ঝাঁট দেয়, আর রাজা মশাইএর অফিসের কাগজে লাল নীল পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকে,

কখনও বাঘ, কখনও মানুষ, বাঘের হাঁ-টা ভাল হয় না, কিন্তু মানুষের মুখটা ঠিক যেন রাজা মশাইএর মতন, ইয়া গোঁফ, নাকটি ঠিক মনের মতন হয় না। ছেলেপুলে নেই কি করবে বল ?'

'রাজা শীকারে যায় না ?'

'আরে তাই ত যায়। হাসিখুশি পড়ে কত দিন কাটান যায় বল ? রাজা ভাবেন শীকারে যাই। রাজা শীকারে চললেন, লোক লস্কর, হাতি ঘোড়া, তীর ধনুক…'

'বন্দুক ? গুড়ুম !'

'বন্দুক তখন ছিল না। তীর ধনুক, আর বল্লম, আর তলোয়ার। এক বনের ধারে তাঁবু গাড়া হোলো বিকেল বেলা। সামনে নদী, পদ্ম ফুল ফুটে আছে, রাজহাঁস চরছে…'

'প্যাঁক, প্যাঁক, প্যাঁক।'

'ঠিক প্যাঁক নয়, খ্যাঁক্ খ্যাঁক্…'

'সে ত ওদের বাড়ির খুকী করে !'

'রাজহাঁসেও করে। তারপর, সন্ধ্যা হোলো, গরম পড়েছে, রাজা নদীর ধারে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়, চমৎকার গান শুনতে পেলেন…'

'সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে…আমি শুনেছি'।

'না, ও গান নয়, গান আর বাজনা…'

'নাচ নয় ? ঝুমুর, ঝুমুর, গ্রামোফোনে যেমন নাচে ?'

'না, রাজা তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, যেন দূর থেকে আসছে, আসছে, আসছে, ঐ এলো। রাজা দেখেন কি ! একটা রূপোর নৌকো, তার মাথাটা হাঙ্গরের মতন দেখতে…হাঁ, হাঁ, ঠিক ঐ রকম মুখটা, আর নয়, আর নয়, ঠোঁট চিরে যাবে, তারপর দেখেন কি ! নৌকার ওপর ঘর, ঘরের ছাদে একটি পরমা-সুন্দরী মেয়ে বসে রয়েছে, আর গান গাইছে, হাতে সেতার, পিড়িং পিড়িং করে বাজে যেটা সেইটে। রাজা ভাবলেন, কোথায় এলাম ! একি স্বর্গ !'

'মা যেখানে গিয়েছে ?'

'হাঁ, বটে, কিন্তু সে রকম ঠিক নয়। রাজার মনে যেন হচ্ছে—স্বর্গ। তারপর, রাজার সঙ্গে মেয়েটির চোখোচোখি হয়ে গেল…'

'এইরে, আমি জানিরে! বলব, বলব? তারপর রাজার সঙ্গে রাণীর বিয়ে হয়ে গেল। ঠিক বলেছি কিনা বল? এইবার এইবার পয়সা দাও···পুতুলটা কিনব।'

সুজনের গল্প গেল ভেঙ্গে। খুকীই শেষ করে দিলে। ঝি চা ও সামান্য খাবার নিয়ে এল একটা ডিশে। চা পানের সময় খুকীর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুজন পিরিচে কয়েক চামচ চা ঢাললে। ফুঁ দিয়ে নিজেই ঠাণ্ডা করে খুকী এক চুমুকেই চা খেলে, ঝিএর মানা শুনলে না। ঝি খুকীকে নিয়ে চলে গেল।

ডাক পিওন চিঠি ছুঁড়ে দিলে জানলা দিয়ে। কোলকাতার ছাপ, হাতের লেখা বিজনের। তাড়াতাড়ি সুজন খামটা ছিঁড়ে চিঠি পড়লে।

বিজন লিখছে ঃ

সুজনদা,

তুমি যাবার পরই হার্ড কোর্টসের খেলা সুরু হয়। এবার কোয়ার্টার ফাইন্যালে উঠেছিলাম। শেষ সেট্-এ ৫।৩ গেম্ লীড্, ফর্টি-ফিফটীন, এমন সময় পিছলে পড়ে যাই। তারপর কি হয়ে গেল যেন—৭।৫এ হেরে গেলাম। ডবল্সে সেমি ফাইন্যালে যাই, ষ্টেট্স্ম্যান আমার সম্বন্ধে কি লিখেছে আশা করি পড়েছ। মিক্স্ড্ ডাব্ল্স্এ কাপ পেয়েছি। ওরা বলে, আমি নাকি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিক্স্ড ডাবল্স্ খেলোয়াড়! কিন্তু আমার দুরাশা সিংগল্সে। রমাদি হাসছেন, বেশ বুঝতে পারছি। সে যাই হোক আমার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে টের পাচ্ছি, তুমিও পেয়েছ নিশ্চয়। এখন নিজের ওপর বিশ্বাস এসেছে, কোর্টে দাঁড়িয়েই মনে হয় হারিয়ে দেব, বিপক্ষের যত বড় নামই হোক না কেন। এখন বেশ চালাকি শিখেছি। আগে তার দোষ দেখে নিই। প্রায় সব মিঞাই ব্যাকহ্যাণ্ডে গঙ্গারাম, আর ওভার হেড। এক সাহানী ও কৃষ্ণস্বামী ছাড়া কারুর ও-বালাই নেই। তাই আজকাল কেবল বিপক্ষের বাঁয়ে বল পাঠাই, আর না হয় লব্। ড্রপ শট্ আমার কেমন হয় জান, তাই একটু একটু করে নেট্এর কাছে না এনে, তারপর টুক্ করে মাথার ওপরে ডীপ্ লব্—ব্যস্!

তাই বলছি, ঠিক এখন যখন আমার উন্নতি হচ্ছে, নিজের ওপর বিশ্বাস জন্মেছে, তখন কোচ্এর কাছে মাস খানেক ট্রেনিং না নিলে দেখছি চলছে না। খবরের কাগজে তাই লিখেছে—বুঝেছ? তুমি বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটু লিখবে।

তোমার কথা বেদবাক্য। আমি যেন হরিজন বাবার কাছে। যেন ভুলোনা লিখতে। আমি লিখতে পারব না। যাক্‌গে, আর টেনিসের কথা নয়, তোমার কোনো ইন্‌টারেষ্টই নেই, রমাদিরও না। তুমি, তোমরা যেন কি হয়েছ, কাশী গিয়ে। ধর্ম্ম করছ? উচ্ছন্ন যাবে বলে দিলাম। দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে ঐ করে।

এক মজার ব্যাপার ঘটেছে। তুমি শীঘ্রই কোলকাতা চলে এস। যদি না আস, আফশোষ হবে শেষে। ইতি

বিজন

পুঃ কাউকে যদি না বল প্রতিজ্ঞা কর, তবে পরের চিঠিতে লিখতে পারি। একটু আভাস দিচ্ছি, নচেৎ রমাদি-তে আর তোমাতে আমার পার্টনার নিয়ে ঠাট্টা হাসাহাসি করবে। আমি সোশিয়ালিষ্ট হয়েছি। এইবার দেখ! খগেন বাবুর ব্যক্তিবাদ নয়—অন্য জিনিষ! শুনলাম ভদ্রলোক নাকি আশ্রমে সেঁধিয়েছেন। জানতাম তাঁর দৌড় ঐ আশ্রম পর্য্যন্ত। আশ্রম হোলো আফিম ও গুলীর আড্ডা। আশ্রমবাসের অর্থই হোলো স্বার্থপরতা। এ-যুগে মেটিরিয়ালিষ্ট না হলে চলবে না। তোমার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে। আমি দু'একটা মিটিংএ যোগ দিয়েছি, এলবার্ট হলে। যদি থাকতে! তুমিও সোশিয়ালিষ্ট না হয়ে থাকতে পারতে না।

আমাদের গাড়িখানার কল বিগড়েছে, বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মতন। ভাবছি সারাব না। আমার কোনো অধিকার নেই ভোগ করবার যখন চারধারের লোক খেতে পাচ্ছে না।

রমাদি আমাকে ভুলে গেছেন। আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

তাঁকে কোনো চিঠি দেবো না। তাঁকে বোলো যে তাঁর সম্বন্ধে জানবারও আমার কোনো আগ্রহ নেই।

বিজন

পুঃ পুঃ তুমি যত শীঘ্র পার চলে এস। বাবাকে টেনিস্ কোচের কথা লিখতে যেন ভুল না হয়। রমলাদির গাড়িটা গ্যারাজে পড়ে রয়েছে, এঞ্জিন খারাপ হবে। টায়ারও যাবে। নিতে পারি কি দরকার হলে? আমাকে মধ্যে মধ্যে খিদিরপুর যেতে হয়। আমি ড্রাইভ না হয় নাই করলাম।

বিজন

গোটা গোটা ছাঁদা অক্ষর বিজনের, এখনও যেন দাগা বুলুচ্ছে। কিন্তু হস্তলিপির সরল রেখায় তার অপরিণত সরলতার সাক্ষ্য দেয়। আগে কখনও বিজন কমা, ফুলষ্টপ দিত না, নতুন দিতে শিখেছে, ছেদগুলো যেন উগ্র মনে হয়। আত্মপ্রচারের ভেতর দিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করছে। আগে নিজত্ব আছে স্বীকার করুক, তারপর সন্ধান চলবে। খগেন বাবুকে বিজনের ভাল লাগে না যে তাঁর কারণ বিজন এখনও নিম্নস্তরের। সময়ের স্তর, স্বভাবের নয়। অপরিণত যে ব্যক্তি সে কখনও পরিণতির পন্থার দুর্গমতা কল্পনা করতে পারে না, সংশয়ীর বিরোধকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অথচ সংশয়, বিরোধ, এই জীবন। সকলকেই খগেন বাবুর রাস্তার পথিক হতে হবে। এই হোলো মানবের আদিম অভিশাপ। মানুষকে সভ্য হতেই হবে। সভ্যতা বনাম দ্বিধা, তাকে পাশ কাটিয়ে চলবে কে? হয় সে অবসর-প্রাপ্ত বৈষ্ণব রায়বাহাদুর, না হয়, অক্ষয়।

নীলকণ্ঠ না হয়ে বাঁচা যায় না। সুজনের নিজের মনে আগে একটা সামঞ্জস্য ছিল, এখন যেন বিচ্যুতি ঘটেছে। এত অল্প বয়সে, আত্মসন্ধানী হবার পূর্ব্বেই, তার প্রয়োজন ঘটবার পূর্ব্বেই সে কেন সোশিয়ালিষ্ট হোলো? এ যেন বাঙ্গালী মেয়েদের কালচার—দ্বিতীয় ভাগের পরই রবীন্দ্রনাথ। ইজ্‌মে বিশ্বাস পরাশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা।

সোশিয়ালিজমের নামে কেমন একটা আতঙ্ক আসে—অজানা অনিশ্চিতের ভয়, আবার একটা মোহও আছে। সোশিয়ালিষ্ট হোক গরীব গৃহস্থের সন্তান, যাদের বুকে অর্থ-বৈষম্য বিঁধেছে। মনে মনে যারা স্নব, যারা সমাজের ঊর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করতে চায়, তারা যখন ভাবে অর্থ নেই বলেই পাচ্ছে না তারাই তখন পরাভবের স্বীকার করতে সাম্যবাদের আশ্রয় নেয়। বিজন স্নব নয়, টেনিস খেললেই স্নব হয় না, পয়সার তার অভাব নেই, আদুরে ছেলে। সোশিয়ালিজম শোভা পায় সুজনের নিজের, তার মতন অবস্থার লোকের। বৈষম্য রয়েছে সর্ব্বত্র, কিন্তু বৈষম্য-বোধ আসে নিম্নশ্রেণীর, যারা দলিত পিষ্ট, যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খেতে হয়। বিজনের সোশিয়ালিজম বড়লোকের ছেলের খামখেয়াল। এও একপ্রকার রোমান্টিসিজম। অবশ্য প্রেমে পড়ার ফ্যাশান উঠে গেলে মন্দ হয় না।

বেলা বারটা বেজে গেল, অক্ষয় তখনও ফেরেনি। ঝি খুকীকে খাইয়ে দিয়েছে,

এবার সে ঘুমোতে যাবে। সুজন স্নানাদি শেষ করে খাবার চাইলে মহারাজের কাছে। খাবার পর বিশ্রাম করতে মন সরল না। খগেন বাবুর খোঁজ পাওয়া না গেলেও মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে খবরটুকু রমলাদিকে জানান হয়নি, সেজন্য মনটায় খচ্ করে উঠল। কিন্তু আবার মনে হোলো, দিয়েই বা কি হবে। রমলাদি তাঁকে পেলে আপন করবেন বলেছেন। অদূর সর্ব্বনাশের ছায়াপাত হয় সুজনের মনে। তার চেয়ে খগেন বাবু মাসীমার কাছে থাকুন—সেই ভালো। মুকুন্দ বলেছে মাসীমা দুটোর আগে ফেরেন না।

সুজন যখন মাসীমার বাড়ি পৌছল তখন প্রায় দুটো বাজে। কড়া নাড়তে মুকুন্দ বেরিয়ে এসে তাকে ছায়ায় অপেক্ষা করতে বললে; ঠাকরুণ আহারে বসেছেন, এখনই উঠলেন বলে, তারপর মুকুন্দ খেতে যাবে, ইতিমধ্যে—বাড়িতে বসবার ঘর না থাকার জন্য সে সঙ্কুচিত। তীর্থের অকিঞ্চনতা, কাশী ও কোলকাতার পার্থক্য সম্বন্ধে সুজন পুরোদস্তুর সজ্ঞান জেনেও মুকুন্দর লজ্জা গেল না। কোলকাতার অনেক দোষ, লোকগুলো নাক সিঁটকে হাঁটে, মোটর চড়ে কাদা ছিটুতে ছিটুতে যায়, মাল বোঝাই মোটরগাড়ি বলা নেই কওয়া নেই হুমড়ি খেয়ে ঘাড়ের ওপর পড়ে, দুধে জল, খাবার দামও বেশী, তরকারি পত্তর, মাছ, বিশেষতঃ গঙ্গার ইলিশ টাটকা মেলে না, কিন্তু, হাজার বার মুকুন্দ বলবে, ভদ্দর লোকের খাতির করা যায় সেখানে, ইচ্ছে হয়, দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে সিঙ্গড়া কচুরি খান, এক মিনিটে চপ কাটলেট গরম গরম এখানেও পাওয়া যায়, কিন্তু মুখে দেওয়া যায় না— ধূলো আর পাঁটির মাংস। ক্ষীর ভাল—বলে কি না 'খোয়া'। কিন্তু ক্ষীর খেয়ে খেয়ে কাশীর খোট্টাদের মতন ভুঁড়ো হবে কে। এক্কার ঠেলায় পথ হাঁটা যায় না— হাঁকাচ্ছেন ত এক্কা! ভাবছেন রথ! তবু যদি মোটর হোত! আর এত বিধবাও আছে! এধারে দেখুন, খালি হাত, ওধারে চান, থান কাপড়, তার ওপর মালা আর কুঁড়োজালি···সারাদিন সব চর্কীর মতন ঘুরছে। ষাঁড়গুলো যেন 'ক্যার' করে না কাউকে, দোকান থেকে ফল তুলে খাচ্ছে, তাদের মাথায় আবার সিঁদুর, গায়ে গোল গোল চূণে হলুদের ছোপ, লোকে আবার কুঁদো ষাঁড়কে নমস্কার করে! বেশী করে আবার বিধবার দল। আর ঘটি করে রাস্তার দুপাশের বটতলার নোড়া-নুড়ির মাথায় ঢালা! কাশী এলে কারুর মাথার ঠিক থাকে না—যেন ধর্ম্মের বড়-বাজার! হিন্দু ধর্ম্মের বিপক্ষে মুকুন্দ মন্তব্য প্রকাশ করে মহাপাতকী হতে চায় না,

কিন্তু ষাঁড়হীন, বিধবাশূন্য, নুড়িবিহীন কোলকাতাতেই যে ধর্ম্ম করা শ্রেয় সে বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

'দেখুন না বাবু, আমাদের বাবু কোলকাতা থাকলে কি অমন হতেন, না আপনারা হতে দিতেন? কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুরদের সঙ্গে ঘোরা ফেরা? মাসীমা এধারে অধীর হয়ে উঠেছেন। এবার ত নিরুদ্দেশ! ঐ শরীরে সহ্য হবে কত! বাবুর আমার চা নেই, সিগারেট নেই, খবরের কাগজ, বিলেতী ডাক, বইপড়া ঘুচে গেছে। মুখে কথাবার্ত্তা নেই। আমাকে বকেন না পর্য্যন্ত! আচ্ছা বাবু, আপনাকে মেমসাহেবের বাড়ি দেখেছি না?'

'কোন মেমসাহেব মুকুন্দ?'

'ঐ যে আপনাদের চিন্তামণির মেমসাহেব গো!'

'চিন্তামণির মেমসাহেব!'

'যিনি গো বাবুকে খুব যত্ন করলেন, তখন!'

'ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইখানেই দেখেছ নিশ্চয়।

মাসীমা বেরিয়ে এলেন, কিন্তু এক চটকা দেখে না চিনতে পারার দরুণ সুজনকে খগেন বাবুর বন্ধু হিসেবে আবার পরিচয় দিতে হোলো।

'কৈ বাবা, কিছু খবর পেলে?'

'এখনও পাই নি। আপনার কাছ থেকে খবর নিয়ে সন্ধান করব।' বৃদ্ধার আদেশে সুজন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে। এক গেলাস মিছরি-পানা সেবন ও মুখশুদ্ধির পর খগেন বাবুর কাশীবাসের বিবরণ যা জানা গেল তা এই: খগেনবাবু কাশী এসে প্রথম প্রথম রোজই প্রায় মাসীমার সঙ্গে দেখা করতেন, ইচ্ছেটা ছিল যে মাসীমা তাঁর বাড়িটা ছেড়ে ছেলের কাছেই থাকেন, কিন্তু সংসারে পুনরায় জড়িয়ে পড়ায় বৃদ্ধার ভীষণ আপত্তি ছিল। তবু খগেন বাবু প্রায়ই আসতেন শুখতো আর সজনে ডাঁটার ছেঁচকি খেতেন। মাস দু'এক পরেই তাঁর আসা কমে গেল। মুকুন্দর কাছে শুনলেন সাধু-সঙ্গ চলছে। কিছুদিন পরে খগেন বাবু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন। মাসখানেক পরে 'মুখখানি আম্‌সী করে ফিরে আসে, চোখের কোল বসে গিয়েছে' বলতে বলতে বৃদ্ধার চোখ চক্ চক্ করে উঠল। আবার কয়েক সপ্তাহ বেশ লক্ষ্মী হয়ে রইল, তারপর আজ কতদিন হোলো দেখা নেই, চিঠিপত্রও নেই। মুকুন্দ মাসীমার কাছেই থাকে। মুকুন্দ বল্লে,

'ঠাকরুণ বিয়ের কথা পেড়েছিলেন, মুখের সামনে হেসে উড়িয়ে দিলেন, রাগ করবার জো নেইত। কিন্তু বাড়ি গিয়ে আমার ওপর হানা দিতে লাগলেন। সে সব কী বুক বেঁধান কথা, তিনি নাকি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনলে আমার বাহুচাল্যি থাকবে না, মুড়ুলি করতে পারব না, আর যদি বিয়েই করেন তবে এমন মেমসাহেব দেখেই করবেন যে আমাকে জব্দে রাখবে।' মাসীমা তাকে ধমক দিলেন। মাসীমা হাই তুলছেন দেখে সুজন চলে এল।

বাড়ি এসে সুজন হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ল। মাথা ধরেছিল রৌদ্রে ঘুরে। একটু বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। অক্ষয় বাইরের পোষাক পরে সুজনের ঘরে এল। 'দুপুর বেলা কোথায় ঘুরতে যাও হে সুজন? এখনকার রোদ্দুরটা বড় খারাপ। সন্ধ্যার পূর্ব্বে না বেরোনই ভাল। আমাদের কথা ছেড়ে দাও, একেবারে সান্‌প্রুফ ওয়াটার-প্রুফ। তোমাদের সইবে না। আচ্ছা, একটু বিশ্রাম কর, তারপর চা খেয়ে বেড়াতে যেও। আজ আমার ফিরতে রাত হবে একটু বেশী। নেমন্তন্ন সেরে আসব, যেতেই হবে, ছাড়বে না কিছুতেই, মস্ত কন্‌ট্র্যাকটর, প্রায় বৎসরে দশ লক্ষ টাকার কাজ করে আমাদের, লোকটা বেশ ফুর্ত্তি দিতে জানে হে! নাতির মাথা মুড়োন কি ঐ রকম একটা কিছু। আচ্ছা শোও এখন। চেয়ে চিন্তে নিও। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, ঐ যে তোমাদের শাস্ত্রে বলে, নিজেই নিজের যত্ন কোরো। আমাকে অফিসের কাজ সেরে যেতে হবে।' অক্ষয় মোটর নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিশ্রামের পরও মাথা ছাড়ল না। চা খেয়ে খদ্দরের চাদর নিয়ে সুজন গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল। সোনালী আলো পড়েছে নদীর ওপর, সন্ধ্যা তখনও হয় নি। ঘাটে একজন অল্প পরিচিতের সঙ্গে দু চারটি কথা বিনিময় করে সে অহল্যাবাইএর মন্দিরের নীচে বসে পড়ল। এ ত মন্দির নয়, প্রাসাদ, দুর্গ। ধর্ম্মের জোরে মারহাট্টার ক্ষাত্রবীর্য্য কাশীর গঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত এসে আত্মসম্বরণ করেছে। এ-স্থাপত্যে আত্মনিবেদন নেই, আছে নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, অভ্রভেদী দম্ভ। মীরার মতন বৈষ্ণবী ছিলেন না অহল্যাবাই, বাঙ্গালীও নয়, অথচ হিন্দু। হিন্দুত্বের এই দিকটা রাজপুতানা কি মধ্যভারত ভিন্ন অন্য কোনো প্রদেশে চোখে পড়ে না। চারধারে ধূ ধূ করছে মরুভূমি, কিংবা লালমাটি ঢেউ খেলতে খেলতে দিগন্তে প্রসারিত হয়েছে। তার মধ্য থেকে হাজার ফুট উঁচু আর মাইল খানেক লম্বা এক পাহাড়, সেই পাহাড়টার বুকে এক কেল্লা, তারই পায়ের কাছে সহর বলতে যা কিছু, ভেতরে

সরু পাথর কাটা রাস্তা, সশস্ত্র প্রহরী-রক্ষিত সরু উঁচু ফাটক, আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করেন রাজপরিবার—সেখানে কি আছে কে জানে? আছে বীরত্ব আর গুপ্ত ষড়যন্ত্র, আছে সম্মান আর কৃতঘ্নতা—বড়-ছোটর যৌথ পরিবার। ওপরে ওঠ—সূর্য্যাস্ত দেখবে থরের ওপারে, পাহাড় সবুজ হয়েছে বর্ষার প্রারম্ভে, দূরে, ঐ দূরে আর একটা পাহাড় দেখা যায়—এক জায়গীরদারের কেল্লা, ভীষণ লড়াই হয়েছিল ওরই পাদদেশে···তখন ভারত ছিল স্বাধীন।

না, অহল্যা দেবীর মন্দিরে ধর্ম্ম নেই, আছে তার চেয়েও বড়, আত্মপ্রতিষ্ঠা।

সুজন বেশীক্ষণ অহল্যা দেবীর মন্দিরের আশ্রয়ে বসতে পারলে না। অত ভারী বাড়ির কাছে বসলে হাঁপ ধরে। সন্ধ্যা অজানিতে আত্মগোপন করেছে। নেমেছে অন্ধকার। সুজন ঘাট থেকে ফিরছে এমন সময় রমলা দেবীর সঙ্গে দেখা। বাড়িতে না পেয়ে তিনি ঘাটে সরাসরি চলে এসেছেন দেখা হবার আশায়। মুখে চোখে কিসের ব্যস্ততা।

একটু পাশে নিয়ে গিয়ে রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, তুমি আমাকে আজই, এখনই অন্য বাড়িতে নিয়ে যাও—আমি কিছুতে ওখানে থাকতে পারব না। বিকেলে আসনি কেন? বসেছিলাম কতক্ষণ ধরে।'

সুজন কেবল অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

'সুজন, উত্তর দাও, আসনি কেন? আমাকে বাড়িঅলী অপমান করেছে, তোমাকে নিয়ে খারাপ ইঙ্গিত করেছে। ঐ ছোট্ট খুদে বৌটার মন কি নীচু, জঘন্য, ছিঃ···মেয়েজাতেরই ওপর আমার অশ্রদ্ধা এসেছে ··আমি পারব না থাকতে, তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চল। যাবে কি না বল? চুপ করে কি দেখছ? আমার অপমান দেখবে? পুরুষ মানুষ না তুমি? না, খগেন বাবুর শিষ্য?'

'কি করছেন, রমাদি! রাস্তার লোকে···'

'রাস্তার লোক রাস্তার ডাষ্ট্‌বিন্‌এ পচে মরুক, কুকুরে খাক তাদের······তুমি আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চল।'

'চলুন এখান থেকে।'

রাস্তায় সুজন রমলা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসীমার বাড়ি যেতে আপত্তি কি?'

'যেখানে হোক্। মাসীমার বাড়ি? মাসীমার বাড়ি জান? এসেছেন ফিরে!'

'না, মাসীমার বাড়ির ঠিকানাটুকু।'

'বলনি কেন?'

'এই কাল টের পেয়েছি। বলব কি করে! তুমি যা করছ ক'দিন থেকে তাতে, তাতে আমার বড় ভয় হয়েছে।'

'ভয়! কেন, আমি কি করেছি? তুমি কেন ভয় পেলে ভাই? তুমি না সুজন? তোমার কাছে স্বাভাবিক ব্যবহার করব না ত কার কাছে করব? আচ্ছা, এই ভদ্র মহিলা হলাম।' রমলা দেবী হেসে উঠলেন।

'রমাদি, তোমার পায়ে ধরছি, একটু ঠাণ্ডা হও। আমার বড়, সত্যি বলছি, বড় ভয় করছে।'

রমলা দেবীর মুখের ওপর দিয়ে কে যেন শীতল হাত বুলিয়ে দিলে, চমক লাগল, একবার মাত্র পলক পড়ল, তারপর পাথরের মতন শান্ত কঠিন। অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর প্রস্তর মূর্ত্তি কথা কইলে—'সুজন, ভয় হয়েছিল কেন?'

'উন্মুক্ত প্রকৃতি কখনও দেখিনি।'

'তাইতে?'

'তার চেয়ে ভয়াবহ আর কি আছে? অবশ্য, আমার কাছে। আমি যে নিতান্ত সভ্য জীব, অভ্যাস হোলো আমার মাটি, সেটা টললে মাথা ঘুরে যায়। আমি আবরণে অভ্যস্ত।'

'ছাই, ছাই, মাটি নয়। ভাব মাটি, তার তলায় ছাই আছে, তাও নেই, ফাঁকা, ভুয়ো।'

'যাই বল। তুমি বড় অপ্রত্যাশিত ব্যবহার করছ এ ক'দিন।'

'তোমার কাছে অপ্রত্যাশিত ত? জানি তোমার প্রত্যাশা। "লক্ষ্মী মায়ের লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ঘরের বৌ।" ছোট বৌটির মতন, কেমন! ঐটুকু পুঁচকে মেয়ে কি ইঙ্গিত করেছে শুনবে? তোমার সঙ্গে আমি চলে এসেছি···দেওরের সঙ্গে··· কৃমি···ঐ ব্যবহার আমার নয় বলে অপ্রত্যাশিত! আর তাইতে ভয়!'

'ছেড়ে দাও ওসব কথা। ঐটুকু···'

'ঐটুকু মেয়ে! অথচ স্বামীকে এঁটুলির মতন আঁকড়ে ধরে আছে···কেবল কি ঐ মেয়েটি! বাড়ির গিন্নী পর্য্যন্ত বলে, আমাকে কাশীর বাড়িঅলী পেয়েছ?

আমার বাড়িতে তোমাদের রাসনীলে চলবে না···আমার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত! আর তাইতে তোমার ভয়। চমৎকার!'

'বেশ, কালই আমি অন্য বাড়ি দেখব···ওখানে থাকা হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি এখন কোথায় খুঁজব?'

'তোমার আত্মীয়ের বাড়ি?'

'তাঁর স্ত্রী নেই জানই ত। পিসীমাও দেশে গেছেন।'

'আমি বাইরের ঘরে শোব।'

'আমি সেইখানে শুই। কি করে সম্ভব বুঝে দেখ, রমাদি। অস্থির হলে চলে কি? আজ যা করে হোক রাতটা কাটিয়ে দাও।'

'তবে মাসীমার বাড়ি নিয়ে চল।'

'সেখানে মাত্র একটি ঘর।'

'তুমি দেখেছ? কবে গেলে? জেনেও আমাকে বলনি!'

'আজ দুপুরে দেখলাম। কি বলে পরিচয় দেব?'

'বলবে, তোমার আত্মীয়।'

'সে হয় না—অসম্ভব! আমিই তাঁকে চিনি না ভাল করে। আমিই তাঁর কে!'

'যদি খগেন বাবুকে সত্যি ভালবাসেন, তবে তুমি তাঁর সব। আমাকেও ঠাঁই দেবেন এক রাত্রের জন্য।'

'কি বলব?'

'বোলো, সাবিত্রীর দূর সম্পর্কের বোন···যা হয়। তাঁর বৌমার আত্মীয়াকে এই বিপদে ফেলে দেবেন না তিনি, আমি জানি। কালই আমি চলে আসব, অন্য বাড়িতে। ও বাড়ির মুখ দেখব না।'

'আচ্ছা, তাই চল। মনে হয় না। যাক্‌গে। একবার তোমার বাড়িটা ঘুরে যাব, তুমি কোথাও দাঁড়িও ভেতরে না যাও।'

'আচ্ছা, চাবি নাও। কোনো কথা বলতে পারবে না ওদের সঙ্গে। ব্যাখ্যা কোরো না।'

সুজন রমলা দেবীর বাড়ি প্রবেশ করে সোজাসুজি ওপর তলায় চলে গেল। কর্ত্তা বসে তামাক খাচ্ছেন। বৃথা বাক্যব্যয় না করে সুজন তাঁকে সাফ্‌ বলে

দিলে যে রমলা দেবী আর এ বাড়িতে থাকবেন না। বাড়ি ভাড়া অগ্রিম দেওয়া ছিল। কর্ত্তা পনের দিনের নোটিশ চাইলেন। সুজন কালই আরো পনের দিনের ভাড়া দিয়ে যাবে প্রতিশ্রুতি দিলে। জিনিষপত্র যেমন ঘরে সাজান আছে তেমনই থাকবে—যতদিন না নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহিণী ঘোমটার আড়াল থেকেই বল্লেন, 'এ বাড়ি আপনাদের সুবিধে হবে না আগেই জানতাম। আমার গুচ্ছির খরচ কপালে ছিল কেবল!' দোতলার সব ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে একটি দরজায় তালা লাগিয়ে সুজন নেমে এল।

রমলা দেবী অন্ধকার একটি কোণে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সুজনের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

'রমাদি, তুমি বরঞ্চ আপাততঃ আমার ওখানেই চল। আমার ঘরে বোসো, কেউ নেই, আমি শীঘ্রই মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসছি।'

'সেই ভাল। তোমাকে কষ্ট দেবো না।'

'কষ্ট নয়, কষ্ট আর কি?'

সুজনের কণ্ঠে দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করে রমলা দেবী হঠাৎ জ্বলে উঠে বল্লেন, 'তুমি কি ভাব, কাশী সহরে একরাত্রি থাকবার স্থান নেই? কোনো নাটমন্দিরে সারারাত কাটিয়ে দেব।'

'চুপ কর। তুমি বসবে চল। তারপর কি হয় দেখছি।'

সুজন রমলা দেবীকে নিজের ঘরে বসিয়ে দরজা বাইরে থেকে সন্তর্পণে বন্ধ করে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাসলীলা

রাসে শ্রীরাধা

'পরিচয়ে' রাসের ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে রাসের উল্লেখ নাই। মহাভারতের খিলপর্ব্ব হরিবংশে রাসের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু 'রাস' শব্দ নাই—হরিবংশে রাসের নাম 'হল্লীশ'। ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতোক্ত রাসের বিবরণের আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ তিন গ্রন্থের কোন গ্রন্থেই রাধার নাম নাই, অথচ বর্ত্তমানে রাসের সহিত শ্রীরাধা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। রাসের বিবরণ-মধ্যে রাধা কবে প্রবেশ করিলেন।

হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বর্ণিত রাসের আমরা যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ঐ ঐ বিবরণে কামায়ন বা erotic elements পর পর ক্রমশই ঘনীভূত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, পর্য্যায়ক্রমে ঐ সমস্ত বিবরণে নূতন নূতন রেখা-সম্পাত (new touches) ঘটিয়াছে। এ প্রসঙ্গে পাঠকের স্মরণ হইবে, হরিবংশের বিবরণে রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সাময়িক অন্তর্দ্ধানের কথা নাই—যে অন্তর্দ্ধান পুরাণে বর্ণিত রাসলীলার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ব্রহ্মপুরাণেই প্রথম দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইলেন, এবং গোপীরা ব্যগ্র মনে সমবেত হইয়া বৃন্দাবনের রমণীয় বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন—

> এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
> গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্॥

ইহার উপর বিষ্ণুপুরাণ এই নূতন রেখাপাত করিলেন যে, গোপীরা বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন লক্ষ্য করিলেন; এবং তাঁহাদের মনে হইল যেন ঐ পদচিহ্নের সহিত কোন সুকৃতকারিণীর চরণচিহ্ন মিলিত হইয়াছে—

> কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
> পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনাহ্ল্পতনুনি চ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে রাস হইতে অন্তর্দ্ধানের সময় এক গোপীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, হরিবংশ বা ব্রহ্মপুরাণে ইহার কোন ইঙ্গিত নাই। ইহা বিষ্ণুপুরাণের অতিরিক্ত touch—হয় ত' উহা ঈর্ষাকষায়িত গোপীদিগের কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র। পরবর্ত্তী ভাগবতে কিন্তু এই ঘটনা প্রকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ভাগবতকার ইহাও বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই কামিনীর দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সেই গোপবধূ বিলাপ করিতে লাগিল। অন্যান্য গোপীরা তাহার বিলাপ শুনিয়া তাহার সহিত মিলিতা হইলেন, এবং সকলে যমুনাপুলিনে সমবেত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তবগান করিতে লাগিলেন। ইহাই ভাগবতের প্রসিদ্ধ গোপীগীত। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং গোপীদিগের সহিত রাসনৃত্য ও বিহার বর্ণনা। আমরা দেখিয়াছি, ভাগবতের ঐ বর্ণনা কামায়ন-প্রচুর। কিন্তু তখনও রাধার নাম পাই না। ভাগবত ছাড়িয়া যখন আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণে আসি, তখনই রাধিকার প্রথম সাক্ষাৎ পাই এবং দেখিতে পাই ঐ ঐ পুরাণে কামায়ন চক্রবৃদ্ধি-প্রাপ্ত—It is eroticism run wild। সেখানে রাধা আছেন—চন্দ্রাবলী আছেন, আয়ান (রায়ান) আছেন। এক কথায় It is the wild carnival of love, or rather sensual lust—উত্তুঙ্গ অনঙ্গরঙ্গ, কামদেবের তাণ্ডব নৃত্য।

প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে এই রাসের বিবরণ। আমরা নিম্নে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।

একদা শ্রীহরির্নক্তং বনং বৃন্দাবনং যযৌ।
শুভে শুক্ল ত্রয়োদশ্যাং পূর্ণচন্দ্রোদয়ে মধৌ॥

'একদা মধুমাস সমাগমে শুভ শুক্লা ত্রয়োদশীর রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ রমণীয় বৃন্দাবনে গমন করিলেন।' শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, বৃন্দাবন বিবিধ কুসুমামোদে আমোদিত ও বিচিত্র ভ্রমর-ঝঙ্কারে মুখরিত এবং কোকিলের কলতানে পুলকিত। আর দেখিলেন,—

প্রসূনৈঃ চম্পকানাঞ্চ কস্তূরী চন্দনান্বিতৈঃ।
রতিযোগ্য বিরচিতৈর্নানাতল্পৈঃ সুশোভিতম্॥

'বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে রতিযোগ্য নানা সজ্জা চম্পক কুসুমে ও কস্তূরা চন্দনে

সুবাসিত হইয়া শোভা পাইতেছে।' তখন তিনি 'কামুকী' গোপীদিগের অনঙ্গবর্দ্ধন বংশী-রব করিলেন—

চকার তত্র কৌতুক্যাৎ বিনোদি মুরলীরবম্।
গোপীনাং কামুকীনাঞ্চ কামোদ্বর্দ্ধন-কারণম্॥

সেই মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাধিকা কামাতুরা হইয়া তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্না হইলেন এবং কোনরূপে আত্ম-সংবরণ করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ গৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই বংশী-রবের অনুসরণ করিলেন—

তৎ শ্রুত্বা রাধিকা সদ্যো মুমোদ মদনাতুরা।
যযৌ তদনুসারেণ প্রসমীক্ষ্য চতুর্দ্দিশম্॥

রাধিকার প্রিয়তমা ৩৩ জন প্রিয় সখী কামার্ত্তা হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার সহচরী হইল।

কুলধর্ম্মং পরিত্যজ্য নিঃশঙ্কাঃ কামমোহিতাঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ বয়স্যাশ্চ তাঃ সুশীলাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
রাধিকায়াঃ প্রিয়তমা গোপীনাং প্রবরা যযৌ॥

এই ৩৩ জন প্রবরা গোপীর প্রত্যেকের অনুগতা আবার সহস্র সহস্র সখী চলিল। ফলতঃ বৃন্দাবন ঐ রজনীতে গোপীসংকুল হইয়া উঠিল।

গোপীগণ বৃন্দাবনে কৌমুদীপ্লাবিত, কুসুমামোদিত, স্বর্গাদপি রমণীয় রাসমণ্ডল দর্শন কবিলেন।

প্রাপুর্ব্বৃন্দাবনং রম্যং দদৃশূ রাসমণ্ডলম্।
স্বর্গেভ্যঃ সুন্দরং দৃশ্যং রাকাপতিকরান্বিতং॥

শুভক্ষণে রাধিকা সেই তরুণী সখীদিগের সহিত রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

শুভক্ষণে প্রবিবেশ রাধিকা রাসমণ্ডলং।
সর্ব্বাভিরালিভিঃ সার্দ্ধং ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজং॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই অনিন্দ্যসুন্দরীকে দেখিয়া মদনাতুর হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন—

জগামানুব্রজাং প্রীতো সস্মিতো মদনাতুরঃ।

রাধিকাও সেই শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া কামবাণ-প্রপীড়িতা ও হতচেতনা হইয়া সর্ব্বাঙ্গে পুলক ধারণ করিলেন—

মূর্চ্ছামবাপ সা সদ্যঃ কামবাণ-প্রপীড়িতা।
পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী-বভূব হতচেতনা॥

তখন কৃষ্ণ রাধাকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন—রাধিকাও প্রাণনাথকে আলিঙ্গন করিয়া 'চুচুম্ব হ'।

কৃত্বা বক্ষসি তাং প্রীত্যা সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব চ।
প্রাণাধিকং প্রাণনাথং সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব হ॥

এইবার রাসেশ্বরীর সহিত রসিকশেখর রতি-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

জগাম রসিকাসার্দ্ধং রসিকো রতিমন্দিরং

অতঃপর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত উভয়ের রতি-ক্রীড়া সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন—আমরা রুচিভঙ্গের ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তবে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করি—

এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মুখঃ।
সুস্বাপ রাধয়া সার্দ্ধং রতি-তল্পে মনোহরে॥
শৃঙ্গারাষ্ট প্রকারঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
নখ দন্ত করাণাঞ্চ প্রহারঞ্চ যথোচিতং॥

অর্থাৎ বিপরীতাদি অষ্টপ্রকার শৃঙ্গার, যথারীতি নখদন্তকরাদির প্রহার—কিছুরই অভাব হইল না। এ রতিরণে কাহার হার কাহার জিত হইল, তাহা নিরাকরণ করা গেল না—

শৃঙ্গারকুশলৌ তৌ তু কামশাস্ত্রমুপস্থিতৌ।
রতিযুদ্ধ বিরামশ্চ ন বভূব দ্বয়োরপি॥

স্থলে রতিশেষ করিয়া অতঃপর রাধাকৃষ্ণ যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন—

স্থলে রতিরসং কৃত্বা জগাম যমুনা-জলং।
রাধয়া সহ কৃষ্ণশ্চ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনঃ॥

জলের মধ্যেও বহুবিধ বিহার হইল—

তাঞ্চ নগ্নাং সমাশ্লিষ্য নিমমজ্জ জলে হরিঃ।
প্রকৃত্যাভ্যন্তরে ক্রীড়ামুত্তস্থৌ চ তয়া সহ॥
গৃহীত্বা পীত বসনং চকার তং দিগম্বরং।
বনমালাঞ্চ চিচ্ছেদ দদৌ তোয়ঃ পুনঃ পুনঃ॥

কিন্তু ইহাতেও দামোদরের কামনির্ব্বাপণ হইল না—তিনি রাধাকে লইয়া রমণীয় মলয়-দ্রোণীতে প্রস্থান করিলেন—

সর্ব্বত্র রমণং কৃত্বা রাধা-বেশং বিধায় চ।
জগাম মলয়দ্রোণীং রম্যাং চন্দনবায়ুনা॥
শয্যাং পুষ্পময়ীং কৃত্বা তত্র রেমে তয়া সহ।
অতীব সুখসম্ভোগাৎ মূর্চ্ছাং সংপ্রাপ রাধিকা॥

—সেখানে নানাবিধ অনঙ্গরঙ্গের অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু আমরা আর এ বিষয়ের বিস্তার করিব না।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের ৫২ ও ৫৩ অধ্যায়েও রাধাকৃষ্ণের বিহার বর্ণনা আছে। সেখানে ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার শ্রীরাধাকে নিতান্ত নির্লজ্জা কামুকীভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। 'মহাভাবময়ী' 'কৃষ্ণ-প্রাণ-সমা'র এ কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! আমরা নমুনাস্বরূপ দুই চারিটা শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিব—তাহার কিন্তু অনুবাদ দিব না।

রাধিকা-বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
মামারুহেত্যেব মুক্ত্বা সোঽন্তর্দ্ধানঞ্চকার হ॥
তূর্ণং কৃষ্ণং সমাশ্লিষ্য জহার মুরলীং রুষা।
মালাঞ্চ পীতবসনং নগ্নং কৃত্বা চ মানিনী॥
যযুর্ব্বনান্তরে যত্র সুরম্যং রাসমণ্ডলং।
তত্র চম্পকতল্পেষু সুস্বাপ চ তয়া সহ॥
নানা প্রকার শৃঙ্গারং কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
চকার কামী ক্রীড়াঞ্চ কামিন্যা সহ কৌতুকী॥
বভূব সুরতি স্তত্র সুচিরঞ্চ তয়োর্ম্মুনে!
রতির্নিষ্ঠা তয়ো রম্যা বিরতির্নাস্তি তৎক্ষণং॥
রাসং নির্ব্বত্য রাসে চ রাসেশ্বর্য্যা সমন্বিতঃ।
স্বয়ং রাসেশ্বরস্তস্মাদ্ যমুনাপুলিনং যযৌ॥

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যদিও শ্রীরাধিকা রাসেশ্বরী এবং ঐ রাসে রাধা ও কৃষ্ণ রতোৎসবে ব্যাপৃত, তথাপি পুরাণকার পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্ম-বিষ্ণু-ভাগবতে বর্ণিত রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য গোপিকাদিগের সহিত বিহার-ব্যাপার ভুলিতে পারেন নাই।

এবং গৃহে গৃহে রম্যে নানা মূর্ত্তিং বিধায় চ।
রেমে গোপাঙ্গনাভিশ্চ সুরম্যে রাসমণ্ডলে ॥

অর্থাৎ যত গোপী, তত মূর্ত্তি রচনা করিয়া শ্রীহরি সেই সুরম্য রাসমণ্ডলে তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত বিহার করিলেন। জয়দেবের ভাষায়—'চুম্বতি কাম্ অপি, শ্লিষ্যতি কাম্ অপি, কাম্ অপি রময়তি রামাম্।' গোপীদিগের তৎকালে কিরূপ অবস্থা হইল ?

মুক্তকেশানি নগ্নানি বিচ্ছিন্ন-ভূষণানি চ।
বেশোচ্ছন্নানি মত্তানি মূর্চ্ছিতানি স্মরেণ চ ॥
কঙ্কণানাং কিঙ্কিণীনাং বলয়ানাঞ্চ নারদ !
সদ্রত্ন-নূপুরাণাঞ্চ শব্দ-যুক্তানি সন্ততম্ ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

'সেই রাসমণ্ডলে কামমত্তা গোপীগণ নগ্না ও মুক্তকেশী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বেশভূষা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সেই রাসমণ্ডলী হইতে তখন সেই ব্রজবধূগণের কঙ্কণ কিঙ্কিণী বলয় ও নূপুরের ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।'

এইরূপ স্থলক্রীড়া শেষ করিয়া তাঁহারা সকলে জলে প্রবেশ করিলেন এবং দীর্ঘকাল জলক্রীড়ার পর জল হইতে উঠিয়া গোপিকাগণ বসন পরিধান করিয়া রত্ন-দর্পণে নিজ নিজ মুখকমল দর্শন করিতে লাগিলেন।

এবং কৃত্বা স্থল-ক্রীড়াং যযুস্তানি জলং মুদা।
কৃত্বা তত্র চিরং ক্রীড়াং পরিশ্রান্তাতি সাম্প্রতম্ ॥
তূর্ণং জলাৎ সমুত্থায় বাসাংসি পরিধায় চ।
দদৃশু র্মুখপদ্মানি সদ্রত্ন-দর্পণেষু চ ॥

কিন্তু তখনও বিরাম নাই—

কাশ্চিৎ কামাতুরা কৃষ্ণং বলাদাকৃষ্য কৌতুকাৎ।
হস্তাদ্বংশীং নিজগ্রাহ বসনঞ্চ চকর্ষ হ ॥
চুচুম্ব গণ্ডে বিম্বৌষ্ঠে সমাশ্লিষ্য পুনঃ পুনঃ।
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ মুখচন্দ্রং স্তনোন্নতং ॥
মূর্চ্ছামবাপুস্তাঃ সর্ব্বা নব-সঙ্গম মাত্রতঃ।
বভূবু রচলাস্যাঙ্গাঃ পুলকাঞ্চিত-বিগ্রহাঃ ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

আলিঙ্গন, চুম্বন, কটাক্ষপাতন ও স্তনঘর্ষণের পর রমণোল্লাসে গোপীগণ মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ কিন্নরগণ সস্ত্রীক সমবেত হইয়া আকাশ হইতে এই

লীলা দেখিতে ছিলেন। এ কামায়নের অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা কামবাণে প্রপীড়িত হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল—হইবারই কথা!

সমাজগ্মুঃ সুবাঃ সর্ব্বে সকলত্রাশ্চ সানুগাঃ।
পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গাঃ কামবাণ প্রপীড়িতাঃ॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

ইহার তুলনায় পদ্মপুরাণের রাসবর্ণনা অতি লঘু ও তরল—নিতান্ত tame affair। অবশ্য সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কোটিকন্দর্প-দর্পহারী লাবণ্যের কথা স্মরণ করিয়া, মন্মথাস্ত্রে পীড়িতা হইয়া গোপস্ত্রীরা রজনীতে শয্যা হইতে উত্থিতা হইলেন এবং "বিকীর্ণাম্বরমূর্দ্ধজা" অবস্থায় কুলশীললাজ, পতি সুত বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া রাসমণ্ডলে সমবেত হইলেন এবং সেই আত্মারামের সহিত রমণ করিলেন। পদ্মপুরাণকার বলেন, এই গোপীরা পূর্ব্ব জন্মে দণ্ডকারণ্য-বাসী মহর্ষি ছিলেন। বনবাসে রামচন্দ্রের অভিরাম মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদের চিত্তে তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা জাগিয়াছিল (ভোক্তুম্ ঐচ্ছন্)। সেই জন্য এ জন্মে তাঁহারা বৃন্দাবনে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখন ভগবানে কাম অর্পণ করিয়া মুক্তি লাভ করিলেন।

হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ।

পদ্মপুরাণোক্ত রাসের বিবরণ এই :—

বৃন্দাবনে মহারম্যে ফলপুষ্পবিরাজিতে।
রম্যং নিনাদয়ন্ বেণুং তত্রাস্তে যদুনন্দনঃ॥
অবধীরিত-কন্দর্পকোটি লাবণ্যমচ্যুতম্।
সর্ব্বা গোপস্ত্রিয়ো দৃষ্ট্বা মন্মথাস্ত্রেণ পীড়িতাঃ॥
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাস্ত গোকুলে।
হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥
ক্রোধেনৈব যথা দৈত্যাঃ সমেত্য মধুসূদনম্।
নিধনং প্রাপ্য সংগ্রামে হতা মুক্তিমবাপ্নুয়ুঃ॥
কামক্রোধৌ নৃণাং লোকে নিরয়স্যৈব কারণম্।
হরিং সমেত্য ভাবেন মুক্তা গোপ্যঃ সুরদ্বিষঃ॥

কামাদ্ভয়াদ্বা দ্বেষাদ্বা যে ভজন্তি জনার্দ্দনম্।
তে প্রাপ্নুবন্তি বৈকুণ্ঠং কিং পুনর্ভক্তিযোগতঃ॥
তস্য বেণুধ্বনিং শ্রুত্বা রজন্যাং বল্লবাঙ্গনাঃ।
শয়নাদুত্থিতাঃ সর্ব্বা বিকীর্ণাম্বরমূর্দ্ধজাঃ॥
ত্যক্ত্বা পতীন্ সুতান্ বন্ধূংস্ত্যক্ত্বা লজ্জাং কুলং স্বকম্।
জগৎপতিং সমাজগ্মুঃ কন্দর্পশরপীড়িতাঃ॥
সমেত্য গোপ্যঃ সর্ব্বাস্তু ভুজৈরালিঙ্গ্য কেশবম্।
বুভুজুশ্চাধরং দেব্যঃ সুধামৃতমিবামরাঃ॥
তাভিঃ সর্ব্বাভিরাত্মেশঃ ক্রীড়য়ামাস গোব্রজে।
তেনাপি তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা রেমিরে নির্ভয়া ব্রজে॥
ইত্যেবং রময়ামাসুরহন্যহনি কেশবম্।
বৃন্দাবনে মনোরম্যে কালিন্দীপুলিনে তথা॥

—পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৬২-৭৩

পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতালখণ্ডের ৪০ অধ্যায়েও রাধার কথা আছে—কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাধার তুলনায় তিনি স্বর্গের দেবী। এমন কি মুনিবর নারদ সেই ভাবময়ী কৃষ্ণবল্লভাকে দর্শন করিবার জন্য তদ্গতচিত্তে অপেক্ষা করিয়াছিলেন—

অশোকলতিকামূলমাসাদ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রতীক্ষমানো দেবীং তাং তত্রৈবাগমনেন হি।
স্থিতোঽত্র প্রেমবিকলশ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণবল্লভাম্॥—পদ্মপুরাণ

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পরবর্ত্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের যে অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন—রাধয়া মাধবো দেবঃ মাধবেনৈব রাধিকা—পদ্মপুরাণ-ব্রহ্মবৈবর্ত্তের যুগে সে ভাব তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। অধিকন্তু উভয় পুরাণের মতেই শ্রীকৃষ্ণ রমণ এবং সমস্ত গোপীরা রমণী। চরিতামৃতকার এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ।
ইহাতেই অনুমানি রাধিকার গুণ॥

পরবর্ত্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মে গোপীরা শ্রীরাধার প্রিয় 'নর্ম্মসখী'—rivals নহেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করেন না, রাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটন করান।

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।

কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।

এই সখীতত্ত্ব—যাহার অপূর্ব্ব সংস্পর্শে রাসলীলায় এক অভিনব অধ্যাত্মিক আলোকপাত হইয়াছে—পুরাণকারদিগের তাহা অবিদিত ছিল। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমরা দেখিলাম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণ—উভয় গ্রন্থেই রাধিকা রাসেশ্বরী। পুরাণদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই প্রাচীনতর। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত রাধিকাকে যে বিশিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই একটা বিলম্বিত বিবর্ত্তনের দীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান। কিন্তু এক্ষণে ঐ ইতিহাসের পুনরুদ্ধার সম্ভব কি ?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কতদিনের গ্রন্থ ? হোরেস্ উইলসন্ সাহেব বলিতেন (ইনি পুরাণের অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ—উহার বয়ঃক্রম দুই তিন শত বৎসরের অধিক নহে। এ মত যে যুক্তিসহ নয়, সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণ চরিত্রে' তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জয়দেব গোস্বামী একাদশ শতকের শেষ ভাগের লোক। তাঁহার 'গীতগোবিন্দে'র কথা কে না জানেন ? ঐ গীতগোবিন্দের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ আর নায়িকা শ্রীরাধা। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি এই :—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে ! গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

'রাধে ! আকাশ দেখ ঘন ঘটায় সমাচ্ছন্ন, বনভূমি তমালদ্রুমে অন্ধকারময়। তাহাতে আবার রজনী উপস্থিত। আমার এ শিশুটি (শ্রীকৃষ্ণ) ভয়শীল—তুমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া গোষ্ঠে পহুঁছিয়া দাও। নন্দের এই নিদেশে পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধা-মাধবের যমুনাকূলে অনুষ্ঠিত বিজন কেলিসমূহ জয়যুক্ত হউক।' বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, যে সময় গীতগোবিন্দ রচিত হয়, সে সময় 'ঐ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক 'মেঘৈর্মেদুরম্' ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না।' এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গীতগোবিন্দের ঐ প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ বেশ অস্পষ্ট—টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই উহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই।

কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে জয়দেবের ঐ 'মেঘৈর্মে্দুরম্' শ্লোকের ভাবার্থ বেশ বিস্পষ্ট হয়। কিরূপে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলেন, একদা নন্দ শিশু কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনের ভাণ্ডীর-বনে গোচারণ করিতেছিলেন—

একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবন ভাণ্ডীরে চারয়ামাস গো-কুলম্॥—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৫।১

ইতিমধ্যে মায়া-শিশু শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করিলেন—

চকার মায়য়াকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে!

সেই মেঘাবৃত গগন ও শ্যামল কানন দেখিয়া বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে নন্দ ভীত হইলেন—নন্দো ভয়মবাপ হ।

মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরং।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দং চ দারুণম্॥—১৫।৪

নন্দ বলিতে লাগিলেন—'কি করি, কোথা যাই—ভবিতা বালকস্য কিম্? শিশুর কি উপায় হয়?' এদিকে শ্রীকৃষ্ণ যেন ভয়ে ভীত হইয়াই পিতার কণ্ঠ ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ।

এমন সময় শ্রীরাধা—(তিনি তখন পূর্ণ কিশোরী)—শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীত।

এতস্মিন্ অন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।

নন্দ রাধিকার রূপলাবণ্যে বিস্মিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ভক্তিভরে বলিলেন—'আমি ঋষিমুখে শুনিয়াছি, তুমি পরা প্রকৃতি—কমলার অপেক্ষাও হরি-প্রিয়া।

জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ।
পরাং নির্গুণমচ্যুতাম্ + + ॥

'হে ভদ্রে! এই তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর—যথা সুখে বিচরণ কর—পরে মনোরথ পূর্ণান্তে আমার পুত্র আমাকে দিও—

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে! যথাসুখং।
পশ্চাৎ দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্॥—১৫।২৫

রাধা মধুর হাস্য করিয়া বালককে গ্রহণ করিলেন—

জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ।

এবং কৃষ্ণকে সানন্দে বক্ষে ধারণ করিয়া যথেপ্সিত দূরদেশে গমন করিলেন—

এবমুক্ত্বাতু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
গত্বা দূরে তং নিনায় বাহুভ্যাংচ যথেপ্সিতম্॥—১৫।২৫

স্মৃতিমাত্রে সেই বিচিত্র কাননে অপূর্ব্ব রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল—রাধা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন—সেখানে পীতাম্বর বনমালী মদনমোহন কিশোর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত রহিয়াছেন—

পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।
কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্॥

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সেই ক্রোড়স্থ শিশু অন্তর্ধান করিয়াছেন—তাঁহার স্থলে নবযুবা শ্যামসুন্দর!

ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনং।
সর্ব্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ॥ —১৫।১৫

রাধিকা অনিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিত্ত লালসায় পূর্ণ হইল—তিনি 'মদনাতুরা' হইলেন—

নিমেষরহিতা রাধা নব সঙ্গম লালসা।
পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা॥

ইহার পর 'রহঃ কেলয়ঃ' যেমন হওয়া উচিত সম্পন্ন হইল—কোনরূপ অঙ্গহানি হইল না—

পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাং।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাং নখদন্তৈশ্চকার হ॥

রতিরণের পর রাধিকা যেমন শ্রীকৃষ্ণের বেশ বিন্যাস করিতে গেলেন—কি আশ্চর্য্য! অমনি কৃষ্ণ কিশোর রূপ পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ শিশু রূপ পরিগ্রহ করিলেন! রাধা কি করেন? ত্বরায় বৃন্দাবন হইতে বহির্গত হইয়া মেঘজলের মধ্যে আদ্র বসনে রোরুদ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া নন্দ-গৃহে উপনীত হইলেন এবং যশোদাকে পুত্র প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

গৃহাণ বালকং ভদ্রে ! স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয় ।

যশোদা তাহাই করিলেন—

যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ ।

ইহাই ব্রহ্মবৈবর্তের বিবরণ—জয়দেবের ‘মেঘৈর্মেদুরম্’ শ্লোক যে এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে কি ?

বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—বর্ত্তমান আকারের ব্রহ্মপুরাণ জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ-শতকের পূর্ব্বগামী ।

বঙ্কিমচন্দ্র ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত আছে—যে পুরাণ জয়দেবের অবলম্বন ছিল—উহা প্রাচীন ব্রহ্মপুরাণ নহে—উহা একরূপ অভিনব গ্রন্থ। কারণ, মৎস্য পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্তের যে পরিচয় আছে, তাহার সহিত প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণের সঙ্গতি নাই ।

রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য-সংযুতম্ ॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতম্ বর্ণ্যতে মুহুঃ ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে ॥

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহ-চরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-সংযুক্ত পুরাণই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ।

প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না, নারায়ণ নামে অন্য এক ঋষি নারদকে বলিতেছেন। ইহাতে রথন্তর কল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের নামগন্ধ নাই। অধিকন্তু এক্ষণকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতি-খণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গই উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে দৃষ্ট হয় না।

খুব সম্ভব, মৎস্যপুরাণের উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাতন গ্রন্থ এবং তাহাতে রাধা রাসেশ্বরীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্তের অবর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা অসম্ভব।

কালিদাস পঞ্চম শতকের লোক। তাঁহার ‘মেঘদূতে’ বর্হাপীড়াভিরাম গোপবেশ বিষ্ণুর উল্লেখ আছে—

বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ

—কিন্তু শ্রীরাধা যে তাঁহার বাম পার্শ্বে স্থিতা—একথা ত' নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

তবে কি কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ নিতান্ত আধুনিক? কখনই নয়—কারণ, 'হাল সপ্তশতী' নামক প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহে রাধিকার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেই প্রাকৃত শ্লোকটি এই ঃ—

মুখমারুতেণ তং কহ্ন! গোরঅং রাহিআএ অবণোন্তো।
এতাণং বল্লবীণং অন্নাণং বি গোরবং হরসি॥—১।৮৯

ইহার সংস্কৃত রূপ এই ঃ—

মুখমারুতেন ত্বং কৃষ্ণ! গোরজো রাধিকায়া অপনয়ন্।
এতানাং বল্লবীনাম্ অন্যাসামপি গৌরবং হরসি॥

'রাধিকার মুখসক্ত গোধূলি মুখমারুতে অপনোদন করিয়া হে কৃষ্ণ! তুমি অন্য গোপিকাদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।'

হাল কতদিনের লোক? অধ্যাপক সেনা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শতবাহন রাজা প্রথম পুলোমির এক শত বৎসর পরে 'হাল সপ্তশতী' সংগৃহীত হইয়াছিল (Senart in zeits. f. Ind. u. Iran)। সেনা প্রথম পুলোমিকে খৃষ্টপর দ্বিতীয় শতকে ফেলিয়াছেন। ইহা যদি ঠিক্ হয়, তবে সপ্তশতীকার হাল তৃতীয় শতকের লোক। 'হরপ্রসাদ লেখমালা'র দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব 'রাজা হাল ও পাটলীপুত্র' প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, প্রথম পুলোমির রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক এবং রাজা হাল খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দীর লোক। তাহা যদি হয়, তবে সপ্তশতীতে সংগৃহীত ঐ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাকৃত শ্লোক (উহা হালের স্বরচিত নয়) খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং কৃষ্ণলীলায় রাধার যোগ খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তিন মাস দেশে কাটিয়ে মাঝ-শ্রাবণে কর্ম্মস্থানে ফিরলাম। এবার কোকন প্রদেশ, কুলাবা জেলা। একেবারে নূতন রকমের আবহাওয়া। গুজরাত ছিল শস্যশ্যামল সমতট—সাহেবদের ভাষায়, The garden of India। কর্ণাটক ছিল কঠিন নীরস মালভূমি। আর আমার এই নূতন জেলা অর্দ্ধেক সহ্যাদ্রির পর্ব্বতমালা, আর অর্দ্ধেক আরব সমুদ্রের বেলাভূমি। পাহাড়গুলি সুন্দর সবুজ, কোথাও কোথাও গহন বনে ঢাকা। বেলাভূমি যেন এক দীর্ঘ বিস্তৃত নারিকেল বাগান। সমুদ্র থেকে ছোট বড় কত খাড়ি ডাঙ্গার ভিতর ঢুকে দেশ আরও দুর্গম করে তুলেছে! খাড়ি পার না হয়ে, ঘাট না ভেঙ্গে, কোন দিকে দশকোশ পথও যাওয়া যায় না। গ্রামগুলি সব ছোট ছোট, পথ-ঘাট সর্ব্বত্র ঠিক দুর্গম না হলেও সুগম কোথাও নয়। কৃষাণ-কুল দারিদ্র্যপীড়িত, সারা বছর চাষবাস করে আধপেটা বই খেতে পায় না। এদেশে পয়সা কড়ি যা একটু আছে, তা জেলেদের আর আগরীদের। জেলার দক্ষিণ ভাগে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু তারাও গরীব, ধার করে মামলা মোকদ্দমা করাই তাঁদের প্রধান আনন্দ। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে পাড়াগেঁয়ে লোক যারা আয়কর (Income tax) দিত, তারা অনেকেই জেলে। এই জেলেরা বোম্বাই শহরে ও শহরতলীতে মাছ বেচে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। এরা সব জাতে কোলী। এদের সাজ—পরণে কৌপীন বা গামছা, গায়ে কম্বলের চৌবন্দি, মাথায় লাল টুকটুকে বনাতের দীর্ঘ টুপী। মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে সমানে মেহনত করে। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই গড়ন চমৎকার, চলন ভারী সুন্দর। আপনারা অনেকেই বোম্বাই সহরে সমুদ্রকিনারে এদের দেখে থাকবেন। একবার দেখলে ভোলা শক্ত। এই কোলীরা খুব আমুদে ও কষ্টসহিষ্ণু লোক, কিন্তু একটা কিছু আয়েব এদের আছে যে জন্য এরা কখনও খোলা দরিয়ায় মাল্লাগিরী করতে যায় না। সুরতের মাছিরা কি রত্নাগিরির দাল-

দীরা জাতে জেলে হলেও দলে দলে জাহাজে চাকরী করতে যায়। কিন্তু কোলীরা কখনও জাত-ব্যবসা ছাড়ে না। পর্তুগীজ আমলে এদের অনেকে খৃষ্টান হয়েছিল। আজকের দিনে তাদের বংশধরেরা কেউ কেউ ভারী মজা করে। মন্দিরেও যায়, গীর্জ্জাতেও যায়, বামুনকেও মানে, পাদ্রিকেও মানে। কোলীদের একজন রাজা বা সর্দ্দার এখনও আছেন। ভদ্রলোকের রাজ্য নেই, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে তাঁর অগাধ ক্ষমতা। কুলাবা জেলার সমস্ত কোলীরাই তাঁকে রাজা বলে খাতির করে ও তাঁর ফতোয়া মাথা পেতে নেয়। আমি এঁর সাহায্যে অনেক ছোট-খাটো দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করেছিলাম। এই জেলে জাতের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হওয়ার কারণ পরে বলব। এদের প্রধান উৎসব হচ্ছে নারিকেল পূর্ণিমা। বর্ষা-শেষে সেই দিনে এরা মহা ধূম করে সমুদ্র-দেবকে নারিকেল দিয়ে পূজা করে। দেবতাকে পূজায় তুষ্ট করে পরদিন হতে বড় বড় ডিঙ্গা সব বারদরিয়ায় নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। কেন না, বর্ষার কয়েক সপ্তাহ ত এই বড় নৌকাগুলো বেরোয় না! সব ডাঙ্গার উপর তোলা থাকে, ছপ্পর ঢাকা। আমরা আমলাবর্গ সবাই এই উৎসবের দিনে কোলীদের মিছিলের সঙ্গে গিয়ে সমুদ্রে নারিকেল ফেলতাম। এটা প্রায় Official Function বলে গণ্য হত।

আগরীদের জাতব্যবসা নুন তৈরী করা। আগর কথাটার মানে saltpan। যারা অবস্থাপন্ন লোক, তাদের নিজেদের নুনের কারখানা আছে। গরীব আগরীরা মহাজনদের কারখানাতে চাকরী করে। তবে আজকাল এদের অনেকে চাষবাসও ধরেছে, কেন না দেশী নুনের ব্যবসা লিভারপুলের তাড়ায় অনেক কমে গেছে। এ আমি আগের কথা বলছি। এখন গান্ধীজীর কল্যাণে আবার কতটা তফাৎ হয়েছে, তা আমি জানি না। এদের সম্বন্ধে একটা কথা এখনও মনে আছে যে এদের নামকরণ জন্ম-বার থেকে হয়ে থাকে—যথা সোমিয়া, মঙ্গলিয়া, শুকিয়া ইত্যাদি। সাধারণতঃ এরা বেশ জোরালো ও সাহসী মানুষ, নিজেদের মধ্যে মারামারি, খুনোখুনি, দাঙ্গাহাঙ্গামা খুব করে। তবে চুরী ডাকাতির দিকে বড় একটা যায় না।

কুলাবা জেলার পাহাড়ী বাসিন্দা বলতে দুই জাত—কাতকরী ও ঠাকুর। এদের রঙ্গ, চেহারা, চালচলন, রীতি-নীতি অনেকাংশে মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভীলের মত। থাকে পাহাড়ের উপর বন জঙ্গলে, কাঠ কাটে, মজুরী করে, আবার মধু ইত্যাদি নানারকম

বনের দ্রব্য সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে বেচে বেড়ায়। কাতকরীরা ভাল শিকারী—চমৎকার তীরন্দাজ। বনে তিতির, খরগোশ, কখনও বা বরাহ, মেরে গ্রামের বড় লোকেদের বাড়ীতে জোগায়। খেতে না পেলে মাঝে মাঝে ডাকাতের দলও পাকায়, কিন্তু ছিঁচকে চুরী বড় একটা করে না। ঠাকুরেরা অপেক্ষাকৃত নিরীহ জীব। তাদের শিকার-টিকারের সখ নেই। কুলি-মজুরী করে খায়। কখনও বা জঙ্গলের মাঝে একটু আধটু জমী নিয়ে সামান্য চাষবাস করে। কাতকরীদের মতন ডাকাতি করার সাহস এদের নেই, তবে দরকার পড়লে চুরী করে বই কি! কাতকরীরা হনুমানের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। পার্ব্বণ উৎসবাদিতে হনুমানের মাংসই এদের প্রধান ভোজ্য। পাহাড়ের নীচের গ্রামগুলোতে হনুমানের উপদ্রব বেশী হলে গ্রামের লোকে এই কাতকরীদেরই ডেকে পাঠায়। কারণ অন্য হিন্দুরা ত শ্রীরামের ভক্ত হনুমানকে মারতে পারে না!

এই কুলাবা জেলাতে অনেক ইহুদীর বাস। তারা কিন্তু আমাদের কলকাতার মুর্গীহাটার অধিবাসী আধা-আরব বাগ্দাদী ইহুদীদের মত গৌরবর্ণ বিদেশী নয়। তারা নিজেদিকে বলে বেন-ই-ইসরাইল। আর এক নাম, Black Jews। ভারতবর্ষে এক কোকন ছাড়া আর কোথাও এদের বসতি নেই। কত শতাব্দী আগে যে এরা ভারতবর্ষে এসেছিল, তা ঠিক বলা যায় না। তবে এখন একেবারে নেটিব বনে গেছে। নেটিবের মতনই কাল বরণ, ধুতি পরে বেড়ায়, গ্রাম্য মরাঠীতে কথাবার্ত্তা কয়। এরা পুরানো ইহুদী নামগুলো একেবারে ছেড়ে দিতে পারে নেই, তবে এখন নানা রকমের দেশী নামও নিয়েছে। যেমন বাপুজী, বাবাজী, নানাসাহেব ইত্যাদি। এদের পদবী অন্য মারাঠাদের মত গ্রামের নামের সঙ্গে 'কর' যোগ করে হয়ে থাকে। দুই একটা নামের নমুনা দিচ্ছি—শেলম বাপুজী, সুলেমান নানা সাহেব পেনকর, রূবেন এজরা মহাড়কর ইত্যাদি। বেনি ইসরাইলরা অধিকাংশ পল্লীগ্রামবাসী। গ্রাম্য সমাজে এরা তেলী বলে খ্যাত—জাত-ব্যবসা ঘানি চালান। আগেকার কালে অনেকে পল্টনে কাজ করত। এখন ইংরেজী লেখাপড়া শিখে চাকরী-বাকরী, ওকালতী ডাক্তারীও করে। কিন্তু অন্য যাই করুক, এরা মহাজনী, সুদখোরী, করে না অপর দেশের ইহুদীদের মত। হয়ত এরা যখন ভারতবর্ষে এসেছিল তখন ইহুদীরা পরাধীন জাত হয় নেই, আপন দেশে সকল রকম কাজই করত। আর একটা আশ্চর্য্য কথা যে এরা এতদিন

এদেশে পৌত্তলিকের মাঝে বাস করেও বিশুদ্ধ (Judaism) একেশ্বরবাদ ত্যাগ করে নেই। মাঝে মাঝে বড় গ্রামে এদের ধর্ম্মমন্দির (Synagogue) দেখা যায়। আমার বড় ভাল লেগেছিল এই জাতটাকে। ঘরদোর তকতক করছে, মানুষগুলো সব সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর মেয়েপুরুষ সকলেই বেশ ভদ্র অথচ রাশভারী। জাতে তেলী হলে কি হয়, এদের একটা বিশেষত্ব আছে।

আহমেদাবাদ বা বিজাপুরের মত উত্তর কোকনেও গ্রামের পাটিল আছে। কিন্তু যেমন গ্রাম, তেমনি পাটিল। বেচারারা এত গরীব যে সময় সময় ক্যাম্পে দেখেছি দুধ বা জ্বালানি কাঠ নিজেরাই মাথায় করে নিয়ে আসছে, আর সামান্য দু পয়সা বকশিশের জন্য হাত পাতছে! পাটিলের চেয়ে বরং অন্ত্যজ জাতীয় চৌকীদার গুলোকে মানুষের মতন মনে হত। চারটী বছর মানী, জবরদস্ত, পাটিদার ও লিঙ্গায়েৎ গ্রামনীদের সঙ্গে কাটিয়ে এখানে এসে প্রথম প্রথম বড় হতাশ বোধ হত। এই রকম পাটিল নিয়ে কাজ করব কি করে! খাজনাই বা আদায় হবে কেমন করে, শান্তিরক্ষার কাজই বা চলবে কি রকম করে! ক্রমশঃ সয়ে গেল। দেখলাম যে এ প্রদেশে মাইনে করা তলাটী বা village accountant-এর প্রভাব বেশী। পাটিল তারই হুকুমবরদার। যেখানে গ্রামের মত গ্রামই নেই, সেখানে মাতব্বর আসবে কোথা থেকে!

সারা জেলার মধ্যে সব চেয়ে দুর্গম ভাগ হচ্ছে করজত তালুকা। এই তালুকার খানিকটা একেবারে পশ্চিম ঘাটের মাথায়। এখানে ডোঙ্গর কোলী বলে এক পাহাড়ী জাত বাস করে। তারা ভীল কি কাতকরীদের মত aboriginal বা বর্ব্বর জাত নয়। কিন্তু ভয়ানক দুর্দ্দান্ত। আমার সময়েতেও ঠিক পোষ মানে নেই। কিছুকাল আগে দাজী বিঠু শিন্দে নামে এক মারাঠা এই ডোঙ্গর কোলীদের নিয়ে করজত অঞ্চলে এক মস্ত ডাকাতের দল গড়ে তুলেছিল। সরকারকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এই দল ভাঙ্গতে। যত দূর মনে আছে, দাজী বেঁচে থাকতে দল ভাঙ্গে নেই। দাজীর দল গ্রামে বস্তীতে মামুলী রকমের লুট-তরাজ ত করতই, উপরন্তু ঘাটমাথায় যাবার সড়কের উপর রীতিমত টেক্স আদায় করত পথিকদের কাছ থেকে। ডাকাতের প্রশংসা করতে নেই, কিন্তু লোকে বলত যে দাজী শিন্দে গরীব দুঃখীর উপর জুলুম করত না। বরং বড় লোকের পয়সা লুটে নিয়ে গরীবদের বিতরণ করত। সে যাই হোক, কোন রাজাই ত আর ডাকাতকে প্রশ্রয় দিতে

পারেন না! তাই দাজীর দলকে ধরবার জন্য সরকার নানা রকম আয়োজন করে-ছিলেন। কিন্তু ওদের এমন পাকা গোয়েন্দার ব্যবস্থা ছিল, যে পুলিস কাছাকাছি এলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ডাকাতের দল অদৃশ্য হয়ে যেত। একবার পালালে সেই গহন বনের মাঝে গিরি-দরী-কন্দরে কোথায় লুকিয়ে পড়ত, ধরে কার সাধ্য!

এ গল্পটা বললাম এই জন্য যে পাঠক বুঝবেন কুলাবাটা কি রকম অদ্ভুত জায়গা ছিল। এক দিকে ঘন অরণ্যাবৃত করজতের ঘাট, চোর ডাকাতের ঘর; অন্য দিকে বোম্বাই বন্দরের পরপারে, বোম্বাই-এর Suburb বিশেষ, উরন শহর, ইংরেজ পারসী প্রভৃতি হ্যাট-কোট-পরা সাহেব-সুবোর বাস।

কুলাবা জেলার সদরের নাম আলিবাগ। ছোট্ট শহর। সমুদ্রের কিনারে আমাদের কয়েকজন আমলার বাঙ্গলা। তার দক্ষিণে নূতন মানমন্দির, তখনও তৈরী হচ্ছে। তার খানিকটা আগে হাঁসপাতাল ও ডাক্তার সাহেবের কুঠি। কাছেই দেশী ক্লাব—ক্রীড়া-ভবন। সাহেবদের ক্লাব ছিল না। বোধ হয় আজও নেই। আমরা পুলিস সেপাইদের সঙ্গে রোজ হকী খেলতাম, বেশীর ভাগ সময় জলের ধারে বালির উপর। তার পর, কারও না কারও বাঙ্গলাতে জমায়ৎ হয়ে তাস-পাশা খেলে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতাম। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর-প্রকৃতি বয়স্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাদের কোন রকম খেলা-ধুলোতে যোগ দিতেন না। তবে দেশী ক্লাবেও যেতেন না, পাছে ইজ্জতের কোন রকম হানি হয়। বাকী অফিসার কজন সবাই ইংরেজ ছিলেন। বিজাপুরের চেয়েও ছোট সমাজ, তায় ক্লাব নেই, আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ রকম মেশামিশিই ছিল।

আমার কলেকটার ছিলেন ব্রাউন বলে এক আধ-বয়সী ভদ্রলোক। ভারী চমৎকার মানুষ। হতে পারে, কাজকর্ম্মে খুব বেশী হুশিয়ার ছিলেন না, কেন না শেষ বয়সেও তেমন বড় চাকরী কিছু পান নেই। তবে মানুষটী যে রকম সৎ, সরল ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, তাতে হুশিয়ার হলেও বেশী দূর উঠতেন কি না সন্দেহ। কারোয়াহি নইলে সংসারে কি আর কিছু পাওয়া যায়! আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই বললেন, "ওহে! এখানে কাজকর্ম্ম বেশী নেই। আমি চারটের সময় কাছারী শেষ করি। তুমি আমার সহকারী, তিনটে অবধি খাটলেই যথেষ্ট। তারপর চা খেয়ে খুব খানিকটে হকী খেলবে, রাত্তিরে নিজের পড়াশুনা করবে, তাহলেই সময়টা দিব্যি কেটে যাবে। নাই বা রইল নাচ, বড়খানা, ক্লাব!"

আমাদের কলেকটারীতে একখানা বড় Life boat ও একখানা সাধারণ Jolly boat সাজ সরঞ্জাম সমেত ছিল। সমুদ্রে কোন নৌকার বা জাহাজের বিপদ আপদ signal হলেই বড় নৌকাটা তক্ষণি বেরিয়ে যেত। ব্রাউন নিজে পারলেই যেতেন। আমাদের কাউকে কাউকে কখন কখন সঙ্গে নিতেন। সামনের সমুদ্রে খুব কম জল, আর জলে ডোবা অজস্র পাথর। কাজেই বিপদ আপদ বর্ষাকালে মাঝে মাঝে হতই! এই নৌকা দুটো চালাবার জন্য একজন বুড়ো বিচক্ষণ তাণ্ডেল ও আট জন মাল্লা ছিল। সবাই জাতে কোলী। আমরা সমুদ্রের তুফানকে ডরাতাম না বলে এরা আমাদিকে বড় ভালবাসত। ব্রাউন এদের চোখে দেবতা বিশেষ ছিলেন। আমিও তাঁর এসিষ্টাণ্ট বলে একটা ছোট খাটো উপদেবতা বনে গেছলাম। একদিন আমি পুরোপুরি কোলীর সাজ পরে বইঠা হাতে, জাল কাঁধে, একখানা ছবি তোলালাম। সে ছবি পেয়ে আমাদের মাল্লারা যে কি খুশীই হল, কি বলব! কোলী রাজা পর্য্যন্ত এসে একখানা চেয়ে নিয়ে গেলেন। বললেন, "বড় করিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখব।" আমাদের তাণ্ডেল ছিল বহু কালের পুরানো লোক। সেকালের জাহাজ ডুবি নৌকা ডুবির কত গল্প করত! তার বাঁধা বুলি ছিল, "জাহাজের সাহেব কাপ্তানগুলো বড্ড মদ খায়! নইলে বোম্বাই-এর বাতিঘর আর আমাদের খান্দেরীর বাতিঘর এ দুটোর মাঝে গোলযোগ কি করে হতে পারে, সাহেব?" ব্রাউনের নাম করে কেবলই বলত, "সাহেব ত সাহেব, ব্রাউন সাহেব! রাত বারোটাই বাজুক, একটাই বাজুক, সিংনেইল হলেই আমাদের সাথে বেরিয়ে যাবে।" বাস্তবিকই ব্রাউন বাহাদুর লোক ছিলেন। যখন জার্ম্মান যুদ্ধ বাধল, তখন তিনি পেনশন নিয়েছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পলটনে নাম লেখালেন। একবার বেলজিয়ম থেকে জখম হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু সেরেই আবার ছুটলেন লড়াইয়ের ময়দানে। এবার আর সহজে নিষ্কৃতি পেলেন না। একখানি পা কেটে দিয়ে এলেন যুদ্ধের রাক্ষসীকে!

ব্রাউনের মত দিলদরিয়া মানুষ যেখানে কর্ত্তা, সেখানে সামাজিক ও official (কর্ম্ম সংক্রান্ত) জীবন জলের মত বহে যাবে, এই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। একটী দিনের জন্যও কোন বিষয়ে খিটির-মিটির হয় নেই। শুধু আমার নিজের কথা বলছি না। সকলেরই মুখে একটা সহজ আনন্দের ভাব সব সময় দেখা যেত। অবশ্য এটা অনেকাংশে আবার climatic—জল বায়ুর প্রভাব। ঘণ্টাখানেক ধরে

সমুদ্রে স্নান করে, বালির উপর হকী খেলে, মাঝে মাঝে নৌকায় বেড়িয়ে কি আর মানুষ বদ মেজাজী থাকতে পারে! নোনা হাওয়ার ozone মনের ময়লাও ত পুড়িয়ে দেয়।

আমাদের মফঃস্বলে বেরিয়ে যাবার আগে ব্রাউন বিলেত চলে গেল। এক নূতন কলেকটর এলেন। তাঁরও নাম B.। বুড়ো লোক, কমিশনার হওয়ার কথা। তা নয়, তাঁকে পাঠিয়ে দিলে কি না এই ক্ষুদ্র জেলার হাকীম করে! ভদ্রলোক প্রথম এসে দিন কয়েক সব সময় মেজাজ খারাপ করে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে খেলা ধূলো করতেনই না, দেখা হলেই আপিসের কথা কইতেন, আর সবাইকে বলতেন—আমি ছুটীর দরখাস্ত করেছি, এই মাস পরে দেশে চলে যাব, কিন্তু বেশী দিন এ ভাব রইল না। মাসখানেক নোনা জলে সাঁতরে, আর সমুদ্রের ঘুম-পাড়ানি গান শুনে ভদ্রলোকের ব্যাধি সব সেরে গেল। আমি বাঁচলাম। মনে বড় ভাবনা হয়েছিল, এ রকম বড় সাহেব নিয়ে চালাব কি করে।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

স্পেনে অন্তর্বিরোধ

[১]

মাসাধিক কাল থেকে স্পেন্‌দেশের শোচনীয় অন্তর্বিরোধ সংবাদপত্র-পাঠকদের মন অভিভূত করছে। ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে জনগণের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে যে-সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আজ তার সমূহ বিপদ উপস্থিত—হয়ত বা তার পতন এখন আসন্ন, অন্ততঃ স্পেনের সৈন্যবল ক্যাথলিক্ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান এবং ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সাহায্যে তার উচ্ছেদসাধনের ব্রত গ্রহণ করেছে। এ-সঙ্ঘর্ষ ইয়োরোপের এক প্রান্তে উদিত হ'লেও সকল দেশের দৃষ্টিই আজ এর উপর নিবদ্ধ; যে-দুই আদর্শ ও মতবাদের সঙ্ঘাত এই গৃহ-যুদ্ধের রূপ নিয়েছে, তার পরিচয় এখন আর পৃথিবীর কোনও এক কোণে প্রচ্ছন্ন নেই।

স্পেনের আভ্যন্তরিক সংগ্রাম থেকে জগদ্ব্যাপী প্রলয়ের সূচনা হবে কিনা এ-প্রশ্নই আজ চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। সোশ্যালিষ্ট্ ভাবাপন্ন স্পেনের বর্ত্তমান রাষ্ট্রশক্তি ফরাসী ও রুষ সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করছে, অপরপক্ষে ফাশিষ্ট্ জার্ম্মানি ও ইটালির কাছে বিদ্রোহীদের জয়-কামনাই স্বাভাবিক। ইয়োরোপ যখন ১৯১৪ সালের মতন আবার প্রায় সমকক্ষ দুই রাজ্যসমষ্টিতে বিভক্ত, তখন তুচ্ছ কোন ঘটনা থেকে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ যেখানে উপস্থিত সেখানে উপলক্ষের অভাব হয় না। ভবিষ্যদ্বাণী সর্ব্বদাই দুঃসাহসের পরিচয়, তবে এক্ষেত্রে ভরসার কথা এই যে শোনা যায় হিট্‌লারের সমর সজ্জা সম্পূর্ণ হ'তে এখনও কিছু দেরী আছে। তাছাড়া ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ব্লুম্ শান্তিপ্রিয়, ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ আচরণ অনিশ্চিত এবং স্পেনের ব্যাপারে বোধহয় প্রায় কোন দেশবাসীই একমত নয়। সুতরাং ইয়োরোপে শান্তিভঙ্গ না হওয়ার সম্ভাবনা যে এখনও যথেষ্ট আছে এ-কথা স্বীকার করা যেতে পারে।

তবুও স্পেনের দুর্দ্দশা অনেককে ব্যথিত ও বিচলিত করবে। আন্তর্জাতিক

সংগ্রাম আমাদের কাছে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়, সে সঙ্ঘর্ষ যেন মানব-সভ্যতার চির সহচর। অন্তর্বিরোধ পক্ষান্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করে, কেননা এর হাত থেকে সাধারণ লোকেরও নিস্তার দুর্লভ। বহির্যুদ্ধের সময় প্রতিবেশী আমাদের বন্ধু, শত্রুর সামনে জাতীয় একতা প্রাণে সাহস আনে ; গৃহ-বিরোধ দেশের প্রতি কোণে, এমন কি বহু পরিবারেরও মধ্যে পর্য্যন্ত, সন্দেহ ও হিংসার সৃষ্টি করে। দেশবাসীদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ তাই অস্বাভাবিক বাতুলতা রূপে প্রতীয়মান হয় ; আবিসিনিয়ায় গ্যাস প্রয়োগে নির্ব্বিকার থাকলেও স্পেনের হত্যাকাণ্ডে মন শিউরে ওঠে। অথচ ইতিহাসে অন্তর্বিরোধের কাহিনী কিছু সামান্য নয়। ইয়োরোপের অতীতে এক একটা যুগ এসেছে যখন প্রতি দেশের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিরোধ প্রচণ্ডভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্ম সংস্কারের সময় অন্তর্যুদ্ধ প্রায় শতাব্দীকাল বহু দেশকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল এ-কথা সর্ব্বজনবিদিত। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্ত্তী যুগেও আবার অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী অনুরূপ গৃহবিবাদের আমরা পরিচয় পাই, এবার সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল উদার মতবাদের সঙ্গে রক্ষণশীল মনোভাবের। সোশ্যালিষ্ট-ফাশিষ্ট্ সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে ইয়োরোপ হয়ত আবার এক বিরোধের যুগে প্রবেশ করছে। এভাবে দেখলে স্পেনে তাণ্ডবলীলাও শেষ পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হয় না। কারণ স্পেনে বিদ্রোহীরা অতীতের অর্দ্ধ ফিউডাল্ অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চাইলেও আসলে সোশ্যালিজ্‌মের গতিরোধই তাদের প্রচেষ্টার মূল অর্থ।

কিন্তু কথা উঠতে পারে যে আভ্যন্তরিক বিবাদের কি সকলক্ষেত্রেই বিনাযুদ্ধে নিষ্পত্তি সম্ভব নয়? শান্তির পন্থা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় এবং ঊনবিংশ শতকে জাতীয় রাষ্ট্রের যে-আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষার সম্ভাবনাও অবশ্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে ঐক্য সেখানেই সম্ভব যেখানে অন্ততঃ কিছুদূর পর্য্যন্ত আদর্শের মূলগত মিল থাকে। যে-মুহূর্ত্তে স্বার্থের ও স্বার্থপ্রসূত ভাববাদের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় তখন থেকেই শান্তিরক্ষা দুরূহ হয়ে ওঠে। বুদ্ধিবাদ এ-বিপদ থেকে আমাদের আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারে নি, কেননা তার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিংশ শতক হয়ত তাই শেষ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের ইতিহাসে অন্তর্বিরোধের আর একটি যুগরূপেই গণ্য হবে।

[২]

স্পেনের প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। রোমসাম্রাজ্যের অবসানে কিছুদিন গথ্ রাজত্বের পর এদেশ আরব বা মূর্দের অধিকারে আসে। তারপর খৃষ্টীয় খণ্ডরাজ্যগুলি ধীরে ধীরে ইস্লাম্কে বিতাড়িত ক'রে এক যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের পরিণত করল; এ-সংগ্রামকে ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধ রূপেই দেখা হয়—ফলে সে সময় থেকেই স্পেনে ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের প্রবল প্রতিপত্তি দৃঢ় স্থাপিত হয়েছিল। ক্যাথলিক্ বিশ্বাস স্পেনের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল, প্রটেষ্টান্ট্ বিদ্রোহ তাকে বিশেষ টলাতে পারে নি; পোপ্-প্রাধান্যের নিষ্ঠাবান সমর্থক ডমিনিকান্ এবং জেস্যুইট্দের অভ্যুদয় হ'ল স্পেন দেশেই। আজ পর্য্যন্ত স্পেনে ক্যাথলিক্ প্রতাপের অবসান ঘটে নি; এই প্রতিষ্ঠানের বিপুল অর্থবল এবং গ্রামবাসী কৃষকদের উপর এর প্রভাব এখনও সে দেশে সকল সংস্কার ও আধুনিক আদর্শানুযায়ী সংগঠনের পথে প্রধান বাধা। স্পেনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও প্রথম থেকে প্রকাশ পেয়েছিল; এখানে ফিউডাল্ ভূস্বামীদের প্রভুত্ব বিশেষ খর্ব্ব হয় নি, প্রজাদের উপর তাদের আধিপত্য ছিল প্রচণ্ড; বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হিসাবে, রাষ্ট্রশক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা এদের সমীহ করে' চলেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের দৌলতে যে-মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্যদেশে পুরোহিত ও জমিদারকে খর্ব্ব করেছিল, স্পেনে নানা কারণে তার প্রসার হয় নি—দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার উপনিবেশ সমূহ স্থাপনা এবং ইয়োরোপে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে স্পেনের সামরিক খ্যাতি বাড়লেও তাতে স্থায়ী আর্থিক উপকার হয়েছিল বলা চলে না। এ-ভাবে প্রথমে হ্যাপ্স্বার্গ্ ও পরে বুর্ব্বন্ রাজবংশের অধীনে স্পেনের প্রাচীন সামাজিক গঠন শতাব্দীর পর শতাব্দী অপরিবর্ত্তিত থেকে গেল।

নেপোলিয়ানের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যখন সমস্ত স্পেন্ বিদ্রোহ করে, তখনই প্রথম পুরাতন ভাবধারার পাশে নূতন চিন্তার আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল; বিপ্লবী ফ্রান্সের আদর্শে স্পেনীয় উদার দল ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এক নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাব করে। বিদেশী সৈন্যদল বিতাড়িত হবার পর বুর্ব্বন্ বংশীয় রাজা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে' ১৮১২ সালের শাসন-পদ্ধতি বর্জ্জন করলেন—তাঁর এ-কার্য্য অবশ্য প্রাচীন-পন্থীদের আন্তরিক সমর্থন পেয়েছিল। সেই থেকে স্পেনের জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরল, নূতন ও পুরাতন আদর্শের দ্বন্দ্ব সে অবধি কখনও সম্পূর্ণ মেটে নি। এ-

সংগ্রামের ইতিহাস বড় বিচিত্র ; বিদ্রোহ, শাসন-সংস্কার, অবাধ কর্তৃত্বের প্রত্যাবর্ত্তন, কোনটারই অভাব হয় নি কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অভাবে এ-সব কাহিনী ইতিহাসের ছাত্রের জ্ঞাতব্য মাত্রে পর্য্যবসিত হয়ে রয়েছে। পশ্চিম ইয়োরোপের বহু দেশের তুলনায় স্পেন্ যে পুরাকালের আবহাওয়া সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি এই কথাটাই শুধু সাধারণ লোকে মনে রাখতে পারে। ইতিমধ্যে একবার রেপাব্লিক্ স্থাপিত হ'লেও শীঘ্রই বুর্ব্বন্ বংশ সিংহাসনে ফিরে আসে এবং বলা বাহুল্য যে নামতঃ নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার মূলগত কোন পরিবর্ত্তন হয় নি।

স্পেন্‌দেশে পুরাতন সমাজ দীর্ঘস্থায়ী হবার প্রধান কারণ চার্চ্চ্ ও অভিজাত গোষ্ঠীর প্রতাপ এবং আর্থিক উন্নতির অভাবে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ব্বল অবস্থা। কিন্তু উনবিংশ শতকে অন্য অনেক দেশে যে-পরিবর্ত্তনের স্রোত এসেছিল স্পেনে তা' বাধাপ্রাপ্ত হ'লেও তার ফলে সমাজের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠাতে ঐক্যের বদলে দুই বিরোধী শক্তি ক্রমশঃ জাতিকে বিভক্ত করে' ফেল্‌ল। এ-অবস্থা বহুদিনব্যাপী হ'লে বোধহয় উভয়দিকেই চরম মতের আদর বাড়ে, সঙ্ঘাতের আবর্ত্তে মধ্যপন্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। রাশিয়ার সঙ্গে স্পেনের সাদৃশ্য তাই লেনিনের চোখে পড়েছিল। গত শতকের উদার ও রক্ষণশীল মতসঙ্ঘর্ষ তাই স্পেনে অকস্মাৎ বর্ত্তমান যুগোপযোগী সোশ্যালিষ্ট্-ফাশিষ্ট্ বিরোধের চরমতম রূপে পরিণত হ'তে পেরেছে।

[৩]

রাজা আল্‌ফন্‌সোর অক্ষমতায় শাসনকার্য্য প্রায় অচল হয়ে ওঠাতে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ প্রিমো দ্য রিভেরা ডিক্‌টেটার্ রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর দক্ষতার অভাব ছিল না কিন্তু পরিবর্ত্তনেচ্ছু মতবাদগুলিকে দমিয়ে রাখা ক্রমশঃই দুঃসাধ্য হচ্ছিল। সে-সময়ে স্পেনে অনেকেই বলাবলি করত যে এই সেনাপতি-শাসকের কৃতকার্য্যতার উপরই রাজবংশের ভাগ্য নির্ভর করছে। ১৯৩০ সালে নানা শত্রুর চক্রান্তে প্রিমো দ্য রিভেরার পতন ঘটে—তার কয়েকমাসের মধ্যেই আল্‌ফন্‌সোকে পলায়ন করতে হয়। ১৯৩১এর ১৪ই এপ্রিল দ্বিতীয়বার স্পেন্‌দেশে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল। এত সহসা এই বিপ্লব ঘটেছিল যে পুরাতনপন্থীরা কোন বাধা দিতে পারে নি কিন্তু জাতির মধ্যে একমতের অভাব প্রকাশ

পেতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে স্পেনের রেপাব্লিক্ আজকের সঙ্কটে উপনীত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে কি হবে এখন বলা শক্ত কিন্তু অন্তর্বিরোধের সহজ অবসান এবং স্থায়ী শান্তি এক্ষেত্রে বোধ হয় আশার অতীত।

বিরোধের বর্ত্তমান অবস্থা এবং স্পেনের গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস বুঝবার পক্ষে যে-সকল ঘটনা ও মতবাদ সাহায্য করে এবার তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ইয়োরোপীয় অন্য অনেক দেশের মত স্পেনেও অসংখ্য রাষ্ট্রীয় দলের উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু সর্ব্বত্রই পোলিটিকাল্ মতামতকে তিনভাগে ভাগ করা সম্ভব। ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে এ তিন-জাতীয় চিন্তা দক্ষিণ, মধ্য ও বাম বিশেষণ তিনটির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভায় এই তিন মূলদলের সভ্যেরা সভাপতির দক্ষিণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও বামদিকে আসন গ্রহণ করত ব'লেই নামগুলির প্রচলন হয়েছিল। দক্ষিণমার্গ পুরাতন বিধিব্যবস্থা ও প্রাচীন সমাজের সংরক্ষণ অথবা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিলাষী ; বামপন্থা তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ সম্পূর্ণ নূতন আদর্শে সমাজ পুনর্গঠন এবং আমূল পরিবর্ত্তনই তার লক্ষ্য। মধ্যমত এ দুয়েরই চরমভাব বর্জ্জন করে' একটা মাঝামাঝি অবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করে। এই মধ্যমতবাদ শ্রেয়স্কর ব'লে মনে হ'লেও সঙ্কট ও সংগ্রামের সময় তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে; তাই বিপ্লবের ইতিহাস মুখ্যতঃ দক্ষিণ ও বামের সঙ্ঘাতের আকারেই দেখা দেয়। মধ্যস্থানীয় দলগুলির কতক দক্ষিণপন্থা অবলম্বন করে, অপরের ঝোঁক অন্যদিকগামী হ'তে বাধ্য হয়। স্পেনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ-সত্যের উদাহরণ আবার পাওয়া গেল।

[৪]

স্পেনের দক্ষিণমার্গীয় মতসমষ্টি চারটি রাষ্ট্রিক দলে বিভক্ত বলা যায় ; কিন্তু এদের বাহ্যিক সকল পার্থক্যকে অতিক্রম করে' একটি সাধারণ রূপ প্রকাশ পাচ্ছে যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের ইচ্ছার মূলোৎপাটন করে' প্রাচীন অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ক্যাথলিক্ প্রতিষ্ঠান, অভিজাত ভূস্বামিগণ ও তাদের প্রভাবান্বিত গ্রামবাসী কৃষকেরা দক্ষিণপন্থার পরিপোষক ; সৈন্যসামন্তের সহানুভূতি যে এদিকে তার প্রমাণ বর্ত্তমান বিদ্রোহেই প্রকাশ পাচ্ছে। স্পেনের জাতীয় ঐতিহ্য ও অনুন্নত আর্থিক অবস্থা দক্ষিণমতের প্রাচীন সুস্পষ্ট স্বরূপটি অক্ষুন্ন রেখেছে, জার্ম্মানি বা ইটালির অনুরূপ মতবাদের মতন তাকে কোন নূতন আবরণের

সাহায্য নিতে হয় নি। কিন্তু স্পেনে ধনিকতন্ত্র সেকেলে হলেও সোশ্যালিজ্‌মের পরম শত্রু।

রাজতন্ত্রের প্রকাশ্য-সমর্থকদলের সংখ্যা কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ অল্পই ছিল ; বিদ্রোহ সফল হ'লেও বুর্ব্বন্‌বংশের প্রত্যাবর্ত্তন স্থিরনিশ্চয় বলা চলে না। রাজতন্ত্রী নেতা সেনর্ সটেলোর কর্ম্মকুশলতার বিশেষ খ্যাতি ছিল ; তাঁর আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই মরক্কোস্থিত সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাজকুমার জুয়ান্‌ও নাকি প্রবাস থেকে এসে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছেন। দক্ষিণমার্গীয় দ্বিতীয় দলটি জমিদারদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ; এরও সংখ্যা অধিক নয় কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এদের অর্থবল এবং কৃষিপ্রধান প্রদেশগুলিতে প্রতিপত্তি প্রচুর আছে। জমিদারবর্গের স্বার্থহানি না হ'লে সাধারণতন্ত্র গ্রহণ করে' নিতে এদলের বিশেষ আপত্তি হ'ত না কিন্তু রেপাব্লিক্ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে জমি পুনর্বণ্টনের দাবী উঠেছে। প্রেসিডেন্ট্ আজানা কিছুদিন আগে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন যে দেশের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে অল্পলোকের করতলগত রয়েছে, তার প্রতিবিধান রাষ্ট্রের অবশ্যকর্ত্তব্য। সুতরাং এ-দল যে এখন নিশ্চেষ্ট নেই একথা সহজেই অনুমেয়।

অধ্যাপক গিল্ রব্‌লেস্ এর নেতৃত্বে ক্যাথলিক্ দলই এখন কিন্তু দক্ষিণ মতবাদের মেরুদণ্ড। কিছুদিন পূর্ব্বে এদের নূতন নামকরণ হয়—আক্‌সিয়ন্ পপুলার্। সংখ্যায়, সামর্থ্যে ও দৃঢ়চিত্ততায় এরাই সামাজিক পরিবর্ত্তনের পথে প্রধান কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে এদের নামও সার্থক হয়েছে—জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন ধর্ম্মানুরাগী প্রায় সকলেই এ-দলের সমর্থন করে। চার্চ্চের রক্ষণাবেক্ষণ রব্‌লেসের অনুচরদের প্রধান লক্ষ্য, এজন্য দলপতি সাধারণতন্ত্র মেনে নিতেও একহিসাবে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু স্পেনের নূতনবিধান আত্মরক্ষার জন্যই ক্যাথলিক্-প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব্ব করতে আরম্ভ করে এবং বস্তুতঃই সে কার্য্য অনেকাংশে সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন সমাজ গঠন বা কোনও প্রকার সংস্কারের বিশেষ আশা ছিল না। এজন্য নূতন শাসনপদ্ধতি অনুসারেই স্পেনে কাথলিক্ সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং প্রথম থেকেই জেসুইট্-সঙ্ঘ ভেঙ্গে দেবার আদেশও দেওয়া হয়েছিল। আক্‌সিয়ন্ পপুলার্ এর তীব্র প্রতিবাদ করে' এসেছে এবং এজন্যই রেপাব্লিক্ ও তার বিধি-

ব্যবস্থাকে এ-দল পুরোপুরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অথচ ক্যাথলিক্দের প্রতি ব্যবহার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে' স্বীকার করলেও মনে রাখতে হবে যে স্পেনে ক্যাথলিক্ মতবাদের অবাধ প্রচার নূতন রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল ও জনসাধারণকে রেপাব্লিকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করারই নামান্তর। এর অনুরূপ অবস্থায় সকল রাষ্ট্রই প্রতিকূল মতকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ আক্সিয়ন্ পপুলারের সঙ্গে সংস্কারকদের আদর্শের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। স্পেনে আর্থিক সাম্যভাবাপন্ন কোনও সমাজ গঠনের প্রধান প্রতিবন্ধক তাই আক্সিয়ন্ পপুলার্। এই বিরোধই বিদ্বেষবিষ ও নৃশংস অত্যাচারের মূলের কথা।

দক্ষিণমার্গীয় শেষদলের পরিচয় আমরা সৈন্যসমষ্টির মধ্যে পাই। ফ্রাঙ্কো ও মোলা নামক দুই সেনাপতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। প্রিমো দে রিভেরার পুত্রও নাকি এখন এঁদের সঙ্গে। এই জাতীয় লোকদেরই স্পেনের আসল ফাশিষ্ট্ বলা যায়। এ-ফাশিস্ম্ অষ্ট্রিয়া বা পর্টুগালের ফাশিষ্ট্ আন্দোলনের অনুরূপ—চার্চ্চ্ ও সৈন্যদল এর দুই বাহন। ইটালি বা জার্ম্মানির মতন উন্নততর দেশে ফাশিস্মো ভিন্ন আকার ধারণ করতে বাধ্য। সেখানকার ফাশিষ্টেরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করে' দেশব্যাপী বিরাট দল গঠন করেছে, তাদের উদ্দেশ্য যাতে জনমত সোশ্যালিজ্ম্কে ত্যাগ করে' তাদের আশ্রয় নেয়। স্পেনের অবস্থা ঠিক এরূপ নয়, সেখানে দক্ষিণপন্থা এখনও প্রকাশ্যে প্রাচীন সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের গুণগান করতে পারছে। স্পেনে জনসাধারণকে দমিয়ে রাখা এদের মতে এখনও সহজ।

[৫]

মধ্যমার্গের কথা অতি সংক্ষেপেই বলা সম্ভব। একে দুভাগে ভাগ করা চলে—একদলের সহানুভূতি প্রাচীন পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য, অপর দল বাধ্য হয়েই প্রকৃত বিপ্লবীদের উপর নির্ভর করে। এর প্রথমটি স্পেনের বর্ত্তমান যুগে র‍্যাডিকাল্ পার্টি বলে বিখ্যাত, এদের নেতা সেনর্ লেরু। একদা এরাই রেপাব্লিকের আদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছিল কিন্তু আজকের দুর্দ্দিনে বিপ্লবের বিভীষিকায় এরা ক্রমশঃই দক্ষিণপন্থার অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। সেনর্ লেরু পর্টুগালে সম্প্রতি আশ্রয় নিয়েছেন, অধ্যাপক গিল্ রব্লেস্ও নাকি সেখানে যুদ্ধের ফলাফল প্রতীক্ষা করছেন।

মধ্যপন্থী দ্বিতীয়দলের নেতা সেনর্ আজানা। তিনি প্রথমে প্রধান মন্ত্রী ও তারপরে প্রেসিডেন্ট্ রূপে সাধারণতন্ত্রের রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। একাজে তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়েছে বামমার্গীয় বিপ্লবী দলগুলি। তারা সোশ্যালিষ্ট্ হিসাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে যোগ দিতে অস্বীকার করলেও ফাশিষ্ট্ আক্রমণ থেকে রেপাব্লিক্‌কে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। আজানা নিজে সোশ্যালিষ্ট্ না হ'লেও অবস্থার ফেরে তাঁকে এদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। তাঁর এই ঝোঁক তাঁকে দক্ষিণী দলগুলির চোখে তাদের পরম শত্রু করে তুলেছে বলা যায়। অন্তর্বিরোধের প্রকট অবস্থার সময় মধ্যমার্গে বিরাজ করা প্রায়শঃই পণ্ডশ্রম হয়ে পড়ে—লেরু ও আজানার অবস্থার থেকে বোধ হয় এই সিদ্ধান্তই করতে হবে। কিন্তু সমরক্লান্তি সমস্ত জাতিকে যদি অভিভূত করে' ফেলে তখন অবশ্য চরমমতবাদের চাইতে মধ্য পন্থার প্রভাব প্রবলতর হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বর্ত্তমান বিদ্রোহের ফলে স্পেনে শেষ পর্য্যন্ত এ-জাতীয় একটা সাময়িক নিষ্পত্তি অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে স্পেনের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের উল্লেখ করা যেতে পারে। বহুশতাব্দী ধরে ক্যাটালন্ জনসমূহ তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবী করে এসেছে, সমগ্র স্পেনের ঐক্যের মধ্যে এ-প্রদেশের পার্থক্য কখনও একেবারে লোপ পায় নি। ক্যাটালন্ আন্দোলন এই জন্য স্পেনে প্রাচীন ও নবীন সামাজিক আদর্শের দ্বন্দ্বের মধ্যে বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে, ক্যাটালোনিয়া কখন কোন পক্ষ অবলম্বন করে তা বরাবর কিছু অনিশ্চিত। রেপাব্লিক্ স্থাপিত হবার পর ডন্ লুইস্ কম্পানিস্-এর নেতৃত্বে ক্যাটালন্ জাতীয় এস্‌কোয়েরা-দল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে স্থাপিত হয়েছে। এসকোয়েরা মতানুসারে স্পেনের ভবিষ্যৎ যুক্তরাষ্ট্র বা ফেডারেশন্ হওয়া ভিন্ন গতি নেই—ইতিপূর্ব্বেই বাস্ক্ প্রদেশ ক্যাটালোনিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের অন্তর্বিরোধ প্রবলতর হয়ে উঠলে ক্যাটালন্ স্বাতন্ত্র্যের ভাগ্যও সম্ভবতঃ মধ্যমার্গীয় অন্যান্য মতবাদের মতন বিপর্য্যস্ত হবে। এ প্রদেশের প্রধান নগরী বার্সিলোনা বন্দর বহুদিন যাবৎ নৈরাজ্যবাদের এক প্রধান কেন্দ্র এবং সম্প্রতি সে-অঞ্চল বিপ্লবীদের প্রতাপের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। ক্যাটালোনিয়াতে পর্য্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী জাতীয়তার বদলে নানাবিধ সোশ্যালিষ্ট্ আদর্শের দ্বারাই বোধ হয় বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে।

[৬]

স্পেনে রাষ্ট্রচিন্তার বামমার্গ চারটি দলে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা শক্ত নয়। এদের আদর্শ স্পেনে নূতন শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গঠন করা, পার্থক্য প্রধানতঃ কর্ম্মপদ্ধতিতে এবং ভবিষ্যৎ সংগঠনের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে। এরা যে-স্পেনের স্বপ্ন দেখছে সেখানে শ্রেণীভেদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকবে না ; সুতরাং আপাততঃ এরা চায় শ্রমিক প্রভুত্ব—রাজতন্ত্র, জমিদার-দের আধিপত্য, ক্যাথলিক্-প্রতিষ্ঠানের প্রতাপ, এবং ক্যাপিটালিষ্ট্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজ্যশাসন, এর কোনটাই বামপন্থীয়দের মনঃপূত হ'তে পারে না। রেপাব্লিক্ এদের কাছে প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছবার সেতুমাত্র কিন্তু তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন, নয়ত পুরাতন পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই বর্ত্তমান সঙ্কটে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে শ্রমিক চরমপন্থী সকলেই একজোটে দাঁড়িয়েছে এবং এই বিপদের আভাস পেয়েই গত ফেব্রুয়ারী মাসের নির্ব্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন শ্রমিক দলগুলি সেনর্ আজানার সঙ্গে যোগ দেয়। সেই থেকে রেপাব্লিকান্ দেশশাসকদের সঙ্গে এদের একটা রাষ্ট্রিক মৈত্রীভাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—এই একত্রীকরণ আজকের ফ্রান্সে যে Front Populaire গঠিত হয়েছে তার অনুরূপ।

সংখ্যার ও ক্ষমতার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বামমার্গের প্রধান দল এখন সোশ্যালিষ্ট্ পার্টি। মার্ক্সের জামাতা লাফার্গ্ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এ-দলের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন—এদের আয়ত্ত অসংখ্য ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি যে-মহাপ্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, সংক্ষেপে তার নাম ইউ জি টি (U. G. T.)। রেপাব্লিক্ স্থাপিত হবার পর তিন তিন বার নির্ব্বাচনের সময় প্রমাণিত হয়েছে যে অন্য যে-কোন দলের চাইতে স্পেনে সোশ্যালিষ্ট্দের সংখ্যা অধিক। এতদিন পর্য্যন্ত স্পেনীয় সোশ্যালিষ্ট্ দল শান্তিপ্রিয় সোশ্যাল্ ডিমক্র্যাসির সুবিদিত পদ্ধতি অনুসরণে নিয়মতন্ত্রের আইন-সঙ্গত পরিধির মধ্যে নিজেদের আন্দোলন আবদ্ধ রেখেছিল—তাদের আশা ছিল যে ধীরে ধীরে প্রচারের ফলে দেশের জনসাধারণ তাদের মত অবলম্বন করবে। ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে র‍্যাডিকাল্ নেতা লেরুর আকসিয়ন্ পপুলারের সঙ্গে সহযোগিতা তাদের মনে আশঙ্কার সঞ্চার করল—প্রাচীনপন্থী দলগুলি সুবিধামত কার্য্যসিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করতে পশ্চাদপদ হবে না এ-বিশ্বাস সোশ্যালিষ্ট্ পার্টিকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে এই ভাবে। দলপতি সেনর্

প্রিয়েটো সাবধানী লোক কিন্তু পার্টির মধ্যে গত দু'বৎসরে সেনর্ ক্যাবালেরোই কর্ত্তা হয়ে উঠেছেন—তিনি এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা উত্তরোত্তর মার্ক্স্ নীতির উগ্রতম প্রকাশের পক্ষপাতী হয়ে পড়ছেন বলা চলে। শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের সাহায্যে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন প্রচেষ্টার প্রতি এ-প্রীতি সোশ্যালিষ্ট্ আখ্যাধারী দলের পক্ষে নূতন। কিন্তু আক্সিয়ন্ পপুলার্ যে-ত্রাস উৎপাদন করেছে, তার সমর্থনে বলা যায় যে শান্তিপ্রিয় নিশ্চেষ্টতার ফলে ১৯৩৩ সালে বিরাট জার্ম্মান্ সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্ দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। স্পেনের সোশ্যালিষ্টেরা এর থেকে ১৯৩৪এর অষ্ট্রিয়ান্ সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্দের মতন অস্ত্রহাতে মরা শ্রেয়স্কর মনে করেছে।

বামপন্থী দ্বিতীয় দল কমিউনিষ্ট্ বা সাম্যবাদী নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে এরা স্পেনের সোশ্যালিষ্ট্দের থেকে আপাততঃ বেশী নিরীহ। তাদের মতে বিপ্লব সম্বন্ধে আস্ফালন সব সময় সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ১৯৩৫ সালে বোল্‌শেভিকি কমিন্টার্ণের সপ্তম অধিবেশন এই স্থির করেছে যে সাধারণ-শত্রু ফাশিস্‌মোর সামনে সাম্যবাদীদের গণতন্ত্রের সমর্থক যে-কোন দলের সঙ্গে এখন একত্রে কাজ করাই প্রয়োজন। সে-সভায় ডিমিট্রভ্ ঘোষণা করেন যে জার্ম্মানিতে কমিউনিষ্টেরা সোশ্যাল্ ডেমোক্র্যাট্দের বিরুদ্ধাচরণ করে' ভুল করেছিল দেখা যাচ্ছে, তাতে শুধু নাৎসিদের জয়লাভের পথ পরিষ্কার হয়েছিল। ফাশিষ্ট্ প্রভাব খর্ব্ব করা এখন কমিউনিষ্ট্দের প্রথম কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; রাশিয়া তাই ফ্রান্সের পরম মিত্র আর দেশে দেশে কমিন্টার্ণ্ তাই এখন সম্মিলিত Popular Front গঠনে ব্যস্ত। এতে বিশেষ বিস্মিত হবার কিছু নেই—লেনিনের কার্য্য-কলাপ যাঁদের পরিচিত তাঁরা জানেন যে সাময়িক অবস্থা অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তনে সাম্যবাদীরা সিদ্ধহস্ত।

তৃতীয় একটি দল কিন্তু এই নূতন ভাবের বিশেষ বিরোধী,—মরিন্ এবং নিন্ নামক দুই নেতার অনুচর এই শ্রমিক দল ট্রট্স্কি-প্রচারিত বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। স্পেনে এদের সংখ্যা ষ্টালিনের সমর্থকদের চাইতে কিছু কম নয়। এদের মতে ষ্টালিন্ রাশিয়ার প্রাদেশিক স্বার্থের খাতিরে মার্ক্সের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছেন, তাঁর অনুবর্ত্তী রুষ সাম্যবাদীদল এবং সেই সঙ্গে কমিন্টার্ণ্ পর্য্যন্ত এখন আর শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা হবার যোগ্য নয়। ষ্টালিনের সাম্প্রতিক বহু আচরণ বোধ হয় ট্রট্স্কির মতের পরিপোষক কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে লেনিন্ও একদা

জিনোভিয়েভ্ প্রভৃতির চরম পন্থাকে তীব্র নিন্দা করে' তাকে শিশু-সুলভ ব্যাধি আখ্যা দিয়েছিলেন। সে যা হোক, ট্রট্স্কির দল স্পেনে প্রবল এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহে তারা নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়েছে। এমন কি প্রকৃত কমিউনিষ্ট্ দল পর্য্যন্ত তাদের সাবধানী আচরণ সত্ত্বেও এখন অন্তর্বিরোধের প্রবল প্রকাশ্য স্রোতে নিমজ্জিত।

আধুনিক স্পেনের বামমার্গীয় শেষ বৈশিষ্ট্য নৈরাজ্যবাদ। মার্ক্সের শত্রু বাকুনিন এ-দলের গুরু, একমাত্র স্পেন্ দেশেই এখন পর্য্যন্ত এদের বিস্তীর্ণ প্রভাব দেখা যায়। নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের মূল আদর্শে প্রভেদ অল্প কিন্তু উভয় দলের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে এত দুস্তর পার্থক্য যে ইতিহাসে এরা পরস্পর-বিরোধী রূপেই গণ্য হয়েছে। এনার্কিষ্ট্ মতানুসারে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক দল গঠন ও যোগদান শ্রমিকদের পক্ষে মূর্খতা মাত্র; তাদের কর্ত্তব্য গুপ্তসমিতি প্রভৃতির সাহায্যে ধনিকদের বিভীষিকা উৎপন্ন করে' দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট কিম্বা সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা প্রচলিত আর্থিক বিধি ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন। পক্ষান্তরে মার্ক্সীয় তত্ত্বে চিরকাল এনার্কিষ্ট্দের নিন্দা করা হয়েছে; নৈরাজ্যবাদীদের কর্ম্মপদ্ধতি শুধু দেশে নিরর্থক উপদ্রব ও রক্তপাতের কারণ হবে, পণ্ডশ্রমে শ্রমিক শ্রেণী এতে শুধু অক্ষম হয়ে থাকতেই বাধ্য। বল্‌শেভিক্‌দের বিশ্বাস যে শিক্ষার অভাব এবং ফ্যাক্টরি প্রথার প্রসারের পথে নানা বাধার জন্যই স্পেনের অনেক শ্রমিক এখনও নৈরাজ্যবাদের ভ্রান্তিতে মগ্ন রয়েছে। স্পানিয়ার্ড্দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রপ্রিয় স্বভাব ও সেকালের অত্যাচারী রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষও হয়ত নৈরাজ্যপন্থার পুষ্টির কারণ। এনার্কিষ্ট্দের এফ্ এ আই এবং সি এন্ টি নামে পরিচিত দুইটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে। ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুবই কৌতূহলপ্রদ কিন্তু আজকের স্পেনে এনার্কিষ্ট্ প্রভাব ক্ষয়োন্মুখ ব'লেই বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।

শ্রীসুশোভন সরকার

বসুধৈব কুটুম্বকং

ভেরুষা ভাই,

ঠিক এক বছর আগে তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলাম—একেবারে মরিয়া হ'য়ে। আবার বছর ঘুরে বসন্ত কাল এসেছে।

এতদিন একেবারে চুপচাপ ছিলাম কেন জানো? আমায় এত সইতে হয়েছে যে চিঠি লিখবার শক্তি আর ছিল না।

কিন্তু গত সপ্তাহে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যে তোমায় না লিখে পারছি না। তোমাকে সেই ছেলেটির কথা লিখেছিলাম মনে আছে? তার প্রভাবে মন জুড়ে সে কি তোলপাড়! ঠিক এক সপ্তাহ আগে তার সঙ্গে আবার দেখা! গত বছর সে পাশ করে প্র্যাক্‌টিশ সুরু করে দিয়েছে, তাই আর এতদিন দেখা শোনা হয়নি।

আমার জীবনে ইতিমধ্যে বিশেষ নতুন রকমের একটি ব্যাপার ঘটেছে। অত্যন্ত সংক্ষেপে, ব্যাপারটি হচ্ছে একটি শিশু, এই সবে তিন মাস বয়স। সুতরাং আমি এখন তরুণী মা'দের দলের একজন। খুব কি অদ্ভুত লাগছে? এই মাসের মধ্যেই আমার ক্লিনিক্‌-এর কাজ হয়ে যাবে, তারপর আমি একেবারে স্বাধীন। কিন্তু সে মানুষটি আমি আর নাই, এই এক বছরে আমি একেবারে বদলে গিয়েছি।

একেবারে গোড়া থেকে বলাই ভালো।

প্রথম যখন বুঝলাম আমি মা হব, তখন থেকে এই ব্যাপারের আরম্ভ। সত্যি ভাবতে ভয় করে সে দিনের কথা। সব প্রথম মনে হোলো, আমার এই অবস্থা যখন ধরা পড়বে তখন বাড়ির লোকদের কাছে আমার আর মুখ দেখানোর জো থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হবে প্রতিবেশীদের বিষদৃষ্টি, কানা-ঘুঁষো, আরো কত কি। আর আমার প্রতি সকলের বিজাতীয় বিদ্বেষ, কেন না আমি স্বাধীনতা লাভ করে হয়েছি ভ্রষ্ট; আর দুধের ভাঁড় হাতে বাজারে না গিয়ে যাচ্ছি মস্কো সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে।

যাই হোক, ট্রেণের চাপা হাওয়ার থেকে বেরিয়ে ভোরের আলোয় যখন গোরুর গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, তখন কি আরামই লাগছিল। জানো তো, সারারাত

মেঘের ডাক আর অসহ্য গুমটের পর কি রকম সুন্দর ঝরঝরে হয় এক একটি সকাল! বাতাসে ভেসে আসে মিষ্টি গন্ধ, বৃষ্টি-ভেজা গাছের পাতা করে ঝল্‌মল্‌, আকাশ-ছাওয়া লঘু কোমল মেঘ। দূর থেকে কানে আসে পাখীর গান, আর যতদূর চোখ যায় ক্ষেতভরা লম্বা লম্বা রাই একেবারে দিগন্তে উধাও।

একটা ঝোপের গা ঘেঁষে গাড়ি চলার সময় ভিজে পাতার ছোঁয়া লেগে আমার মুখ চোখ জলের ছিটায় গেল ভরে। বার্চের তীব্র গন্ধে গ্রামের পথ হয়েছিল উতল। আমার মনে হোলো সেদিনকার সুন্দর সকালটি, তার স্নিগ্ধ বাতাস, আকাশ ভরা আলো, আর রাইক্ষেতের কূলহারা প্রসার, সবশুদ্ধ আমারই মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। এই সময়ে চোখে পড়ল দূরে আমাদের বাড়ির ছাদ, আর তার সমুখে সারবন্দী সেই প্রাচীন গাছগুলো।

মনে হোলো আবার যেন ছেলেবেলা ফিরে এসেছে। গ্রামের মধ্যে পৌঁছে যে-দিকেই তাকাই মনে আর আনন্দ ধরে না। ঘাসে আর কাঁটালতায় ছাওয়া সদর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কূয়োয় যাবার পায়ে-চলা পথ চোখে পড়ল আর ছেলেবেলার একরাশ স্মৃতি একেবারে খুসিতে মন দিল ভরে। হঠাৎ মেঘের জালের আড়াল থেকে সূর্য্য দেখা দিতে, সকালের কোমল আলোর ছোঁয়া লেগে গোলাবাড়ির আঙ্গিনাগুলো সব ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠল আর গ্রামের পথে ঘাসে ঘাসে বৃষ্টির জলের কণায় কণায় আলোর আভাস ঝলমল করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চোখে পড়ল আমার জানা একটি মেয়ে, আমাদের কামারের তরুণী স্ত্রী। আমি তো স্ফূর্ত্তির চোটে তাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়তে যাচ্ছি কিন্তু বিকট মুখভঙ্গী করে চোখ ফিরিয়ে সে খিল্‌খিল করে হাসতে লাগল।

এই রকম অপরূপ মুখভঙ্গী কখনো দেখেছ? এর মানে কিছু বোঝো? এক এক সময় সত্যি মানে বোঝা ভার। কিন্তু তখন মনে হোলো দলছাড়া অসাধারণ লোকদের প্রতি অতি সাধারণ নগণ্য লোকের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ ও ঘৃণা যেন এই মুখভঙ্গীতে জমাট হয়ে ফুটে উঠেছে। কেউ যদি এরকম করে তাকায় মনে হয়, কোথাও কিছু নাই, কিন্তু তবু যেন সমস্ত জীবনটা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

হঠাৎ নিজের অবস্থা মনে ক'রে মনটা ছ্যাঁক্‌ করে উঠল। ইতিমধ্যে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছিলাম। ঠিক তেমনি রয়েছে বাড়ির চেহারা, সেই তিনটে

জানলা, চারদিকে মাটির পাঁচিল, মাঝে মাঝে এক একটা গর্ত্ত মুরগীরা ঠুকরে ঠুকরে করেছে। তাকিয়ে দেখলাম আঙিনায় একটা বালতি গড়াচ্ছে, তার তলাটা গেছে উড়ে, আর খিড়কি দরজার বাইরে সাবানের ফেনা—একেবারে যেমনটি বরাবর দেখে এসেছি, এমন কি দড়িতে টাঙানো সেই ময়লা কাপড়গুলো পর্য্যন্ত, কোথাও এতটুকু বদলায় নি। অবসাদে মন গেল ভ'রে। চাষীদের জীবনের উপর এক চিরন্তন বোঝা চেপে আছে, একেবারে জগদ্দল পাথর, তার আর নড়চড় নেই।

উনুনটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন মা, পরণে একটা বিশ্রী ময়লা ঘাগ্‌রা, হাতে বালতি, আমার দিকে পিছন ফিরেছিলেন ব'লে আমায় প্রথমটা দেখতে পাননি। হঠাৎ ফিরে দেখেই বালতিটা ধপাস্ করে ফেলে আহ্লাদের চোটে হাত তালি দিয়ে উঠলেন। এই একটু আগেই বাড়ি ফিরছি ব'লে মনে আর আনন্দ ধরছিল না, কিন্তু মাকে জড়িয়ে আদর করতে যাবার সময় মনে হোলো একটা ভীষণ ধারালো ছুরি যেন আমার পিঠের উপর বাগানো রয়েছে।

নিতান্ত তালকানা লোকের সঙ্গেও বেশি দিন থাকলে, নিজের অবস্থা তার কাছে চেপে যাওয়া দায়। হোলোও ঠিক তাই। এক হপ্তা যেতে না যেতেই মা আমার দিকে যখন তখন আড় চোখে তাকাতে আরম্ভ করলেন, মুখ দেখে মনে হোতো যেন তাঁর মনে দুশ্চিন্তা আর ধরছে না। একটু হয়তো জানলার ধারে গিয়ে অন্য মনে বাইরে তাকিয়েছি কিম্বা কোথাও চুপটি ক'রে ব'সে স্থির দৃষ্টিতে কিছু দেখছি—অমনি দেখি মা আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন, আর তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে মায়ের প্রাণের ব্যাকুল ভয়। চোখোচোখি হলেই মা তাড়াতাড়ি স'রে পড়তেন, যেন কিছু একটা খোঁজ করছিলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বহরে তাঁর মনের অবস্থাটা আমি ভালো রকমই বুঝতে পারতাম।

আমি বাড়ি আসবার প্রায় পোনেরো দিন পরে মা বেরোবেন ব'লে পোষাক টোষাক প'রে আমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পাশে এসে বসলেন। আমারই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা। খুব হুঁসিয়ার হয়েই কথা সুরু করলেন, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু হ'লে কি হয়, এদিকে যে একেবারে ছেলেমানুষ, মনের ফন্দী বুঝতে আমার দেরি হোলোনা। পঁচিশ বছর বয়স হলো, এবার লেখাপড়া ছেড়ে ভালো গোছের একটি লোককে বিয়ে ক'রে যদি আমি ঘরকন্না করি—এই হোলো বক্তব্য।

'এই দেখনা, আজকালকার সব মেয়েদের জীবন কি রকম যেন এলোমেলো। অনেককেই তো দেখলাম, কিছুতেই তাঁদের রুচি নেই। আহা, কি সুখই না এঁরা মা বাপকে দিচ্ছেন। কি আর বলি! জানো, এক এক সময়ে সারারাত চোখে ঘুম আসে না, তোমার কথা ভেবে ভেবে···'

বলতে বলতে তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল আর চোখ উঠল ছল্ ছল্ ক'রে, দু হাতে মুখ ঢেকে তিনি ফুঁপোতে লাগলেন। অতঃপর আবার গর্জ্জন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে বল্লেন, 'এই রকম অপদার্থ কত মেয়েই না দেখলাম—পোড়ারমুখীর দল, মরণও নেই'।

আমার মনে পড়ল কামার-গিন্নির কথা। ব্যাপারটা জানতে পারলে তার মুখ ঠিক কতখানি বিকৃত হবে একবার কল্পনা করার চেষ্ট করলাম।

ভাবলাম, মাকে সব বলিই না কেন? শুনলেই কি তাঁর মেয়ের প্রতি মমতা একেবারে লোপ পাবে আর মুখের ভাবে স্নেহের বদলে ফুটে উঠবে আতঙ্ক ও ঘৃণা—আমার কলঙ্কের কথা ভেবে? আমাকে বোধহয় মেয়ে ব'লে আর স্বীকারই করবেন না? আর আমার অভ্যন্তরে আর একটি যে প্রাণী রয়েছেন, তাকেই বা কি ব'লে সম্ভাষণ করবেন?

বলাই সাব্যস্ত করলাম। আবার যখন মা কথা বলবার জন্য অত্যন্ত গম্ভীর মুখে এসে পাশে বসলেন, আমি আর দ্বিরুক্তি না করে সটান তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মা, আমি অন্তঃসত্ত্বা'।

শুনেই কি রকম অদ্ভুত হয়ে গেল মার মুখ, বোকার মতন একটু একটু হাসতে লাগলেন, কারও মাথায় ধাঁ করে লাঠি মারলে সত্যি মেরেছে না ঠাট্টা করছে বুঝতে না পেরে সে যেমন হাসে অনেকটা তেমনি। দেখতে দেখতে তাঁর চেহারা হয়ে গেল ফ্যাকাশে, চাপা গলায় তিনি বললেন, 'কি আনন্দই না দিলে! নতুন এক অতিথি আসছেন তাহলে? বলি এ রকম···'

কিন্তু আর একটি কথা তাঁর মুখে ফুটলনা। হোঁচোট খেতে খেতে কোনো রকমে তাল সামলে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর দরজার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'দোহাই, ওটির ব্যবস্থা তুমিই না হয় কোরো, আমাকে আর কলঙ্কের ভাগী কোরোনা।'

মনে পড়ল ঠিক পনেরো বছর আগে আর একবার এই রকম কথা তিনি বলেছিলেন। আমার দাদা, তখন তার বারো বছর বয়স হবে, কোথা থেকে একটি কুকুর এনে হাজির করল। মা তো চটেই আগুন, খাবার যোগাতে হবে তো? একদিন দাদা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, তার নাকি বাচ্চা হয়েছে। মা গেলেন ক্ষেপে, আর চীৎকার করে বললেন, 'যা মন চায় করো ওদেব নিয়ে, কিন্তু আমার চোখে যেন আদবে না পড়ে।'

দিনভর চলল দাদার কান্না আর আবদার। বাইরের টিনের কোঠার এক কোণে নিজের শরীর দিয়ে সন্তর্পণে ছানাগুলোকে ঢেকে 'জিপ্‌সি' যেখানে শুয়েছিল, সারাদিন পর দাদা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হোলো। জিপসির তখনকার চাহনি আমি কখনো ভুলব না, যেন সে নিঃশেষে লুটিয়ে পড়তে চায় দাদার পায়ে আর জানাতে চায় তার চরম মিনতি।

দাদা ছানাগুলোকে এক ছালায় পুরে শক্ত করে বাঁধল তার মুখ। তাদের মা দাদার চারপাশে গড়িয়ে গড়িয়ে গোঙাতে আর করুণভাবে দাদার হাত চাটতে লাগল। জলভরা চোখে আস্তে আস্তে গিয়ে দাদা ডোবার জলে দিল ছালাটা ফেলে।

মার কথার পর মনে হোলো আমি গৃহহীন, স্বজনহীন; আমার নিজের মা আজ পর। এতটা মনের জোর আমার ছিল না যে গ্রামে থেকে ব্যাপারটা চুকিয়ে দি। সুতরাং ফিরে গেলাম মস্কো।

... ...

আজন্ম যে-বাড়িতে মানুষ হয়েছি সে বাড়ি ছেড়ে যে-দিন মস্কো ফিরে এলাম, আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে সেই দিন সকাল বেলার কথা। তখন জুলাই মাস, এত গরম যে সকাল ন'টা বাজতে না বাজতেই রোদ একেবারে ঝলসে দেয়। কারখানাগুলোর নীলাভ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে মস্কো সহর ও তার বড় বড় সোনালি গম্বুজগুলো চোখে পড়ল। দূর থেকেও সহরের গরম বেশ মালুম দিচ্ছিল। কিন্তু তখনো মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়া ট্রেণের জানলা দিয়ে গায়ে লাগছিল। যখন ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সহরের পথে এসে পড়লাম, তখন রাস্তার গরমে আর মোটর গাড়ির ধোঁয়ায় দম বন্ধ হবার উপক্রম হোলো। রাস্তাগুলো দেখলাম সব খোঁড়া হয়েছে, আর কালিমাখা মুখ সব লোকেরা লম্বা লম্বা লোহার শিক দিয়ে বড় বড় আলকাৎরার কড়াইতে জ্বাল দিচ্ছে।

ইউনিভারসিটির হস্‌টেলে গিয়ে দেখি মাত্র দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে 'কমরেড', নিতান্ত তাদের 'ঘরবাড়ি' নাই, তাই সেখানে রয়েছে। কি করি মেজের উপর বোচকাটা নামিয়ে তার উপর চুপচাপ হাঁ ক'রে ব'সে রইলাম খানিকক্ষণ।

হস্‌টেলের বাড়িতেও মিস্ত্রিরা কাজ করছিল। কাঁচা রঙের গন্ধ পেলাম, কলির কাজ হচ্ছিল, বারান্দায় সব চূণ ছড়ানো, আর তারই মাঝে মাঝে পায়ের দাগ। আমার ঘরেরও ঐ অবস্থা।

আমার এই কলঙ্ক চুকিয়ে দিতেই হবে এই সঙ্কল্প ক'রে যেদিন হাঁসপাতালে গেলাম সেই সকালটির কথা কখনো আমি ভুলব না। আমার মতামত ছিল অত্যন্ত উদার কিন্তু, আশ্চর্য্য! তবু নিজের অবস্থা এত শোচনীয় ও লজ্জাকর কেন মনে হচ্ছিল?

ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় হ'তে লাগল। একলা বাড়িতে অসহায় নারী, চারদিকে বালি আর চূণ আর মিস্ত্রি, নিজেই নিরাশ্রয় এর মধ্যে কিনা আবার নূতন একটি অতিথির ব্যবস্থা! ভয়েরই তো কথা। শেষে নিরুপায় হয়ে এক্ষেত্রে অনেককেই বাধ্য হয়ে যা করতে হয়, ঠিক করলাম তাই করা। প্রথমটা অনেকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, তারপর পড়লাম পথে বেরিয়ে।

রাস্তায় সবে জল দেওয়া হয়েছিল, তাই হাঁটতে নিতান্ত মন্দ লাগছিল না। ফুটপাথে ব্যস্ত লোকেদের ভীড়, পথে জল দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছিল তাদের মুখেও বেশ আরামের ভাব ফুটে উঠেছে আর তাদের শরীরের শক্তিও যেন গেছে বেড়ে। যে-যার নিজের কথা ভাবতে ভাবতে জনস্রোতে মিশে যাচ্ছে।

আমিও তো তাদেরই একজন কিন্তু তবু যেন সবার বাইরে, যেন আমার বেঁচে থাকাটাও অধিকার-বিরুদ্ধ। আর মনে হচ্ছিল যে সবাই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছে কি উদ্দেশ্যে আমি চলেছি। সবাই খুসি, সবাই উপভোগ করছে এই পরিষ্কার সকাল বেলার প্রাণভরা স্ফূর্ত্তি, কেবল আমি জর্জ্জরিত আমার জীবনের দারুণ গ্লানিতে। সন্তর্পণে পথের পাশে দরজায় দরজায় নামের ফলক দেখতে দেখতে এগোচ্ছিলাম, যেন বিশ্রী ব্যাধিতে আক্রান্ত ব'লে আমি হয়েছি সমাজচ্যুত, চোর বদমায়েসের মতন দাগী।

অবশেষে হাঁসপাতাল খুঁজে পেলাম, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে সাহসে কুলোচ্ছিল

না, কেবলই মনে হচ্ছিল আর একটু ভেবে দেখা যাক, আর এক মিনিট, তাই একবার করে এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসছিলাম।

আবার মনে হতে লাগল, সবাই যেন আমাকেই দেখছে, আমার ভিতরের কথা বুঝতে কারও যেন বাকি নাই। আমি এমন ভাব দেখাতে চেষ্টা করতে লাগলাম যেন হাঁসপাতালে আমার কোনো দরকারই নাই, দেওয়ালের গায়ে লোহার শিক দেওয়া যে-একটা ফোকর ছিল, হাঁসপাতাল সম্বন্ধে তদন্তের জন্য, সেদিকে যেন আমার চোখই পড়ছে না।

হঠাৎ মনে পড়ল মার সেই কথা ঃ ওটিকে নিয়ে যা মন চায় কোরো। মনে পড়ল সেই কুকুর-ছানাগুলোর কথা ; ছালাটা প্রথমে কিছুতেই ডুবছিল না, তখন দাদা লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে ডুবিয়ে দিল। ভাবলাম জিপসির কথা।

কেন জানিনা, হঠাৎ ঘুরে প্রায় এক দৌড়ে সটান বাড়ি চ'লে এলাম।

ঠিক তার পরেই এমন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার হোলো যা কখনো আমি ভুলতে পারব না। আমারই দেহে আমি ছাড়াও যেন আর একটি প্রাণী রয়েছে, স্পষ্ট অনুভব করলাম তারই সঞ্চার। মনে হোলো, এ আমার নিজের, একেবারে নিজের, আর এই কথা বুঝতে পেরে মন অধীর হয়ে উঠল আনন্দে।

ঘরের এক কোণে পালিয়ে একেবারে চুপ করে রইলাম। যেন আমার মধ্যে যে প্রাণীটি রয়েছে তারই কাছে একটু আশ্রয় খুঁজছি। যে-জীবকে আমি দিয়েছি জন্ম তারই সংহার দাবী করছে নির্ম্মম জীবন—এই কথা ভেবে আমার মন আতঙ্কে ভ'রে উঠেছিল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সমুখে আর নিশ্চয় বলতে পারি দুই চোখ দিয়ে এই আতঙ্ক ফুটে বেরোচ্ছিল।

আর যে দুটি মেয়ে ওখানে থাকত, তানিয়া ও গ্লাশা, তারা এসে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে, কেনই বা আমি অসময়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসেছি।

সব কথা তাদের খুলে বললাম।

দুটির মধ্যে তানিয়াই ছিল বেশি স্ফূর্ত্তিবাজ। সে বলল, 'তাতে কান্নার কি হয়েছে? এতো খুব আনন্দের কথা!' ব'লেই এক দৌড়ে সে উপর তলায় কন্‌ষ্ট্যান্‌টিন্ ব'লে যে-ছেলেটি ছিল তাকে ডেকে আনল।

কন্‌ষ্ট্যান্‌টিন্ বেচারা তো প্রথমটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কৈ, ছেলে কোথায়?'

তানিয়া হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল, 'আছে, আছে, এই শিগ্‌গিরই হবে।'

মেয়ে দুটি উৎসুক ভাবে আমায় দেখছিল, যেন তাদের চোখের সামনে এক পরম রহস্য সঙ্ঘটিত হচ্ছে, যেন তাদেরও জীবনেও এ এক অন্তরঙ্গ অভিনব ব্যাপার। চারদিকে চূণ বালি আর মিস্ত্রির দল, কিন্তু এসবে তাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না, আর এই প্রচণ্ড গরমে আর ধূলোয় এই বিপুল সহরে তারা যে দুটি গৃহহীন মেয়ে সে কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল।

আর আমি খুব স্পষ্ট উপলব্ধি করছিলাম যে সমস্ত পরিবার মিলে যে একটি লোকের উপর জুলুম করা—সেই ইতর নীচ জুলুম আর আমার উপর খাটবে না। আমার পক্ষে এ রকম অভিজ্ঞতা নতুন বটে!

এখন আমার আর একটি বৃহৎ পরিবার জুটেছে—মানব-পরিবার। আমি যে এই পরিবারেরই একজন, খুব পরিষ্কার তা বুঝতে পারছিলাম।

যতদিন এখানে আছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু বা সহপাঠী একটিবারের জন্য কেউ আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকায়নি, আমাকে দেখে মুখ বিকৃত করেনি। শুধু তাই নয়। আমি যে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এই নিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতন তারা গর্ব্ব ক'রেছে আর খুব জোর গলায় বলেছে, 'এই তো স্বাভাবিক, কেবল ইতর বুর্জ্জোয়ারাই এই দেখে আঁৎকে ওঠে!'

এমন কথা নেই যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা বলত না, কিন্তু আমাকে ঠিক তারা মার মতন সমীহ করত। আমি কাছাকাছি এলেই অশ্রাব্য রঙ্গরস একেবারে যেত থেমে।

মনে হয় আমার স্বামী ছিল না ব'লেই আমার সম্বন্ধে তাদের এতটা দরদ, তারা তাই মনে করত আমার ভার তাদের সবার উপর।

এরাই যে আমার আত্মীয়, বাড়ির লোকেরা নয়—ভালো ক'রেই তা বুঝতে পারলাম।

... ...

কি ক'রে তার সঙ্গে আমার দেখা এই কথা শোনবার জন্যে নিশ্চয় তুমি অপেক্ষা করছ। এতক্ষণ ইচ্ছে ক'রেই তা না ব'লে শুধু আমার নিজের কথা বলেছি, দেখা হবার ব্যাপারটি যাতে তুমি আরও ভালো করে বুঝতে পারো।

এক সপ্তাহ আগের কথা। কাজে যাবার সময় বাচ্চাটাকে 'ক্রেশ'-এ রেখে যাই। সেখান থেকে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে 'আলেকজাণ্ডার গার্ডেন'-এ ব'সে ব'সে পড়ছিলাম আর বইয়ের মার্জ্জিনে নোট্ লিখছিলাম।

বসন্তের আরম্ভ। সবে বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে। অনেকদিন পর রাস্তার গোলমাল কানে একটু নতুন লাগে। কাকগুলো একবার উড়ে আসছে আবার পালাচ্ছে। বাতাসে মাছির ভন্ ভন্, বাগানে রোদে ছোট ছেলের দল খেলছে আর চেঁচামেচি করছে। হাতে রং করা কাঠের খেলার কোদাল, মাথায় বোনা টুপি, খেলার জায়গায় সব বালি খুঁড়ছে।

এ যেন এক বিপুল উৎসব, আকাশ পৃথিবী জুড়ে চলেছে বসন্তের ও জীবনের লীলা, এরই আনন্দে সব ভরপুর। আমিও বিভোর হয়ে দেখছিলাম আমার বাচ্ছাটি তার ছোট্ট হাতের মুঠি রোদের ছোঁয়ায় একবার খুলছে আবার বন্ধ করছে।

একটি পাতা উলটে মুখ তুলতেই বুক ধড়াশ করে উঠল, কেননা তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। তেমনি স্থির গম্ভীর ভাব, যার জন্যে সব প্রথম এত্ত ভালো লেগেছিল, আজও সেই জন্যে দূর থেকেই চিনতে পারলাম। মাথা হেলিয়ে ভুরু কুঁচকে তেমনি সে হাঁটছিল—যেমন ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় বারান্দায় সে হাঁটত, পায়ে রয়েছে প্রকাণ্ড সেই বুটজোড়া, আর গায়ে নীল জামা।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল কি রকম যেন রোদে পোড়া লাল রং, নিতান্ত তরুণ যুবকদের মতন। হঠাৎ দেখা হওয়ায় বেচারি বেশ একটু গোলমালে পড়েছিল, এসে কথা বলবে, না যেন দেখতেই পায়নি এই ভাব দেখিয়ে চলে যাবে, বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

এক মুহূর্তেই কিন্তু সে ভাব কেটে গেল।

আমাকে লক্ষ্য করে সে টুপি তুলল, আমিও নমস্কার করলাম।

বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। কাছে এসে কথা কিছুতেই সে বলবেনা।

কিন্তু আমি যে দেখা হবামাত্র দৌড়ে গিয়ে তার ঘাড়ে যত দোষ চাপাইনি, বেশ মনে হোলো তাতে সে আমার উপর বিশেষ খুসি হয়েছে। ইচ্ছা ছিল চ'লেই যায়, কিন্তু আর একবার দেখবার জন্যে যেই মুখ ফিরিয়েছে আর আমিও তার দিকে সেই মুহূর্তে তাকিয়েছি। ফিরে এসে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, তখনো তার মুখের লাল রং মিলায়নি।

আমি বেশ লক্ষ্য করলাম; বারবার চোরা চাহনিতে সে দেখছে আমার পোষাক আর জুতো, উদ্দেশ্য আমার অবস্থা কি-রকম তা জানা, আর আমার জন্যে তার ঠিক কতটা দায়িত্ব তা আন্দাজ করা।

জুতোয় প্রকাণ্ড একটা তালি ছিল তাই অভ্যাসবশে বেঞ্চির তলায় পা লুকিয়ে ফেললাম।

একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমায় সেই কতদিন আগে দেখেছিলাম, এখানে প্রায়ই আস নাকি?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'এই রকম দিন হ'লে আমি রোজই আসি।'

'আচ্ছা, তা হলে, এ রকম দিন থাকলে, কাল আবার দেখা হবে, এখন বড্ড তাড়া।'

একবার সে বাচ্ছাটাকেও আড়চোখে দেখে নিল, কিন্তু উচ্যবাচ্য কিছুই করল না, যেন দেখতেই পায়নি এই ভাব।

ওর যে সত্যি খুব তাড়া ছিল তা মনে হোলো না! বেশ বোঝা গেল নিজের উপর বিশেষ আস্থা নেই, তাই বেশিক্ষণ কথা বলার সাহস হচ্ছিল না। যাই হোক, ভালোয় ভালোয় চুকল ভেবে ও খুসিই হয়েছিল, আর বেশ যেন হালকা মনেই স'রে পড়ল।

আমি হাসিভরা উৎসুক দৃষ্টিতে ওর কথা গিলছিলাম।

খুব চেনা লোকের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হ'লে আর সে যে বেশ ভালো আছে এই খবর পেলে এই রকম হাসিমুখ হওয়াই স্বাভাবিক।

নিজের কথা আমি একটি বলিনি, একটুও অভিযোগ করিনি, সকলে ত্যাগ করলে যে কি রকম শোচনীয় অবস্থা হয় তা মুখেও আনিনি। এই নবজাত শিশুটির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা আমি উল্লেখও করিনি। আর ও যখন চ'লে গেল তখন একবারও চেষ্টা করিনি যাতে ও আর একটু থাকে।

বাড়ি ফিরে ভারি ভালো লাগছিল, এত ভালো আর জীবনে কোনোদিন লাগেনি। সব থেকে ভালো লাগছিল এই কথা ভেবে যে আমাদের দুজনের কি সম্বন্ধ সে কথা ব'লে আমাকে ছেড়ে যাওয়ার অপরাধে ওকে অপরাধী করিনি। আর এই কথা মনে প'ড়ে খুসিতে মন ভ'রে গেল যে দেখা হওয়া মাত্র ওরই মুখ

লাল হয়ে উঠেছিল, আমার নয়। আমি শুধু খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম আর—হওয়া উচিত হোক্ বা না হোক্—খুসিও যে হই নি তা নয়।

ওর ভয়ের ও উৎকণ্ঠার যে বিন্দুমাত্র কারণ নাই তা ওকে বোঝাতে পেরে আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা বলতে পারি না।

ওরও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

পরিষ্কার বোঝা গেল যে ও বেশ সহজ ভাবেই সব আবার নিতে পারছে।

* * *

পরদিন আবার ও এল। বাগানের পথ দিয়ে আসতে আসতে দূর থেকেই আমাকে দেখতে পেয়ে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল, আগের দিনের সেই ইতস্তত ভাব আর সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না! আমি যে আদালতে নালিশ করে লাঠালাঠি কাণ্ড ঘটাব, এ রকম সন্দেহ ওর মনে আর আদৌ ছিল না।

খুব ধীর সহজভাবে, বন্ধুর মতনই ও কথাবার্ত্তা বলল।

কিন্তু একটু আদবকায়দার ভাব ওর মধ্যে কোথায় যেন ছিল, ওর মন থেকে ও যে অপরাধী এই বোধ কিছুতেই যেন যাচ্ছিল না আর আমি ওকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করেছি কিনা ঠিক তা বুঝতে পারছিল না। কিম্বা ওর হয়তো বেশি অন্তরঙ্গ-ভাবে কথা বলতে ভয় হচ্ছিল পাছে ওর দায়িত্বটা তাতে বেশি ফুটে ওঠে।

বেশ নিঃসঙ্কোচে ও আমার সঙ্গে আমার কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গেল, ঠিক দুই বিভাগের ছাত্ররা পরস্পর যেমন আলোচনা করে।

একটু যেন আশ্চর্য্য হয়ে ও বলল, 'তুমি সত্যি অদ্ভুত।' যেন আমার সঙ্গে ওর প্রকৃত সম্বন্ধ ওর কাছে ঠিক পরিষ্কার হচ্ছিল না। শুধু এইটুকু ও বুঝতে পেরে-ছিল ওর সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র বিদ্বেষ নাই।

কিন্তু আসল ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা দুজনেই ছিলাম নীরব—বাচ্ছাটির সম্বন্ধে একটি কথা কেউ বলিনি।

ওর যে ভীষণ আগ্রহ হচ্ছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কি ক'রে কথাটা পাড়বে ভেবে উঠতে পারছিল না। বারবার ওর চোখ পড়ছিল আমাদের এই ছোট্ট শিশুটির উপর, তার পরেই আবার আড়চোখে আমাকে দেখছিল, যেন একটা ব্যাপার ও কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিল না।

আমাব জীবন সম্বন্ধে আর আমি যে ঠিক কি রকম ব্যক্তি এই সম্বন্ধে ওর কৌতূহলের অন্ত ছিল না। আমি ওর কে—স্ত্রী, না শুধু ওর সন্তানের জননী, না আর কেউ আমার ছিল? কিন্তু আমি ওর কে—সত্যি কি কেউ, না কেউই না?

বাচ্ছাটিকে দেখতে গিয়ে ও যখনই ধরা পড়ছিল তখনই ভাব করছিল যেন ওর নজর ছিল অন্য কিছুর উপর। সন্তান সম্বন্ধে ওর আগ্রহ আমার কাছে প্রকাশ করতে ও বিশেষ লজ্জা পাচ্ছিল।

যেন ও সব কিছুই দেখতে পাইনি এই ভাবে বললাম, 'দক্ষিণে গিয়ে একটা চাকরির চেষ্টা দেখলে কেমন হয়, ঐ অঞ্চলে বেশ রোদ।'

লোকে বলে পুরুষদের সন্তান হলে তারা কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ে আর প্রথমটা সন্তানকে তাকিয়ে দেখতেও লজ্জা পায়। কিন্তু ওর লজ্জার কারণ ঠিক তা নয়। আমার প্রতি ও যে 'অন্যায়' করেছে এই শিশুটি যেন ওকে সেই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, তাই যখন বুঝতে পারল যে আমি ওর ঘাড়ে মোটেই দোষ চাপাবনা, তখনও ভরসা ক'রে এ বিষয়ে কথা বলতে পারছিল না।

পূরো একঘণ্টা গল্প করার পর ও গেল। যাবার আগে আমার কাঁধে হাত রেখে আর খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল,

'সত্যি, আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি!'

*　　　　*　　　　*

যাক্, এতদিনে বাধা ঘুচেছে। কাল অবশেষে কথা হোলো।

বাচ্ছাটাকে নিয়েছিলাম কোলে, সে পরম আনন্দে হাতের মুঠি খুলছিল আর বন্ধ করছিল, হঠাৎ দিল আলেকজাণ্ডারের নাকের দিকে হাত বাড়িয়ে।

আমি তার হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'না, না বাবার প্রতি অত দয়ায় কাজ নেই।'

'বাবা' কথাটা শুনে আলেকজাণ্ডারের মুখটা যেন কি রকম হোলো। পাশ থেকে অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে ও আমায় দেখছিল।

আমি যেন দেখতেই পাচ্ছিলাম না।

একগাল হেসে ও বল্‌ল 'বলতে চাও আমি ওর বাবা। কখ্‌খনো না!'

আমি সংক্ষেপে বল্‌লাম, 'তুমিই তো'।

'বলো কি ! ইনি যে দস্তুর মত এক নাগরিক।'

একটু অতিরিক্ত ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বলল, মনে হোলো নিজের সঙ্কোচ ঢাকবার বিশেষ চেষ্টা করছে।

নিশ্চয় ও ভেবেছিল এই সুযোগে আমি ও যে আমার স্বামী আর আমার সন্তানের বাবা এই হিসাবে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ব। কিন্তু আমি বাচ্ছাটাকে নামিয়ে খুব করে আঙুল নেড়ে তাকে শাসন ক'রে অন্য সব বিষয়ে কথা সুরু ক'রে দিলাম, আমার নিজের কথা, আর এই নবাগতটির ভবিষ্যতের কথা।

খানিকক্ষণ সে মাথা নীচু ক'রে বসে বুটের ফিতেটা ধরে নাড়া দিতে লাগল, যেন গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে। ঠোঁট কামড়িয়ে সে বলল, 'কিন্তু ওর সঙ্গে আমারও তো একটা সম্বন্ধ আছে।'

আমি উত্তর দিলাম, 'খুবই সামান্য। আর যাই হোক, এমন কিছু সম্বন্ধ নেই যে বড় হ'য়ে ও জানলে পরে বেজায় খুসি হবে।'

ওর মুখের রং লাল হয়ে উঠল। শুষ্ক কণ্ঠে ও জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তোমার নতুন······সেই নতুন কাজে কবে যাবে ?'

আমি হাসিমুখে জবাব দিলাম, 'এক পক্ষের মধ্যেই, যখন বার্ড-চেরি ফুটবে সেই সময়ে।'

মুখের ভাবে মনে হোলো আমার কথার মানে ও ঠিক ধরতে পারেনি।

'আমাকে তোমার ঠিকানা দিয়ে যাবে তো ?' এই ব'লে উত্তরের প্রতীক্ষায় বালিতে ও বুট ঘষতে লাগল।

আমি ঠিক তখন তখনই জবাব দিলাম না। ও তাড়াতাড়ি বল্‌ল, 'আবার তুমি নিরুদ্দেশ না হয়ে যাও তাই বলছি।' নিশ্চয় ওর মনে হয়েছিল যে আমি ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে নারাজ। আবার ওর মুখ লাল হয়ে উঠল।

আমি এতক্ষণে জবাব দিলাম, 'না, তা কেন হবে ?' ওর ট্রেণ ধরবাব কথা, তাই আমরা বিদায় নিলাম। আমার দিক থেকে বিদায়-সম্ভাষণ বেশ একটু আবেগপূর্ণই হয়েছিল। কিন্তু আবার দেখা হবে কিনা এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিনি।

আমার হাত ধ'রে অনেকক্ষণ ও আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, বোধ হয় সন্ধান করছিল স্থির বন্ধুত্বের হাসি ছাড়া আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা।

অবশেষে বেশ জোরে আমার হাত চেপে আস্তে আস্তে গেল চ'লে, একটি বারও পিছন ফিরে তাকাল না। আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

সারা বিকাল কাটল বিদায়ের কথা, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ভেবে। মনে প্রশ্ন জাগল, ভালো করেছি কি? ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু ও চ'লে গিয়েছে ব'লে লেশমাত্র ক্ষোভ বা ব্যথা আমার নেই। মনের মধ্যে আজ অনুভব করছি আশ্চর্য্য শক্তি, মনে হচ্ছে আজ আমি একেবারে স্বাধীন।

(রাশিয়ান গল্পের ইংরাজি অনুবাদ হইতে অনূদিত)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

নিশীথ সঙ্গীত

[মেস্‌ফিল্ড-কৃত স্প্যানিশ্‌ কবিতার অনুবাদ থেকে]

গান ভেসে আসে—
দূর গৃহ-বাতায়নে রূপসীর গান!
অলস চোখের পাতে কুয়াসার মতো ঢুলুঢুলু,
বাতাসের কাঁপা ঠোঁটে ফুলের চুমোর মত মিঠে,
পাখীর ডানার গায়ে বনের ছোঁয়ার মতো লঘু লীলায়িত,
গান ভেসে আসে!

গান ভেসে আসে—
দূর গৃহ-বাতায়নে উদাসীর গান!
পাইন্‌ বনের ছায়া—সোনালী জলের ঝিলিমিলি—
ঝরা ফসলের বুকে ফড়িঙের পাখ্‌নার দোলা—
ভীরু আকাশের চোখে মিটিমিটি তারার তাকোনো—
গান ভেসে আসে!

গান ভেসে আসে—
দূর গৃহ-বাতায়নে পিয়াসীর গান!
অতল ব্যথার গান, আহত আশার রঙে লাল—
পুরানো মদের গান, ঝাঁঝালো মধুর নেশা ভরা—
কোঁক্‌ড়া চুলের 'পরে আল্‌তো মুঠির মৃদু গান—
গান ভেসে আসে!

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জরতী

(জোসেফ ক্যাম্প্‌বেলের কবিতা হইতে)

অপরূপ মুখ-শোভা
জরাতাপ-দিগ্ধ,—
বেদীতলে যেন ক্ষীণ
দীপালোক স্নিগ্ধ।

শীতের নিরাভ সাঁঝে
নিভে-আসা সবিতা—
নিঃশেষ ভ্রূণ সম
জীবনের কবিতা।

গত জন, জল্পনা
একাকিনী জরতীর—
কালো থির ডোবা যেন
পোড়ো বাড়ী-খিড়্কীর।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আজ রজনীতে

আজ রজনীতে প্রহর ভুলেছে কারা?
সুরার মতন কে করিছে পান এমন বাদল ধারা?
আকাশে কোথায় লুকানো সাকীর দল,
পেয়ালা হইতে ঝরিতেছে অবিরল,
পৃথিবী যে হলো নেশায় পাগলপারা!
আজ রজনীতে সুরার মতন ঝরিছে বাদল ধারা॥

বন্ধু, আজিকে এলো অদ্ভুত রাতি!
ভুলিয়া গিয়েছি কখন নিভেছে বাসর ঘরের বাতি!
হয়তো সে নারী চোখেতে অশ্রু-রেখা
জাগিয়া জাগিয়া প্রহর গণিছে একা,
হয়তো ঘুমালো ধূলায় আঁচল পাতি'!
আজ রজনীতে কখন নিভিল বাসর ঘরের বাতি?

আজ রজনীতে আমাদের সুখ নাই !
ভরা বাদলের উন্মাদ রাতে বাহিরিয়া যেতে চাই !
সবাই যখন মগন ঘুমের ঘোরে
কার লাগি প্রাণ এমন কাঁদিয়া মরে ?
কিসের আশায় দুঃখের গীতি গাই ?
আজ রজনীতে মেঘের মতন আমাদেরও ঘর নাই ॥

বন্ধু, আমরা কেবল খুঁজিয়া মরি !
শত রজনীর আয়োজন হতে এক রজনীরে ডরি !
জীবনের নেশা হঠাৎ চাপিয়া ধরে,
মদিরা-পাত্র আবার কেমন করে
হৃদয়-রক্তে ঠোঁটের সুমুখে ধরি !
লাখো রজনীতে বাঁচিয়া আমরা এক রজনীতে মরি ॥

আজ রজনীতে নেশা জমিয়াছে ভালো !
তারা নাই নভে, মেঘের ফাঁকেতে নাহিকো চাঁদের আলো !
আমাদের মুখ চিনিবে না কেহ আর,
এমন রাত্রে খোলা নাই কারো দ্বার,
কোন্ অভাগিনী মোদের বেসেছে ভালো,
তারো চোখ বুঝি রাত্রির মত বেদনায় হলো কালো ॥

এখনও যা আছে করে লও নিঃশেষ !
আজ রজনীতে রেখোনা, বন্ধু, দরদের কোন লেশ !
পৃথিবীর শব সুমুখে পড়িয়া আছে,
প্রেতের মতন চারিদিকে ছায়া নাচে,
এখনও কি আছে জীবনের অবশেষ ?
আজ রজনীতে রেখোনা, বন্ধু, দরদের কোন লেশ ॥

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকী

এক সময়ে সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতায় আমার অগাধ আস্থা ছিলো। তখন আর পাঁচ জনের মতো আমিও মনে করতুম যে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল ভিন্ন শিবের অন্য কোনো পরিচয় না থাকলেও, সত্য আর সুন্দর নির্ব্বিকার ও নিত্য, তাদের সম্বন্ধে আদমসুমারীর সাক্ষ্য যেমন অশ্রদ্ধেয়, বিসংবাদ তেমনি অভাবনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিশ্বাস ধোপে টিঁকলো না; পারিপার্শ্বিক রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে এবং নিজের খামখা খেয়ালের যুক্তিসূত্র খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত আর না মেনে পারলুম না যে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা লোকাচারের মতোই দেশ-কাল-পাত্রের মুখাপেক্ষী; এখানেও পরমার্থের স্বাক্ষর নেই, স্বার্থই কর্ম্মকর্ত্তা; এবং এক্ষেত্রে দর্শকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত তো অনিবার্য্য বটেই, এমন-কি দ্রষ্টার কৈবল্যও হয়তো কিংবদন্তী। অবশ্য তৎসত্ত্বেও সাহিত্যবিচারে শ্রেণিসংঘর্ষের প্রস্তাবনা সঙ্গত নয়, এবং হোমার বা শেক্স্পীয়র, য়ুক্লিড্ বা ন্যুটন্-এর প্রতিপত্তি এতই সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বকালীন যে তাঁদের নির্লিপ্তি অন্তত আংশিক ভাবে সার্থক। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম মাত্র, সাধারণ বিধির প্রত্যন্তে অবস্থিত; এবং গত সাত-আট হাজার বৎসরের বিবর্ত্তনেও এই রকম বিশ্বমানবের সংখ্যা যেকালে মুষ্টিমেয়ই রয়ে গেছে, অহংসর্ব্বস্বদের মতো অসীমে ঠেকেনি, তখন শিল্পী-বিশেষের সুনাম-কুনামের জন্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তাঁর সমসাময়িকদের সহজ অনুকম্পা অথবা স্বাভাবিক অনীহা। অর্থাৎ সরস্বতীপূজাও যুগধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি; এবং যুগধর্ম্ম যেহেতু লোকোত্তরের ধার ধারে না, লোকায়তেই বাঁচে মরে, তাই প্রকাশ্যে বিদ্যোৎসাহ দেখালেও, ভারতীর কাছে আমরা ধনলাভ, বংশবৃদ্ধি, শত্রুবিনাশ ইত্যাদি বরই চাই। সেইজন্যেই কোনো কোনো কাব্যবিবেচকের মতে মহাকবিরা পরবর্ত্তীদের উপরে প্রভাব বিস্তারে অক্ষম, সে-সাফল্য অকবিদেরই আয়ত্তে; কারণ প্রকৃত কাব্যের প্রাঞ্জলতায় ভুল বোঝার অবকাশ নেই, এবং ব্যাসকূটের ব্যাখ্যায় স্বেচ্ছাচার অনিবার্য্য ব'লেই অপ-সাহিত্য অনুযাত্র আকর্ষণে সিদ্ধহস্ত। সম্ভবত এ-সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জিত; কিন্তু

চরিত্রগত ঐক্যের অবর্ত্তমানে এড্‌গর এলেন্‌ পো-র সংক্রাম বোদ্‌লেয়র মারফৎ ফরাসী দেশে পৌঁছতো কিনা সন্দেহ।

সে যাই হোক, পরলোকগত মাক্‌সিম্‌ গর্কি-র সঙ্গে দেশ-কালের যোগ আমার নেই, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি এমনি বিসদৃশ যে আমার পক্ষে সে-মনীষার মূল্যবিচার ধৃষ্টতা। আমি উত্তরসামরিক মানুষ, বিমানবিধ্বস্ত সমাজে বেড়ে উঠেছি, মেশিন গানের অগ্নিবৃষ্টি, শর্ষে গ্যাসের বিষবাষ্প, গৃহবিবাদের রক্তগঙ্গা আমার আবাল্য সহচর। কাজেই প্রাগ্‌বিপ্লবী বাঙালীর মতো স্বাধীনতার দেবদত্ত অধিকারে অচলা ভক্তি আমায় সাজেনা, অন্যায়ের অমোঘ পরাজয় আমি রূপকথার রাজ্যেই খুঁজি, আমার জানতে বাকি নেই যে সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্য্যায়ে। উপরন্তু অনাবশ্যক নরবলি ছাড়া বিদ্রোহের যে অন্য কোনো পরিণাম আছে, তা আমি ভাবতে পারি না; এবং প্রাগ্রসর মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে এত জাতি গত বিশ বছর ধ'রে নরকের গোলোকধাঁধায় ঘুরে মরছে যে অদৃষ্টের গয়ংগচ্ছে অধৈর্য্য প্রকাশ, আমার বিবেচনায়, মারাত্মক, তাতে অরাজকতারই আগল ভাঙে, ভাগ্যবিপর্য্যয় দূনে চলে না। অতএব গর্কি-র বিপ্লব-বিলাসের সঙ্গে আমার সহানুভূতি নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশায় মানুষের মনোভাব অন্য রকম ছিলো; রোমান্টিক আদর্শের আত্মপ্রবঞ্চনা তখনো অনাবিষ্কৃত, কালপ্রবাহের বাঁধা ঘাট তখনো উদারনীতির শূন্যকুম্ভে শব্দায়মান, নির্ব্বাসিত ভগবানের উচ্চ সিংহাসনে ব'সে বিজ্ঞান তখনো দুঃস্থ সংসারকে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির প্রলোভন দেখাতে ব্যস্ত। অবশ্য ইতিমধ্যেই সেই স্বপ্নগর্ভ অন্ধকারের এখানে ওখানে রূঢ় আলোক উঁকি পাড়ছিলো; এবং বুয়োর যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয়, ফাশোদা ইত্যাদির উপদেশে কেবল কালারাই কান পাতেনি। কিন্তু তখনকার মানুষ শব্দব্রহ্মকেই সর্ব্বশক্তিমানের মর্য্যাদা দিয়েছিলো; এবং সদিচ্ছা আর সমাজসংস্কারের মধ্যে যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান, তা সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার যুগ ঘুণাক্ষরেও বোঝেনি। হয়তো সেইজন্যে শ-প্রমুখ ফেবিয়ান্‌দের কাছে মার্ক্‌স্‌ হাস্যকর ঠেকেছিলো; এবং সেই বুদ্ধিজীবীরা স্থানে অস্থানে জোর গলায় ব'লে বেড়িয়েছিলেন যে তাঁদের মতো আমিষভোজন ছাড়লেই ভবিষ্যতের কল্পলতায় টেনিসনী নজিরের স্বতঃস্ফূর্ত্তি সুরু হবে। যত দূরে মনে পড়ে, গর্কি-র সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপের প্রথম পরিচয় এই ভাবধারার শ্রাবণপ্লাবনের দিনে; এবং

সমাজের অধস্তন স্তরে জন্মালেও, তাঁর পরিকল্পিত ত্রাণকর্ত্তারা যেহেতু কর্ম্মবীর নন, অসাধারণ তার্কিক আর অসামান্য বাগ্মী, তাই গর্কি-র নাম জপতে জপতে তদানীন্তন রক্ষণশীলেরাও ভেবেছিলেন যে তাঁরাই বুঝি অত্যাচারের চিরশত্রু ও নববিধানের অগ্রদূত।

আমি জানি উল্লিখিত মন্তব্যের বিপক্ষে অনেকেই আপত্তি তুলবেন; এবং যাঁদের চক্ষে সোভিয়েট্ শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্‌টিকের চরম ও পরম সমন্বয়, তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে ধমকে বলবেন যে মাক্‌সিম্ গর্কি শুধু বৃদ্ধ বয়সেই নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার গুণ গাননি, ১৯০৫ সনের সশস্ত্র রাজদ্রোহেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাঁকে হিংসাব্রত বোল্‌শেভিকদের সমপাংক্তেয় ভাবা আমার অসাধ্য। কারণ তৎকালীন জার্ম্মান দার্শনিকদের সংসর্গদোষে গর্কি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই মার্ক্‌স্‌বাদে আস্থা খোওয়ান, এবং উক্ত সমাজতন্ত্রের শোধনকল্পে কাপ্রি আর বোলোনাতে দুটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা ক'রে সহকর্ম্মী লুনাচার্স্কি-র সঙ্গে লেনিন্-এর কটু কাটব্য কুড়োন। কিন্তু তাতেও তাঁর ভুল ভাঙেনি; এমন-কি ১৯১৭ সালের উপনিপাতের পরেও বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির অপঘাত শোচনীয় জেনে তিনি উচ্ছ্বাসী লুনাচার্স্কি-র সংস্রবই ছেড়েছিলেন, বিজয়ী বিপ্লবের শৃগালী ঐকতানে সুর মেলাতে পারেননি। তবে নববিধানের ধ্বংসকামনায় তাঁর সম্মতি ছিলো না, এবং বুনিন্-প্রমুখ স্বদেশপলাতক লেখকদের মতো মাতৃভূমির কুৎসা প্রচারে তিনি উৎসাহ দেখাননি। উপরন্তু গর্কি যদিও একাধিক বার সাফল্যের চূড়ান্তে উঠেছিলেন, তবু বাঁদা-বর্ণিত মসিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোনোদিনই ছোঁয়নি; এবং জনগণের আত্মপ্রসাদে সাধুবাদের ঘৃতাহুতি ঢালা আমরণ তাঁর বিবেকে বাধলেও, তিনি কখনো ভোলেননি যে প্রাক্তন আত্মীয়তার সূত্রে প্রোলেটেরিয়ট্‌ই তাঁর সেবা ও অনুকম্পার অংশভাক্। তাহলেও ব্যক্তিবাদ তাঁর কাছে মহামূল্য ঠেকতো, রুষ ধনতন্ত্রের রক্তাক্ত উপসংহারে তিনি যথাসাধ্য প্রতিবন্ধক জুটিয়েছিলেন; এবং জন্মভূমি সম্বন্ধে বিদেশীদের অবিমিশ্র বৈরী ভাবে ধৈর্য্য হারিয়ে তিনি তাঁর শেষ জীবন পাশ্চাত্য সভ্যতার ছিদ্রান্বেষেই কাটিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই রুচিপরিবর্ত্তনের পরেও গর্কি মনুষ্যধর্ম্মের বাদ সাধেননি, সাধারণ স্বত্ব ব্যতীত ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ পরিণতি দুর্ঘট বুঝেই কম্যুনিজ্‌ম্‌কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আসলে গর্কি-র হৃদয় তাঁর মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড়; এবং সেইজন্যে লেনিন্-এর মৃত্যুর পরে তিনি এক দিকে যেমন লেনিন্-প্রতিষ্ঠিত

শাসনযন্ত্রকে তাঁর শোকার্ত্ত বন্ধুবাৎসল্যের উত্তরাধিকারী ব'লে চিনেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে তাঁর অহৈতুক কৃষকবিদ্বেষের দায় রুষ জাতির তথাকথিত নৃশংসতার উপরে চাপিয়ে তিনি স্বদেশে সমষ্টিবাদের সম্ভাব্যতা মানতে চাননি।

তাহলেও গর্কি সম্পর্কে নির্ব্বোধ বিশেষণ অব্যবহার্য্য। বরং তাঁর ক্ষেত্রে রুষ চারিত্র্যের স্বভাবসিদ্ধ তর্কপ্রেম আত্মশিক্ষিতের সচেতন বিদ্যাভিমানে মিশে রস-রচনাকেও তত্ত্ববিচারের মতো শুষ্ক ও সূক্ষ্ম ক'রে তুলেছিলো; এবং এ-অভিযোগ শুধু তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাস 'ক্লিম্ সাম্‌গিন্' সম্বন্ধেই খাটে না, জগদ্বিখ্যাত 'ফোমা গর্ডেইয়েভ্', 'থ্রি অফ্ দেম্', 'দি মাদার' ইত্যাদিও কেমন যেন নীতিমূলক, কেমন যেন অবাস্তব ও অসংহত। অথচ সে-বইগুলোর জীবনবেদ অসাধারণ; তাদের পাত্র-পাত্রীরা মাঝে মাঝে অতিশয় জীবন্ত; প্রাদেশিক কুসংস্কারের অনড় অন্ধকারও যে স্বাধীনতার সূর্য্যকে চিরকাল ঢেকে রাখবে না, এই অমর আশার উন্নয়নে প্রায় প্রত্যেক পুস্তকই উদ্দেশ্য-প্রধান হয়েও সঙ্কীর্ণ সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে-পিপাসা নিয়ে আমরা রুষ উপন্যাসের অতলে ডুবি, এখানে তা মেটে না; টল্‌ষ্টয়-এর বিশ্ববীক্ষা, টুর্গেনিভ্-এর মাত্রাজ্ঞান, ডষ্টয়েভ্স্কি-র অন্তর্দৃষ্টি, চেকোভ্-এর বহিরাশ্রয়িতা, সে-সমস্তই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি ব'লে ধরা পড়ে, এমন-কি এর পরে গোঞ্চারভ্, আর্টসিবাশেভ্ প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠাকেও আর জাতীয় প্রতিভার লক্ষণ হিসাবে ভাবা যায় না। কিন্তু এ-ধরণের তুলনা আসলে হয়তো নিরর্থক। কারণ রসপ্রতিপত্তি একাগ্রতার পুরস্কার; এবং সম্প্রতি কীথ্-এর মতো নৃতত্ত্ববিদও জাতিস্বাতন্ত্র্যের দিকে যতই ঝুঁকুন না কেন, তবু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই মানুষী বিবর্ত্তনে বর্ণভেদের প্রশ্রয় দেন না। তাছাড়া সংস্কারমুক্তি ও স্বকীয়তা সকল সাহিত্যিকেরই কাম্য; এবং গর্কি-র নভেলে প্রত্যাশিত সুষমার অভাবে আমি ও আমার সমানধর্ম্মীরা পীড়া পাই বটে, কিন্তু তাঁর ছোট গল্প অথবা জীবনস্মৃতি এই বৈচিত্র্যের বাহুল্যে, এই অপরিচয়ের বিস্ময়েই আমাদের মন মজায়। 'দি বর্থ্ অফ্ এ ম্যান্', 'ইন্ দি অটম্', 'টোয়েন্টি সিক্স্ মেন্ এণ্ড্ এ গর্ল্' এবং সর্ব্বোপরি 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' পড়লে আর সন্দেহ থাকে না যে গর্কি রুষ সাহিত্যের মহাপথে চলুন বা না-চলুন, তাঁর রূপনৈপুণ্য অন্য কারো চেয়ে কম নয়; এবং সেই কলাকৌশলের উপভোগ যদিও দুর্লভ বৈদগ্ধ্যের ধার ধারে না, তবু আদর্শ ও যাথার্থ্য, বাদানুবাদ ও তন্ময়তা, চিত্তশুদ্ধি ও রোমাঞ্চপ্রীতি, কালোপ-

যোগিতা ও অবৈকল্যের এ-রকম অপরূপ সংমিশ্রণ তাঁর আগে আমাদের কল্পনার অতীত ছিলো।

কিন্তু উক্ত রসায়ন গর্কি-র বুদ্ধিজাত নয়, তাঁর আবেগপ্রসূত; তার পিছনে বিরাট সাধনা নেই, আছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং উপন্যাস যেহেতু এক নিঃশ্বাসে লেখা যায় না, ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সাহায্যে গ'ড়ে তুলতে হয়, তাই গর্কি-আদি প্রেরণাপ্রধান লেখকেরা ছোট গল্প রচনায় যে-সাফল্য পান, বড় উপন্যাসে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন না। এ-ধরণের পুস্তকে আমরা মাঝে মাঝে হয়তো বিদ্রোহী উন্মাদনার বিদ্যুদ্বিলাস দেখি, বিদ্রোহের শোকাবহ ব্যর্থতায় তলাই, কিন্তু গর্কি-সদৃশ প্রতিভাবানের প্রাণপাত প্রযত্ন সত্ত্বেও তার সার্থকতা বুঝি না, আগন্তুক সমাজের সুসমঞ্জস চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ করি না। আমি যত দূর জানি, সফল বিদ্রোহ সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপন্যাস একখানাও নেই; কারণ উপন্যাসে বিশ্বাসের অবকাশ থাকলেও, বুদ্ধিই সেখানকার প্রভু, তার থেকে পক্ষপাত বাদ পড়ে না বটে, কিন্তু তার মধ্যে তুলাসাম্যই নজরে আসে, সে-কার্য্যে সত্যকে যদি বা সম্ভাব্যতার খাতিরে ভোলা চলে, তবু তথ্য বা তত্ত্ব, কারো প্রয়োজনেই শৃঙ্খলার অসম্ভ্রম সয় না। আপাতত নিরাসক্ত ভিন্ন ঔপন্যাসিকের গতি নেই; এবং গীতিকবিতা বা আখ্যায়িকা-রচয়িতার মতো অনুকূল ঘঠনাচক্র তাকে উত্তেজনা জোগায় না, সে যখন চরিত্রব্যবসায়ী, তখন মানসপুত্রদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সে নিজেই জোটাতে বাধ্য। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও অত্যধিক কল্পনাবিলাস বিপজ্জনক; অলস মনে ভাব থেকে ভাবান্তরে ঘুরলেই উপন্যাস ফুটে ওঠে না, সেজন্যে মমত্ববোধ বর্জ্জনীয়; এবং বিবেচনা আবশ্যিক। অর্থাৎ ছায়ামূর্ত্তিও স্বাতন্ত্র্যে অধিকারী, স্বধর্ম্মেই তার উজ্জীবন; এবং পৈত্রিক আদর্শের বোঝা বইলে পুত্রের ব্যক্তিস্বরূপ যেমন পিষে মরে, তেমনি উদ্‌ভাবকের মতপ্রচারে জুড়ে দিলে মানসপ্রতিমার বুকেও প্রাণস্পন্দন জাগে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্‌ বলেছিলেন নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থনেই কাব্যের উৎপত্তি; এবং সে-অনুমান যে মিথ্যা, তার প্রমাণ শেলীর উচ্ছ্বসিত কবিতাবলী। কিন্তু কাব্যের বেলা সে-নিয়ম খাটুক আর নাই খাটুক, ঔপন্যাসিকের মুখ্য সম্বল কীট্‌স্‌-বর্ণিত জীবন্মুক্তি। বলাই বাহুল্য, এই নঙর্থক ক্ষমতা ভাবয়িত্রী প্রতিভার লক্ষণ; এই নির্ব্বিকার সমভাব কারয়িত্রী প্রতিভাকে সাজে না; এবং এটা শুধু নিষ্কাম ও নিরাত্ম নয়, অমানুষিক রকমের নিষ্ঠুরও। হয়তো সেইজন্যেই সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ট্র্যাজিডি; এবং শ্রেষ্ঠ

কথাসাহিত্যিকেরা দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার; ভগবদ্‌ভক্তি ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ের আকর্ষণ মানলেও, পরিণামী সিদ্ধির মোহ সাধ্যপক্ষে এড়িয়ে গেছেন। অতএব উপন্যাস করুণাময়দের উপযুক্ত রঙ্গভূমি নয়; কেননা সর্ব্বগ্রাসী বোধশক্তি আর সর্ব্বংসহ ক্ষমা কেবল ফরাসী প্রবচনের মতেই তুল্যমূল্য; সাধারণ মানুষ স্নেহান্ধ, এবং স্নেহ আর হিংসা অভিন্নহৃদয়, উভয়ই অধীর ও একদেশদর্শী।

দুঃখের বিষয়, বিপ্লবী লেখকেরা আর্য্যসত্যে বীতশ্রদ্ধ। তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে তাঁদের সমর্থন নেই; এবং তাঁরা যদিও জানেন যে অগ্নিপরীক্ষা উৎরিয়েই বৈদেহী দুর্ম্মুখদের থামিয়েছিলেন, তবু সেজন্যে তাঁরা রামের সুমতিকে বাহবা দেন না, বলেন যে নিশ্চিতের যাচাই চিরায়ুদেরই মানায়, মর্ত্ত্যমানুষের কাছে স্বজ্ঞার নির্দ্দেশ স্বতঃপ্রমাণ। মার্কস্‌-ভক্ত না হলেও মাক্‌সিম্‌ গর্কি এ-কথা মানতেন, এবং ১৯০৭ সালে থেকে ক্ষয়রোগের কবলে প'ড়ে সময়সংক্ষেপের প্রয়োজন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন। উপরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের মতো তিনি দুঃখ-দৈন্যকে দূর থেকে দেখেননি, এবং পরোক্ষ অভাব-অনটন তাঁর ভাববিলাসের উপলক্ষ্য জোগাতো না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজ্‌নি-র এক সর্ব্বহারা পরিবারে তাঁর জন্ম; এবং চার বৎসর বয়সে চর্ম্মকার পিতাকে হারিয়ে ১৮৯২ সনে তাঁর প্রথম গল্পের মুদ্রণ পর্য্যন্ত যে-অকথ্য দুর্দ্দশা তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল, সেই উপাদানে হয়তো দশ-বিশখানা মহাভারত লেখা যেতো, কিন্তু সে-সম্বন্ধে শিল্পিশোভন পরিচ্ছিন্নতার অবকাশ ছিলো না। অবশ্য তার পর থেকে মাঝে মাঝে রাজপুরুষদের তাড়া খেলেও, বর্ত্তমান বিধি-ব্যবস্থা গর্কি-র জয়যাত্রার সামনে কেবল ফুলই ছড়িয়েছে। কিন্তু প্রাপ্যের অধিক পূজা পেয়েও তিনি নিজের গন্তব্য ভোলেননি, আমরণ মনে রেখেছেন যে গ্রাসাচ্ছাদন, আহ্লাদ-আমোদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি শুধু প্রতিভাশালীদের আয়ত্তে এলেই যথেষ্ট নয়, সর্ব্বসাধারণের উৎকর্ষসাধনই সভ্যতার একমাত্র ব্রত। এ-আদর্শ যে মহান, অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির চেয়ে অকাতর সমাজসেবা যে অনেক বেশি উদার, তা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহলেও এ-মত সম্ভবত অর্দ্ধ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, এবং অর্দ্ধ সত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক। অন্ততপক্ষে এ-সংবাদ সকলেরই সুবিদিত যে অনুরূপ যুক্তির জালেই জার্ম্মানী ও ইটালীর স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অসামাজিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা শ্রেয়োবোধের উদ্বন্ধন ঘটাচ্ছে; এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদেই যখন গর্কি-র সারা জীবন কেটেছে, তখন

তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে কখনো প্রজ্ঞাবিসর্জ্জনের কুমন্ত্রণা মিলবে না, স্বাবলম্বী বিচার-বুদ্ধিকেই অপরিহার্য্য লাগবে। কারণ ফাশিজ্‌ম্ আর কম্যুনিজম্-এর উভয়সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যৎকিঞ্চিৎ কম অসদ ব'লে আমাদের অবশ্যবরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে অর্দ্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্ব্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচারিত মধ্যপন্থাই হয়তো অগতির গতি, এবং সে-পথে চলতে গিয়েই বুরিদান্-এর গাধা অনাহারে মরেছিলো বটে, কিন্তু তার দু পাশে যে-দুটি বিপরীতমুখী গড্ডলিকাস্রোত প্রবাহিত, তাদের পরিসমাপ্তি একেবারে প্রলয়পয়োধিতে।

পুস্তকপরিচয়

Soviet Communism—A New Civilisation ?—By Sidney and Beatrice Webb (Longmans) 2 vols.

দুই ভলুমের বইখানিকে আলোচ্য বিষয়ের বিশ্বকোষ বললে অত্যুক্তি হয় না। একে সোভিয়েট সাম্যবাদ, তায় লেখকদ্বয় ওয়েব্-দম্পতি, অতএব বইখানি যে ইংরেজী ভাষায় লেখা সমাজতন্ত্রের একখানি উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিগণিত হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সোভিয়েটতন্ত্র সম্বন্ধে যতপ্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে তার উত্তর, যতপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় থাকতে পারে তার বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা লেখকদ্বয় দিয়েছেন। ওয়েব-দম্পতির তথ্য সংগ্রহের প্রতি মোহ চিরপরিচিত, কিন্তু সে-মোহ সাবধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বিশুদ্ধ বলেই আজকালকার প্রত্যেক ইংরেজ সমাজতত্ত্ব-বিদই তাঁদের গুরুস্থানীয় মনে করে। অমানুষিক পরিশ্রম, অপক্ষপাত ভূয়োদর্শন, তীব্র সত্যানুসন্ধিৎসা, সাবধান সিদ্ধান্ত এবং সর্ব্বোপরি সহজ বোধগম্য ভাষা আমরা বরাবরই তাঁদের কাছে পেয়েছি এবং প্রত্যাশা করি। প্রায় ১১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে এমন কোনো বাক্যের সাক্ষাৎ পাইনি যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে ওয়েব-দম্পতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের আজীবন সাধনার আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাঁদের তথ্যানুরাগ এখনও অক্ষুণ্ণ, এই আমার ধারণা, অতএব, সেই দিক থেকে তাঁদের বিশ্বকোষী গ্রন্থের সমালোচনা কারুরই সুসাধ্য নয়।

সমালোচনা সম্ভব একমাত্র সিদ্ধান্তের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে। লেখকদ্বয়ও তাই প্রত্যাশা করেন, নচেৎ বইএর নামকরণে 'একটি নতুন সভ্যতা'র পর জিজ্ঞাসার চিহ্ন থাকত না। নানা তর্ক বিতর্কের পর ওয়েব-দম্পতি স্বীকার করছেন যে সোভিয়েট-তন্ত্র এক-প্রকার নতুনতর সভ্যতা এবং এই সভ্যতা ছড়িয়ে পড়বে দেশবিদেশে, অর্থাৎ সোভিয়েট-কম্যুনিষ্টের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। মাত্র এইটুকুই বিচারের ক্ষেত্র। অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে ; কারণ একাধিক ভারতবাসীর ধারণা যে ভারতবর্ষে অন্য এক প্রকার সভ্যতার আঙ্গিক পরীক্ষিত হয়েছিল, তার কাঠামোটা এখনও বর্ত্তমান এবং মার্ক্স্-কল্পিত বিশ্ব ইতিহাসের দুর্নিবার নিয়তির পরিক্রমণে সেই কাঠামো হয়ত বা সামান্য পরিমাণে বাধাও দিতে পারে। অন্য ভাষায় বলা চলে, সোভিয়েট-কম্যুনিজম যদি একপ্রকার সভ্যতা হয়, তবে ওয়েবদ্বয়ের স্বীকারোক্তি অনুসারে অন্য একটি সভ্যতার মাপকাঠিতে তার বিচার সম্ভব। এইখানে বলে রাখা ভাল যে লেখকরা মার্ক্সিষ্ট নন, কোনো মার্ক্সিষ্ট কিংবা কম্যুনিষ্ট 'সোভিয়েট-কম্যুনিজম' কথাটি ন্যায়তঃ প্রয়োগ করতে পারেন না, কারণ, তাঁর মতে কম্যু-

নিজ্স্ই একমাত্র সভ্যতা, বাকি সব বর্ব্বরতা, অর্থাৎ সভ্যতার পূর্ব্বাবস্থা। ন্যায়ের যুক্তি না তুললেও চলত, কারণ কেনা জানে যে ওয়েবরা ফেবিয়ান? যখন তাঁরা সোভিয়েট-তন্ত্র আলোচনা করছেন তখনও তাঁরা ফেবিয়ান। এমন কি এতদূর পর্য্যন্ত বলা চলে যে কয়েক বৎসব পূর্ব্বের নিজেদের রচনার—(A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain) ও কল্পনাব বাস্তব পরিণতি হিসেবেই যেন সোভিয়েট পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, নতুন বইখানিতে। রাশিয়ায় গোঁড়া কম্যুনিষ্ট বোধ হয় আজকাল কেউ নেই, তাই বইখানি সম্বন্ধে ট্রট্স্কীকার মতামত একটু কঠোর হবে ভয় হয়। হয় রাশিয়া 'ফেবিয়ান' হয়ে আসছে, না হয় ওয়েবদ্বয় রাশিয়ায় ফেবিয়ান-কল্পনার রূপ দেখেছেন। সে যাই হোক না কেন, গোঁড়া কম্যুনিষ্ট এবং গোঁড়া স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী, উভয়েই নতুনতর সভ্যতার দাবী সহজে গ্রাহ্য করতে চাইবেন না সন্দেহ হয়।

প্রথম ভলুমে রাশিয়ার শাসন-পদ্ধতির বিবরণ ও আলোচনা আছে। কেন্দ্রিক, দেশীয় ও স্থানীয় রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা লেখকদ্বয়ের করায়ত্ত, অতএব ঐ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিতে বহু বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট। অধিক বলা আজ ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অশোভন। খবরের কাগজে প্রকাশ যে ষ্ট্যালিন রাশিয়ার শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে এক নতুন ইস্তাহাব জারি করেছেন। তার প্রধান কথা নাকি পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসী, অর্থাৎ আপামর সাধারণের প্রত্যক্ষ স্বরাজ চালনার পরিবর্ত্তে প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা সকলের জন্য আইনকানুন প্রবর্ত্তন করা। ষ্ট্যালিনের মতলব কি জানা যাবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর প্রস্তাবটি বিশেষ সোভিয়েট পন্থায়, অর্থাৎ ওয়েব-বর্ণিত উপায়ে গৃহীত ও প্রকাশিত না হচ্ছে। ইতিমধ্যে খবরটি সনাতনীদের আত্মরতিব যত খোরাকই যোগাক না কেন, নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিকেরা বইখানি পড়বার পর ষ্ট্যালিনের নতুন ইস্তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিচলিত হবেন না। সোভিয়েট রাজ্যশাসনতন্ত্র আর যাই হোক স্যুইজারল্যাণ্ডের 'উর' নামক জেলার পুরাতন landsgemindeএর মতন প্রত্যক্ষ ব্যক্তিবাদী সাধাবণতন্ত্র নয় এবং ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টাবী ডিমক্রেসীও হবে না। রাশিয়ার বাজ্যব্যবস্থা বৃত্তিমূলক দল ও ব্যক্তিতান্ত্রিক ভোটেব সমন্বয়েব ওপর প্রতিষ্ঠিত। পার্লামেণ্ট ও সোভিয়েট তন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ষ্ট্যালিন যা নামই দিন না কেন। দুটি দলের সংখ্যার পঞ্চবার্ষিক হ্রাসবৃদ্ধির ওপর যে রাজ্যপদ্ধতি নির্ভর করে সে-পদ্ধতি রাশিয়ায় কখনও আসতে পারে না, যতদিন 'পার্টি' কথাটির বিশেষ মার্ক্সিষ্ট অর্থ ও সামাজিক নির্দ্দেশ না পরিবর্ত্তিত হয়। যদি ধরাও যায় যে রাশিয়ার বিপ্লব এখন শেষ হয়েছে, অতএব রাষ্ট্রাধিকারের উপায় অর্থাৎ পার্টির এই সংজ্ঞা এখন সেখানে নিষ্প্রয়োজন, তবু পার্টি কথাটিব ওয়েব-নির্দ্দিষ্ট সামাজিক ইঙ্গিত এখনও অর্থবাহী রয়েছে ও থাকবে। ওয়েবদের মতে কম্যুনিষ্ট পার্টি এক প্রকার শিক্ষানুষ্ঠান, যেখানে নেতৃত্ব সাধনার কঠোর পদ্ধতি রাশিয়ান যুবক যুবতীকে শেখান হয়।

কম্যুনিষ্ট সমিতির সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা খুবই কঠিন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি তাই 'vocation of leadership'-এ রীতিমত পোক্ত। আমার বিশ্বাস হয় না যে পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, মাত্র এই ধারণার বশে নেতৃত্বরৃত্তির শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যক্ত হবে। পরিত্যাগের অর্থই হোলো কম্যুনিষ্ট পার্টি-অনুষ্ঠানকে মেরে ফেলা—অর্থাৎ আত্মহত্যা। যদি তাই হয় তবে নতুন সভ্যতার নতুনত্ব উঠে যাবে। অত সহজে ও অত শীঘ্র কোনো জাগ্রত জাতি আত্মনিধনে ব্রতী হয় না।

সেই জন্য আমার বিশ্বাস যে প্রতিনিধির নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটলেও বইখানির প্রথম ভলুমটির সাহায্য সোভিয়েটতন্ত্রের রাষ্ট্রনির্ব্বাহ জানবার জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রথম ভলুমের পরিশেষে রাষ্ট্র ও শাসন-প্রক্রিয়ার নক্‌সা দুটি অমূল্য। কেন্দ্রস্থ ও সীমাস্থিত সমিতির যোগ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভুল ধারণা চলে গেল। কেন্দ্রমুখ রাজসভা ও কেন্দ্রবিমুখ গ্রাম ও কারখানার সমিতির মধ্যে সমন্বয় তখনই সম্ভব যখন উভয়ই সত্যকারের সাধারণতন্ত্র, যখন দুটির মধ্যে জনগণের জীবনস্রোত অবাধে প্রবাহিত, যখন ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলী কেন্দ্রস্থ সভার আশীর্ব্বাদে শুদ্ধস্বার্থ, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার সুযোগ বর্ত্তমান। এই সমন্বয় পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসীর decentralisation কিংবা devolution নয়; কিংবা সিণ্ডিক্যালিষ্ট কল্পিত bourse du travail-এর আভিজাত্য ও সাধারণতন্ত্রের জগাখিচুড়ি নয় নিশ্চিত। অবশ্য এই প্রকার ইমারৎ খাড়া করা যায়, কিন্তু তাতে সিঁড়ি থাকে না, নীচের তলার লোক নীচেই পচে মরে, ওপর তলার লোক মাটিতে না হাঁটতে পেরে বাতগ্রস্ত হয়। প্রথম ভলুমের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় আমি তাই বহু মূল্যবান মনে করি। আমরা পার্টি, ডিক্‌টেটার, নেতা প্রভৃতি অনেক কথাই ব্যবহার করি কংগ্রেস সম্পর্কে। কিন্তু নেতৃত্বের পিছনে কত কৃচ্ছ্রসাধন থাকা উচিত, নেতৃত্ব যে ভগবানের কৃপা নয়, তার জন্য যে একটি ব্যাপক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, সেটি যে একপ্রকার নিষ্ঠা ও বৃত্তি (vocation), আমরা ভারতবাসীরা যেন ঠিক বুঝি না, অর্থাৎ মুখে স্বীকার করলেও কার্য্যে পরিণত করতে পারিনি। আমাদের দেশে কি উপায়ে নেতা তৈরী হয় জানা আছে। তাই আমাদেব কর্ম্মীদের অনুরোধ করছি অধ্যায় দুটি পড়তে। বি, এ পাশ করে শ্বশুর কিংবা সম্প্রদায়ের জোরে চাকরী পেলে রাজকর্ম্মচারী হওয়া যায় না, এমন কি কঠিনতম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষা পাশ করলেও যেমন গবর্ণমেণ্টের শ্রীবৃদ্ধি হয় না তেমনই জয় জয় রবে ভিড় জমালে কিংবা ছুতোয় নাতায় জেলে গেলে ও জেলে গিয়ে ধর্ম্ম পুস্তক পড়ে দেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলেও নেতা তৈরী হয় না, দেশের কল্যাণও হয় না। নিষ্কাম ভাবে সমাজ-সেবা করতে করতে সেবক হয়, তাদের মধ্যে সুবিধা, প্রকৃতি ও ব্যবস্থা অনুযায়ী কেউ বা হয় নেতা, কেউ বা থাকে সেবক। সে-নেতা ও সে-সেবকের মধ্যে পার্থক্য ভিন্ন ধরণেরই। শাসনপদ্ধতির ব্যাখ্যা ভিন্ন এই vocational training of leader-

ship-এর বিবরণের জন্যও ওয়েব-দম্পতির প্রথম ভলুমটি সকলের কাছে চির আদরণীয় থাকবে।

দ্বিতীয় ভলুমটাই আমি কিন্তু বেশী আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। কারণ তার মধ্যেই, প্রথমটি ছাড়া অন্য পাঁচটি অধ্যায়ে, আমার মত লোকের মনের খোরাক যথেষ্ট আছে। আজ গত কয়েক বৎসর ধরে অর্থনীতিজ্ঞ মহাপণ্ডিতদের রচনায় পড়ছি যে প্ল্যানিং পদার্থটি হয় অতি পুরাতন, না হয় নিতান্ত অসম্ভব। সেই মত প্রচারও করেছি ছাত্রদের কাছে। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হোতো; কারণ, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যেন মহারথীদের মতামত হেয় প্রতিপন্ন করতেই পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পকে সার্থক করে ফেললেন দেখলাম। ক্যান্যান্, গ্রেগরী থেকে হায়েক্, মিজেস্, পিয়ার্সন্ সকলেই বলেছেন ঐ ধরণের প্লানিং সম্ভব নয়, অথচ নিরপেক্ষ সোভিয়েট-বিদ্বেষী দর্শকবৃন্দ দেখাচ্ছেন যে যতটা সঙ্কল্পিত হয়েছিল ততটা না হোক, প্ল্যানের অনেকাংশই পশ্চিমী য়ুরোপীয়ানের পক্ষে আশাতীত ভাবে সফল হয়েছে। আমরা ভারতবাসী অধ্যাপক তত্ত্ব ও তথ্যের দোটানায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। তাই যখন বইখানির দ্বিতীয় ভলুমে পড়লাম যে পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের মূলকথা—অর্থাৎ মুনাফাবর্জ্জিত ব্যবসা, পণ্ডিত-বর্গ ধরতে পারেন নি, অতএব তার নতুন রূপ ধারণা করতে তাঁরা অক্ষম তখন সত্যই যেন কূল পেলাম। অবশ্য পূর্ব্বেও একাধিক পুস্তকে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু বারবারা ওয়টন্, মাইকেল্ ফার্বম্যান্, গ্রীঙ্কো, ডব্, মিস্ বোশ্যাম্প্ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করতে মন চাইনি। সে যাই হোক, এখন আমি বুঝেছি যে ব্রূসকুস্ প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ্য, অর্থাৎ হিসাব-নিকাশে (costing & accounting-এ) সোভিয়েটপদ্ধতি পরিচিত পন্থায় না গেলেও সেই দোষের জন্য অন্য দেশে যেমন সর্ব্বনাশ হয় সে সর্ব্বনাশ রাশিয়ায় সাধিত হয় নি। সোভিয়েটের কর্ত্তৃপক্ষ দিব্যি কাজ চালাচ্ছে—এমন ভাল ভাবে যে উদ্বৃত্ত পণ্য ঠেল মারছে অন্য দেশে, তাও শোনা গিয়েছে।

ব্যাপারখানা এইঃ ব্যক্তিগত লাভ যদি বাদ দেওয়া যায় হিসেব থেকে ও ব্যবসায়ীর মন থেকে তবে প্ল্যানিংএর বিপক্ষে আপত্তি টেঁকে না। বাস্তবিকপক্ষে, লাভ (profit) প্রত্যয়টির শিকড় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যতটা ব্যাপক হোক আর না হোক, তার মূলটা মনের গভীরতম কন্দরে পৌঁছায়, এই লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক জীব নামে একটি আজব চীজের কল্পনা করেন। কিন্তু লাভের এই আদিম, অকৃত্রিম ও অনাহত তাগিদ, কিংবা উদ্দীপনা, কিংবা প্রবৃত্তি যদি অস্বীকার করা যায় তবে প্ল্যানিং সম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব প্ল্যানিংএর বিপক্ষে আপত্তিটা মানসিক, তার জবাব দেবে মানসবিজ্ঞান। পরীক্ষামূলক মানসবিজ্ঞানে লাভ নামে কোনো প্রাথমিক প্রবৃত্তির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোভিয়েটতন্ত্র শিক্ষায় বিশ্বাসী, তাঁরা পারিপার্শ্বিককে উন্নত করে হৃদয়বৃত্তির পরিবর্ত্তন-সাধনে তৎপর। সুপ্রজনন বিদ্যার দোহাই পেড়ে যাঁরা প্রতিবেশের

মূল্য দিতে চাননা এবং বীজের মধ্যে লাভের প্রবৃত্তি আবিষ্কার করতে যাঁরা তৎপর তাঁদের জন্য স্যার যোশিয়া ষ্ট্যাম্প নামক চল্লিশটি কোম্পানীর ডিরেকটার বাহাদুরের মত উদ্ধৃত করছি। Philosphy নামে একটি পরিচিত পত্রিকায় 'Can present human motives work a planned society ?' প্রবন্ধে ভদ্রলোক বলছেন :—My provisional answer is therefore over a major part of the field 'No' ; over a certain smaller but important part possibly 'Yes' ; and over yet a balance of the area probably 'Yes'. But I have exposed only a part of the mechanism to view and more attention ought to be devoted to the psychology of the plannees alongside of an elaborate study of plans and planners। সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে···ঠিক এই কাজগুলিই ওয়েবদ্বয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

প্লানিংএর বিপক্ষে আপত্তি বাস্তবিক পক্ষে মানসিক স্তরের লিখেছি। কিন্তু অর্থনীতিবিদ ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নন। অর্থনীতিতে আজকাল বিশ্লেষণের যুগ চলছে, বিশেষতঃ লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিনিকেতনে। তাঁদের পদ্ধতিটা নতুন নয়, ধ্রুব। অনুষ্ঠান ও প্রকৃত ব্যবহারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইকনমিক জীব, ইকনমিক রাষ্ট্র, optimum firm প্রভৃতি তাঁরা সৃষ্টি করেছেন ও তাদের কার্য্যাবলী বিচার করছেন। এই নব্য নৈয়ায়িকদের যুক্তি অকাট্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে গাছে মাকড়সার জাল ঝোলে তার পাতায় শিহরণ লাগলে জাল যায় ছিঁড়ে। ধরা যাক, আবহাওয়া আজকের মতন স্পন্দনহীন, জালের প্রত্যেক তন্তুটি অন্যটির সঙ্গে জ্যামিতিক ছন্দে বাঁধা। তন্তুগুলি কি ? প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আদান প্রদান বাধাহীন, ফলে ক্রেতাসমষ্টির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে সন্তোষ-বিধান ; সুদের সঙ্গে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করবার খরচের যোগফলে বাজারের নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারণ ; ক্রেতার বিরতিহীন চাহিদার ফলে মূল্যের স্বাভাবিক সমীকরণ (automatic price adjustment by the continual referendum on what shall be produced and consumed) ; দেশের গড়পড়তা মূলধনের ব্যবসা-ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী বণ্টন (optimum allocation of capital between the different units)। সুতোগুলি অত্যন্ত মিহি এবং প্রত্যেকটির শিল্প অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। মনে হয় মাকড়সার কি অদ্ভুত কৌশল ! যেন ভগবানের হাত, স্বভাবের চেয়েও স্বাভাবিক ! কিন্তু ওয়েবদ্বয়ের কৃত এই ধ্রুবপদ্ধতির ইকনমিকসের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পড়লে আমাদের মোহ দূর হয়। তখন মনে হয়, নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়ায় ক্রেতার কোনো স্বাধীনতা নেই, তার চাহিদার প্রকৃত অর্থ হোলো effective demand, অর্থাৎ হাতে যা টাকা আছে তাই দিয়ে যা প্রস্তুত করছেন কর্ত্তারা তাই কেনবার যৎসামান্য ক্ষমতা। আর মনে হয় মূল্যের স্বাভাবিক সমীকরণ নিরর্থক—ওসব ধরতাই বুলি, চলে কেবল নিরালম্ব নিরঙ্কুশ কাল্পনিক

জগতে। ব্যক্তিবাদী, বিশ্লেষণ-প্রিয়, বিশ্বাসী ইকনমিষ্টদের তাই আমি ৬৭১ পৃষ্ঠা থেকে ৬৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অন্ততঃ পড়তে অনুরোধ করছি। ওয়েবদ্বয়ের প্ল্যানিংএর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ অদ্ভুত, সমর্থনও বুদ্ধিগ্রাহ্য।

আমি ভেবে চিন্তেই বিশ্লেষণ ও বিবরণ লিখলাম। কারণ তার বেশী বিশেষ কিছু আমি এই বইএ পাইনি। সমাজতাত্ত্বিকের কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তথ্য সংগ্রহ, তার ব্যাখ্যা ও বিবরণ ভিন্ন অন্য আগ্রহ আছে ও থাকা উচিত, তা প্যারেটো সাহেব অত বড় কেতাবে যত রসিকতাই করুন না কেন। এই ভিন্ন আগ্রহকে Values বলাই ভাল। সেগুলিও এক প্রকার তথ্য। সেই দিক থেকে আমার কিছু বক্তব্য আছে দ্বিতীয় ভলুম সম্বন্ধে। তার দ্বাদশ অধ্যায়, The Good Life এবং উপসংহার, A New Civilisation ? আমি বারবার পড়লাম। কিন্তু সোভিয়েট তন্ত্রের নবতর ধর্ম্ম (এথিক্‌স্) সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ও প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়েই গেল। নিতান্ত মোটামুটি ভাবে ওয়েব-দম্পতির প্রতিপাদ্য হোলো এই ঃ সোভিয়েট এথিক্‌সে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাথমিক পাপের কোনো ছাপ নেই ; চিরন্তন ঐকান্তিক নীতিতে কম্যুনিষ্ট বিশ্বাসী নয়, তার কাছে স্বাধীনতার অর্থ ঐতিহাসিক রীতি (অবশ্য ডায়েলেক্‌টিক) বুঝে সেই জ্ঞানকে কর্ম্মে প্রয়োগ করায়, অর্থাৎ চিন্তা ও কর্ম্মের সমন্বয়ে, তার নীতি নিঃস্বার্থভাবে সমাজ-সেবা, সমাজের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, কারণ তার ধারণা যে প্রত্যেক মানুষ সামাজিক ঋণের বোঝা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই বোঝা তাকে নামাতেই হবে। বিজ্ঞানের সাহায্যে ধনোৎপাদন যখন বৃদ্ধি পাবেই পাবে, এবং রাষ্ট্রের সাহায্যে সেই বৰ্দ্ধিত ধন ব্যক্তির প্রয়োজন-অনুযায়ী যথাযথ ভাবে বিভক্ত হতে যখন বাধ্য তখন নিষ্কাম জনসেবাই হবে মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। লেনিনের ভাষায় কম্যুনিষ্ট এথিক্‌সের মূল কথা—social equality in plenty। Plenty শব্দটির প্রয়োগে সমাজ-ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও প্রত্যয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি সূচিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ওয়েবদম্পতির বিবরণে আরও একটি অঙ্গীকার রয়েছে ; অবস্থান্তর-প্রাপ্তির অবসান ঘটেছে, রাষ্ট্রের জবরদস্তি ও শ্রেণীবিরোধ এখন লুপ্তপ্রায়, এবং কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিষ্ট এথিক্‌সের আলোচনা তখনই চলে যখন অন্তর্বিপ্লব শেষ হয়েছে। গতির ধর্ম্ম ও আপেক্ষিক স্থিতিরও ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে—অন্ততঃ কর্ত্তারা তাই বলে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচনের সমর্থন করতেন।

কিন্তু এই সব কথাবার্ত্তা শুনলে আমার সব আপত্তিগুলো সজারুর কাঁটার মতন খাড়া হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় ম্যাক্সিম গর্কী On Guard নামক রচনাসমষ্টির একটিতে বলেছেন সোভিয়েটতন্ত্রেই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্মেষ সম্ভব। তাঁর ভাষা maximisation of personality। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা উচিত, কারণ এটা পুরুষসিদ্ধির কথা। ধনিকতন্ত্রে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির অবকাশ ছিল ফিউড্যালিজমের চেয়ে, এবং ম্যাক্স্‌ ওয়েবারের ভাষায় system of

nationalistic ethics-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বেরই জোরে ধনিকতন্ত্র চাঙ্গা হোলো। (হেণ্ডারসনের আপত্তি সত্ত্বেও ওয়েবারের প্রধান প্রতিপাদ্য টিঁকে থাকে।) আজ কিন্তু দেখছি সেই শক্তিশালী ধনিক তন্ত্রই ব্যক্তিকে চেপে মারছে। ঠিক যেন হাইপীরিয়ান-এপোলো, বাপছেলের সম্বন্ধ। যা চোখে পড়ে তার ব্যাখ্যার রীতি হোলো ডায়েলেক্‌টিক্। নব্য ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্বে তার বিশ্লেষণ হয়ত সম্ভব, কিন্তু সে বিশ্লেষণ ইতিহাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রে কিংবা সমষ্টিতে প্রয়োজ্য নয়, বিশেষতঃ যখন ফ্রয়েড নিজেই সেদিন অনেক প্রত্যয়ের প্রত্যাহার করলেন। মানুষিক ব্যবহারে দুটি বিপরীত প্রবৃত্তি একত্র বসবাস করে, তাকে ambivalence বলে, কিন্তু সে ত নাম। নাম দিয়ে ইতিহাসের ব্যাখ্যা হয় না। নামে গতির রীতি বোঝা যায় না। অতএব অন্য ব্যাখ্যা চাই। যত ব্যাখ্যা পেয়েছি তার মধ্যে ডায়েলেক্‌টিক্‌ই সন্তোষজনক। এতদূর পর্য্যন্ত আমি কম্যুনিষ্ট এথিকসের মূল কথা গ্রহণ করি। কিন্তু তার পর? আমি কোন সাহসে বলি যে প্রগতির রীতিনীতি সোভিয়েট-তন্ত্রের সীন্‌থেসিসে পর্য্যবসিত হয়েই নিঃশেষিত হবে? হয় ডায়েলেক্‌টিক্ সত্য, না হয় সোভিয়েটতন্ত্রে ব্যক্তি পুরুষ হোলো, সিদ্ধ হোলো এই দাবীটা সত্য। দুটি বিরোধী তত্ত্বের মধ্যে আমাকে যদি নির্ব্বাচন করতেই হয় তবে প্রথমটিকে অর্থাৎ ডায়েলেকটিকেই করব। (যদিও আমি সম্পূর্ণভাবে তাও করিতে পারি না)। অর্থাৎ, আমি কিছুতেই মানব না যে সোভিয়েটরাজ্য এ যুগের শম্বুক-বর্জ্জিত, মন্থরা, কৈকেয়ী, বিভীষণ বর্জ্জিত, বশিষ্ঠ-চালিত রামরাজ্য, সেখানে সব বিরোধ, শ্রেণীবিরোধ, ব্যক্তিগত বিরোধ, ভাবগত বিরোধ সমন্বিত হয়েছে। আমি কি নির্ব্বাচন করব? স্থাণু শিষ্ট স্বর্গ; না চলন্ত কম্পিত ঐতিহাসিক জীবন? আমি ঐতিহাসিক সত্তাকে ধারা ভাবি—গচ্ছতা কালেন—history is a glorious adventure—আমার তাই যথেষ্ট। কম্যুনিজমের মহাকাল ধর্ম্মরাজ নন, যমদূত ভূত। আমি তাই বলি, যদি সোভিয়েটতন্ত্রের এথিকস মানবজীবনের, অর্থাৎ জীবিত সমাজের ব্যবহারের উপর পরিকল্পিত হয় তবে তার মধ্যে নতুন রকমের বিরোধের ও সেই সঙ্গে তার সমন্বয়ের বীজ লুকানো থাকবেই থাকবে। ওয়েবদ্বয়ের ফিলজফিতে ঘাঁটতি পড়েছে। আর না হয়, কম্যুনিজমের দর্শনে কাল বস্তুটির খাতির নেই।

ওয়েবদ্বয় emergent morality কথাটি ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। হয়ত তাঁদের বিশ্বাস, যেকালে emergent তখন আজ অন্ততঃ নীরব থাকাই ভাল। emergent কথাটি আজকাল জীবতত্ত্বে লয়েড মর্গ্যানের আশীর্ব্বাদে চলছে। দর্শনেও আজকাল বিজ্ঞানের বকুনি না থাকলে চলে না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে কথাটি সাহিত্যের, বিজ্ঞানেরও নয়, দর্শনেরও নয়। ধরাই যাক ভাষার দৈন্যের জন্য নতুন values-এর সম্ভাব্যতা বোঝাতে গেলে ঐ কথাটির প্রয়োগ অনিবার্য্য। ধরাই যাক কোন সমাজতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস ক'রে জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্‌বক্তা হতে পারেন না। কিন্তু সঙ্কল্প করব, প্লানিংএর

সমর্থন যোগাব, অথচ অন্ততঃ দূরদর্শী হব না—এ কেমন? না হয় কম্যুনিষ্ট চিরন্তন ও ঐকান্তিক ধর্ম্মনীতি মানেন না, কিন্তু তিনি নিশ্চয় একটি বিশেষ, বহিরাশ্রয়ী ও তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' নীতি গ্রহণ করছেন দেখছি, হয় ডায়েলেক্‌টিক্, না হয় ইতিহাস। তার আপেক্ষিক পরিবর্ত্তন স্বীকার করলেও তার সতত-অস্তিত্বকে নাকোচ করতে তিনি পারেন না, এবং করেনও না। যে সত্তা নানারূপের মধ্যে প্রকাশিত তার ভবিষ্যৎ রূপের সম্বন্ধে নিরাগ্রহতা বুদ্ধির অপমান। উত্তর হয়ত আসবে—বুদ্ধির অগম্য ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াই সোভিয়েট নীতির প্রেরণা। আমি পাল্‌টা জবাব দেব—ঐ প্রকার বিভাগ মানি না। একবার বুদ্ধিকে পৃথক করলে বিজ্ঞানকে ছেঁটে ফেলতে হবে, প্রয়োগশিল্প বন্ধ হবে, এবং বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির পার্থক্য থাকবে না। তখন রইল কি? থাকে মাত্র বিশ্বাসটুকু। আমারও তাই সন্দেহ হয়, কম্যুনিষ্ট ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মযোগের নামে জ্ঞানকে বর্জ্জন করে বিশ্বাসকে বরণ করতে সদা ব্যগ্র। আমার বিপদ, বিশ্বাস আমার ধাতে বসে না। রামরাজ্যের কল্পনা বিশ্বাসের অন্তর্গত, বিরোধের অবসান বুদ্ধির অতীত। বিরোধ অন্তর্দ্ধানে যে মুক্তি সে মুক্তি আমার নয়, যতই কেন স্বস্তিপ্রিয় হই না কেন।

কল্যাণ সম্বন্ধে লেখকদ্বয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার মাত্র একটি অংশ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কম্যুনিষ্টের কল্যাণ-সাধনা এক প্রকার দীক্ষার সামিল। যতদূর স্মরণ হয় প্লেটোও initiation ইঙ্গিত করেছেন। কম্যুনিষ্ট সমিতির সভ্য হবার পূর্ব্বে যে প্রক্রিয়ার ইতিহাস বইখানিতে পাই তাইতে মনে হয় লেলিন কিংবা ষ্ট্যালিন ব্যাখ্যাত মার্ক্সিজম্‌ই হল এই নব্যতান্ত্রিক চক্রের বীজ মন্ত্র। প্লেটোও সর্ব্বসাধারণকে কল্যাণ-মন্ত্রের অধিকারী ভাবেন নি, ব্রাহ্মণ গুরুরাও নয় বোধ হয়, অন্ততঃ একই মন্ত্র সব শিষ্যকে দেবার রীতি আমাদের দেশে নেই। প্লেটোর প্রভাবে গ্রীক সভ্যতার কল্যাণ-ধারণাটি এক প্রকার সার্ব্বিকের সামিল ছিল। তান্ত্রিকদের মতে বীজমন্ত্রের সাধনা এক প্রকার ব্রহ্মবাদেরই সাধারণ সংস্করণ। আমার বক্তব্য এই, এমন কোন কল্যাণ-ধারণার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই যার পিছনে কোন না কোন প্রকার পরম সত্য কিংবা সার্ব্বিকের সমর্থন নেই। কেবল তাই নয়, কল্যাণ-ধারণা ও সাধনার মূলে সেই পরম সত্য বা সার্ব্বিকের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। খৃষ্টানী এথিক্‌সের মূলে রয়েছে আদিম ও অকৃত্রিম পাপের ধারণা। Original Sin ভিন্ন খৃষ্টীয় মুক্তির (redemption) অর্থ থাকে না, অনুতাপ হয়ে ওঠে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও ভাববিলাস এবং খৃষ্টান সভ্যতা অন্য যে কোন সভ্যতার, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রসূত সভ্যতার পুনরাবৃত্তি হয়ে ওঠে। তা নয় কিন্তু। অতএব কোন একটি অতিরিক্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে কল্যাণময় জীবনের বিশ্বাসের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন সর্ব্বত্রই ঘোষিত হচ্ছে। নির্জলা মানবপ্রেম বড়ই পান্‌সে লাগে—নরের সেবায় নারায়ণের প্রয়োজন—শিলাটি পর্য্যন্ত। নচেৎ কোঁৎ থেকে আরভিং ব্যাবিট পর্য্যন্ত সকল হিউম্যানিষ্টদের ষড়যন্ত্রে ও উপদেশে পৃথিবীর দুঃখ যেত

Good Lifeটা শেষ কথা নয়—তার পিছনে বিশ্বাস থেকেই থাকে, কম্যুনিষ্টেরও আছে, ইতিহাসের ওপর যতটা না হোক, লেনিন-ষ্ট্যালিন-মার্ক্সের ওপর। অন্য বিশ্বাসীর সঙ্গে কম্যুনিষ্ট নামধারী বিশ্বাসী জীবটির পার্থক্যটুকু পরিষ্কার করা হয় নি বইখানিতে এই আমার প্রধান আপত্তি।

আমার মতে, কল্যাণময় জীবনের ধারণায় 'প্রাচুর্য্যে সামাজিক সাম্য' ভিন্ন অন্য একটি জিনিষ আছে, যেটি সম্পূর্ণ অর্থ নৈতিক ব্যাপার নয়। ওয়েব-দম্পতি তার ইঙ্গিতও করেছেন। সেটি হোলো—সমাজের কাছে আমাদের জন্মগত ঋণ সম্বন্ধে সচেতনতা। সচেতনতার অর্থ ঋণপরিশোধের ঐকান্তিক সাধনা। এই কথাটি ভারতবাসীরা, হিন্দু মুসলমান জৈন পারসীক শিখ সকল সম্প্রদায়ই সহজে বোঝে। মনুসংহিতা ও বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে নানাপ্রকার জন্মগত ঋণের উল্লেখ আছে বলে নয়, সমগ্র ভারতী সংস্কৃতিতে, যৌথপরিবারে, জাতিবিচারে, গ্রাম্য জীবনে, পুরাতন শাসন-পদ্ধতিতে এই জন্মগত ঋণের ধারণা সমাজকে একসূত্রে বেঁধেছিল। কোন সম্প্রদায়ই সে বন্ধন থেকে মুক্তি পায় নি, সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় নি। বিবেকানন্দ ও বিপিনচন্দ্রের ভাষায় অর্থাৎ ইংরাজী কথার বাংলা অনুবাদে, তার নাম সেবাধর্ম্ম, যার মোদ্দা কথা অধিকার নয়, সামাজিক কর্ত্তব্য। দেশপ্রেমিকরা ক্ষুণ্ণ হবেন, ঐতিহাসিকরাও শিলালিপি থেকে অপ্রমাণ করবেন, কিন্তু তবু সত্যি যে অধিকারের (right) ধারণা বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সভ্যতা, তার রাষ্ট্রবিষয়ক, ব্যবহার-নীতি-বিষয়ক চিন্তার ও কর্ম্মের দান। তিলক মহারাজের বিখ্যাত মন্তব্য—স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার—ইংরেজ শাসনের পূর্ব্বে কোন মনীষীর, না গোপালের না দিব্যের, কারুরই মুখ থেকে উচ্চারিত হতে পারত না। Natural right, birth right প্রভৃতি বুলি রোমান ব্যবহারনীতির সৃষ্টি, যার মূলে ছিল jus naturale এবং jus gentium-এর যোগ। ভারতবর্ষে state ছিল না, তার পরিবর্ত্তে সমাজ ছিল, এও একটা অধিকার সম্বন্ধে নিরাগ্রহতার কারণ হতে পারে। যে কারণেই হোক না কেন, পলিটিক্যাল, ইকনমিক, ধার্ম্মিক, (ethical) কোন ব্যবহারই বিচ্ছিন্নভাবে, খণ্ডিত রূপে কল্পিত হয় নি। সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ব্যবহারে যোগ ছিল এটুকু ঐতিহাসিক সত্য। ঐ প্রকার ধারণায় ও আচরণে ব্যক্তিত্ববোধ জাগে না, ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র, ব্যক্তি বনাম সমাজ, গোষ্ঠী, জাতি, বর্ণ, এই প্রকার বৈপরীত্য-বোধ ফুটতে পায় না। হয়ত, ফোটবার অবকাশ না পাওয়াই আদিমতার নিদর্শন। কিন্তু আদিম, বর্ব্বর, অসভ্য, যাই হোক না কেন, অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং ঋণ-পরিশোধ ও কর্ত্তব্য (duties) সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতনতা আমাদের বিশেষত্ব ছিল। এখনও আছে, তার প্রমাণ, যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়ে' লিখেছেন, মা-এর হাতে বৌ-এর অত্যাচার ছেলে এখনও নীরবে সহ্য করে, এবং তাই সৎ ছেলে। সহ-গুণ মানে কাপুরুষতাও হতে পারে, কিন্তু ছেলে যখন স্ত্রীকে সহ্য করতে শেখায় তখন তার উপদেশের ভাষা (স্বর্গাদপী গরীয়সী···

হাজার হোক, মা) শুনলে প্রমাণ হবে যে গোষ্ঠী ও সমাজ-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি এখনও স্মৃতিপট থেকে বিলুপ্ত হয়নি। ঋণ-পরিশোধের ধারণা যদি বর্ব্বরতার লক্ষণ হয় তবে একজন কম্যুনিষ্ট মহারথীর বাক্য উদ্ধৃত করে দিলে অনেকে আশ্বস্ত হবেন—'There is such a thing as the privilege of backwardness'।

দাঁড়াল এই ঃ কম্যুনিষ্ট ও হিন্দু সমাজধর্ম্মের মিলটুকু বাহ্যিক। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে মানুষের ব্যবহার ও মন বিভক্ত হচ্ছে। তাব সমন্বয় চাই। সমন্বয়ের জন্য যোগসূত্রের প্রয়োজন। এতটুকু মিল। গবমিল হোল ঐ যোগসূত্রটির প্রসারণ ও বাঁধবার শক্তিতে। কেবল ঋণ-পরিশোধের সচেতনতায় চলে না, আরো কিছুর প্রয়োজন। কম্যুনিষ্টের কাছে মার্ক্সিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা—ধরা যাক, ইতিহাস, হিন্দুর কাছে কৈবল্য। মানবমনের ওপর ইতিহাসের জোর বেশী, না ঐ প্রকাব অমানুষিক সার্ব্বিকেব জোর বেশী জানি না। কিন্তু এটুকু জানি পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশেষ এক টুকরো জমিতে জন্মে, সেই জমি থেকে উৎপন্ন বিশ্ব-ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিশীলনের উত্তরাধিকারী হয়ে ওয়েব-বর্ণিত কল্যাণে আত্মসমর্পণ করা শক্ত।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Civilisation and the Growth of Law—By W. A. Robson (Macmillan)

সাধারণ লোকের আইন সম্বন্ধে একটা ভয় আছে, এবং সে ভয় থাকা বোধ হয় খানিকটা স্বাভাবিক। কারণ আইনের যে দিকটার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয়, অপরাধ এবং শাস্তি নিয়েই তার কারবার। তাই আইনের কথা উঠলেই আমাদের মনে পুলিশের লাল পাগড়ীর আভাস লাগে, আসামীর কাঠগড়া এবং বিচারকের কঠোর মূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এটা যে কেবলমাত্র আমাদের দেশের পক্ষে সত্য তা নয়, স্বাধীন দেশেও আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের একটু সঙ্কোচ, একটু সন্দেহ প্রায় সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট।

আইনের চলিষ্ণু এবং সংহারক (? punitive) দিকটার প্রতিই দৃষ্টি সহজে পড়ে, কিন্তু তারও যে স্থায়ী এবং সংরক্ষণশীল একটা দিক আছে, সে কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। ডক্টব রবসনের মতে আইনের যথার্থ স্বরূপ কিন্তু তারই মধ্যে মেলে, তাই তিনি বলেছেন যে আইনের মধ্যে হুকুম এবং হুকুল তামিল এ দুটী উপাদানই রয়েছে, কিন্তু শক্তির প্রকাশ হিসাবে আইনকে দেখলে আমরা তার মর্ম্মকথা বুঝব না—আইনকে সত্যিভাবে বুঝতে চাইলে সহযোগিতার উপায় বলেই তার বিচার কবতে হবে। যেখানেই মানুষের সঙ্গে মানুষেব সম্বন্ধ, সেখানেই সমবায় এবং সহযোগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সাধারণ দেখবার ভঙ্গি ভিন্ন সহযোগ সম্ভবপর নয়, এবং সে ভঙ্গি

সাধারণ নিয়মের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। তাই শাসন আইনের মূল কথা নয়, আইনের মূলকথা সম্মতি ও সমন্বয়।

ডক্টর রবসনের এ প্রতিপাদ্য বোধ হয় অনেকেই মেনে নেবে। তাই বলে তার বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠতে পারে না, তা নয়, কারণ সম্মতি এবং সমন্বয়ের গোড়ার কথা মতামতের স্বাধীনতা। যদি সমাজ গঠনে ব্যক্তির সত্যসত্যই স্বাধীনতা থাকত, তবে আইনের এ কল্পনা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং গ্রাহ্য না হয়ে পারত না, কিন্তু আপত্তি নেই বলেই কি আমরা সম্মতি ধরে নিতে পারি? আপত্তি যে নেই, অনেক স্থলেই তার কারণ আপত্তি করবার সুযোগ বা সাহসের অভাব। সে সব ক্ষেত্রে সম্মতির চেয়ে শাসনের পরিকল্পনাতেই আইনের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে উঠে।

এক কথায় বলতে গেলে ডক্টর রবসন আইনের পরিকল্পনায় সনাতন পথই অবলম্বন করেছেন। সে মতবাদ যে অবিমিশ্র সত্য সে সম্বন্ধে আজ আমাদের মনে সন্দেহ উঠেছে, কিন্তু সমাজতন্ত্র-বাদীদের যে সমালোচনায় সনাতন মতবাদের একাদশদর্শিতা ধরা পড়েছে, সে সমালোচনাকেও সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা কঠিন। তাই সনাতনী মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা যায় না, এবং তার দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে, তার সিদ্ধান্তগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারলেও তার পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তুর অনেকখানিই আমাদের গ্রাহ্য।

এটুকুই সতর্কের কথা, কিন্তু একথা একবার মনে রাখলে ডক্টর রবসনকে তাঁর বিশ্লেষণের জন্য অভিনন্দন না করে উপায় নেই। তাঁর গ্রন্থের নামকরণ পর্য্যন্ত দুঃসাহসিক, কারণ ৩০০।৩৫০ পৃষ্ঠার বইতে তিনি মানুষের পৃথিবী বিষয়ে ধারণা এবং তার সঙ্গে আইনের এবং রাজনৈতিক পরিকল্পনার সম্বন্ধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। মানব-চরিত্র এবং সমাজ, রাজনীতি ও বিশ্বদৃষ্টি—এ সমস্ত ব্যাপারের প্রত্যেকটীকে নিয়েই আলোচনা এবং আন্দোলনের অন্ত নেই, প্রত্যেকটীর সম্বন্ধেই আমাদের ভাবনা চিন্তা নিত্য-নূতন রূপে প্রকাশ পায়, তাই একখানি বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটীর স্বরূপ এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রকাশের চেষ্টা যে প্রায় অসাধ্যসাধনের প্রয়াস, তা সহজেই বোঝা যায়। রবসনের কৃতিত্ব এই যে সেই অসাধ্যসাধনকেও তিনি সম্ভাবনার কোঠার মধ্যে এনে ফেলেছেন।

প্রতি যুগের সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে তার রাজনীতি ও আইনের সম্বন্ধ নিগূঢ়। বস্তুত আইনের সূত্রপাতে রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে না, ধর্ম্ম অথবা বিশ্বদৃষ্টির মধ্যেই তার প্রথম সম্ভাবনা। আদিম সমাজের সংগঠন আমরা বস্তুদৃষ্টি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করি, সে চেষ্টা খানিকটা সফলও হয়, কিন্তু সে সমাজ সংগঠনের মর্ম্মকথা আমাদের চিন্তাধারাকে প্রায়ই এড়িয়ে যায়। আদিম মানুষের পৃথিবী, তার সমাজ, তার ভাবনা এবং ধারণার রূপ আমাদের কাছে এত সুদূর যে তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার বাসনা দুরাশামাত্র, আপনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা তার অভিজ্ঞতাকে যাচাই করতে গিয়েও ব্যর্থকাম হই।

ধর্ম্মের আবহাওয়ায়-যে সমস্ত নিয়ম ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, কালক্রমে তারা স্পষ্টতর হয়ে

আইনের রূপ নিলে, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত আইন ধর্ম্মের আওতা ছাড়াতে পারেনি। এখনো সম্পূর্ণ ছাড়িয়েছে কিনা সেকথা বিচার্য্য, কারণ এখনো পৃথিবীর অনেক সমাজপরিকল্পনায় ধর্ম্ম ও আইন পরস্পরসম্বদ্ধ। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সভ্যতায় তাদের ব্যবধান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে রবসনের বিশ্বাস। কিন্তু সে কথাও কি সম্পূর্ণ স্বীকার করা চলে? বিশেষ ধর্ম্মের বিশিষ্ট নির্দ্দেশ ও বিশ্বাস—ইংরিজিতে যাকে dogma অথবা creed বলা চলে—ইয়োরোপীয় সামাজিক আইনকে আগের মত আর নিষ্পিষ্ট করে রাখে না সত্য, কিন্তু যে সন্দেহবাদ তার মূলে, তাকেই আজকার দিনে ইয়োরোপের যুগধর্ম্ম বলা চলে। কেবল তাই নয়, ইয়োরোপে আজ যে সমস্ত নতুন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা পরিস্ফুট, তারা কি সে সব দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক আইনকে নতুন রূপ দেয়নি?

মানুষের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা যে তার ন্যায়-অন্যায়-বোধ এবং আইন-পরিকল্পনাকে কি ভাবে রঞ্জিত করেছে, তার একটা উদাহরণ দিলেই বোধ হয় চলবে। ভগবানের বিচারের ওপর আমাদের আস্থা অবিচলিত, তাই যখনই আমাদের মানুষী বুদ্ধিতে কোন প্রশ্নের সমাধান কঠিন হয়ে ওঠে, তখন ঈশ্বরের হাতে তার ভার ছেড়ে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় স্থির করা চলে, কারণ ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যে অবিচারের স্থান নেই, তিনি দুর্ব্বলের বাহুতে মত্ত হস্তীর বল সঞ্চার করে আপনার ন্যায়নিষ্ঠা রক্ষা কববেন। রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষাও ভগবানের বিচারে বিশ্বাসের ফল, তা নইলে সন্দেহবাদের দৃষ্টিতে আগুনের কাছে দোষী-নির্দ্দোষীর কোন তফাৎ নেই, অত্যাচারী এবং অত্যাচারিতকে সমান চক্ষে নির্ব্বিকার ভাবে অগ্নি গ্রাস করে।

যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে আইনের মূলসূত্রের যোগ রবসন পরিস্ফুট করে তুলেছেন, কিন্তু চিন্তার ফলে যুগবিশেষের প্রকৃতি যে রূপান্তরিত হয়, সে কথা তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। প্রায়ই বলা হয় যে গ্রীক পরিকল্পনার অনুবাদে ভুল হয়েছিল বলেই স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলে গিয়েছে, কিন্তু অনুবাদে যে ভুল হয়েছিল তার কারণ কি কেবলমাত্র আকস্মিক? অনুবাদে সত্যসত্য ভুল হয়েছিল কিনা, সে কথাও বিবেচ্য, কারণ গ্রীক জগতে যে পরিকল্পনা রূপ নিয়েছিল, ঘটনা এবং চিন্তা ধারার ঘাতপ্রতিঘাতে তার স্বরূপ যে বদলায়নি, তারই বা প্রমাণ কই? ফরাসী বিপ্লবের তাড়ায় যে সমস্ত স্বাভাবিক অধিকারের দাবী, সে দাবীও স্বভাবের নিয়মের পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু স্বভাবের নিয়মের মধ্যে আইনের ইঙ্গিত যে লুকানো, আগে সে কথা আবিষ্কৃত হয়নি কেন? বৈজ্ঞানিক মতবাদের মধ্যে রাজনৈতিক ডাইনামাইটের আবিষ্কার কেবলমাত্র ফরাসী বিপ্লবের যুগেই হয়নি—বর্ত্তমান যুগের প্রবলতম বিপ্লব আন্দোলনের মূলেও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সমানভাবেই সক্রিয়।

রবসনের বইখানি হয়তো সুসংবদ্ধ নয়—৩০০ পৃষ্ঠায় মানুষের মনোধারার ইতিহাস এবং আইনের ওপর তার প্রভাবের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাও দুঃসাহস। কিন্তু এই দুঃসাহসের ফলেই

বইখানি এত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। পাতায় পাতায় ইঙ্গিতে আভাসে এত চিন্তা, এত তথ্য এবং তত্ত্ব ছড়ানো রয়েছে যে আরম্ভ করলে বইখানি শেষ না করে ছাড়া যায় না, গ্রন্থকারের সঙ্গে বলতে হয় যে বইখানি সত্যসত্যই "a strange and exciting adventure"। বিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ পাঠক—এ উভয় শ্রেণীই বইখানিতে আনন্দ পাবেন।

হুমায়ুন কবির

Untouchable—By Mulk Raj Anand ; (Wishart)

আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস। কিন্তু মোটেই মামুলী ধরণের উপন্যাস নয়। ইহার রচনা-পদ্ধতিতে নূতনত্ব, মৌলিকত্ব, যথেষ্ট আছে। বাখা নামক একজন অস্পৃশ্য মেহতর জাতীয় যুবকের জীবনের একটী দিবসের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছে। এই ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে অস্বাভাবিক বা রোমাঞ্চকর কিছুই নাই। এমন কোন ঘটনা গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই যাহা পড়িয়া পাঠক বলিতে পারেন—কই, এরূপ ত সংসারে ঘটে না!

বরঞ্চ অতি স্বাভাবিক অনেক কিছু আছে, যাহা সামান্যতঃ সাহিত্যে স্থান পায় না। হয়ত রাবলে-র যুগে স্থান পাইত কিন্তু আজ লোকের রুচি অন্যরূপ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মাত্র এইটুকু বক্তব্য যে শারীর বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার সময় যে সমস্ত নৈসর্গিক দৈহিক ব্যাপারের বর্ণনা করিতে হয়; সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার বিচার বা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন—হয়ত বা অশোভন।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন খ্যাতনামা ফর্স্টার সাহেব। তিনি স্বীকার করিতেছেন, "Some readers...will go purple in the face with rage before they have finished a dozen pages," কিন্তু তাঁহার নিজের মত, "The book seems to me indescribably clean!" Clean বা dirty, অমল বা সমল, এ বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন।

পুস্তকখানিকে নভেল অপেক্ষা নকসা বলাই সঙ্গত। তবে ইহা একটী অবিচ্ছিন্ন নকসা নয়, নকসা পরম্পরা বা panorama। এই panorama-র প্রত্যেকটী চিত্রই স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও জীবন্ত। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বর্ণিত ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ঘটিতেছে। ইংরেজী ভাষার উপর গ্রন্থকারের অসাধারণ দখল। এশিয়াবাসীর লেখা এরূপ সুন্দর ইংরেজী বেশী পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। লিখন-ভঙ্গীও চমৎকার। প্রত্যেক ছত্রে দীন হীন অন্ত্যজের প্রতি লেখকের অসীম দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে। অথচ অযথা অলঙ্কার অনুপ্রাসের বহর নাই, বীররসের আস্ফালনও নাই।

চরিত্রাঙ্কন মনোরম ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ গভীর। কিন্তু অস্পষ্টতা বা জটিলতা কোথাও নাই, আগাগোড়া সাধারণ পাঠকের অধিগম্য। পুস্তকে নায়িকা নাই, প্রেম-কাহিনী নাই, romantic plot বলিতে যাহা বুঝায় তাহারও একান্ত অভাব। ঘটনা-পরম্পরা যে ক্ষীণ সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত, সেইটুকুই ইহার plot। তথাপি পুস্তকখানি এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলা যায়, কোন স্থানে আটকায় না।

কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক দেখিবেন যে অতি সামান্য ঘটনাও কি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাখার ভগ্নী সোহিনী প্রত্যূষে জল গরম করিবার জন্য চুলা জ্বালিতেছে, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘর, দারুণ শীত—"Bakha saw that his sister was trying to light a fire between two bricks. She was blowing hard at it, lifting herself on her haunches as she crouched on the mud floor. Her head almost touched the ground, but each puff from her mouth succeeded only in raising a spurt of smoke and was beaten back by the wet wooden sticks that served as fuel. She sat back helpless when she heard her brother's footsteps. Her smoke-irritated eyes were full of water. She turned and saw her brother. Real tears began to flow down her cheeks."

এইরূপ বর্ণনা পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠাতেই আছে। তবে শেষ অংশে, যেখানে বারিষ্টার বসির সাহেব ও কবি ইকবাল পণ্ডিত ভারতের দুর্দ্দশার কথা আলোচনা করিতেছেন, সেখানে কতকটা বাগাড়ম্বর ও প্রাঞ্জলতার অভাব লক্ষিত হয়। আমাদের মনে হয় এই জটিল বাগাড়ম্বর ইচ্ছাকৃত। ফর্স্টার সাহেবেরও তাহাই মত। আমরা বর্ত্তমান ভারতের intellectuals, বুদ্ধিব্যবসায়ীর দল ত এইরূপ বাগ্‌জালে পড়িয়াই খাবি খাইতেছি! Pseudo-intellectuals, মেকী পণ্ডিত-মণ্ডলীকে বাদ দিলে ভারতের চিত্র যে অসম্পূর্ণ থাকে!

আমাদের আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই। বাখার চরিত্র সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাখা ভঙ্গীর সন্তান। তবে সে সাধারণ ভঙ্গী যুবক নয়। তাহার বাবা লাখা পদগৌরবে মেহতরদিগের জমাদার। বাখা নিজে বারাক-এর গোরাদের সংস্পর্শে আসিয়া মনে মনে অনেকটা সাহেব হইয়াছে। সাহেবী বেশভূষাও কিছু কিছু অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছে। সারাদিন সেই পোষাক পরিয়া সে সাহেবী চালে চলিয়া বেড়ায়। রাত্রেও পোষাক ছাড়ে না। গোরাদের মত কম্বল গায়ে দিয়া শোয়। একখানা কম্বলে শীত ভাঙ্গে না, তবু সে "নেটু"-র ন্যায় লেপ গায়ে দিতে নারাজ। এই সাহেবীয়ানার জন্য বেচারাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ঠাট্টা তামাসা সে গায়ে মাখে না। বাপের গালিগালাজও অম্লান বদনে সহ্য করে। তার বড় সাধ ইংরেজী শেখে, কিন্তু ভঙ্গীর ছেলেকে কে ইস্কুলে লইবে!

মেহতরের কাজ করিতেও বাখার বিশেষ আপত্তি নাই, যদি তাহাকে শুধু সাহেবদের কমোড দেখিতে হয়। এরূপ মনোবৃত্তি ত অন্য বর্ণের মধ্যেও বিরল নয়! বেচারা ভঙ্গী সন্তানই কি একা ধরা পড়িল!

একদিন সকালের দিকে শহরের রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বাখা অসাবধানতা-বশতঃ এক লালাজীকে ছুঁইয়া ফেলিল। আর রক্ষা আছে! বেচারাকে হাতে হাতে অশেষ সাজা ভোগ করিতে হইল—গালাগালি, ধমক, ধাক্কাধাক্কি, মার। জন্মাবধি উচ্চ বর্ণের হস্তে নিগ্রহ সহিয়া আসিতেছে। তবু আজ তার কেমন সহ্য হইল না। সমস্ত দেহ মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বাড়ীর পথে আবার আরও নানারকম অপমান বরদস্ত করিতে হইল। বাড়ীতে ফিরিলে লাখা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে? বড় শ্রান্ত হয়েছিস্?" বাখা চীৎকার করিয়া উঠিল, "আজ আমাকে ওরা বড় অপমান করেছে, গালাগালি দিয়েছে, মেরেছে—" বাপ বলিল, "তুই চেঁচিয়ে সাবধান করে দিস্ নেই যে ভঙ্গী আসছে সরে যাও?" ছেলে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কি হবে চীৎকার করে! চেঁচালেও ত ওরা অত্যাচার করবে! মন্দিরের পুরুৎটা সোহিনীকে অপমান করলে আবার চেঁচাতেও লাগল। বড় বাড়ীর স্ত্রীলোকটা চার তলার উপর থেকে আমাকে রুটী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। না, আমি আর যাব না শহরের মধ্যে!"

বাখার সমস্ত দিনটাই আজ নষ্ট হইয়া গেল। অপরাহ্নে এক বিবাহ উৎসব দেখিতে গেল, নূতন ব্যাট লইয়া হকী খেলিল, তারপর খোলা ময়দানে বেড়াইল, কিন্তু কিছুতেই মনে স্ফূর্তি আসিল না। বাড়ী ফিরিবা মাত্র বাপের কাছে খুব গালাগালি খাইল, "সারাদিন যে নবাবের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছিস, তোর কাজ করবে কে? মেহতরের ছেলের সাহেব হবার সাধ গেছে!—দূর হ, হতভাগা, শূয়োর, বেরো আমার বাড়ী থেকে। যা, আর আসিস্ না। আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।" বাখা কোন উত্তর না দিয়া সেখান হইতে পলাইল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "কি করেছি আমি! কেন আমার কপালে আজ এত অপমান!"

এর পর বাখার হইল কি? গ্রন্থকার বাখাকে তিনটী পথ দেখাইয়াছেন, তাহার সমস্যা সমাধানের তিনটী উপায় উপস্থিত করিয়াছেন। বাখার সহিত প্রথম দেখা হইল মুক্তি ফৌজের কর্ণেল সাহেবের। তিনি বাখাকে যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। বলিলেন যে পাপীর ত্রাণের জন্য যীশু আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাখা ঠিক বুঝিল না যীশু কে, কেন তিনি পাপীর জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। পাদরী সাহেব বলিলেন যে প্রভু যীশুর চক্ষে ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও মেহতর, সবাই সমান, সকলেব জন্যই তিনি প্রাণ দিয়াছিলেন। বাখা বুঝিল না মানব মাত্রই পাপী কেন। শেষ বলিল, "হুজুর, আমি রামকে চিনি, যীশুকে চিনি না।" কথা কহিতে কহিতে দুজনে সাহেবের বাঙ্গলাতে পৌঁছিলেন। বাখা বাহির হইবে শুনিতে পাইল মেমসাহেব সাহেবকে বকিতেছে, "আবার তুমি কালা আদমীর সহিত ঘুরিতেছ!...আমি তোমার জন্য বসিয়া থাকিব, চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, আর তুমি চামার ভঙ্গী লইয়া ঘুরিবে!" বাখার

মেজাজ ত ভাল ছিল না! "সেলাম, সাহেব" বলিয়া সে পলায়ন দিল। গির্জ্জায় যাওয়া তার হইল না।

তার পর মহাত্মা গান্ধীর দর্শন। বাখা মহাত্মার বক্তৃতা শুনিল। সব কথা বুঝিল না। কিন্তু যখন মহাত্মাজী উকা মেহতরের গল্প করিলেন, যখন তিনি বলিলেন, "আমার আশ্রয়ে একজন অষ্টাদশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণ কুমার মেহতরের কাজ করে," তখন বাখার সমস্ত শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"The Mahatma seemed to have touched the most intimate corner of his soul. 'Surely, he is a good man', Bakha said."

বাখার মনে হইতে লাগিল, "একবার মহাত্মা যদি গিয়ে আমার বাবাকে বলে আসেন যে আমি কত দুঃখী, আমাকে আর লাঞ্ছনা করা উচিত নয়, তাহলেই বাবা আমাকে বাড়ীতে ফিরে যেতে দেবে!" ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বাখার সম্মুখে তৃতীয় পন্থা উন্মুক্ত হইল। বারিষ্টার বসির সাহেব ও ইকবাল পণ্ডিতের তর্ক শুনিতে শুনিতে হঠাৎ তাহার কানে আসিল পণ্ডিতজী বলিতেছেন,—"When the sweepers change their profession, they will no longer remain untouchables. And they can do that soon, for the first thing we will do when we accept the machine, will be to introduce the machine which clears dung without any one having to handle it—the flush system."

বাখা এই দুই বিদ্বান ব্যক্তির তর্কবিতর্কের বেশী কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না, কিন্তু মল-শোধক কলের কথাটা বুঝিল। ভাবিল, "কলটার কথা ভাল করে জিজ্ঞেস করে নিলে হত!" এই হইতেই ত একদিন তাহাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে! বেচারার মনটা বড় হালকা বোধ হইতে লাগিল। "যাই, বাড়ী যাই। বাবাকে বলি গিয়ে মহাত্মাজী আমাদের কথা কি বললেন। আর, পণ্ডিতজী কলের কথা যা বললেন, তাও বলি গিয়ে। বাবা খুশী হবে। আর পথে পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয় ত কলের সব খবর নিতে হবে।"

বাখা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার সমস্যার সমাধান হইল কি? কে জানে! তবে আপাততঃ তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। বেচারা শান্তি পাইল। আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Ancient versus Modern Scientific Socialism—By Dr. Bhagavan Das. (Theosophical Publishing House).

বর্ত্তমান সভ্যতা যে বিষ উদ্‌গীরণ করছে, শুধু অমৃত নয়, সে বিষয় আজ আর কারও সন্দেহ নেই। আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যে সব danger spots আছে তার বর্ণনায় সকলে পঞ্চমুখ।

আমাদের যন্ত্ররাজ্য, আমাদের জাতীয়তাবোধ, আমাদের হাতে বিজ্ঞানের উন্নতি—এ সব "গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়"—এটা আমাদের সুখ সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক দিকে যেমন অনুকূল হয়েছে, অন্যদিকে আমাদের করে ফেলেছে অনীশ্বর, পরশ্রীকাতর, ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব। এই জন্য দেখতে পাই, সকলে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে, যা বিশ্বাস করি না বা করতে পারি না তার পায়ে মাথা নোয়ান আমাদের পক্ষে যেমন সহজ নয়, তেমনই কি যে তার জায়গায় দাঁড় করাব সে বিষয়েও আমরা একমত নই। কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ, অন্ন নৈলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সবই এই অন্নের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই দেশে বিদেশে অন্ন-সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান সমস্যা, জগদ্ব্যাপী মহাপ্রলয়ের একমাত্র সম্ভাব্য কারণ। আমাদের দেশেও নতুন করে এক শ্রেণীর সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছে। তার নাম শ্রমিক, চাতুর্ব্বর্ণ্যে তাদের স্থান সব চেয়ে নীচে, তাদের ওপরই আজ বিশ্বের ভরসা, কারণ তারাই বিশ্বের আধার। রাষ্ট্রশক্তি আজ সব জায়গায়ই তাদের অধিকার স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে ;—রাসিয়ায় তাদের পরম প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু ইতালীতে আবার রাষ্ট্রশক্তি সকল বিষয়কে আত্মসাৎ করবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—ফ্যাশিজম্ ও বল্‌শেভিজম্—এই দুই মতবাদ নতুন পথ মানুষের সামনে ধরেছে, ওদের আলোতে আমরাও আজ খানিকটা—হয়ত অনেকখানি—সম্মোহিত এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। এদের অন্তর্নিহিত সত্যের শক্তি ও স্বরূপ জানবার জন্য আমাদের দেশে যাঁরা চিন্তাশীল তাঁদের আগ্রহ, আর যাঁরা চিন্তাশীল নন তাঁরাও সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি লাভের আশায় ঐ দুই বাদের বিবাদে যোগ দিতে চেষ্টা করেন।

ভগবান দাসজী কাশীর একজন সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন নাগরিক। তাঁর বিদ্যার ও চরিত্রের, গাম্ভীর্য্যের ও লোকহিতৈষণার খ্যাতি বহুদূর প্রসার লাভ করেছে। তার ওপর তিনি আবার একজন বড় "থিওজফিষ্ট"—অ্যানি বেসান্তের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম। ফ্যাসিজম্ ও বল্‌শেভিজমের আলোচনায় তিনি কয়েক বৎসর ধরেই যোগ দিচ্ছেন এবং তাঁর শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি রয়েছে ভারতবর্ষের বহুঅবজ্ঞাত মনুসংহিতার ওপর। এককালে (হয়তো এখনও) দেশের সংস্কারকেরা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের গৌরব ও মনুর অগৌরব কীর্ত্তন করতেন, এখন আবার কেউ কেউ সেই মনুকেই বড় বলছেন, এর একটা রহস্যের এবং কৌতুকের দিক আছে সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই কিন্তু থিওজফিষ্টরা চিরকাল ধরে মনুর প্রশংসা করে এসেছেন। বিশেষ করে ভগবান দাস ; তিনি মনু ভাল করে পড়বার দাবী রাখেন, এবং বহুদিন পূর্ব্বে—তাঁর ছাত্রাবস্থার ঘোর কাটার পূর্ব্বেই যেন মনে হয়—জোর গলায় থিওজফিষ্ট মহলে মনুর প্রশংসা করেন।

মনু বলতে অবিশ্যি ভগবান দাস মানবধর্ম্মশাস্ত্রের সূত্র বা মূলসূত্রগুলি বোঝেন ; যেমন ব্রাহ্মণ বলতে ব্রহ্মণ্যভাব, জন্মনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণোচিত চিত্তের ও কর্ম্মের ধারাকে বোঝেন। চাতুর্ব্বর্ণ্য তাঁর মতে শুধু ভারতে নয়, সারা জগতের ব্যাপার ; কারণ মানুষের দেহে মনে আত্মায় জ্ঞানৈষণা কর্ম্মৈষণা বিত্তৈষণা সুখৈষণা রয়েছে,—তার ওপরে ভিত্তি করে সে চলে ফেরে,—তাকে

ছাড়িয়ে নয়। এই হচ্ছে তার স্বভাব ; আর স্বভাবের বিকৃতি ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হলেও তা' বিকারই থাকে, স্বভাব হতে পারে না। সুতরাং লেনিন-ষ্ট্যালিন-মুসোলিনী-হিট্‌লার যতই চেষ্টা করুন, মানুষকে বড় করতে হলে অথবা তাকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে হলে একাকারের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে চতুরাকারের কথাই ভাবতে হবে, এই চার শ্রেণী থাকবেই, তাদের সামঞ্জস্যে সমাজের উন্নতি ও গতি,—অন্যথা নয়। এই জন্য একদিকে উঁচু করতে হবে, অন্যদিকে—যাঁরা বেশী উঁচু হয়ে আছেন তাঁদের নীচু করতে হবে। আর্থিক পরিস্থিতি বিষয়ে ভগবান দাস একটা মোটামুটি ধরে নিয়েছেন,—

"The State may well fix a single adult working person's plainest necessaries at ten rupees p.m. (which is at present, in the U. P., considered a decent wage for an unskilled laborer). The higher limit of remuneration, for skilled labor, may be fixed at, say, ten times as much ; for the learned professions, twenty-five times as much, plus ex-officio expenses, if any ; for the executive or administrative professions, a hundred times, besides all ex-officio expenses, free quarters, conveyance, travel, etc, ; for the wealth-making professions, five hundred (or even a thousand) times, nett, after paying all business-charges."

ভগবান দাসের সমস্ত কথাই আমাদের নিতে হবে, এমন কথা নয়, তবে তাঁর দৃষ্টিভূমিতে আরোহণ করে সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের দেখতে হবে ; এমন কিছু নয় যে আমাদের পণ্ডিতেরা নিশ্চিত কোনও জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন যার ফলে সকল দুঃখ দূরে যাবে। সুতরাং মনুতে বর্ত্তমান যুগের 'আলোক পাত' করলে লাভের সম্ভাবনা আছে।

কোথায় বিংশ শতাব্দীর বেদ—লেলিনবাদ ষ্ট্যালিনবাদ—আর কোথায় বা প্রাচীন হিন্দুর সুপ্রাচীন শাস্ত্র,—যাতে কত রকম বাজে কথাই না লেখা আছে! ("ত্রিশ বৎসরের ছেলের সঙ্গে বার বছরের মেয়ের বিয়ের কথায় দাসজী কি বলেন?") নিতান্ত সৎসাহস না থাকলে, মতের ও চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকলে লেখক মনুকে পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের প্রণেতাদের সামনে দাঁড় করাতেন না।

"যেথানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখ তায়,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

অন্ততঃ এই বুদ্ধি নিয়েও আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা আশা করি ভগবান দাসের কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বেদান্ততীর্থ কর্ত্তৃক সম্পাদিত; Calcutta Sanskrit series, no IV.; (Metropolitan Printing & Publishing House)

এ দেশে বেদান্তের আলোচনা যতটা হয়েছে অন্য শাস্ত্রের আলোচনা হয়ত ততটা হয় নি; কারণ কোন নূতন ধর্ম্মমতই সে শাস্ত্রকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে নি, হয় তাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে, না হয় তাকে খণ্ডন করতে হয়েছে। সেই জন্য নিত্যনূতন বেদান্তের বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় এবং এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত নরেন্দ্র বেদান্ততীর্থের নিকট আমরা অনেক পরিমাণে ঋণী। তিনি তাঁর নানা বইয়ে বহু নূতন পুঁথিপত্রের খবর দিয়েছেন (এ বিষয়ে তাঁর 'বেদান্তশাস্ত্রের ইতিহাস' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

বেদান্তসিদ্ধান্ত সূক্তিমঞ্জরী সম্পূর্ণ নূতন বই না হলেও তাকে এক হিসাবে নূতন বলা যায়। ইতিপূর্ব্বে সে বই অপ্যয় দীক্ষিতের বিখ্যাত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেই জন্য তখন সে বই সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। নরেনবাবু এসিয়াটিক সোসাইটি ও সংস্কৃত কলেজের দুইখানি নূতন পুঁথির সাহায্যে এ গ্রন্থ পুনরায় সম্পাদন করেছেন। এই সম্পাদন কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ পূর্ব্বপ্রকাশিত বইয়ে অনেক ভ্রম প্রমাদ ছিল; সেগুলিকে নূতন পুঁথির সাহায্যে দূর করা সম্ভব হয়েছে; তা ছাড়া এই দুই নূতন পুঁথিতে গ্রন্থকারের নিজের যে টীকা ছিল তা' পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নি, সে টীকার নাম 'প্রকাশ' আর সে টীকা অনেকস্থলে মূলগ্রন্থ থেকেও মূল্যবান।

এ গ্রন্থের রচয়িতা গঙ্গাধর যতি—গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী নামেও অনেক স্থলে উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি বেদান্তের অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—তন্মধ্যে স্বারাজ্যসিদ্ধিনামক গ্রন্থ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ—চন্দ্রিকোদ্গার, প্রণবকল্প-প্রকাশ, সিদ্ধান্ত-বিন্দুশীৎকার ও নানা টীকা টিপ্পনী এখনো পুঁথিতে নিবদ্ধ রয়েছে। গঙ্গাধর যতি প্রাচীন গ্রন্থকার নন, তিনি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তিনি লেখক হিসাবে অর্ব্বাচীন হলেও তাঁর গ্রন্থ যে মূল্যবান তা'তে সন্দেহ নেই।

বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী মৌলিক গ্রন্থ নয়, কিন্তু সে গ্রন্থে বহু প্রামাণিক গ্রন্থ হতে বাণী উদ্ধৃত হয়েছে এবং সেই কারণেই এ বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ধৃত গ্রন্থের দু একখানির নাম উল্লেখ করলেই সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে—অপ্যয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ (সপ্তদশ শতক) প্রকটার্থ (ত্রয়োদশ শতক), সুরেশ্বরের সংক্ষেপ শারীরক (নবম শতক), নারায়ণ-সরস্বতীর বার্ত্তিক (ষোড়শ শতক), বাচস্পতি মিশ্রের কৌমুদী (নবম শতক), চিত্রদীপ (ষোড়শ শতক) ইত্যাদি।

এই গ্রন্থে যে বেদান্ত বর্ণিত হয়েছে তা' শুদ্ধাদ্বৈত এবং সেই মতানুসারে গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, মায়া, অবিদ্যা, সাক্ষিন্, জীব প্রভৃতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। সেই জন্য গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ অর্থাৎ এ শুদ্ধাদ্বৈত গ্রহণে নানা আপত্তি খণ্ডন করে বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করবার প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ ও এ বিদ্যায় অধিকার-ভেদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ফল বা মোক্ষের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয়েছে।

বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী মৌলিক গ্রন্থ না হলেও অতি প্রয়োজনীয় handbook। প্রথম অধ্যায়ে ১২১টী শ্লোকে সমস্ত বেদান্তের সারমর্ম্ম বর্ণিত হয়েছে, অথচ তার মধ্যেই বহু প্রামাণিক গ্রন্থের মত উল্লিখিত হয়েছে। সমস্ত গ্রন্থে মোট ২৫০টী শ্লোক আছে এবং তার মধ্যে কোন কথাই বাদ যায় নি। তা ছাড়া মূল গ্রন্থে যে কথা স্পষ্ট করা সম্ভব হয় নি টীকায় তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। বেদান্তে যাঁরা প্রথম প্রবেশ লাভ করতে চান তাঁদের পক্ষে এ গ্রন্থ যে মূল্যবান সে কথা জোর করে বলা চলে।

গ্রন্থসম্পাদক ভূমিকা, তাঁর সংস্কৃত ও ইংরাজী টিপ্পনি দিয়ে গ্রন্থকে সৌষ্ঠবান্বিত করেছেন। ভূমিকায় বেদান্ত দর্শনের যে আলোচনা ও পরিশিষ্টে পারিভাষিক শব্দসমূহের যে বিশদ অর্থ দেওয়া হয়েছে তা এ গ্রন্থ অধ্যয়নের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। এ ছাড়া সম্পাদক গ্রন্থে উল্লিখিত নানা বইয়ের রচয়িতাদের ও গ্রন্থ রচনার কাল সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা'তেও যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রমাণ রয়েছে। সম্পাদক এ গ্রন্থসম্পাদনে যে প্রণালী অবলম্বন করেছেন তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সে রীতি যদি সর্ব্বত্র অনুসৃত হয় তা হলে প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করা সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি

টাকাকড়ি।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, গবেষক, বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোম্পানি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

এই বইখানি বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার যে 'টাকাকড়ি'র মত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেই জন্য তিনি বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ, তিনি আরও ধন্যবাদার্হ এই কারণে যে তাঁহার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। টাকাকড়ি সংক্রান্ত বহু জটিল ব্যাপার তিনি প্রাঞ্জল বাংলায় আলোচনা করিতে পারিয়াছেন। তবে স্থানে স্থানে ইংরাজি প্রতি-

শব্দগুলি ইংরাজি হরফে ব্র্যাকেটে দিলে ভাল হইত মনে হয়। টাকার বাজার, ব্যাঙ্কিং প্রথা, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সহিত দেশী ও বিদেশী টাকার বিনিময় হারের সম্বন্ধে বহু তথ্য গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রগণ অনেক ইংরাজি বই অপেক্ষা এই বই হইতে বেশি সাহায্য পাইবেন—অন্ততঃ ভারতীয় মুদ্রানীতি সম্পর্কে। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
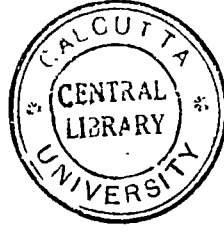
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪৩

পরিচয়

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি

ব্যাকরণের অতি সূক্ষ্ম তথ্য সরল ও সরস ভাষায় আলোচনা করা কম কথা নয়। আধুনিক যুগের Jespersenএর পূর্ব্বে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ভিন্ন আর কেহ এ কাজে সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তাঁহার বিরাট গ্রন্থ ব্যাকরণমহাভাষ্য বাস্তবিকই সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই মহাভাষ্য ব্যতিরেকে পাণিনীয় ব্যাকরণ কখনই এত প্রসিদ্ধি লাভ করিত না। পাণিনির ব্যাকরণের এই প্রসিদ্ধি সংস্কৃত ভাষার পক্ষে শুভকর হয় নাই; কারণ ইহার পর হইতেই ভাষাটি সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণের দাস হইয়া পড়িয়াছিল। পতঞ্জলির বহু পূর্ব্বেই অবশ্য সংস্কৃত যে একটি জীবন্ত ভাষা ছিল না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে; কিন্তু বিশেষ বিশেষ শিক্ষিত (শিষ্ট) সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃত তখনও কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পতঞ্জলি বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির যুগে ভারতীয় সভ্যতা আলোচনার সম্পর্কে বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইবে।

পতঞ্জলির যুগ কোনটি? সকলেই অবগত আছেন যে পতঞ্জলি তাঁহার একটি দৃষ্টান্তে পুষ্যমিত্রকে তাঁহার সমসাময়িক রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, "ইহ পুষ্যমিত্রং যাজয়ামঃ।" ইহা হইতেই প্রায় সকলেই ধরিয়া লইয়াছেন যে পতঞ্জলি বাস্তবিকই পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক। এই প্রকার সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রমাত্মক। কারণ আজ আমি আমার কোন পুস্তকে যে কোন উপলক্ষ্যেই হউক না কেন, যদি বর্ত্তমান কাল

ব্যবহার করিয়া এইরূপ একটি বাক্য লিখি, "রাম রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন" তাহা হইলে কিছুকাল পরে আমার লেখাটি দেখিয়া লোকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে যে আমি, রাম ও রাবণ সমসাময়িক লোক ছিলাম। বাস্তবিক দৃষ্টান্ত মধ্যে পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ হইতে পতঞ্জলি ও পুষ্যমিত্রের সমসাময়িকত্ব প্রমাণিত হয় না। তাহা হইতে এইটুকু মাত্র বলা যাইতে পারে যে পতঞ্জলি পুষ্যমিত্র সম্বন্ধে জানিতেন; তবে তাহা সমসাময়িক রূপে কিম্বা পূর্ব্ব-কালের একজন প্রসিদ্ধ সম্রাটরূপে সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার উপায় নাই। কিন্তু মহাভাষ্য মধ্যে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রতিফলিত তাহা হইতে এ কথাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে পতঞ্জলির পক্ষে পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়, এবং উভয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান যদিই বা কিছু থাকে তাহাও কখনই বিশাল ছিল না।

ব্যাকরণশাস্ত্রের গুরুপরম্পরা বিচার করিলেও পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়. পাণিনি ও পতঞ্জলির অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে বার্ত্তিক-কার কাত্যায়ন ও কারিকাকার ব্যাড়ির জন্ম হইয়াছিল। পতঞ্জলি ব্যাড়ির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান; তাঁহার অধুনালুপ্ত লক্ষশ্লোকী "সংগ্রহ" পতঞ্জলি পুনঃ পুনঃ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনির সূত্রও যেমন পতঞ্জলির নিকট কেবল ব্যাখ্যানের বস্তু, বিচারের বা খণ্ডনের নহে, ব্যাড়ির কারিকাও তাঁহার নিকট তদ্রূপ। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের প্রতি পতঞ্জলির মনোভাব কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরূপ। একথা বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে মহাভাষ্যকারের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মত খণ্ডন করা। অবশ্য এতৎ সম্পর্কে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সাধারণতঃ মহাভাষ্যের সংস্করণে যতগুলি বার্ত্তিক কাত্যায়নের উপর আরোপ করা হয় তাহার অনেকগুলিরই প্রণেতা পতঞ্জলি স্বয়ং, কাত্যায়ন নন।

পাণিনি ও পতঞ্জলির মধ্যে কালগত ব্যবধান যে সামান্য নহে তাহা ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে পতঞ্জলি কোন কোন স্থলে পাণিনির সূত্রের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।* এ সম্বন্ধে পতঞ্জলির সহিত পাণিনির যে সম্পর্ক, পাণিনির সহিত ঋগ্বেদের

---

* যথা পাণিনীয় সূত্র "সংবুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে"। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা অন্যত্র (Ind. Hist. Qu. X. 665 pp.) করিয়াছি।

পদকার ও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের আদি প্রণেতা শাকল্যেরও সেই সম্পর্ক, কারণ শাকল্যেরও প্রগৃহ্যসম্পর্কিত কয়েকটি সূত্র বুঝিতে না পারিয়া পাণিনি এমন সব সূত্র করিয়া গিয়াছেন যাহার সদর্থ করিবার জন্য পতঞ্জলিকে এমন সব উপায়ের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল যাহা সাধারণ অবস্থায় কোন ভাষ্যকারের পক্ষেই মার্জ্জনীয় নহে (see Keith, Indian Culture 1936, pp. 742-3)। সূত্রকার ও ভাষ্যকারের মধ্যে যে বহু বিষয়ে মতবৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাহার একটি মুখ্য কারণ ইহাও হইতে পারে যে তাঁহারা ভারতবর্ষের দুইটি বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। আম্নায়ানুযায়ী পাণিনি ছিলেন পঞ্চনদের অধিবাসী, সূত্র মধ্যে পঞ্চনদ সম্পর্কিত নানা খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনা দেখিয়া মনে হয় এ কথা বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই। তবে পঞ্চনদের অধিবাসী হইয়াও পাণিনি ভারতের অপরাপর প্রদেশের শিষ্টপ্রয়োগ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না ; তিনি বহু স্থলে প্রাচ্য ও উদীচ্য-গণের শিষ্ট প্রয়োগ সম্বন্ধেও বিশেষ সূত্র করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের শিষ্টপ্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার কোন বিশেষ সূত্র নাই। সূত্রকারের এই চ্যুতি পূরণের জন্য পতঞ্জলিকে বিশেষ যত্ন লইতে হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের শিষ্টপ্রয়োগ সম্বন্ধে পতঞ্জলি মহাভাষ্যে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা হইতে মনে করা হইয়া থাকে তিনি নিজেই দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও সেইরূপ প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং বৈদিক সাহিত্যেই কাত্যায়নীয় প্রবরাম্নায় প্রাচ্য দেশীয় রূপে পরিগণিত। সুতরাং পাণিনীয় ব্যাকরণ সাহিত্যে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের শিষ্ট প্রয়োগের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ভাষার ক্ষেত্রে এত প্রাচীন-কালেই সমগ্র ভারতের একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা বাস্তবিকই হিন্দু সভ্যতার একটি সুমহান কীর্ত্তি। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে তখনই ভারতের নানা প্রদেশের মধ্যে কৃষ্টিগত বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মাতুলকন্যা বিবাহের জন্য দাক্ষিণাত্য-গণকে তখনও হয়তো আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত, এবং তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু" পদার্পণ করিলে তখনই হয়তো আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

কিন্তু শিষ্টপ্রয়োগ কাহাকে বলে? পতঞ্জলি নিজে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে (পরবর্ত্তী প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য)।

পতঞ্জলির যুগে সংস্কৃত একটি কথিত ভাষা ছিল কিনা একথাও এই সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। বাণ, দণ্ডী, মাঘ, ভারবি ইত্যাদির ভাষা যে কথিত জীবিত ভাষা ছিল না তাহা প্রমাণ করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই; এই সকল বিকৃতবুদ্ধি "সাহিত্যিকে"র নিকট দুর্ব্বোধ্যতাই ছিল সাহিত্যিক উৎকর্ষের মাপকাঠি। কিন্তু শঙ্করভাষ্যের স্বচ্ছ, সুন্দর, জলদগম্ভীর ভাষাকে dead idiom মনে করিতে বাস্তবিকই মনে বাধে। এই ভাষারই দূর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় মহাভাষ্যে। অবশ্য শঙ্করের ভাষার উদাত্ত ধ্বনি পতঞ্জলির ভাষায় নাই,—থাকা সম্ভবও নয়; কিন্তু মহাভাষ্যের ভাষাও সমাপিকা ক্রিয়াবহুল, এবং মহাভাষ্যের বহু অংশ পাঠ করিলে আপনা হইতেই বৈদিক সাহিত্যের ব্রাহ্মণগুলির ভাষার কথা মনে পড়িয়া যায়। তাই মনে হয় শাঙ্করভাষ্যের ভাষাকে যে কারণে dead idiom বলিয়া উপেক্ষা করিবার উপায় নাই, পতঞ্জলির সমাপিকা ক্রিয়াবহুল নাতিদুর্ব্বোধ্য ভাষাকেও সেইরূপ মৃত ভাষা বলিয়া মনে করা যায় না। অবশ্য শঙ্করের ভাষা যে কোন দিন সাধারণ্যে প্রচলিত দৈনিক কেনা বেচার ভাষা ছিল না তাহা বলাই বাহুল্য; পতঞ্জলির ভাষা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে।

পতঞ্জলির যুগে যে সাধারণ্যে সংস্কৃত কথিত ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত না তাহার "পাথুরে" প্রমাণ প্রথমতঃ পাওয়া যায় অশোকাদির শিলালিপিতে। তথাগতের "ধর্ম্ম" প্রচারে ব্রতী হইয়া অশোক সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে অশোক জনসাধারণের অবগতির জন্য স্বয়ং তথাগতের আদেশানুযায়ী সংস্কৃত ভাষা পরিহার করিয়া সহজবোধ্য প্রাকৃত ভাষায় তাঁহার উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই বিনয় পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গে একটি গল্প আছে যে বুদ্ধদেবের কোন শিষ্য এক সময়ে তাঁহার বচনগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল। বুদ্ধদেব ঐ কথা শুনিতে পাইয়া শিষ্যকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া সকলকে বলিলেন "অনুজানামি ভিক্‌খবে সকায় নিরুত্তিয়া বুদ্ধবচনম্ পরিয়াপুণিতুম্" অর্থাৎ "হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে অনুজ্ঞা করিতেছি যে তোমরা আপন ভাষায় বুদ্ধবচন শিক্ষা করিবে।" কিন্তু এ বচন দ্ব্যর্থযুক্ত; "আপন ভাষা (=সকায় নিরুত্তিয়া)" বুদ্ধদেবের আপন (মাগধী?) ভাষাও বুঝাইতে পারে আবার শিষ্যদিগের প্রত্যেকের আপন আপন ভাষাও বুঝাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভাষায় পারদর্শী, আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন

শিক্ষক অধ্যাপক Wilhelm Geiger মনে করেন যে বুদ্ধদেব এই বাক্যদ্বারা শিষ্যগণকে তাঁহার আপনার (মাগধী ?) ভাষাই ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। অপরদিকে বিশাল পণ্ডিত অধ্যাপক Hermann Oldenberg চুল্লবগ্‌গের অনুবাদে বলিয়া গিয়াছেন যে বুদ্ধদেব এই বাক্যদ্বারা প্রত্যেক শিষ্যকেই আপন আপন ভাষা ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন! মহারথীদের মধ্যে যেখানে এরূপ বিরোধ সেখানে কিঙ্করঃ কিং করিষ্যতি! ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে এটুকু কিন্তু নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে মাগধী অপেক্ষা অর্দ্ধ-মাগধীরই সহিত পালিভাষার সম্বন্ধ নিকটতর।—সে যাহাই হউক, অশোকের শিলালিপিতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার নাই দেখিয়া এ সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হইবে না যে তাঁহার যুগে সংস্কৃত ভাষা সাধারণ্যে বোধগম্য ছিল না, যদিও তাঁহার শিলা-লিপির প্রাকৃতই যে লোকে তখন সিন্ধুপ্রদেশ হইতে মহীশূর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারিত তাহাও বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। কারণ অশোকের শিলালিপির মধ্যেই এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ আছে যে যাহারা এই সকল শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিল তাহারা নিজেরাই এগুলির অর্থ বুঝিত না। অশোকের সাম্রাজ্যের জনসাধারণ যে এই সকল লেখকদের অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত ছিল তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। এই সম্পর্কে একথা বলিয়া রাখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর যে সব লাটিন শিলালিপি পাওয়া যায়—স্বয়ং Consulদের আদেশে যেগুলি লিখিত হইয়াছিল—সেগুলির লেখকরাও ছিল সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন। সম্রাট অশোকের কর্ম্মচারীদের মত তাহারাও তাহাদের আদর্শ হইতে অক্ষরগুলি 'মাছিমারা কেরাণীর' মত প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া যাইত। তবে প্রাচীন লাটিন শিলালিপি ও অশোকের শিলালিপিতে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে লাটিন শিলালিপিগুলি জনসাধারণে পড়িতে না পারিলেও প্রয়োজন হইলেই সেগুলি তাহাদের পড়িয়া শোনান সম্ভব ছিল। অশোকের শিলালেখ-গুলির অধিকাংশ সম্বন্ধে কিন্তু সে সম্ভাবনা ছিল না। সমুচ্চ স্তম্ভের উপরে বা পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি কে সহজে পাঠ করিতে পারে? কাজেই ধরিয়া লইতে হয় যে জনসাধারণকে পড়াইবার জন্য অশোকের শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হয় নাই। তবে কিসের জন্য হইয়াছিল? যে জন্য পারস্যের হখামনিষ সম্রাট্‌গণ বিহিস্তুনের মত অনধিগম্য পর্ব্বতপঞ্জরে তাঁহাদের শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়া

গিয়াছেন ; যে জন্য আধুনিক যুগে লোকে আপনার বা আত্মীয়জনের মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই হখামনিষ সম্রাট্‌গণ পর্ব্বতগাত্রে তাঁহাদের শিলালিপি উৎকীর্ণ করাইয়া গিয়াছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, সম্রাট অশোক তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। কাজেই তাঁহার শিলালিপি হইতে তাৎকালিক ভারতবর্ষের কথিত ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিবার উপায় নাই। অশোকের শিলালিপির ভাষা ছিল খুব সম্ভব পাটলিপুত্রের রাজভাষা মাত্র। যে সকল ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে অশোকের যুগেই ভারতে একটা lingua franca বর্ত্তমান ছিল, তাঁহারা অশোকের শিলালেখের উদ্দেশ্যেই বুঝিতে পারেন নাই! তখনকার দিনের প্রকৃত কথিত ভাষার পরিচয় বরঞ্চ তাৎকালিক প্রাকৃত শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়, যথা—যোগীমারা শিলালিপি (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক)। এই শিলাশিপির ভাষাকে বাস্তবিকই প্রাচীন মাগধী বলা যাইতে পারেঃ—"শুতনুকা ণম দেবদশিক্যি, তং কময়িথ বলনশেয়ে দেবদিণে ণম লূপদখে।"* এই ভাষা পতঞ্জলির সংস্কৃত হইতে যত পৃথক, অশোকের ভাষা হইতেও তত।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে পতঞ্জলির যুগেই সংস্কৃতেতর অন্ততঃ দুই শ্রেণীর ভাষা ভারতে কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল। ইহার মধ্যে একশ্রেণীর ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় অশোকের শিলালেখে; খুব সম্ভব এই ভাষা ছিল পাটলিপুত্রের রাজভাষা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় প্রাচীন প্রাকৃতে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন সমাজে যে পতঞ্জলির সংস্কৃত ভাষাও তখন কথিত হওয়া সম্ভব ছিল না এরূপ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। পতঞ্জলি স্বয়ং এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া যান নাই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন সংস্কৃত ভাষা শিষ্টগণের মধ্যেই ব্যবহৃত হইত; "লোকে" কিন্তু "কৃষি"কে বলা হইত "কসি"। "কসি" অবশ্যই প্রাকৃত। কাজেই পতঞ্জলির নিজের কথা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে জনসাধারণে তখন প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিত।

ছাত্রগণের ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে পতঞ্জলি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান হয় যে Alexandrinian যুগে যে ভাবে গ্রীক্ পড়া হইত অন্ততঃ সেই ভাবে পতঞ্জলির যুগে সংস্কৃত পড়া হইত। ছাত্র উদাত্ত স্থলে অনুদাত্ত উচ্চারণ করিলে "খণ্ডিকোপাধ্যায়" তাহাকে চপেটাঘাত (!) করিয়া বলিতেন "অন্যত্বম্

* "সুতনুকা নামক দেবদাসীকে বারাণসীর অধিবাসী রূপদক্ষ দেবদত্ত ভালবাসিয়াছিল।"

করোষি"। অধ্যাপক যে প্রত্যেকটি অক্ষর অতীব যত্নের সহিত উচ্চারণ করিতেন তাহারও পরিচয় মহাভাষ্য হইতে পাওয়া যায়, যথা "প্রমাণভূত আচার্য্যো দর্ভপবিত্র-পাণিঃ শুচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রং প্রণয়তি স্ম, তত্রাশক্যম্ বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্।" আজকালকার শিক্ষকদের মত পতঞ্জলির যুগেও অধ্যাপকদিগকে ছাত্রগণের প্রতিপত্ত্যর্থে নানাপ্রকার আকার ইঙ্গিতের আশ্রয় লইতে হইত, কেবল নিশ্চল ভাবে তাঁহার বক্তব্য বলিয়া যাইলেই যথেষ্ট হইত না। "ইহেঙ্গিতেন চেষ্টিতেন নিমিষিতেন মহতা চ সূত্রনিবন্ধেনাচার্য্যাণামভিপ্রায়ো লক্ষ্যতে।" কড়া অধ্যাপকদিগকে ছাত্রগণ কিরূপ ভয় করিত তাহা এক ভীত ছাত্রের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে: "যদি মামুপাধ্যায়ঃ পশ্যতি ধ্রুবং মে প্রেষণমুপালম্ভো বা"। অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলে কিন্তু অন্তেবাসিদের পরম লাভ, কারণ উপাধ্যায়ের যজমানাদির গৃহে সেইরূপ ছাত্র যথেষ্ট সমাদর লাভ করিত, যথা: "উপাধ্যায়স্য শিষ্যো যাজ্যকুলানি গত্বা অগ্রাসনাদীনি লভতে"। উপাধ্যায়ের দ্বারা একবার এইরূপে অনুগৃহীত হইলে প্রিয়শিষ্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিত যেন অপর কোন ছাত্র তাহাকে এই গুরুর প্রসাদ হইতে বঞ্চিত না করে, তবে ইহলৌকিক ভূতিলাভই ছাত্রগণের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না:—"নেহ কশ্চিৎ পরোঽনুগ্রহীতব্য ইতি প্রবর্ত্ততে, সর্ব্ব ইমে স্বভূত্যর্থং প্রবর্ত্তন্তে পারলৌকিকং চ নো ভবিষ্যতি, ইহ চ নঃ প্রীতো গুরুরধ্যাপয়িষ্যতি"। বিখ্যাত অধ্যাপকের অন্তেবাসী হইবার জন্য শিক্ষার্থীরা শত যোজন দূর হইতেও গুরুর নিকট আসিত, এই সকল শিক্ষার্থী "যৌজনশতিক" নামে অভিহিত হইত। আজকালকার মত তখনকার দিনেও ছাত্রদিগকে পরীক্ষার্থে "অচকমত" পদসাধুত্ব করিতে দেওয়া হইত একথাও মহাভাষ্য হইতে জানিতে পারা যায়।

মহাভাষ্য হইতে বৈদিক সাহিত্যের বহু তথ্য পাওয়া যায়, এবং বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাসে ঐ সকল তথ্য ব্যবহার করাও হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে ঐ দুরূহ বিষয়ের আলোচনা করিব না। বরং তিনি লৌকিক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রসঙ্গচ্ছলে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে পতঞ্জলির কি মনোভাব সে সম্বন্ধে দুই এক কথা এই প্রবন্ধমধ্যেও না বলা অন্যায় হইবে। আজকালকার গোঁড়া পণ্ডিতদের মত পতঞ্জলিও বিশ্বাস করিতেন যে বেদ অপৌরুষেয়, কিন্তু পতঞ্জলির মতে বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব অর্থ সম্বন্ধেই প্রযুজ্য,

শব্দ সম্বন্ধে নহে ঃ—"ন হি ছন্দাংসি ক্রিয়ন্তে, নিত্যানি ছন্দাংসি। ......যদ্যপ্যর্থো নিত্যঃ যা ত্বসৌ বর্ণানুপূর্বী সানিত্যা।" এই "বর্ণানুপূর্বী"ই পতঞ্জলির মতে বৈদিক বাঙ্ময় মধ্যে বিভিন্ন শাখার উদ্ভবের কারণ। বাজসনেয়ি সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মধ্যে যে বৈষম্য তাহা যদি পতঞ্জলির মতে কেবলমাত্র বর্ণানুপূর্বী বা arrangementএর ফলমাত্র হয় তবে তো ইহারই দোহাই দিয়া যে কোন বৈদিক গ্রন্থের যে কোন ব্যাখ্যাই করা যাইতে পারে। পতঞ্জলি যদি এতটাই বরদাস্ত করিতে পারিতেন তবে আজকালকার অভিশপ্ত ভাষাতাত্ত্বিকরা বেদের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক সেটাই কেবল তিনি সহ্য করিতেন না ইহাও মনে করিবার কারণ নাই। পতঞ্জলির নিকট হইতে এবিষয়ে আজকালকার গোঁড়া পণ্ডিতদের অনেক কিছুই শিক্ষা করিবার আছে। কাশীর এক বিখ্যাত পণ্ডিতকে বেদ সম্বন্ধে ছাত্রগণকে বলিতে শুনিয়াছি, "বেদ রোটো, ঘোখো, কিন্তু বুঝিবার চেষ্টামাত্র করিও না।"

পতঞ্জলির যুগে যে সংস্কৃত ভাষায় একটি বিরাট লৌকিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভাষ্য হইতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের যুগেই ইতিহাস ও পুরাণাদির একটা বিশেষ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল; আপস্তম্ব-শ্রৌত সূত্রে "ভবিষ্যৎ" পুরাণের নাম পাওয়া যায়। কাজেই মহাভাষ্যে পুরাণেতিহাসের উল্লেখ দেখিয়া বিস্মিত হইবার কিছু নাই। পতঞ্জলি এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে আখ্যান ও আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ঐ সকল আখ্যায়িকা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত দানস্তুতি ও নারাশংসী জাতীয়। ঋগ্বেদের অন্তর্গত হইলেও অধিকাংশ আখ্যান-সূক্তের যজ্ঞে কোন প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া মনে হয় যে আখ্যানসূক্তগুলি প্রকৃতপক্ষে লৌকিক সাহিত্যেরই অন্তর্গত। বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকায় অভিজ্ঞ লোকদের সেই আখ্যায়িকানুযায়ী সংজ্ঞা হইত, যথা যে ব্যক্তি যবক্রীতের উপাখ্যানে পারদর্শী তাহার সংজ্ঞা ছিল "যাবক্রীতিক"; ঐরূপে প্রৈয়ঙ্গবিক, যাযাতিক, বাসবদত্তিক ইত্যাদি। মহাভারত প্রোক্ত প্রসিদ্ধ যয়াতির উপাখ্যানে পারদর্শী ব্যক্তিই খুব সম্ভব যাযাতিক নামে অভিহিত হইত। কিন্তু কোন্ প্রিয়ঙ্গু বা বাসবদত্তার নামে পতঞ্জলির যুগে আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। কতকগুলি আখ্যায়িকার নাম হইতে সেগুলির নায়কদের সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই, যথা, দৈবাসুরম্, রক্ষোসুরী ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে পতঞ্জলির যুগে রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল কিনা। মহাভারতের বহু চরিত্র মহাভাষ্যে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এইগুলিরই সম্পর্কে এমন সব শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে যেগুলি বাস্তবিকই মহাভারত হইতে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। পাণিনি স্বয়ং "মহাভারত" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার "মহাভারত" বাস্তবিকই একটি গ্রন্থ বা আর কিছু তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই। বার্ত্তিক ও ভাষ্য মধ্যে কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডব ভিন্ন দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনেরও নাম পাওয়া যায়। কুরুদের সম্বন্ধে একথাও বলা হইয়াছে যে "ধর্ম্মেণ স্ম কুরবো যুধ্যন্তে"। মহাভারতের প্রবক্তা—বৈয়াসকি শুকের নামও মহাভাষ্যে আছে। এই সকল কারণে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই যে পতঞ্জলির যুগেই (শ্লোকে রচিত) একটি মহাভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণ সম্বন্ধে কিন্তু মহাভাষ্যে কোন কথাই প্রায় পাওয়া যায় না। একটি শ্লোকে বানর সৈন্যের উল্লেখ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন পতঞ্জলি রামায়ণের সহিতও পরিচিত ছিলেন ; কিন্তু বানরের পাল হইতে রামায়ণের অস্তিত্ব অনুমান আর ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান ঠিক এক পর্য্যায়েব নহে। কিন্তু রামায়ণের উল্লেখ নাই বলিয়া পতঞ্জলির যুগে রামায়ণের অস্তিত্বও ছিল না এইরূপ argumentum ex silentio কেহ যেন করিয়া না বসেন। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহাদিগকে Jacobir Das Ramayana পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। আমার নিজের বিশ্বাস, বর্ত্তমানে রামায়ণ ও মহাভারত যে আকারে পাওয়া যায় সেই আকারে রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন ; কিন্তু মহাভারতই যে রামায়ণ অপেক্ষা পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিবার কোন কারণ নাই।

পরবর্ত্তী যুগে পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে যে সমস্ত গল্প সংগৃহীত হইয়াছে সেই ধরণের অনেক গল্প যে পতঞ্জলির যুগেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহার পরিচয় মহাভাষ্য হইতে পাওয়া যায়। যথা—কাকতালীয়ম্, অজাকৃপণীয়ম্, অহিনকুলিকা, কাকোলূকিকা ইত্যাদি। এই জাতীয় গল্পগুলির যে কোথায় কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই, বহু প্রাচীন কাল হইতেই এগুলি নানা আর্য্য ও অনার্য্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায়।

বাস্তবিকই পতঞ্জলির যুগে লৌকিক সাহিত্যে নাটকও ছিল কিনা সে বিষয়ে

মহাভাষ্য হইতে নিঃসন্দেহে কিছু জানিবার উপায় নাই ; তবে তাঁহার যুগে যে রীতিমত অভিনয় হইত তাহা নিঃসন্দেহ। মধ্য এসিয়া হইতে অশ্বঘোষের যে নাটকগুলি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির লিপি হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ঐ নাটকগুলির পুঁথি খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে নাটকগুলির রচনাকাল আরও একশত বৎসর পূর্ব্বে ধার্য্য করা অনুচিত হইবে না। ইতিহাসেও পাওয়া অশ্বঘোষ ছিলেন কনিষ্কের সমসাময়িক, কাজেই পতঞ্জলির অল্পদিন পরেই যে অশ্বঘোষের নাটকগুলি রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার উপর অশ্বঘোষের নাটকের মধ্যেই দেখা যায় যে পরবর্ত্তী যুগে আলঙ্কারিকগণ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় সমস্তই তন্মধ্যে রহিয়াছে। সুতরাং মহাভাষ্যে এ সম্বন্ধে প্রকটোক্তি না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পতঞ্জলির যুগেই নাটকরচনা রীতিমত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, এবং নাটক থাকুক বা না থাকুক, প্রায় বৈদিকযুগ হইতেই যে একপ্রকারের নাট্যাভিনয় ভারতে প্রচলিত ছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নানা দেশে দেখা যায় যে প্রাচীন আনুষ্ঠানিক নৃত্য (ritual dance) হইতে ক্রমে লৌকিক নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবর্ষেও যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

'নাট্য' কথাটি হইতেই বুঝা যায় যে নৃত্যের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, কারণ 'নাট্য' শব্দ 'নৃত্য' শব্দেরই প্রাকৃতরূপ। প্রাকৃত শব্দটি দেখিয়া ইহাও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই নাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। নাটকে বহুল পরিমাণে প্রাকৃত প্রয়োগ দেখিয়াও মনে হয় সাধারণ্যেই ইহার উৎপত্তি এবং জনসাধারণের জন্যই এই সকল নাটক অভিনীত হইত। প্রাচীন ritual-এর সহিত ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তিগত যোগ এবং জনসাধারণের তৃপ্তিসাধনের জন্যই এগুলির অভিনয়, এই দুইটি কথা স্মরণ রাখিলে কিন্তু আর বলিবার উপায় থাকে না যে গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়াই ভারতীয়গণ নাটক রচনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীকরা এদেশে আসিয়াছিল বিজেতারূপে ; কাজেই ধরিয়া লইতে হইবে যে তাহারাই ছিল শিক্ষায় ও কৃষ্টিতে ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে জনসাধারণেব সহিত বিজেতা গ্রীকগণের যোগসাধন কিরূপে সম্ভব ? কাজেই খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে

যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক সামন্ত রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের দ্বারাই ভারতে নাট্যাভিনয় প্রচারিত হইয়াছিল একথাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অবশ্য এই সকল সামন্তের সভায় যে গ্রীক্ নাটকের অভিনয় হইত না তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই, যদিও তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণও কিছু নাই। পর্যুদস্ত পারস্যে কিন্তু তখন যে গ্রীক্ নাটকের অভিনয় হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পার্থীয় সম্রাট্‌গণের অধীনে পারস্য আবার স্বাধীনতা লাভ করিবার পরেও সে দেশের রাজসভায় গ্রীক্ নাটক অভিনীত হইত। ক্রাসাসের অধীনে রোমক সৈন্য যখন পার্থীয়দের নিকট পরাস্ত হইল এবং ক্রাসাসের খণ্ডিত মুণ্ড যখন পারস্যের রাজসভায় আনীত হইল, তখন সেখানে সফোক্লিসের একটি নাটক অভিনীত হইতেছিল। প্রধান অভিনেতার তখন একটি নরমুণ্ড হাতে করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার কথা; তিনি আসল পাইয়া নকলের মায়া ত্যাগ করিয়া ক্রাসাসের ছিন্নমুণ্ড হস্তে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া যে রোমাঞ্চের সঞ্চার করিলেন, তাহার বিবরণ রোমক ঐতিহাসিকগণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গ্রীক্‌সামন্তগণ কিন্তু, হয়তো কুশান ও ইউচিদের আক্রমণের ফলেই, তাহাদের স্বদেশ ও স্বভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হেলিওডোরসের বেস্‌-নগর স্তম্ভ হইতে জানিতে পারা যায় যে গ্রীক্‌গণ তখন বৈষ্ণবধর্ম্মও অবলম্বন করিত। এই গ্রীক্‌গণ যে ভারতীয়দিগকে নাট্যরচনা ও অভিনয় প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত।

উপরন্তু, নাটক না হউক, নাটকের অনুরূপ রচনাবলীর পরিচয় বৈদিক সাহিত্য মধ্যেই পাওয়া যায়। যম ও যমী, কচ ও দেবযানী, উর্ব্বশী ও পুরূরবার আখ্যান (dialogue) সূক্ত ঋগ্বেদের মধ্যেই বর্ত্তমান। ঋগ্বেদে যত সূক্ত আছে, তাহার সমস্তই যজ্ঞমধ্যে কোন কোন উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু আখ্যানসূক্তগুলির যজ্ঞে কোন প্রযোগ নাই। তাই অনুমান হয় এগুলির উৎপত্তি লোকরঞ্জনার্থে। আখ্যান সূক্তগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে এগুলি এমন খাপছাড়া যে মনে হয় যে শ্লোকগুলির মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু গদ্যাংশ যেন ছিল, যেগুলি বৈদিক সাহিত্যে সমাম্নাত হয় নাই। অর্থাৎ কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নাটকের গদ্যাংশ বাদ দিলে সেগুলির যে আকার দাঁড়ায়, আখ্যান সূক্তগুলি অনেকটা সেইরূপ। গদ্যাংশ লুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়; আইস্‌ল্যাণ্ডের (Iceland) এড্ডা (Edda)

সাহিত্যে বাস্তবিকই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে সংহিতার পরই ব্রাহ্মণের যুগ। এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে আমরা বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের বিশদ্ বর্ণনা দেখিতে পাই। এখন এই ব্রাহ্মণ সাহিত্যে যজ্ঞসম্পর্কিত কোন কোন ক্রিয়ার বর্ণনা হইতে স্পষ্টই মনে হয় যে সেগুলি সাধারণ্যে প্রচলিত সাধারণ উৎসবের সংস্কৃত রূপ। গবাময়নের পারায়ণোপক্ষ্যে মহাব্রত অনুষ্ঠিত হইত। এই মহাব্রতের নানা অনুষ্ঠান নাট্যাভিনয়েরই নামান্তর। একজন ব্রহ্মচারী ও একজন বেশ্যা পরস্পরকে গালি দিতে দিতে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইত। শ্বেতকায় একজন আর্য্য ও কৃষ্ণকায় একজন অনার্য্য গোলাকার একখণ্ড চর্ম্মের উপর যুদ্ধ করিত এবং যুদ্ধে অনার্য্যেরই পরাজয় হইত। মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড রচনা করিয়া নারীগণ জলপূর্ণ কুম্ভ মস্তকে ধারণ করিয়া বৃত্তাকারে নৃত্য করিতেন। নাট্যাভিনয়ের সমস্ত উপকরণ ইহারই মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং পতঞ্জলির যুগে যে নাট্যাভিনয় হইত তজ্জন্য গ্রীক্ প্রভাব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ং সূত্রকার পাণিনি "নটসূত্রে"র উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই নটসূত্রের নট কেবল নর্ত্তক ছিল না অভিনেতা ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। পতঞ্জলি কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া যান নাই। তিনি বলিতেছেন :— "নটস্য শৃণোতি", "গ্রন্থিকস্য শৃণোতি।" নট যে গানও করিত তাহা "অগাসীন্নটঃ" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়। বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ সম্বন্ধে পতঞ্জলি যাহা বলিয়াছেন তাহা তাঁহার যুগে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ। পতঞ্জলি এ স্থলে বলিতে চান, অভিনয়ে যদিও প্রাচীন ইতিহাসই কথিত হইতেছে, তথাপি চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হওয়ায় তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমানকাল প্রয়োগ করা উচিত :— ইহ তু কথং বর্ত্তমানকালতা, কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি? চিরহতে চ কংসে, চিরবদ্ধে চ বলৌ! উত্তরে বলা হইতেছে—"অত্রাপি [বর্ত্তমানকালতা] যুক্তা; কথম্? যে তাবদত্র শৌভিকা নাম এতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তি" ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে শৌভিকাখ্য অভিনেতাগণ দর্শকবৃন্দের চক্ষের সম্মুখে কংসবধ, বলিবন্ধন প্রভৃতি অভিনয় করিয়া দেখাইত। কেবল অভিনয় মাত্র নহে, অনেক পুরাতন কাহিনী চিত্র সাহায্যেও দর্শকবৃন্দকে দেখান হইত, যথা :—চিত্রেষ্বপি উদ্‌গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে, কংসস্য চ কৃষ্ণস্য চ। পতঞ্জলির প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে মুদ্রারাক্ষসে যে যমপটের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বোধ হয় এই জাতীয় চিত্র। পতঞ্জলি নট ও শৌভিকদের সহিত সমপর্য্যায়ে "গ্রন্থিক"-দেরও উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাদের কাজ ছিল "শব্দগ্রন্থন" মাত্র। খুব সম্ভব এই গ্রন্থিকগণ বর্ত্তমান যুগের কথকদেরই পূর্ব্ব সংস্করণ।

নট ও অভিনেতাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই মহাভাষ্য হইতে জানা যায়। "ছাত্রস্য হসিতম্, নটস্য ভুক্তম্, ময়ূরস্য নৃত্তম্" এক নিঃশ্বাসে উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় যে নটের আর্থিক দৈন্য ছিল প্রসিদ্ধ। নটস্ত্রীর পুংশ্চলীত্ব পতঞ্জলির যুগেও বিখ্যাত ছিল। তাহাদের সম্বন্ধে পতঞ্জলি একটি সাংঘাতিক কথা বলিয়াছেনঃ ব্যঞ্জনানি পুনর্নটভার্য্যাবদ্ভবন্তি। তদ্যথা নটানাং স্ত্রিয়ো রঙ্গাগতা যো যঃ পৃচ্ছতি "কস্য যূয়ম্ কস্য যূয়ম্" ইতি, তং তং "তব তব" ইত্যাহুঃ, এবং ব্যঞ্জনান্যপি যস্য যস্যাচঃ কার্য্যমুচ্যতে তং তং ভজন্তে। অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেমন ক্ষেত্রানুযায়ী যে কোন স্বরবর্ণ আশ্রয় করে, নটস্ত্রীগণও সেইরূপ আহ্বানমাত্র যে কোন ব্যক্তির অনুবর্ত্তী হয়। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে নটনটীদের অশেষ গুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির যুগে কিন্তু তাহারা জনসাধারণের সকল শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

পতঞ্জলির নটীগণ অভিনয়ে যোগদান করিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বোধ হয় তাহারা তাহাদের সংজ্ঞার আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী নৃত্য মাত্র করিত, অভিনয় করিত না। পতঞ্জলি স্বয়ং "ভ্রূকুংস"দের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা ছিল স্ত্রীবেশধারী পুরুষ নট। নারীসুলভ ভ্রূকুঞ্চন হইতেই ইহাদের নাম "ভ্রূকুংস"। একটি কারিকায় স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক ও ভ্রূকুংসের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছেঃ—

স্তনকেশবতী স্ত্রী স্যাল্লোমশঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
উভয়োরন্তরং যচ্চ তদভাবে নপুংসকম্।
লিঙ্গাৎ স্ত্রীপুংসয়োর্জ্ঞানে ভ্রূকুংসে টাপ্ প্রযুজ্যতে॥

কারিকাটির অর্থ সম্বন্ধে আমি ঠিক নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। বোধ হয় অর্থ এইরূপ হইবেঃ—"স্ত্রীলোক স্তনকেশবতী, পুরুষ লোমশ; এই উভয়ের পার্থক্য বিধায়ক লক্ষণহীন ব্যক্তি নপুংসক; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই লক্ষণসম্পন্ন ভ্রূকুংসের সংজ্ঞায় স্ত্রীত্ববিধায়ক টাপ্ প্রত্যয় হইবে।" মহাভাষ্যের টীকাকার জৈয়টসূত কৈয়ট বলিয়াছেন—"ভ্রূকুংসঃ স্ত্রীবেশধারী নটঃ"। এতৎসম্পর্কে এ কথাও স্মরণ

রাখা প্রয়োজন যে ক্লীবগণের নৃত্যপরায়ণতা বৈদিক যুগেও প্রসিদ্ধ ছিল ঃ—ক্লীবা ইব প্রনৃত্যন্তঃ (অথর্ব্ব বেদ, ৮।৬।১১)।

তাৎকালিক ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে যে কত কথা জানা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহার শতাংশের একাংশেরও আলোচনা এই প্রবন্ধ মধ্যে সম্ভব নয়। তথাপি তাৎকালিক হিন্দুধর্ম্মের যে চিত্র মহাভাষ্যে পাওয়া যায়, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা না করা অপরাধ হইবে। কারণ, পতঞ্জলির যুগ ছিল হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ। উপনিষদের যুগেই ক্রিয়ামাত্র-সার বৈদিকধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদের ঋষি ও রাজন্যগণ ঠিক বুদ্ধ ও মহাবীরের মতই ক্রিয়াপ্রাণ বৈদিক ধর্ম্মের তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। পতঞ্জলির যুগে বৈদিকধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের ফলে নূতন হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বুদ্ধ ও মহাবীর ছিলেন হিন্দুধর্ম্মেরই সংস্কারক, তাঁহারা পৃথক্ কোন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান নাই। Protestantism যদি খৃষ্টধর্ম্ম হইতে পৃথক্ একটি ধর্ম্মরূপে পরিগণিত না হয়, তবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। Catholic ও Protestantদের মধ্যে সংঘর্ষে ইউরোপে যে পরিমাণ রক্তপাত হইয়াছিল সে অনুপাতে ভারতবর্ষে কিছুই হয় নাই। রক্তপাত হইয়াছিল তখনই যখন বাস্তবিকই একটি পরদেশজ ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছিল, যথা ইসলাম। কিন্তু ইসলামের সহিতও চিরাচরিত পন্থায় ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল; চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও নানক প্রচারিত শিখধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মেরই সমন্বয়ের ফল।

হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম যে কেবল আদ্যাবস্থাতেই অভিন্ন ছিল তাহা নহে। আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও অন্ততঃ বঙ্গদেশে, যে ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত তাহাকেও অনেকাংশে একটি মহাযানী বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলেও খুব বেশী অত্যুক্তি হয় না। বাংলার লোকাচারে, বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহে ও শ্রাদ্ধে, যে সকল অনুষ্ঠান আজও দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত গৃহ্যসূত্রপ্রোক্ত বৈদিক আচারের তো প্রায় কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল আচারে ব্রহ্মযামলাদি তন্ত্র পর্য্যন্ত উদ্ধার করা হইয়া থাকে, এবং সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্রে যে মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রেরই পরিণত, বিকৃত রূপ তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন,

আজকাল শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে যে পরিমাণ বৈষম্য দেখা যায়, পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সেটুকু বৈষম্যও ছিল কিনা সন্দেহ। বৌদ্ধদর্শনের জ্ঞান না থাকিলে অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু দর্শনও (বিশেষ করিয়া ন্যায়) বুঝিয়া উঠা যায় না, কারণ বৌদ্ধ দার্শনিকদের ইহার মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে। আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলার আধুনিক কায়স্থদের সকলেই প্রায় পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল। এখানকার কায়স্থদের মধ্যে যাঁহারা মুসলমানী আমলের মজুমদার, মুস্তফী প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেন নাই তাঁহাদের পদবীগুলি সব বৌদ্ধ; ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, পালিত, রক্ষিত প্রভৃতি নামের প্রত্যেকটিই বৌদ্ধ। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে যে কায়স্থ জাতির উল্লেখ আছে তাহার সহিত এই কায়স্থদের বংশগত কোন যোগ থাকা সম্ভব নয়। গুপ্ত আমলের শিলালেখে ও রাজতরঙ্গিণীতে যে অত্যাচারী কায়স্থদের কথা পাওয়া যায় তাহারা ছিল রাজকর্ম্মচারী মাত্র, কোন্ জাতির রাজকর্ম্মচারী তাহা কিন্তু জানা যায় না। অপর দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে অশ্বঘোষ বুদ্ধঘোষ প্রভৃতি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কোন জাতিগত (ethnic) পার্থক্যও দেখা যায় না। তাই মনে হয় বাংলার যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাই এখন কায়স্থ নামে পরিচিত।

আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের দুইটি প্রধান লক্ষণ গোমাংস নিষেধ ও মূর্ত্তিপূজা। কিন্তু বৈদিক ঋষিদের গোমাংসপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত, এবং মূর্ত্তিপূজা আমরা বৌদ্ধদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে মূর্ত্তিপূজার চিহ্নমাত্র নাই। একথা argumentum ex silentio বলিয়া উপেক্ষা-করা যায় না, কারণ সংহিতা হইতে শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র পর্য্যন্ত বৈদিক হিন্দুর যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান এরূপ বিশদ-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে মূর্ত্তিপূজার কিছুমাত্র ব্যবস্থা থাকিলে তাহার কোন উল্লেখ এই বিশাল সাহিত্যের মধ্যে কোথাও একবারও থাকিত না। মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিয়াছিল ভারতের প্রত্যন্তপ্রদেশ নিবাসী গ্রীক্ বৌদ্ধগণ। গ্রীক্গণ আপনার দেশেই মূর্ত্তিপূজায় অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধমূর্ত্তি গড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। পাঞ্জাবের বুদ্ধমূর্ত্তিই ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি, এবং এই মূর্ত্তির মধ্যে প্রকৃত ভারতীয় শিল্পের প্রায় কোন চিহ্নই নাই।* কিন্তু একবার সম্মুখে আদর্শ পাইয়া

* প্রকৃত ভারতীয় শিল্পের প্রথম যুগে বুদ্ধকে একটি চিহ্নমাত্র দিয়া নির্দ্দেশ করা হইত।

ভারতীয়গণ দ্রুত মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ করিয়া দিল। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ইত্যাদি হইতে মহাযানীদের মধ্যে ক্রমে বিভিন্ন তারা মূর্ত্তির অভ্যুদয় হইল। বাংলার হিন্দুগণ দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিরূপে এই তারা মূর্ত্তিরই পূজা করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধপ্রভাবে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন কিন্তু পতঞ্জলির যুগে হিন্দুসমাজে রীতিমত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। পতঞ্জলি একথাও বলিয়া গিয়াছেন যে মৌর্য্য রাজাগণ ঘরে ঘরে দেবমূর্ত্তি দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। বিশেষ করিয়া শিব, স্কন্দ ও বিশাখের মূর্ত্তি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন দেবমূর্ত্তি "সম্প্রতিপূজার্থে" ও ভিক্ষা-সংগ্রহার্থে এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইত; কৈয়ট বলিয়াছেন, "যাঃ পরিগৃহ্য গৃহাৎ গৃহমটন্তি", সেইগুলিই সম্প্রতি পূজার্থে ব্যবহৃত দেবমূর্ত্তি। পতঞ্জলি আরও বলিয়াছেন যে পূজার্থে "কাশ্যপপ্রতিকৃতয়ঃ" ব্যবহৃত হইত। পতঞ্জলি যে সমস্ত দেবতার মূর্ত্তির পূজার কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই সকল দেবতার অনেকগুলিরই নাম বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায় না, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন মহাভারতাদিতে যে দেব দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভাষ্যে বিশেষরূপে সেই সকল দেব দেবীরই পূজার কথা বলা হইয়াছে। একথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মহাভাষ্যে কোথাও বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ নাই; কিন্তু বাসুদেব বা কৃষ্ণের উল্লেখ পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে। "জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ" ইহা পতঞ্জলিরই কথা। মহাভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন "অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ"। হরিবংশ রচনার বহু পূর্ব্বেই যে কৃষ্ণ অক্রূর, কেশব, গোবিন্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন একথাও পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে জানা যায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিপ্লাবিত ভারতবর্ষে অশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়া পুষ্যমিত্র যখন বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন জনসাধারণ সে ধর্ম্ম প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। পতঞ্জলির অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের শিলালেখাদির মধ্যেও এমন সব দেবতার উল্লেখ দেখা যায় যাহাদের নাম সাহিত্যে কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল নানা লক্ষণ দেখিয়া আপনা হইতেই মনে হয় যে পতঞ্জলির যুগে যাগাত্মক বৈদিক ধর্ম্মের স্থলে ভক্তিমূলক হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-বাসুদেবকে কেন্দ্র করিয়াই হিন্দুধর্ম্মের এই নব অভ্যুদয়। তাই মহাভাষ্যে কৃষ্ণোপচারের এত বাহুল্য।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

আবর্ত্ত

৩

'মুকুন্দ, মুকুন্দ, মুকুন্দ! আমি একবার মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে চাই এখনই।'

'বাবুর খবর পেয়েছেন?'

মাসীমা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে সুজন দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলে।

'এই যে মাসীমা!'

'এত রাত্তিরে!'

'না, খগেন বাবুব কোনো খোঁজ পাইনি, কিন্তু আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনি যখন খগেন বাবুর মাসীমা, তখন আমারও মাসীমা। আপনাকে উদ্ধার করতেই হবে। এক রাত্রির জন্য আমার এক আত্মীয়াকে আপনার ঘরে স্থান দিতে হবে। তিনি বাড়ি খুঁজে পাচ্ছেন না, কালই সকালে অন্যত্র নিয়ে যাব। কোন কষ্ট হবে না তাঁর, এই মেজেতেই মাদুর পেতে শোবেন, সঙ্গে লটবহর নেই। চমৎকার মাদুর! কোথায় পেলেন মাসীমা? যেন শীতলপাটি! মাসীমা, আমি তাঁকে নিয়ে আসি?'

'এখনই! সে কি করে হয় বাবা! তুমি খগেনের বন্ধু বলছ, তাই আমি কিছু বলতে পারি না, কিন্তু কাশীতে অনেক ব্যাপার ঘটে কিনা, তাই বলছি। কিছু মনে কোরো না, মেয়েটি বাড়ি থেকে চলে আসেনি ত? স্বদেশী মেয়ে?'

'না মাসীমা, স্বদেশী মেয়ে মোটেই নয়। ওসব হলে আমিই বা আনব কেন?'

'তবে নিশ্চয় ঝগড়া করে এসেছে। কিংবা...বাবা, তাকে বিধবা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।'

'না, না, ও-সব কিছু নয়। উনি খগেন বাবুর স্ত্রীর বন্ধু, একরকম আত্মীয়ারই সামিল। খগেন বাবুর সঙ্গে সেই সূত্রে খুব পরিচয়।'

মুকুন্দ বলে উঠল, 'মেম সাহেব এসেছেন বাবু? সেই যে গো, যার কথা বলেছি, জুতো পরেন, মোটর চড়েন, ইংরেজী বলেন...'

মুকুন্দ ও মাসীমার দৃষ্টিবিনিময় লক্ষ্য করে সুজন বললে, 'তুই থাম, মুকুন্দ! মাসীমা? আপনার কষ্ট হলে না হয় থাক্, অন্য বন্দোবস্ত করছি। এত রাত্তিরে এই যা!'

'না, আমার কষ্ট হবে না। তাঁরই কষ্ট হবে, তিনি পারবেন না।'

'তিনি' শব্দটির উচ্চারণে সুজনের মনে হোলো যেন বহু ইঙ্গিত রয়েছে, মুকুন্দ যেন মাসীমাকে সতর্ক করে দিয়েছে। মনে হোলো যেন কোন বহু পুরাতন সাবধান স্বার্থ-বন্ধনে তুটি প্রাণী একত্রিত হয়েছে। অলক্ষ্য শত্রুর গন্ধে পশুর দলই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নিরীহতা বর্জ্জন করে, প্রথমে চঞ্চল, পরে তূষ্ণীভূত। কিন্তু মানুষের আচরণ একটু ভিন্ন হওয়া চাই। মাসীমা ও মুকুন্দ মনুষ্যত্ব খুইয়ে এক হোলো। জড়ের ঐক্যে, পাশবিক ঐক্যের ঘন কাঠিন্যে যেন মাথা ঠুকে যায়। আহত হয়ে সুজন রমলা দেবীর কাছে ফিরে এল।

'কি হোলো সুজন? মাসীমা রাজি হলেন না? জানতাম। আমি তোমার ঘরেই শোব। তোমার আত্মীয় আসবেন, কি বলবে তাঁকে তৈরী কর এখন থেকে।'

'তাঁকে যা ঘটেছে তাই বলব। গৃহকর্ত্রী অপমান করেছে।'

'তিনিই বাড়ি ঠিক করলেন, আর তাঁকেই বলবে?'

'তা ভিন্ন উপায় কি?'

নিতান্ত অবান্তর মন্তব্য প্রকাশের মতন রমলা দেবী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'বলবার কোনো প্রয়োজন আছে?'

'তুমি কি বলছ রমাদি!'

'বেশ, বেশ, তাই ভাল, যা ইচ্ছে তোমার তাই বোলো। কি বলবে শিখে নাও—আমি খারাপ মেয়ে, কারুর সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারি না। অত ভয় কিসের সুজন? লোকে তোমাকে নিন্দে করবে যদি রাত্রে তোমার ঘরে আমাকে কেউ দেখে? বেশ, তুমি না হয় অন্য ঘরে শোও গে। আমি এই তোমার খাটে গা ঢাললাম······পার ত হাত ধরে টেনে তোল, তাড়িয়ে দাও।' রমাদেবী হেসে উঠলেন, হাসতে হাসতে সুজনের চোখে চোখ রেখে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে

পড়লেন, ডান হাত মাথার নীচে, ওপর হাতের তলা চিতি সাপের পেটের মতন সাদা······দেহের রেখায় ঢেউ লেগেছে······'সুজন, এ-বিছানায় তোমার বৌ কিছুতেই শোবে না······বাবা গো···কি খাট মা! ব্রহ্মচারীর খাট! ইঁটের পাঁজায় মানুষে শোয়? তোমার কম্বলগুলো কোথায়? বসবে না? অত দাঁড়িয়ে থেকো না। খাবে না? যাও ভেতরে, নয়ত ঘরেই খাবার নিয়ে আসবে মহারাজীন্। যাও, যাবার সময় না হয় দরজা ভেজিয়ে দিও। তোমার আত্মীয় কি তোমার সঙ্গে গল্প করেন রাত্রে?'

সুজন ভাঙ্গা গলায় উত্তর দিলে—'না'।

'তবে দেরী কোরো না,···যাও, খাবার খেয়ে এস। পেঁড়া কিছু নিয়ে এলেই হোতো, পড়ে আছে। আমি কিছু খাব না।'

সুজন দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেল। 'ঝি, আমি কিছু খাব না। যা হয় দাও।' ঝি একটি থালায় ফলের কুচি ও দুটি সন্দেশ গুছিয়ে দিলে, আর এক বাটি দুধ। 'রাতে খিদে পেলে খাব। আমার কুঁজোয় জল আছে, আর দিতে হবে না। দীপা ঘুমিয়েছে?'

'খুকী খুঁৎ খুঁৎ করছে বাবু। যা দরকার হয় চেয়ে নেবেন।'

'আচ্ছা। তুমি দীপার কাছে যাও। চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। এই বয়সে রাত জাগা ভাল নয়। দরকার পড়লে নিজে নেবো।'

সুজন থালা ও দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে এল···ঘর অন্ধকার। সন্তর্পণে চুপি চুপি কথাবার্ত্তা হয় দুজনের মধ্যে।

'সুজন, এস, এইখানে।'

'আলো জ্বালো, হাতে থালা বাটি, পড়ে যাব।'

রমলা দেবী আলো জ্বাললেন, তাঁর চোখের পলক ঘন ঘন পড়ে, সুজন সুদৃঢ় হস্তে থালা ও বাটি টেবিলের ওপর রাখে।

'আমার মাথা ধরেছে সুজন, আলো সহ্য হচ্ছে না। আমার জন্য এনেছ? লক্ষ্মীটি···আমরা দুজনেই খাব, তুমি আগে নাও···বেশ লাগবে···কেমন?'

'না, আমি খাব না। রাতে তুমি খাও আজকাল?'

'না।'

'বেশ খেয়ো না। জোর নেই।'

রমলা দেবী বিছানা থেকে উঠে চেয়ারে এসে বসলেন, সুজন অন্য একটি হাতল-বিহীন লোহার চেয়ারে বসল।

'সুজন, আরাম কেদারায় শুয়ে পড়। শোবে না?···আচ্ছা, আমি শুয়ে পড়ি। তুমি না হয় এইটাতে বোসো, গদি আছে···। কত রাত কে জানে? তোমার আত্মীয় আসেন নি? কখন আসবেন?'

'এলেন বলে। কেন?'

রমলা দেবী হেসে ফেল্লেন, 'আচ্ছা গো আচ্ছা, অত চেঁচিয়ে কথা কয়ে সাধু সাজতে হবে না···চুপ করে বসে থাক, না হয়···'

'আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

'তার চেয়ে আমিই যাই—কেমন?'

'যা ইচ্ছে।'

'আমি যাব না। ঐখানে বসে থাক। চুপ করতে জান না, কথা, আর কথা, কেবল কথা···থাক নীরবে।'

নীরবে সঙ্গোপনে···মোটর থামবার আওয়াজ হোলো, গ্যারেজের চাবি বন্ধ হোলো···'কি হে সুজন, শুয়ে পড়েছ? বড় খাটিয়েছে আজ, বুঝেছ হে! রাতে পোড়ো না বাবা, সোনামুখে কালি পড়বে, বুঝেছ···' অক্ষয় খট খট করে ওপরে চলে গেল···

'যার কেহ নাই তুমি আছ তার...ঘুমোও সুজন, সোনামুখে কালি পড়বে বাবা।' রমলা দেবীর মুখে হাসি ঝল্‌কে ওঠে।

অনেক রাত হয়েছে, কুলপী বরফ হেঁকে চলে গেল, দূরে শেষ ডাকের জন্য সুজন অপেক্ষা করে···সহরের কোলাহল থামল বরফ্‌-এর হসন্তে, কোলকাতায় বরোফ্‌ উচ্চারণ করে ভাঙ্গাগলায় মেদিনীপুরের লোকেরা, ও-কার বেশ গোলগাল মোমের পুতুলের গালের মতন···রমলা দেবীর চিবুক সুদৃঢ়, বিষম চতুর্ভুর্জ। সুজন চোখ ফিরিয়ে নিলে···এবার থিতিয়েছে, নগরে নিশীথিনী নামল; ঘরের ছেলে ঘরে এল, মুখর কলরব মূক মুহূর্তে মিশল···। রমলা দেবী ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলো নিভিয়ে দিই? আমি ঈজী চেয়ারেই শোব, তুমি বিছানায়।···তোমার শালটা দেবে? কেমন শীত শীত করছে।' যন্ত্রের মতন সুজন আজ্ঞা বহন করে,

আলো নেভায় না, রমলা দেবীও ওঠেন না, বলেন, 'তোমার আত্মীয়টি কেমন লোক, সুজন ?'

'কেন ?'

'না, তাই বলছি, গলার আওয়াজটা কেমন কেমন একটু জড়ানো মনে হোলো। বেচারী···একলা থাকে, কোন দোষ নেই। ঘরে যদি আসতেন!' ওপরের ঘর থেকে আবৃত্তির সুরে কে যেন বলছে,—যার কেহ নাই তুমি আছ তার। রমলা দেবী হঠাৎ শিউরে উঠলেন,·· ছেদ পড়ে গেল।

রমলা দেবী ঈজী চেয়ারে শাল জড়িয়ে শুয়েছেন, লাল শাল, কোণের কল্‌কা বুকের ওপর, বাঁ হাতে চোখ ঢাকা, নীচের ঠোঁট দেখা যাচ্ছে, সামান্য একটু মোটা, গলার হার একপাশে ঝুলে পড়েছে, কালো লকেট্ দোলে, স্বস্তিকা, বুক ওঠে নামে, অতি ধীরে, নিরীক্ষণ করলে চোখে পড়ে, একটা চুল গালের ওপর শুয়েছে। লাল শাল, আলোয় মনে হয় কমলা লেবুর রং, রেখা ও ঘনতার আদেশ পালনের সুযোগে কৃতজ্ঞ হয়ে দেহের ওপর লুটিয়ে পড়েছে, দুটো পা-ই একটা হাতলের ওপর, শালে মোড়া, গোড়ালির একটুখানি দেখা যায়, গিনীপিগ···কাটা দাগ রয়েছে···। একটু জোরে শিষ্ টেনে রমলা দেবী অন্য পাশে ঘাড় ফেরালেন, ঘুমন্ত চুলটি জেগে উঠল, জাগন্ত চুল ঘুমুল। সুজন একটি সিগারেট নিলে, জানলার বাইরে হাত বার করে দেশলাই জ্বালাতে চেষ্টা করলে, দেশী, ধরল না, দুটি, তিনটে···কিছুই পারে না সে···রমলা দেবীকে বোঝে না, মাসীমাকে মনে হয় যেন বোঝে, দেশী গিন্নী, কিছুতেই এঁকে আমল দিতে পারেন না মাসীমা, আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ, স্বার্থে, অধিকারে ঘা পড়েছে। কি যে হবে! জানালার পাশে সুজন দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ, যা হয় হবে—কিছুই ভাবতে ইচ্ছে হয় না, মনের কাজ বন্ধ। আকাশে বাতাসে কোনো চঞ্চলতা নেই, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এল। রাস্তার আলো সম্মুখের বাড়ির কাচের জানালায় প্রতিহত হয়ে ঘরের মধ্যে আসতে চায়, কিন্তু ঘরের আলো বাধা দেয় তার প্রবেশে, তার প্রকাশে। সিগারেট ধরান হয় নি, দেয়াশালাই জ্বাললে শব্দ হবে···ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ঘুমুন, গভীর ভাবে, শান্তি আসুক তাঁর মনে। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, পা টিপে এসে সুজন সন্তর্পণে সুইচ্ বন্ধ করলে, শব্দ হোলো না···অন্ধকার···সুজন খাটে বসল···সত্যই শক্ত··· জাপানীরা কাঠের বলিশ মাথায় দেয়, দেহকে তারা বশে এনেছে, দেহের আবার

চাহিদা কি ? তার নেই, খগেন বাবুর নেই···রমলা দেবীর ? সুজন জানে না, যে শুয়ে আছে সে রমলা দেবী নয়, রমাদি, বৌদি ! তুহীনতরঙ্গস্রোত, পাইথন্···। খগেন বাবু কাশী এলেই রমলা দেবী গ্রাস করে ফেলবেন, গ্রাসের পূর্ব্বে আদর যত্নের লালা ক্ষরণ হবে···তখন ? তখন আর কি ! সুজনের নিজের মনোভাব হওয়া চাই বৈজ্ঞানিকের—তখন খগেন বাবুর গ্রস্ত হওটাই তথ্য হবে, ভালমন্দের বিচারক সে নয়। তখন রমাদিকে পাওয়া যাবে না, এই। মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে তবু। বিজন কি ভাববে ? নিশ্চয়ই চট্‌বে। তার নতুন মতবাদে প্রেমের স্থান কি নেই ? সে আধুনিক হতে চাইছে, তার রমাদিকে যদি খগেন বাবু স্ত্রীভাবেও গ্রহণ করেন, তবু বিজনের আপত্তি থাকা উচিত নয়। রমলা দেবীর স্বামী মোকদ্দমা করবেন ? হিন্দু-বিবাহে মুক্তি নেই—বন্ধন তার আমরণ। কি হবে ? কালবোশেখীর আগমনের মতন ভবিষ্যৎ থম্ থম্ করে।

"দিনের সাধনা, রাতের বাসনা···" কার লেখা ? খগেন বাবুর রমলা দেবীকে লেখা চিঠিতে আছে···বাকিটা কি ? মনে পড়ছে না। "রাতের বাসনা" কেন লিখলেন ? কিসের বাসনা ? বাসনা ত তীব্র হবে। তা নয়, বাসনা বোধ হয় একটা সাধারণ ইচ্ছা মাত্র, বৈদেহী, হাওয়ার মতন সর্ব্বত্র ছড়ান, অস্তিত্বের অপ্রমাণে অচেতন, নিশ্চেষ্ট। সামান্য একটু চাঞ্চল্য থাকে বা। খগেন বাবুর দেহ কি ছিল না ? কখনও কি মেদ মজ্জা রক্ত মাংস তাঁকে বিরক্ত পীড়িত করে নি ? 'বাসনা' লিখলেন কেন ? 'সাধনা'র সঙ্গে মিলের খাতিরে ? সাধারণ কবিদের মতন ? বাকি লাইনটা মনে আসছে না—অস্বোয়াস্তি হয়। ডায়েরীতে আছে, চিঠিতে নয়। ডায়েরীর রচনা-ভঙ্গীতে কোনো সাহিত্যিক কৃত্রিমতা ছিল বলে ত মনে হয়নি···সহজ ছিল তার গতি, কালো ফিঙের মতন, সব লাইনটা মনে পড়লে বোঝা যেত 'রাতের বাসনা' সাহিত্যিক বাসনা, না সত্যকারের। রমা দেবীর নিশ্চয় মনে আছে, কতবার পড়েছেন। নিঃশ্বাস পড়ল জোরে—ফোঁস করে, দীর্ঘশ্বাসে কি বেদনা ব্যক্ত হয় ? কি চাওয়ার প্রকাশ হয় ? সমাজের সঙ্গে যুদ্ধপর্ব্বের এই ত সুরু। হয়ত বা মাসীমাকে রাজি করান যেত, মুকুন্দটা মাটি করলে। নিশ্চয়ই মাসীমার কাছে যা-তা বলেছে, মুকুন্দ পছন্দ করত না রমা দেবীকে, তাঁর কেতাদুরস্ত বেয়ারা চিন্তামণিকে। খুবই স্বাভাবিক কিন্তু···

'সুজন'।

'কি ? কষ্ট হচ্ছে ?'

'না। তুমি ঘুমোবে না ?'

'ঘুম আসছে না।'

'ঘুম কখনও আসে!' শব্দে কতদিনের সঞ্চিত বেদনা, সহানুভূতির কত মধুর প্রতিদান।

'এই বার শোব যে! তুমি না হয় এই খাটে ছড়িয়ে শোও। কম্বল পেতে দিই ?'

'না, তোমার বিছানায় শোব না। পরে, পরে তোমার কষ্ট হবে।'

'কেন ?'

'বোকা ছেলে!'

সুজন অনেকক্ষণ নীরব থাকার পর বলে, 'খগেন বাবু কি একবার লিখেছিলেন, তোমার মনে আছে ? গোড়ার কথা—দিনের সাধনা, রাতের বাসনা—তার পর ?'

' "দিনের আদর্শ, রাতের বাস্তব, আলোর বুদ্ধি, তমিস্রার দেহ—এই কি চিরন্তন বিরোধ ?" কি মনে হচ্ছে ?'

'তোমার স্মরণশক্তিকে নমস্কার জানাই।'

'কেন ? কি কারণে তোমার মনে হোলো ?'

'ভেসে এল—অকারণে ?'

'কি ভাবছিলে ?'

'অমনি। ভাবব বলে কেউ ভাবে ?'

'লাইনটার অর্থের সঙ্গে তোমার মন নিশ্চয়ই একসুরে বাঁধা ছিল।'

'হবে! অর্থ কি ?'

'অর্থ এই···না বলব না। তুমি ভয় পাবে।' রমলা দেবী উঠে বসলেন।

'বল'।

'বলব ? অর্থ—তাঁর আমাকে প্রয়োজন।'

'জানি'।

'জান না। যে-ভাবে জান সে-ভাবে নয়।'

'কিন্তু রমাদি···'

'কিন্তু কি ? কিন্তু নেই।'

'তাঁর ক্ষতি হবে।'

'বেণে—ধার্ম্মিক হলে কবে থেকে? না, ক্ষতি হবে না, তাঁর বিরোধ ঘুচবে। বেশীক্ষণ দোলায় তুললে গা গুলিয়ে ওঠে।'

রমলা দেবী সোজা হয়ে চেয়ারে বসেন। হাই ওঠে, তিনটি আঙ্গুল দিয়ে মুখ ঢাকেন, চমৎকার লাগে নিজেরই কাছে, গোড়াটি মোটা, ডগাটি সরু হয়ে এসেছে। রমলা দেবী নিজের আঙ্গুল দেখেন, লালচে মনে হয়, আগুনের শিখাত্রয়ী···। সুজন চোখ নামিয়ে নেয়।

'সুজন, আমার আঙ্গুল কেমন?'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি হবে? যাঁর উত্তরে তুমি খুসী হবে তাঁকে প্রশ্ন কোরো।'

রমলা দেবী গা এলিয়ে দেন, সুজন অন্য দিকে চায়।···

কোতোয়ালির ঘণ্টায় ছুটো বাজল। সুজন বল্লে, 'ছুটো'।

'ছু'টো'!

'কত রকমেরই না আছে!'

'কি?'

'কত রকমের ঘণ্টা কাশীতে শোনা যায়। তোমার ভাল লাগে না রমাদি? আমি সুর ধরতে পারি না, কিন্তু ঘণ্টা শুনে বুঝতে পারি কোন্ মন্দিরের।'

ঘণ্টাধ্বনি যবনিকা তোলে না—নামায়।

'সুজন, শোও। আলো নিভিয়ে দিই, এদিকের জানলা খুলি, আর কেউ দেখতে পাবে না, আমাকে।' রমলা দেবী হঠাৎ উঠে আলো নিভিয়ে দিলেন। 'শুয়ে পড়। কোনো ভয় নেই। মাত্র অস্বাভাবিক। এস, স্বাভাবিক করে দিই।' অন্ধকারে রমলা দেবীর আগমন অনুভূত হয়, তাঁর হাত সুজনের গা স্পর্শ করে— 'এই যে ভাই, শোও তুমি।' হঠাৎ সুজনের গালে হাত দিয়ে সেই হাতে চুমু খান, একটু শব্দ হয়।

'আলো জ্বালো, জ্বালো বল্‌ছি।' বলেই সুজন ধড়মড় করে গিয়ে নিজে আলো জ্বালে, রমলা দেবীর দিকে চাইতে পারে না, জানালার ধারে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রমলা দেবী ঈজী চেয়ারে এলিয়ে পড়েন, আরামের জন্য সাড়ির গিঁঠ আল্‌গা করেন।

'সুজন, শোবে না?' কোন উত্তর আসে না।

'সুজন, শোন। আমি আর পারছি না। তুমি কবে ওঁকে আনবে বল? আমি—আমি তোমাকে চাই না,…তুমি তাঁকে ভালবাস তাই তুমি আমার আপন। বুঝেছ?'

'বুঝেছি।'

'এস, গল্প কর। তুমি তাঁকে কবে প্রথম দেখলে?'

'আমার মনে নেই। তুমি বল।'

'আমি? গানের আসরে। একজন নামজাদা গায়িকার গান হচ্ছিল। আমার ভাল লাগছিল না। অথচ সমাজ তাকে নিয়ে পাগল। সকলের কেমন লাগছিল জানি না, তবে মেয়েরা সব হুলছিল, পুরুষে মাথা নাড়ছিল, জুতো ঠুকে তাল দিচ্ছিল। আর, থামবার পর কী প্রশংসা, কী হাততালি! কেবল, উনি বসেছিলেন একটি সোফায়, মুখ বুজে। বুঝলাম, ভাল লাগেনি। হঠাৎ, আমার দিকে চাইলেন। আমি অনেকক্ষণ দেখেছিলাম। চোখোচোখি হোলো। মনে হোলো, আমরা আলাদা।'

'দুজনের একই জিনিষ ভাল লাগলে শুনেছি ঐ সব হয়। এ দেখছি না ভাল লাগার বন্ধন!'

'তারপর, সাবিত্রীর সঙ্গে আলাপ করি।'

'নিজে?'

'সেধে।'

'তাঁর তোমাকে কেমন লাগত?'

'কার?'

'খগেন বাবুর?'

'বোধ হয়, ভালই লাগত। না হলে, চটতেন কেন সাবিত্রীর ওপর, আমার সঙ্গে মিশলে? সে ত আত্মরক্ষা!'

'আর তাঁকে আত্মরক্ষা করতে দেবে না?'

'না।' নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিজলী বাতি চমকে উঠল, বিদ্যুতের চাপ কমেছে। সুজন নিজের হাতে ছোট চাপড় মেরে বল্লে, 'এখানে একটু বেশী মশা।'

'অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে পাবে না।'

'তোমাকেই কামড়াবে।'

'তুমি মুড়ি দাও। দাঁড়াও, ভাল কবে ঢেকে দিচ্ছি।'

একটা চাদরে সুজনের দেহ আবৃত করতে করতে রমলা দেবী বল্লেন, 'সুজন, তুমি আমার নিতান্ত প্রিয়। তুমি আমাকে বাধা দিওনা, লক্ষ্মীটি।' রমলা দেবীর ঠোঁট সুজনের রগে ঠেকল···'লক্ষ্মীটি, মণিটি, ঘুমোও, আমিও ঘুমুই, কেমন? আমার কোন কষ্ট হবে না ঈজী চেয়ারে। অনুমতি দাও।'

'যাও'—খট্ করে সুইচ বন্ধ হোলো।

বিছানায় শুয়ে সুজন আপন গালে হাত দেয়। সারা মুখ তার গরম ঠেকে, কান যেন পুড়ে যাচ্ছে, চারপাশে আগুনের হল্‌কা। সিল্কের মতন মসৃণ, একটু পুরু। এক দৃষ্টিতে সে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে রূপগ্রহণ করে। প্রথমে অনির্দ্দিষ্ট ভ্রূণাকার···পরে, দেওয়ালের চূণকাম খসে গেল, কত কাল্পনিক জন্ম নিলে, আদিমযুগের জানোয়ার দীর্ঘাকৃতি, বলবান, ভারী, মোটা, পুরু···চলৎশক্তিহীন ম্যাষ্টাডন, ম্যামথ, লম্বা দাঁতঅলা বাঘ। কোথায় অদৃশ্য হোলো···। গাছের ওপর বানরের দল লাফালাফি দাপাদাপি করে···। গরম যায় কমে। ছাত থেকে বানর ঝোলে, লম্বা ল্যাজ ঢুলিয়ে, ধপাস করে পড়বে বুকের ওপর · এইবার, এইবার! সুজন ধড়মড় করে উঠে বসল। একটা মানুষের মতন জানোয়ার এল—কোমর ভেঙ্গে হাঁটে, কপাল আর মাথা এক, কি মোটা ভুরু, কি ভীষণ ঝোলা চিবুক, কি পুরু ঠোঁট! চোখের ওপর লম্বা হাতের তালু কার্নিশ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূরের কি একটা দেখে, অন্য হাতে মস্ত একটা পাথর। পাথর ছুঁড়ল, একটি মেয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে, ঝাঁকড়া তার চুল, বিজ্ঞাপনের ছবির মত বাঁকা পায়ে দাঁড়ায়। একই রকমের রেখাভঙ্গী, কোন বদল হয় নি, তিলমাত্রও না, অপরিবর্ত্তনীয়তার প্রতিমূর্ত্তি, না আছে অভিব্যক্তি, না আছে অগ্রস্থতি, না আছে প্রগতি—কেবল সাড়ি, ব্লাউজ, আর জুতো, দুচারটে গহনা, সব ভাসাভাসা ওপরকার···শক্তি জমাট বেঁধে রইল জড়ের আকার পরিগ্রহ করে। তাই, জীবন যাবে আসবে, থাকবে কেবল সঞ্চিতশক্তি জড়পিণ্ড, তারই প্রভাবে জীবন রুদ্ধ হবে। হবে! খগেন বাবুর পরিণতি নেই, অসম্ভব।

রমলা দেবী ঘুমুচ্ছেন কি না সুজনের জানবার বাসনা হয়। জড় তাই নির্জীবের

মতন ঘুম, শ্বাসপ্রশ্বাসরহিত, নিঃশব্দ, নীরবে, সঙ্গোপনে, অব্যর্থ সন্ধানে সুজন আসে আরাম কেদারার পাশে। জীবনের কোন প্রমাণ বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গায়িত হয় না। সুজন সচকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি হাত এসে সুজনের হাত ধরলে, 'বল, বল, আমাকে তাড়িয়ে দেবে না। এইখানে বোস, হাতলের ওপর।' হাতের ওপর হাত বুলিয়ে চলে, কাশফুলের হালকা পরশ।

'কষ্ট হচ্ছে সুজন?'

সুজন চেয়ারের হাতলের ওপর প্রস্তরমূর্ত্তির মতন বসে থাকে, জিভ আসে শুকিয়ে, চোখ জ্বলে। রমলা দেবীর একটি হাত তুলে সুজন আঙ্গুলগুলি আপন চোখে বোলায়, তারপর ঠোঁটে, তারপর হঠাৎ হাতের তেলো বুকে চেপে ধরে··· তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে যায়।

"ভোর ভৈঁ"—সানাই বেজে ওঠে, অতি কোমল রেখাব, শুদ্ধ গান্ধারে স্থায়ী হয় না, একেবারে মধ্যমে আশ্রয় নেয়, তার পর মধ্যম থেকে মীড় টেনে অতি কোমল রেখাবে অবরোহণ করে ··সুরে স্থিত হতে প্রাণ চায় না, ওঠে পঞ্চমে, আবার মধ্যম, আবার মীড় দিয়ে অতিকোমল রেখাব·· মধ্যকার গান্ধারের প্রয়োজন নেই, অথচ আছে, মধ্যম ও রেখাবের সম্বন্ধের জন্য যতটুকু···। কত পরে কোমল ধৈবত, কী মধুর! যেন অতিকোমল রেখাবের দোসর···লাগল বুঝি কোমল নিখাদ···না, না, লাগেনি, ফিরে এল মধ্যমে।···ভোর ভৈঁ···সব ক্লান্তি অপসৃত হয় ঐ মীড়ে, স্বরের পৃথক অস্তিত্ব নেই, তার সত্তা ভৈঁরোর আশ্রয়ে, সমগ্রের কৃপায়। প্রাণ উর্দ্ধমুখী হয় পঞ্চমের পর থেকে, কোমল ধৈবতেই, তীরের মতন ছোটে শুদ্ধ নিখাদে। সত্ত্বগুণের আধার এই সুর, ঋষির উদাত্ত কণ্ঠ-নিঃসৃত, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দান···জয় জয় শম্ভু বিশ্বনাথ···কাশীর মন্দিরে ভোর বেলা ভৈঁরো বাজে সানাইএ ··হে নিদ্রালু, কামপিষ্ট, বিক্ষুব্ধচিত্ত সংসারী শোন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ্যিবোধত···

'ওঠ ওঠ রমাদি, কাশীর প্রভাত—সুপ্রভাত—বেদমন্ত্র শুনবে চল। উপনয়নে যা উচ্চারণ করেছিলাম···'

'বিবাহ বাসরে যা বুঝিনি।'

'এবার বুঝবে, বুঝে উচ্চারণ করবে।'

'বাধা দেবে না ?'

'না'।

অন্ধকার ঘোলাটে হয়ে এল, কালো রঙে খানিকটা সাদা কে মিশিয়েছে যেন। জোয়ার ভাঁটার মধ্যকালীন নিথরতা, মৃত্যুর জড়তা নয়, সৃষ্টি-স্পন্দনের পূর্ব্বকার সন্দিগ্ধতা, ক্রমিক বিবর্ত্তনের আবর্ত্তে নিমজ্জিত হবার আশঙ্কায় রুদ্ধগতি প্রাণের আবেগ। কালস্রোতের আহ্বানে উদ্বিগ্ন এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এখন ধ্যানে বসলে যুক্ত হওয়া অসম্ভব সুজনের পক্ষে। তাই দিনানুদৈনিক কার্য্যাবলীর স্মরণ হয়। সুজন অলসকণ্ঠে বলে,—'বিজন চিঠি লিখেছে।'

'কি ?'

'তোমার মোটরটা ব্যবহার করতে চায়।'

'লিখে দাও। নিজে যেন না চালায়। পরে নিজেই লিখব তাকে। আর কিছু লিখেছে ?'

'ম্যাচ জিতেছে।'

'জিতুক। আর কি ?'

'নতুন খেয়ালে পেয়েছে।'

'মন্দ কি !'

'লিখেছে, সে সোশিয়ালিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।'

'গোলমালে পড়বে না ত ?'

'আমারও তাই ভয় হয়। নিজেকে সামলাতে পারবেনা, অভ্যাস নেই।'

'কতদিন সামলে রাখবে ? এই যে বল্লে বাধা দেবে না !'

'সে তোমাকে।'

'তার বেলায়ও বাধা দিও না।'

'মাপ কর, সে আমি পারব না। মামাকে খুলে লিখি। না হয় এখানেই চলে আসুক।'

'এখানে! কোথায় ? কার কাছে ? কাশী পালিয়ে আসবার সময় হয়নি।'

'তোমার কি তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না ?'

'দেখতে ? কি প্রয়োজন ?'

'চোখে ঠুলি দিয়েছ তুমি। বোধ হয়, তাই হয়। না, রমাদি, সে এখানে আসুক।'

'আসুক তবে। কিন্তু আমার কাছে থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'ভাল লাগবে না, কারুরই।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'সুজন আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে না? চল ঘাটে যাই। বাড়ি খুঁজবে না?'

'একটু বোসো। এখনও ফরসা হয়নি।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রমলা দেবীকে নিয়ে সুজন ঘাটের দিকে চলল। 'তুমি বসো এখানে। আশা করি ফিরতে আমার দেরী হবে না।' সুজন বাড়ি খুঁজতে গেল।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাসলীলা

ভাসে রাস

'রাসের বিবরণে শ্রীরাধা কবে প্রবেশ করিলেন ?'—গতমাসের 'পরিচয়ে' আমরা এ প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, যদিও মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, এমন কি ভাগবতেও শ্রীরাধার নামগন্ধ নাই, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও পদ্মপুরাণোক্ত রাসের বিবরণে শ্রীরাধার বিশিষ্ট স্থান। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, ঐ দুই পুরাণের বিবরণ কাম-সঙ্কুল—ঐ বিবরণদ্বয়ে কামায়ন চক্রবৃদ্ধি-প্রাপ্ত। এক কথায়, সেখানে উত্তুঙ্গ অনঙ্গ-রঙ্গ— Carnival of lust. কিন্তু পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থসমূহেও রাসের বর্ণনা ঐরূপ 'তারা'য় না উঠিলেও, কি হরিবংশ কি ব্রহ্মপুরাণ কি বিষ্ণুপুরাণ কি ভাগবত— রাসের সকল বিবরণই অল্পবিস্তর কামবহুল।

ঐ সকল কামসংকুল বিবরণে ক্ষুভিত হইয়া আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধোক্ত ইংরাজি ভূমিকায় 'রাস কামক্রীড়া নহে—রাস ইতিহাস নয়, রাস আধ্যাত্মিক রূপক' এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া ৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়া ছিলাম ঃ—

The account of Rasa is not historically true but contains (even in the Haribansha) an admixure of spiritual allegory, which afterwards reached its efflorescence in the Bhagabata and the Brahma-vaibarta Purana.

It is quite possible that in the same way as the boy-God frolicked and played with his youthful companions, the boys of Brindaban, He sported and danced with the girls there. Everybody, whether young or old, felt attracted by His charms which were simply irresistible and it is small wonder that the girls of Brindaban should be impelled to seek His company and take part in the songs and dances organised by Him or that they should disregard the warning of their guardians and come out to join with him. This was, I believe, the historical basis of the Rasa and nothing more.

রাসের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ঐরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও, সেই সন্দেহের সমর্থন জন্য সে সময় কোন সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত ছিল না। পরে সে প্রমাণ হস্তগত হইয়াছে—সে প্রমাণ ভাস কবির 'বালচরিত' নাটকে বর্ণিত রাস।

কালিদাসের প্রথম নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' ভাস কবির উল্লেখ আছে—প্রস্তাবনায় পারিপার্শ্বিক সূত্রধরকে (Stage Managerকে) বলিতেছে, 'ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং' উৎকৃষ্ট নাটক সত্ত্বে কে এই নবীন কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় দর্শন করিবে?' উত্তরে সূত্রধর বলিলেন—'দেখ! পুরাণম্ ইত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্—পুরাতন হইলেই উৎকৃষ্ট হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই—সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে—সুধী ব্যক্তি পরীক্ষান্তে তবে ভাল মন্দ নির্ণয় করেন।' সে যাহা হ'ক, ইহা হইতে জানিলাম কালিদাসের যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপর চতুর্থ শতকের শেষভাগে ভাস 'পুরাণ' নাট্যকার বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু ইদানীং তাঁহার নাটক বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার কোন পরিচয়ই জানিবার উপায় ছিল না। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের দক্ষিণপ্রান্তে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজকীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ (curator) পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী কীটদষ্ট পুঁথিস্তূপের মধ্যে ভাসরচিত কয়েকখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইয়া ঐ গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করেন। ঐ প্রকাশিত নাটকের অন্যতম 'বালচরিতম্'। 'বালচরিতম্' নাটকে জন্ম হইতে কংসবধ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

দেখা যায়, ভাস শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁহার নাটকে শ্রীকৃষ্ণের নাম 'দামোদর' এবং বলরামের নাম 'সঙ্কর্ষণ'। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর শঙ্খচক্র-গদাধনুঃ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে কংসভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিল, কবি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

বালচরিতে আরও দেখি কংসবধের পর নারদ শ্রীকৃষ্ণকে 'নারায়ণ! নমস্তেঽস্তু' বলিয়া প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—

> কংসে প্রমথিতে বিষ্ণোঃ পূজার্থং দেবশাসনাৎ।
> সগন্ধর্ব্বাপ্সরোভিশ্চ দেবলোকাদিহাগতঃ॥

এই নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা—পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, উদূখলে বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঙ্গ, ধেনুক-কেশী-অরিষ্ট বধ এবং কালীয়দমনের প্রসঙ্গ আছে। তৃতীয় অঙ্কে দেখিতে পাই, দামক তাহার মাতুল এক বৃদ্ধ গোপালকে বলিতেছে—

মাদুল! অজ্জ ভট্টিদামোদল ইমষ্‌ষিং কুন্দাবণে গোবকণ্ণকআহি ষহ হল্লীষকং নাম প্রকিলিদুম্ আঅচ্ছদি (মাতুল! অদ্য ভর্ত্তৃদামোদরঃ অস্মিন্ বৃন্দাবনে গোপকন্যকাভিঃ সহ হল্লীষকং নাম প্রক্রীড়িতুম্ আগচ্ছতি)—'অদ্য ভর্ত্তা দামোদর

এই বৃন্দাবনে গোপকন্যাদিগের সহিত হল্লীষক ক্রীড়া করিতে আসিতেছেন।' শুনিয়া বৃদ্ধ গোপ বলিল "ভাল ভাল! সমস্ত গোপগণের সহিত ভর্ত্তা দামোদরের হল্লীষক দেখিব। (তেণ হি ষব্বেহি গোবজণেহি ষহ ভট্টিদামোদলষ্‌ষ হল্লীষঅং পেক্‌খম্ম)।

তখন সেই বৃদ্ধ গোপাল গোপকন্যাদিগকে আহ্বান করিল, "ওগো গোপকন্যকা! ঘোষসুন্দরি। বনমালে। চন্দ্ররেখে। মৃগাক্ষি! আঅচ্ছহ আঅচ্ছহ ষিগ্ঘং। শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো।" গোপকন্যারা আসিলে বৃদ্ধ গোপাল বলিল—"দারিকাগণ! ভর্ত্তা দামোদর দুগ্ধশ্বেত ভর্ত্তা সঙ্কর্ষণের সহিত গোপবালকে পরিবৃত হইয়া ঐ যে আসিতেছেন।" (দারিকাঃ! এষ ভর্ত্তা দামোদরঃ গোক্ষীর-পাণ্ডুরেণ ভ্রাত্রা সঙ্কর্ষণেন সহ গোপালকৈশ্চ পরিবৃতঃ গুহানিক্ষিপ্তঃ সিংহ ইব ইত এবাগচ্ছতি।) *

তখন গোপজন-পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন— ততঃ প্রবিশতি গোপজন-পরিবৃতো দামোদরঃ সঙ্কর্ষণশ্চ। শ্রীকৃষ্ণ গোপকন্যকা-দিগের রমণীয় বেশভূষা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—

—অহো! প্রকৃত্যা রমণীয়ানাং গোপকন্যকানাং বেশগ্রহণ-বিশেষঃ—কারণ, তাহারা হল্লীষ-ক্রীড়ার জন্য বিচিত্র বসনে ও বন্য কুসুমে সজ্জিত হইয়াছিল। বলরাম বলিলেন—এই যে গোপদারকগণও উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধ গোপালক বলিল 'হাঁ প্রভু! সকলেই সজ্জিত হইয়াছে—সর্ব্বে সন্নদ্ধা আগতাঃ'। শ্রীকৃষ্ণ গোপকন্যকাদিগকে বলিলেন—ঘোষবাসস্য অনুরূপোঽয়ং হল্লীষক-নৃত্যবন্ধ উপযুজ্যতাম্—"পল্লীবাসের উপযোগী (অর্থাৎ pastoral) এই হল্লীষক নৃত্যবন্ধের জন্য প্রস্তুত হও'। বলরাম গোপদিগকে আজ্ঞা করিলেন—বাদ্যন্তাম্ আতোদ্যানি—মাদল † বাজাও। তখন মাদল বাদিত হইলে 'সর্ব্বে নৃত্যন্তি'—দারক-দারিকারা কৃষ্ণ-বলরামের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ গোপাল বলিতে লাগিল "সুন্দর গীত, সুন্দর বাদ্য, সুন্দর নৃত্য—হী হী সুষ্ঠু গীতং সুষ্ঠু বাদিতম্ সুষ্ঠু নর্ত্তিতম্"—এবং সেও সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিল। "জাব অহং বি নচ্চেমি"।

---

* পাঠকের বোধসৌকর্য্যের জন্য নাটকের উদ্ধৃত প্রাকৃত অংশগুলি সংস্কৃত আকারে দিলাম।

† 'আতোদ্য' শব্দের সাধারণ অর্থ বাদ্য। মুরজ (মাদল) তাহার অন্যতম। এখানে আতোদ্য শব্দ দ্বারা মাদল লক্ষিত হইয়াছে, কারণ, বৃদ্ধগোপালের মুখে আমরা শুনি 'পটহরূপবেশাঃ'। পটহ অর্থে ঢক্কা।

এমন সময় এক গোপালক আসিয়া সংবাদ দিল বৃষভরূপী অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ফলে ঐখানেই হল্লীষক বিশ্রান্ত হইল। ইহাই রাসনৃত্য।

এ নৃত্য (যাহার প্রাচীন নাম হল্লীষ) অনেকটা য়ুরোপে মধ্যযুগে প্রচলিত Maypole Dance-এর মত। ইহা বালক বালিকার সহিত নৃত্য। ইহাতে কামের নামগন্ধ নাই—চুম্বন নাই, আলিঙ্গন নাই, কুচমর্দ্দন নাই, রমণ নাই। আমার ধারণা ইহাই ঐতিহাসিক রাস, Historical হল্লীষ—বাকিটা Spiritual Allegory—আধ্যাত্মিক রূপক।

ভাস কতদিনের লোক? গণপতি শাস্ত্রীর মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন—সম্ভবতঃ তিনি কৌটিল্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্যদিগের অনেকে ভাসকে খৃষ্টপর তৃতীয় শতকের লোক মনে করেন এবং ভাসের নামে প্রচলিত সকল নাটককে ভাস-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না। * এ বাদ-বিবাদের গহণে এ ক্ষেত্রে প্রবেশ করা অনাবশ্যক। বালচরিতম্ যখনই রচিত হউক এবং যাঁহারই রচনা হউক, ঐ নাটক রচনার সময়

* If Prof Luders and Dr. Marshall are right that Kanishka and Asvaghosha belong to the 2nd C. A. D., it is hardly possible to date Bhasa before the 3rd or 4th.—Sten Konow in the Indian Antiquary of 1914.

As to Bhasa's date, nothing seems to be known except that he was anterior to Kalidasa; but Kalidasa is put by the European scholars, e. g. Macdonell (in his History of Sanskrit Literature, P. 325), in the beginning of the fifth century A. D. and hence Bhasa can well be put in the 3rd C. A. D.—Sir Vincent Smith in the Indian Antiquary of 1911.

Tha ascription of the authorship of some of the plays to Bhasa is doubted by Barnett in the Journal of the Royal Asiatic Society, 1919, pp 233-34—"The group of plays published by Pāndit Ganapati Sastri in Nos. 15—17, 20—2, 26, 39 and 42 of the Trivandrum Sanskrit Series is now doubtless familiar to most Sanskritists; but few, I suspect, will agree with the learned editor's ascription of them to Bhasa, for which he adduces no evidence of the least cogency."

কিন্তু পাশ্চাত্যেরা যে যাহা বলুন, আমার দৃঢ় ধারণা ভাস-কবি খৃষ্টপূর্ব্ববর্ত্তী এবং এই বাল-চরিতং নাটক তাঁহারই রচনা। আমরা দেখিয়াছি যে প্রথম শতকে সঙ্কলিত 'হাল সপ্তশতী'তে

রাসক্রীড়া কামবর্জ্জিত নির্দ্দোষ হল্লীষ মাত্র ছিল—গোপদারক ও গোপদারিকা-গণের শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া 'করি হাত ধরাধরি' চক্রাকারে নৃত্যমাত্র ছিল। আমি বলিতে চাই এই হল্লীষ, এই Pastoral sportive Danceই ঐতিহাসিক রাস।

এখানে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন উঠিবে যে, ভাসের বালচরিতে বর্ণিত রাসের বিবরণ যখন ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, এমন কি হরিবংশেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, তবে কি এই সকল পুরাণ-গ্রন্থ ভাসের পরে রচিত হইয়াছিল? এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ, প্রাচীন ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে—এমন কি অথর্ব্ব-বেদেও পুরাণের নাম দৃষ্ট হয়।

> ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ—অথর্ব্ব বেদ, ১১।৭।২৪
>
> পুরাণং বেদঃ সোঽয়ম্ ইতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত—শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩
>
> ইতিহাসঃ পুরাণং—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।১০
>
> ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্—ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।১।১

'পুরাণার্থবিশারদ' মহর্ষি বেদব্যাস তদানীং প্রচলিত ঐ 'পুরাণ' আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্প সংগ্রহ করিয়া পুরাণসংহিতা নামে এক সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

> আখ্যানৈশ্চাপুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
>
> পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

মহামুনি ব্যাস ঐ পুরাণসংহিতা স্বশিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন—

> পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ।

তৎশিষ্য কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংসপায়ন সেই মূল সহিতার উপর তিনখানি উপসংহিতা প্রস্তুত করেন।

> কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংসপায়নঃ।
>
> লৌমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৯

কৃষ্ণের সহিত রাধার যোগ আছে, কিন্তু ভাসে রাধা ত' নাইই—অধিকন্তু রাস কামহীন হল্লীষ-ক্রীড়া। অতএব ভাস নিশ্চয়ই খৃষ্ট-পূর্ব্ব যুগের লোক।

ভাস শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বে পূর্ণ বিশ্বাসী। যাঁহারা মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণে ক্রাইষ্টের অনু-করণে অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা হইতে ভাসকে নিশ্চয়ই খৃষ্ট-পরবর্ত্তী বলিবেন। আমার 'অবতারতত্ত্ব' গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে আমি সবিস্তারে প্রদর্শন করিয়াছি যে, বেস নগরে আবিষ্কৃত খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের এক শিলালিপিতে বাসুদেবকে—'দেবদেব' বলা হইয়াছে,—এমন কি, খৃষ্টের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনিসূত্রেও বাসুদেব 'ভগবান্' বলিয়া পূজিত। অতএব ঐ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ভাসকে খৃষ্টপরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত করা একেবারেই অসঙ্গত।

এই চারিখানি সংহিতাই ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণের ভিত্তি। এ ভাবে বেদব্যাসকে অষ্টাদশ পুরাণের বক্তা বলা অসঙ্গত নয়।

অষ্টাদশপুরাণানাং বক্তা সত্যবতীসুতঃ।

অর্থাৎ আদিতে পুরাণ এক ছিল—পরে অষ্টাদশ হইয়াছিল—

পুরাণম্ একমেবাসীৎ তদা কল্পন্তরেহনঘ!—মৎস্যপুরাণ, ৫৩।৪

পুনশ্চ প্রশ্ন উঠিবে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে ঐ অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল কি না? নিশ্চয়ই ছিল—কারণ, আমরা দেখিতে পাই আপস্তম্ভ ধর্ম্মসূত্রে পুরাণ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরতি

অষ্টাশত সহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ ইত্যাদি—আপস্তম্ভ, ২।২৩।৩-৪

ঐ দুই শ্লোক কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে অধুনা-প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণে, মৎস্য-পুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায়।

আপস্তম্ভ-ধর্ম্মসূত্রের আর এক স্থলে নাম করিয়া ভবিষ্যপুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

আভূতসংপ্লবাৎ তে স্বর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তি ইতি ভবিষ্যৎপুরাণে

—আপস্তম্ভ ধর্ম্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আপস্তম্ভ কতদিনের লোক? প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বুলহার সাহেব বলেন আপস্তম্ভ খুব সম্ভব পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী (পাণিনি খৃঃ পূর্ব্ব অষ্টম শতকে জন্মিয়াছিলেন) —অধস্তন পক্ষে তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের লোক।*

পাণিনির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে—কিন্তু তিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা একরূপ নিঃসংশয়। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র রচনা করেন তখনও নির্ব্বাণ শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা আরণ্যক-গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই:—

'অরণ্যাং মনুষ্যে'—অরণ্য শব্দের উত্তর 'ঞিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্য-বাচক 'আরণ্যক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

---

* Apastambha cannot be placed later than the 3rd century B. C.
—Bulher's Introduction. p. cvi. (Sacred Books of the East Series)
He must have lived earlier than Panini or before Panini's grammar had acquired general fame throughout India. —Ibid

'নির্ব্বাণোঽবাতে'—নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ নির্ব্বাত (বায়ুশূন্য) স্থান।

আর এক কথা। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, কয়েকখানি পুরাণ নিজ নিজ সঙ্কলন-কাল স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন—অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ সম্প্রতি ভারতবর্ষের সম্রাট্।

> অভিমন্যোঃ উত্তরায়াং···পরীক্ষিৎ জজ্ঞে যোঽয়ং সাম্প্রতং এতৎ ভূমণ্ডলম্ অখণ্ডায়তি ধর্ম্মেন পালয়তীতি। —বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২০।১২-৩

গরুড় পুরাণ বলেন জনমেজয়ই বর্ত্তমান রাজা এবং তাঁহার উত্তর ভবিষ্য-রাজবংশ কীর্ত্তন করেন।

> সুহোত্রাণিরমিত্রশ্চ পরীক্ষিৎ অভিমন্যুজঃ।
> জনমেজয়স্য চ সুতো ভবিষ্যাশ্চ নৃপান্ শৃণু॥—গরুড় পুরাণ, ১৪৪।৪২

মৎস্যপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন যে, অধিসীমকৃষ্ণ (ইনি জনমেজয়ের প্রপৌত্র) 'সাম্প্রতং যো মহাযশা'।

> অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্য বীর্য্যবান্।
> যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।
> তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রং তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং॥—মৎস্যপুরাণ, ৫০।৬৬-৬৭

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টজন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ পুরাণের অন্ততঃ কয়েকখানি বিদ্যমান ছিল। অতএব সকল পুরাণ যে ভাসের পরবর্ত্তী—এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

অবশ্য একথা অস্বীকার করিনা যে, খৃষ্ট যুগের পরে ঐ সকল পুরাণের নূতন সংস্করণ প্রণীত হইয়াছিল। ঐ new redactionএ অনেক পুরাতন জিনিষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অনেক অভিনব বিষয় সংযুক্ত হইয়াছিল। এই নূতন সংস্করণের পুরাণই ইদানীং প্রচলিত। এখন আমরা হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত যে আকারে প্রাপ্ত হই, তাহা সেই সেই গ্রন্থের প্রোক্ত নূতন সংস্করণ। আমার নিজের বিশ্বাস, এই সকল নূতন সংস্করণ ভাসের পরবর্ত্তী। ভাস খৃষ্টপূর্ব্ব যুগে যখন 'বালচরিতম্' রচনা করেন, তখন রাস গোপদারক ও গোপদারিকার সহিত চক্রাকারে নৃত্য 'হল্লীষ' মাত্রই ছিল। ভাসের পরবর্ত্তী কালেই ঐ 'হল্লীষ' কাম-সঙ্কুল রাসে পরিণত হইয়াছে—যাহার বিবরণ আমরা প্রচলিত হরিবংশ, ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতাদিতে দেখিতে পাইতেছি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন, গোলোকে রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাস। একদা গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণ লোক ও লোকপাল সমুহ সৃষ্টি করিয়া দেবগণের সহিত সুরম্য রাসমণ্ডলে গমন করিলেন—

এতান্ সৃষ্ট্বা জগামাসৌ সুরম্যং রাসমণ্ডলম্ ।
এতৈঃ সমেতো ভগবান্ অতীবকমনীয়কম্ ॥

তিনি রাসমণ্ডলে উপবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে এক অপরূপা কন্যার আবির্ভাব হইল—

আবির্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ ।

ইনিই শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের 'প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী'।

ইনি আবির্ভূর্তা হইয়াই কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার সহিত একাসনে বসিলেন এবং হাস্যমুখে প্রাণনাথের মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে যুগল মিলন হইল।

সা চ সম্ভাষ্য গোবিন্দং রত্নসিংহাসনে বরে।
উবাস সস্মিতা ভর্ত্তুঃ পশ্যন্তী মুখপঙ্কজম্ ॥

ইহা একমেবাদ্বিতীয়ের পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে দ্বিধা-ভবন-বিষয়ক রূপক—ঐ পুরুষ-প্রকৃতি চিরালিঙ্গনে আলিঙ্গিত—সংযত্তমেতৎ ক্ষরম্ অক্ষরঞ্চ—ইহাই হরগৌরীর অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি; ইহার সহিত কিন্তু ভৌম রাসের বিরল সম্পর্ক।

কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতে ঐ নিত্য রাসের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। তিনি বলেন, প্রকৃতির পরপারে যে পরব্যোম তাহার উপরিভাগে নিত্য গোলোকধামে দ্বিভুজ মূরলীধর শ্রীকৃষ্ণ গোপগোপীর সহিত্য নিত্য বিলাস করিতেছেন—

প্রকৃতির পার পরব্যোম নাম ধাম
কৃষ্ণ-বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্।
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম।
চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ
গোপগোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।

—আদিলীলা, পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কবিরাজ গোস্বামী আরও বলেন, শুধু রাসলীলা কেন, অপ্রপঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাই নিত্য—প্রপঞ্চে সেই সকল লীলার প্রকট হয় মাত্র।

পূতনা-বধ আদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন।
এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার।
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ডে কিশোরতা প্রাপ্তি
রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি।
... ...
অলাত চক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে।
অতএব গোলক স্থানে নিত্য বিহার
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার।

—মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ কথা। রাস যদি ইতিহাস না হয়, রাস যদি বস্তুতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন-ঘটিত আধ্যাত্মিক রূপকই হয়—তবে ইহার মধ্যে কামদেবের এত অবাধ গতি কেন? ইহাতে কামায়নের (Erotic elements-এর) এত প্রাচুর্য্য কেন? আগামী বারে 'রাসের রূপকতা' প্রতিপন্ন করিতে আমরা এ সকল প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বর্ত্তমান কালে কুলাবা জেলা ও আলিবাগ শহর নিতান্ত নগণ্য ক্ষুদ্র স্থান হলেও চিরদিন তা ছিল না। আমার মতন মানুষ, যে অতীতের মাঝে বাস করে, অতীতের স্মৃতি নিয়ে দিন কাটায়, তার কাছে আনকোরা নূতন কুবেরপুরীর মূল্য কি! তাই আমার বিজাপুরও যেমন ভাল লেগেছিল, কোকনও তেমনি লাগল। যেন স্বপ্নরাজ্য! নূতন সাত-তলা ইমারত নেই, কিন্তু প্রকাণ্ড কালো কালো পুরানো কেল্লাগুলো আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, পয়সা-কড়ি নেই, কিন্তু অতীতের অক্ষয় স্মৃতি-সম্পদ আছে। মানুষের তৈরী লেডী-বাগিচা, চিড়িয়াখানা, বটানিকাল গার্ডেন নেই, কিন্তু প্রকৃতি তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সমুদ্র, পাহাড়, বন-জঙ্গল দিয়ে দেশটাকে সাজিয়েছেন। এমন সাজিয়েছেন যে কোথাও তার জোড়া পাওয়া ভার! আজই না হয় এখানে মানুষ নেই, কিন্তু একদিন এই বিরাট সুন্দর আবেষ্টনের উপযুক্ত মানুষও কত ছিল!

বোম্বাই পালোয়া বন্দরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণের পানে চাইলে ওপারে যে পাহাড় দেখা যায় সেইখানে আমার এলাকার আরম্ভ। পাহাড়ের প্রাচীন নাম দ্রোণগিরি। ওই পাহাড়ের গোড়ায় উরণ শহর, যার কথা পরে অনেক বলতে হবে। এই পাহাড়ের নাম দ্রোণগিরি কেন হল, সে সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম। গল্পটা প্রায় ভুলে গেছি। যতটুকু মনে আছে, তা এই। সেকালে অর্জ্জুনগুরু দ্রোণাচার্য্যের সঙ্গে দেবদ্বিজের শত্রু এক বিশালকায় রাক্ষসের যুদ্ধ বেধেছিল। রাক্ষস আকাশ থেকে যুদ্ধ করছিল, দ্রোণাচার্য্যের বাণে বিদ্ধ হয়ে এইখানে সমুদ্রতীরে পড়ে। তারই দেহ হতে এই পাহাড়ের উৎপত্তি। হয়ত আধুনিক পাঠক নজীর প্রমাণের অভাবে এই গল্প বিশ্বাস করবেন না।

তা, না করুন! কুলাবার প্রাচীনত্বের একেবারে অকাট্য প্রমাণ আছে। বোম্বাই-এর জাহাজ-ঘাটার ঠিক সামনাসামনি ঘারাপুরী বলে এক দ্বীপ আছে। সারা দ্বীপটা জুড়ে এক পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথার উপর বিখ্যাত হস্তীগুম্ফা

বা এলিফান্টা কেভ্‌স্‌। বিশাল এই গুহা, আর অপরূপ সুন্দর তার ভেতরের মূর্ত্তিগুলি! আপনারা অনেকেই এই এলিফান্টা দেখেছেন। যাঁরা দেখেন নেই, তাঁরা এর সম্বন্ধে কেতাব পড়েছেন। সুতরাং এখানে আবার তার বর্ণনা করা বাহুল্য হবে। শুধু এইটুকু বলি যে এই অনুপম গুহামন্দির তৈরী হয়েছিল প্রায় হাজার বছর আগে, যখন সারা বোম্বাই দ্বীপটাতে ঘর কতক জেলেদের বসতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই যে ঘারাপুরী দ্বীপ, এও ছিল আমার এলাকার সীমার মধ্যে। আমি যখনই একা বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গুহা দেখতে যেতাম, হাকীম মূর্ত্তিতেই যেতাম। এখন কথা হচ্ছে এই যে হাজার বছর আগে যাঁরা আস্ত পাহাড় কুঁদে এই আশ্চর্য্য গুহা ও মূর্ত্তি গড়েছিলেন, তাঁরা ত সামান্য মানুষ ছিলেন না। কুলাবা জেলার প্রাচীন সভ্যতার আর কি প্রমাণ চাই!

এ ত গেল হিন্দু যুগের কথা। মোগলদের আমলেও এ প্রদেশের গৌরব ক্ষুন্ন হয় নেই। ছত্রপতি শিবাজীর বিখ্যাত রায়গড় কেল্লা এই কুলাবা জেলারই দক্ষিণ প্রান্তে আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিবাজী মহারাজ ত পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গাতেই কেল্লা বেঁধেছিলেন, কিন্তু এই রায়গড়ই ছিল তাঁর রাজধানী। এইখানেই সেই মহাপুরুষের অভিষেক হয়েছিল, আর এইখানেই তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন। কত লোক সেই সমাধি দেখতে আজও যায়। স্বয়ং লাট উইলিংডন সেখানে গিয়ে সমাধি ঢাকবার এক বহুমূল্য চাদর দিয়ে এসেছিলেন। যাঁকে ইংরেজী ইতিহাসে বারবার ডাকু বলে বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর সমাধির প্রতি এইরূপ সম্মান দেখানর জন্য সাহেবসুবো কেউ কেউ লাটবাহাদুরের ওপর বড় বিরক্ত হয়েছিলেন। নিজের কানে ক্লাবে এই সম্বন্ধে অনেক টীকা টিপ্পনী আমাকে শুনতে হয়েছিল। নীরবে শুনেছিলাম, কি আমিও কিছু টিপ্পনী কেটেছিলাম, তা এখন ভুলে গেছি।

এই জেলার বাণকোট গ্রাম পেশোয়া মহারাজদের জন্মভূমি। যে বাজীরাও পেশোয়ার নামে একদিন অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ কাঁপত, তিনি ছিলেন এই বাণকোটেরই ছেলে। যতদিন পেশোয়ারা তাঁদের গরীব সাদাসিধে কোকনী চাল বজায় রাখতে পেরেছিলেন, ততদিন তাঁদের গৌরব অক্ষুন্ন ছিল। বাজীরাও-এর এক গল্প পাঠকের মনে আছে কি? একবার নিজাম-উল-মুলকের এক দূত এলেন পুণা শহরে পেশোয়ার দরবারে। সঙ্গে কত হাতী ঘোড়া, লোক-লস্কর, বাজনা বাদ্য। নিজামের রাজ্য তখন সবে নূতন স্থাপিত হয়েছে কি না! দূত এসে শুনলেন যে পেশোয়া

মহারাজ রাজধানীতে নেই ; সেইদিনই ফৌজ নিয়ে অমুক সড়কে বেরিয়ে গেছেন। দূত মনিবের কাছ থেকে এক অত্যন্ত জরুরী পত্র নিয়ে এসেছিলেন—নিজাম তখন পেশোয়ার মিত্রতাপ্রার্থী। কাজেই বৃথা সময় নষ্ট না করে দূত তৎক্ষণাৎ একলা রওয়ানা হয়ে গেলেন পেশোয়া যে পথে গেছেন, সেই পথ দিয়ে। খানিক দূর গেলে পর দেখলেন যে একদল মরাঠা সওয়ার আগে আগে যাচ্ছে, তাদের পিঠে ঢাল শড়কী বাঁধা। তারা হাসি তামাশা করতে করতে পোড়া জওয়ারীদানা খেতে খেতে, চলেছে। দূত এগিয়ে গিয়ে তাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন,"পেশোয়া মহারাজের সওয়ারী কোনদিকে গেছে, বলতে পারেন কি ?"

একজন সওয়ার বললেন, "কেন, পেশোয়ার খবরে আপনার কি প্রয়োজন ?"

মুসলমান উত্তর দিলেন, "তাঁর কাছে আমার মনিব নিজাম-উল-মুলকের চিঠি এনেছি।"

সওয়ার হেসে বললেন, "আমিই বাজীরাও। কই, আপনার পত্র দেখি।" দূত ঘোড়া থেকে এক লাফে নেমে সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করে পেশোয়াকে পত্র দিলেন। পেশোয়া প্রসন্নমুখে পত্রখানি পড়িলেন। তখন দূত আবার সেলাম করে মহা-রাজের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, "হুজুর আমার মনিব ঠিকই বলেছেন— "ইস মুল্‌কমে এক বাজী, আওর সব পাজী।" বাজীরাও হেসে উত্তর দিলেন, "আপনি আপনার মনিবকে গিয়ে বলবেন, বাজীরাও-এর উত্তর এই—ইস্ মুল্‌কমে এক নিজাম, আওর সব হাজাম।" সেইখানেই ঘোড়ার পিঠে বসে অতি সংক্ষেপে ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই বিচক্ষণ বীর একটা মতলব স্থির করে ফেললেন। মন্ত্রণা-গারের অপেক্ষা রাখলেন না। এঁরই বংশধর রঘুনাথ রাও পেশোয়া যে একদিন পানিপতে মরাঠা গৌরব ধূলিসাৎ করলেন, সে শুধু তিনি কোকনী চাল ছেড়ে বাদশাহী চাল ধরেছিলেন বলে।

কুলাবা জেলার সঙ্গে মরাঠী-শাহীর সম্বন্ধ কিন্তু এইটুকুই নয়। আলিবাগ ছিল মরাঠা নৌবহরের অধিনায়ক বিখ্যাত কানোজী আঙ্গরের রাজধানী। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে পশ্চিম ভারতের রাজারাজড়ারা সবাই স্থির বুঝেছিলেন যে শুধু ডাঙ্গায় যুদ্ধ করে ভারতে প্রধান্য লাভ আর সম্ভব নয়। সেই জন্যই স্বয়ং মহারাজ শিবাজী দক্ষিণ কোকনে সমুদ্রকূলে দুই প্রকাণ্ড কেল্লা নির্ম্মাণ করেছিলেন। হরনাই বন্দরের সুবর্ণদুর্গ, আর মালবন বন্দরের সিন্ধুদুর্গ। এই দুই কেল্লার মাঝা-

মাঝি জায়গায় উঁচু পাহাড়ের উপর নৌ-সেনাপতি ধোলপ বেঁধেছিলেন বিজয় দুর্গ, আর রতনাজী নামে এক সরদার বেঁধেছিলেন রত্নগিরির বিশাল কেল্লা। উত্তর কোকনে আলিবাগে সেনাপতি আঙ্গরে তুলেছিলেন দুই কেল্লা—আলিবাগ দুর্গ ও হীরাকোট। আলিবাগ দুর্গ ছিল ঠিক আমার বাঙ্গালার সামনে দুশো কদম দূরে জলের মাঝে, আর হীরাকোট ছিল ডাঙ্গার উপর ঠিক আমাদের পেছনে। আমার সময়ে হীরাকোট হয়ে গেছল সরকারী আপিস ও জেল, কিন্তু জলের মাঝের কেল্লাটা একরকম খালীই পড়েছিল। আমাদের লাইফ বোটের মাল্লারা সেখানে থাকত, আর একটা দীর্ঘ মাস্তুলের উপড় উড়ত ব্রিটিশ পতাকা। ভেতরে কানোজী আঙ্গরের মহল ছিল, কিন্তু তখন ভাঙ্গাচোরা বেমেরামত অবস্থায়। সমুদ্রে খুব ভাঁটা পড়লে কেল্লা পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়া যেত। তাই আমরা প্রায়ই বেড়াতে যেতাম ওই কেল্লায়। বেড়াতে বেড়াতে আনন্দ হত, না দুঃখ হত! নিজেই ঠিক বলতে পারি না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসত, কিন্তু মনটা হালকা বোধ হত। শিবাজীর সুবর্ণ-দুর্গ আজ খালী পড়ে রয়েছে, কিন্তু সিন্ধু-দুর্গের ভেতর এক মন্দির আছে, যেখানে দেবীমূর্ত্তির সামনে ছত্রপতির পুরানো পোষাক ও তলোয়ায় রাখা থাকে। মন্দিরে নিয়মিত পূজা হয়, কোলহাপুরের মহারাজ বাহাদুর তার খরচ দেন। এই কেল্লার প্রাচীরের উপর এক জায়গায় একটা হাতের ছাপ আছে। লোকে বলে সেটা শিবাজী মহারাজের নিজের হাতের ছাপ। যখন কেল্লা বাঁধা হচ্ছিল, তখন একদিন তিনি সেইখানে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। চুণ বালি কাঁচা ছিল, তাই ছাপ রয়ে গেছে। পাঠক, সে ছাপ আমি মুহূর্ত্তের জন্য দেখেছি, দাঁড়াতে পারি নেই। আপনারা সুবিধা পেলে একবার দেখে আসবেন, চক্ষু সার্থক হবে।

রায়গড় দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটে নেই। যে জন্য দিল্লী, আগ্রা, চিতোরগড় দেখতে যাই নেই, বোধ হয় সেই জন্যই। দুর্ব্বল মানুষের মন ত! তার একটা সহ্যের সীমা আছে। বিজয়-দুর্গের ধোলপেরা একবার কোন এক বিলেতী জাহাজ মেরে সেই জাহাজের ঘণ্টা এনে তাঁদের শিবমন্দিরে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও বোধ হয় ঝুলছে। অন্ততঃ আমার সময়ে ছিল। ঘণ্টার উপর জাহাজের নামটা পর্য্যন্ত দেখা যেত। অন্যের জাহাজ-মারা সে যুগে ত বীরধর্ম্ম বলেই গণ্য হত! আটলান্টিকের জলদস্যু রালে ও ড্রেক, সেকালের মালাবারের সাহেব বোম্বেটের দল, এদের ত আজ কেউ নিন্দা করে না, ধোলপকে দোষ দিয়ে ফল কি।

পাঠক একবার সেকালের ভারতের পশ্চিম উপকূলের ছবিটা মানসচক্ষে দেখতে চেষ্টা করুন। ইংরেজ কোম্পানীর সুরত ও বোম্বাই, ফিরিঙ্গীদের গুজরাতে দমণ ও দক্ষিণে গোয়া, হাবসীদের গুজরাতে সচিন ও কোকনে জঞ্জীরা, মরাঠাদের আলিবাগ হতে মালবন পর্য্যন্ত এক সারি কেল্লা, মালাবার উপকূলে মোপলা আরবদের কালিকট। কতকাল ধরে এই সমস্ত রাজারা সমুদ্রে আধিপত্যের জন্য মারামারি কাটাকাটি করেছিলেন, অনবরত পরস্পরের জাহাজ ডুবিয়েছিলেন, তার কি আজ কোন হিসাব করা যায়! শেষ, ডাঙ্গাতেও যা হল, জলেও তাই হল। যে যোগ্যতম, সেই জিতল। বাকী, কেউ গেল, কেউ ছেলে খেলা করবার জন্যে বেঁচে রইল।

আলিবাগের আঙ্গরে বংশের আছে শুধু একটী মেয়ে, আর কেউ নেই। বিষয় সম্পত্তিও না থাকার মধ্যে। মেয়েটীর নাম জিজাবাঈ। তাঁর বিবাহ হয়েছে মধ্য ভারতের দেবাস রাজ্যের পওয়ার ঘরাণাতে। তাঁদের যদি ছেলে হয়ে থাকে, ত সেই কানোজীর বিগত-গৌরব বংশধর। আমি জিজাবাঈ সাহেবাকে কখনও দেখি নেই, কিন্তু তাঁর স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বের সৌভাগ্য হয়েছিল। অতি চমৎকার লোক। ধোলপদের আর কেল্লা নেই, রাজ্য নেই, সামান্য জায়গীর পড়ে আছে মাত্র। রাজ্য কেল্লা থাকলেই বা কি! অনেকের ত আছে!

আমার পুরানো কথা বলতে বলতে অন্যের পুরানো কথা এসে পড়ল। থাকতে পারলাম না, তাই একটু ইতিহাস চর্চ্চা করতে হল। পাঠক অপরাধ নেবেন না। আমি এইবার অন্য কথা পাড়ব।

কুলাবা জেলাতে নূতন যে সব জাতের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, তাদের অনেকের কথা ইতিপূর্ব্বে বলেছি। কিন্তু একটী জাতের উল্লেখ করা হয় নেই। সেটী হচ্ছে কায়স্থ জাত। পুরো নাম চান্দ্রসেনীয় কায়স্থ প্রভু। মহারাষ্ট্রে কায়স্থ সংখ্যা খুব কম। তাঁদের জন্মভূমি হচ্ছে কুলাবা জেলাতে, আর তার আশেপাশে। তাঁরা আমাদের মত শূদ্রাচারী কায়স্থ নন। আচার ব্যবহার উচ্চ বংশীয় ক্ষত্রিয়ের মত। তবে, ক্ষত্রিয় যোদ্ধা জাত, বাহুবলের উপাসক, মগজের সঙ্গে সম্পর্ক কম। কায়স্থ প্রভুরা আমাদেরই মত মসীজীবী ও বুদ্ধি-ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। বুদ্ধি-বলে কেউ খাটো নয়, তাই এই দুই জাতের ঝগড়াঝাঁটি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব কার্য্যে চলেছে। অন্য লোককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে

উঠতে হয়। ব্রাহ্মণেরা এঁদিকে দ্বিজ বলে স্বীকার করেন না। প্রভু কথাটাকে পরভু উচ্চারণ করে তার একটা কদর্থ করেন। তা ব্রাহ্মণেরা ত শিবাজীর বংশধরদিকেও কৃষক জাতীয় শূদ্র বলেন! এসব ঝগড়া কিন্তু আগেকার দিনে ছিল না। বাজী প্রভু যখন শিবাজীর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন, তখন কায়স্থ প্রভু জাতটাকে কেউ ক্ষত্রিয় বই আর কিছু মনে করত না। শিবাজী মহারাজ দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। তাঁর একটা সার্ব্বজনীন ভাব ছিল। তাই তাঁর দপ্তরে, পলটনে, তিনি সব জাতকে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের রেশারেশি ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল। চতুর্থ ও পঞ্চম পেশোয়ার আমলে ফতোয়া জারি হল যে কায়স্থ প্রভুরা শূদ্র, ক্ষত্রিয় নয়। এর ফলে কায়স্থেরা ধীরে ধীরে রাজদরবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুলে দিলেন। পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাওকে তাঁর কাকা রঘুনাথ রাও ও কাকী আনন্দীবাঈ খুন করান। যে খুন করেছিল, তার নাম সুমের সিং গারদী। সে পেশোয়ার শরীর-রক্ষীদের নায়ক ছিল। ব্রাহ্মণেরা এই গুজব রটিয়ে দিলেন যে এই সুমের সিং একজন ছদ্মবেশী কায়স্থ প্রভু। এ কথা কেউ কোন দিন প্রমাণ করতে পারে নেই। তবু অনেক ব্রাহ্মণ আজও বিশ্বাস করেন যে নারায়ণ রাও-এর হত্যা প্রভুরাই করেছিল বা করিয়েছিল। অনেকে বলেন যে কায়স্থ প্রভুরা আসলে মহারাষ্ট্রীয় নয়, তারা উত্তর ভারত হতে এসে মহারাষ্ট্রে বাস করেছে। কেউ কেউ জোর করে বলেন যে এরা সেকালের হৈ হৈ রাজপুতদের বংশধর। এ সব কথা জোর করে বলবার মত প্রমাণ নেই। তবে একটা জিনিস উল্লেখযোগ্য। এদের কুল-দেবতা দেবী বিন্ধ্যাচলবাসিনী। এই দেবীর মন্দির মির্জ্জাপুরের কাছাকাছি বিন্ধ্যপর্ব্বতে অবস্থিত, দক্ষিণ দেশে নয়। প্রভুদের চেহারা মোটামুটি অন্য মরাঠাদের মতই। তবে চরিত্রের একটু বিশেষত্ব আছে। এরা কোকনের অন্য জাতের মত মিতব্যয়ী নয়, বিলাসী খরচে মানুষ। আর বুদ্ধিমান হলেও সরল-প্রকৃতি। ব্রাহ্মণদের, বিশেষ করে কোকনস্থ ব্রাহ্মণদের, সাংসারিক বুদ্ধি প্রবল। তাই তাঁরা কায়স্থদিকে, কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বলেন যে ওদের ভিতরে কোন পদার্থ নেই, কেবল বাবুগিরি করতেই জানে। কথাটা সত্য নয়। প্রভুদের মধ্যেও আমি ঢের কেজো লোক দেখেছি।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

সাহিত্যের স্বরূপ *

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কল্যাণীয়েষু—

রস-সাহিত্যের রহস্য অনেককাল থেকেই আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি এই লেখাগুলি থেকে তার পরিচয় পাবে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বারবার নানারকম করে বলেছি। সেটা এই বইয়ের ভূমিকায় জানিয়ে রাখি।

মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলি আমরা জানছি। সেই জানা তুই জাতের।

জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে তার লক্ষ্য রূপে সামনে।

ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।

বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন কি সেই অদ্ভুতের অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানাভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারি থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হোতে নানাখানা, রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হোতে পারলেই খুসি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মানুষের মন চায় মিলতে, মিলে গিয়ে হয় খুসি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।

একদিন নিশ্চিত স্থির করে রেখেছিলেম সৌন্দর্য্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান

---

* "সাহিত্যের পথে" নামক সদ্য প্রকাশিত বইয়ের ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত।

কাজ। কিন্তু এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায় না দেখে মনটাতে অত্যন্ত খটকা লেগেছিল। ভাঁড়ু দত্তকে সুন্দর বলা যায় না—সাহিত্যের সৌন্দর্য্যকে প্রচলিত সৌন্দর্য্যের ধারণায় ধরা গেল না।

তখন মনে এল এতদিন যা উল্টো ক'রে বলছিলুম তাই সোজা ক'রে বলার দরকার। বলছিলুম, সুন্দর আনন্দ দেয় তাই সাহিত্যে সুন্দরকে নিয়ে কারবার। বস্তুত বলা চাই, যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী। সাহিত্যে কী দিয়ে এই সৌন্দর্য্যের বোধকে জাগায় সে-কথা গৌণ, নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের। তাকে সুন্দর বলি বা না বলি, তাতে কিছু আসে যায় না, বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে মন তাকেই অঙ্গীকার করে নেয়।

সাহিত্যের বাহিরে এই সুন্দরের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। সেখানে প্রাণতত্ত্বের অধিকৃত মানুষকে অনিষ্টকর কিছুতে আনন্দ দেয় না। সাহিত্যে দেয়, নইলে ওথেলো নাটককে কেউ ছুঁতে পারত না। এই প্রশ্ন আমার মনকে উদ্বেজিত করেছিল যে সাহিত্যে দুঃখকর কাহিনী কেন আনন্দ দেয় এবং সেই কারণে কেন তাকে সৌন্দর্য্যের কোঠায় গণ্য করি।

মনে উত্তর এল, চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আছি এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চার-দিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে রাখে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুত মন নাস্তিত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ।

দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক। কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের চৈতন্যকে স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্ব্বতোভাবে বর্জনীয় ব'লে জানে, অথচ আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করছে। এ'কে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি।

রামলীলায় মানুষ যোগ দিতে যায় খুসি হয়ে, লীলা যদি না হোত তবে বুক যেত ফেটে।

এই কথাটা যেদিন প্রথম স্পষ্ট করে মনে এল সেদিন কবি কীটস্-এর বাণী মনে পড়ল—"Truth is beauty, beauty truth"। অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা "হৃদা মনীষা মনসা" উপলব্ধি করি তাই সুন্দর। তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই ব'লেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।

মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্যে।

সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রস-বিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানাভাবে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।

ইংরেজিতে যাকে বলে real, সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই, যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য,—তর্কের দ্বারা নয়, প্রমাণের দ্বারা নয়, একান্ত উপলব্ধির দ্বারা। মন যাকে বলে এই তো নিশ্চিত দেখলুম, অত্যন্ত বোধ করলুম; জগতের হাজার অচিহ্নিতের মধ্যে যার উপর সে আপন স্বাক্ষরের শিলমোহর দিয়ে দেয়, যাকে আপন চিরস্বীকৃত সংসারের মধ্যে ভুক্ত করে নেয়। সে অসুন্দর হোলেও মনোরম, সে রসস্বরূপের সনন্দ নিয়ে এসেছে।

সৌন্দর্য্য প্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলঙ্কার শাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।

মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলা-জগতের সৃষ্টি সাহিত্যে।

কিন্তু এর মধ্যে মূল্যভেদের কথা আছে, কেননা এ তো বিজ্ঞান নয়। সকল উপলব্ধিরই নির্ব্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের নির্ব্বাচনের কর্ত্তব্যতা আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ।

সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলের ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ ক'রে চিরকালের সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিলে যায়। ইতি ৮ আশ্বিন, ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাহা

কম্পিত ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে দাস সাহেব উঠে জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভারী চোখের পাতার কোণ থেকে বড় বড় ফোঁটা স্ফীত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। জানালার সার্শীতে হাত ভর দিয়ে, তারই মধ্যে মুখ গুঁজে সরকারের খেতাবী উজীর, পঞ্চাশ বছরের বুড়ো দাস সাহেব ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। আবেগ-প্রাবল্যে তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

নীচে লাল সুরকীর সরু রাস্তা ধরে ডাক্তারের টু-সীটার সশব্দে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে মিসেস্ দাসের গলা শোনা গেল, ওগো, তুমি এত অধীর হচ্ছ কেন? যা গেছে, তা কি ফিরবে আর? আর কষ্ট কি তোমারই একার? আর কারো বুকে কি তোমার মতোই লাগেনি? কথা শোনো···এদিকে এস···

দাসের কাঁধে হাত রেখে মিসেস্ দাস কোমর থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে, চোখ মুছে ও নাক ঝেড়ে কপালে হাত দিয়ে চুল ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললেন, এখনকার যা কাজ সে সম্বন্ধে ত উদাসীন থাকলে চলবে না। শোফারকে গাড়ী দিয়ে মার্কেটে পাঠিয়েছি ফুল আনতে, রতন নীচে ফোনে বসে আছে রাজ্যি শুদ্ধ লোকের শোক প্রকাশের জবাব দিতে···

দাস সাহেব কাঁধ থেকে মিসেসের হাত নামিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে না তাকিয়েই ক্লান্ত ধরা গলায় বললেন, আমায় মাপ কর লীলা, যা করবার তুমিই করো, ওসব তুমিই ভালো বোঝ। আমি একটু একা থাকতে চাই।

বলে স্খলিত পায়ে তিনি ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিসেস্ মিনিটখানেক বেকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর কাঁধ ঝাড়া দিয়ে স্বামীর উদ্দেশে বললেন, মেয়ে তোমার শুধু একারই মরে নি, তাই বলে ঢং করতে শিখিনি আমরা। বাড়াবাড়ি কিছুরই ভালো নয়, দুফোঁটা চোখের জল বেশী ফেললেই কি আর মরা মেয়ে ফিরে আসবে। যখনকার যা, তখনকার তা।

মেয়ের শোকে এখনকার কর্ত্তব্য ভুললে চলবে কেন ?···দেখি, কাদের ওখান থেকে আবার ফুল নিয়ে চিঠি এসেছে, জবাবটা লিখে দি গে···

আর একবার কপালে ও চুলে হাত বুলিয়ে তিনি দ্রুতপদে নীচে নেমে গেলেন।

ড্রয়িং রুমের দক্ষিণে লটির শোবার ঘর। একটা দরজা মাঝে, ভারী পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। ঘরের সাথে পশ্চিমে স্নানের ঘর, পূবে চওড়া বারান্দা, টবে ও অর্কিডে সাজানো। সে দিকে ছুটো দরজা। ঘরের ঠিক মাঝখানে চওড়া খাটটার ওপর আপাদমস্তক কাশ্মীরী চাদরে ঢাকা, তেইশের কোঠা না পেরতেই অচিন্ পথের দেওয়ানা, লটি দাস শুয়ে আছে। ছু-একগাছা চুল, বালিশের ওপর দিয়ে এসে এপাশে ওপাশে ঝুলছে। শোওয়ার ধরণধারণ এত স্বাভাবিক, যে দেখলে মনে হয় রোজ যেমন সে খাওয়ার পর একটা বই হাতে করে শুয়েই অমনি ঘুমিয়ে পড়ত, আজো তেমনি পড়েছে। মাথার দিকে, আয়নার টেবিলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তেমনি সাজানো রয়েছে। আজ কেবল রূপোর চিরুণীটার দাঁতের ফাঁকে একগাছা চুলও বেধে নেই, আর টেবলের চক্‌চকে মেহগনিতে এক ফোঁটাও পাউডার পড়ে নি।

লটির হাত ছুখানা বুকের ওপর, মাথাটা ডাইনে কাঁধের দিকে একটু হেলানো। চাদরের ভেতর দিয়ে আর কিছু দেখা যায় না।

কিন্তু কেউ যদি মুখের ঢাকনীটা উঠিয়ে ফেলত, তবে দেখতে পেত, লটির আজকের ঘুম একান্ত প্রশান্তির ঘুম নয়। অল্প ফাঁক ঠোঁট ছুটিতে অতৃপ্তির প্রত্যাশা মাখানো। মুদিত চোখের কোল বেয়ে যে অশ্রুধারা ছাপ রেখে গেছে, তার উৎস শুধু দৈহিক যন্ত্রণাই খুলে দেয়নি। নাকের ডগার যে লালিমাটুকু মরণ এখনো মুছে নিতে পারেনি, তার পেছনে অনেক অনুক্ত বেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

লটি দাস···সোসাইটির নামকরা সুন্দরী মেয়ে লটি। রূপে, গুণে তার তুলনা ছিলনা। যে পার্টিতে তার যাওয়া হত না, সেখানকার ছেলে বুড়ো সবাই মনমরা হয়ে উঠত তার অভাবে। যে ডিনারে সে যোগ দিত না, সেখানকার প্রত্যেকটি ডিশ্ বিস্বাদ হয়ে উঠত। তার একটি কথা রাখবার জন্যে দরকার হলে কেউ কেউ প্রাণ দিতে পারত। ছোকরা ব্যারিষ্টার সরকার বিলেত থেকে গোঁপের ধার ছেঁটে মর্কট সেজে এসেছিল, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন কেউ তাকে বড় করে

রাখতে অথবা কামিয়ে ফেলতে রাজী করতে পারে নি। লটির একবার নাক সেঁটকানোর মর্জ্জিতে সে-জোড়া সমূলে অন্তর্হিত হয়েছিল। ষাট্‌ বছরের বুড়ো, পেন্‌শনভোগী সিবিলিয়ান হালদার সাহেব, তাঁর তিরিশ বছরের মৌতাত হাভানা শুদ্ধ লটিকে তুষ্ট করবার জন্যে ছেড়ে, সিগারেট ধরেছিলেন। সমাজে লটির প্রতিপত্তি ছিল অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মতো।

ঘণ্টা দুই আড়াই হল লটির মৃত্যু হয়েছে, এরি মধ্যে ফোনে ও লোকের মারফৎ খোঁজ খবরের ভীড় সুরু হয়ে গেছে। এক তলার হলকামরা কালো পোষাকে ও ক্রেপে এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে উঠেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি সাদা ফুল লটির ঘরে আস্‌ছে, ঘর ভরে উঠলো বলে। সমাগত শোক-প্রকাশকদের নিয়ে মিসেস্‌ দাসের ব্যস্ততার আর অবধি নেই। আদর, অভ্যর্থনা, ঘন ঘন শুক্‌নো চোখে রেশমী রুমাল বুলোনো, "মিষ্টার দাসের হঠাৎ এই খানিক আগে, শরীরটা" বলে তাঁর হয়ে মাপ চাওয়া, অনবরত চলছে। অভ্যাগতদের মধ্যে কলকাতার বড় দরের বড় ঘরের কতিপয় ইংরেজ ও বহু বাঙালী সাহেব মেমের মধ্যে বেশী কেউ আর বাকী নেই। কেউ বিষণ্ণ মুখে চুপ করে আছেন, কেউ মিসেস দাসকে দু একটা সান্ত্বনার কথা বলছেন কেউ চাপা গলায় অস্ফুট স্বরে লটির বিষয়ই আলোচনা করছেন।

যাঁরা আসতে পারেন নি, তাঁদের মধ্যেও লটির মৃত্যুসংবাদ কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নি। কেউ হয়ত হাইকোর্ট বেরোবার মুখে খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন—লটি, লটি দাস। এমন হঠাৎ—কেন, কি হয়েছিল তার। এমন শক্ত কিছু হয়েছে বলে ত আগে শুনি নি,—

একটু একটু করে তাঁর মাথায় সমস্ত স্মৃতি একের পর এক ভেসে উঠেছে।

—লটি আমায় দুটো ফুল দিয়েছিল দে'র গার্ডেন পার্টিতে। দিন কয়েক পর আমি একটা ব্রোচ প্রেজেণ্ট নিয়ে যেতে তার মুখ ভার, শেষ মায়ের তাড়ায় বেচারীকে রাজী হতে হোলো। মিসেস সরকারের বুক্‌-টিতে সে Way of an Eagle হয়ে গেছল, প্রথম ধরি আমি—good gracious! ও কি বারোটা! ডি, সির সাথে একটা কন্‌সলটেশন ছিল যে, ঘড়িটা বেগড়ায় নি ত।

সকাল প্রায় সাতটায় লটির মৃত্যু হয়েছে। শরীরটা অসুস্থ ছিল কদিন থেকে, কাল সারাদিন ঘর থেকে বারই হয়নি। আজো সকালে চা খেয়েছে ঘরেই। খানিক্‌ পরে বাথরুমে গোঙানী শুনে মিসেস দাস ছুটে গিয়ে দেখেন সে অজ্ঞান

হয়ে পড়ে আছে। আসল ব্যাপার কি আর কারো জানা না থাকলেও মিসেসের অজানা ছিল না। কিন্তু সে কথা তিনি যে জন্যেই হোক কাউকে বলা উচিত মনে করেন নি। সেবা শুশ্রূষা ডাক্তার কিছুরই ত্রুটি হয় নি, কিছুতেই তাকে ধরে রাখা গেল না, এমন কি যে মায়ের কথা সে জীবনে কোনদিন ঠেলে নি, তাঁর সহস্র কাতরোক্তিতেও না।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সবই বুঝতে পেরেছিলেন, দাস সাহেবকে বলেও গেছেন। কিন্তু সে ত বাইরে বলা চলে না। মিসেস দাস সবায়ের প্রশ্নের জবাবে বলছেন, পা স্লিপ করে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকে যায় ওয়াশিং বেসিনের কোণায়, ব্রেণ কন্কাশন, দুঘণ্টা পুরোও রাখা গেল না,—সঙ্গে সঙ্গে চোখে রুমাল।

মিসেস্ দাসকে হৃদয়হীনা মনে করলে ভুল করা হবে, হৃদয় তাঁর সত্যিই ছিল, শুধু মায়ামমতার জায়গায় সোসাইটি ও ফ্যাশন তার সবটুকু জুড়ে ছিল। নিজে তিনি ছাপোষা ঘরের মেয়ে, পঁচিশ বছর আগে যখন ডেপুটি নরেন দাসের সাথে তাঁর বিয়ে হয়, দাস তখন যাযাবর বৃত্তি ধরে বাংলা দেশের মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। দাসের মতামত বরাবরই একটু সাহেবী। ওটা পৈতৃক উত্তরাধিকার, তাঁর বাবা রমেশ দত্ত ইত্যাদির আমলের ব্রাহ্মভাবাপন্ন হিন্দু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর ফিরিঙ্গিপনাতে তাঁকেও মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হোত। মুখে কিছু বলা সম্ভব হোত না, কিন্তু মনে মনে তিনি স্ত্রীর ধরণ ধারণ অপছন্দ করতে স্থুরু করলেন।

বিয়ের বছর তিনেক পর যখন লটি হোল, মিসেসের নব উন্মেষিত সভ্যতা-চক্ষু গিয়ে তার ওপর পড়ল। স্বামীর কাছে আমল না পেয়ে তিনি মেয়ের শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে পড়লেন। লটির বছর নয়েক বয়েসের সময় তিনি স্বামীর কর্ম্মস্থল পীরোজপুর মহকুমা ত্যাগ করে সকন্যা দার্জ্জিলিংএ সমারূঢ়া হলেন। উদ্দেশ্য স্থায়ী অবস্থান, উপলক্ষ্য মেয়ের শিক্ষা।

মায়ের নিপুণ তত্ত্বাবধানে মেয়ের পড়াশুনা ত্বরিৎগতিতে ও তার ফিরিঙ্গিয়ানা তড়িৎগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। সতেরো বছর বয়সে লটি পিয়ার্স‌ন ম্যাগাজিনে কবিতা ও ত্রিলোক মানে তিন ঠো আদমী বলতে শিখলে।

কুড়ি বছর বয়সে তার পিয়ানো বাদন ও ইংরেজী অভিনয় পটুতার খ্যাতি দার্জ্জিলিং মেলে সারা ব্রিজ পার হয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছল।

এই সময় একদিন কলকাতা গেজেটে খবর বেরুল যে দাস সাহেব অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত জেলা কলেকটরের পদে উন্নীত হয়ে আলিপুরে বদলী হয়েছেন।

কলকাতায় এসে প্রথম শ্রেণীর ইঙ্গবঙ্গ সমাজে মিশতে ডেপুটিজায়ার যে অসুবিধে, মেয়ের দৌলতে মিসেস দাস তা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। লটির খ্যাতি প্রতিপত্তির জোরে হোম্‌রা চোম্‌রা বাঙালী সাহেব মেম মহলের সব দরজাই তাঁর জন্যে উন্মুক্ত হতে লাগল।

লোয়ার সার্কুলার রোডের এক ফ্ল্যাটে দাস সাহেব বাসা নিয়েছিলেন। আসবাব পত্র এল পার্ক ষ্ট্রীটের বিলিতী দোকান থেকে, মোটরও এল একখানা, ফোর্ড। মোটর নিয়ে সাহেব মেমে প্রথম দিনই বচসা হয়ে গেল। মিসেস বললেন, আমি হেঁটে বেড়াব সেও ভালো, কিন্তু তোমার কলের টমটমে চড়তে পারব না।

দাস ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বললেন, বেশ ত। বয়েস হলে হাঁটার মতো ভালো জিনিষ কি আর আছে?

মিসেস ঠাট্টা গায়ে না মেখে বললেন, মল্লিক সাহেবের মেম ডেম্‌লার কিন্‌লে সেদিন, তারাও ত আর ক্যাশ সব টাকা দ্যায়নি!

—সত্যি কথা। মল্লিক নগদ দেয়নি, কিন্তু দেবে। অর্থাৎ দিতে পারবে। কারণ মাস গেলে সে বেতন পায় সাতাশ শো। আর আমার? হপ্তা খানেকও হয়নি, সাড়ে আটশোর কোটা পেরিয়ে বারোশো পঁচাত্তরে ঠেকেছে।

জবাবে মিসেস দুর্ব্বোধ্য ভাবে যা-তা বলে উঠে গেলেন।

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ ফোর্ড গাড়ী, কলকাতার সবচেয়ে দামী গাড়ী হয়ে উঠলো। ঐ গাড়ীতে লটির পাশে একটু বসবার জায়গা পেলে, বহুৎ রোলস্ মিনার্ভার মালিকও নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগলেন। দেখে শুনে, মিসেস দাস হেঁটে বেড়ানোর শুভ সংকল্প ত্যাগ করলেন।

সোসাইটি পুরোমাত্রায় চলতে লাগল।

দিনকতক পর একদিন রাতে শুতে যাবার আগে দাস সাহেব মিসেস্‌কে বললেন, দ্যাখ, মল্লিকের ছেলের সাথে লটির বেশী মেলামেশা আমি পছন্দ করিনে।

মিসেস ভ্রূ কপালে তুলে বললেন, কে, টুটু? The finest young man in society! তেরো বছর বিলেতে ছিল, পব্লিক স্কুল আর,—

—আমি জানি। একটি আস্ত বাঁদর হয়ে ফিরে এসেছে তাও জানি।

—কে বললে তোমায় ? নিশ্চয়ই কেউ চুকলি করেছে। ওগো, ঘটে যদি তোমার একটুও বুদ্ধি থাকত, তবে তুমি এসব ভাবতেও না। অমন বাপমায়ের ছেলে, জুনিয়রদের মধ্যে পসারও হয়েছে মন্দ না। আর তা ছাড়া, ও—ও—লটিকে, ইয়ে, খুব সাধারণ ভাবে দেখে না। কে কোথায় কি কানে তুলেছে, তাই তাকে cut করতে হবে ?

স্ত্রীর দিকে একটু কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাস বললেন,—শোনো লীলা, অতো কথা আমি শুনতেও চাইনে, বুঝতেও চাইনে। I dont want Mullik junior to get thick with Lottie, ব্যস্।

বলে তিনি বিছানায় গিয়ে উঠলেন।

মিসেস কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। তার পর তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠলেন, ইস্! ভা—রি—ত!

মুখে বললেন বটে ইস্, কিন্তু স্বামীকে তিনি চিন্‌তেন বেশী কথার মানুষ তিনি নন্, গায়ে পড়ে বড় কিছু বলতেও আসেন না। আজকের পর প্রকাশ্য ভাবে টুটুর সাথে মেলামেশা যে তিনি বরদাস্ত করবেন না, এ সুনিশ্চিত। কিন্তু তা বলে তাঁর নিজেরও ত একটা মতামত আছে। মেয়ের ওপর দাবী কি শুধু একা বাপেরই ? স্বামীর কথামত চললে সোসাইটিতে মুখ দেখানো কঠিন হয়ে উঠবে যে! মল্লিক বাড়ীতে ত ঢোকাই যাবে না—ছিঃ!

এমন সময় লটির গলা শোনা গেল—মাম্, মাম্—তোমার চিঠি, নেলিদের ওখান থেকে,—

—ইয়েস ডিয়ার, বলে মিসেস উঠে গেলেন।

... ...

পরদিন বিকেলে সার এস্, এন্ দত্তের ফটকের সামনে দাসের ফোর্ড এসে দাঁড়াতেই ইজের কোর্ত্তার তবক মোড়া কতিপয় ইয়ং মেন এগিয়ে এসে মিসেস ও মিস দাসকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিলে।

শেষটান দিয়ে সিগারেটের পোড়া টুক্‌রোটা ছুড়ে ফেলে টুটু মল্লিক বললে, By Jove, Baby, you are late! ঝাড়া একঘণ্টা আমরা তোমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে! Couldn't you come earlier?

মৃদু হেসে লটি বললে, না, ড্যাডির অপিস থেকে ফিরতে বড্ড দেরী হোলো আজ, তাই—

—Hell—। চলো—মিসেস দাস এগিয়ে গেছেন। বলে টুটু একটা সিগারেট বার করে বাঁ হাতের উল্টো পিঠে ঠুকতে লাগল।

মল্লিক জুনিয়রকে লটি যে খুব পছন্দ করত তা নয়। কিন্তু মনের অপছন্দকে ব্যবহারে প্রকাশ করবার মতো সাহসও তার ছিল না, শিক্ষাও হয় নি। টুটুর ধরণ ধারণ কদিন থেকে একটু কেমন কেমন ঠেক্‌লেও, সে কিছু গায়ে মাখে নি।

চল্‌তে চল্‌তে টুটু বললে, কি হবে এখুনি ওই বুড়োদের দলে ভিড়ে? চলো, একটু বেড়ানো যাক বাগানের দিকে।

লটি বললে, কিন্তু মাম্ miss করবে আমাকে,—

—আশ্চর্য্য! তুমি কি কচি খুকী রয়েছ এখনো? মার আঁচল ধরে ঘুরতে হবে!

—তা নয়, তবে কারো সাথে দেখা হবার আগেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া—

—কি হবে দেখা করে? ওখানে গেলেই ত ভায়োলেট মিত্তিরের ক্যাঁটকেঁটে গলার স্বর ভাঁজা, না হয় রেণু চৌধুরীর damned Bengali songs শুনতে হবে।

—বাংলা গান আমার খুব ভালো লাগে।

—কবে থেকে? সেদিন পর্য্যন্ত ত দেখেছি, বাংলা তুমি ভালো বোঝোই না—

—তার পর শিখেছি।

অপ্রসন্ন মুখে টুটু বল্‌লে, বেশ, চলো তা হলে।

দুজনে গিয়ে ড্রয়িং রুমে উঠল।

লেডী দত্ত এসে লটির হাত ধরে বল্‌লেন, বড্ড দেরী হলো লটি, তোমাদের। এসো এ ঘরে, কিছু মুখে দেবে চলো। গৃহকর্ত্রীর কথা শুনে, অভ্যাগতদের মধ্যে জনকয়েক কিচির মিচির করে উঠল, Oh dear, no! Don't rob us of her company!

হালদার বুড়ো পাকা ভুরুজোড়ার ওপর প্যাঁস্‌নেটা বসিয়ে বল্‌লেন, তা হলে বিভা, খাবারটাই এখানে আনার ব্যবস্থা করো। এস গো মা লক্ষ্মী, এইখেনে এসো,—বলে তিনি হাত ধরে লটিকে নিজের পাশে বসালেন।

লটি বসে, অল্প হেসে বল্‌লে, আজো খেয়েছেন ওগুলো!

একটু বিব্রত হয়ে অপরাধীর মতো হালদার বল্‌লেন, খুব কম মা খুব কম। তিরিশ বছরের মৌতাত—তা আজ সমস্ত দিনে মাত্র ছটা খেয়েছি।

লটি বল্‌লে, বারে, বেশ ত ! আমি কি আপনাকে একেবারে হঠাৎ ছেড়ে দিতে বলেছি ? কমাতে কমাতে ছেড়ে দেবেন।

হালদার আশ্বস্ত হয়ে লটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, মা লক্ষ্মী! তার পর সুধোলেন, দাস এলো না যে ?

মিত্র সাহেবের মেমের সাথে মিসেস দাস পর্দ্দার কাপড়ের ডিজাইন নিয়ে বচসা করছিলেন, হালদার সাহেবের কথা কানে যাবামাত্র বলে উঠলেন,—তাঁর মাথাটা বড়ো ধরেছে আজ, তাই আর বেরোতে পারলেন না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে, ভ্রূকুটি করে, লটি পিয়ানোর পাশে রেণু চৌধুরীর কাছে উঠে গেল।

বাইরে, বাগানের ধারের বারান্দায় টুটু মল্লিক ও ভায়োলেট মিত্তির সিগারেট ফুঁক্‌তে ফুঁক্‌তে গল্প করছিল।

আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ভায়োলেট বল্‌লে, Horrid ! গাঁজা।

মল্লিক বল্‌লে, Sorry ! My brand—

—I know,—but not mine,—বলে ভায়োলেট আংটা আঁটা রেশমী ব্যাগ খুলে সুদৃশ্য ছোট সোনার কেস্ বার করে খুলে ধরে বল্‌লে,—Try ?

একটা তুলে, নিজের নিঃশেষিত-প্রায় সিগারেটটা থেকে ধরিয়ে নিয়ে, লম্বা এক টান দিয়ে টুটু বল্‌লে, ঘাস খেলেই পারো।

ভায়োলেট বল্‌লে, খাইনে বলেই তোমাকে চিনেছি। তার পর what about your latest ?

কপালে চোখ তুলে টুটু বল্‌লে, মানে ?

—ন্যাকা, কিছু বোঝ না, না ? ওসব আমার কাছে নয়। I am......

—কি বাজে বোক্‌ছ ভায়োলেট !

—আমি বাজে বক্‌ছি ? খ্যাপা কুত্তার মতো লটি দাসের পাছ নিয়েছ,—শুধু আমি কেন, a host of others have been watching ! চোখ এড়ানো অতই সোজা !

—I say, Vi, আস্তে, আস্তে, তুমি বড় চেঁচিয়ে কথা কও।

—Fiddlesticks ! What do I care ? সবাই জানুক, সেই ত আমি চাই। তুমি যে কি চীজ্—

—আহা চটো কেন? কি করতে চাও তুমি, আমায় ফাঁসাবে? সে তুমি পারবে না, তাহলে সাথে সাথে নিজেকেও ফাঁসতে হবে এবং তোমার রাঁচীর মীনা মাসী—কথা শেষ না করে টুটু রেলিংয়ে বসে দেয়ালে ঠেস্ দিলে।

ভায়োলেট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে, ও—that's what you are banking upon? ভুল করেছ মল্লিক জুনিয়র, মেয়েদের তুমি চেনো নি। নিজে আমি যাই করে থাকি না কেন, to save that innocent kid's honour, I can risk mine own—এই মুহূর্ত্তে! I shall warn Lottie, এই বলে যাচ্ছি তোমাকে। আমার কথা বাদ দাও—আমি old sport। আর সবার কথা? যারা জানে, তারা সবই জানে—

একটু বিব্রত হয়ে টুটু বল্‌লে, Don't be silly, Violet! হেল্লো—এই যে সরকার, এসো এসো! ওকি, তোমার গোঁপ কোথা গেল? দেখেছ ভায়োলেট—

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভায়োলেট বল্‌লে, বাঁচ্‌লে এখনকার মতো। তারপর সরকারের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আমি জানি। আর কেন কামিয়েছে, তাও জানি।

আম্‌তা আম্‌তা করে সরকার বল্‌লে, হেঁঃ, কি জানেন আপনি? আমার খুশী, আমি কামিয়েছি।

ভায়োলেট বল্‌লে, বটে, ডাক্‌ব লটিকে?

মুখ চূর্ণ করে সরকার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগ্‌ল।

মল্লিক বল্‌লে, কেন ওকে ঘাঁটাচ্ছ সরকার! তার চেয়ে চলো, গলাটা একটু ভিজিয়ে আসা যাক্। শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। যাবে নাকি ভায়োলেট?

—I refuse to drink with you—বলে ভায়োলেট ড্রয়িংরুমের দিকে গেল।

গলা ভিজিয়ে সরকার মল্লিক যখন ফিরল, তখন পিয়ানোতে লটি গান গাইছে। একপাশে পিয়ানোয় ঠেস্ দিয়ে ভায়োলেট একখানা বিলিতী স্বরলিপির পাতা ওল্‌টাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আড় চোখে লটির মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

সে মুখ তাকিয়ে দেখবার মতো। যথেষ্ট হিংসার কারণ থাকা সত্ত্বেও ভায়োলেট মনে মনে তারিফ না করে পারছিল না।

লটির গান শেষ হবা মাত্র ঘন ঘন করতালির সাথে সবাই, Thank you,

Thanks, বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। মল্লিকজায়া বল্‌লেন, একখানা গেয়েই ফাঁকি দেবে? আর একটা হোক্ না—সেই Lovely lads of Ludlow টা—

লটি বল্‌লে, বাঃ আমি ত খানিক আগেই আরো দুখানা গেয়েছি। একা আমিই entertainment-এর ভার নেব নাকি? আর কারো গাওয়া উচিত—

মিসেস্ রায় বল্‌লেন, তা তো বটেই, বেচারী হায়রাণ হয়ে পড়েছে, তা হলে ভায়োলেট, You're nearest the piano—

ভায়োলেট বল্‌লে, আমায় গাইতে বলার সেইটেই বোধ হয় একমাত্র কারণ?··· Of course, I dont mind—বলে সে বসে পড়ল।

মিসেস্ রায় লজ্জিত হয়ে বল্‌লেন, না না, তা কেন!

লটি উঠে হালদার বুড়োর পাশে এসে বস্‌ল।

বুড়োকে সে মনে মনে ভারী পছন্দ করত, শ্রদ্ধাও করত। শিশুর মতো সরল মানুষ। এই পরবেশী ও পরভাষী সমাজে তিনি যখন তাকে মা লক্ষ্মী বলে ডাকৃতেন, তখন তার সত্যিই খুব ভালো লাগ্‌ত।

বসেই কব্জির দিকে তাকিয়ে লটি বল্‌লে, ইস্, রাত যে অনেক হয়ে গেছে!

—কটা?

—দশটা দশ।

—তাহলে একটু রাত হয়েছে বটে। কেমন লাগ্‌ল মা তোমার আজকের পার্টি?

—বেশ।

—বিভা ভারী ভালো মানুষ, না? একটু সেকেলে, তা আমাদের কাছে তাই ভালো লাগে। হালের চালচলন পছন্দ হয় না আমার,—তবে, বরদাস্ত করে যাই।

—তা হলে, আমাদেরো ভালো লাগে না আপনার?

—তুমি বড়ো কথা কাটো মা লক্ষ্মী! আমি কি তাই বল্‌লুম? তবে,— এই আজ কালকার সবাই,—এত ছোট সব জিনিষ নিয়ে এরা থাকে,—ভালো লাগে না। চালচলনও সব কেমন যেন! এই ধর না, ইয়ং মল্লিক,—well, to be frank, I detest the fellow!

টুটু মল্লিক একপাল মেয়ের মধ্যে আসর জম্‌কে বসেছিল। লটি সেদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, হালদারের কথার জবাব দিলে না।

মিসেস্ দাস গৃহকর্ত্তার সাথে দামী দামী মোটরের গল্প করছিলেন, লটি তাঁকে বল্‌লে, It's getting late, Mum—

—কেন, কটা বেজেছে ?

—Time we were gone। সাড়ে দশ।

সার এস্, এন্ বল্‌লেন, সে কি এখ্‌খুনি ?

মিসেস্ দাস বল্‌লেন, হ্যাঁ, ওঁর শরীরটা ভালো নেই আজ।

—তা হলে,—

—হ্যাঁ, উঠি তা হলে। এসো লটি। ও, লটি দেখত গাড়ী এসেছে কি না—

টুটু মহিলা-চক্র ত্যাগ করে এগিয়ে এসে বল্‌লে, ও আর দেখে কি হবে, চলুন আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

লটি আপত্তি করে বল্‌লে, না না, তাতে কাজ নেই। কি হবে খামখা। আর এত রাতে, কষ্ট করে,—

—Pleasure,—কষ্ট নয়, চলুন।

মিসেস দাস পুলকিত ভাবে বল্‌লেন, অনেক ধন্যবাদ, টুটু, so kind of you আচ্ছা, গুড্ বাই, গুড্ বাই—

সম্মিলিত হাতনাড়া ও অভিবাদনের কোলাহল ত্যাগ করে তিন জনে বেরিয়ে এলেন। দু সেকেণ্ড পর মল্লিক জুনিয়রের লম্বা নীচু স্পোর্টিং সান্‌বীম নিঃশব্দে কমপাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

ড্রয়িং রুমে বসে সান্‌বীমারূঢ় টুটু মল্লিকের স্থানে নিজেকে কল্পনা করে, সরকার সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

* * *

মাস তিনেক পরের এক রবিবার।

দুপুরের খাবার পর, লটি তার শোবার ঘরে বইয়ের শেল্‌ফের কাছে হাঁটু পেতে বসে বছর খানেকের জমানো ন্যাশ ও ষ্ট্র্যাণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করছিল। পরণে লাল-পেড়ে গরদ, গায়ে ঐ কাপড়েরই একটা ঢিলে আস্তিন জামা। ভিজে চুলের বোঝা ডগায় গেরো দিয়ে পিঠের ওপর ছাড়া।

জানলা দিয়ে একরাশ হেমন্তের মিঠে রোদ তার গায়ে পিঠে এসে পড়েছে।

সে গুণ্ গুণ্ করে রেণু চৌধুরীর কাছে সম্প্রতি শেখা এক্‌টা বাংলা গানের একচরণ ভাঁজছিল, আর তারই ফাঁকে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

…ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণ গুণিয়ে…গুণ গুণিয়ে! বারে গ্ল্যাক্সো বেবি! দেখ্‌লেই চুমো খেতে ইচ্ছে হয়!…ঘরেতে…

দরজার কাছে শব্দ শুনে সেদিকে না তাকিয়েই সে বল্‌লে—কোন্ হ্যায়—

পর্দ্দার ফাঁকে শ্বেত শ্মশ্রু 'বয়ে'র পাগড়ী দেখা গেল।

—কেয়া হ্যায়, বয়? সাব্ বোলাতা? বহুৎ খু'—বোলো ম্যয়্ আব্‌হি আতী হি—

উঠে টয়লেট-র‍্যাকের ওপর থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ হাত পা ভালো করে মুছে, কপালের ওপর ব্রাশটা দু একবার বুলিয়ে, সে নীচে চল্‌ল।

বস্‌বার কামরায় ঢুক্‌তে গিয়েই লটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দাস সাহেবের পাশে সেরিডানের ওপর একজন যুবক বসেছিল। গায়ের রং রোদে পোড়া গৌর, ঈষৎ তামাটে। চওড়া কপাল ও প্রকাণ্ড নাক—গ্রীক ভাস্করের খোদিত মূর্ত্তির মতো। পোষাক পরিচ্ছদ সাহেবী ও আড়ম্বরহীন। একগোছা চুল বাঁ কপালের ওপর এসে পড়েছে। বোতাম-খোলা কোটের তলায় মস্তো বড় বুকটার ওপর 'টাই' অবিন্যস্তভাবে হাওয়ায় উড়ছে। ওপরকার ঠোঁটের ধার দিয়ে কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে।

একটু ইতস্তত করে লটি বল্‌লে, Sorry, Dad, জান্‌তুম না আর কেউ আছেন,—

—আর কেউ মানে দিস্ জেণ্ট্‌ল্‌ম্যান অর্থাৎ ডাকু ত? তোমার ঘাব্‌ড়াতে হবে না লটি, ওর সামনে তুমি at home feel করতে পারো। She is Lottie, ডাকু, সেই নোয়াখালীর ছোট্ট ফ্রকপরা লটি। একে তোমার মনে নেই, লটি, সেই ডাকুদা—নোয়াখালীর মিঃ রায় ছিলেন ডেপুটি, তাঁর ছেলে। তোমার ত একটা ভালো নাম আছে ডাকু—হ্যাঁ হ্যাঁ—শঙ্কর,—শঙ্কর রায়।

শঙ্কর হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিল, লটির হাত বাড়ানো দেখে করকম্পন করে বললে, নোয়াখালীর পরেও দেখেছি আপনাকে দার্জ্জিলিং-এ দুয়েকবার। স্যানি ব্যাঙ্কে—

—আপনি যেতেন চৌধুরীদের বাড়ীতে? দেখিনি ত!

—দুর্ভাগ্য। অথচ শেষবার ওই বাড়ীতেই উঠেছিলাম। নোয়াখালীর কথা ত আপনার মনে থাকা সম্ভব নয়, তখন আপনি বেজায় ছোট।

—হ্যাঁ, তবে আপনিও সে সময় বিশেষ বড়ো ছিলেন না মনে হয়।

হেসে শঙ্কর বল্‌লে, না। এই ধরুন, বারো তেরো—

—তাই বলুন। আপনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় মাত্র।

দাস সাহেব বললেন, আচ্ছা লটি, তোমার মাকে যে ডেকে পাঠালুম, এলেন না ত—

বলতে বলতে মিসেস দাস ঘরে ঢুক্‌লেন। জামাকাপড়, চুল, জুতো—ফিট্-ফাট্। মুঠোর রুমালটা একবার নাকে ঘসে তিনি বস্‌লেন।

দাস সাহেব বল্‌লেন, লীলা, চিন্‌লে একে ?

অস্ফুট স্বরে মিসেস্ বল্‌লেন, কই···

—ভালো রে ভালো! স্বরেন রায়ের ছেলে, ডাকু। সেই নোয়াখালীতে—ওঃ তুমি বেশী দেখনি ওদের বটে।

মিসেস দাস হাত বার করে বল্‌লেন, Good day, Mr. Roy—well, how do you do,—

হাতঝাঁকানো সমাধা করে, ভালো করে বসে শঙ্কর বল্‌লে,—আমি বেশ আছি। আপনি ভালো ত ?

মিসেসের মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। মিঃ দাস ও লটি হো হো করে হেসে উঠলেন।

দাস সাহেব বল্‌লেন, লীলা, তুমি মিঃ রয়, মিঃ রয় করছ কাকে ? ও ডাকু, নামেও, কাজেও—ব্যস্, সেই ওর যথেষ্ট পরিচয়। নামেও, কাজেও। কি বল হে ?

লটির সাগ্রহ হাসি-রঙীন ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ডাকু বললে, কিন্তু সমাজে বাস করে নামের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন যাপন করলে কি আর চলবে,—

—আরে বাদ দাও তোমার সমাজ! সেই ছেলে বেলার মতো ডানপিটেই রয়েছ নাকি এখনো ? মারামারি করে হেষ্টিংস হাউস ছাড়লে, সে আমি এখনো ভুলি নি।

—তাইতেই ত সাহেবী শেখাটা পুরো হয়ে উঠলো না। আর দুদিন থাকলেই

খাস বিলেতীদের সাথে টেক্কা দিতে পারতুম। বলে ডাকু হাস্‌ল। তার পর বল্‌লে, সে শুধু প্যাপির জন্যে। খেলা ধূলায় ওরকম বরাবর হয়, বিশেষ হকীতে। তাই বলে মাষ্টাররা মোড়লী করতে আসে না। হাতে ছিল ডাণ্ডা, মাথায়ও বোধ করি খুন চেপেছিল,—! কষ্ট হয় টুটু মল্লিকের জন্যে। অবশ্য তার ছোট মান্‌ষেমির যোগ্য শাস্তি হয়েছিল। তবে মারটা একটু বেশীই খেয়েছিল। দিন দশেক ছিলো হাঁসপাতালে।

—কোন টুটু? মল্লিক সাহেবের ছেলে?

—হ্যাঁ। তার পরই ওর বাবা ওকে বিলেত পাঠিয়ে দেন। শুন্‌লুম, ফিরেছে নাকি বছর খানেক হোলো।

—হ্যাঁ। বারে জয়েন করেছে। লীলা, তুমি ওর কীর্ত্তিকলাপ শুনে ভাবছ, বুঝি ও একটি আস্ত গুণ্ডা! He is a self made man, নিজের জোরে রেলে বড় কাজ পেয়েছে। জামালপুরে থাক এখন, নয়? কোথায় উঠেছ এসে কলকাতায়? হোটেলে? সে কি? সুরেনের ছেলে, আমি থাকতে এসে হোটেলে উঠবে—না না, absurd! আজই সন্ধ্যার ভেতর চলে এসো,—ব্যাগ অ্যাণ্ড্‌ ব্যাগেজ। No arguments! তোমার একজন দাদা জুট্‌লো লটি,-বহুৎ বদ্‌মাস,—ডাকু দাদা।

বলে দাস সাহেব সস্নেহে তাদের মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগলেন।

মিসেস দাস গম্ভীর মুখে ঘাড় কাৎ করে পরম মনোযোগের সাথে কাঁধের ব্রোচ-টার শিল্পসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করছিলেন, এইবার গম্ভীরতর ভাবে দাস সাহেবের দিকে তাকালেন।

লটি ভাবলে, ওয়েল,—বেশ ত! ডাকু—ডাকু দা! তার পর ডাকুর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, কখন আস্‌ছেন তা হলে? সত্যি, না এলে ভারি দুঃখিত হব আমরা, হব না মাম্?

দীর্ঘ দেহ টান করে দাঁড়িয়ে ডাকু বললে, এলে আমি বেঁচে যাই সত্যি, তবে আপনাদের ভুগতে হবে।

দাস সাহেব বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আদবকেতা তোমায় মানায় না। We shall expect you before tea, বুঝ্‌লে? লীলা, তোমার কোনো engagement নেই ত বিকেলে?

—আছে বৈ কি। I am going to Mullik's for tea—

—বেশ। লটি থাক্‌বে।

—সেকি? ওকে ত যেতেই হবে, তাঁরা বিশেষ করে বলেছেন।

মায়ের হিপ্‌নটিজম্ আজ যেন লটিকে কায়দায় আন্‌তে পারলে না। সে বাধা দিয়ে বললে, না, আমি যাব না। Not feeling up to it,—

দাস সাহেব মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, তাহলে তুমি বেরোবে না। ডাকু, তুমি ঠিক্ এসো তা হলে।

—আসব। চল্‌লুম খুড়ি মা। চলি মিস্ দাস।

ডাকু যাবার পর খানিক চুপ করে থেকে মিসেস বললেন, আমি আর্ম্মি নেভিতে যাচ্ছি, যাবে তুমি?

লটির যেন আজ কি হয়েছিল। সে বললে, বাব্বাঃ, এই দুপুরে! আমি তার চেয়ে একটু ঘুমুব।

—কি আলসেই হচ্ছ দিন দিন।

ঈষৎ হেসে, লটি বল্‌লে, আল্‌সে নয়, তবে দিনরাত ঐ পোষাক পরিচ্ছদ ঘাঁট্‌তে ভালো লাগে না আর। আর আমার এখন একটু পড়তে ইচ্ছে করছে।

বিস্মিত ভাবে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস উঠে গেলেন। লটি সশব্দে চটিতে পা গুঁজে, গুণ্ গুণ্ করতে করতে ঘরে চলল।

ঘরে গিয়ে লটি দেখ্‌লে, বিছানার ওপর তার জাপানী স্পানিয়েলটা দিব্যি গুড়ি সুড়ি হয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছে। অন্যদিন সে সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়ত, কিন্তু আজ তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বললে, জানিস্ রুবি, মেরে দাদা মিলা এক্‌ঠো,—ডাক্কু, ডাক্‌স্, ডিক্—তবেরে পাজী কুকুর, আচ্ছা নাক চেটে দিলি কি বলে, বল্ ত!

কোল থেকে রুবিকে নামিয়ে দিয়ে, লটি মুখে চোখে জল দিয়ে এল। তারপর একখানা বই হাতে করে শুয়ে, বইখানা খোলবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

* * * *

দিন দশেক পর কলকাতা ছাড়বার দিন, দুপুরে খাবার পর লটির ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকু ডাক্‌লে, লটি শুন্‌ছ।

—কি—

—শোনো।

লটি এসে বেতের চেয়ারটার ওপর বস্‌ল। পাঁচীলে হেলান দিয়ে ডাকু দাঁড়িয়েছিল, বল্‌লে, আজ আমি যাচ্ছি, জানো।

—হ্যাঁ।

—ছাখ, ভালো করে কিছু গুছিয়ে বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। হঠাৎ যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলি, দোষ নিও না।

—আচ্ছা, বলে লটি একটু অবাক্ হয়ে তাকালে। তারপর বল্‌লে, কিন্তু কথাটা কি না বলে শুধু বাজে বোক্‌ছ।

—তাহলে বলে ফেলি। ওয়ান্—টু—থ্রী, তুমি আমায় বে' করবে?

লটি অবাক্। হবারই কথা, কারণ ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত, তেম্‌নি অপ্রত্যাশিত। বিয়ের নানারকম প্রস্তাবের বিবরণ সে পড়েছে, সে শুনেছে। কিন্তু এ রকমটা তার ধারণার বাইরে। তার হাসা উচিত না চটা উচিত কিছু বুঝতে না পেরে সে বোকার মতো তাকাতে লাগ্‌ল।

ডাকু হো হো করে হেসে উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বল্‌লে, তুমি আশ্চর্য্য হবে জানি, কিন্তু আমি সঠিক জবাব চাই। "না" বললে আমি খুশীই হব, যদি তাই তোমার মনের কথা হয়।

ডাকুর কণ্ঠস্বরে একাগ্রতা প্রকাশ পেতেই লটির মুখচোখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। সে অন্যদিকে মুখ ফেরালে।

ডাকু বল্‌লে, তুমি ভেবে সন্ধ্যের আগে আমায় বোলো। হ্যাঁ একটা কথা। ভেবো না এইবারের দুদিনের পরিচয়ে অতবড়ো একটা কথা বলে ফেললাম। নোয়াখালীতে,—তখন অবশ্য খুবই ছোট। কিন্তু ছেলেবেলার সে আকর্ষণের পরিণতির পরিচয় পাই দারজিলিংএ। যাক্, তোমার জীবন কি পথে চলেছে, জানিনে, হয়তো আমার ভবঘুরে জীবনযাত্রার সাথে তার আগাগোড়াই গরমিল। যদি অপ্রীতির কারণ হয়ে থাকি, ক্ষমা কোরো, তবে খুলে বোলো, আমি জান্‌তে চাই। না জেনে ঢের দিন গেছে, আর সংশয় সইতে পারি নে।

ডাকু উঠ্‌তেই লটি মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লে, ডাকু দা—

—ডাক্‌ছ, ?

—হ্যাঁ।

—কি বল্‌বে ?

লটি চুপ করে থাক্‌ল। তার পর মুখ তুলে বল্‌লে, যদি আমি সন্ধ্যের আগে কিছু ভেবে ঠিক্‌ না করে উঠ্‌তে পারি ?

ডাকু দাঁড়িয়েছিল, এইবার চেয়ারের হাতলের উপর বস্‌ল। বল্‌লে, বেশ, অপেক্ষা করব।

—আজই যাবে ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

—আবার আস্‌বে কবে ?

—শিগ্‌গির নয়। ছুটি পাওয়া বড়ো শক্ত। তুমি লিখো।

—লিখব।

ডাকু বললে, বেশ। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, আমার সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চাও? কোন কথা···

লটি বললে, দরকার নেই।

ডাকু বল্‌লে, তা হলে চলি এখন নীচে ?

—আচ্ছা।

সন্ধ্যের ডাক গাড়ীতে লটির জবাব না নিয়েই ডাকুকে কলকাতা ছাড়তে হোলো। গাড়ী ছাড়বার আগের মুহূর্ত্তে লটি বল্‌লে, আমি লিখব।

অলক্ষ্যে নিয়তি ও মিসেস দাস ক্রূর হাস্য বিনিময় করলেন।

ডাকু যাবার পর এক সপ্তাহ না যেতেই, একদিন সন্ধ্যেবেলা স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছিল। লটি বাড়ী ছিল না। সাহেব জান্‌তেন ব্যানার্জ্জি পরিবারের সাথে সে এম্পায়ারে গেছে। কথাটা আংশিক সত্য, সে ছবি দেখতে গেছে সত্য, কিন্তু গেছে বিজুতে, এবং টুটুর সাথে। এটুকু মেম সাহেবের কারসাজী।

দাস বলছিলেন, ডাকু পৌঁছে চিঠি লিখেছে। একটা অদ্ভুত খবর আছে। সে লটিকে বিয়ে করতে চায়।

—Heavens! ঐ ভূতটার সাথে লটির বিয়ে! কি আস্পর্দ্ধা! Unmannerly, half-civilised boor,—

—তার মানে ? সোসাইটির সং-গুলোর মতো ইংরেজী বুক্‌নী কাটে না, কথায়

কথায় দিব্যি গালে না, বেপরোয়া মদ্যপান করে না,—এই ত। আমার ডাকুকে ভালো লাগে।

—তা লাগুক। বিলেত যায় নি, একটা আস্ত জানোয়ারই ত রয়ে গেছে এখনো। সমাজেও ওর কোনো স্থান নেই।

—একবার বিলেত ঘুরে এলেই জানোয়ারত্ব ঘুচে যেত? আমাকেও তা হলে জানোয়ারের দলে ফেল্‌ছ ত?

মেম সাহেব কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত হয়েছিলেন বললেন, তা নয়, তা নয়। আমি ঠিক্ বোঝাতে পারছি না, অর্থাৎ, set-এর বাইরে একজন অজানা অচেনা,—

দাস সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, একটু সম্‌ঝে। তুমি যে ডেপুটির স্ত্রী একথা তুমি ভুললেও বাঁড়ুজ্যে মল্লিক পরিবারের কেউ-ই এক লহমার তরেও ভুল্‌বে না জেনো। শঙ্কর রায়ের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলে, তোমার অমর্য্যাদা হবার ভয় নেই। সোসাইটির গিন্নিদের জিজ্ঞেস করে দেখো যে ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁদের অনেকেই বর্ত্তে যাবেন। ও যে কাজ করে, সে কাজ পাবার জন্যে বহু বিলেত ফেরৎ মল্লিক-বাঁড়ুজ্যের ছেলে জুতোর তলা খইয়ে ফেল্‌লে। কাদের নিয়ে তোমার set, লীলা? নিজের দেশে পরদেশী, অ্যাক্‌টিং এবং কৃত্রিম জীবন যাপনে অভ্যস্ত, জনকয়েক তাসের সাহেব-বিবি। রাস্তার ভিখিরীর যা কালচার, যা tradition, তাদেরও তাই, তফাৎ শুধু সিল্ক সুট ও ছেঁড়া কাঁথার। সে অত্যন্ত স্থূল তফাৎ। যাক্। তর্ক বৃথা। আমি নিজে মনে করি, তোমার টুটু মল্লিকের চেয়ে ডাকু অনেক উঁচু দরের ছেলে।

—টুটুর নাম করছ কেন? সে কি করলে তোমার?

—করে নি কিছু, কিন্তু ঐ একটি লোক আছে, যাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

—গা তোমার জ্বলে যেতে পারে, কিন্তু এই তোমায় বলে রাখছি আমি, তার চাকর থাক্‌বার যোগ্যতাও নেই তোমার ডাকুর।

টুটুর প্রতি দাস সাহেবের মনোভাবের আঁচ মিসেস পেয়েছিলেন, তাই লটির সাথে তার মেলামেশাটাকে যতদূর সম্ভব আড়াল করে রাখতেন। শুধু আড়াল

নয়, মেলামেশার সুযোগ ঘটাতেও মেয়ের প্রতি তাঁর হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌ বিদ্যার প্রয়োগ করতে হত প্রায়ই।

তাঁর প্রথম থেকেই ইচ্ছা টুটুর সাথে সম্পর্কটা পাকাপাকি করে ফেলেন, তা হলে সিবিলিয়ান বৈবাহিকা সুবাদে ডেপুটি জামাত্বের হীনতাটুকু একেবারে শেষ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে টুটুর সম্বন্ধে যে সব কথা কানে আসে, সোসাইটিতে সে সব ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। ও বয়সে ওরকম একটু আধটু সব ছেলেরই হয়।

কিন্তু স্বামীর বর্ত্তমান মনোভাবে এ অভিলাষ প্রকাশে অনেক বিপদ। তাই সর্ব্বাগ্রে তিনি মেয়েকে পোষ মানানোর ফিকিরে ছিলেন।

দাস সাহেব একখানা বইয়ে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ পর মৌনতা ভঙ্গ করে বল্‌লেন, তাই ত, রাত হয়ে চল্‌ল যে! Time they were back!

মিসেস বল্‌লেন, কটা বেজেছে?

—ন'টা।

—ভারী রাত হয়েছে। দশটার আগে ত ছবিই শেষ হবে না।

দাস সাহেব কথা কইলেন না। বই হাতে আপিস কামরার দিকে উঠে গেলেন।

মেম সাহেব লাইব্রেরীতে চিঠি লেখা নিয়ে বস্‌লেন।

লটির মনের গভীরতা ছিল না বললে ভুল হবে, কিন্তু সে গভীরতার ওপরের জলরাশি ছিল ঘোলাটে। তাই তরঙ্গ উঠ্‌লে আলোড়ন তলস্পর্শ করত না। কিন্তু ইদানীং যেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে সুরু হয়েছিল।

দৈনন্দিন জীবন যাপনের কৃত্রিমতার চাপ তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিত। মাঝে মাঝে মনে হত, সমাজটা যেন একটা দানব, যেন কি এক উগ্র নেশায় মত্ত হয়ে চালকহীন রেলগাড়ীর এঞ্জিনের মতো ভীমবেগে চোখ লাল করে ছুটে চলেছে—কোনো রকমে পায়ের তলায় লাইন দুটো বেঁকে বস্‌লেই ধ্বংস অনিবার্য্য। কোনো আশা, কোনো মঙ্গলের সম্ভাবনাও নেই—ঝোড়ো হাওয়ায় যেন তীব্র হিংস্র বিদ্রূপ, টিট্‌কারী দিয়ে মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

আতঙ্কে তার অন্তর আর্ত্ত হয়ে উঠ্‌ত।

ঠাণ্ডা মাথায় মাঝে মাঝে সে ভাব্‌তে বস্‌ত। পড়বার বাতিক তার চিরদিনই

ছিল, কিন্তু পড়ে সে সম্বন্ধে ভাব্‌বার অভ্যাস ছিল না। এইবারে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখতে গিয়ে এই কথাটাই বারে বারে মনে হোতো যে সুন্দরের অভাবের অবস্থাটা হয়ত তবু সওয়া যায়, কিন্তু অসুন্দরের উপস্থিতি অসহ্য।

তার এ ক্ষণিক উন্মেষের আয়ু দীর্ঘ হত না, ভস্মস্তূপের ক্ষণদ্যুতি স্ফুলিঙ্গের মতোই চরম পরিণতির দিকে ঢলে পড়ত।

আজ টুটু মল্লিকের সাথে বেরোতে তার যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কারণ অনেক। কিন্তু একটিও বলা হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া মাকে কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল।

একটি জিনিষ সে বুঝেছিল, মল্লিকের সাথে ঘনিষ্ঠতা মার কাম্য। কিন্তু যা বোঝা তার সর্ব্বাগ্রে উচিত ছিল, অর্থাৎ এ আত্মীয়তার ওপর তার নিজের মন বিরূপ, সেইটেই সে পরিষ্কার বোঝে নি।

ছবি সাড়ে আটটায় ভাঙ্‌লে, বেরিয়ে, লটি বললে, আমি বাড়ী যাব, আমার মাথা ঘুরছে।

টুটু বল্‌ল, I say, what,—মাথা ঘুরছে, এ ত ভালো কথা নয়! Let us have some food first,—খাবার সময়ও হয়ে গেছে।

—খাবার জন্যে নয়। তুমি যে কোল্ডড্রিঙ্ক দিলে এনে, সেইগুলো খাবার পর থেকে। বিচ্ছিরি ঝাঁজ লাগলো।

টুটুর ঠোঁটের ধার দিয়ে পাৎলা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেলো। বায়োস্কোপে প্রারম্ভিক দু' পেগে তার পানতৃষ্ণা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছিল, তাই সে অধিক বাক্য-ব্যয় না করে বল্‌লে, still, খেতে ত হবে। চলো ফার্পোতে।

হোটেলে ঢুকে লটি বল্‌লে, তুমি কিছুতেই drink করতে পাবে না। মাতালের সাথে ঘুরতে ভয় করে।

টুটু বল্‌ল, মাতাল? কি যা তা বোলছ? হুইস্কি অবশ্যই আমি খাই, কিন্তু তা বলে,—যাক্। I say, তোমার মাথা ঘুরছে বলছিলে না, দাঁড়াও, let me get a soothing something for you—

—আমি কিছু খাব না।

—এখেনে scene কোরো না। শেষে মাথা ঘুরে পড়ে টড়ে যাবে, একটা যাচ্ছে তাই কাণ্ড হবে।

জিন মেশানো জিঞ্জারের প্রভাবে লটির মাথা তখন বেশ ঝিম্ ঝিম্ করছিল, সে আর কথা বল্‌লে না।

ডিনার যখন শেষ হল, তখন রাত সাড়ে দশটা। ততক্ষণে টুটুর ছ'পেগ হুইস্কি ও ছুটো কক্‌টেল্ এবং লটির চারটে "soothing something" শেষ হয়ে গেছে।

নীচে গাড়ীতে এসে টুটু বল্‌লে, what about a long drive? বাড়ী যাবার আগে বুঝেছ ত,—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা,—

লটির কিছু বলবার অবস্থা ছিল না। সে জড়িত স্বরে কি একটা বলবার চেষ্টা করে টুটুর কাঁধে মাথা রাখলে।

শীষ দিয়ে টুটু অ্যাকসেলারেটরে পা দাবালে। কলকাতার রাস্তা পার হয়ে গাড়ী ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ বেগে ছুটল।

রাত দেড়টায় বাড়ী ফিরে, মিসেসের সুবন্দোবস্তে লটির নিজের ঘর পর্য্যন্ত পৌঁছতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয় নি বটে, কিন্তু তার চেহারা দেখে মিসেসের মন শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। অনবরত দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে থাক্‌তে থাক্‌তে লাল ঠোঁটে গভীরতর লাল দাগ কেটে দাঁত বসে গেছে। চোখ ছুটোর রঙ্ হয়েছে অস্ত সূর্য্যের আলোয় বর্ষার নদীর ঘোলা জলের মতো। চুল অবিন্যস্ত, উড়ছে।

সারা বিনিদ্র রাত লটির মুদিত চোখের উপর বায়োস্কোপের ফিতের মতো অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের ছায়া ঘুরতে লাগল। পাশবালিশের সুখকর উত্তপ্ত আলিঙ্গনের সাথে সাথে মত্ত টুটু মল্লিকের প্রসারিত বাহুর বিভীষিকা ফুটে উঠতে লাগল।

নারীজীবনের প্রথম জৈবযজ্ঞে নিহত, নিশ্চেতন মানসকে আবরণ করে, তার সর্ব্বাঙ্গ অসহায় ভীতিতে থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগল।

* * *

দিন যায়, ডাকুকে আর লেখা হয়ে ওঠে না। লেখবার মতো গুছিয়ে কথাও যোগায় না, লিখব বলে তোড়জোড় করে বসতেও আলসেমি লাগে। লটি যেন দিন দিন ছনমনে হয়ে উঠছে।

সে হঠাৎ অসামান্যা রূপসী হয়ে উঠেছে। দেহ-তটে যৌবনের বান ডেকেছে, পাড় উপ্‌ছে পড়ো পড়ো। কিন্তু চোখের কোলে চিন্তার কালিমা গাঢ়তর হয়ে উঠছে।

মিসেসের মন খুব ভালো। লটি কোন দিনই তাঁর অবাধ্য ছিল না, এখন যেন আরো বাধ্য হয়েছে। টুটুর সাথে বেরোতে তার আপত্তি নেই, আর্ম্মি নেভির সেলেও দিনেদুপুরে যখন তখন মায়ের সাথে সে বিনা ওজরে বেরিয়ে পড়ে। মিসেস এমনও আশা করেন যে টুটুর সাথে আর একটু ঘনিষ্ঠতা চোখে পড়লেই, তিনি সম্বন্ধের কথাটা পাকাপাকি করে ফেলবেন। তাঁর মনে ডাকু-ঘটিত একটা আশঙ্কার কারণ সর্ব্বদাই জাগরূক ছিলো, বিশেষ করে দাস সাহেবের মনোভাবের পরিচয় পাবার পর থেকে। Absurd তাহলে সমাজের বাস ওঠাতে হবে। মল্লিক বাড়ীতে তিনি আর যাবেন কোন মুখে।

সেদিন মল্লিক বাড়ীতে ডিনার ছিল। ডিনারের পর সবাই বসবার কামরায় সমবেত হলে, ভায়োলেট মিত্তির লটিকে একেলা বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, চলো একটু বেড়াই।

—চলো।

কিছুক্ষণ ফুলের বেডের ধার দিয়ে ঘোরবার পর হঠাৎ ভায়োলেট বললে, I say, Lottie, what has Tutu done to you—I mean—

লটির মুখ সহসা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে হঠাৎ গাঢ় লাল হয়ে উঠল। সে অস্ফুট স্বরে বললে, কিছু না।

ভায়োলেট ঐকান্তিক সৌহার্দ্দ্যের স্বরে বললে, সে বুঝলুম। কিন্তু তুমি ত বেবি নও লটি, আত্মরক্ষার এডুকেশনও কি তোমার হয় নি?—Or you are thinking of getting stuck to that worm? আমি অনেক আগেই এঁচেছিলুম, কিন্তু,—

তারপর ক্ষুণ্ণভাবে বললে, আমার উচিত ছিলো তোমায় সাবধান করে দেওয়া। তোমার মা জানেন?

লটি মৃদু স্বরে বললে, আমি বলিনি।

—বলে ফেল, আর দেরী কোরোনা। এমনিই বোধ হয় দেরী হয়ে গেছে।

অজ্ঞাত বিভীষিকায় লটির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার আচ্ছন্ন মননে যে সব কথা রূপ পরিগ্রহ করে উঠতে পারেনি, ভায়োলেটের খোলাখুলি কথাবার্ত্তার পর, সে সব জোয়ারের জলের মতো তার চিন্তাকে প্লাবিত করতে লাগল।

রাতে বাড়ী ফিরে সে ডাকুকে চিঠি লিখতে বসল। একান্ত নির্ভরের স্বপ্নে তার চোখের সামনে চওড়া একখানা বুকের ছবি ভেসে উঠতে লাগল। চিঠি লিখে, সীল করে, সে যখন উঠল, তখন রাত আড়াইটে।

মায়ের কথাতেই তার জীবন নিয়ন্ত্রিত, অথচ জ্ঞান হবার পর যেচে তাঁকে কিছু বলতে যাওয়ার স্মৃতি মনে আসেনা। আজ এই অসম্ভব সময়ে, সে পা টিপে টিপে মায়ের ঘরের সামনে গিয়ে ডাকলে, মা—

সে রাত মায়ের ঘরে, মায়ের পাশে শুয়ে কাটল।

... ...

ডাকুর চিঠির জবাব আসে না, লটির দিন কাটে না। একা ঘরে থাকা আর অষুধ খাওয়া, এই কাজ।, তার অসুখ।

তার অসুখ, সেই দুশ্চিন্তায় দাস সাহেবের মাথার সবকটা চুল সাদা হয়ে উঠল। সে শুনেছে, টুটুর সাথে তার বিয়ের প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তি-কারী টুটু নিজে। কানাঘুষো শোনা যায়, সে বিলেতে বিয়ে করে এসেছে, তার বিলীতী স্ত্রী চিঠি দিয়েছে, আসছে।

মিসেস হাল ছাড়েন না। মনে মনে ঠিক করেন, সার এস্, এনের ভাইপো অরুণ। সিবিলিয়ান হয়ে আসছে, তার সাথে লটির বিয়ে দেবেন। এই আপদটা এখন ভালোয় ভালোয় চুকলে হয়।

লটিকে দেখতে যাঁরা আসেন, মিসেস অদম্য উৎসাহে তাঁদের তোয়াজ করে বিদেয় করেন। লটির কাছে ঘেঁষতে দেন না।

তারপর একদিন, এমন করে দিন কাটাবার আর আবশ্যক রইল না, বাথরুমে গোঙানী শুনে মিসেস্ ছুটে গিয়ে সংজ্ঞাহীন লটির ভূপতিত দেহ আবিষ্কার করলেন, যন্ত্রপাতি, ডাক্তার, সব মিথ্যে হোলো, সে কাহিনীর বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। তারই পরিণতির সূত্রেই এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

ডাকু কাজে লাইনে ছিল। ফিরে, চিঠি পেয়ে, সে লটিকে নিতে এসেছিল। এইটুকু লটির জেনে যাওয়া হয়নি।

যুবনাশ্ব

কবিতাগুচ্ছ

নাগরিক

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আল্‌কাৎরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহু দূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্ত্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারদিকে অন্ধকার— রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোন্ দ্বীপ থেকে,—
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্তদিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্য্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য,—
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বাস্ রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন
　　আর কতো লাল সাড়ী আর নরম বুক, আর টেরীকাটা
　　　　　　　　　　　　　　　　মসৃণ মানুষ,
　　আর হাওয়ায় কতো গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
　　হে মহানগরী!
　　যদি কোনো দিন কর্ম্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
　　—স্কুল আর কলেজ হোলা শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট জনহীন,
　　দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
　　সন্ধ্যা নামলো ঃ
　　মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
　　দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চীৎপুরে ভীড় ;
　　কাল সকালে কখন সূর্য্য উঠবে!
　　কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর বসন্ত
　　বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
　　শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্ব্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি—
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

সমর সেন

কোজাগরী

আজ কোজাগরী,
বৎসরান্তে আবার এসেছে ঘুরে আমার স্মরণীয়তম রাত্রি,
তোমার সুন্দরতম।
তোমার চোখে কোজাগবীর প্রধান আকর্ষণ, এর রূপ।
সত্যই ত এ রূপের তুলনা কোথায় ?
শরতের এই স্বচ্ছ শুভ্র রজনীটির মোহে কে না পাগল ?
কিন্তু এ রূপ বড় স্পষ্ট অভিব্যক্ত স্বয়ং-সম্পূর্ণ।
দর্শকের বিচক্ষণার অপেক্ষা রাখে না ;
যেন রাফায়েল্লোর চিত্রকলা, রূপান্ধেরও চোখে পড়ে।
আমি তাই ভালোবাসি ভূতচতুর্দ্দশীর নিশীথিনী,—
ঘনশ্যাম অন্ধকারে অসংখ্য জ্যোতিষ্কের স্তব্ধ সমারোহ,
গগনবিদারী ছায়াপথের বক্ষ-বাহী বিস্তৃতপক্ষ সিগ্‌নাস্‌-এর অকম্পিত অভিযান—
যার সৌন্দর্য্য, ড্যুরার-এর ছবির মতো, সাধারণের অবজ্ঞাত,
রূপসাধকের চির-আনন্দ।
এ নিয়ে তোমাতে আমাতে অনেক বচসা হয়ে গেছে,—
সুন্দরের লক্ষণা, রুচিবিচারে অধিকারী-ভেদ, কত কি,
তোমায় আমি বলেছি অপক্ক, আমায় তুমি দাম্ভিক,—
যার মীমাংসা হয়েছে অশ্রুতে ও চুম্বনে।

অশ্রু ও চুম্বন,
আমাদের মিলিত জীবনের ইতিহাস কি এ দুটো কথায় সংক্ষিপ্ত হয়ে নেই ?
আমাদের প্রেম আজও ঊর্দ্ধাভিসারী,
পাখীর দুই ডানার মতো এদেরই আবর্ত্তনে।
তোমার আমার সম্বন্ধ ত ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নয় ;
দুটি সচল মেঘের,
যাদের মিলনে কখনো ঝরে জল, কখনো ঝলকায় বিদ্যুৎ।

এই নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে তোমার মনে ক্ষোভ নেই,
আমারও না।
তবু মনে হয়,
একবার এক কোজাগরী রাতের একটি মুহূর্তে সত্তার যে-স্তরে আমরা উঠেছিলুম,
তা আমাদের অনায়ত্ত রয়ে গেল।
তার স্মৃতিই এখন আমার চোখে প্রত্যেক কোজাগরীকে দেয় রূপাতীত মহিমা ;
এর চাঁদ যে-সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়া,
তার কিরণ মাটির পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলে নামে না।
তার অনুভূতি হয় শুদ্ধ-চেতনার অখণ্ড আনন্দে,
দেহীর দেবত্বে।
সেই দেবত্বের ক্ষণিক উপলব্ধি পেয়েছিলুম এক কোজাগরীতে,
তোমার একটি প্রণামে,
যে-প্রণামে ছিল শ্রদ্ধা, প্রীতি, নিবেদন, সমর্পণ,
অথচ ছিল না অপকর্ষ-বোধ,
ছিল সুপ্রতিষ্ঠ সাম্যের সঙ্গে লীলোচ্ছল বিনতি,
পুরুষের কাছে প্রকৃতির ;
যার বিপরীত প্রকাশ,—
উন্মাদিনী করালীর পদতলে সমাহিত মহেশ্বর।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

অপ্সরা

মোরা অযুত অযুত যুগ যুগান্ত ধরি
শুধু হাসিয়া নাচিয়া জীবন যাপন করি।
জরতীর চেয়ে প্রাচীনা,
জরারে তবুও চিনি না,
বয়সের হায় নাহিক গাছ পাথর,
কোটি কল্পান্তর।

ওগো ধরণীর এই কচি প্রাণগুলি ভরি
শুধু প্রেমে ও মৌনে দাও ভরপূর করি ;
শিশির ঝরানো আঁধারে
তারকা-নিকর বিথারে
আবরিয়া দাও হিয়াখানি তরুণার,
কিশলয় সুকুমার।

নব যৌবনে আসি পঁহুছিল যারা সবে
যেন সে তরুণীদল পুরুষের সংস্রবে
না আসে, মোদের কামনা ;
এর চেয়ে শুভ যাচনা
জানিনা ; জানত বল দেখি কী সে বর,
ফল যার শুভতর ?

বল, বল তা মোদেরে যে আমরা চিরদিন
অতি প্রাচীন হইতে প্রাচীনতম নবীন,
হাজার হাজার বরষে
মরণ নাহিক পরশে
এ অমর রূপ অচল দীপ্র শিখা,
কালের অনলে লিখা।

হায়, সে বহুদহনী বহ্নিশিখার তলে
কোন্ চিরভিখারিণী ভাসে যে অশ্রুজলে ?
পতঙ্গ-দল পড়িয়া
মরিবে মরুক পুড়িয়া !
যা তাহারা চায় পায় তাহা অনায়াসে
বহ্নিশিখার গ্রাসে।

আছে দেহের কুলায়ে অচিন্ পাখীর বাসা,
সে যে চায় পরাণের অনাবিল ভালবাসা

চায় না সে রূপলালসা
বহ্নিদহন হরষা,
চায় নিরবধি অতল জলধি নারী,
পূত জাহ্নবী বারি।

আছে পাতাল গঙ্গা দেহের অতল তলে
সেথা সূর্য্যকান্ত মরকত মণি জ্বলে।
পুরুষ রতন কোথা সে ?
কৌস্তুভমণি সুভাসে
উছল জলধি তলে যে পশিতে পারে
সে মণিরে হরিবারে।

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

সঙ্গ

ভালো লাগে তোমার একা থাক্‌তে ?
ভালো লাগে ? আমার লাগে না কিন্তু।
সব সময় নয় অন্ততঃ।
ধরো কোনো গ্রীষ্মের দুপুর—
গরমে দম বন্ধ হোয়ে আসে, এমনি এক দুপুর।
তোমার টেবিলের ওপর রয়েছে—
অসংখ্য লোভনীয় গল্পের বই,
নানাদেশের নানারঙের চোখ-ভোলানো মাসিক পত্র—
এবং আরও অনেক রকমের অনেক কিছু—
যা তোমার মনকে আকৃষ্ট করে অন্য সময়,
কিন্তু এখন ? এই গরম, গা ঝলসানো দুপুরে
তোমার সে সব ছুঁতে ইচ্ছা করে কি ?
কী কোরবে তুমি ?

চিলা কোঠায় গিয়ে শীতল পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পার অবশ্য
ফ্যান খুলে দিয়ে।
কিন্তু অশ্বস্তি আরও বাড়বে তাতে।
খানিক পরে তুমি বাধ্য হবে উঠে আস্তে।
না যাচ্ছে শোওয়া, না বসা, না দাঁড়ানো,
অস্তিত্বই হোয়ে উঠ্ছে অসহনীয়।
কী কোরবে ভেবে পাচ্ছো না,
কোরছোও না কিছু ছটফট্ করা ছাড়া।
এমনি এক দুঃসহ দীর্ঘ গ্রীষ্মের দুপুর কী কোরে কাটে বলো তো?
এই সময় তুমি কি সঙ্গ কামনা করো না
সঙ্গ কামনা করো না এমন একজনের—
যার সঙ্গে যা'তা নিয়ে গল্প কোরতে পারো
যার সঙ্গে যা ইচ্ছা তাই ব্যবহার কোরলে সে ক্ষুণ্ণ হবে না,
এবং সে যদি করে, তুমিও না?
হাসি আর গল্পে, অজস্র লঘুতায়
সুদীর্ঘ আর সুতপ্ত দুপুর কখন যাবে কেটে
তুমি টেরও পাবে না।
ভাবতে পারো ঃ কী আরাম,
মরুভূমিতে থেকেও তুমি কোনো কষ্ট পেলেনা,
কারণ তুমি ওয়েসিসে ছিলে।

কিংবা কোনো বর্ষণ-মুখর বিকেলই ধরো
বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই,
কখনো থাম্বে সে ভরসা হোচ্ছে না,
বাইরে যাওয়া যায় না, ঘরে থাকা দুঃসহতর,
সব গেছে ভিজে।
ভিজে মাটির ভ্যাপসা গন্ধ আসছে তোমার নাকে
তোমার মনও কি ভিজে যায়নি স্যাঁৎসেঁতে হোয়ে?

এমন সময় তুমি যদি পাও তেমন একজনকে—
যে বেশ ঝরঝরে রয়েছে
মনে আর পোষাকে।
সূর্য্যালোকের মতোই উষ্ণ আর উজ্জ্বল যার কথা আর হাসি
যে ঔজ্জ্বল্যে তোমার ঘর আলোকিত হোয়েছে
আলোকিত হোয়েছে তোমার মন,
কী আরাম ভাবতে পারো ?

ধরো কোনো ম্লান, বিষণ্ণ সন্ধ্যা !
তুমি রুগ্ন, ভয়ানক রুগ্ন, ভালো-না-লাগা রোগে।
তোমার মুখ দিয়ে চীৎকার বেরুচ্ছে না,
এতো অসহ্যতর তোমার যন্ত্রণা,
চুপ কোরে বোসে আছো।
রোগ চিনেছো, ওষুধ পাচ্ছো না খুঁজে।
এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করার মতো না আছে ইচ্ছা, না উৎসাহ।
সেই মুহূর্ত্তে তুমি কি কামনা করোনা তার সঙ্গ
যাকে তোমার ভালো লাগে, সিম্প্‌লি ভালো লাগে ?
তোমাকেও ভালো লাগে যার ?
যার খুসির ঢেউয়ে
মনের ম্লানিমা যাবে ভেসে, ভেসে যাবে ভালো-না-লাগা।
যার চোখের বৈদ্যুতিক আলোয়
ঘুচবে সন্ধ্যার অন্ধকার,
ঘুচবে মনের অন্ধকার।
সুস্থ, স্বাভাবিক আর তৃপ্ত মনে
তুমি বোলবে ঃ　কী আরাম !

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পাদকী

সেদিনকার সংবাদপত্রে যখন পড়লুম যে অশীতিপর বর্নার্ড্ শ অতঃপর মুখ বুজে সভা-সমিতিতে তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তির বার্ত্তা রটাবেন, তখন, সত্য বলতে কি, বেশ একটু ভয় পেয়েছিলুম। কারণ তাঁর সাহিত্যসাধনা আমার জন্মের আগেই সিদ্ধ হলেও, তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠা আমার ছাত্রাবস্থার সমসাময়িক ; এবং তিনি যদি আজ বার্দ্ধক্যের চূড়ান্তে পৌঁছে থাকেন, তবে আমিও নিশ্চয় প্রৌঢ়ির উপান্তে পা দিয়েছি। প্রথমটায় মন এ-পরিবর্ত্তন মানতে চায়নি, স্মরণে এসেছিলো যে অন্তত ভুক্তভোগীদের মতে তারুণ্যের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক অত্যল্প, এবং ষ্টাইনাক্-ভোরোনোফ্-এর অস্ত্রচিকিৎসাতেও শ্রান্ত শরীরে পূর্ব্বরাগের পুলক আবার লাগবে না বটে, কিন্তু একবার জড়তা কাটিয়ে 'প্লেজ্—প্লেজেন্ট্ এণ্ড্ অন্প্লেজেন্ট্'-এর ধূলা ঝাড়তে পারলেই মুমূর্ষু মনীষাও চিরনূতন সত্যের সংঘাতে যৌবন ফিরে পাবে। দুঃখের বিষয়, সোৎসাহ ঝাড়ন-চালনার পরেও এ-প্রত্যাশা অতৃপ্ত রইলো, বোঝা গেলো, ওয়ারেন্-জায়ার অধুনালুপ্ত জাদুর পিছনে নাট্যকারের দুঃসাহসিক স্পষ্টবাদিতা নেই, আমাদের প্রাক্সামরিক কৈশোরের গৈবী পাতকবিলাসই সেই উত্তরচল্লিশ রূপজীবীকে রূপকথার নায়িকা বানিয়েছিলো। অবশ্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও 'ক্যাণ্ডিডা'-র বিরুদ্ধে আর অনুরূপ আপত্তি টিঁকলো না, অগত্যা স্বীকার করলুম যে সেই শুচিব্রতার আকর্ষণ পাঠকবিশেষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধার ধারে না, তার আত্মস্থ উৎকর্ষ অনাগত নাট্যামোদীদেরও অর্শাবে। কিন্তু আমার উপভোগের বাধা তবু যেন ঘুচলো না ; অবচেতনের অগাধ থেকে বররুচি হঠাৎ সন্দেহের স্বরে শুধোলে সে-পুস্তকের নামকরণে ভল্তেয়র-প্রণীত উপাখ্যানের ছায়াপাত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত কিনা, এবং অনিচ্ছুক অন্তর্যামী অনেক ভেবে জবাব দিলে যে শ-এর প্রগল্ভ প্রতিভা অঘটন-সংঘটন-পটীয়সী নয়, সাধারণত পল্লবগ্রাহী ; তাই যে-নির্দ্বন্দ্ব উপলব্ধির জোরে সেই ফরাসী ভাবুক তাঁর তুচ্ছতম প্রচারসাহিত্যকেও সনাতনের সকাশে পাঠাতেন, তা কোনোদিনই বুদ্ধিসর্ব্বস্ব বর্নার্ড্ শ-এর আয়ত্তে আসেনি। কিন্তু এ বোধহয় গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ; কারণ বই-দুখানির উপাধিগত সাদৃশ্য শুধুই আক্ষরিক,

এমন-কি ধ্বনিসাপেক্ষও নয়; এবং নাটকের নামনির্ব্বাচনকালে আপন প্রতিভার বংশপরিচয় হয়তো তাঁর অজ্ঞাতই ছিলো, কুলপঞ্জিকাটা পরবর্ত্তী সমালোচকদের আবিষ্কার। তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে পরলোকগত ফ্র্যাঙ্ক্ হ্যারিস্-এর অভিযোগ অমূলক নয়, এবং অভিজ্ঞতা ও অনুকম্পার অনটনে তাঁর নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ যেমন রক্ত-মাংসহীন যন্ত্রজগতেই থেমে আছে, তেমনি হার্দ্দ্য সঙ্কীর্ণতার দোষে তাঁর সমাজ-তন্ত্রবাদও কেবল আত্মপ্রসাদের ইন্ধন জুগিয়েছে, কখনো ফেবিয়ান্ সাবধানের ভবী ভোলেনি।

সুতরাং শ-এর সঙ্গে আর আমার পা মিলছে না দেখেও আমি অবিচলিত রইলুম, বুঝলুম এ-অসামঞ্জস্যের সঙ্গে আমার নিঃসংশয় বয়োবৃদ্ধির কোনো সম্পর্কই নেই; যারা এখনো দেহে তরুণ, তারা শ-এর বর্ষণহীন গর্জ্জন শুনে আমার চেয়ে বরং বেশি চটবে। কারণ এংলো-স্যাক্সন্ বিপ্লববাদীরা আজও যদিচ মার্ক্স্-বিমুখ, তবু অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার উপরে রক্ষণশীলেরা সুদ্ধ ভক্তি হারিয়েছে; এবং ফাশিষ্ট আর কম্যুনিষ্টের মধ্যে যতই মনান্তর থাক না কেন, অন্তত এ-বিষয়ে তারা একমত যে সব ছেড়ে শুধু সুযোগ খুঁজলে কুযোগই আমাদের ঘিরে ফেলে, তখন তো গন্তব্য আর নজরে পড়েই না, এমন-কি শুভমুহূর্ত্ত চেনাও দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু এ-মন্তব্য যে-পরিমাণ নৃশংস, সে-অনুপাতে ন্যায়পরায়ণ নয়; এবং এ-কথা সত্য বটে যে বর্নার্ড্ শ-এর জীবনে অহমিকা চিরদিনই আদর্শের অগ্রগণ্য, তবু এ-দেশের সংযমী সংস্কারকদের মতো তিনি কখনো বুক ফাটাকে মুখ ফোটার উপরে বসাননি, তাঁর প্রচণ্ড পরিহাসই উনিশ শতকের সর্ব্ববিধ অত্যাচার-অনাচারের প্রতি আমার সমবয়সীদের মনোযোগ সর্ব্বপ্রথমে আকর্ষণ করেছিলো। তাহলেও সদর্থক উপদেশের অভাবে সেই উপাদেয় বিদূষণ সেকালের নিরুদ্যোগ মানুষকে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার সুপথ্য জোগাতে পারলেন না; এবং তাঁর শূন্য নির্ঘোষের নিরন্তর সঙ্গীতে আমাদের সদ্যজাগ্রত চৈতন্য আবার ঘুমে না ঢুললেও, বুদ্ধিমানেরা পর্য্যন্ত অবিলম্বে ভুললো যে বহিরাশ্রয় ব্যতীত বাক্যের কোনো অর্থ নেই। হয়তো সেইজন্যেই মহাপ্রলয়ের ডাকে সমাজতান্ত্রিকেরাও সাড়া দিলে, সাত্ত্বিক স্বাধীনতাসেবীরাই সর্ব্বাগ্রে ভাবলে যে প্রাতঃস্মরণীয় আপ্তবাক্যগুলো জপতে জপতে শব্দব্রহ্মের উদ্দেশে প্রাণ সঁপলেই বিধ্বস্ত বিশ্বে সাম্য-মৈত্রীর পুনরাবর্ত্তন ঘটবে। অবশ্য এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে বর্নার্ড্ শ ওয়েল্‌স্ বা গল্‌স্‌ওয়ার্দি-র মতো নরমেধযজ্ঞের পৌরহিত্যে মাতেননি,

উপনিপাতটাকে অনাদ্যন্ত প্রাণশক্তির দুরূহ খেয়াল ব'লে মেনে নীরবে অনুকূল লগ্নের আশাপথ চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রশংসনীয় মিতভাষণ সত্ত্বেও তিনিই আমাদের বাগ্‌জীবন বাল্যকালের প্রতীক ; এবং তাঁর ও সমধর্ম্মীদের কাছে আমরা যেহেতু সংস্কৃতিসংরক্ষণের উপায় শিখিনি, আজন্ম শুধু নেতিবাচক সংস্কারমুক্তির প্রয়াস পেয়েছি, তাই আজকের জগদ্ব্যাপী নিরীহনিগ্রহও আমাদের টলায় না, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্য অলঙ্ঘনীয় জেনে আমরা প্রতিবাদের সময়টুকু কাটাই হিরণ্যগর্ভ মৌনের আড়ালে।

এখানে স্বভাবতই একটা আপত্তি উঠবে যে রসপ্রতিপত্তিই যখন সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন রসবিচারে রূপকারের শিল্পেতর জীবন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ; এবং এ-কথা যদিও সত্য যে বর্নার্ড্ শ-এর মতামত পোষণীয়তা বা যুক্তিসঙ্গতির জন্যে বিখ্যাত নয়, চমৎকারী স্বাতন্ত্র্যের কল্যাণেই বিশ্ববিশ্রুত, তবু 'পিগ্‌ম্যালিয়ন্,' 'সেন্ট্ জোয়ান্' ও আরো অনেক রচনার সাক্ষাৎ পরিচয়ে বিপক্ষেরা সুদ্ধ তাঁর দায়িত্ববোধের দৈন্য ভুলে যায়, এবং দুর্মুখেরাও আগে তাঁর কলাকৌশলের গুণ গেয়ে, পরে তাঁর আত্মবিজ্ঞাপন, প্রকৃতিকার্পণ্য ও চিত্তলাঘবের দোষ ধরে। কিন্তু বার্নার্ড্ শ নিজেই এই রকম সমালোচনার উদ্‌ভাবক, কীট্‌স্-এর 'নেগেটিভ্ সেন্সিবিলিটি' অথবা নৈরাত্মসিদ্ধি তাঁকে কোনোদিনই টানে না, তিনি সদাসর্ব্বদা শেলি-র সর্ব্বতোমুখী সংবেদনার গুণগ্রাহী ; এবং শিল্প ও জীবনের বৈষম্যে তাঁর অবিশ্বাস এত প্রবল যে ইবসেনী নাটক সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবহৃত ব'লে সেই নাট্যকারকে তিনি স্বয়ং শেক্স্‌পীয়র-এর উপরে স্থান দেন। অবশ্য এই রুচিভেদের জন্যে শ-এর সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের বিবাদ নেই, বরঞ্চ সাম্প্রতিক বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে তাঁর নির্ভীক একদেশদর্শিতা ল্যাম্ব্-কোল্‌রিজ্, ডাউডন্-ব্র্যাড্‌লি-র অন্ধ ভাববিলাস ও উচ্ছ্বসিত স্তব-স্তুতির চেয়ে শ্রেয় ; এবং এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই বটে যে শেক্স্‌পীয়র মহাকবিদের মধ্যেও অদ্বিতীয়, তবু সুইন্‌বর্ন্ ও সাইমন্স্-এর মতো আমরা আর তাঁর কাব্যে স্বকীয় পলায়নপ্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি দেখি না, বুঝি যে নিজের সময় ও সমাজকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েই তিনি কালের কবল থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রগতিপ্রেমিক বর্নার্ড্ শ-এর বিবেচনায় এ-ধরণের সমভাব অমার্জ্জনীয় ; এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর শুচিগ্রস্ত রঙ্গরচনার এলাকায় পারিপার্শ্বিকের অব্যাহত প্রবেশ অপছন্দ করেন, এমন অবাস্তব ঘটনা বা অমূলক চরিত্রের উপাদানে নাটক-

গুলিকে গ'ড়ে তোলেন, যা তাঁর তত্ত্বসঙ্কুল্ ভূমিকাসমূহের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদাহরণ জোগাতে পারে। আসলে নিজের শিল্পপ্রেরণার উপরে তাঁর বিন্দুবিসর্গ আস্থা নেই, তিনি জ্ঞানত সারা সংসারের দীক্ষাগুরু ; এবং আজকালকার প্রতিকূল পরিমণ্ডলে অকৃত্রিম প্রবক্তাদের প্রাণধারণ যেহেতু অসাধ্য, তাই বিবেকের বাধা স'য়েও তিনি শিশুসমাকীর্ণ সমাজকে চিনির পাকে নিম খাওয়াতে বাধ্য। ফলত তাঁর প্রত্যেক প্রহসনই অবসরবিনোদনের ক্ষমতা ধরে, তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসপুত্রদের অতিরঞ্জিত দুর্দ্দশায় আমরা নিশ্চয়ই হাসি, হয়তো অর্দ্ধচেতন আত্মশ্লাঘার ঝোঁকে অল্প কিছুক্ষণ উদারনীতিতেও ডুবি ; কিন্তু সম্ভাব্যতার অভাববশত তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মীয়তা আমাদের চোখেই পড়ে না, এবং যে-চিত্তশুদ্ধি শুধু ট্র্যাজিডির নয়, মোলিয়েরী বিদ্রূপ বা সুইফট্-প্রযুক্ত শ্লেষের অনিবার্য্য পরিণাম, তার অনুপস্থিতি ঢাকবার জন্যেই যেন শেভিয়ান্ নাটকের যবনিকা নামে।

সে যাই হোক, ভল্‌তেয়র-এর পরে একা বার্নার্ড্ শ ছাড়া দুরূহ দর্শনের এমন রমণীয় ব্যাখ্যান বোধহয় আর কারো শক্তিতেই কুলোয়নি ; এবং কালধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে তাঁর তত্ত্বকথার প্রথম মুখপাত্র 'ম্যান্ এণ্ড্ স্যুপর্ম্যান্' আজ অনেকেরই ক্লান্তি জাগায় বটে, কিন্তু 'ব্যাক্ টু মেথ্যুসেলা'-র প্রস্তাবনা ও উপসংহার শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অধিকারী। ইতিপূর্ব্বে 'ক্যাশেল্ বাইরন্স্ প্রোফেশন্'-এর অমিত্রাক্ষর সংস্করণ সত্ত্বেও শ অনবদ্য গদ্যলেখক হিসাবেই আমাদের মন জুড়েছিলেন ; এবং তাঁর ভাষায় যদিচ কোনোদিনই ভাবের অপ্রাচুর্য্য ছিলো না, তবু রচনারীতিতে প্রসাদ ও পৌরুষকে প্রাধান্য দিয়ে তিনিই ইংরেজী গদ্যসাহিত্য থেকে পেটরী অলঙ্কারবিলাস তাড়ান। এইবার হঠাৎ তাঁর কবিপ্রতিভার কিন্নর-কণ্ঠ শোনা গেলো ; এবং অতঃপর আর সনাতনীদেরও বুঝতে বাকি রইলোনা যে গদ্য-পদ্যের হর্বর্ট্ স্পেন্সর-প্রদত্ত সংজ্ঞাই নির্ভুল, অন্তত পক্ষে মুদ্রাকরদের প্রচলিত প্রথা না-মেনে কাব্যকে সমমাত্রিক কিনারার মধ্যে ছাপালেও, তা কাব্যই থাকে। কিন্তু কবিতার জন্মব্যাপারে ছন্দ ইত্যাদি বাহ্য প্রকরণগুলো অনাবশ্যক হলেও, আন্তরিক হৃদয়াবেগ ব্যতীত তার উদ্ভব অভাবনীয় ; এবং 'মেথ্যুসেলা'-র অগ্রে ও পশ্চাতে প্রাগুক্ত প্রাণশক্তির প্রশস্তি গাইবার সময়ে শ যেকালে অবিশ্বাসী দর্শকবৃন্দের কথা মনে রাখেননি, নিজের নিগূঢ় অনুভূতিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের মত মিলুক আর নাই মিলুক, তর্কের অবকাশ না-পেয়ে

আমাদের সমবেদনা বেড়েই চলে। সম্ভবত এইটাই বর্নার্ড্ শ-এর বিশিষ্ট উপলব্ধি ; এবং ঐতিহাসিক কারণবশত উনিশ শতকের নাস্তিকতা তাঁকে না-বর্ত্তালে, হয়তো লামার্কী অভিব্যক্তিবাদের বাইরেই তাঁর অমৃতপিপাসা মিটতো। কেননা তাঁর মরমী চিত্তবৃত্তি আপাততই ধর্ম্মদ্রোহী, আসলে তিনিও টেনিসন্-এর মতো কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে বিজ্ঞাননিষ্ঠা দেখান ; এবং ভিভিসেক্‌শন্-এর নিষ্ঠুরতা ও চিকিৎসকদের অবিছাই 'দি ডক্টর্স্ ডাইলেমা'-র উপলক্ষ্য জোগালেও, তিনি যে বস্তুত ভূমা আর ব্রহ্মাস্বাদের সাধক, তার প্রমাণ 'দি ব্ল্যাক্ গর্ল্'-এর অভিরাম বিজ্ঞান-বিদ্বেষ। সেইজন্যই শ কখনো অন্ধ নিয়তির অকাট্য নিয়ম সইতে পারেন নি, এবং ডারুইনী বিবর্ত্তনের চেয়ে বের্গ্‌সনী 'এলঁা ভিতাল্'-ই তাঁর বেশি বরণীয় লেগেছে ; সেইজন্যেই প্রতিযোগী সমাজব্যবস্থায় তাঁর মন বসেনি, এবং প্রবৃত্তিচালিত মানব-চৈতন্যে তিনি সামবায়িক সঙ্কল্পের বীজ ছাড়িয়েছেন ; সেইজন্যেই তিনি একাধারে কম্যুনিষ্ট্ আর ফাশিষ্ট্, প্রগতির অগ্রদূত আবার মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবিকথক, জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে জৈনশোভন অহিংসার পক্ষপাতী অথচ রাষ্ট্রপরিচালনায় অমানুষিক স্বৈরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ; এবং তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ যেমন মানদণ্ডনির্ব্বিচারে বিরাট, তেমনি গুণমুগ্ধদের কাছেও সে-ব্যক্তিস্বরূপের অবৈকল্য সংশয়াচ্ছন্ন।

বলাই বাহুল্য যে অনুরূপ সঙ্করতাই বর্ত্তমান সভ্যতার দারুণ দুর্লক্ষণ ; এবং অনেকের অনুসারে প্রতিভা যেহেতু দূরদৃষ্টিরই পরম পরিণতি, তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বর্নার্ড্ শ আধুনিক আদর্শবিভ্রাটের ডাক শুনেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর সারা জীবন নিকামত তত্ত্বনিষ্কর্ষণে কাটলেও, তাঁর রচনাবলীর আষ্টে-পৃষ্ঠে সাময়িকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট ; এবং এই সকল লেখা পরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যসেবী বা সত্যসন্ধানীর কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, এগুলোর উপকারিতা আগামী ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয় সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করবে। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে এই কালানুগত্যের সবটাই কিছু সুপ্রকট নয়, অনেকখানিই শুধু অনুমেয় ; এবং অসঙ্গতির যে-আতিশয্যে আজকের বৈজ্ঞানিকেরা ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকছে এবং ধার্ম্মিকেরা বিজ্ঞানের অভিমুখে এগোচ্ছে, অথবা শিল্পীরা প্রকারকার্য্যে নামছে এবং প্রচারকেরা কারুকলার সাহচর্য্য মানছে, তার আলোড়নে বর্নার্ড্ শ-এর বিচারবুদ্ধি বড় একটা ঘুলিয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের মতো দু নৌকোয় পা রেখে ভবনদী পেরোনোর সময়োপযোগী প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যেও চিরপ্রবল, কুয়ে-প্রস্তাবিত অকারী

আত্মসম্মোহনের সাহায্যে সমাজের রোগমুক্তি তাঁরও অভিপ্রেত, এবং তিনি যখন ভাবেন যে সৎশিক্ষাই সাম্যবাদের জনক, তখন তাঁরও জানা নেই যে নরকের পথ সদিচ্ছায় বাঁধানো। আমার বিশ্বাস, আজকে সজ্জনদের মনও অনেকান্ত ব'লেই মানবসভ্যতা মৃত্যুমুখে পতিত, এবং ভবিষ্যতে বাক্যব্যয় কমিয়ে শক্তিক্ষয় না-বাড়ালে তার উজ্জীবন একেবারে অসাধ্য। সেইজন্যেই বর্নার্ড্ শ-এর প্রতি আমার প্রাথমিক অনুরক্তি আজ আমি পাল্‌টে নিতে চাই; এবং আমার কৃতজ্ঞতা এ-কথা কোনো-দিনই ভুলবে না বটে যে তিনি ইদানীন্তন স্বাধীন চিন্তার অন্যতম মন্ত্রদাতা, কিন্তু আমার পক্ষে আজ আর এমন ধারণা সহজ নয় যে আচারলুপ্ত বিবেচনায় তাঁরা যে-অতিজীবিত ঐতিহ্যকে আমাদের অবচেতনা থেকে উপড়ে ফেলেছেন, সে-ঐতিহ্য ব্যতিরেকেও মনুষ্যধর্ম্ম টিঁকে থাকবে। কারণ দুর্মর প্রাণপ্ররোহ যদিবা কার্য্য-কারণের শিকল ছিঁড়তে পারে, তবু নিরবলম্ব শূন্যে তার স্বতঃস্ফূর্ত্তি অসম্ভব; এবং নীট্‌শে-র প্ররোচনায় তুলামূল্য উৎরোতে গিয়ে শ-প্রমুখ প্রাগ্রসর নিয়ামকেরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে হয়তো নিঃশ্রেয়স নেই, আছে কেবল নাস্তি। ফলে এখন প্রকৃষ্টচিত্ত মানুষেরাই বিশেষভাবে নিশ্চেষ্ট; যা নেই তার জন্যে সতর্কতা হাস্যকর, যা অনাগত তার বিষয়ে নিরাগ্রহ স্বাভাবিক, এবং ইতিমধ্যে যা ঘটছে তা নির্ব্বিকার নৈরাশ্যে তবু একটু বৈচিত্র্য জাগায়; সুতরাং তার পথে প্রতিবন্ধক জোটানো মূঢ়তা, সে-প্রযত্নও ক্ষতিকর, এত বৎসরব্যাপী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে-প্রবঞ্চনা চুকেছে, তদুপলক্ষে শোকপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, তদপেক্ষা অপরীক্ষিত মরীচিকাই শ্রেয়; আসলে আত্মরক্ষার কোনো মানে নেই, আমরা রামে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও বাঁচবোনা। তবে এ-সম্বন্ধে দুস্তর মতভেদ অবশ্যম্ভাবী, এবং আমি যেমন সনাতন সত্যে আস্থাবান, আমার মার্ক্‌স্‌-বাদী বন্ধুরাও তেমনি শ্রেণিগত মিথ্যায় বীতশ্রদ্ধ।

পুস্তকপরিচয়

পত্রপুট }
শ্যামলী } —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য এক টাকা।

ব্রেজিল হইতে আনীত কচুরিপানা একদা কলিকাতার এক সৌখিন সাহেবের ফুল বাগানের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল ইতি জনশ্রুতি। আজ সেই বিলাস কুসুমের প্রচুর ব্যাপ্তিতে বাংলাদেশের বহু জনপথ রুদ্ধশ্বাস হইয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছে। কি কুক্ষণে জানি না, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে গদ্য কবিতার প্রবর্ত্তন করেন। কাব্য জগতের এই অপসৃষ্টি রক্তবীজের সন্ততির ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সমগ্র সাহিত্য-ক্ষেত্র আজ তাহারই বিষ-বায়ুতে দূষিত।

ইহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রপুট ও শ্যামলীর আবির্ভাব রুদ্ধশ্বাস পাঠকের পক্ষে প্রায় মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায়। রবীন্দ্রনাথও এই পুস্তকদ্বয়ে 'গদ্য-কবিতা' লিখিয়াছেন—'গদ্য-কবিতা' আখ্যা সঙ্গত কিনা তাহা বিচার্য্য—এবং অন্যান্য লেখক যে-ভাবে লেখেন সেই ভাবেই। অর্থাৎ তাঁহার টেক্‌নিক্ ও অন্যান্য গদ্য-কবিতার টেক্‌নিক্ (যদি গদ্য-কবিতার টেক্‌নিক কিছু থাকে) আপাতদৃষ্টিতে একই প্রকার। কিন্তু তবু সামান্য একটু পার্থক্য আছে। পত্রপুটের রচনা-সমষ্টির লেখক রবীন্দ্রনাথ; এই জাতীয় অন্যান্য রচনার লেখকবর্গ অন্যান্য কবি অর্থাৎ গদ্য-কবি। সামান্য এই পার্থক্যটুকু সমালোচনা-বিজ্ঞানের কোনো মূলসূত্রকে নিশ্চয় স্পর্শ করেনা কিন্তু পাঠকের রসবোধের পরিমাণে যে প্রভেদ ঘটায় তাহা আকাশপাতাল।

আপত্তি উঠিবে, শুধু গদ্য-কবিতা কেন, সকল প্রকার কবিতা, কবিতাই বা কেন, যে-কোনো প্রকারের রচনা সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট রচনা অনুযায়ী রস-বোধের তারতম্য সকল ক্ষেত্রেই তো ঘটিতে পারে। গদ্য কবিতা কি অপরাধ করিল? ইহার উত্তর এই যে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বাংলাদেশের সকল কবিই নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে তুলনা বাতুলতা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সকল নিকৃষ্টতর কবিদেরও অনেকেই যথেষ্ট উপভোগ্য কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবাল্য পুষ্ট হইয়াও এই সকল কবিতা সমাদরে বিদগ্ধজনের ব্যাঘাত ঘটে না। অবশ্য সমাদরের মাত্রাভেদ হয় প্রচুর।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আসরে গদ্য কবিতা নামধেয়ী যে নবাগত—আহূত কি অনাহূত জানি না—অবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সমাদর শিষ্টাচারসম্মত হইলেও সত্যের অনুরোধে

বলিতে বাধ্য হইতেছি তাঁহার গুণগ্রহণ করিতে আমি নিতান্তই অক্ষম, কেননা স্বকীয় শক্তিতে বহুল বৃদ্ধি ছাড়া আগন্তুকটির আর কোনো গুণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা পড়িতে পড়িতে চমক লাগে। একই তো সামগ্রী, কিন্তু কি করিয়া তাহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল। ইহা কি রবীন্দ্রনাথের ভেলকি? যাহা প্রকৃতই অপকৃষ্ট তাঁহার লেখনীর যাদুস্পর্শে তাহাই বিচিত্র বর্ণে পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে, না রবীন্দ্রনাথ ইহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বিকাশিত করিয়াছেন মাত্র, অন্য কোনো কবি তাহা পারেন নাই?

অন্য যে-কোনো প্রকারের কবিতার তুলনায় গদ্য-কবিতার বিশেষত্ব এই যে ইহার কোনো নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই—ছন্দের অতি লঘু বন্ধনেরও ইহা তোয়াক্কা রাখে না। লেখক ইহা যত ইচ্ছা লিখিয়া যাইতে পারেন এবং যাহাই লিখুন না কেন তাহা হইবে কাব্য জগতে একেবারে নির্গুণ ব্রহ্ম। মাসিক পত্রে ইহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন পাতা উপচাইয়া পড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু ক্ষতি কি? ইহা অব্যয় ও অশেষ। পাঠকও তাই যেখানে ইচ্ছা আরম্ভ করিতে পারেন, যেখানে ইচ্ছা শেষ করিতে পারেন এবং যদি বিশেষ ভাবপ্রবণ হন তাহা হইলে এই ভাবে পাঠ করিয়াও তন্ময় হইয়া যাইতে পারেন—কিম্বা পারেন না। অন্য সকল প্রকারের কাব্যও কুকবির হস্তে পড়িলে অশেষ লাঞ্ছিত হয়, কিন্তু তবু তাহাদের এক বিশিষ্ট রূপ থাকে, হয় তাহা সুরূপ নয় কুরূপ। গদ্য-কবিতা নিরূপ। যাহার একটুমাত্র লিখিবার ক্ষমতা আছে সেই লিখিতে পারে এবং একবার লিখিতে আরম্ভ করিলে কি বিষয়ে লিখিবে, কতখানি লিখিবে এবং কি রকমের লিখিবে এই সকল তুচ্ছ কথা ভাবিবার প্রয়োজন হয় না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের বোধ হয় স্মরণ আছে একদা স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের কোনো প্রবন্ধে নীরব কবি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তীব্র মন্তব্যসহকারে লিখিয়াছিলেন যে নীরব এবং কবি একসঙ্গে হওয়া অসম্ভব, কেননা কাব্যের অর্থই ভাষায় ভাবপ্রকাশ। এমন কোনো বুদ্ধিমান লোক নাই যিনি এই যুক্তি মানিবেন না। কিন্তু এ কথাও সত্য, ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ তখনই কাব্য হয় যখন তাহা সংযত আবেগে এবং সংহত রূপে মূর্ত্ত হয়। যেখানে এই সংযমের ও সংহতির অভাব ঘটে সেখানে পাওয়া যায় শুধু উচ্ছ্বাস, মুখরতা ও কোলাহল—কাব্য নহে। ছন্দের নির্দ্দিষ্ট কাঠামো কাব্যের রূপ-সৃষ্টির উপায় মাত্র।

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে ইহার অনির্দ্দিষ্ট পরিধি নিরঙ্কুশ মুখরতার অতি সহজলভ্য আশ্রয়। পত্রপুটের ও শ্যামলীর কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানেই—তাহারা মুখর নহে। কেন মুখর নহে তাহার কারণ, অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহারা আবদ্ধ না হইলেও, কবির বিশিষ্ট বক্তব্যের দরুন তাহাদের রূপ সংহত, তাহাদের গতিবেগ সংযত। অর্থাৎ ঠিক যে-কারণে উৎকৃষ্ট গদ্য বা পদ্য সংযত ও সংহত হয় সেই কারণে, পার্থক্য শুধু বোধ হয় এই যে গদ্য-কবিতায় যাহা প্রকাশ করা যায় তাহা সাধারণ গদ্যের যোগ্য বিষয়বস্তু নহে।

যদি গদ্য-কবিতার পক্ষে কোনো যুক্তি থাকে এই হইল একমাত্র যুক্তি। শ্যামলী ও পত্রপুট এই যুক্তির সারবত্তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে কিনা তাহা কে বলিবে? পাঠকের বিচারের জন্য শ্যামলীর 'হঠাৎ দেখা' কবিতাটি নিম্নে সমগ্র উদ্ধৃত হইল। এই বাহুল্যবর্জ্জিত রচনাটি একবারে মর্ম্মের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে।

রেলগাড়ীর কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন।

আগে ওকে বারবার দেখেছি লাল রঙের সাড়িতে দালিম ফুলের মতো রাঙা; আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছে মাথায়, দোলোনচাঁপার মতো চিকণ গৌর মুখখানি ঘিরে। মনে হোলো কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে, যে দূরত্ব শর্ষেক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনের নীলাঞ্জনে। থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা; চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্য্যে, হঠাৎ খবরের কাগজ ফেলে দিয়ে আমাকে করলে নমস্কার। সমাজবিধির পথ গেল খুলে; আলাপ করলেম সুরু—কেমন আছ; কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি।

সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার হওয়া চাহনিতে। দিলে অত্যন্ত ছোটো দুটো-একটা জবাব, কোনোটা বা দিলেই না। বুঝিয়ে দিলে হাতের অস্থিরতায়, কেন এ সব কথা, এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা।

আমি ছিলেম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সঙ্গে। এক সময় আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে। মনে হোলো কম সাহস নয়, বসলুম ওর এক-বেঞ্চিতে। গাড়ির আওয়াজের আড়ালে বললে মৃদুস্বরে, "কিছু মনে কোরো না, সময় কোথা সময় নষ্ট করবার? আমাকে নামতে হবে পরের ষ্টেশনেই; দূরে যাবে তুমি, দেখা হবে না আর কোনোদিনই। তাই যে প্রশ্নটার জবাব এতকাল থেমে আছে, শুনব তোমার মুখে। সত্য করে বলবে তো?"

আমি বললেম,—"বলব।" বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়েই শুধোলো,—"আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই গেছে, কিছুই কি নেই বাকি?"

একটুকু রইলেম চুপ করে; তারপর বললেম—"রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।"

খট্‌কা লাগল, কী জানি বানিয়ে বললেম না কি? ও বললে, "থাক, এখন যাও ওদিকে।" সবাই নেমে গেল পরের ষ্টেশনে; আমি চললেম একা।—

অত্যন্ত সুন্দর এই রচনাটি সন্দেহ নাই, কিন্তু অত্যন্ত বিরল এত সুন্দর গদ্য-কবিতা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইহাদের সম্বন্ধে মনে সন্দেহ থাকিয়া যায়, হয় তো ছন্দে কবির বক্তব্য আরো সুন্দর করিয়া ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু, একথা প্রমাণ করিবার সাধ্য আমার নাই। সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র যিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারিতেন তিনি স্বয়ং ইহাদের রচয়িতা। সুতরাং তাঁহারই দোহাই দিয়া তাঁহার প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে জানি না এবং অত্যন্ত গর্হিত হইলেও ব্যক্তিগত রুচির সমর্থনে এই উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়া বলিব, রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতা (কিম্বা অন্য যে-কোনো নামে এই জাতীয় রচনাকে অভিহিত করা হউক না কেন) লিখিয়াছেন এই কথা ঘোষণা করিবার জন্য—'ইহা না লেখাই ভালো, কিন্তু নিতান্তই যদি লিখিতে চাও, এই ভাবে লিখিয়ো।'

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

The General Theory of Employment, Interest and Money —by J. M. Keynes (Macmillan and Co. Ltd.)

অভিনব চিন্তাধারাব প্রবর্ত্তন করিয়া যাঁহারা ধনবিজ্ঞানের সংস্কার সাধনের চেষ্টা কবিতেছেন, Mr. Keynes তাঁহাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ তিনি 'Money' বা অর্থ সম্বন্ধে নানা দিক্ হইতে বহু অলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা-সমূহ প্রথমতঃ বাস্তব জগতের সমস্যাগুলির মীমাংসা আবিষ্কারের চেষ্টায় নিবদ্ধ ছিল—তাঁহার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের Indian Currency and Finance, এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের A Tract on Monetary Reform উভয় পুস্তকই প্রধানতঃ monetary policyকে আশ্রয় করিয়া, monetary theoryর কথা বই দুইটিতে সামান্যই আছে। এই প্রসঙ্গে অর্থের স্বরূপ প্রকৃতপক্ষে কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন, এবং এ সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞানে প্রচলিত মত যে ভ্রমাত্মক এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এই বিষয়ে তিনি কয়েক বৎসর চিন্তা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে A Treatise on Money নামক পুস্তকে প্রকাশিত করেন। এই বইখানিতে ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের বহু মনীষীর ভাবধারার সমন্বয় করিয়া তিনি "অর্থ" সমস্যাটিকে ব্যাপকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞানের কাঠামোতে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ভিত্তি অটল রহিয়াছে।

আলোচ্য বইখানি এক দিক দিয়া Keynes-এর পূর্ব্বরচনার ক্রমবিকাশ মাত্র, কারণ ইহার বিষয়বস্তু Treatise এ সূচিত এবং অনেক ক্ষেত্রে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আর এক দিক দিয়া ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের, কারণ ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ধনবিজ্ঞানের আমূল সংস্কার সাধন।

সংক্ষেপে বইখানির বিশেষ পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। প্রচলিত ধনবিজ্ঞানের গলদ কোথায় এবং ইহার মূলসূত্রগুলিতে কি কি পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন তাহার যে আলোচনা এই বইখানিতে আছে তাহা অতি জটিল, এবং বহু নূতন-পারিভাষিক শব্দে ভারাক্রান্ত। Mr. Keynes বিশেষ করিয়া প্রচলিত theory of wages এবং theory of interest-এর ভুল দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উভয় theoryতেই অর্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না থাকায় উহারা বাস্তব জগতের কোন পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মূলসূত্রগুলিতে অর্থ বিষয়ে এই নিরপেক্ষতা Keynes এর মতে একটা মারাত্মক ক্রটী। দৃষ্টান্তস্বরূপ theory of wages ধরা যাউক। প্রচলিত মত অনুসারে "the wage bargains between the entrepreneurs and the workers determine the real wage" (১১ পৃঃ)। অর্থাৎ দিনমজুরীর সাধারণ হারের প্রকৃত মূল্য (বা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার যোগ্যতা) নির্ভর করে মালিকের সহিত শ্রমিকের যে চুক্তি হয় তাহার উপর। Keynes দেখাইয়াছেন যে সেই চুক্তির উপরে নির্ভর করে শুধু ক্ষেত্রভেদে দিনমজুরীর আপেক্ষিক হার; ইহার সাধারণ হার নির্ভর করে

amount of employment-এর উপরে, এবং এই amount of employment নিরূপিত হয় প্রধানতঃ তিনটি শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে—marginal propensity to consume, marginal efficiency of capital, এবং state of liquidity preference। এই নূতন ব্যাখ্যা অনুসারে wage-rate শ্রমিকগণের মানসিক অবস্থা অপেক্ষা জনসাধারণের এবং বিশেষ করিয়া ধণিকগণের মানসিক অবস্থা দ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

Theory of interest আলোচনা করিয়াও Keynes অনুরূপ অভিনব সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। প্রচলিত theory অনুসারে সুদের হারের উপর quantity of moneyর কোন প্রভাব নাই। Keynes কিন্তু উহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (পৃঃ ১৬৭-১৬৮)। এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইলে ধনবিজ্ঞানের একটি সুপ্রাচীন সমস্যার সমাধান হয়—কেন যে দ্রব্যাদির মূল্যের সাধারণ হারের সহিত সুদের হার বাড়ে কমে ইহার একটা সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যায়।

এই মত অবলম্বন করিয়া Keynes বেকার সমস্যার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রচলিত theory অনুসারে বেকার হওয়ার জন্য সাধারণতঃ শ্রমিকেরাই দায়ী—তাহারা যদি সামান্য মজুরীতে সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলে সাধারণতঃ বেকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই (পৃঃ ১৬)। Keynes কিন্তু দেখাইতেছেন যে এ বিষয়ে শ্রমিকের কোনই হাত নাই—সে অবস্থার দাস মাত্র।

"Unemployment develops because people want the moon;—men cannot be employed when the object of desire (i. e. money) is something which cannot be produced and the demand for which cannot be readily choked off." (পৃঃ ২৩৫)।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সর্ব্বসাধারণের মুখ্য কাম্য হইয়াছে 'অর্থ', যে 'অর্থ' পরিশ্রম করিয়া সৃষ্টি করা যায় না—এবং তাহার ফল এই বেকার সমস্যা, মোটামুটি এই তাঁহার সিদ্ধান্ত।

এই জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইলে ধনবিজ্ঞানে যে যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন হইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই মতবাদের নূতনত্ব প্রকৃতপক্ষে কোথায় এবং প্রচলিত theoryর সহিত ইহার যোগসূত্র কি তাহা বইখানির ভূমিকা হইতে গৃহীত নিম্নোক্ত অংশে বোঝা যাইবে—

"A monetary economy, we shall find, is essentially one in which changing views about the future are capable of influencing the quantity of employment and not merely its direction. But our method of analysing the economic behaviour of the present under the influence of changing ideas about the future is one which depends on the interaction of supply and demand, and is in this way linked up with our fundamental theory of value." (পৃঃ ৭, ভূমিকা)।

বইখানি সম্বন্ধে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বর্ত্তমানে প্রচলিত theory অনুসারে যে সকল মত অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলিয়া অগ্রাহ্য হইতেছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি ইহাতে কতকাংশে সমর্থিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত অংশটি লওয়া যাইতে পারে—

"I sympathise, therefore, with the pre-classical doctrine that everything is pro-

duced by labour.......It is preferable to regard labour...as the sole factor of production..." (পৃঃ ২১৩-১৪)।

Adam Smith-এর পূর্ব্ববর্ত্তী Mercantilistদের মতবাদ এবং দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তিও (Protectionism) এই পুস্তকে সমর্থিত হইয়াছে।

উপরোক্ত অংশে বইখানির বিষয়বস্তু এবং সিদ্ধান্তের মোটামুটি ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহা হইতে লেখকের মানসিক শক্তির যে পরিচয় বইখানিতে আছে তাহার কোন আভাস পাওয়া যাইবে না। বইখানির বহুল প্রচার অবশ্যই হইবে—ইহার মূল্য মাত্র পাঁচ শিলিং করাও তাহার একটা কারণ। কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তসমূহ যে সহজে পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হইবে এরূপ মনে হয় না। Prof. Pigou ইতিমধ্যেই Economica পত্রিকায় ইহার প্রত্যেক অংশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সমালোচনার এক অংশের সহিত সকলেই একমত হইবেন—বইখানির রচনাভঙ্গীতে Keynes-এর স্বভাবসুলভ প্রসাদগুণ মোটেই নাই। অন্যান্য বিষয়ে আরও আলোচনার ফলে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বইখানির নানাস্থানে পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু ইহার সারবত্তা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। Marshall-এর "Principles of Economics" ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পরে ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ মূল্যবান আর কোন পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই।

পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী।

The Life and Letters of John Galsworthy —By H. V. Marrot (Heinemann)

গ্রন্থখানি সুবৃহৎ ও চিত্রবহুল কিন্তু সুখপাঠ্য নয়। জীবন-চরিত-সাহিত্যের সেকেলে প্রশস্তি-সর্ব্বস্ব সালঙ্কার প্রকৃতি একালে অচল। আজকালকার পাঠক সম্প্রদায় অরুচিকর পাঠ্য পুস্তকে বীতশ্রদ্ধ। হাটের চাহিদা রহস্য, কুৎসা ও চাঞ্চল্য। সেই জন্য আধুনিক জীবনীকারেরা নায়ককে অবলম্বন করে সমসাময়িক সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ-চিত্রণে প্রয়াসী হয়। গলস্‌ওয়ার্দ্দীর সম্রান্ত ইংরাজী জীবন স্বভাবতঃই রহস্যবিরল; তার ওপর প্রণেতার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা, বিধবা ও পালিত পুত্রের ভক্তির আধিক্যে অতিরিক্ত মার্জ্জিত ও মহিমামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে। এতে পাঠকের ধৈর্য্য ক্লান্ত হয়; নতুবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পরিশেষে সঙ্কলিত পত্রাবলী এবং গলস্‌ওয়ার্দ্দীর স্বরচিত আত্মস্মৃতির খণ্ডচিত্রগুলি যথার্থই প্রণিধান-যোগ্য।

নায়কের বহিঃপ্রকৃতি যেখানে নীরস, আভ্যন্তরিক সঙ্গতির অনুধাবনা সেখানে বিধেয়; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থকারের দৃষ্টিশক্তি ছায়াচিত্রের মত আপাত-বিস্তারিত বলে' কোন বৈশিষ্ট্যময় ঘটনার অন্তঃস্থলে তা প্রবেশ করতে পারেনি। তাতে লাভ বই ক্ষতি হয়নি, কারণ এ গ্রন্থ প্রকাশের মূল

উদ্দেশ্যেই যখন স্তুতিবাদ তখন পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিশ্লেষণী বর্ণনা আশা করা যেত না—ববং সত্যের অপলাপ করা হত।

আমার ধারণা অনন্যসাধারণ শিল্পী মাত্রেরই জীবনে দুইটি কঠোর সাধনার সময় আসে। একটি যখন অন্তরের প্রতীতি বহিঃপ্রকাশ হবার জন্য ভাষার প্রতীক্ষা করে; আর একটি যখন সাফল্যের অহমিকা সৃষ্টির স্বাভাবিক গতিকে ক্ষিপ্র ও ব্যাপক করে' তুলে স্রষ্টাকে সংস্কারক করে তোলে।

গলস্‌ওয়ার্দ্দীর জীবনে এই দুইটি অন্তর্দ্বন্দ্ব এতখানি প্রবল ছিল যে ম্ট্রেচীর মত সুযোগ্য লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানি অবলম্বন করেই প্রকৃষ্টতর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন।

স্থৈর্য্য-ধৈর্য্যভরা সাবেকী আমলের কথা। ধনী সন্তান, যথাক্রমে হ্যারো ও অকস্‌ফোর্ড হতে উত্তীর্ণ হয়ে নৌ বিভাগীয় আইন অধ্যয়নে সমুদ্র যাত্রায় প্রেরিত হলেন সুদূর দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে। প্রথম অভিযানে দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় বারে কন্‌রাডের সঙ্গে হলো পরিচয় ও বন্ধুত্ব; প্রথম সাক্ষাৎ হয় অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে—রৌদ্রদগ্ধ শীর্ণকায় পোলিশ নাবিকটি তখন মাল বোঝাই-এর তদারক করছিলেন। তারপর পালবাহী জাহাজের অনন্ত অবকাশ ভরে গেল ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজি গল্প কথায়। পুস্তক-পুষ্ট স্থাবব মন উদ্বেলিত হয়ে উঠলো বিপ্লব, জল, ঝড়, খুনোখুনি, নিবিড় প্রেম ইত্যাদি লোমহর্ষক ও মনোরঞ্জক কাহিনীতে। বিজাতীয় লোকটির অত্যদ্ভুত পর্য্যবেক্ষণ ও বর্ণনা-শক্তিতে যুবকের হৃদয়ে প্রথম সৌন্দর্য্য-বোধ অঙ্কুরিত হলো; পরে রাশিয়া ভ্রমণকালে প্রকৃতির প্রশস্ত অঙ্গনে উদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যরাশি পত্রপুটে সঞ্চিত করে ভগ্নীর সন্নিধানে পাঠিয়ে দেবার যে প্রবল চেষ্টা ও অক্ষমতার জন্য আক্ষেপোক্তি পাওয়া যায় ধ্বনি-হিল্লোল ও চিত্রকল্প-প্রধান চিঠিগুলিতে তাতে হয়তো উদীয়মান প্রতিভার ইঙ্গিত মেলে; কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা তখনও গলস্‌ওয়ার্দ্দীর মনে উদয় হয় নি।

আরও অনেক পরে কোন এক রেল ষ্টেশনের বুকষ্টলে ভ্রাম্যমাণ ভ্রাতৃজায়া কথাচ্ছলে বলে ফেলেন "তোমার দ্বারা হবে - লেখোনা কেন?" "আমি"? "হ্যাঁ গো—হ্যাঁ তুমি।"

গলস্‌ওয়ার্দ্দীর বয়স তখন প্রায় আঠাশ। ভবিষ্যৎ, প্রণালীবদ্ধ। স্নেহশীল পিতার আভিজাত্য ও অহঙ্কার নবীন ব্যারিষ্টারের কর্ম্মপটুতায় সন্তুষ্ট। কিন্তু প্রেম এবং বিশেষ করে অবৈধ প্রেম বড় বিষম দায়। প্রণয়িনীর এক কথায় জন্মগত বিধান বিদলিত হল। নাটকের উচ্ছৃঙ্খল নায়কের মত উচ্চ শিক্ষিত ইংরাজ যুবকটি সব কিছু পরিহার করে কলা-লক্ষীব আরাধনায় মেতে গেলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ আর্থিক অবস্থা ছিল সচ্ছল। প্রথম সাত বছর ঐকান্তিক সাধন ও মার্জ্জনের ফলে চারখানি কিপলিং-এর খেলো অনুকৃতি ছাপা হল আপন ব্যয়ে, ছদ্মনামে। অর্থাগম হল না—উপরন্তু ঘব থেকে গেল পঁচাত্তর পাউণ্ড। এর পর ক্লান্তি হয়তো আসতো কিন্তু কনরাডের ও প্রণয়িনীর আশা প্রচেষ্টাকে জাগিয়ে রাখলে। এই সময় কনরাড করে দেন এডওয়ার্ড

গারনেটের সঙ্গে পরিচয় এবং তাঁরই উপদেশ অনুযায়ী দুবছর পরে প্রথম পুস্তক "আইল্যাণ্ড ফারিসি" স্বনামে প্রকাশিত হয়। সমালোচকেরা স্পষ্টতঃ প্রশংসা না করলেও আশাপ্রদ বলে অভিহিত করেন। আরও দুবছর পরে অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী তূর্য্যধ্বনি করে প্রবেশ করলে "ম্যান অফ্ প্রপার্টি।" যশ ও অর্থ এল হুড়মুড় করে। ভাষার লালিত্যে ভাবের ঘনত্বে, বর্ণনার সূক্ষ্মতায় বইখানি প্রথম শ্রেণীর বলে গণ্য হলো।

এই হচ্ছে সাহিত্য সাধনার সূচনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গলস্ওয়ার্দ্দী বলতেন তাঁর সাফল্যের জন্য তিনি তুরগেনেভ্ আর মোপাসাঁর কাছে ঋণী। কিন্তু শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি এত সহজে খোলে না—আসল কারণটি—আলোচ্য গ্রন্থে সম্পূর্ণ উহ্য থেকে গেছে; তার কারণ তাঁর বিধবা প্রেমপত্র-গুলিকে প্রকাশ করেন নি। ভ্রাতৃজায়াকে পত্নীরূপে লাভ ক'রতে তাঁকে সমাজের সঙ্গে দীর্ঘ নয় বছর সংগ্রাম ক'রতে হয়েছিল—সে সংঘর্ষে যে দুর্ব্বহ নৈরাশ্য, দুর্নিবার বেদনা, অপার আনন্দ এসেছে গেছে, তার সংরক্ত আঘাতে, শুভ লগ্নে, সৌখীন রচনা-চাতুর্য্যের আস্তরণ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আমার ধারণা, মানব-প্রকৃতির যুগ যুগ সঞ্চিত দ্বেষ হিংসা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় এক একটি মানুষের হৃদয় জুড়ে বসে থাকে এবং আত্মপ্রকাশ করে নিবিড় নিগূঢ় ও গোপন ভাবে, ভদ্রতার অবগুণ্ঠনে, সকলের অজ্ঞাতসারে পদচিহ্ন রেখে যায় অন্তর্বেদনার ভিজা-মাটিতে। গলস্ওয়ার্দ্দীর হৃদয় বিদলিত হয়েছিল এই স্থূল পদবিক্ষেপে—তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই সংঘর্ষের ইতিহাস। গভীর প্রেমের বেদনা-সঞ্জাত আবেগ ভাষাকে অনুভূতিকে করে এনেছিল পেলব সুন্দর।

এর পর তাঁকে আর ক্লেশ পেতে হয় নি। অজস্র নাটক, গল্প, উপন্যাস ও পত্রাবলীর মধ্যে নিকৃষ্ট লেখার অভাব নেই কিন্তু লিপিশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল শেষ বয়স পর্য্যন্ত। 'অন ফরসাইট চেঞ্জ' লেখা হয় ৬৩ বছর বয়সে।

কিন্তু মানুষের ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির এমনি মহিমা যে দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনায় পূত ও পরিশুদ্ধ স্রষ্টাটিও সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরায়ণতায় ও পাণ্ডিত্যাভিমানে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহ করেই অল্পকালের মধ্যে দুঃস্থ দুর্নীতিময় সমাজের সংস্কার-কল্পে টাইমস্ পত্রিকায় পত্রাঘাত করতে লাগলেন। তুমুল জন আলোড়ন ঘটালেন দণ্ডবিধির সংশোধনের জন্য। উদ্দীপনাপূর্ণ নাটক রচনা করলেন এবং রাজকর্ম্মচারীদের পত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করে অবশেষে কৃতকার্য্য হলেন আংশিক ভাবে। উৎসাহ বর্দ্ধিত হল। রণক্ষেত্রে বিমানপোত নিরাকরণ হতে বস্তী সংস্কৃতি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশটি আন্দোলনে যোগদান করে বসলেন। এদিকে মহৎ কার্য্যের আতিশয্যে তাঁর ব্যক্তি-গত প্রকৃতি হয়ে গেল সঙ্কীর্ণ। জনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্লেষ প্রকট হয়ে উঠলো।—হাস্যরস-বোধ হারিয়ে বসলেন। যে গারনেটের সমালোচনায় প্রভূত ভাবে উপকৃত হয়েছেন—যার উপদেশে 'ম্যান্ অফ প্রপারটির' বসিনেকে আত্মহত্যা না করিয়ে কুয়াসার অন্ধকারে মৃত্যু ঘটিয়ে বইখানির

মধ্যে একটি জমাট বেদনাকে অমোঘ করেছিলেন—তাঁকে করলেন অবজ্ঞা। বেচারা কনরাড হয়ে রইল কৃপার পাত্র। বিরুদ্ধ সমালোচনায় ও কার্টুনে অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন তীব্রভাবে।

শান্তি এল নিষ্ঠুর ভাবে মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে। দেশভক্ত ও স্ত্রৈণ গলস্‌ওয়ার্দ্দী উভয় সঙ্কটে পড়লেন। মন স্থির হল না। শান্তিপ্রিয় বন্ধুদের লিখলেন শান্তি চান। ফরাসী বন্ধুদের লিখলেন জার্মান জানোয়ারদের কামানের অনলে উড়িয়ে দিলে সভ্যতা রক্ষা পায়। জার্মান ঐতিহ্যকে ব্যঙ্গ করলেন রূঢ়ভাবে। বল্লেন—কি সঙ্গীতে, কি সাহিত্যে, কি চিত্রকলায় জার্ম্মানী মৃত। গত দুই পুরুষের জার্ম্মানদের অভিহিত করলেন বর্ব্বর বলে। দেশ সেবার আর কোন বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ উপায় না পেয়ে—চালিয়ে দিলেন অজস্র নিকৃষ্ট রচনা মার্কীনী হাটে। অর্থ সমর-কোষে দান করে নিজেকে দায়মুক্ত ভাবলেন। মতবাদের অসামঞ্জস্য প্রকট হল যখন ফরাসী সরকার জার্ম্মানীর অভ্যন্তরে কৃষ্ণকায় সৈন্য-প্রেরণ করলেন। বর্ণ-বিদ্বেষ পীড়িত হয়ে উচ্ছ্বাস থেমে গেল। তখন ইংরাজই হল শ্রেষ্ঠ জাতি। জার্ম্মানীর প্রতি শ্লেষ অকস্মাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার স্কন্ধে ভর করলে। আমেরিকা অর্থব্যয় ও উচ্ছ্বাসের অনুপাতে বহু ঊর্দ্ধে স্থান পেলো।

রাজনৈতিক মতবাদে সামঞ্জস্য রেখে চলা কঠিন কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক সমরথীদের প্রতি বড় বেশী অনুকম্পা ছিল বলে মনে হয় না—ডি, এইচ লরেন্সকে বলেছিলেন অশ্লীল, অবান্তর, ঘৃণিত ডষ্টোয়েভস্কির রোগজীর্ণ-ছায়া। রোমা রোলাঁ ছিলেন চক্ষুশূল। ওয়াইল্ডকে বলেছিলেন অসহনীয়। উক্তির অভাব নেই। শিল্পীর সৌকর্য্যকে এককথায় ছেঁটে ফেলে দেওয়া অমার্জ্জনীয় অহঙ্কার।

গলস্‌ওয়ার্দ্দীর এই সকল রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণ চিত্ততা গ্রন্থকারের নিকট গৌরবের বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে। হয়তো অধিকাংশ ইংরাজের মানসিক প্রতিক্রিয়া তাই হবে। কারণ জাতীয়তার অভিমান অত্যন্ত কঠিন আবরণ। কিন্তু গলস্‌ওয়ার্দ্দী কাল ও লোকের ঊর্দ্ধতন জগতে ওঠবার অভীপ্সা পোষণ করতেন। তাঁর বিবেক যে হৃদয়াবেগের স্বৈরাচারে পীড়িত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থোপার্জ্জন কল্পে নিকৃষ্ট-সাহিত্য রচনার জন্য আক্ষেপোক্তিতে।

গ্রন্থকার গোড়ার দিকে বলেছিলেন গলস্‌ওয়ার্দ্দীর চরিত্র তাঁর রচনার মধ্যে ফুটে ওঠে; সুতরাং বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। এই সত্যের উপর যদি নির্ভর করে তিনি নির্ব্বাক হয়ে থাকতেন তা হলে বোধ করি গলস্‌ওয়ার্দ্দীর আত্মার সুনিদ্রা হ'ত। কিন্তু কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ে আমার মত অলস সংবাদগ্রাহীর বিশেষ উপকার হয়েছে। গলস্‌ওয়ার্দ্দী নাইটহুড্ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আমি জানতাম না। পি, ই, এন ক্লাবের ইতিহাসও আমার সঠিক জানা ছিল না। এইটুকু কৃতজ্ঞতার দাবী জীবনীকার করতে পারেন।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Joseph Conrad—By Edward Crankshaw (Bodley Head)

জীবিত লেখকের আমাদের উপর দাবী অনেক। বাঁচিয়া থাকার চেয়ে বড় কথা বোধ হয় পৃথিবীতে নাই, এবং সমস্ত আর্ট, সমস্ত শিল্পেরই মূলে এই বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা। তাই কেবল মাত্র বাঁচিয়া থাকিয়াই জীবিত লেখক আমাদের কৌতূহল এবং প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন। জীবিত লেখকের কাছে আমরা নিত্য নূতন আনন্দ প্রত্যাশা করি। সে প্রত্যাশাও তাঁহার প্রতিষ্ঠার একটি কারণ। তাহা ছাড়াও জীবিত লেখকের একটি মস্ত বড় সুবিধা এই যে আমাদের মত এবং রুচির বদলের সঙ্গে তাঁহারও রুচি বদলায়, কাজেই পিছনে পড়িয়া থাকিবার ভয় তাঁহার বড় বেশী নাই।

মৃত লেখকের বেলায় কিন্তু এসব কথা খাটে না। তাঁহার যাহা বলিবার তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাই প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব থাকিবার অবসর আমাদের নাই। রুচি এবং সমাজ-বোধ বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো কালের আচার ব্যবহারও অনেক সময় অদ্ভুত ঠেকে, তাই বাহিরের সেই প্রকাশের পার্থক্যে মানুষমনের ঐক্য অনেক সময়েই চাপা পড়িয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে মৃত লেখককে আমরা জানি, এবং জানি বলিয়া সেখানে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। জীবিত লেখককে যতই আমরা জানিতে চেষ্টা করি না কেন, সকল সময়েই একটা সম্ভাবনা থাকে যে নতুন কিছু করিয়া তিনি আমাদের পূর্ব্বের সমস্ত ধারণা একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া দিবেন!

বিস্ময়ের অবকাশই তাই লেখকের অমরত্বের ভিত্তি। সম্পূর্ণ ভাবে যাহা বোঝা যায়, তাহাতে আর কৌতূহল থাকে না, তাই মৃত লেখকদের মধ্যে যাহারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আজিও রহস্যাবৃত, তাঁহারাই আজও আমাদের কাছে অমর। ক্র্যাঙ্কশয়ের প্রতিপাদ্য এই যে কনরাডের মধ্যে সেই রহস্যের উপাদান রহিয়াছে, তাই সাহিত্যিক হিসাবে তিনিও অমরতা দাবী করিতে পারেন।

সে কথা প্রমাণ করিতে গিয়া ক্র্যাঙ্কশ উপন্যাসের গঠন এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। উপন্যাসের সৃষ্টির মূলে কেবল মাত্র প্রতিভাই কার্য্যকরী নহে, সজ্ঞান প্রয়াসেরও তাহাতে অভাব নাই। কনরাডের সাহিত্য সৃষ্টির বিশ্লেষণে তাই ক্র্যাঙ্কশ শিল্পী কনরাডের বিচারেই প্রবৃত্ত, কারণ শিল্পীর শিল্পনীতি বিচার্য্য, সাহিত্যিকের প্রতিভা অনির্ব্বচনীয়। সমস্ত চারু-কলাতেই লেখকের বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ পাইতে বাধ্য, উপন্যাসেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কনরাডের বেলায় সে বিশ্বদৃষ্টির মূলকথা ব্যক্তিত্বের বিকাশ। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে যে শক্তির প্রাচুর্য্য এবং অনিবার্য্যতা আমাদিগকে সহজেই আকর্ষণ করে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বলিয়াই তিনি তাহা আঁকিতে পারিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের সমস্ত কারবারের মূলে যে কয়েকটী বিশ্বাস, সেগুলি সমস্তই সহজ এবং গভীর। ব্যক্তির বিশ্বাসেই সমাজ এবং সংসার চলে, এবং সে বিশ্বাসের উৎস মানুষের আত্মপ্রত্যয় এবং বিশ্বস্ততা।

ব্যক্তিকে বড় না করিয়া উপন্যাস রচনা হয়তো অসম্ভব, কিন্তু অন্য পক্ষে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের উপর ঝোঁক পড়িলে শিল্পের গভীরতা এবং মহত্বের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষ এবং প্রকৃতি, এই উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াই জীবনের রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে, তাই কেবলমাত্র প্রকৃতিকে বড় করিয়া দেখিলে চারুকলার সহজ মানবধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, আবার কেবলমাত্র মানুষকে বড় করিয়া দেখিলে শিল্পের চিরন্তনতার হানি। কনরাড মানুষের শারীরিক অনুভূতি বা সংবেদনার মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং ক্র্যাঙ্কশয়ের মতে সে চেষ্টা সার্থক। কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়া চলেনা। কারণ সংবেদনার ধর্ম্মই এই যে তাহা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, তাই গীতি-কাব্যের উপাদান হিসাবে সংবেদনা অনবদ্য, কিন্তু গীতিকাব্যেও সংবেদনাকে অতিক্রম এবং রূপায়িত করিতে না পারিলে কাব্য হয় না, উপন্যাসের বেলায় রূপায়ণ এবং অতিক্রমণই শিল্পের মর্ম্মকথা। ক্র্যাঙ্কশ যে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ সম্পূর্ণ ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন, সে কথা বলা কঠিন।

হুমায়ুন কবির

The Rise of European Liberalism—By Harold J. Laski—(George Allen and Unwin Ltd.)

ইতিহাস আলোচনায় একটা স্তরভেদ স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। বিভিন্ন ঘটনা নির্দ্ধারণ, নিছক ফ্যাক্টের বর্ণনা ঐতিহাসিক চর্চ্চার ভিত্তিস্থল। এই প্রাথমিক বিবরণ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ থাকে না, অন্ততঃ যেখানে মালমশলার প্রাচুর্য্যের জন্য কল্পনার আশ্রয় নিষ্প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড সত্য নিয়ে মানুষের মন তৃপ্তি পায় না, এতে আবদ্ধ থাকলে ইতিহাস নিতান্ত নীরস ও অনেকাংশে নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাই ঐতিহাসিক তাঁর বিদ্যাকে একটা উচ্চতর স্তরে তুলতে চেষ্টা করেন—সে ক্ষেত্রে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধসূত্রের মালায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাকে গ্রথিত করার উদ্যমই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এইখানেই ইতিহাসে ব্যাখ্যার রাজ্য আরম্ভ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এর পর মতভেদের আর অন্ত থাকে না। উনিশ শতকে রাঙ্ক, য়্যাক্টন্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করতেন যে এমন ইতিহাস রচনা করা সম্ভব যা সকলের কাছে সমানভাবে গ্রাহ্য হবে। আজকের দিনে এ-বিশ্বাস রাখা নিতান্ত শক্ত। বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী ইতিহাস-চর্চ্চার দ্বিতীয় স্তরে প্রায় অচল এবং ইতিহাস-লেখকের পক্ষে একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে' বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষতায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। অথচ ব্যাখ্যার আশ্রয় ব্যতীত ইতিহাস কিম্বা অন্য অনুরূপ জ্ঞানান্বেষণকে ঠিক বিদ্যার পর্য্যায়ে ফেলা চলে না।

ইয়োরোপীয় ইতিবৃত্তের গত পাঁচ শতাব্দীকে নিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি সম্প্রতি যে তার মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন সে সম্বন্ধে তাই মতান্তর স্বাভাবিক। তবুও অনেক পাঠকের কাছে

তাঁর বইখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে। ল্যাস্কির সুপ্রসিদ্ধ লিপিকৌশল তাঁর অধুনাতম গ্রন্থেও প্রকাশ পেয়েছে যদিও এবার স্থানে স্থানে পুনরুক্তি-দোষ আমাকে পীড়া দিয়েছে। এর ফলে লেখকের যুক্তির সুস্পষ্টতা খানিকটা বাধা পেয়েছে মনে হয়। ল্যাস্কি যে খুব নূতন কথা বলেছেন তাও বলা যায় না কিন্তু তাঁর মতন সুলেখকদের কৃতিত্বেই নূতন ধারণা পাঠকমহলে ছড়িয়ে পড়ে এবং শিক্ষিত সাধারণের মনে নব প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

গত বৎসর 'ষ্টেট্' গ্রন্থে ল্যাস্কি যে-দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন এই পুস্তকে তার অনেকখানি পরিণতি লক্ষ্য করা সহজ। কিছুদিন থেকে ল্যাস্কি মার্ক্সের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন এ-কথা বোধহয় অনেকের কাছেই অবিদিত নয়। আলোচ্য বইখানিতে সাম্যবাদের ছায়া পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করবেন। তবুও ল্যাস্কিকে এখনও পুরোপুরি মার্ক্স-তন্ত্রী বলা চলে না। বস্তুবাদের কাঠামোর মধ্যে ডায়ালেকৃটিকের গতিচ্ছন্দ ল্যাস্কির লেখার ভিতর সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় নি বলেই মনে হয়। কিন্তু ল্যাস্কির রাষ্ট্রচিন্তার স্রোত যে কোন দিকে বইছে সে সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ নেই। তিনি এখন বলছেন যে আর্থিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সকল ভাবধারার মূল উৎস শ্রেণিগত স্বার্থের বিকাশ। ইয়োরোপে গত পাঁচ শ' বছর ধরে' ধীরে ধীরে লিবেরালিজ্‌ম্ বা উদারনীতির ক্রমপ্রকাশ হয়েছে কিন্তু তার পিছনে যে-শক্তি গতিসঞ্চার করে আসছে সে হচ্ছে বুর্জোয়া ধনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়।

ইয়োরোপে গত তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে প্রায় সমান আয়তনের ছয়টি যুগে ভাগ করা নিতান্ত অন্যায় হবে না। এর প্রথম পাঁচ শতাব্দী গ্রীসের অভ্যুদয়—তারপর গ্রীক ও রোমক সভ্যতা প্রতিষ্ঠার যুগ,—তৃতীয় ভাগ রোমান সাম্রাজ্যের পটভূমি। এর পর পাঁচ শ' বছর ইয়োরোপের তথাকথিত অন্ধকার যুগ, তার অবসানে প্রকৃত মধ্যযুগের আরম্ভ। তারপর যে-যুগ গত পাঁচ শতক ব্যাপ্ত করে বিরাজ করেছে তার ঐক্যসূত্র ল্যাস্কির মতে বুর্জোয়া-শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্যে। উদারনীতি তারই বহিরাবরণ অর্থাৎ উদার মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার এ-শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল বলেই সে মতের এত প্রতিপত্তি। ধনিকতন্ত্রের সঙ্কটের দিনে এখন তাই উদার মতবাদেরও ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা।

মধ্যযুগের শেষের দিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে নাগরিক ধনিক শ্রেণীর উৎপত্তি হয় এ-কথা সর্ব্বজনবিদিত। ফিউডাল্ সমাজে বুর্জোয়া বা নাগরিক সম্প্রদায় নগণ্য ছিল, তাদের অস্তিত্ব তখন সামাজিক গঠনের মধ্যে অবান্তর রূপেই গণ্য হ'ত। অভিজাত ভূস্বামী ও অর্দ্ধদাস কৃষকের মাঝামাঝি অবস্থায় ন্যস্ত হওয়ার জন্যই এদের ইংরাজিতে মধ্যশ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ এর বাংলা তর্জ্জমা মধ্যবিত্ত হওয়া উচিত নয় কারণ ফিউডাল্ যুগের শেষের দিকে অনেক নাগরিক ব্যবসায়ীর অর্থসম্পদ জমিদারের চাইতে বেশী ছিল নিশ্চয়। কিন্তু তখনও মধ্যশ্রেণীর পক্ষে আর্থিক ব্যবহারে পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকারসমষ্টির প্রতিষ্ঠা, সামাজিক পদমর্য্যাদালাভ এবং রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বস্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এই বিবিধ প্রচেষ্টাই এর পর

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের মূলবস্তু হয়ে দাঁড়াল—তার ফলে যে-চিন্তাস্রোত সার্থক হয়ে পড়ে তাকেই উদারনীতি আখ্যা দেওয়া হয়।

উদার মতবাদের বহু অঙ্গ গ্রীক, রোমক বা মধ্য যুগে ব্যক্তি বিশেষের মনে উদিত হয়েছিল নিশ্চয় কিন্তু ল্যাস্কি যে-দৃষ্টিভঙ্গীর এখন আশ্রয় নিচ্ছেন তার বক্তব্য এই যে বিশিষ্ট মতবাদ মাত্রেই প্রবল ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে ওঠে শ্রেণিস্বার্থের তাড়নায়। তাই ল্যাস্কি সযত্নে বহু পরিশ্রম-সাপেক্ষ পাণ্ডিত্যের সাহায্যে এই সাধারণ সূত্র গত পাঁচ শ' বছরের কাহিনীর মধ্যে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মূলকথার সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকের মতানৈক্য থাকা বিচিত্র নয় কিন্তু বইখানি সকলেরই প্রণিধানযোগ্য একথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

পঞ্চদশ শতকে আমরা রেনেসাঁসের সাক্ষাৎ পাই—প্রাচীন হেলেনিক সভ্যতার পুনরুদ্ধার মানুষের মনকে তখন ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মদর্শনের এলাকা থেকে পার্থিব জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে মুক্তি দিল। এ-রেনেসাঁসের প্রধান নির্ভর কিন্তু ইটালির নাগরিক মন। অন্যদিকে এর সমসাময়িক নূতন অজানা দেশাবিষ্কারের অভিযানসমূহের মূল উৎসও সম্ভবতঃ বাণিজ্য-বিস্তার-প্রচেষ্টার মধ্যে অনুসন্ধান করাই সমীচীন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রেফর্ম্মেশন্ ইয়োরোপকে মথিত করল। ধর্ম্ম সংস্কারের বাসনা পুরাতন; লুথার প্রমুখ সংস্কারকেরাও যে আত্মার মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে মধ্যযুগোপযোগী মনোভাব দেখিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রটেষ্টান্ট্ ধর্ম্মবিপ্লবের অর্থই ছিল এই যে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের অধীনতা-পাশ থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া। মধ্যযুগে আর্থিক জীবনকে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের নিষেধ-শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা চলত; এখন সার্ব্বভৌম চার্চ্চের শক্তিহ্রাস উদীয়মান মধ্যশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল বলেই প্রটেষ্টান্ট্‌দের সাফল্য সহজ হ'ল। এর একটা প্রমাণ এই যে যেখানেই ক্যাথলিক্ প্রতিষ্ঠান নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল সেখানেও অতীতের নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতিকে দুর্ব্বল করে' আনা হয়েছিল বলা চলে। ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেট্-প্রাধান্যের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হ'ল বটে, কিন্তু রাজশক্তির উপর মধ্যশ্রেণী নির্ভর ক'রতে ভরসা পেত ব'লেই তার প্রসারের পিছনে এ-শ্রেণীর যথেষ্ট প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা সম্ভব।

সতেরো শতকে প্রধান কীর্ত্তি ইংল্যাণ্ডে এবং ঠিক এখানেই মধ্যশ্রেণীর অগ্রগতি সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। রাষ্ট্র পরম শক্তিশালী হয়ে ওঠাতে বণিক শ্রেণীর স্বার্থের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় একথা লিপ্‌সন্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেন। তাই ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লবের সময় মধ্যশ্রেণী রাজশক্তির বিরোধী। অথচ ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বে এই শ্রেণীই সম্পত্তিহীন গণতন্ত্রীয় দলকে পদদলিত করতে দ্বিধা করে নি। ১৬৮৮র পর ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রশক্তির সীমানা নির্দ্দিষ্ট হ'ল—সমসাময়িক ফ্রান্সে পর্য্যন্ত এর সাড়া পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান প্রচলিত ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত জীবন থেকেও প্রায় চ্যুত করল—সেই সঙ্গে মানুষের মনে উত্তরোত্তর পারিপার্শ্বিকের উপর ক্ষমতার ও জীবনযাত্রায় সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেতে

লাগল। এই মনোভাব বিস্তারের পিছনেও হয়ত মধ্যশ্রেণীর আন্তরিক কামনার সন্ধান পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ বিজ্ঞানবাদেরই সন্তান। যে-ব্যক্তিগত অধিকারসমষ্টির দাবী এখন শোনা গেল তার প্রত্যেকটিতেই মধ্যশ্রেণীর অশেষ সুবিধা দেখা সম্ভব। সম্পত্তিহীন দরিদ্র শ্রমিকের কাছে যে সে অধিকারের মূল্য অতি সামান্য এ-কথা এ সময়ের চিন্তানায়কেরা ধরতে পারেননি, তাই ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্রে পর্য্যন্ত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পাশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্থান পেয়েছিল। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত যে-ষ্টেট্ মধ্যশ্রেণীর সহায়-রূপে গণ্য হ'ত এখন কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ ধনিকদের আর কাম্য রইল না। তাই আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্রশক্তি নিরপেক্ষ থাকা উচিত এই উপদেশ প্রাকৃতিক নিয়মের মর্য্যাদা লাভ করল। মনে রাখা প্রয়োজন যে স্মিথ্ রিকার্ডো প্রভৃতির সনাতনী অর্থশাস্ত্র যখন প্রতিষ্ঠালাভ করে তখনও রাষ্ট্রে বণিকদের পূর্ণকর্ত্তৃত্ব আসে নি অথচ তার পূর্ব্বেই ধনিকদের আর ষ্টেটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবার প্রয়োজন ছিল না।

ফরাসী বিপ্লবের ফল আমরা উনিশ শতকেই ভাল করে দেখতে পাই। এতদিন পরে মধ্যশ্রেণী পূর্ণ রাষ্ট্রিক কর্ত্তৃত্বলাভ করল। কিন্তু সাম্যমন্ত্র ঘোষিত হ'লেও রাষ্ট্রিক অধিকার প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যস্ত হ'ল তাদেরই উপর যারা জনসাধারণ নয়, যাদের কিছু অর্থসম্পদের যোগ্যতা আছে। গণতন্ত্র ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল এর অনেক পরে—কিন্তু সর্ব্বত্রই পণ্যোৎপাদন পদ্ধতির বিশাল পরিবর্ত্তনই ডিমক্রেসীর অগ্রদূত। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেল যে ধনিকতন্ত্র বিস্তারলাভের যুগে ডিমক্রেসীর কাঠামোর ভিতরেও মধ্যশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকতে পারে। সুতরাং জনসাধারণকে ভোট দেওয়া পর্য্যন্ত এতদিনে নিরাপদ বলে' গণ্য হ'ল।

অধ্যাপক ল্যাস্কির বক্তব্যের যে-সংক্ষিপ্তসার উপরে উদ্ধৃত হ'ল তার থেকে তাঁর মতের স্বরূপ বোঝা যেতে পারে। এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে পাঁচ শ' বছরের ইতিবৃত্তের ব্যাখ্যার চেষ্টা নিশ্চয়ই পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করবে। এবং অন্ততঃ সেইজন্যে এই বইখানির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে স্বীকার করা উচিত।

শ্রীসুশোভন সরকার

Extra-Sensory Perception—by J. B. Rhine, Associate Professor of Psychology, Duke University, (Faber and Faber)

এই বই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কারণ এ বইয়ে মনস্তত্ত্বের একজন বিশিষ্ট আমেরিকান অধ্যাপক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এমন একটী বিষয় আলোচনা করেছেন যা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। আলোচনার

প্রণালী যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ বইয়ের মুখপত্রে মনস্তত্ত্বের দু'জন মহারথী উইলিয়াম ম্যাক্‌ডুগাল ও ওয়াল্টার ফ্রাঙ্কলিন প্রিন্স এ-প্রণালীকে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করেছেন। আলোচ্য বিষয়কে অবৈজ্ঞানিক বলেছি তার কারণ অনেক বড় পণ্ডিত ইতিপূর্ব্বে psychic research করতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। কিন্তু Rhine সাহেব এ বিষয় যে ভাবে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর কথা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

Rhine প্রথমে তাঁর রিসার্চ্চ আরম্ভ করেন একটী ঘোড়া নিয়ে। সে ঘোড়াটী নাকি আশ্চর্য্যভাবে লোকের মনোভাব বুঝতে পারত। তার পর দু'বৎসরের বহু চেষ্টাতেও যখন ঐরূপ আর একটী জন্তু পাওয়া গেল না তখন Rhine ছোট ছেলেদের উপর পরীক্ষা আরম্ভ করেলেন। তিনি একখানি কাগজে কোন সংখ্যা লিখে সে কাগজ খামে ভরে রেখে ছেলেদের অনুমান করতে বলতেন ও তাদের জবাব অন্য কাগজে পৃথকভাবে লিখিয়ে নিতেন। এ পরীক্ষা বিশেষ আশাপ্রদ না হওয়ায় Rhine পরে কলেজের ছাত্রদের উপর সেই পরীক্ষা করলেন, সে পরীক্ষার ফল খুব সন্তোষজনক না হ'লেও Rhine তাদের মধ্য থেকে এমন দু'একটী ছাত্র বেছে বের করলেন যাদের অনুমান শক্তি ছিল অসাধারণ। তাদের পাঁচটী অনুমানের মধ্যে অন্ততঃ তিনটী ঠিক হত। এই সব ছাত্রদের নিয়ে Rhine তিন বৎসর ধরে প্রায় ৯০,০০০ পরীক্ষা করে যে ফল পান তা' সন্তোষজনক এবং সেই ফলই এ বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি নানা প্রকারের—

(1) Extra-Sensory Perception—perception without the function of the recognised senses.

(2) Pure telepathy i.e. extra-sensory perception of the mental processes of another person.

(3) Pure clairvoyance—extra-sensory perception of objective facts.

(4) Clairvoyant card calling—with shuffled and cut pack of 25 cards placed face down before the percipient.

(5) Clairvoyant card calling, with the cut pack of cards remaining unopened until after the 25 calls are made.

এই বিভিন্ন বিষয়ে ৯০,০০০-এর উপর পরীক্ষা করে Rhine যে ফল পেয়েছেন তাতে দেখা গিয়েছে যে প্রতি ২৫টী পরীক্ষায় ৮.২ হতে ১৪-৮ পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক উত্তর পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষাগুলি অতি অবধানতার সঙ্গে চালান হয়েছিল বলেই তার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়। Rhine বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত ভাবেই দেখিয়েছেন যে, Extra-sensory preception, clairvoyance, telepathy প্রভৃতি আছে ; সেগুলিকে উড়িয়ে দেওয়া আর চলে না এবং প্রত্যেক মনস্তাত্ত্বিক যদি এ সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চালান তাহলে এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের গণ্ডী বাড়বে। পরীক্ষা কি ভাবে চালাতে হবে তার প্রণালীও Rhine দিয়েছেন।

যে সব বিষয় নিয়ে Rhine গবেষণা করেছেন সেগুলি আমাদের নিকট নূতন নয়। দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ, পরচিত্ত-প্রবেশ প্রভৃতি যে সম্ভব তা আমাদের সাধনবিষয়ক শাস্ত্রে বলা হয়েছে এবং যোগসাধন পথের পথিকেরা এখনো বিশ্বাস করেন। সে সাধনের বিশেষ প্রণালীও আছে এবং সে প্রণালীর মূলকথা concentration of the mind। Rhine যাদের নিয়ে পরীক্ষা করেছেন পরীক্ষার প্রথমে তাদেরও তাই করতে হয়েছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যদি experiment করবার প্রবৃত্তি কারু থাকে তাহ'লে আমাদের প্রাচীন প্রণালী উপেক্ষা করে Rhineএর scientific প্রণালী গ্রহণ করার কোন দরকার নাই। কারণ আমার মনে হয় উভয় প্রণালীই সমান scientific।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কাকনতলার মেয়ে—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কথাভারতী)
ছন্নছাড়া—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী (কথাভারতী)

শৈলজানন্দ একজন কৃতী লেখক। ছোট গল্পের লেখক হিসাবে এঁর খুবই সুখ্যাতি আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এঁর লেখার প্রশংসা করেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর সে শক্তির কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না। সমস্ত বইটিতে লেখকের অসাবধানতা অতি স্থূল ভাবে দেখা যায়। ফলে গল্পের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও গল্পটি জমতে পারে নি।

সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী কিরণবালাকে ঘিরেই সমস্ত গল্পটি গড়ে উঠেছে এবং তারই দুঃখের কাহিনীতে বইয়ের পাতাগুলি ভারাক্রান্ত। গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট লোক রটনা করলেন যে কিরণবালার পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ হয়েছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ বামুনের ছেলে হলেও বিধবা বিবাহ করেছে। গ্রামের জমিদার অমরনাথ চৌধুরী সবার অনুরোধে সভা করে বিচার আরম্ভ করলেন, কিন্তু বিচার বেশীদূর এগুবার প্রয়োজন হল না। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এসে কিরণবালার স্বীকারোক্তি জানালে—ন বছর বয়সে তার বিবাহ হয় কিন্তু বিবাহের পরই স্বামী মারা যায়। এ রকম অবস্থায় কিরণবালাকে আর গ্রামে রাখা যায় না। শেষ পর্য্যন্ত কিরণবালা ও তার এক মাত্র ছেলেকে কাশীতে মার কাছে নির্ব্বাসনে পাঠানো হল। পৌঁছে দেবার ভার পড়ল সুরেন্দ্রনাথেরই ভাই নিবারণের ওপর।

এ পর্য্যন্ত গল্পের ধারা বেশ চলছিল, কিন্তু এখানেই এসে গল্প যেন আর পথ পেলে না। কিরণবালার নির্ব্বাসনের পর সুরেন্দ্রনাথের ম্লান শ্রীহীন গৃহের বর্ণনা নিয়ে কয়েক পাতা চলেছে, কিন্তু তাই নিয়ে এধরণের উপন্যাস ভরাট করা চলে না। লেখককে বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হল জমিদার অমরনাথের ওপর। অমরনাথকে প্রথমে ঠিক চেনা গেল না, পরে দেখা গেল ভদ্রলোকটি গোবিন্দলাল জাতের। গোবিন্দলালের সমশ্রেণীয় লোকের চরিত্রের

পতন হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব এই সুযোগে লেখক অমরনাথের একটি পতন ঘটিয়ে দিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে গোবিন্দলালের পতনের ইতিহাস আমাদের জানা ছিল, কিন্তু অমরনাথের বেলায় তার আভাস তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। অমরনাথের পতনের পিছনে লেখক যথেষ্ট যুক্তি রাখেন নি। সে যাই হোক, গল্প কিন্তু এই পতনের মারফতে আবার গতি পেলে।

তারপর হঠাৎ দেখি সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই উপীনকে জমিদার বাড়ীতে। অমরনাথ তাঁর দুর্ব্বলতাকে সর্ব্বরকমে সার্থক করে তোলবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত ওরই শরণাপন্ন হলেন। একটা সুযোগও মিলল। সুরেন্দ্রনাথের মা মৃত্যুশয্যায় পড়ল, তারই অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ স্ত্রী পুত্রকে কাশী থেকে আনবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। এ বিষয়ে স্বয়ং জমিদার সাহায্য করলেন। কিরণ-বালাকে আনবার ছলে তিনি কৌশলে উপীন ও তাঁর এক কর্ম্মচারীকে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু অত সহজে বেচারা উপীনকে বোকা বানিয়ে তার ওপর এত বড় কলঙ্কের বোঝা চাপানোর পেছনে একমাত্র সুবিধা ছাড়া আর কোনও যুক্তি লেখকের কাছ থেকে মেলে না। আসলে উপীন ঠিক বোকা ছিল না, আর তাছাড়া ছেলেটির পাপের বোধও ছিল, লেখক তার উল্লেখ করেছেন।

এর পর কি ঘটবে অতি সহজেই তা অনুমান করা যায়। গল্পের এই অংশটি পূর্ব্বাংশের চেয়ে দ্রুতভাবে চলতে থাকে। এবং গল্পটিকে চলিষ্ণু করবার জন্যে অনেক অনাবশ্যক কৃত্রিম ঘটনা ও ভাবকে আশ্রয় করতে হয়। ফলে গল্পের আর কোনও স্বাদ থাকে না। তা ছাড়া অস্বাভাবিক নাটকীয় প্রণয়োচ্ছ্বাসে ও অসংলগ্ন ঘটনার ঘোড়দৌড়ে পাঠকের মন স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

যে অমরনাথ কিরণবালাকে কামনার সামগ্রী হিসাবে দেখেছিলেন, তাঁকেই আবার দেখি অন্তঃপুরে কিরণবালাকে ভগ্নীরূপে পাবার ইচ্ছা করতে। শুধু তাই নয় তাঁর জীবনের ওপর যেন নব প্রভাতের উদয় হল। অবশ্য এ রকমের পতন ও উত্থানকে মেনে নিতে হলে লেখকের চেয়ে পাঠকের মনের ওপরই নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

বইয়ের শেষ পাতাগুলি অমরনাথের আকস্মিক সস্নেহ ভাব ও কিরণবালাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য সক্রিয় মনের পরিচয় দেয়। এমন কি তিনি নিজে কিরণবালাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে প্রকাণ্ড সভা করে বিধবাবিবাহ যে অন্যায় কিছু নয় তা পর্য্যন্ত প্রমাণ করেন এবং গ্রামবাসীরাও এ যুক্তি মাথা পেতেই মেনে নেয়। বলা বাহুল্য ঘটনাগুলি ভাবের পারম্পর্য্য রাখতে পারেনি।

সমস্ত বইটিতে একমাত্র নিবারণের চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক বলে বোধ হল।

কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছে অমরনাথের রোমাঞ্চকর শিশু-হরণ পালাটি। জমিদার হয়েও অমন জমকালো ভাবে শিশু-হরণ করবার দক্ষতা সত্যই প্রশংসনীয়।

অপর বইটিতে দেখতে পাই লেখিকা একেবারে প্রথমে ছন্নছাড়াকেই উৎসর্গ করেছেন।

শুধু উৎসর্গ করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতি পাতায় পাতায় তাঁর পক্ষপাতের প্রমাণও দিয়েছেন। লেখিকাকে অত্যন্ত আধুনিকা বলে মনে হয়, কিন্তু তাই বলে তিনি সস্তা রিয়ালিষ্ট নন। যদিও তার গল্পের আসর বস্তীতে এবং বিষয়বস্তু নিষ্পিষ্ট ও উৎপীড়িত শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম, তবুও তিনি পুরোমাত্রায় আইডিয়ালিষ্ট। সেই জন্য বস্তীতেও আমরা শুনতে পাই তানপুরার গুঞ্জন এবং সঙ্গে সঙ্গে হতাশ প্রেমিকের মর্ম্মধ্বনি। লেখিকা বোধ হয় দেখাতে চেয়েছেন, দারিদ্র্য প্রেমকে নষ্ট করতে চাইলেও সত্যিকারের প্রেম (অবশ্য কামগন্ধহীন) জীবনের পথে এগিয়ে যাবে, এবং এই যাত্রাপথে এক মাত্র ছন্নছাড়ার দলই পথিক হতে পারবে। তবে লেখিকা কি দেখাতে চেয়েছেন আর পাঠক সম্প্রদায় কি দেখলেন তার মীমাংসা শেষ পর্য্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি।

বইটির কাগজ বাঁধাই দাম হিসেবে হয়ত ভালই, কিন্তু ছাপার ভুল বিস্তর।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পাঠক গোষ্ঠী

মার্ক্‌স্‌-এর ডায়ালেক্‌টিক্স্‌

পত্রোত্তর

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী

শ্রীচরণেষু,

তোমার সুবোধ্য ও সুন্দর প্রবন্ধখানি পড়ে খুবই সুখী হয়েছি, কারণ এর আগে বাঙ্গলা সাহিত্যে Dialectical Materialism সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ চোখে পড়েনি। আমি দার্শনিকও নই এবং তোমার মত সাহিত্যিকও নই; সুতরাং আমার কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু বলবার অধিকার নেই। তবে অধিকার না থাকলে যে কিছু বলা যায় না, একথা মানতে আমি মোটেই রাজী নই; তাই এই অনধিকারচর্চ্চা করবার জন্য কলম ধরলাম। প্রথমেই বলে রাখি যে, লেখার সুবিধার জন্য Dialectical Materialismকে আমি D-Materialism বলব; এর আর একটা কারণ দেওয়াও যেতে পারে। Vitamin-এর আবিষ্কারের ও প্রচারের পর এ যুগকে Vitamin যুগ বল্লে দোষের হবে না। আর তুমিত জান যে, Vitamin D আমাদের শুধু সবল ও সুস্থ করে না, এমন কি Rickets বা বাঁকাহাড়কেও সোজা করে দেয়। Dialectical Materialism-এর উদ্দেশ্য যখন এই পুরানো Mechanistic Materialismকে সুস্থ ও সবল করা এবং অন্য দিকে বাঁকা Idealismকে সোজা করা, তখন একে D-Materialism বল্লে কারও আপত্তি থাকবে না।

(২)

তুমি বলেছ যে, রুশিয়ার Communism-এর সঙ্গে D-Materialism-এর সম্বন্ধে, দেহের সঙ্গে বেশের যা' সম্পর্ক, তাই। এ কথা মেনে নেওয়া একটু শক্ত। বেশ আমরা ইচ্ছামত ফেলেও দিতে পারি; কিন্তু Communism যদি D-Materialismকে পরিত্যাগ করে, তা'হলে সেটা অন্য কোনও "ism" হ'তে পারে বটে, কিন্তু Communism আর থাকবে না। Prof. MacMurray বলেছেন, "It is not too much to say that, it is quite impossible to understand the political, economic and social development of revolutionary Russia, except by first understanding the philosophy which underlies it. ......Communism stands or falls by its philosophy, and the leaders of Soviet Russia are quite aware of it." সুতরাং "রুশিয়ার Communism এ দর্শন থেকে উদ্ভূতও নয়, তার উপর প্রতিষ্ঠিতও নয়"—তোমার এ কথার উত্তর দিতে হ'লে

Communism-এর পাশ কাটিয়ে D-Materialism-এর পরিচয় দেওয়া যাবে না। মুস্কিল হচ্ছে যে, এত বড় ব্যাপারটি এখানে অল্প কথায় বুঝিয়ে বলতে হবে।

Marx-এর মতে এই D-Materialism ইতিহাসে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, মানবসমাজে সব সময়ে দুই দলে গোলমাল চলছে (যদিও এটা অনেক সময়ে খুব পরিস্ফুট নয়) ; একদল, যারা পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতি বাজেয়াপ্ত করেছে,—আর অপর দল, যারা তা' থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যেমন শ্রমজীবিরা (proletariats)। Feudalism-এর সময় এর অন্য মূর্ত্তি ছিল ; Capitalism-এর সময় আবার চেহারা বদলিয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণীগত বৈষম্য আছে তখন থেকে, সমাজ যখন থেকে সংগঠন ও সঙ্ঘের মানে বুঝেছে। D-Materialism-এর মতে, এই শ্রেণী-সংঘর্ষ, যাতে মানুষের এত ক্ষতি হচ্ছে,—সেটা শ্রেণীবিরোধশূন্য সমাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হবে। ঐ লজিক অনুসারে এই সাম্য আসতে বাধ্য ; তবে তার প্রত্যাশায় আমাদের বসে থাকলে চলবে না, বরঞ্চ তার দিকে যত শীঘ্র সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। এর গোড়াপত্তন করতে হলে Marx দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য এবং শ্রমজীবিদের জন্য ডিক্‌টেটরশিপ দরকার। রুশিয়া তাই করেছে। এটা যে কিসের জন্য করতে হবে, তা' যাঁরা এদের রাষ্ট্র-আদর্শের ক, খ, পড়েছেন, তাঁরা সহজেই বুঝবেন। Marx-এর মতানুসারে এই ডিক্‌টেটরশিপ চিরস্থায়ী নয়, একে সময় বুঝে ছেড়ে দিতে হবে। রুশিয়াও এই কথা মেনে নিয়েছে, তার আভাস আমরা এখনই পাচ্ছি। কারণ ১৯৩৭ থেকে তারা নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন করবে, শুনছি ; যদিও অন্য দেশের পার্লামেণ্টারী ডিমক্রেসী বল্লে যা বোঝায়, এটা ঠিক তা হবেনা। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এরা শ্রেণীস্বার্থশূন্য সমাজের দিকে কতদূর এগোতে পেরেছে, ও Marx-এর Dialectics-এর কি পরিচয় এতে পাওয়া যায়। আমি এখানে তার কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি। (ক) স্ত্রীলোকের স্বত্ব নিয়ে সব দেশেই তুমুল আন্দোলন চলছে ; কিন্তু রুশের মুল্লুক হচ্ছে একমাত্র দেশ, যেখানে এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমস্যার সমাধান হয়েছে ; এবং অন্য দেশের মত মেয়েরা আর পুরুষের দাসীত্ব করতে বাধ্য নয়। (খ) এরা national minority সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছে, তাতে major communityর সঙ্গে তাদের কোন প্রভেদ নেই। এরা জাতীয় সভ্যতা বজায় রেখেছে, অথচ federated socialist republic-এর অন্তর্ভুক্ত আছে ; যদিও এদের secession right দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জাতীয় সভ্যতার সঙ্গে Communism-এর কোনও গোলমাল নেই, যেটা Imperialism-এর সঙ্গে অধীন জাতিদের রয়ে গেছে। (গ) সহর ও গ্রামের সে দ্বন্দ্ব, সংক্ষেপে বলতে গেলে সেটাও collective farm-এর সৃষ্টিতে এবং অন্য নানাবিধ উপায়ে প্রায় দূরীভূত হয়েছে। (ঘ) ধর্ম্মমোহ এবং ধর্ম্মভেদও বিশেষরকমের ব্যবস্থাগুণে খুবই কমে গিয়েছে। (ঙ) বেতনের তারতম্য আছে ও সেই সঙ্গে লোকের ভিতর ধনের পার্থক্যও আছে, তবে যে জায়গায় ইংলণ্ডে 1 : 30,000, রুশিয়াতে সেই জায়গায় মাত্র 1 : 20. (Strachey "Coming struggle for power",

p 344.)। শুধু শাসকসম্প্রদায় ও শাসিতের মধ্যে যা অল্প প্রভেদ রয়ে গিয়েছে ; তা দূর হবার সম্ভাবনা হবে তখন, যখন "withering away of state" হবে, অর্থাৎ যখন পুরাপুরি Communism আসবে। রুশিয়া এখনও পুরা Communist নয়, ও তা হতে এখনও অনেক দেরি আছে। সুতরাং Marx-এর Dialectics অনুসারে সমাজে এই D-Materialism-এর ভেদ করার যা উদ্দেশ্য ছিল, তার সঙ্গে রুশিয়ার কি সম্বন্ধ এতেই বুঝা যায়। Bourgeois ভাষায়, যেটা তুমি 'দেহের সঙ্গে বেশের সম্বন্ধ' বলেছ, সেটা proletarian ভাষায় 'ধড়ের সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ'। তবে এখানে বলা দরকার যে, D-Materialism অনুসারে সব ভেদই দূর করে মানুষকে ভেড়া করবার ব্যবস্থা নেই ; অর্থাৎ বুদ্ধিমানকে যে বোকার সঙ্গে বোকা হয়ে এক হতে হবে তা নয়, বরঞ্চ সকল ব্যক্তির একাকারটাই এরা চায় না। এ বিষয়ে সামাজিক একতার সঙ্গে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা—এইটাই হওয়া দরকার। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক বিধিনিষেধের এরকম ভাবে খাপ খাওয়ানতে যে চূড়ান্ত স্বাধীনতাই বজায় থাকে, এ কথাটা paradox-এর মত শোনায় বটে ; কিন্তু G. B. Shaw তাঁর "Too true to be good"-এর ভূমিকায় এই বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন।

(৩)

তুমি অল্প কথায় হেগেলীয় লজিকের যা ব্যাখ্যা দিয়েছ, তা অতি চমৎকার হয়েছে ; তাই সে বিষয়ে বেশী কিছু বলব না। তবে তুমি ঠাট্টা করে এক জায়গায় তাঁর logic-এর যা উদাহরণ দিয়েছ,—অর্থাৎ ফুল thesis, পাতা antithesis, ফল synthesis—সেটা যে হজম করা শক্ত, তা খুবই ঠিক। কিন্তু ভুলে যেও না যে, Hegel—Leibnitz অথবা Kant-এর মত বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, এবং এ বিষয় তাঁর জ্ঞান খুব কমই ছিল। তাঁর বিদ্যা হয়েছিল Philology ও Theology পড়ে। সুতরাং ঐ উদাহরণটি Hegel-এর কবিত্ব বলে মেনে নিলে আর হজম করা শক্ত হবে না। জগতের প্রত্যেক জিনিষ যা "হচ্ছে", তার দু'দিক আছে ; আর এই পরস্পর-বিরোধের সমন্বয়ে অভিব্যক্তি চলছে।

Marx-এর জড়বাদ যে যন্ত্রবাদ নয়, তুমি তা বলেছ, তবে শুধু অর্থনৈতিক জড়বাদ বল্লে, জিনিষটার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়, ; যদিও Marx আসলে ঐ সামাজিক অবস্থার গতিবিধি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সংক্ষেপে D-Materialism, যন্ত্রবাদের মত মানুষের জীবনকে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মানে না। বহুলাঙ্গ জীবন সৃষ্টির সঙ্গে যে একটা নূতন গুণের সৃষ্টি হয়েছে—যেটা এই সব বিধিবিধানের মাপকাঠির বাইরে—এরা তাই বিশ্বাস করে। অনেকের মতে যন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞানে, অর্থাৎ Planck-এর "Quantum theory"র পর থেকে, এর প্রভাব কমে গিয়েছে। কিন্তু D-Materialism-এর সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের কোনই বিরোধ নেই, পরন্তু যথেষ্ট মিল আছে। এখানে দেখবে যে D-Materialism,

Idealism-এর দিকে ঝোঁকে। তবে এরা Ideal আগে ও Reality পরে—এ কথা মানে না। Idealism-এর সঙ্গে এদের মতের কি কি তফাৎ, সে কথা বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হবে; তাই এর একটা উদাহরণ দিয়েই শেষ করব। ওমর খৈয়াম ও মার্কস্-এর উদ্দেশ্য একই। নিম্নের passage দুটি থেকে তা' বোঝা যা'বে—

"Ah ! love, could thou and I with fate conspire
To change this sorry scheme of things entire,
Would we not shatter it to bits—and then
Remould it nearer to our hearts' desire."

(Omar Khayyam)

"The philosophers have only interpreted the world in different ways ; the task lies in changing it."

(Marx)

তফাৎ এতেই দেখা যায়, কারণ Marx মানুষের এই অবস্থা পরিবর্ত্তন করবার ক্ষমতার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করেন, সেটা ঠিক ওমর খৈয়ামের নেই। এই সূত্রে বলা দরকার যে, Bergson-এর Vitalism-এর সঙ্গে D-Materialism-এর কিছু মিল আছে; এবং এই দুটি দর্শনই Evolution যে কি, তার পুরাপুরি উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে (এখানে Spencer, Hackel ও অন্য Darwinian-দের উল্লেখ করবার দরকার দেখিনে)। কিন্তু D-Materialism এর সঙ্গে জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আছে, যেটা Bergson-এর creative evolution-এর সঙ্গে নেই। আর এক কথা এই, রুশিয়ার বৈজ্ঞানিক Pavlov সাহেব মানুষের মন সম্বন্ধে যা গবেষণা করেছেন, তাতে conditioned reflex বলে একটা মনের ক্রিয়া ধরা পড়েছে। তবে "consciousness" মানুষের মধ্যে নেই—মানুষ একটা automaton মাত্র—এ কথা তিনি বলেন নি। Bergson-এর elan vital-এর সঙ্গে এই conditioned reflex-এর ঠিক খাপ খায় না, কিন্তু D-Materialism এর সঙ্গে এখনও এর গোল বাধেনি। পরন্তু Pavlov এক জায়গায় বলেছেন যে, brain-এর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি থেকে মনের উৎপত্তি। D-Materialism-এর ভাষার সঙ্গে এ কথার মিল আছে, অর্থাৎ মনের উৎপত্তি হয় বিরোধ থেকে। Bergson intuition জিনিষটাকে খুবই বড় স্থান দিয়েছেন। অপর পক্ষে Materialism এ বিষয়ে কি বলে, তা এই প্রবন্ধে বেশী কথা বলেও যে খুব সুস্পষ্ট করতে পারব, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই আপাততঃ আর সে বিচার করব না।

(৪)

তুমি এ বিষয় দার্শনিক Croce-র কিছু মতামত উদ্ধৃত করেছ ও B. Russell সম্প্রতি D-Materialism সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা পড়তে বলেছ। B. Russell এ বিষয়ে কি বলেছেন, দুঃখের বিষয় আমার তা জানা নেই। Russell অতি বুদ্ধিমান লোক ও তিনি Capitalist নন্, আমি মানি; তবে তাঁর দর্শন pessimism-এ ভরা ও তিনি pluralistic universe-এ

বিশ্বাস করেন, যেটা তাঁর মতে "All spots and jumps"। মানুষ অনেকটা আশার জোরে বেঁচে আছে, তা নাহ'লে পৃথিবীটা নরকে পরিণত হত। তুমি ত জান Danteর "নরক" (Inferno)-র ফটকের উপর কি লেখা ছিল—"Leave all hope, ye who enter here." সুতরাং আমার মত দুর্ব্বল লোকের pessimismএর গা ঘেঁসে যেতে একটু ভয় হয়, তার উপর ঐ "spots and jumps"-এর ভিতর পড়লে শরীরের দুটো হাড়ও আস্ত থাকবে না। Croce Marx-এর dialectics সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা হয়ত অনেকে তাঁর philosophy সম্বন্ধেও বলতে পারে। অর্থাৎ তা একটা "bizarre proposition." সুতরাং ঐ একটা কথা নিয়ে এ সব বিষয়ের মীমাংসা হয় না, তর্কও চলে না। Schopenhauer-এর পর থেকে এক দল philosopher হয়েছেন, যাঁরা মনে করেন অন্যদের দর্শন চাব্‌কালে নিজেদের দর্শন বড় হবে। Croce সাহেব যে সেই দলভুক্ত, তা আমি বলছিনে; কারণ লোকটি খুব খাঁটি বলেই মনে হয়। তবে যা বলেছি—Marx এর Dialectics শুধু "bizarre proposition" বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না।

Marx-এর Dialecticsএর পরিচয় দিতে গিয়ে তুমি একটি বড় দার্শনিক Spinoza-র কথা ভুলে গিয়েছ, যাঁর সঙ্গে D-Materialism-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। D-materialistরাও তাঁর "Substance" বা পরম তত্ত্বে বিশ্বাস করে, যাকে হিন্দুরা "ওঁ তৎ সৎ" বা "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" বলেন। তবে ওদের "ওঁ" কথাটা বলতে বিশেষ আপত্তি আছে, ও বেদান্ত বা শঙ্করাচার্য্যের মত অন্য সব জিনিষকে মিথ্যা মায়া বলে না; কারণ, Spinoza "modes" বলে এর যা ব্যাখ্যা করেছেন, তাই এরা মেনে নেয়। নাস্তিকের দেশে যদি ধর্ম্মের স্থান অন্য কিছু অধিকার করে, তা হলে ঐ D-Materialism, অথবা Bergson-এর "Creative evolu-tion"-এর মত দর্শনই তা করতে পারবে—বিশেষ করে D-Materialism, যার সঙ্গে সামাজিক অবস্থার বিশেষরকম যোগ আছে। তুমি বলেছ—"আমাদের শেষ কথা 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ", আর ওদের প্রথম কথা 'অশান্তিঃ অশান্তিঃ অশান্তিঃ"। এখানে একটু তফাৎ হচ্ছে এই যে, এরা শান্তিস্থাপনের জন্য অশান্তিকে ভয় করে না—তার সঙ্গে যুদ্ধ করে; আর আমাদের চিরকালই শেষ কথা Resignation, Resignation, Resignation!

এ কথা ঠিক যে, পুরানো জিনিষ দিয়ে নূতন জিনিষ খাড়া করা শক্ত। তবে পুরানো জিনিষের ভিতর যে সত্য আছে সেটা স্থায়ী, যদিও তা নূতন বেশ ধারণ করে। Hegelদর্শনের প্রভাব কমেছে, কিন্তু তার logic-এর dialecticsটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে—শুধু নূতন বেশ পরেছে। এই বেশ হচ্ছে Materialism। আমাদের দেশে যখন অর্থভেদ, ধর্ম্মভেদ ও জাতিভেদ রয়েছে, Marxএর Dialectics যে তিতো ওষুধ বলে মনে হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীদেবকুমার চৌধুরী

কৈফিয়ৎ

আমি শ্রাবণ মাসের পরিচয়ে যে পত্রাকার প্রবন্ধ অথবা প্রবন্ধাকার পত্র প্রকাশিত করি, সেটি যথার্থই পত্র, প্রবন্ধ নয়।

পত্রের সঙ্গে প্রবন্ধের মোটা প্রভেদ এই যে, আমরা পত্র একটি বিশেষ ব্যক্তিকে লিখি আর প্রবন্ধ লিখি তাঁদের জন্য, যাঁরা সে প্রবন্ধ পড়বেন। কে যে অনুগ্রহ করে পড়বেন, তা আগে থাকতে বলা যায় না। তা ছাড়া এই অজানা পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধি, মনের চরিত্র লেখকের কাছে সম্পূর্ণ অবিদিত; তিনি পণ্ডিতও হতে পারেন, অপণ্ডিতও হতে পারেন, সমজদারও হতে পারেন, সমালোচকও হতে পারেন—সুতরাং সে পাঠকের মনোমত লেখা আমরা ইচ্ছে করলেও লিখতে অপারগ। যদি কোনও পাঠক আমাদের লেখা প্রবন্ধ পাঠ্য মনে করেন ত সেই অপরিচিত পাঠককে আমরা মনে মনে বলি "গুণী গুণাং বেত্তি।"

তবে এ প্রশ্ন লোকে করতে পারেন যে, পত্রখানি যদি কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে লেখা হয় ত মাসিক পত্রে সেখানি কেন প্রকাশ করা হ'ল? এর প্রথম কারণ, আমার হস্তাক্ষরের চাইতে ছাপার অক্ষর ঢের বেশী সুখপাঠ্য; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, হেগেলের dialectics এবং তার মন্ত্রশিষ্য Marxকর্তৃক তার বিচারসাধন সম্বন্ধে আরও পাঁচজনের কৌতূহল থাকতে পারে—বিশেষতঃ এ মতামত নিয়ে মারামারি কাটাকাটির যুগে। আজকের দিনে Spainএ যে ব্যাপার ঘটছে, তা নাকি Fascism-এর সঙ্গে Communism-এর লড়াই। অবশ্য এ শাস্ত্রবিচার অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে করা হচ্ছে।

উক্ত পত্রাকার প্রবন্ধের একটি স্পষ্ট দোষ ছিল। সে দোষ এই যে, Dialectic Materialism যে কি মত, তা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারিনি। পারিনি যে, তার কারণ দু কথায় তা বোঝানো যায় না।

উক্ত পত্র আর কেউ পড়েছেন কিনা জানিনে—কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান দেবকুমার চৌধুরী এটি সুধু পড়েন নি, critically পড়েছেন। তিনি বলেছেন যে "তুমি Hegelian logic-এর অল্প কথায় যা ব্যাখ্যা দিয়েছ, তা অতি চমৎকার হয়েছে।" এ কথা শুনে মহা খুসী হয়েছি; কারণ আমি লেখক, কারও মুখে প্রশংসা শুনলে আমার পক্ষে খুসী হওয়াত স্বাভাবিক। তবে অপর কোনও পাঠক যে শ্রীমানের মতের সঙ্গে একমত হবেন, এ আশা আমি করতে পারিনে।

Dialectics কথাটা ইউরোপের দর্শনের একটা খুব বড় কথা। সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় না থাকলে, ও কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। Croce নামক বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিকের ধারণাও তাই। তিনি হেগেল সম্বন্ধে যে বই লিখেছেন, তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম "Chiarimento circa la Storia della Dialettica." অর্থাৎ Dialectics

কথার ইতিহাস। এই বইয়ের শুরুতে পাই ইংরাজী অনুবাদ আছে। যদি কেউ লজিকের এ পদ্ধতি পরিষ্কার করে বুঝতে চান ত উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি পাঠ করবেন। Socrates থেকে আরম্ভ করে হেগেল পর্য্যন্ত নানা দার্শনিক dialectics কি ভাবে বুঝেছেন, তার ইতিহাস উক্ত দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। এ কারণ হেগেলের logic-এর মৎকৃত ব্যাখ্যা যে সন্তোষজনক নয়, তা আমি জানি। সে যাই হোক, যাঁর জন্য ও পত্র লেখা, তিনি যখন আমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন পত্র হিসেবে আমার লেখা সার্থক হয়েছে।

আমি উক্ত প্রবন্ধে বলি—"রুশিয়ার Communism এ দর্শন থেকে উদ্ভূতও নয়, তার উপর প্রতিষ্ঠিতও নয়"। আমার এ মতের বিরুদ্ধে অনেকে যে আপত্তি করবেন, তা আমি জানতুম। কেন না যাঁরা রুশীয় Communistদের কাছ থেকে ইউরোপীয় দর্শন শিখেছেন, তাঁদের পক্ষে আমাকে 'কিং স্বাতন্ত্র্যং অবলম্বসে' বলে ধমক দেওয়া স্বাভাবিক। এ কথা জানা সত্ত্বেও আমি এ ক্ষেত্রে কেন স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করেছি, তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি। কোনও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে যে নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়া হয় না, এই হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। Hegel হচ্ছেন একজন মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক, আর তাঁর মন্ত্রশিষ্য Marx ও বামাচারী হেগেলিয়ানদের অগ্রগণ্য। আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন যে, বিধিনিষেধ সম্বলিত হিন্দুধর্ম্ম "বেদমূলং", আর Communist শাস্ত্রীরা আজ বলছেন যে, রুশীয় Communism "হেগেলমূলং।" ও দুটি কথারই মূল্য এক। যারা নিজের জোরে একটা মত খাড়া করতে পারে না, তারা আবহমান কাল একটি না একটি authority-র দোহাই দেয়। রুশীয় Communistরা যদি হেগেল Marx-এর দোহাই না দিয়ে বাইবেলের দোহাই দিতেন, তাহলে আর ইউরোপীয়েরা এই নব Communismএর এতটা প্রতিকূল হত না। আর সে দোহাই যে দেওয়া যায়, তা যিনি যিশু-খৃষ্টের বচনের সঙ্গে পরিচিত, তিনিই স্বীকার করবেন। বিশেষতঃ যখন আদি খৃষ্টান সম্প্রদায় ছিল আদি Communist সম্প্রদায়। তাঁরা যে কেন বাইবেলের দোহাই দেননি, তার সন্ধান পাওয়া যাবে ইতিহাসের অন্তরে, কোনও দর্শনের অন্তরে নয়। আমরা এ যুগের শিক্ষিত লোকরা যে authority মানিনে, এমন কথা বলবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। শিক্ষা মানেই পূর্ব্বাচার্য্যদের বই পড়ে শিক্ষা, অর্থাৎ পরের মুখে শুনে শেখা। তাই বলে বিলেতি রাম শ্যাম যদু হরি যে বই লেখে, তাকেই আমরা authority বলে ধরে নিতে পারিনে। আমি জানি যে, একালে আমাদের authority এক মূল নয়—শতমূল। এর ফলে আমাদের মনের প্রবণতা Scepticismএর দিকে, dogmatismএর দিকে নয়। এই কটি কথা বলে আমার কৈফিয়ৎ সুরু করছি।

শ্রীমান দেবকুমার যাঁদের authority দেখিয়েছেন, তাঁদেরও আমি very pleased to meet you বলেছি, অর্থাৎ তাঁদের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। MacMurray Moscow Dialoguesএর মুখপত্র লিখেছেন, আর লিখেছেন Communist (Bolshevik ?) Philosophy নামক পুস্তিকা, যে পুস্তক থেকে শ্রীমান তাঁর authority উদ্ধৃত করেছেন। এখন

শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করি, MacMurray সাহেব কি Communismয়ে বিশ্বাস করেন ?—তা যে তিনি করেন না, তার প্রমাণ তাঁর সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকে স্পষ্ট পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি এই মত broadcast করেছেন যে—Bolshevism and Fascism are the two ideals, which rest upon the deification of organised society. Both of them believe that social service is the true moral ideal, that a man's whole goodness consists in being a good citizen. In repudiating social morality as a false morality—I am repudiating Bolshevism and Fascism equally.

(Freedom in the Modern World)

MacMurray সাহেব অবশ্য ও-কথার পিঠ পিঠ বলেছেন যে—If I had to choose between the two, I should, I confess, choose Bolshevism ; because it repudiates the belief in mere wealth. But I dont want either !—অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকের মতে Bolshevism এবং Fascism উভয়ই একই বৃন্তে দুটি ফুল। যদি তিনি বাধ্য হতেন, তাহলে তিনি এ দুয়ের মধ্যে লাল ফুলটি তুলতেন, কালোটি নয়। এ মত রুশীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বপক্ষে না বিপক্ষে ?

আমি যে বিষয়ে আলোচনা করেছি, সে হচ্ছে এই নব communism-এর সঙ্গে Hegel-এর dialecticsএর কি সম্বন্ধ। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, communism-এর সঙ্গে একটি ফিলজফি আছে,—Fascism ফিলজফি-ছুট। আর সেই ফিলজফিটি যে কি, তাই বলবার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপার হচ্ছে একরকম শাস্ত্রবিচার। এ বিচারের বিশেষ কোন সার্থকতা নেই ; নিজের idea একটু পরিষ্কার করা ছাড়া।

এ বিচার আমার পক্ষে সত্য সত্যই অনধিকারচর্চ্চা। হেগেল-দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ভাসা ভাসা, আর Marx-দর্শন সম্বন্ধে আমি বরাবরই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এর ফলে আমি দু একজন বিশেষজ্ঞের শরণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। Croceই আমার প্রধান authority। Marxএর মতামতের পরিচয় আমি প্রথম Croce-এর লেখাতেই পাই।

Croce যে এ যুগের একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক, তা অনেকেই জানেন ; কিন্তু তিনি যে Marxism-এর জনৈক আদি প্রচারক, তা হয়ত সকলে জানেন না।

তিনি ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত Marxএর দর্শনের critical আলোচনা করেন এবং ১৮৯৬ সালে তাঁর এ বিষয়ে লেখাগুলি একত্র করে Materialismo Storico নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের মুখপত্রে তিনি লিখেছেন যে, তাঁকে লোকে orthodox মার্ক্সিষ্ট বলে গণ্য করে ; যদিচ তিনি প্রথম থেকেই Marx-এর মতামতের কোনটি গ্রাহ্য আর কোনটি অগ্রাহ্য, তার বিচার করেছেন। উক্ত গ্রন্থে সুধু Marx নয়, মার্ক্স্‌পন্থী বহু জার্ম্মান, ইটালিয়ান ও ফরাসী দার্শনিকদেরও মতের বিচার আছে। তিনি যে Marxকে কতদূর শ্রদ্ধা করতেন তার

নিদর্শন, তিনি Marxএর funeralয়ে যোগদান করবার জন্য ইতালী থেকে ইংলণ্ডে যান। আর আজও যে তিনি Fascist হন নি —তার প্রমাণ Mussolini তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছেন। সুতরাং Croce-র পদানুসরণ করে আমি সম্ভবতঃ বিপথে যাইনি। আর Croce-র মত হচ্ছে যে, রুশীয় Communismএর সঙ্গে হেগেলের Dialecticsএর সম্বন্ধ হচ্ছে, দেহের সঙ্গে বেশের সম্বন্ধ। তাঁর বৃদ্ধবয়সের লেখা - History of Europe in the Nineteenth Century নামক পুস্তকে Communismএর বিচার ছড়ানো আছে। Croce অবশ্য Communism গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু Fascism'ও প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি কোন ismএ বিশ্বাস করেন ?—এ দুই ছাড়া কি পৃথিবীতে অপব কোনও ism নেই, বা থাকতে পারে না ? এ দুই ism হচ্ছে Dogmatism। আমি পূর্ব্বে বলেছি এ-যুগে আমরা কোনরূপ Dogmatism গ্রাহ্য করতে পারিনে, পেয়াদায় না করালে।

আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে Croce ব্যতীত আর একজনের দোহাই দিয়েছি, তাঁর নাম Bertrand Russell। আমি অবশ্য তাঁর চেলা নই। তা যে নই, তার প্রমাণ আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পাঠকরা পাবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর তুল্য বুদ্ধিমান লোক অন্ততঃ লেখক ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় নেই। আর তাঁর লেখা খোলা তলওয়ারের মত যুগপৎ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।

Croce হেগেল সম্বন্ধে যে বইখানি লিখেছেন, তার নাম Cio Che E Vivo, Cio Che E Morto, della Filosofia di. Hegel। অর্থাৎ হেগেল দর্শনের কোন অংশ জীবিত ও কোন অংশ মৃত। Bertrand Russell Marx সম্বন্ধে যে চারটি অধ্যায় লিখেছেন, তারও নাম দেওয়া যেতে পারে—Marx মতের কোন অংশ মৃত ও কোন অংশ জীবিত। Russell বিদ্রূপে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু এ লেখায় বিদ্রূপ নেই, আছে শুধু বিচার। যাঁরা Marx দর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, তাঁদের আমি এই বই পড়তে অনুরোধ করেছিলাম। এ অনুরোধ অন্যায় নয়, কারণ যাঁদের ইচ্ছা কোন-কিছু পড়ব না, অথচ সবই জানব—আমি তাঁদের দলভুক্ত নই। তবে শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করা অনেকের পক্ষে যে নরকভোগ মাত্র, তা আমি জানি। তাই উক্ত গ্রন্থ থেকে কটি ছত্র আমি নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

(১) The communist doctrine must be regarded as a relic of Victorianism.

(২) Marx's dialectics is no more revolutionary than that of Hegel.

(৩) The belief that metaphysics has any bearing upon practical affiairs, is to my mind a proof of logical incapacity.

(৪) Whenever metaphysics is really useful in reaching a conclusion, that is because the conclusion cannot be reached by scientific means, i. e. because there is no good reason to suppose it true,

(৫) The efforts of Communists may be stimulated by the belief that there is a God called Dialectic Materialism ।

রুশীয় Communism-এর সঙ্গে Dialectical Materialism-এর যে প্রাণের যোগ নেই, এমন কথা বলায় আমি যদি এই নবধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন পাষণ্ড মত প্রচার করে থাকি ত তার কারণ আমি "মহাজনো যেন গতাঃ সৈব পন্থা" এই কথা মেনে নিয়েছি। এর কারণ আমার বিশ্বাস যে, আমার মত খুল্ল সাহিত্যিকের পক্ষে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। আমি পূর্ব্ব পত্রে বলেছি যে, আমি এ বিচারে Communism-এর পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। কারণ Commuuism এর ইতিহাস – that's another story। আর সে ইতিহাস লিখতে হলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখতে হয়;—যা লেখবার ধৈর্য্য আমার নেই, আর তা পড়বার ধৈর্য্যও কারও নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

———

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

পরিচয়

ডব্ল্যু-বি য়েট্‌স্‌ ও কলাকৈবল্য *

ইংরেজী প্রবচনের মতে সত্য স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত; এবং যেহেতু প্রবাদমাত্রেই শুধু ভূয়োদর্শনের ফল, তাই তার ব্যাপ্তি কম, ব্যতিক্রম বেশি। কিন্তু এ-ত্রুটি হয়তো শব্দেরই প্রকৃতিগত; অন্ততপক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিকথাতেও বহুলাঙ্গ অতীতের যথাযথ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে না, একটা কঙ্কালসার যুগের এক টুক্‌রো অস্থিই কৌতূহলীর কল্পনা জাগায়; এবং সম্ভবত বস্তু আর বাক্যের সামান্যতা যৎকিঞ্চিৎ ব'লে, এই নির্ব্বিকার বিশ্বে থেকেও আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করি। তাহলেও বাক্য ছাড়া সংসারযাত্রা অচল; এবং যোগীদের সাযুজ্যসিদ্ধি বাদ দিলে, বাক্য শুধু জ্ঞানবিনিময়ের নয়, জ্ঞানার্জ্জনেরও অনন্যপন্থা। এই দিক থেকে দেখলে উল্লিখিত জনশ্রুতিকে আর অব্যবহার্য্য লাগবে না, বোঝা যাবে যে চমৎকারিত্বে সত্য স্বপ্নের অগ্রগণ্য না হলেও, সমকক্ষ বটে। উদাহরণত উনিশ শতকের পশ্চিম য়ুরোপ স্মরণীয়; এবং ফরাসী বিপ্লবের ভাববিলাসে তলিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষ যখন শতাব্দীর মাঝামাঝি আবার পায়ের নিচে কঠিন মাটির স্পর্শ পেলে, তখন বস্তুকে অপরিচয়ের বিস্ময়ে সাজিয়ে সে ভাবলে রূপকথা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় যে-বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক ঠেকেছিলো, যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রচারে তার একদেশদর্শিতা ধরা পড়লো; এবং সমাজরক্ষার জন্যে ভারসাম্য এমনি আবশ্যকীয় যে কান্তবিদ্যাবিশারদেরা অবিলম্বে পদার্থবিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। উইলিয়ম্‌ বট্‌লর য়েট্‌স্‌ এই প্রতিক্রিয়ার পরম পুরোধা ছিলেন; এবং সহকারীদের মতো তিনি যদিও শিল্পের নামে যথেচ্ছাচারের সুযোগ খোঁজেন নি

* Dramatis Personae—By W. B. Yeats (Macmillan)
A Full Moon in March—By W. B. Yeats (Macmillan)

অথবা মিথ্যার প্রশস্তি গাননি, তবু গণিতশাস্ত্রের চেয়ে কেল্‌টিক্ পুরাণই তাঁকে বেশি টেনেছিলো, তিনি মেনেছিলেন যে সত্য আশ্চর্য্যময় হোক আর নাই হোক, স্বপ্নই সারবান্ ও সনাতন।

দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত সিদ্ধান্তও পক্ষপাতদুষ্ট; এবং বিজ্ঞানসম্মত বিষয়াসক্তির অবসান যেমন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতায়, তেমনি কলাকৈবল্যের পরিসমাপ্তি ওয়াইল্ড্ ইত্যাদির অধঃপতনে। কেননা স্থিতিস্থাপকতা শুধু সমাজের পক্ষেই অবশ্যমান্য নয়, আতিশয্যের ফলে ব্যক্তিও রসাতলে যায়। কিন্তু সে-কথা বোঝার সময় তখনো আসেনি; এবং যদিও ফরাসী প্রতীকীদের প্রভাব কখনো ইংরেজী কাব্যের ধাতে বসেনি, তবু কি ফরাসী, কি ইংরেজ, সকল সাহিত্যিকের মনেই তখন এই ধারণা বদ্ধমূল ছিলো যে তাঁরাই নূতন ধর্ম্মরহস্যের প্রবক্তা, পুরাতন অমৃত-নিকেতনের প্রতিহারী, অনাগত নরনারায়ণের অগ্রদূত। কাজেই সে-সময়ে আত্ম-বিদ্ য়েট্‌স্ পর্য্যন্ত স্বকীয় আদর্শের সঙ্কীর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হননি; এবং যেহেতু স্বাবলম্বীরা সুদ্ধ আগে যুগের দাবি মিটিয়ে, তবে নিজের খেয়ালে চলতে পারে, তাই অকালমৃত্যু, আত্মহত্যা, পানাসক্তি প্রভৃতি কারণে তাঁর বন্ধুদের একে একে হারিয়েও তিনি স্বভাবতই ভেবেছিলেন যে সেই সর্ব্বনাশের দায়িত্ব ততটা তাদের নয়, যতটা প্রতিবেশের। খুব সম্ভব এ-বিশ্বাস শুধুই অতিরঞ্জিত, একেবারে ভিত্তিহীন নয়; অন্তত নেপোলিয়ন্-এর যুগ থেকে বাণিজ্যলক্ষ্মীই ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এবং ইংরেজী কাব্যের সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকর্ষ বাণীপ্রসাদেরই নিদর্শন বটে, কিন্তু সেখানে দেবীর বরপুত্রেরাও শুল্কসঙ্কোচের আন্দোলনে যে-উত্তেজনা দেখিয়েছেন, শিল্পস্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে সে-উৎসাহ প্রকাশ করেননি। অবশ্য এজন্যে তাঁরা নিন্দাভাজন নন; হয়তো সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনের অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থাই তাঁদের মাতৃভূমিকে এত দিন ধ'রে প্রগতির পুরোভাগে রেখেছে; এবং স্বদেশের জল-হাওয়া সরস্বতীপূজার প্রতিকূল ব'লে যত ইংরেজই স্বেচ্ছানির্ব্বাসন ব'রে থাকুন না কেন, তবু আজও ইংলণ্ডই উৎপীড়িত উদারনীতির অন্তিম আশ্রয়।

তবে ইংরেজী তিতিক্ষা বোধহয় ন্যায়পরায়ণতার ধার ধারে না, তার উৎপত্তি হয়তো বা সে-জাতির শ্লেষ্মাপ্রধান চারিত্র্যে; এবং সেইজন্যেই সেখানকার সমাজ যদিচ আবহমান কাল ব্যক্তিগত বাতিকের প্রশ্রয় দিয়েছে, তবু উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তি-স্বরূপ সে-দেশে কোনোদিন প্রতিভার খাতিরেও সমাদৃত হয়নি। এই দিক থেকে

তাকালে তাদের সঙ্গে হিন্দুদের সাদৃশ্য ফুটে উঠবে ; এবং বাইরে অনুষ্ঠান বজায় রাখলে আমরা যেমন ভিতরে মানসিক নাস্তিকতার অনুমতি পাই, তেমনি প্রকাশ্যে চিরাচার বাঁচিয়ে চল্‌লে তারা তাদের ভদ্রাসনকে নির্ব্বিবাদে স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ বানাতে পারে। বলাই বাহুল্য যে এ-মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কপটতা থাকলেও, এরই কল্যাণে ইংরেজ জাতি একাধিক উপনিপাতের পাশ কাটিয়ে গেছে ; এবং কুসীদজীবীর অর্থের মতো সুপ্রযুক্ত সামর্থ্যও যেকালে ব্যয়ে বাড়ে বই কমে না, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের জনমত যে প্রায় অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা ধরবে, তাতে বিস্ময়বোধের কারণ নেই। কিন্তু প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত ক্রিয়া কষ্টকল্পনা, আদেশের উত্তর অবাধ্যতা, এবং প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈরথযুদ্ধে উভয় পক্ষ সমবল ব'লেই মর্ত্ত্যধামও মোটের উপরে স্থিতিশীল। সুতরাং উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে সেই সর্ব্বশক্তিমান লোকাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ যে হঠাৎ যুগ-যুগান্তের আগল ভাঙবে, তাতেও আশ্চর্য্যের অবকাশ নেই। সত্য বলতে কি, এই প্রতিবাদের আরম্ভ পেটর-এর সময়ে নয়, তাঁর সগোত্র ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌-ই এর উদ্যোক্তা ; এবং অত্যাধিক ব্যসনাসক্তিই ডাউসন্‌ প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সেধেছিলো বটে, কিন্তু ব্রাউনিং-এর বহু প্রশংসিত প্রগতিসেবাও পুঁথিগত পাতক-বিলাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত সেইজন্যেই ওয়াইল্ড্‌-এর ভাগ্যে ইংরেজী অনীহার আনুকূল্য জোটেনি, আপামর সাধারণ ন্যায়ত তাঁকে একটা অসামাজিক আন্দোলনের প্রতিভূরূপেই দেখেছিলো ; এবং তাই যে-বিকৃতি ইংরেজদের মধ্যে মধ্যে নাতিদুর্ল্লভ, সে-অপরাধের বোঝা বয়েছিলেন তিনি একলা।

স্বভাবগুণে য়েট্‌স্‌ কখনোই ওয়াইল্ড্‌-স্তাবকদের অন্যতম ছিলেন না, এবং ওয়াইল্ড্‌-এর কৃত্রিম জৌলস ও অতন্দ্র আত্মবিজ্ঞাপন চিরদিনই তাঁর খারাপ লাগতো। তাহলেও ওয়াইল্ড্‌ সম্বন্ধে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বিদ্বেষে তাঁর স্বকীয় অশ্রদ্ধার প্রতিবিম্ব দেখে তিনি খুশি হলেন না, বরং বুঝলেন যে পার্নেল্‌-এর মহত্ত্ব সইতে না পেরে ইংলণ্ড যেমন কুৎসার চাপে সেই অতিমানুষকে পিষে মেরেছিলো, তেমনি ওয়াইল্ড্‌-নির্য্যাতনের পিছনেও আছে অসামান্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ঈর্ষ্যা। ফলত লণ্ডন্‌-এর হাওয়া হঠাৎ তাঁর কাছে বিষাক্ত ঠেকলো, স্মরণে এলো যে সাত্ত্বিক শিল্পী মরিস্‌ আর ইহলোকে নেই, তাঁর রূপদক্ষ অন্তরঙ্গেরা একে একে ধ্বংসের অভিমুখে এগুচ্ছে, এবং জনমন থেকে মহাপ্রাণ হেন্‌লি-কে ঠেলে ফেলে তাঁর জায়গা

জুড়ে বসেছেন রডিয়ার্ড্ কিপ্লিং। অতএব য়েট্স্ স্বদেশে ফেরা ঠিক করলেন। পুনরাবিষ্কৃত কেল্টিক্ ঐতিহ্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁকে মজিয়েছিলো; এবং এই সময়ে লেডি গ্রেগরি-র সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তিনি ভাবলেন যে নাগরিক সভ্যতাই আধুনিক জগতের ঘুণ ধরিয়েছে, সে-মারীর বীজ যেখানে ছড়ায়নি, যেমন কৃষিপ্রধান আইরিশ্ জাতির মধ্যে, সেখানে মানুষ এখনো হয়তো অতিমর্ত্ত্য আত্মার সাড়া শোনে, গ্রামবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা দিব্যযোনিদের সাক্ষাৎ পাক বা না পাক, মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে উঠে তারা অন্তত স্থানমাহাত্ম্য মানে, তাদের স্বজ্ঞা যেহেতু কুশিক্ষায় বিগড়ে যায়নি, তাই তারা জানে যে পর্ব্বত ও সমুদ্র তো অসীমের প্রতীক বটেই, এমন-কি অতীত মহাপুরুষদের অমর সংস্পর্শে নিত্যনৈমিত্তিক মাঠ-ঘাট-বাট সুদ্ধ অলৌকিকের অখ্যাত আশ্রয়। যেখানে মানুষ স্থানসংক্ষেপবশত গড্ডলিকার মতো গায়ে গায়ে ঠেসে থাকতে বাধ্য নয়, সেখানে তার পশুত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম, সেখানে সে নিজে স্বতন্ত্র, অতএব অন্যের মানরক্ষায় তৎপর; এবং ফলত যে-অধিকারভেদের অভাবে শুধু শিল্প বা সাহিত্য নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও আজ ম্রিয়মাণ, তার পুনরুজ্জীবন আয়ার্লণ্ডের মতো অনুন্নত দেশেই সহজ।

কারণ আইরিশ্ জাতি চিরদিনই স্বপ্রাধান্যে বিশ্বাসী, এবং তাদের মজ্জাগত ব্যক্তিবাদ যা আইরিশ্ স্বাধীনতার যুগে গেলিক্ কাব্যকে বিশুদ্ধ বীররসের আধার বানিয়ে রেখেছিলো, তা বর্ত্তমান কালে প্রাতঃস্মরণীয়দের নাম জ'পেই উপস্থিত পরাধীনতার অপমান ভুলতে চায়। সেইজন্যেই আঠারো শতকের বিশ্বসভ্যতায় জন্মেও বর্ক্লি তাঁর জাত্যভিমান ছাড়তে পারেননি, লক্-এর সাধারণবোধ্য দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে সকল আয়ার্লণ্ডবাসীর মতো তিনিও অদ্বৈতের উপাসক; এবং ইংরেজদের রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে সুইফ্‌ট্ আর বর্ক্-এর সম্পর্ক যদিও অতিঘনিষ্ঠ ছিলো, তবু গণতন্ত্রের সময়োপযোগী মাহাত্ম্যকথন তাঁদের জিভে বাধতো। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রজ্ঞা ও পরিমিতি বিংশ শতাব্দীর আয়ার্লণ্ডেও সুলভ নয়; প্রাচীনদের বীর্য্য ও আত্মনির্ভরতা অর্ব্বাচীনদের ক্ষেত্রে হয়তো ঈর্ষ্যা, কলহ আর বাগ্‌বাহুল্যের রূপ ধরেছে। কিন্তু তাহলেও য়েট্স্ দম্‌লেন না, ভাবলেন যে নেতৃনির্ব্বাচনেও যে-দেশ যোগ্যতা, কর্ম্মনিষ্ঠা বা কূটবুদ্ধিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না, সহৃদয়তা ও স্বার্থত্যাগের পরিমাণেই ব্যক্তিত্বের মূল্য বোঝে, সে-দেশের সংস্কার নিশ্চয়ই অনায়াসসাধ্য, বাইরের রাজনৈতিক নির্য্যাতন থেকে অভ্যন্তরীণ

স্বায়ত্তশাসনের দিকে চাইলেই এরিন্-এর হৃত গৌরব ফিরে আসবে। দিন-ক্ষণের গণনাতেও মুহূর্ত্তটাকে তাঁর অনুকূল লাগলো। পার্নেল্-এর পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ্ জাতির বৈধ আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছিলো। অতঃপর সারা দেশ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত প্রচেষ্টা চল্‌লেও, সেখানকার নিরবলম্ব জাতীয়তা বাহ্যত ছুটেছিলো ভাবলোকের দিগ্বিজয়ে। উপরন্তু আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যের ধরতাই বুলি তখনো চরমপন্থার বীজমন্ত্র হয়ে ওঠেনি। কাজেই তরুণ য়েট্‌স্-এর কাছেও স্বদেশী ঐতিহ্যের অনুশীলন মর্য্যাদাবান ঠেকেছিলো, তিনি মেনেছিলেন যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই কাম্য, এবং বহির্জগৎও যেকালে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ার্থের দ্বারাই গঠিত, তখন নিজেদের চিনলেই আমরা বিশ্বকে চিনবো।

কিন্তু বিশ্ববীক্ষা আত্মজ্ঞানেরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, তার সঙ্গে অহংকারের কোনো সম্পর্ক নেই ; এবং অবগতি, হৃদয় বা বুদ্ধি, যে-পথ দিয়েই আসুক না কেন, নির্ম্মম নিরপেক্ষতাই তার চিরপরিচিত লক্ষণ। অবশ্য মনোবিজ্ঞান নৈরাত্ম্যসিদ্ধিতে বীতশ্রদ্ধ ; কিন্তু বেন্থাম্-আদি হিতবাদীরা পরমার্থের শূন্যেও স্বার্থের প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন ; এবং এ-প্রসঙ্গে ফ্রয়েড্ ব্যতীত অপর মনস্তাত্ত্বিকদের অনুমোদন থাক আর না থাক, অভিজ্ঞ মানুষমাত্রেই জানে যে অত্যাসক্তিও নিরাসক্তির মতো অমায়িক, সে কখনো প্রিয়পাত্রদের দোষ ঢাকতে চায় না, বরং ত্রুটির অসংখ্যতা ভালোবাসাকে অনন্তে পাঠায়। বস্তুত এই বৈপরীত্য শুধু প্রেমের সম্বল নয়, প্রবল সংরাগ সদাসর্ব্বদাই স্বতোবিরোধী ; এবং এলিজাবেথীয় নাটকে সেনেকা-র দান কতখানি, তার বিচারে নেমে এলিয়ট্ দেখিয়েছেন যে তখনকার ট্র্যাজিক্ নায়ক-নায়িকারা আত্মধিক্কারের অগাধে তলিয়েই আত্মরতির শুক্তি কুড়তো। রিচার্ড্‌স্-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তের পরিপোষক, এবং তাঁর শিষ্য এম্প্‌সন্-এর মতে নিজের নিন্দা ছাড়া আত্মশ্লাঘার উপায়ান্তর নেই ব'লেই মানুষের অসারতা মনুষ্যধর্ম্মের মুখ্য উপজীব্য। এই মন্তব্যে যে সাম্প্রতিক দ্ব্যর্থপ্রীতির আভাস নেই, তা প্রাচীন দর্শনের সকল অনুরাগীই মানবেন। কারণ নেতিবাদ ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রাচীন পদ্ধতি, এবং প্রাক্‌হেগেলীয় তাত্ত্বিকেরাও অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্যে আস্থাবান ছিলেন। সম্ভবত সক্রেটিস্-ই এই আর্য্যসত্যের আবিষ্কর্ত্তা ; অন্ততপক্ষে এরিষ্টটল্-এর গুরু-নিপাতনী স্বকীয়তায় এর অভিব্যাপ্তি অবিসংবাদিত ; এবং অন্য সব বিষয়ে তাঁর ভ্রান্তি বুঝে প্লোটাইনাস্ যদিচ আবার প্লেটো-তেই ফিরে গিয়েছিলেন, তবু বিশেষের

সামান্যতা অথবা সামান্যের বৈশিষ্ট্য স্বীকারে তিনি একবারও দ্বিধা করেন নি। বোধহয় কৈশোরে হিন্দু দর্শনের চক্রান্তে প'ড়ে য়েট্‌স্ চিরদিনই প্লোটাইনাস্-এর অনুগামী; এবং সেইজন্যে আত্মোপলব্ধি আর বিশ্বোপলব্ধির মধ্যে তিনি কখনো ব্যবধান রাখেননি, সার্ব্বত্রিক সাধকসম্প্রদায়ের নির্দ্দেশে ভেবেছেন যে সম্ভাব্যতার অনুপাতে উপস্থিতের বৈকল্য জেনেই মানুষ দিনে দিনে, যুগে যুগে, হয়তো বা জন্মে জন্মে, নিঃশ্রেয়সের দিকে আস্তে আস্তে এগোয়। কেননা সান্ত আর অনন্ত, বর্ত্তমান আর অবর্ত্তমান, আত্মা আর অনাত্মার সালোক্যই পুরুষসিদ্ধির অদ্বিতীয় পন্থা; এবং এই ভাবাভাবের সেতুবন্ধ যে শুধু মরমী ব্যাসকূটের পুনরাবৃত্তি নয়, বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই মর্ম্মোদ্‌ঘাটন, তার প্রমাণ অধুনাতনী জ্যামিতি যাতে অসীমের বাইরেই সমান্তরের মিলন সুলভ এবং ব্যস্তবাগীশেরাও সময়সাশ্রয়ে সরল রেখা এড়িয়ে চলে।

সে যাই হোক, উক্ত নিঃশ্রেয়স যে পরব্রহ্ম নয়, এ-বিষয়ে য়েট্‌স্ আজ নিশ্চিত, এবং যৌবনসুলভ অধ্যাত্মনিষ্ঠার দিনেও এতে তাঁর যথেষ্ট সংশয় ছিলো। কারণ তাঁর ব্যক্তিবাদ লাইব্‌নিৎস্-এর চেয়েও উগ্র, এত উগ্র যে সাধিতপূর্ব্ব সাম্য দূরের কথা, তিনি যুক্তির সার্ব্বজনীনতা মানতেও অনিচ্ছুক। তাঁর মতে অন্বীক্ষা সত্য আবিষ্কারের পন্থা নয়, সত্যবত্তা উৎপাদনের যন্ত্র, তার পিছনে সাধনার নম্রতা বা অতিক্রান্ত প্রতর্কের উৎকণ্ঠা নেই, আছে ব্যাবসায়িক ধূর্ত্ততা আর জ্ঞানপাপীর নিশ্চিন্ত প্রাগল্‌ভ্য। সেইজন্যেই তর্কযুদ্ধে পরাজয় দুঃসহ এবং বিজয় অকিঞ্চিৎকর; তার সমস্তটাই যেকালে একটা চিরাচরিত পদ্ধতি, একটা ব্যায়াম বা অভিনয়, চর্ব্বিত-চর্ব্বণের একটা নিরর্থক অভ্যাস, তখন তাতে বৈফল্য শুধু প্রতিকার্য্য অসতর্কতার পরিণাম, সাফল্য কেবল জাগ্রত স্মৃতিশক্তির প্রসাদ; এবং এই দোষ-গুণের একটাও সহজ নয়, প্রত্যেকটাই আপতিক। কিন্তু আবেগ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, তার কমঠবৃত্তি মনোবিজ্ঞানীরও অবশ্যস্বীকার্য্য, সে দেশ-কালের কোনো তোয়াক্কা রাখে না, আপন চালে চলে, নিজের প্রয়োজনে থামে, এবং তার মূল জন্মান্তরে না হোক, অন্তত পুরুষান্তরে প্রোথিত। সুতরাং তার সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপের কোনো বিবাদ নেই; এবং সম্বেগের সংঘাতে চারিত্র্য যদিও অনেক সময়েই নিপাতে যায়, তবু তাতে আত্মোপলব্ধির বাধা ঘোচে। কেননা, কথাগুলো অদ্ভুত শোনালেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেখানে বর্ত্তমানকে অসম্পৃক্ত ভাবে, ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে দেখে ভূত-ভবিষ্যতের বের্গসনী

অন্তঃপ্রবেশ। অবশ্য পঞ্জিকার সাহায্যে এই কালের গণনা অসাধ্য, একে সার্ব্বিক বলা কষ্টকল্পনা, এর সঙ্গে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ খাপ খায় না, খুব জোর কর্ম্মবাদের তুলনা চলে। তাহলেও এই ত্রিসীমানায় নীটশে-র পদার্পণ নিষিদ্ধ, এই পরিমণ্ডল থেকে ব্যক্তির পলায়ন অভাবনীয়, এবং এর ভিতরে সুকৃতি-দুষ্কৃতির কোনো লোকোত্তর প্রতিমান নেই বটে, কিন্তু দায়িত্বমুক্তির আশাও বিড়ম্বনা। এইজন্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ নির্ব্বিকল্প নির্ব্বাণের সমকক্ষ, আত্মম্ভরিতা উভয়ত্রই ইষ্টলাভের অন্তরায়; এবং সকল চিত্তবৃত্তির মধ্যে একা আবেগই যেহেতু নিষ্কাম ও নৈর্ব্যক্তিক, তাই বৌদ্ধ মতে তার পরিহার অত্যাবশ্যক হলেও, তার কাছে আত্মসমর্পণই, য়েট্‌স্-এর বিবেচনায়, কৈবল্যপ্রাপ্তির অনন্য উপায়।

য়েট্‌স্-এর উপরোক্ত উপদেশ যে অযৌক্তিক, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই; এবং যে-বিরোধবোধ তাঁর পরাবিদ্যার ভিত্তি, তা নিশ্চয়ই ন্যায়াতিরিক্ত, কিন্তু কোনোমতেই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সত্য বলতে কি, এই নিরুপাধিক বৈপরীত্যও একটা পারিভাষিক পদার্থ; এবং য়েট্‌স্ একে যদিও তত্ত্বসন্ধানে বেরিয়ে আবিষ্কার করেননি, কাব্যাদর্শ খুঁজতে খুঁজতেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তবু আবেগসর্ব্বস্বতাও বুদ্ধিবাদের মতোই নিরপেক্ষ নিষ্কর্ষণের ফল, এবং সার্ব্বজনীন চিন্তাপদ্ধতি যেমন যাথার্থ্যশূন্য, ঐকান্তিক হৃদয়সংবেদ্যতাও তেমনি নিবর্থক। বুদ্ধিবিদ্বেষী হলেও য়েট্‌স্ যেহেতু নির্ব্বোধ নন, তাই এ-কথা জানতে তাঁর দেরি লাগেনি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি দেখেছিলেন যে কাব্যের পরাকাষ্ঠা ট্র্যাজিডি, এবং সাহিত্যের সেই নাতিনূতন বিভাগটার আবাল্য আলোচনা তাঁকে অনায়াসে বুঝিয়েছিলো যে নাটকের মধ্যস্থতায় এরিষ্টটল্-প্রোক্ত চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে গেলে পাত্র-পাত্রীর সুসীম বৈশিষ্ট্যের নিটোল ভাস্কর্য্য ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা আবশ্যিক আবেগের অবিমিশ্রতা। এইখানেই শিল্পের সঙ্গে সংসারযাত্রার প্রভেদ; এবং আবেগই জীবন্ত মানুষকে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা জোগালেও, লাভ-ক্ষতির আশা-আশঙ্কায় দৈনন্দিন আবেগ দ্বিধাদুর্ব্বল ও অপবিত্র। কাজেকাজেই প্রাত্যহিক মানুষের ইতিহাসে দুঃখ আছে, ট্র্যাজেডি নেই, দৈন্য আছে সর্ব্বনাশ নেই; সে ঠ'কে লোক হাসাতে পারে, কিন্তু ভুল ক'রে প্রমিতির বার্ত্তা রটাতে পারে না। অতএব সাধারণ মানুষ কমেডির নায়ক, তার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন; এবং যে-কবি আমাদের অবসর-বিনোদনের সাথী তাঁর পক্ষে নামরূপের ধ্যানই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি লোকশিক্ষার

জন্যে ব্যগ্র,—এবং ট্র্যাজেডির প্রধান কর্ত্তব্য আত্মার উন্নতিসাধন—তিনি জাতিরূপের অন্বেষণে বাধ্য, প্রতিবিম্বে তাঁর আশ মেটে না, তিনি চান প্রতীক।

অবশ্য সেই প্রতীক সাধারণের হিতার্থে পরিকল্পিত, তার সংগঠনে মালার্মে-পন্থী দুরূহতার স্থান নেই ; এবং কৈশোরান্তে 'রাইমার্স্ ক্লাব্'-এর সভ্যতালিকায় নাম লিখিয়ে য়েট্‌স্ অল্প বয়স থেকেই বিজ্ঞের মতো ভাবতে শিখেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবনেই জে-এম্ সিং আর লেডি গ্রেগরি-র সংসর্গে এসে তিনি সেই ভাবের অভিব্যক্তির জন্যে যে-ভাষা, যে-চিত্রকল্প, যে-বহিরাশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন, তাতে ইব্‌সেনী উন্নাসিকতার বা উইস্‌মানী বৈদগ্ধ্যের লেশমাত্র ছিলো না ; গ্রীক্ নাট্যকার-দের মতো সকল রকম আধিক্য বাঁচিয়ে সহজ, সরল পৌরাণিক বা পুরাণতুল্য আখ্যায়িকার পটে বিশ্বমানবের স্বরূপ ফোটাতে পারলেই তাঁর মনে প্রসাদ জাগতো। তাহলেও তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর দুরুক্তিই কুড়োলেন ; এবং আইরিশ্ জাতির আত্মরতিকে আত্মবেদে বদলানোর যে-স্বপ্ন তাঁকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলো, তা স্বপ্নই র'য়ে গেলো। কিন্তু এ-মনোমালিন্যের জন্যে কোনো একপক্ষ দূষণীয় নয় ; এবং এর ফলে য়েট্‌স্ যদিও তখন তখন জাতীয় জীবন থেকে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তবু আজ আর তিনি না মেনে পারেন না যে এরই কল্যাণে তাঁর উপস্থিত আত্ম-সমাহিতি অন্য সব কবির চেয়ে বেশি। বস্তুত উদ্দীপনার বিচারে য়েট্‌স্-এর সাম-য়িক উষ্মা হয়তো আইরিশ্ জাতির তদানীন্তন উত্তেজনার অপেক্ষা অধিক অহৈতুক ; এবং ইতিপূর্ব্বেই নিঃসংশয় প্রতিভার জোরে ইংরেজ মনীষীদের মহলে তাঁর পসার জমেছিলো ব'লে আয়ার্ল্যণ্ডবাসীরা স্বভাবতই ভেবেছিলো যে অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে তিনি অতখানি স্পষ্টবাদিতা দেখালে এরিন্ অচিরেই অবশিষ্ট বিদেশী বন্ধু-কটিকে হারাবে। উপরন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষেই ফ্রয়েডী গবেষণার ফসল ফল্‌লেও, মনোবিকলনকে কেউ তখনো নিত্যব্যবহার্য্য বিলাসবস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেনি ; এবং সেদিনে অনেকেই নিরীশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকে থাকলেও, সেকালের নাস্তিকেরা শুদ্ধ জানতো যে আস্তিকদের বিশ্বাস তাদের মতোই সরল ও স্বতঃপ্রকাশ।

ফলত য়েট্‌স্-এর প্রথম নাটক 'দি কাউণ্টেস্ ক্যাথ্‌লিন্' কোনো দলেরই মন পেলে না। ক্রোধান্ধ ক্যাথলিকেরা স্বভাবতই বললে যে সে-দয়াবতী যদি সয়তানের কাছে আত্মা বেচেও অক্ষয় স্বর্গে ঢুকতে পারে, তাহলে সদসদের দ্বন্দ্ব নিতান্তই কবিকল্পনা, সনাতন সত্যসমূহ মহাপুরুষদের আত্মপ্রবঞ্চনা, ধারাবাহিক ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান

পণ্ডশ্রমের পরাকাষ্ঠা ; এবং অসন্তুষ্ট অধার্ম্মিকেরা ন্যায়ত রটালে যে মোক্ষ যখন সুকৃতির পুরস্কার নয়, সদিচ্ছার সাক্ষ্য, তখন ভগবান সত্য-সত্য থাকলে সবাইকেই সমান সৌভাগ্য বর্ত্তাতো, এবং তা যখন দুর্ঘট, তখন বিধাতা নেই, মানুষ অন্ধ নিয়তির ক্ষণিক খেলনা। য়েট্‌স্-এর পরবর্ত্তী নাটিকা 'ক্যাথ্‌লিন্ নি হুলিহান্' ঝগড়াটাকে আরো পাকিয়ে তুললে। তাতে অবশ্য ধর্ম্ম সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ ছিলো না, ছিলো জনসাধারণের দেশভক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ ; এবং সে-ইঙ্গিত যথার্থ ব'লেই সকলের কাছে দুঃসহ ঠেকলো। সাধারণ পুরুষ স্বাধীনতার চেয়ে টাকাকে বেশি ভালোবাসে, সাধারণ নারী আদর্শনিষ্ঠা ছেড়ে সুখের সংসার আক্‌ড়ে ধরে, এ-অভিযোগের সরবত্তা বুঝেই আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপে উঠলো ; এবং অতঃপর য়েট্‌স্-প্রতিষ্ঠিত 'আইরিশ্ লিটেরারি থিয়েটার'-এ সিং-এর প্রাকৃত নাটকাদির অভিনয় আইরিশ্ আত্মপ্রসাদে ঘৃতাহুতি ঢাললে না, দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপলক্ষ জোগালে। এত দিন পর্য্যন্ত য়েট্‌স্-এর কপালে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের অভাব ঘটেনি, কিন্তু এইবার তাঁর অন্তরঙ্গেরাও স'রে দাড়িয়ে দৈনিক গালি-গালাজের সঙ্গে সুর মেলালেন ; দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও দুরারোগ্য রোগে জে-এম্ সিং অকালে মারা গেলে স্বদেশী বিদগ্ধমণ্ডলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ; এবং যে-দু-তিন শ দর্শকের মুখ চেয়ে 'আইরিশ্ ন্যাশনল্ থিয়েটর' স্বপ্ন-প্রয়াণে বেরিয়েছিলো, অল্পে অল্পে তাদের সুদ্ধ খুইয়ে য়েট্‌স্ শেষ পর্য্যন্ত এমন নাটক লিখতে লাগলেন, যা শুধু তাঁর বৈঠকখানায় একান্ত আপনজনের সামনেই অভিনেয়।

বারম্বার দেখা গিয়েছে যে তথাকথিত শুদ্ধ শিল্পের শামুকে ঢুকে অনাদৃত দাম্ভিকেরা পারিপার্শ্বিক উপেক্ষার জ্বালা জুড়োয় ; এবং সেইজন্যেই মার্ক্‌স্-বাদী সমালোচকদের তুলামূল্যে আমাদের আস্থা না-থাকলেও, শিল্পী-বিশেষের সম্পর্কে তাঁদের মারাত্মক মন্তব্য আমরা অনেক সময়েই অগত্যা মানি। কিন্তু প্রকৃত পবিত্রতা শুধুই দুর্লভ, একেবারে অসাধ্য নয় ; এবং যেখানে তার সাক্ষাৎ মেলে, সেখানে তার অভিনন্দন কোনো রকম আত্মীয়তার অপেক্ষা রাখে না, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী স্বেচ্ছায় সাময়িক বিসংবাদ উৎরিয়ে একদিন না একদিন তার পায়ে মাথা নোওয়ায়। য়েট্‌স্-এর বেলাতেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি, এবং যেহেতু তাঁর রূপকারী বিবেক নিন্দুকদের বাক্যবাণে বিষিয়ে ওঠেনি, বরঞ্চ নৈঃসঙ্গ্যের পরিপোষণে তাঁর হৃদয়ের গভীরতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য বেড়েছে, তাই 'এট্ দি হক্‌স্ ওয়েল্'-প্রমুখ নাটিকাগুলির সচেতন শুচিবায়ুও আজ আর জনতার সাধুবাদকে

ঠেকাতে পারে না ; সকলেই জানে যে বিশ্ব-সাহিত্যে আয়ার্লণ্ডের নিজস্ব দান এই চরিত্রচিত্রহীন, অদৃশ্য, দুষ্পর্শ, সম্বেগসর্ব্বস্ব নাট্যরচনা। অবশ্য 'হক্‌স্‌ ওয়েল্‌'-এর মধ্যে য়েট্‌স্‌ প্রতিভার কোনো অপ্রত্যাশিত উন্মেষ আমি দেখতে পাই না ; এবং তাঁর আকস্মিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আধুনিকেরা আজকাল যত বাক্যব্যয় করেন, তার অধিকাংশই আমার অমূলক লাগে। কারণ এক হিসাবে য়েট্‌স্‌-এর চেয়ে সুপরিপক্ক লেখক বোধহয় ইংরেজী ভাষায় আগে কখনো কলম চালায়নি ; এবং তাঁর প্রথম বয়সের 'ক্রস্‌ওয়েজ্‌' যেমন নিখুঁৎ রূপের ঝলকে আজও আমাদের চমকে দেয়, তেমনি গত শতাব্দীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধাদি না পড়লে শেষ জীবনের 'দি টাওয়ার' অথবা 'দি ওয়াইণ্ডিং ষ্টেয়ার্স্‌' বোঝা যায় না। সুতরাং বিনয় ও ঔদার্য্যের আধিক্য-বশত তিনি নিজে এ-কথা ভাবলেও, এটা সত্য নয় যে ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সাম্প্রতিক গুণগুলোর জন্যে য়েট্‌স্‌ এজ্রা পাউণ্ড-এর কাছে ঋণী। আসলে উৎকর্ষের বিচারে তিনি চিরদিনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; এবং কাব্যকলার বিষয়ে তাঁকে কখনো কেউ কিছু শেখায়নি, উল্‌টে অনেকেই তাঁর দানসত্র থেকে বিনারসিদে আপন আপন ব্যবসায়ের মূলধন নিয়ে গেছে। তাহলেও তাঁর বর্ত্তমান প্রতিপত্তির জন্যে শুধু পাঠক-সাধারণের উন্নততর রুচিই প্রশংসনীয় নয়, তাঁর নিজের পরিবর্ত্তনও উল্লেখ-যোগ্য এবং সে-পরিবর্ত্তন যদিও এমনি সঙ্গত ও আশানুরূপ যে তাকে পরিবর্দ্ধন বলাই বিধেয়, তবু তার ফলে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেরই বাঁধন ছেঁড়েনি, বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্যও সম্পূর্ণ হয়েছিলো।

এক হাতে যখন তালি বাজে না, তখন কবি-পাঠকের দোটানায় একা পাঠকই দায়ী নয় ; এবং এ-অনুযোগ ঠিক বটে যে প্রাক্‌সামরিক পাঠকের অন্ধকার অবিদ্যাই য়েট্‌স্‌-এর যশোরবিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেয়েছিলো. কিন্তু তাঁর ও মূর প্রভৃতি সহ-কর্ম্মীদের অনাবশ্যক ঔদ্ধত্য ও ভেদবুদ্ধিই যে বহু অনুকম্পায়ী আসঙ্গলিপ্সুকে ফিরিয়ে পাঠিয়েছিলো, তাও প্রায় নিঃসন্দেহ। তবে ইতিহাস কারো হাত ধরা নয়, এমন-কি সোহংবাদী য়েট্‌স্‌-ও সে-প্রভুত্বে বঞ্চিত ; এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ, ১৯১৬ সালের ইষ্টার বিদ্রোহ ও ১৯১৯ সালের গৃহবিচ্ছেদ যেমন জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকে সাহিত্যিক মতান্তর থেকে রাষ্ট্রনৈতিক মনান্তরের দিকে ফেরালে, তেমনি য়েট্‌স্‌-ও বুঝলেন যে এই রঙ্গগঙ্গায় যারা ডুবেছে বা স্নান সেরে এসেছে, তাদের কেউ কেউ তাঁর পূর্ব্বতন শত্রু হোক আর নাই হোক. তারা সকলেই মহৎ, সকলেই উদার ও শ্রদ্ধার্হ, আত্ম-

সমাহিত শিল্পজগতে তাদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও, শিল্পোত্তর অমৃতলোকে তাদের পদার্পণ অব্যাহত। তাই ব'লে তিনি তাঁর আজন্মের সাধনা বা চিরজীবনের বিশ্বাস মুহূর্ত্তমধ্যে ঝেড়ে ফেললেন না। কিন্তু এর পরে তাঁর উপরে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ কেমন যেন ক'মে গেলো, অন্ততপক্ষে তিনি না মেনে নিস্তার পেলেন না যে ছুৎমার্গে চ'লে কদর্য্যের কুসঙ্গ এড়ালেই সুন্দরের সন্দর্শন মেলে না, সেজন্যে রূপদক্ষের হাতে কুৎসিতের সাক্ষাৎ পরাভব অপরিহার্য্য। অবশ্য তত্ত্ব হিসাবে এ-সত্য য়েট্‌স্ বহু পূর্ব্বেই অঙ্গীকার করেছিলেন, এবং তাঁর দার্শনিক মতামতের মূল কথা এই যে বিপরীতের সঙ্গে নিজের সমীকরণেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু এ-সকল মীমাংসা এত দিন পর্য্যন্ত তাঁর বুদ্ধির শিখরে বাসা বেঁধেছিলো, তাঁর সত্তার শিকড়ে, তাঁর অনুভূতির মর্ম্মে নামতে পারিনি। ১৯১৬ সালে সে-বাধা হঠাৎ একদিন ঘুচলো; নিষ্ফল বিপ্লবে প্রাণ হারিয়ে অতিসাধারণ মানুষও এক ভীষণ সৌন্দর্য্যের জন্ম দিলে; এবং সেই সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমিকদের ক্ষমা করে, তাদের কীর্ত্তিগাথা গেয়ে, তাদের ও নিজের প্রত্যাবৃত্ত অতীতের স্মরণার্থে য়েট্‌স্ এই সময় থেকে যে-কাব্য লিখতে লাগলেন, তা মাধুর্য্যে হয়তো তাঁর প্রাক্কালীন কবিতাসমূহের চেয়ে নিকৃষ্ট কিন্তু মর্য্যাদায় সেগুলোর বহু উর্দ্ধে।

আগেই বলেছি যে অন্তত আমার মতে য়েট্‌স্-এর কোনো পরিবর্ত্তনই অপ্রত্যাশিত নয়; এবং যাঁরা বিনামনোযোগেও তাঁর গ্রন্থসমূহ পড়তে গেছেন, তাঁরা সুদ্ধ দেখে থাকবেন যে ইদানীং তিনি যে-সব বিষয়ে কবিতা লিখছেন, ইতিপূর্ব্বে সেই সকল প্রসঙ্গই তাঁর প্রবন্ধাদির উপজীব্য ছিলো। কিন্তু আমার অনুসারে প্রসঙ্গ কাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র, তার তন্মাত্র রূপ, এবং কোনো কৃত্রিম কলাকৌশলের উপরে এ-রূপের ভিত্তি নয়, এর মূল রূপকারের স্বায়ত্তশাসনে। অবশ্য উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যেও লেখকের যথেচ্ছাচার অচল; কিন্তু সেখানে বিষয় বিষয়ীর জন্মদাতা, এবং কাব্যের ধর্ম্ম ঠিক এর উল্‌টো, এখানে প্রকার প্রকারীর প্রবর্ত্তক। অতএব য়েট্‌স্-এর অর্ব্বাচীন কাব্যে প্রাচীন প্রবন্ধের পুনরুক্তি শুনে তাঁকে নির্ব্বিকার ভাবা অনুচিত; এ-ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন যে এত কাল ধ'রে তিনি হৃদয় আর বুদ্ধির মধ্যে যে-ব্যবধান রেখেছিলেন, আজ তা সেতুসংযুক্ত, এবং আজকাল তিনি বুদ্ধিব সাহায্যে উপলব্ধি আর হৃদয়ের সাহায্যে বিচার করতে পারেন ব'লেই তাঁকে আর বাছাইএর জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না, সব কিছু, এমন-কি

সাবেকী গুরুগম্ভীর গদ্যও, আপনাআপনি রসস্বরূপ পদ্যে বদলে যায়। এ-পর্য্যন্ত তাঁর পদ্য শুধু অনুভূতির উচ্ছ্বাস বইতো, তাছাড়া বাকি সমস্তকে অসুন্দর জেনে তিনি সে-বোঝা চাপিয়েছিলেন গদ্যের কাঁধে। তাই ইষ্টার বিদ্রোহের পূর্ব্বে তাঁর গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটেনি; একটা অপরের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে এক রকম ভারসাম্য জোগাতো বটে, কিন্তু রচয়িতার দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপে তাতেও কোনোমতে জোড়া লাগতো না। এইবার হঠাৎ তাঁর বীভৎসভীতি ভাঙলো, তিনি নিজেকে এতখানি বশে আনলেন যে পশুত্বের পুনরাবর্ত্তনেও তাঁর আপত্তি রইলো না। বরং তিনি বুঝলেন যে বৈপরীত্যসিদ্ধি একা ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়, সেইটাই সভ্যতারও ব্রত; কাজেই যদি খৃষ্টানী আপ্তবাক্যের ফল ফলেই, তবে আর নরদেবতার প্রত্যাগমন ঘটবে না, আমাদের আত্মপ্রদক্ষিণ থামবে প্রাক্পৌরাণিক নরপশুর পুনরুত্থানে।

আমি জানি যে কাব্যবিবেচনা দর্শনালোচনার ক্ষেত্র নয়; বিশেষত য়েট্‌স্-এর মতো সাত্ত্বিক কবির বেলায় তথ্য ও তত্ত্বের, পুরাবৃত্ত ও পরাবিদ্যার এ-রকম জটিল সংমিশ্রণ একেবারে অমার্জ্জনীয়। উপরন্তু যে-পুস্তকদ্বয় থেকে এ-প্রবন্ধের উৎপত্তি, সে-দুটিতে উল্লিখিত মতামত ও ঘটনাঘটনের ইঙ্গিত থাকলেও, তাদের উপভোগ কোনো উৎকট বা উদ্‌ভট ধারণার ধার ধারে না। কিন্তু আর পাঁচ জনের মতো আমিও অভ্যাসের দাস; এবং 'ড্রামাটিস্ পের্সোনি' আকারে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এই অসংলগ্ন দিনপঞ্জিকাগুলি য়েট্‌স্-এর শিল্পজীবনের সীমাস্তম্ভ, যার এক প্রান্তে ১৮৯৬ সালের স্বাক্ষর, অন্য ধারে ১৯১৫-এর নোবেল পুরস্কার। অবশ্য এই নির্ব্বাচিত দৃশ্যাবলীর সঙ্গে স্বয়ং নায়কের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক যৎকিঞ্চিৎ; কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা এতটা সঙ্কল্পপ্রধান, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এমনি আত্মসচেতন যে অবান্তর পরচর্চ্চায় য়েট্‌স্ স্বভাবতই নিরুৎসুক। হয়তো সেইজন্যেই তাঁর রচনাসমূহ শেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যসমষ্টির মতোই পরস্পরাশ্রয়ী, এবং চরমোৎকর্ষের নিকষে উভয়ের অনেক লেখাই যদিও অবিশুদ্ধ, তবু সেগুলোর একটাকেও বাদ দিয়ে বাকি কটার মূল্যনির্দ্ধারণ বা যথাযথ রসগ্রহণ সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস এই ধারাবাহিকতা, এই পৌর্ব্বাপর্য্যবোধ মহাকবিদের সামান্য লক্ষণ, এবং লি-পো-র মতো এই সার্ব্বভৌম মহত্ত্ব নিয়ে জন্মালে জীবনবিমুখ চীনা কবিতার গতানুগতিক চার লাইনেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াচ্ছবি ফুটে ওঠে। অতএব আমার মতে 'এ ফুল্ মুন্ ইন্

মার্চ্'-ও আপাতত নির্ভার, বস্তুত সত্তর বৎসরব্যাপী একাগ্রতার নির্য্যাসেই য়েট্স্ এই স্বচ্ছ নাট্যকাব্য প্রস্তুত করেছেন ; এবং সেই একাগ্রতা যেহেতু অন্তর-বাহিরের সাযুজ্যসম্ভূত, তাই পুস্তিকাখানি পড়ার আগে ও পরে তাঁর দেশ ও কালের, তাঁর বৃত্তি ও বুদ্ধির, তাঁর সাধ ও সাধ্যের ইতিহাস অবশ্যস্মর্ত্তব্য।

তাহলেও ক্রোচে-জেন্তিলে-র বিবেচনায় ইতিহাস আর আষাঢ়ে গল্প একই বিকল্পনার এ-পিঠ আর ও-পিঠ ; এবং ব্যক্তিবাদীমাত্রেই অবগত আছেন যে বিষয় বিষয়ীরই আত্মবিস্মৃতি। সুতরাং উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হয়তো একদেশদর্শী, তাতে নিশ্চয়ই আমার নিজস্ব রুচি-অরুচি, ভয়-ভাবনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব য়েট্স্-এর স্বকীয় সমস্যাগুলোর বিকার ঘটিয়েছে ; এবং যাঁরা বয়সে আমার চেয়ে বড় বা ছোট, যাঁদের জন্ম বাংলাদেশের বাইরে অথবা ভারতবর্ষের সীমান্তরে, যাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষয়-বৃদ্ধি কোনো জাতীয় আন্দোলনের প্রসার-সঙ্কোচ কিম্বা উত্থান-পতনের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে যায়নি, তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ঘটনাঘটন স্বভাবতই একেবারে অন্য-রকম দেখাবে। কারণ তত্ত্ব আর তথ্যের আত্মীয়তা শুধু আক্ষরিক বা শ্রুতিগোচর নয়, অর্থগতও বটে, এবং শব্দ-দুটির অভিধাবিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে প্রকৃতিকৃপণ প্রামাণিকদের অনুমানই উদারচেতা জনসাধারণের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। বলাই বাহুল্য সে-প্রামাণ্য আমার লেখনীকে মানায় না ; এবং য়েট্স্-এর যে-অবৈকল্যে আমি নিরন্তর মুগ্ধ, তা যেকালে অধিকাংশ মানুষেরই আয়ত্তে, তখন সুস্থ ও সবল কাব্যা-মোদীদের পক্ষে তাঁর জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, এ-ধরণের নীরস তত্ত্বজিজ্ঞাসায় কান না পেতে, সোজাসুজি তাঁর রূপসাগরে ডুবতে পারলেই তাঁরা বেশি লাভবান হবেন। কিন্তু আমার সে-স্বাধীনতা নেই ; এবং তাঁকে আমি মহাকবি হিসাবে চিনেছি ব'লেই তাঁর অনিন্দ্য কাব্যকলার অবান্তর গুণকীর্ত্তন আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে, আমি তাঁর লেখার ভিতরে এমন একটা জীবননির্ব্বাহনীতির দৃষ্টান্ত খুঁজি, যা আমাদের ঐতিহ্যভ্রষ্ট যুগকে শক্তি ও শৌর্য্যের. শান্তি ও ধৈর্য্যের অপচিত উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেবে। তবে এ-অন্বেষণও পক্ষপাতদুষ্ট, এর উপ-কারিতা তর্কসাপেক্ষ, এবং প্লেটো, প্লোটাইনাস্ ও শঙ্কর, ভিকো, সরেল্ ও মার্ক্স্, ব্লেক্, শেলি ও কেল্টিক্ সাহিত্যের সমন্বয়ে য়েট্স্ যে-সর্ব্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষা গ'ড়ে তুলেছেন, একখানা সাময়িকপত্রের নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধেও তার মানচিত্র আঁকার চেষ্টা যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি অনিষ্টকর।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দুটি চিঠি

(লিওনিদ আন্দ্রিয়েফ হইতে)

(১) সবই হয় —অসময়ে।

তুমি কৈফিয়ৎ চেয়েছিলে, এই নাও। জানি, হৃদয় তোমার বেদনার্দ্র ও অসাড় হয়ে উঠবে, সারা সন্ধ্যা, হয়তো বা কালও, তোমার চোখের জল ঝরবে; কিন্তু আমার মন গলবে না করুণায়! এতো প্রখর তোমার যৌবন যে যায় না তোমায় করুণা করা! তোমার চিত্ত তোমার হাসি, তোমার অশ্রু সকলই এতো তাজা যে করুণার সঞ্চার হয় না; সেজন্য তিরস্কার করো না আমাকে। দেখেছিলাম একদিন এক তরুণীর কক্ষে একটা চিঠি, আমারই চিঠির মতো, পড়ে আছে অশ্রুকলঙ্কিত; পরে দেখেছি সেই চিঠিতেই নূতনতর দাগ, কফির পেয়ালার গোল ছাপ। জানো কয়টী বৎসরের ব্যবধান এই তীব্র চোখের জল ও সুগন্ধি কফির পেয়ালার দাগের মাঝে? একটী বৎসর, প্রিয়া, মাত্র একটী বৎসর। বিশ্বাস করবে যে বড় শ্রান্ত আমি? যারা শ্রান্ত তারাই কেবল হতে পারে উদাসীন তরুণীর চোখের জলে, এক বছরের শোভন শোকে। তাদেরই হাত যে শীতল ও ভারাক্রান্ত। শবদেহ শক্তিহীন ও নিশ্চেষ্ট, তবুও এরই নিষ্ক্রিয় হস্তের আঘাত প্রহারের চেয়ে প্রচণ্ড। আমি ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত! কাল যখন দরজায় তুমি ঘা মেরেছিলে, আমি ঘরেই ছিলাম, অন্ধকারে, একাকী, নিদ্রাহীন; তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার শাড়ীর মৃদু খস্ খস্ কানে এসেছিল, অবরুদ্ধ ও নিস্তব্ধ দুয়ারের পশ্চাতে যেন তোমার বিষণ্ণ, ভীত বক্ষ-স্পন্দন শুনতে পেলাম। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম, দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে তোমাকে আনি নি, এর চেয়ে তুমি কোনো সমাধি-শিলায় আঘাত করলেও ভালো করতে, সেখান হতে কেউই রেহাই পায় না। না, না, কর্ম্মক্লান্তের শ্রান্তি এ নয়, যার জন্য হাতের কাজ কেড়ে নিতে নিতে মৃদু তিরস্কার তুমি করেছ কতদিন, হৃৎশক্তির জড়তা বা কর্ম্মোদ্যমের স্থৈর্য্যও এ নয়; এ শুধু জীবনের ক্লান্তি, উত্তেজনার অনুবর্ত্তী মন্থর

নিস্তব্ধতা, মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করবার হিমশীতল পথ। মনে হয় যেন অকস্মাৎ বিগত বৎসরগুলি একত্র হয়ে আমায় ভর করেছে, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমার জীবনের সকল কাজ শেষ হোল, সকল ছবিই আঁকা হোল, এই দুরন্ত অস্তিত্বের আনন্দ বেদনার সবটুকু এরই মধ্যে কাটিয়ে দিলাম। বক্ষ আমার আর স্পন্দিত হতে চায় না। প্রিয়তমে, এ কী তোমার ধারণায় আসে? প্রাচীন গির্জ্জায় সুদীর্ঘ কাল বেজে যাওয়া ঘড়ির মতো প্রতি আঘাতে এ নিঃশেষ হয়ে আসছে।

শ্রান্ত জীবনে আসে এই ক্লান্তির ক্ষণ! আমার মন আবার আজ সতেজ, স্বচ্ছ চোখ দেখতে চাইছে মেঘের রূপের লীলা, রংয়ের তুলিকায় আবার হাত দিয়েছি, ক্যানভ্যাসটী আবার ডাক দিচ্ছে যেন। না-ই যদি দেখবো ত কিসের জন্যে চোখ, কাজ না করলে হাত দিয়ে কী বা হবে? নাপিতের কাছে চুল ছাঁটতে গিয়েছিলাম আজ,—রিসারেক্‌শনের দিনে কী ভীষণ ভাবেই না তারা বিব্রত হয়ে উঠবে,—কামানো শেষ হোলে সে ঠিকই বলেছিল, "আপনাকে এখন বেশ তরুণ দেখাচ্ছে।"

হ্যাঁ আমি এখন আগের চেয়ে তরুণ, সমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম, আমার মনের ভাব এখন মেলায়-আনা জিপসীদের ঘোড়ার মত, যে-গুলির তেজীয়ান চেহারায় ক্রেতারা প্রলোভিত হয়। এ শান্ত উজ্জ্বল দেহে প্রাণঘাতী শ্রান্তির যে ছায়া পড়েছে, একমাত্র তীক্ষ্ণ ও তীব্র মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতেই তা ধরা পড়ে। অথবা কবির ভাষায় বলা চলে কালসাপ সারা রাত্রি পুষ্পশয্যায় যে সুষুপ্ত ছিল, সকাল বেলা তাকে দেখে কে তা বোঝে?

আজ যদি তুমি আসতে, নিঃসন্দেহে সানন্দে দুয়ার খুলে অভ্যর্থনা করতাম, সারা সন্ধ্যা তোমাকে ও আমাকে, ঈশ্বর ও মানুষকে, মৃত্যু ও প্রেমকে সুকৌশলে প্রতারিত করতে পারতাম। মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন যুবকের মত আগে আগে গিয়ে পাহাড়ে উঠি, হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম —এ সব ব্যাপার বৃদ্ধদের পক্ষে বড় সাংঘাতিক,—দাঁড়িয়েছিলাম পাহাড়ের চূড়ায়, বেদীতে দণ্ডায়মান গ্রীক যুবকদের মত তোমার হাতের বিজয়-মাল্যের লোভে। কিন্তু আমার এসব প্রচেষ্টা তোমার চোখেই পড়লো না, এ যে বড় স্বাভাবিক তোমার কাছে। বাস্তবিক এ অব্যক্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছিল, আজও আমার মিথ্যা আরো ছলনাময় হতে পারতো, যার ঘুমপাড়ানী আস্বাদ আমি কল্পনায় গ্রহণ করতে পারছি। সৌখীন বাজিয়ে যেমন খেলো বা কৃত্রিম সুর বাজায়—না বাজিয়েই ব সে কী করে,

—আমাকেও তেমনি আমার ভবিষ্যৎ ছবির সম্বন্ধে কৃত্রিমতাই বরণ করতে হোত, আমার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠতো' যেন নব প্রেরণা এসেছে, ঈশ্বর ও মানুষের নিকট নীচতম প্রতারক হিসাবে গণ্য হতাম। শিশুর মত সরল ও প্রিয় তোমার চক্ষু দুটীকে মুগ্ধ করতে ঘণ্টাখানেকের জন্য আমাকে সাজতে হোত যেন একজন প্রতিভাশালী শিল্পী। বন্ধু আমার, এ সকলই প্রতারণা, এ ঘোর বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ নাই আমার কোনো প্রতিভা। ভবিষ্যতে আবো কি ছবি আঁকবো? আমার আঁকার পালা শেষ হয়েছে।

শ্রান্ত আমি। ক্রেতাদের সে খবর জানিও না, কাজ আমায় শেষ করতেই হবে, কিন্তু আমি সত্যই যে বড় ক্লান্ত। এ জীবনে যা কিছু পেয়েছি, সবই এতো অসময়ে। রাগ করো না, চোখের জলও ফেলো না, ছোট্ট আমার, তোমার প্রেমও নিষ্প্রয়োজন আমার জীবনে। এই ভালো যে এ সম্বন্ধে কোনো কথাই কখনও হয়নি, বাড়তে পায় নি এ মিথ্যার বীজ, তাহলে আজ এ ফুলগুলির পরে কী ঘৃণাই জন্মাত। মিষ্টি আমার, সবই তো জানি, মাসখানেক ধরে, হয়তো তার চেয়েও কিছু বেশী, সর্ব্বদাই অবসর ও সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছ কখন আমাকে বলবে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। প্রতারক ডন্ জুয়ান ও তুচ্ছ ভীরুর মতো, একমাস সে চেষ্টায় আনন্দ পেয়ে তোমার প্রেম জাগিয়ে, স্বেচ্ছাকৃত কপট উপায়ে গভীরতর অনুভূতির উদ্দীপনায় তোমাকে উত্তুঙ্গ চূড়ায় উন্নীত করে, পালিয়ে এসেছি শঙ্কিত হৃদয়ে চিরকালের মত। হৃদয় আমার কম্পিত, নিশংসয়রূপে ভীত, প্রবল প্রবৃত্তি-বেগে আমার অন্তর তাড়িত, কিন্তু আমার পদবিক্ষেপ ভীরুর, পুলিস-বিতাড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্ত গাঁটকাটার মত। মনে পড়ে আমাদের সন্ধ্যা মিলনের প্রারম্ভে কথা বলতে তুমি আর আমি রইতাম নিস্তব্ধ হয়ে, কিন্তু শেষের দিকে আমিই যেন আবিষ্ট হয়ে অনবরত কথা বলে যেতাম আর তুমি থাক্‌তে স্তব্ধ, হতবুদ্ধি, বাক্‌হীন ও বিষাদাচ্ছন্ন, বোধহয় বুঝতে পারতে না এ কথার সমুদ্র হতে কী উঠবে? নিঃশব্দ তুমি, বাইরে তোমাকে নিয়ে আসি, ধরে থাকি তোমার ম্লান কম্পিত দুটী হাত, তারপর দুয়ার দিই। রেহাই পেয়েছি আজ আমি। দ্রুত গন্তব্য পথে চলেছ তুমি, অথবা তুমি দ্বিধান্বিত? আমি কিন্তু চলে যাই সে মুহূর্ত্তেই। মনে পড়ে গত সপ্তাহে সেই জড় নির্ব্বুদ্ধি দরজার পানে সুদীর্ঘকাল তাকিয়ে রইলাম, আমার শেষাগত অভাবনীয় আনন্দের 'পরে চিরদিনের মত যেটী রুদ্ধ করে দিয়েছিলাম। এর

আলোকিত ভাগে তাকিয়েই দরজা থাকার অর্থ বুঝতে পারলাম; তোমার মৃদু নিঃশ্বাস তখন যদি কানে আসতো! কিছু না। যা কিছু ঘটে অতি বিলম্বে।

ট্রেন ছাড়ার সকালে, তল্পীতল্পা বাঁধা হয়ে গেছে, আঁকার ঝুলি হাতের কাছে নেই, সম্মুখে অবসর রাত্রি-জোড়া, বিবেচনার অনুকূল মুহূর্ত্ত। এর অর্থ জান? ছোট বেলায় সাত আট বৎসর বয়সে আমাদের পিছনের রাস্তায় ছোট্ট দোকানের সস্তা এক রকম কেকের বড় লোভ ছিল আমার, এগুলোর নাম ছিল 'ঝামকী'; জানি না কেন যে আমার ইচ্ছামত পয়সা থাকতো না ঐ ঝামকী কেনার; পিতা-মাতাও দরিদ্র ছিলেন না, অন্য কোনো প্রকার অভাবও ছিল না, কিন্তু ওগুলি কিন্‌তে যথেষ্ট পয়সা কখনো যেন আমার হাতে থাকতো না। এ এক প্রকারের পাগলামী, ছেলেমানুষী খেয়াল; এখনো ভুলতে পারি না ঝামকীর স্বপ্ন দেখা, যারা খেতো তাদের প্রতি নিদারুণ হিংসা, সেই অদ্ভুত স্বাদ ও গড়ন, তাদের হালকা ঠুনকো খোলা ও অসংখ্য অসংখ্য পাওয়ার তীব্র লোভ! বোধ হয় খেয়েছি প্রচুর পরিমাণেই, তবু আরো পেতে সাধ জাগতো, এখন পর্যন্ত এত বৎসর পরেও ও-লোভ নির্ম্মূল হয় নি। এ সব ধারণা করতে পারো? আমি এখন প্রচুর কিনতে পারি, কখনো কখনো দুএক পাউণ্ড কিনে চাকরদের বিলিয়ে দিই। এ তো সে কেক নয়, এগুলি আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়, এদের স্বাদও সে রকম নেই।

সেই পাওয়া গেলো, কিন্তু বড় দেরীতে। সকলই অসময়ে ঘটে থাকে, আমার প্রিয় খাদ্য কেবল এই মূঢ় ঘটনার ভূমিকাস্বরূপ। বয়স বাড়লে ভ্রমণের তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত হোল, সে বাসনা কত উগ্র! নব নব দেশ ও সাগর দর্শনের আসক্তি অবিদিত নেই তোমার, আমার ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রমণের কথা বলার সময়ে তোমার চোখে দেখেছি সেই কৌতূহলের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সীমাহীন যাত্রার পিপাসা, পৃথিবীর চিরপথিক মানবাত্মার নম্রপূত তীব্র ব্যাকুলতা। এ ক্ষুদ্র অগ্নিকণা প্রজ্জ্বলিত হয় সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিতে যাযাবর ও দুঃসাহসীদের জীবনে। আমার বেলায় তা হোল যেন চাপা আগুন, যে শিক্ষিত যুবক দেশের সেবায় ও পিতামাতার সান্ত্বনার জন্য প্রতিপালিত তার জীবনে যেটুকু শোভা পায়। নির্দ্দিষ্ট পাঠ শেষ না করে কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা আমার হোল না, কিন্তু যখন আমি গেলাম···ওয়ার্গ-লি চড়ে বেড়ানো, অথবা টিরোল প্রদেশে ভারী টুরিষ্ট বুট পায়ে ঘোরা ফেরা নিশ্চয় তৃপ্তি ও আরাম দেয়, অন্ততঃপক্ষে তাতে আছে যথার্থ ভ্রমণের মায়া। তবুও যখন

গাড়ীর জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে তাকাই, কেন সর্ব্বদা একটী ছাত্রের ছায়া চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে, যে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রেলের পিছনে ধেয়ে চলেছে দ্রুতপদে ও নিরাশ হৃদয়ে, শব্দায়মান বিরতিস্থানে যে অদৃশ্য হয়ে আবার জেগে ওঠে বিবর্ণ মৃতের মত সূর্য্যালোকিত গৃহ 'পরে আর্ণো নদীর তীরে, নরওয়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায়, আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গ-অশান্ত বিস্তৃতিতে? সমান আগ্রহে তাকে অনুসরণ করতে দেখেছি জাহাজ ও ট্রেন, কিন্তু গ্র্যাণ্ড হোটেল বা একসেলসিয়ারে তার সন্ধান মেলেনি কখনো। সে জগৎ কত না নীরস যেখানে যথেচ্ছ ভ্রমণাভিযান-বিলাসীর বদলে এসেছে সুসভ্য পর্য্যটক, যেখানে মৃত মানবের পারাপারের ভার নিয়েছে কুক কোম্পানী, ক্যারন্ নয়।

এও এলো, কিন্তু কত বিলম্বে; সবই যে আসে সময় পার হয়ে গেলে, তাই তো আমার অন্তরে নৈরাশ্য সঞ্চিত। প্রেম, হ্যাঁ প্রেমও এলো অবেলায়। এ বিধাতার অভিশপ্ত প্রদেশ যেখানে প্রতিবন্ধকই নিয়ম, কোনো গাড়ীই ঠিক সময়ে পোঁছায় না, লালটুপীধারী ষ্টেশন-মাষ্টারেরা পাগল অথবা নির্ব্বোধ, ক্রমাগত দুর্ঘটনায় রক্ষীরা পর্য্যন্ত বিবেচনা-রহিত। বিশ্বস্ততা ও অন্তরঙ্গতা আসে একান্ত অকালে, একের বেলায় যা সময়ের আগে, অন্যের পক্ষে তা সময়ের পিছনে। সমস্ত ঘড়ি ভুল বকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনও মিথ্যা, যেন নৃত্যশীল মাতাল ভূতেরা কেউ কেউ গোলাকারে ঘুরে বেড়ায়, অন্যেরা আবার তাদের পিছু পিছু ধায় আর প্রসারিত হস্ত শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে! সবই যে আসে জীবনের শেষ বেলায়, চির প্রতীক্ষিত মুহূর্ত্তকে চির বিরহের অতল অনন্তে রূপান্তরিত করার রহস্য কেবল প্রেমই জানে।

আমার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অতীত জীবন তোমার অজ্ঞাত, তা আর আলোড়িত করতে চাই না; অনেকের ছায়ায় তা ভরপূর, আজ সে সব বিগতদের জন্যে আমার মনে সহানুভূতি জাগছে, তাদের শান্তি আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে কামনা করি। কিন্তু একটী নারী আছে যাকে আমি সমাধি-শয্যায়ও অশান্তির আগুনে দগ্ধ করতে চাই, কী নির্ব্বোধ সে নারী, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে মারা গেলে আমি একটী লোক নিযুক্ত করবো যে তার সমাধির 'পরে দিবারাত্রি বেত মারবে যাতে মৃত্যুর পরেও সে শান্তি না পায়। শুনবে, প্রিয়া, ব্যাপারটা কি? সে এলো কিনা দেরী করে, ছ'টি বছরের দেরী। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে আমি তার প্রেম-ভিক্ষা করেছি, তারই

সেবায় মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি. কিন্তু সে ছয় বৎসরই তার চিত্ত দোলায়মান, সমস্ত প্রতিশ্রুত সাক্ষাতেই তার বিলম্ব হোত, করলে বিয়ে, ভাঙলে তাকে, আবার বিয়ে। আমি ও আমার প্রেম, তার মনে পড়ত সকলের শেষে। সুদীর্ঘ ছয় বৎসর! তখন যে মর্ম্মস্পর্শী ও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেছি সে সকল নির্ব্বুদ্ধিতার উল্লেখ করে তোমার হিংসার উদ্রেক আর করবো না, সত্যই তখন আমি ছিলাম অপ্রকৃতিস্থ ও করুণার যোগ্য, এ মিথ্যা আশার অভিশপ্ত দেশে সকলেরই এ অবস্থা হয়, সকলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। আমার হৃদয়ের শেষ উন্মত্ত আবেগ হাশিশ-এর মতো আমাকে মোহময় আশঙ্কা ও বিভীষিকাময় কুহকের রাজ্যে নিয়েছিল; যখন ফিরে এলাম সেখান হতে আমি তখন খেলার পুতুলের মত শীর্ণকায়, গিরিমাটীর মত বিবর্ণ ও তুর্কীর মত স্তব্ধ। পথের ধারে বজ্রাহত প্রাচীন বৃক্ষ চোখে পড়েছে কখনো, বাহিরে সবুজ ডালপালা, ভিতর নিঃশেষে পুড়ে কালো অঙ্গারে পরিণত? আমার প্রেমকে আমি নিজ হাতে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছি, কর্ম্মবিহীন বিরল অবসরে বসে বসে ভাবি আমার বীরের ন্যায় সংগ্রামে সমুজ্জ্বল বিজয়-গৌরব।

ইতিমধ্যে আমার প্রতি তার প্রেমের পাঠ সুরু হোল। আমাদের মধ্যবর্ত্তী সহস্র সহস্র মাইলের ব্যবধান, তার খেয়াল মেটাতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বামীর অস্তিত্ব, সবই ব্যর্থ হয়ে গেল, মার্গারেট সামান্য কলুষিত অবস্থায় জীবনক্লান্ত ফাউষ্টকে যেমন ভালবাসতে পারতো, আমার প্রতি জাগলো তার তেমনি প্রেম। শয়তানের আড্ডায় আমার যাতায়াত নেই, সুতরাং তার মতলব আমার অজানা, জানি না কী উদ্দেশ্যে সে এমন খেলা খেলেছে, সম্ভবত নিছক বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকে খুঁজে বের করে, একস্‌প্রেস ট্রেনে অতি দ্রুতগতিতে সে এলো! তারপর দু-সপ্তাহ ধরে ইটালীর নীল আকাশের নীচে, মানুষের সৃজন-প্রতিভার অতীত একটী ব্যর্থ প্রহসনের পালা অভিনীত হোলো! বুদ্ধিহীনা এই নারীকে মার্জ্জনা করো তুমি, সে অজস্র চোখের জল ফেলেছে, যন্ত্রণাও ভোগ করেছে নিদারুণ।

হ্যাঁ সেই তো সময়—যখন বিবর্ণ বিশীর্ণ খেলার পুতুলটীর কাছে বয়ে এসেছিলো অকথিত সৌভাগ্য। সেই স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে একই ট্রেনে এলো যশোভাগ্য—আমার অন্যতরা প্রতীক্ষিতা প্রণয়িনী। সে সময়ের কথা জান তুমি, চোখ ঝলসানো সাফল্যের দ্রুত অভিযান হয়তো তোমার মনে আছে, রোমে, ভেনিসে, প্যারিসে সকল প্রদর্শনীতেই আমার সুনাম যেন উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন ও আতসবাজির মত ছড়িয়ে

পড়লো, সে যেন এক অলৌকিক ব্যাপার। একাডেমীতে নির্ব্বাচন, অজস্র অর্থ, সস্তা পত্রিকার খেলো কাগজে আমার ছবি, যাতে আমাকে দেখায় যেন অস্পষ্ট আঁকা নিগ্রো। একদিন আমার ঐ বাজে প্রতিকৃতিটার বিদ্রূপ করাতে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলে ভৎ'সনার সাথে; মলিন চিত্রিত কালো দাগটী তোমার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল মানুষের সৌন্দর্য্য ও যশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে। বিস্ময়ের অবকাশ নেই এখানে, কারণ ওখানে যে আমি সকলেরই দর্শন-গোচর, এমন কি যারা আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিকার তাদের কাছেও। আমার যশ বিঘোষিত হতে আর কোন্ প্রমাণের প্রয়োজন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার গাড়ীখানা, যেটা আমার প্রাণ নিয়েছিল আর কি, বেচে দিয়েছি সে খুনে জিনিষটাকে, আর সমুদ্রের ধারে আমার 'ভিলা', আর আমার বাতরোগ; আমার টেবিলে সত্যিকারের ফুল, যার গন্ধে আমার কাজের ঘরের হাওয়া হোত বিষাক্ত। ফুল আমি ভালো-বাসতুম, কিন্তু সে আর এক কালে, অতীতে।

বলবো তোমায়, শান্ত আমার, যশও এলো আমার ভাগ্যে বড় অসময়ে? তুমি, অকপটে ও অসঙ্কোচে আমার জীবন-সন্ধ্যার যশোভাগ্যে সুখী, আমার পাশে চলতে গিয়ে যে তোমার চোখে অন্তরস্থিত গর্ব্বের দীপ্তি ঠিকরে ওঠে, সেই তোমার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টিতে কি ধরা পড়বে যে এমন অপরূপ সৌভাগ্যও অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে? তবু হায়, এও যে কঠোর সত্য, অনেকদিন থেকেই এমনিতর বিশৃঙ্খল, অপরিচ্ছন্ন প্রণয়িনী যে রাঁধতে পর্য্যন্ত জানে না, তার বদলে আমি চেয়ে আসছি ধীরা বুদ্ধিমতি অভিজ্ঞ গৃহকর্ত্রী। ভৃত্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা কোথায়? আমার গৃহের মেজেতে কত কর্দ্দমাক্ত পদচিহ্ন, সেগুলি ধুয়ে মুছে ফেলার বদলে আমার বুদ্ধিহীনা প্রণয়িনীটি আবার বার্ণিস করে নূতন আগন্তুকদের কাছে আমার যশের পরিচয় দিতো।

পরিণত-বয়স্ক স্বামীরা প্রায়ই তাদের অল্পবয়স্কা পত্নীদের তিরস্কার করে আনন্দিত হয়, হয়ত বা এই আমার তরুণী প্রণয়িনী স্বেচ্ছাচারিণী নয়, হতে পারে সে গম্ভীর প্রকৃতির লোক যার কিছু কিছু নির্দ্দোষ খামখেয়ালীপনা আছে। হয়ত সে অনুগতা স্ত্রী! কিন্তু এই অনুগতা স্ত্রীটীর সবচেয়ে বড় দোষ যে জীবনে শেষ বেলাতে সে এলো, আমার পরম আকুতির সময়ে তাকে পাইনি। কোথায় ছিল সে যখন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তার প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি? কোথায়

লুকিয়েছিল সে যখন আমার ছবির পর্দ্দায় তাকে খুঁজে বেড়িয়েছি, খুঁজে বেড়িয়েছি সেই সব চোখে যাদের অনাগ্রহ দৃষ্টিতে আমার ছবির আমার রংয়ের ভাষা চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে? তখন, তখন কি সে যারা তার কদর বোঝে না তাদেরকে আদর করায় ব্যস্ত ছিলো?

মার্জ্জনা করো আমার এ হীন চিন্তা, এর তিক্ততাতেই এর একমাত্র সমর্থন। পথ ছেড়ে দাও আমার এ বিলম্বিত আগন্তুকের, যাক সে চলে নেচে গেয়ে। দিন-শেষে কর্ম্মক্লিষ্ট খনি-মজুরের মত আমিও বড় শ্রান্ত, বহুদূর দেশের যাত্রী আমি, আমার তল্পীতল্পা বাঁধা হয়ে গেছে, আর আমি তোমার কাছে শেষ বিদায় নিচ্ছি চিরদিনের মতো,—এরই মধ্যে নিহিত হয়ে আছে আমার ঘৃণা ও জঘন্য অবিচারের হেতু। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করুক, কিন্তু আর একটা কথা বাকী, আমার আর একটী অনুযোগ—কেন সে আমার ছবিগুলির মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে গেলো? জান, সর্ব্বস্ব দিয়েও নিজের আঁকা ছবি কেনার সামর্থ্য নেই আমার, তাদের দাম বড় চড়া, সুধু ধনীদেরই প্রাপ্য, বিশেষত আমার প্রথম আঁকা ছবিগুলি যা আমি ষ্টোভে আগুন ধরাতে বা আমার ঠাণ্ডা দোকান-ঘরটী উত্তপ্ত করা জ্বালানি কাঠের বদলে বিক্রয় করে ফেলেছিলাম। সংগ্রাহকেরা সেগুলি সযত্নে রেখে দিয়েছে। সম্প্রতি মনের আবেগে একখানির প্রশংসা করাতে দয়ালু সংগ্রাহক আমাকে সেটা দেখিয়ে দিয়ে তার গুণ-ব্যাখ্যান শোনালে, আর মাঝে মাঝে ইচ্ছামত এসে দেখতে অনুমতি দিলে—দয়ালু বোকা লোক, এই সংগ্রাহকটী! আমার দুঃখ হচ্ছে যে তোমার সঙ্গে আমি যাই নি, সেদিন সূর্য্যের আলো এত উজ্জ্বল, মাঠটী ছিল ঘাসে ঢাকা।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে সব ঈপ্সিত জিনিষ পাওয়া যায়; তাই ত আজ আমার গাড়ীতে সীট রিজার্ভ ও এত মালপত্র। ভ্রমণের জন্য ওগুলি আমার আবশ্যক নয়, ও হচ্ছে আমার বার্দ্ধক্য, আমার নিরাশা, আমার মৃত্যুসম ক্লান্তির লক্ষণ, যা আমি অজানা গন্তব্য পথে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো; কুলিরা এ বোঝা দেখেই বিরক্তি প্রকাশ করবে, আমিও ভাবছি হায় এ যদি আর একটু হালকা হোত। রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এলো, বুঝলে আমার কথা, প্রিয়তমে? না, না তুমি কি করে বুঝবে, এ সব তো তোমার বোঝার কথা নয়। কে এক নারী ছয় বৎসর প্রতীক্ষার পরে এসেছিলো, তাতে তোমার কী আসে যায়? কী বা তোমার আসে যায় যশঃলক্ষ্মীর খেয়ালীপনার বিরুদ্ধে আমার শ্রান্ত অভিযোগে ও বিদ্রূপ-বিরক্তিতে?

তোমার কাছে এ সব শুধু মুখবন্ধের চিহ্নিত পৃষ্ঠা। তুমি মূল্য দেবে তখনই যখন তোমার কথা তুলবো, তাই তোমার পক্ষে সত্য, সেটাই তো তুমি শুনবে মন দিয়ে। বল ত ঠিক বলেছি কি না। তবে তাই হোক, ভূমিকা সেরে এখন আসল কথাটা আরম্ভ করা যাক।

আমাকে ভালোবেসেছ; এ কী সত্য? জানি এ সত্য, তাই ভালোবাসা শব্দটী বানান করে লিখতে গিয়ে অকারণে নির্লজ্জের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি। আমার জীবনে এর অর্থ বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এর জাদুময় ধ্বনি ও পবিত্র মাধুর্য্যে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জেগে ওঠে—গভীর নিশীথে ঘড়ীর শব্দে যেমন প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। ঘড়ীতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে যায়, যেন ঘোষণা করে দিয়ে যায়, এখন নিশীথ রাত্রি, সূর্য্যোদয়ের বহু বিলম্ব, ঘুমাও মানব ঘুমাও।

কিন্তু বাজে কথায় আবার বিবক্তিকর ভূমিকার অবতারণা করেছি। আমার পাঠিকাটী তো ভালো করেই জানে যে সে আমায় ভালোবাসে—সে সব তার কাছে বাহুল্য মাত্র; সে শুনতে চায় শুধু আমার দিকের কথা। তাকে আমি কি বলবো?

চাঞ্চল্য ক্ষমা করো আমার, আমিও তোমাকে ভালোবাসি, পারিনা তোমাকে ভালো না বেসে; সত্যই আমিও তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমি অবসন্ন, একান্ত অবসন্ন, না, না আমি তা ভেবে বলিনি। তুমি কি বুঝতে পারো না যে আমার জীবনে কত দেরীতে এসেছ তুমি, সত্যই কি অসম্ভব রকম দেরী হয়ে যায় নি? বহুদিন পূর্ব্বেই হিসাব করে রেখেছি, সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর পার হয়ে গেছে পর তুমি এসেছ! তোমার জন্মই হয়েছে আটাশ বৎসর দেরীতে। তোমার আবির্ভাব হয়নি, আসোনি তুমি, সেই সুদীর্ঘ কালে—আমি যখন বেঁচেছিলাম; তখন আমার জীবনে তোমার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। এই গূঢ় অসঙ্গতি কী দেখতে পাচ্ছ না? অপরাধীকে খুঁজে পেলে বলতাম, এ পাপ। বহু পূর্ব্বেই আমার জীবন সুরু হয়ে গিয়েছিল, দাড়ী রেখেছিলাম মাহিনে করা নাপিতও ছিল; একলা ড্রস্‌কি গাড়ীতে গাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েছি, মদ্যপান করেছি, উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হয়ে দিন কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু তুমি তখনও পৃথিবীর আলো দেখ নাই। ভাবো একবার তোমার জন্মাবার পূর্ব্বেই আমার ক্লান্তির বীজ উপ্ত হয়ে গেছে। তারপরে

তুমি এলে—ছোট্ট একটী মেয়ে যে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেতো ও পুতুল নিয়ে খেলা করতো ; পৃথিবীতে তুমি এসেছ, কিন্তু কত কচি ! চুলের বিনুনী ও খেলার পুতুল। হায় ভগবান বেণী আর পুতুল ছাড়া তখন তুমি আর কিছুই নও। অনেক বৎসর পরে—সুন্দরী তুমি এলে আমার জীবনে, দুয়ার খুলে গেল সহজে, তোমার আগমন হোল, কী অপরূপ তোমার মূর্ত্তি ! এখনও কি এর ব্যর্থতা বুঝতে পারো না ? এত রূপ নিয়ে কেন তুমি জন্মালে ? কেন তুমি এলে, আমার সারা জীবনের স্বপ্ন ? ভেবেছিলাম আমি যেমনটী চাই তেমনটী কোথাও নেই, এমন সময় অকস্মাৎ দুয়ার খুলে গেলো, এ রকম তো সচরাচর কতবারই খুলেছে, কিন্তু এবার ? কে এলো আমার খোলা দুয়ার-পথে ? বিশ্বাস করো, তোমাকে চিনতে আমার বেশী দিন লাগে নি, এক মুহূর্ত্তেই আমার নিকট সবই উদ্ঘাটিত হয়ে গেলো, কিন্তু এও বুঝতে পেরেছি যে তুমি যখন এলে তখন সময় চলে গেছে, আমাদের মিলন শুধু একটা দুঃসহ দুর্ভাগ্য। এমনি ভাবেই দান্তে দেখেছিল বেয়াতৃচেকে, কিন্তু দেরীতে আসায় তুমি পেলে শুধু দান্তের অন্তরের ছায়াবিশেষ ; আগেই যে সব বিলিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। তোমার দান্তে যে আতুর, বেয়াতৃচে !

নিঃস্ব আমি, লিখলাম একথা ; কিন্তু অতীতে যদি এ রকম কথা লিখতে হোত, তাহলে হয়তো আমি কাঁদতাম বা বিষ খেতে চাইতাম, কিন্তু এখন, এখন আমি ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ভাবে ভাবছি যে প্রাতরাশের সময় হবে কিনা। সকালের আহার্য্য না পেলে সারাদিন আমি আর আমাতে থাকি না। বুঝতে পারছো তো সব, না এখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি ? মিথ্যা বলেছি, মিথ্যা একথা যে তোমাকে আমি ভালোবাসি। কাউকেই ভালোবাসিনা আমি, কিছুরই আর লিপ্সা নেই ; আমি শুধু চাই নির্জ্জনতা ও শান্তি, শান্তি ও মৃত্যু, নয়ত সেই যে কোন্ দেশ যেখানে কোনো কোলাহল নেই, কেউ ডাকে না বা দেখা করতে আসে না, যেখানে দিন ও রাত্রি একেবারে নিস্তব্ধ। কী যে অবসাদ, কি বলব !

এই অনিচ্ছাকৃত তিক্ততার জন্যে আবার মার্জ্জনা চাই, নিদ্রাহীন রাত্রিতে স্নায়ু হয় দুর্ব্বল, জীবনে ভয়ের ছায়া ফেলে ও অদ্ভুত আবেগের সঞ্চার করে। আমার জীবনে এসব সত্য নয়, এ শুধু অভিনয় , একটি মাত্র সত্য ধ্রুব আমার জীবনে—খনি মজুরের ক্লান্তি জীবনের বেলা-শেষে যখন সূর্য্য চলে অস্তমুখে। তারই অনুসরণ করবো আমি, এ জীবনে তাই হবে সমাপ্তি, রইবে না আর কোনো প্রশ্ন,

কোনো উত্তর, কোনো কিছু। বিদায়, প্রিয়তমে, তোমার হাতে আমার শেষ চুম্বন দিয়ে গেলাম, হাঁ এই কেবল সত্য যে তোমার হাতে চাপছি আমার ঠোঁট। আর তো কিছু বলার নেই ; তুমি আসবে, কিন্তু গৃহ আমার শূন্য···না, না, সে সব কথা আমি ভাবিনি এখন। এখানেই শেষ, বিদায়, চিরদিনের মতো বিদায়। স্থায়ী হোক তোমার রূপ, অপরের তরে ; কিন্তু আমার কাছে এসেছিলে তুমি বড় অসময়ে, যা কিছু আসে সবই আসে বড় অসময়ে, সবই মিলে বড় দেরীতে।

আমার নাম লেখা প্রবঞ্চনা, সুতরাং ও নাম আর স্বাক্ষর নাইবা করলাম ; আমার নাম রেখো,—পলাতক।

(২) মানবো না, এ অসময়।

না, না, এ ক্ষমা করা যায় না। কোনো কারণ দেখালে না, তোমার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত জানালে না, অকস্মাৎ কোথায় চলে গেলে তুমি ? কী বা করবো, কিছুই বুঝতে পারি না ; তুমি তো জানোই আমার লেখার ক্ষমতা নেই, তাছাড়া চিঠি লেখার মূল্যই বা কি ?

আমার সঙ্গে দেখা না করে কেন এমন করলে ? এমন নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ কেউ করে ? একবারও যদি ভাবতে পারতাম যে এত বড় খেয়ালী তুমি, তাহোলে দরজা ছেড়ে এক পাও নড়তাম না, সারা দিনরাত চোখে চোখে রাখতাম তোমাকে। আজ সকালেই চলে গেছ ? তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই এসেছি, তোমার ঘর ফাঁকা, দেখতে কি ভয়ানক বিশ্রী। ফিরে গেলাম যেন দশায় পাওয়া, পথে চাপা পড়তে পড়তে পড়িনি। ঈশ্বরের অনেক দয়া যে তুমি বেঁচে আছো·········কিন্তু কোথায় তোমার দেখা পাব ? জাহাজে বা ট্রেনে। তুমি কোথায় থাকো এ খবরে আমি এতো অভ্যস্ত তাই আজ এতো অদ্ভুত লাগছে ; কোথায় আছো তুমি জানি না বলে মনে হচ্ছে তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি আমার পার্স টার মতো। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না, চুপ করে রয়েছি ; কার কাছেই বা বলবো ? মিথ্যা আশায় মুগ্ধ হয়ে আজ আবার ফোনে তোমায় ডেকেছি,—কোনও উত্তর পাই নি, অবাকও হই নি।

যে তুমি এতো বোঝো, এটুকু আর বুঝতে পারলে না যে সবই আমি জানি।

যেদিন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা, লক্ষ্য করেছিলাম যে তোমার পক্ষে দৌড়ে যাওয়া কতো দুঃসাধ্য, ইচ্ছে করেই থেমে থেমে চলেছিলাম যাতে তুমিও আস্তে আস্তে উঠতে পার। কিন্তু তুমি না দৌড়িয়ে ছাড়লেনা, তোমার দমও তাই ফুরিয়ে গেল। তোমার এমন সুন্দর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো বলে বড় দুঃখ হচ্ছিল ; কারণ এ সকলের তো কোনো প্রয়োজন ছিল না। তোমার বয়সের কথা কি জানি না আমি, কতো অসংখ্যবার তো বলেছ সে কি ভোলা যায় ; কিন্তু তাতে কী বা আসে যায়? আমি কি চেয়েছিলাম একবারও যে তুমি দৌড়ে পাহাড়ে উঠবে? যেদিন তোমার রুদ্ধদুয়ারে আঘাত করেছিলাম, জানতাম ঘরে আছো তুমি, সেদিন কারুর সঙ্গেই দেখা কর নি, বিশেষতঃ আমায় সঙ্গে, কারণ বড় ক্লান্ত ছিলে তুমি। ক্লান্ত মানুষের পক্ষে এ কি অন্যায়? যেমন করে মায়ের হাতে চুম্বন করি তেমনিভাবে তোমার হাতে একটি চুম্বন রেখে আসা উচিত ছিলো, কিন্তু তুমি কেমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক।

আরেকদিন যে সন্ধ্যায় এসেছিলাম, ভেবেছিলে আমি চাইবো যে আমার দিকে মন দাও, মনে হোল খুব কষ্ট করে চেষ্টা করছো তুমি। কোনো মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে এতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? না, না তোমার পানে চাইতামও না আমি, পাশের ঘরে চুপ করে বসে বই নিয়ে পড়তাম, চুপ করে বসে থাকতাম, তোমাকে এতটুকুও বিরক্ত করতাম না, শুধু দুয়ারের ভিতর দিয়ে আলোর একটী ঝলকানি এসে জানিয়ে দিত যে আমি কাছেই আছি। বৃথাই সেদিন এতো কথা বলতে চেষ্টা করেছিলে, জানি আমাকে ভালোবাসো। সেদিন দুয়ারের ঐদিকে দাঁড়িয়েছিলে তুমি, আমিও দাঁড়িয়েছিলাম—আরেক দিকে ; দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন ফেলবো, অব্যক্ত আনন্দে শুধু মৃদু হেসেছিলাম। সে সন্ধ্যায় তুমি আমার এত আপন হয়ে উঠেছিলে।

কিন্তু আজ তোমার এ কী ব্যবহার, পাগলের মতো এ কী ব্যবহার করলে? এসো না একটু ভেবেচিন্তে দেখা যাক। প্রার্থিত বস্তুর বিলম্বিত আবির্ভাব হয় যদি জীবনের দুঃখ দৈন্যের মূলে, তাহোলে স্বেচ্ছায় যেন তা আর অন্যের কাছে দুর্লভ না করে তুলি। এ কি তুমি অনুভব করতে পারো না? আমার জীবনেও সবই অসময়ে হতে আমি দেবো না। তুমি ভাবো আমার আরও আটাশ বৎসর আগে জন্মানো উচিত ছিল? তাতে কী লাভই বা হোত, এ সব বাজে কথার কোনোই

মূল্য নেই। তাহোলে ইতিমধ্যে বুড়ো হয়ে যেতাম আমি আর আমরা হয়তো পরস্পরের কাছে অপরিচিত থেকে যেতাম। খুব সম্ভব তাই হোত, কারণ তুমি হতে লম্বা চুলওয়ালা একজন যুবক, যে ভালোবাসারই খেয়ালে নির্ব্বিচারে প্রেম করে বেড়ায়। এ ধরণের কত যুবকই তো এখন আছে, তবে আর তোমাকে ভালোবেসেছি কেন ?

তোমার বুদ্ধির কি ভুল, তুমি কি পাগল, কেন তোমার এ মেয়েলীপনা! কেন আসল কথাটা বুঝতে চেষ্টা করলে না, কোনো কথা না বলে পালিয়ে গেলে কেন ? ঈশ্বর জানেন কোথায় আছো। দোহাই তোমার, কেন বোঝো না যে তোমার চেয়ে অত ছোট হয়ে আমার জন্মানো, তোমার ও আমার প্রথম দেখা, সেই দুয়ার খুলে যাওয়া, তুমি যা হয়েছ ও আমি যা আছি—এ সবের মধ্যেই একটা গভীরতর উদ্দেশ্য আছে। যখন তোমাকে দেখেছিলাম সে মুহূর্ত্তের কথা আমিও ভুলি নি। তোমার সেই অপূর্ব্ব হাসি, সে হাসি তো দেখতে পাও না তুমি, আয়নার সম্মুখে কি সে হাসি আসে ? কিন্তু তোমার সে হাসি যখন দেখলাম আমার অতীত জীবন যেন চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেলো। তোমার গুণের পরিপূরণ হিসাবে যশ আমার কাম্য নয়, কিন্তু তোমার সেই অপূর্ব্ব হাসি, সে হাসিতে আমি মুগ্ধ, প্রিয় আমার!

আজ তুমি চলে গেছ, আমারও ভয় হচ্ছে, তোমার এ চলে যাওয়া একেবারে নিছক পাগলামী। হয়তো বা আর কখনো তোমায় দেখবো না, আমার এ লেখা তুমি হয়ত চোখ মেলে পড়বেই না, কিংবা হয়ত চিঠিটা পৌছাবে দেরীতে, কী সাংঘাতিক! বুঝতে পারছি না কেন অসময় বলেছ, কিন্তু আমাকে ভয় দেখিয়েছ তুমি, তাই আমার মন আজ ভেঙ্গে পড়তে চায়, বুক নিরাশায় ভরে ওঠে। লিখেছ আমার হৃদয় তরুণ, কিন্তু বেদনার তীব্রতা কি বিন্দুমাত্রও কম ? না, না আমার চোখের জলে আর চিঠি সিক্ত করবো না, সে অশ্রু-কলঙ্কিত কাগজে কফির পেয়ালার দাগও পড়বে না। কিন্তু ইচ্ছে করছে তার হয়ে তোমায় খুঁজে বার কোরে তোমার বুকে বিদ্ধ হয়ে যাই। তারপর হোক আমাদের একসঙ্গে সমাধি—তুমি আর আমি, নিহত ও নিহন্তা। অকৃতজ্ঞ, অনুভূতিহীন এতো নিষ্ঠুর তুমি প্রিয়তম। হঠাৎ আমাকে লিখলে, নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করছ তুমি, অথচ লিখছ এ সব বড় অসময়। তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না, হয়তো বা তোমার সেই প্রিয় খাদ্য কেক দেরীতে পেয়েছো, তোমার সেই রেলগাড়ীর ভাগ্যহীনা প্রণয়িনীটাও এলো অসময়ে,

কিন্তু আমি নয়। আমার জীবনে অসময়ে হতে দিতে পারবো না। লেখার ক্ষমতা যদি থাকতো আমার, কিন্তু চিঠি লেখার শক্তি আমার একেবারেই নেই, লিখতে লিখতে মনে হয় নিজেকে ফ্যাশান-দুরস্ত সুন্দরী, চুলে নীল ফিতে জড়ানো। চুলে ফিতে জড়ানো সুন্দরীদের দেখতে পারি না একেবারেই। কেন তুমি আমাকে শান্ত বলেছ, ও আমার ভালো লাগে না। আমি গাঢ় অন্ধকার রহস্যের আধার। অন্যান্য সুন্দরী মেয়েদের থেকে আমার চিত্তের বাদীসুর একেবারে আলাদা। এ সবই তো তোমার জানা, এর চেয়ে অন্য রকম ভেবে আমাকে ভালোবাসতে পারো না। তবুও অসার নিষ্ঠুর বাক্যে আমাকে বিদ্ধ করবে, এ আমি চাই না, সইতে পারি না যে!

এও সত্য যে যখন গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াতে তুমি, আমি তখন ছোট্ট মেয়ে বেণী দুলিয়ে ও পুতুল খেলে কাটিয়েছি; লম্বা চুল ছিল তোমার, বোধ হয় খুব মোহন কিছু হয়ে উঠতে পারো নি, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাই ঠিক হয়েছিলো, আমি ভাবতে পারি না যে আমি তোমার সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা প্রণয়িনীর সমসাময়িকা বা তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। আমি চাই তোমার হৃদয়ে আমার অধিকার হোক সম্পূর্ণ ও শেষ, যেমন আমার হৃদয়ে তোমার অধিকার সম্পূর্ণ,—একমাত্র, প্রথম ও শেষ, ভাবতে হাসিও পায়, যেন আকাশে ওঠে দুটো সূর্য্য, প্রথম ও দ্বিতীয়!

তুমি চলে গেছ বলে ভয় হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে যে আরও আগে কেন আমার ভালোবাসা জানাই নি। ভেবেছিলে বলতে আমি ভয় পাই, হয়তো বা একটু পাই, কিন্তু তোমার সেই অপূর্ব্ব হাসিই আমাকে মুগ্ধ করেছে বেশী, ভাবতাম এখনও সময় যায় নি। ভাবতে পারোনি তুমি সে সন্ধ্যায় আমার সুখ ছিল স্বর্গীয়, দুঃখে হতবুদ্ধি হয়ে স্তব্ধ হইনি, আমার অন্তরে অন্তরে যে সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তারই জন্য শান্ত হয়ে বসেছিলাম আমি যেন চোখ মেলে স্বপ্ন দেখছিলাম, ক্ষমা করো, তোমার ভবিষ্যৎ চিত্রকল্পনার কথা কিছুই কানে যায় নি, তোমার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে আমারই অন্তরের সুরে মগ্ন হয়েছিলাম। তোমাব কি দারুণ অভাব সূক্ষ্ম বোধের! আমি শঙ্কিতা, সত্যই আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কোথায় চলে গেলে তুমি? তোমার চিঠিখানা আর একবার পড়েছি, তোমার ক্লান্তি, তোমার নৈরাশ্যের কথা, অতি করুণ। করুণাময় ঈশ্বর, যে তুমি এখন বেঁচে আছো। প্রিয়তম তুমি বেঁচে আছো, কিন্তু কোথায় আছো? এ চিঠি পাঠিয়ে দেবো ডাকঘরের কেয়ারে।

অনেক অনেক চিঠি লিখে নানা দিকে দিকে পাঠিয়ে দেবো, সে সব চিঠি নানা পথে ঘুরে ঘুরে তোমাকে খুঁজে বের করবে, তোমার পথ চেয়ে থাকবে। হয়তো বা কোনো সুদূর দেশে গিয়ে তোমার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, কোনো দিন বা হঠাৎ চিঠির প্রত্যাশায় ডাকঘরে গিয়ে ঢুকবে যেদিন অভাবনীয়রূপে তোমার হাতে গিয়ে পড়বে আমার চিঠি।

আমি সইতে পারি না যে যা কিছু আসে সবই অসময়ে ; প্রত্যেক দিন নূতন নূতন সহরে তোমার নামে চিঠি দেবো, একটা চিঠিতেই কি তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না? বল তুমি ফিরবে? আমাকে মনে করে যত তাড়াতাড়ি পারো ফিরে এসো। তোমাকে ছেড়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তুমিই আমাকে ভীরু করে তুলেছ। জানি আমার চিঠি তোমার হাতে পড়বেই, কিন্তু তবুও দুশ্চিন্তা হচ্ছে হয়তো কোনো কারণে সময় পার হয়ে যাবে। সময় পার হয়ে যাবে? বুঝতে পারি না, কেমন করেই বা দেরী হবে? আমার চিঠি পড়ে ফিরে আসার আগেই কি আমি মরে যাবো? আর কী হতে পারে? আর কী ঘটতে পারা সম্ভব?

এত দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে আর আমি লিখতে পারছি না। হয়তো বা তোমার কোনো অনিষ্ট হতে পারে, ঘটেছেই হয়তো। সবই আমার অজ্ঞাত, কোথায় আছ তুমি, কে তোমার সঙ্গে আছে, কোন পথেই বা যাত্রা সুরু করেছ? সমুদ্র বড় খল, মাটীতেও বিপদের অভাব নেই, ট্রেনগুলোর গতিও কী ভীষণ দ্রুত! তুমি একা, আমি তোমার পাশে নেই। আর যদি আমার এ চিঠি পেয়ে ফিরে আসার পথে কোন দুর্ঘটনা হয়। না, না এ চিন্তা অসহ্য, এ সব ভাবতেও পারি না।

এ মুহূর্ত্তে ফিরে এসো। এ চিঠি পেয়েই 'তার' করো, আমি তোমার পথ চেয়ে থাকবো, না, না আমিই তোমার কাছে ছুটে যাবো, তাই ভালো হবে আরও, তাতে আমার যন্ত্রণা একটু লাঘব হবে হয়তো বা, দয়া করো আমাকে, আমি কাঁদতে পারছি না, কিন্তু শোকে ও ভয়ে ভেঙে পড়েছি, তাতেও তোমার দয়া হবে না? এ আমি সইতে পারি না যে সবই হবে অসময়ে! এখনই ফিরে এসো, তার করো, যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এসো, এসো তোমার পথ চেয়ে থাকবো।

তোমার—ম।

শ্রীবীণাপাণি রায়

রাসলীলা

রাসের রূপকতা

গত বারের 'পরিচয়ে' ভাস কবির 'বালচরিতং' নাটকে বর্ণিত হল্লীশ-ক্রীড়ার উল্লেখ করিয়া, 'রাসলীলা কতটা ইতিহাস' তাহার আমরা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক রাস বালকবালিকার কামগন্ধহীন নির্দোষ নর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া গোপদারক ও গোপদারিকার চক্রাকারে নৃত্য—তাহাতে চুম্বন নাই, আলিঙ্গন নাই, কুচমর্দ্দন নাই, রমণ নাই। হল্লীশ ক্রমশঃ যখন জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন-ঘটিত আধ্যাত্মিক রূপকে পরিণত হইল, তখনই উহার মধ্যে ঐ সকল কামিক উপাদান ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিল এবং ক্রমশঃ কামদেবের অবাধ গতির ফলে রাসলীলা কামায়ন-প্রচুর হইয়া উঠিল।

রাস যদি প্রকৃতই আধ্যাত্মিক রূপক হয়, তবে প্রশ্ন উঠিবে ঐ আধ্যাত্মিক রূপকের মধ্যে কামিক উপাদানকে স্থান দেওয়া হইল কেন? মনস্তত্ত্বের দিক্ হইতে (from the psychological point of view) এই প্রশ্নের সমাধান কি?

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনকে আমরা এদেশে যোগ বলি।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

ঐ ব্রহ্ম-সংস্পর্শের ফলে অত্যন্ত সুখের যে অনুভূতি হয়—সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে (গীতা)—সে অনুভূতি 'মূখাস্বাদনবৎ' (নারদ) অকথ্য—অবর্ণ্য।

Man can in no wise speak or even stammer.—Angela of Foligno.

কারণ, ঐ যে ব্রহ্মানুভূতি, মানব-জীবনের উহাই চরম প্রহেলিকা—প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের ভাষায় 'Things seen which impose silence'। অথচ না বলিলেও নয়—স্বজনস্যাগ্রতো বিবৃতদ্বারতাম্ উপৈতি (ভবভূতি)। তাই মিষ্টিকেরা এ সম্পর্কে 'সন্ধ্যাভাষা'র প্রয়োগ করেন। 'সন্ধ্যাভাষা' অনেকটা হেঁয়ালী—'Where words suggest, they do not tell, they entice but do not describe'। সে জন্য ঐ ভাষায় প্রতীকের (Symbolsএর) প্রচুর প্রয়োগ এবং পদে পদে বিরোধাভাস।

The experience of the Mystic is inexpressible except in some side-long way, some hint or parallel which will stimulate the dormant intuition of the reader, and convey, as all poetic language does, something beyond its surface sense. Hence the enormous part which is played in all mystical writings by symbolism and imagery.

—Underhill's Mysticisn, p. 94.

সেই জন্য মিষ্টিক্‌দিগের ভাষা is 'not literal but suggestive', কারণ, Mystics employ the oblique methods of the artist। এ সম্বন্ধে Underhill বলিতেছেন ;—

Over and over again, however, he has tried to speak and the greater part of mystical literature is concerned with these attempts. Under a variety of images, by a deliberate exploitation of the musical and suggestive qualities of words—often, too, by the help of desparate paradoxes, those unfailing stimulants of man's intuitive power—he tries to tell others somewhat of that veritable country which "eye hath not seen."

এই প্রতীকের একটু আলোচনা করিতে চাই। দেখা যায়, মিষ্টিকেরা স্থানে স্থানে সংগ্রামের প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন—

যো সহস্‌সং সহস্‌সেন সঙ্গামে মানুষে জিনে (ধর্ম্মপদ)—সে স্থলে সমসের (sword) বর্ষা ভল্ল ধনুঃশর—প্রযুক্ত প্রতীকের রূপ ধারণ করিয়াছে।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

—মুণ্ডক-উপনিষদ্, ২।২।৪

পকড় সমসের সংগ্রামমেঁ পৈসিয়ে
দেহ পরযন্ত কর যুদ্ধ ভাই
কাট শির বৈরিয়া দাও জঁহকা তহাঁ
আয় দরবারমেঁ সীস নওয়াই।—কবীর

Suso uses the language of the tournament in his description of the mystic life. He would be a Squire - who would ride with the Eternal Wisdom in the lists.—Underhill p. 488

ধ্যানরসিক ব্লেকের বিশ্রুত কবিতা কেনা জানেন ?

Bring me my bow of burning gold !
Bring me my arrows of desire !
Bring me my spear ! O clouds unfold !

Bring me my chariot of fire.
I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand,
Till we have built Jerusalem,
In England's green and pleasant Land."

কিন্তু প্রায়ই দেখি মিষ্টিক্‌দিগের ভাষায় 'মদ্' ধাতুর একাধিপত্য। কারণ, মদ্য ও মদনই এক্ষেত্রে যোগ্য প্রতীক (Symbol)—মদ্যের অপেক্ষাও মদন। মিষ্টিক্‌দিগকে মদমাতালেরা মাতাল বলে বটে, কাম-সেবকেরা কামুক অপবাদ দেয় বটে—কিন্তু তারা এ রাজ্যের কি ধার ধারে?

The persons who imagine that the 'spiritual marriage' of St. Catherine or St. Teresa veils a perverted sexuality, or that the divine inebriation of the Sufis is the apotheosis of drunkenness, do but advertise their ignorance of the mechanism of the arts. —Underhill, p 95

সুফির কথা শুনুন—

অতীত যা' তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর
দিল পিয়ারা সাকী! গো আজ পেয়ালা ভ'রে ঘুচাও মোর।
... ...
এক লহমা সময় আছে, সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় ভোর।
—ওমর খৈয়াম (শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ)

ইহাই সুফির 'divine inebriation'—প্লেটো যাহাকে 'saving madness' বলিয়াছেন (Phaedrus)। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখিয়াছি—

What is the wine and the love of the Sufi mystic but the ecstasy of spiritual longing, symbolised by means of the liquor and the woman?

কেন মদ্যের প্রতীক ব্যবহৃত হয়, মিষ্টিক সুসো অনেক দিন পূর্ব্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

When the good and faithful servant enters into the joy of his Lord, he is inebriated, for he feels, in an ineffable degree, that which is felt by an inebriated man.

এ যুগে আমরা এ কথার সমর্থন পাইয়াছি।

Mr. Boyce Gibson has lately drawn a striking parallel between the

ferment and "interior uproar" of adolescence and the profound disturbances which mark man's entry into a conscious spiritual life.

ইহাই মিষ্টিকের 'a draft of the wine of Absolute Life', আমাদের সোমরস (অমৃতক্ষরণ)।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ইহাই তান্ত্রিকের পূর্ণাভিষেক। উহা মদে ডুবু ডুবু হওয়া নয়—অমৃত রসে স্নাপিত, অভিষিক্ত হওয়া।

"Hinder me not", says the Soul to the Senses in Mechthild of Magdeburg's vision, "I would drink for a space of the unmingled wine."

'There are also "Wine Shops" upon the way, where the weary pilgrim is cheered and refreshed by a draught of the Wine of Divine Love.'

ধ্যানরসিক ব্লেকও মদ্যপ্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন—

So Blake, the great English Mystic, speaks of the great "wine-press" of love, whence mankind, at the hands of the Mystics, has received in every age the Wine of Life.

আর একজন মিষ্টিকের বর্ণনা শুনুন—

Then came St. Francis to give the chalice of life to his brothers : and he gave it first to Brother John of Parma, who taking it drank it all in haste devoutly ; and straightway he became all-shining like the sun. And after him, St. Francis gave it to all the other brothers in order, and there were but few among them that took it with due reverence and devotion and drank it all. Those that took it devoutly and drank it all, became straightway shining like the sun ; ... . But the aforesaid Brother John was resplendent above all the rest, the which had more completely drunk the chalice of life, whereby he had the more deeply gazed into the abyss of the infinite Light Divine. —'Fioretti', cap xlviii.

বৈষ্ণব প্রেমিক ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের 'অধরামৃত' বলেন—'প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতি-লভ্য-ফেলালবঃ'। উহা ভক্তের জিহ্বাস্পৃহা উদ্দীপিত করে। (সখি ! তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্)।

নাগর ! শুন তোমার অধর চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ
বিচারিতে সব বিপরীত॥

রাধা শুধু কৃষ্ণের অধরসুধা পান করেন না—তিনি বিনিময়ে পান করান।

কৃষ্ণকে করায় সোমরস মধুপান
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।

তাই সখীরা বলেন—

সুধা পিও পিও বঁধু! প্রাণ ভরে
দেখ ঝর ঝর কত মধু ঝরে!

তাই শ্রীকৃষ্ণের সার্থক বিশেষণ 'রাধাধর সুধাপান-শালিনে বনমালিনে'।

কিন্তু যুগল মিলনের যে ভূমানন্দ, মদ্য তাহার ক্ষীণ প্রতীক মাত্র—How much better is Thy love than wine (Bible)। এই জন্য মিষ্টিকেরা অনেক স্থলেই মদনের প্রতীক ব্যবহার করেন।

আমরা জানি, শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে সর্ব্বদা এই পদটি শ্রুত হইত—

এই ত' পরাণ বঁধু পাইনু।
যার লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেনু।

এ প্রতীক খুব পুরাতন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন—

তদ্‌যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরম্ এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরম্। —বৃহ, ৪।৩।২১

যোগবাসিষ্ঠে ইহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ নবসঙ্গরসায়নম্॥

Old Testament-এর বিখ্যাত Song of Solomon-এও এ প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে,—

Let Him kiss me with the kisses of His mouth
For Thy love is better than wine.
... ...
Behold Thou art fair, my beloved, yea, pleasant
Also our bed is green.

সেণ্ট বার্ণার্ড, St. John of the Cross, St. Catherine প্রভৃতি খৃষ্টান মিষ্টিক্‌দিগের রচনায়ও এই প্রতীকের প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

'With them the Godhead becomes intensely personal, at times almost verging on the nature of a human beloved'। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার সার এই,—

O Love, I give myself to Thee,
Thine ever, only Thine to be.

The constant sustaining presence of a Divine Companion, became, by an extension of the original simile, 'Spiritual Marriage'. —Underhill

Thus for St. Bernard, throughout his deeply mystical sermons on the Song of Songs, the Divine Word (Logos) is the Bridegroom, the human soul is the Bride.

Prepare thyself as a bride to receive the Bridegroom.—Markos, the Gnostic.

St. John of the Cross-এর প্রার্থনা এই—

I will draw near to Thee in silence, and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride ; I will rejoice in nothing till I am in Thine arms.

I longed for thee ; and I still long for thee, and thou for Me. Therefore, when our two desires unite, Love shall be fulfilled.

—Mechthild of Magdeburg

Thus St. Catherine of Siena's 'mystic marriage' was prefaced by a Voice which ever said in answer to her prayers, "I will espouse thee to Myself in faith", and the vision in which that union was consummated was again initiated by a Voice saying, 'I will this day celebrate solemnly with thee the feast of the betrothal of thy Soul, and even as I promised I will espouse thee to Myself in faith."

Our work is the love of God. Our satisfaction lies in submission to the Divine embrace. Surrender is its secret : a personal surrender not only of finite to Infinite—but of bride to bridegroom, heart to Heart

—Ruysbroeck

ভক্তদাস কবিরও এই প্রেয়স-প্রেয়সীর প্রতীক প্রয়োগ করিতে কৃপণতা করেন নাই—

হিলমিল মঙ্গল গাও মেরী সজনী
ভঈ প্রভাত বীত গঈ রজনী ।······

নৈহর বাঁ* হমকো নহি ভাওয়ে
সাঁঈকী নগরী পরম অতি সুন্দর
　　জঁহ্ কোই জায় ন আওয়ে……।
…　　　　…
তেরে গাওনেকে দিন নগিচানী
　　সোহাগিন্ চেত করোরী ॥
ঝিলমিল জোত যঁহা নিশদিন ঝলকে
　　সুরত দে নিরত করোরী ॥
সাঁইকে সঙ্গ সাসুর আঈ
সঙ্গ না রহি, স্বাদ ন জানে
　　গয়ো জোবন সুপন্‌কে নাঈ।……
সাঁঈকে লগন কঠিন হৈ ভাঈ
যৈসে পপিহা প্যাসা বুন্দকা
　　পিয়া পিয়া রট লাঈ।

আরাধিকা মীরাবাঈও বলিয়াছেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল
　　দুসরা ন কোই
যাকো শির ময়ূর মুকুট
　　মেরো পতি সোই।

কিন্তু গৌড়ীয় মহাজন—জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলীতে এই প্রেয়স-প্রেয়সীর প্রতীক যেরূপ কমনীয় ও রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—অন্যত্র তাহা বিরল। কারণ, তাঁহাদের আস্বাদনে কৃষ্ণ-প্রেমের (Love of God-এর) মধুর রস 'স্বকীয়া'র 'ভাবে'র সীমা অতিক্রম করিয়া 'পরকীয়া'র 'মহাভাবে' উল্লসিত হইয়াছিল।

সত্য বটে, তাঁহাদের হস্তে অপ্রাকৃত প্রেম দৈহিক সংযোগ ও সম্ভোগের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণ 'মদনার্ব্বুদ-মদ-মর্দ্দন' এবং 'কেলিকলহৈক-ধুরন্ধর' (কেলিকলহ = Love Contests) হইয়াছেন। কিন্তু ইহা 'অপদেশ' মাত্র। তাই শ্রীধর স্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন—

---

* নৈহর বাঁ—পিত্রালয়, বাপের বাড়ী ; গওন্—শ্বশুর বাড়ী যাওয়া।

কিঞ্চ শৃঙ্গারকথা-অপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরা ইয়ং পঞ্চাধ্যায়ী ইতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।
ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি
প্রৌঢ় নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ। —চরিতামৃত

এই 'পরকীয়া'তত্ত্ব অধ্যাত্ম জগতের একটি নিগূঢ় রহস্য—যথাস্থানে আমরা তাহা বিবৃত করিব। খৃষ্টীয় Mysticরা এ তুঙ্গ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা এই প্রেয়স-প্রেয়সীর প্রতীক প্রয়োগের সার্থকতা ও আবশ্যকতা বেশ সুন্দর ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"Let Him kiss me with the kisses of His mouth"—Who is it who speaks these words? It is is the Bride. Who is the Bride? It is the Soul thirsting for God. ... ... If, then, mutual love is especially befitting to a bride and bridegroom, it is not unfitting that the name of Bride is given to a Soul which loves.

—St. Bernard, "Cantica Canticorum", Sermon vii.

Those for whom mysticism is, above all things, an intimate and personal relation, the satisfaction of a deep desire—will fall back upon the imagery of passion. ... ... The phrases of mutual love, wooing and combat, awe and delight, the fevers of desire, the ecstacy of surrender are drawn upon. We find images which indeed have once been sensuous; but which are there anointed and ordained to holy office, carried up, transmuted and endowed with a radiant purity, an intense and spiritual life.

—Underhill's Mysticism, pp. 153 & 164

পুনশ্চ It was natural and inevitable that the imagery of human love and marriage should have seemed to the Mystic, the best of all images of his own "fulfilment of life"; his soul's surrender, first to the call, finally to the embrace of Perfect Love. It lay ready to his hand, it was understood of all men: and moreover, it most certainly does offer, upon lower levels, a strangely exact paralell to the sequence of states in which man's spiritual consciousness unfolds itself, and which form the consummation of the mystic life. —Underhill pp. 162, 163

এ সকল কথাই ঠিক—কিন্তু এই মদন-প্রতীক প্রয়োগের একটা নিগূঢ়তর কারণ ও উপযোগিতা আছে। প্রাচীনেরা রমণ-সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বলিয়াছেন। কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রসিদ্ধ দার্শনিক উস্‌পেনসিকের মুখে শুনিয়াছি—

Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstacy. Nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies without doubt the chief cause of the terrible power of sex over human life. ... ... Love, 'sex', these are but a foretaste of mystical sensations. Mystical sensations are sensations of the same category as sensations of 'Love', only infinitely higher and more complex. *

Geraldine Coster-এর Yoga & Western Psychology গ্রন্থেও আমরা এই ধরণের কথা শুনিতে পাই। যোগানন্দ যে আত্যন্তিক সুখ (ecstacy —a state of radiant expansion and fulfilment) একথা বলিয়া তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, যদি তাহাই হয় তবে সাধারণতঃ এই সুখের আস্বাদনে মানুষ বীতরাগ কেন ? The question arises why so intensely pleasurable an activity is not more widely practised and achieved। মুখ্যতঃ ইহার কারণ এই যে, মানুষ রতিসুখে ঐ আনন্দের আস্বাদ পায়। অতএব যোগানন্দ না পাইলেও তাহার চলে।

The majority of mankind do experience its equivalent at the physical level—for the sexual creative act is admittedly the supreme and most desired gratification of the senses, and is an exact counterpart of the mental and creative processes, of which as the East maintains, it is merely the reflexion.

লেখিকা বলেন যে, নিসর্গের ইহা একটি মঙ্গল বিধান যে, রতিসুখ অচিরস্থায়ী। কারণ, তাহা না হইলে মানুষ কোন দিনই যোগানন্দের সন্ধান করিত না—

The fact that the physical satisfaction of sex-intercourse ... ... is transient is regarded in the East as an ordinance of nature, designed that man may be led to seek the more sustained delight of mental and spiritual creative effort.

* এ সম্পর্কে পরিচয়ের ১৩৪০ কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'যৌনাতীত' প্রবন্ধে আমি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। সেজন্য এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

এ প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করাইতে চাই যে, শুধু ধর্ম্মে নয় কাব্যেও সঙ্কল্পপূর্ব্বক রূপক-প্রয়োগ (deliberate spiritual allegory) অপরিজ্ঞাত নয়। বানিয়ানের Pilgrim's Progress, ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যান এবং প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক সকলেরই পরিচিত। স্পেনসারের Fairie Queen এবং টেনিসনের Idylls of the King'ও এ প্রণালীর প্রখ্যাত নিদর্শন। কিন্তু সতর্কতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে এজাতীয় কাব্য কেবল বিরক্তি নয় ন্যাকার উৎপাদন করে। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছি—

Deliberate spiritual allegories are a common form of literature. The notable examples that will at once occur are Bunnyan's Pilgrim's Progress and the Sanskrit drama called Probodha Chandrodoya (the Rise of the Moon of Wisdom). That this form of literary composition has not yet lost its appeal is well illustrated by the Bengali drama "Atma Darshana" which still holds the stage. The trouble with this kind of literature is that if not kept within proper limits, it is apt to bore, if not to bite the reader. Spenser's 'Fairie Queen', is a warning and an illustration—the allegory having been allowed to exceed the proper limits. But used in moderation —as in Tennyson's 'Idylls of the King' where, as the poet reminds us, 'the war of the senses with the soul' is symbolised—the veiled allegory is a distinct adornment.

কেহ কেহ মনে করেন যে, উল্লসিত কামের ক্রীড়াভূমি বিদ্যাসুন্দরও নাকি একটি আধ্যাত্মিক রূপক। আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র বসু 'Symbolism of Vidyasundar নাম দিয়া একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনু-রোধে আমি ঐ পুস্তিকার একটি মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছি। ঐ মুখবন্ধে প্রসঙ্গতঃ আমি এইরূপ বলিয়াছি :—

It is quite likely that when originally invented, the story of Vidya Sundara was a spiritual allegory, as our author insists. But in the course of time and as handled by poet after poet, was not the allegory overlaid by an excess of eroticism and all but forgotten ? The classical case is of course the symbolism of the sports and dalliances of Radha and Krishna—which is probably the greatest spiritual allegory of the world but which in later times and as handled by erotic writers—even Vidyapati and Krishna-das Kaviraj are not free from this taint—becomes a mass of undiluted **sexuality.**

রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা যে জগতের প্রধানতম রূপক এবিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু কালে ঐ রূপকের ভাব নিষ্প্রভ হইলে উহার মধ্যে প্রচুর কামায়ন প্রবেশ করিয়াছিল। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চমৎকারচন্দ্রিকা এবং প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণোক্ত রাসের বিবরণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

The mystic sometimes forgets to explain that his utterance is but symbolical—a desparate attempt to translate the truth of that world into the beauty of this. —Underhill

যখন এইরূপ হয়, তখন প্রেমোৎসব কামক্রীড়ার আকার ধারণ করে। রাসের রূপকতায়ও ঐরূপ হইয়াছে।

"In this carnival of love, the allegory is sometimes strained to the breaking point."

কবি বিদ্যাপতি যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া রাধা সম্বন্ধে বলেন 'বালা রমণী রমণে নাহি সুখ', তখন উহার মধ্যে অণুবীক্ষণের সাহায্যেও আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করা দুর্ঘট হয়। এরূপ উদাহরণ আরও অনেক উদ্ধৃত করিতে পারা যায়।

যাহা হউক, এ বিষয়ের আর বিস্তার করিতে চাই না। এ প্রবন্ধে আমার যাহা মুখ্য বক্তব্য—অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে যে অত্যন্ত সুখানুভূতি, তাহা অকথ্য-অবর্ণ্য এবং সেই জন্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল মিষ্টিকই ঐ অনুভূতির ইঙ্গিত করিতে হেঁয়ালী সন্ধ্যা ভাষার ও প্রচুর প্রতীকের প্রয়োগ করেন; এ সম্পর্কে মদ্য ও মদন, বিশেষতঃ মদন, সুপরিচিত প্রতীক (Symbol) এবং সুফি, খৃষ্টান, মিষ্টিক ও বৈষ্ণব প্রেমিক অবাধে ঐ প্রতীকের ব্যবহার করিয়াছেন—বোধ হয় সে কথা প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছি। 'রাসের রূপকতা' সম্পর্কে অন্যান্য কথা আগামী বারে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চাকরীর প্রথম চার বছর আমার কেটেছিল মফস্বলে, রাজধানীর চঞ্চল জীবন হতে বহু দূরে। আহমদাবাদকে তখনকার দিনেও অবশ্য ঠিক দেহাত বলা চলত না। পঞ্চাশ ষাটটা কাপড়ের কল যেখানে সারাক্ষণ আকাশে ধোঁয়া ছাড়ছে, সে জায়গাকে কতকটা আধুনিক বলে কবুল করতেই হয়। তবে এই কলগুলো বাদ দিলে বাকী শহরটাকে মোটামুটি কালিদাসের উজ্জয়িনীর সঙ্গে তুলনা করাও চলত। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, মানুষ-জন, কারও গায়ে তখনও একালের ছোঁয়াচ লাগে নেই। অতগুলো মিল চলছে, অথচ একটা নোঙ্গরা ঘিঞ্জী মজুরের বস্তী কোথাও নেই। মজুরেরা সব চারি পাশের গ্রামের বাসিন্দা। সারাদিন মিলে খেটে দিনান্তে আপন আপন গ্রামে ফিরে যায়। অধিকাংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শান্ত-শিষ্ট সাধারণ চাষীর ছেলেদের মত। মিলের মালিকও তখনকার দিনে যাঁরা ছিলেন, চিনুভাই, লালভাই, মনসুখভাই, নগরশেঠ মণিভাই, এঁদের চেহারা, কথাবার্ত্তা, চালচলন, সব ছিল একেবারে সেই সেকেলে শ্রেষ্ঠীদের মতন। পারসী শেঠেদের পর্য্যন্ত এতটুকু ভুঁইফোড় ধরণ ধারণ ছিল না। আমার প্রতিবেশী নওরোজী শেঠকে এখনও মনে পড়ে। তাঁর এমন একটা সহজ সুন্দর বনেদী ভাব ছিল, যে প্রথম দর্শনেই আমরা মোহিত হয়ে গেছলাম। বোম্বাইয়ের পারসীরা গুজরাতবাসী স্বজাতিদিকে অবজ্ঞাভরে বলতেন, "Bunnias" (বেনে)। অর্থাৎ হিন্দু-ভাবাপন্ন। তাঁরা নিজেরা ছিলেন প্রায় সাহেব কি না!

আহমদাবাদ শহরই যখন ছিল এই রকম, তখন মফস্বলের অবস্থা সহজেই আপনারা আন্দাজ করতে পারেন। আমার এলাকাতে ছিল দুটী শহর,—ধোলকা ও সাণন্দ। দুই স্থানেই মিউনিসিপালিটী ছিল। কিন্তু যেমন নগর, তার তেমনই নগর পঞ্চায়ৎ! সত্যি কাজকর্ম্ম সবটা আমার দপ্তর থেকেই হত। তার পরে বিজাপুর—সে ত অতীতের কঙ্কাল মাত্র, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া ছিল না। সদরের মিউনিসিপালিটীই ছিল আধা-সরকারী, আমার দেহাতী ব্যাপারগুলোর ত কথাই নেই! মেম্বর মহাশয়দিকে ডেকেডুকে পান-আতর, এক পেয়ালা করে চা, দিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন।

এই রকমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ত আলিবাগে এসে নামলাম! অতি অল্পকালের মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারলাম যে এখানকার আবহাওয়া সম্পূর্ণ আলাদা। আমার এলাকা আবার ছিল উত্তর প্রান্ত, একেবারে বোম্বাই বন্দরের আশেপাশে। মানুষের মেজাজও তাই ছিল বেশ গরম, শহুরে জনোচিত। সবাই ছিলেন আপন হক্, আপন মান-ইজ্জৎ, সম্বন্ধে অতি-মাত্রায় সজাগ। সেকেলে শিষ্টতার বালাই বড় একটা ছিল না।

আহমদাবাদের এক সুদূর দেহাতে একবার মাত্র এক শহরবাসীর বেয়াদবী আমাকে বরদাস্ত করতে হয়েছিল। বিজাপুরে ত কখন এ রকম হয়ই নেই! গল্পটা বলি। নিত্য প্রথা মত সকালে এক গ্রামের ফটকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। দেখি কেউ কোথাও নেই, চারিদিক নিঝুম। গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। এক বাড়ীর দাওয়ার উপর, দেখি, একটী সভ্যভব্য ছোকরা বসে রয়েছে, গায়ে ফরসা জামা, মাথায় টিকি নেই, বেশ সুন্দর তেড়ী কাটা। ঘোড়ার ওপর হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "গ্রামের লোকজন সব গেল কোথায় হে!" সে কথার জবাবই দিলে না, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেল। আমি ভাবলাম, "হল কি!" একটু ফাঁপরে পড়লাম। যা হোক, মিনিট দুই চার ঘোরাঘুরি করতে করতেই পাটিল ও চার পাঁচ জন লোক এসে পড়ল। গ্রাম-সুদ্ধ সবাই কোন এক মন্দিরে গেছল উৎসব উপলক্ষে। চাউরীতে বসে আপন কাজ কর্ম্ম করতে আরম্ভ করলাম। তখন সব রাইয়ৎ জমা হয়েছে। ভিড়ের পেছনে, দেখলাম, সেই তেড়ী কাটা ছোকরাটী দাঁড়িয়ে দিব্যি বিড়ি খাচ্ছে! পাটিলও বোধ হয়, দেখতে পেলে, কারণ উঠে গিয়ে তাকে কি বললে। লোকটা একটু চেঁচিয়েই জবাব দিলে, শুনলাম, "যাও, যাও, বোম্বাই শহরে থাকি, অনেক সাহেব দেখেছি।" বেচারা সাহেবই দেখেছে, কিন্তু বোধ হয় ভুলে গেছল গুজরাতের পাটিল কি জিনিস। বেশী ক্ষণ তাকে দাঁড়িয়ে বিড়ি খেতে হল না। পাটিল তার কানটী ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কোথায় বন্ধ করে রেখে এল। এসে আমাকে সলজ্জভাবে বললে "ছোঁড়াগুলো শহরে গেলে মাথার ঠিক থাকে না, সাহেব। বড়ই লজ্জার কথা!"

এই ঘটনার পর থেকে আমি একটু সাবধানেই থাকতাম। কাউকে বেয়াদবী করার সুবিধা বড় একটা দিতাম না। তবে ছিলাম ছেলেমানুষ, মাঝে মাঝে ধৈর্য্যচ্যুতি হত বই কি! আবার, একবার ধৈর্য্য হারালে ব্যাপার শুধু কথায় শেষ

হত না। তবে সে সব ঘটনাগুলো মনে হলে নিজেই এখন লজ্জা পাই, আপনাদিকে নাই বা বললাম! একটা কথা ভাববার মত আছে, এই জাতীয় অশিষ্ট উদ্ধত লোকগুলো কি সাধারণ চাষীদের চেয়ে বেশী মানী বা বেশী স্বাধীনচেতা? আমার ত মনে হয় না! পাটীদার বা লিঙ্গায়ৎ বা মারাঠা পাটিলেরা যেমন ভদ্র, তেমনই মানী পুরুষ। আমাদের কর্ত্তারা আমাদিকে বারবার সামাল করে দিতেন যে আমরা যেন কোনও রকমে এদের ইজ্জতের হানি না করি। আর একটা কথা মনে হয়। এই সব মানুষগুলো, বিশেষ করে যারা ভদ্র-জাতীয়, তারা স্বদেশী হাকীমের সামনে গরম, ও সাহেবের সামনে নরম, হয় কেন! বোধ হয় শেয়াল মেরে হাত পাকাচ্ছে, এখনও বাঘের সামনা সামনি হবার সাহস নেই। এ সব অবশ্য তিরিশ চল্লিশ বছর আগের কথা।

তবে একটা ঘটনার বিষয় আপনাদের বলি। বেশী দিনের কথা নয়। আমি তখন জেলার জজ। মহাত্মাজীর অসহযোগের হাওয়া খুব জোরে বইছে। চারিদিকে সর্ব্বত্র সাদা খদ্দরের টুপীর ছড়াছড়ি, যেন পচা ডোবায় শালুক ফুল ফুটে রয়েছে। আমার জেলায় এক তরুণ মুনসেফ ছিলেন। তিনি এই খদ্দর আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। শুধু যে মনে মনে বিরোধী, তা নয়। যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে নিজের মত জাহির করতেন। হয়ত বিনা কারণে পাঁচজনের মনে কষ্ট দিতেন। এর ফলে উকীল বাবুরা তাঁর উপর ভয়ানক চটে গেলেন, তাঁকে জব্দ করবেন বলে কোমর বাঁধলেন। আমি এত কথা কিছু জানতাম না। হঠাৎ রাও সাহেবের এক রিপোর্ট পেলাম যে অমুক, অমুক, দুজন উকীল তাঁর এজলাসে সাদা গান্ধী টুপী পরে আসতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর হুকুম মানছেন না। এই দুজনের মধ্যে একজন, R, সেখানকার প্রধান উকীল। আমি লিখে পাঠালাম, আপনারা এই নিয়ে একটা গোলোযোগ পাকাবেন না, মিষ্টার R-কে বলবেন, আমি হপ্তাখানেক বাদে আসছি। এখন, ব্যাপারটা এই যে আমাদের মফস্বলে উকীলদের কোন একটা বাঁধাধরা পোষাক ত ছিল না! তবে সাধারণ গোল টুপী পরে ও দেশে কেউ কোন formal ব্যাপারে যেত না—আদালতাদি সরকারী ব্যাপারেও নয়, বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারেও নয়। যাওয়া রেওয়াজ ছিল না। তবে আমার নিজের কোর্টে একটী ছোকরা উকীল গান্ধী-টুপী ও খদ্দরের ধুতি-পিরান পরে আসতে আরম্ভ করেছিলেন বটে! পরে শুনেছিলাম যে তাঁর সঙ্গে সরকারী ডিপার্টমেণ্ট

বিশেষের লেন-দেন ছিল। সে যাই হোক, আমার নিজের কোন খদ্দর-বিভীষিকা ছিল না ; কিন্তু মুনসেফ বাবুটীকে কোন রকমে উদ্ধার করতে হবে ত ! গেলাম সেই শহরে। R মহাশয়কে ডেকে অনেক বোঝালাম। বললাম, আপনার ইচ্ছা হয়ে থাকে ত দশ গজ খদ্দরের পাগড়ী বাঁধুন না, আদালতে টুপীটা পরা রেওয়াজ নয়, নাই বা পরলেন ! উত্তরে তিনি বড় বড় কথা স্বরু করলেন—অমুক এই সাজে কাউন্সিলে যান, অমুক লাটকুঠীতে যান, ইত্যাদি। আমি জানালাম যে আমার নিজের কোন আপত্তি নেই, তবে মুনসেফ সাহেব ত মনে করতে পারেন যে আপনারা তাঁর এজলাসের অবমাননা করছেন ! যাক, বচসা অনেক হল, কিন্তু সেদিন কিছু নিষ্পত্তি হল না।

ঐ কয় দিন আমাদের কলেক্টরের ক্যাম্পও পড়েছিল এই শহরে। কলেক্টর ছিলেন B, একজন প্রবীণ ইংরেজ সিবিলিয়ান। সন্ধ্যা বেলায় তাঁর কাছে গল্পটা করাতে তিনি হেসে বললেন, "তুমি একদিন সবুর কর। কাল ঐ R উকীল আমার এজলাসে এক মোকদ্দমা করতে আসছে। দেখা যাক না, কি পরে আসে !" পরদিন বিকেলে B-র কাছে শুনলাম যে উকীল মহাশয় দিব্যি পাগড়ী বেঁধে তাঁর কাছারীতে এসেছিলেন। আর যাবে কোথা ! সন্ধ্যাবেলাই R-কে আমার ক্যাম্পে ডেকে গোপনে অনেকগুলো অপ্রিয় সত্য কথা শোনালাম। মোটামুটি বোঝালাম যে মাথার ভেতরে কি আছে সেইটাই আসল কথা, মাথার উপরে কি রকম ছাউনি ঢাকা থাকে সেটার বেশী মূল্য নেই। ভদ্রলোক একটু লজ্জিত হলেন, কিন্তু আমাকে কথা দিলেন যে এই টুপী পরা সম্বন্ধে আর জিদ করবেন না। ভালই হল, কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই সব ঘটনার moral যে বড় ভয়ানক !

ভূমিকা ত অনেক হল, এইবার আবার কোলাবা জেলার কথা ধরি। আমার এলাকায়, যত দূর মনে আছে, তিনটী মিউনিসিপালিটী ছিল—উরণ, পেণ ও পনবেল। উরণ সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না, কারণ সেখানকার একজন, বিংশ শতকের ভাষায়, ডিক্টেটার ছিলেন। এই ডিক্টেটারের কথা আগামী বারে বলব। তিনি একজন স্বনামধন্য মানুষের মতন মানুষ ছিলেন। উরণের সবাই, ইংরেজ, পারসী, হিন্দু, মুসলমান তাঁর কথায় উঠত, বসত। আমার মুস্কিল হল পেণ, পনবেল নিয়ে। দু জায়গারই লোক সবজান্তা শহুরে প্রকৃতির, অর্থাৎ খুব

independent, স্বাধীন-চেতা। অথচ গলদও অনেক—এত গলদ, যে দুই এক বছরে কিছু উন্নতি না দেখাতে পারলে, কমিশনার সাহেব মিউনিসিপালিটী তুলে দেবেন বলে শাসিয়ে রেখেছেন। পেণ শহরে ওয়ার্ড ভাগ ছিল না। সারা শহরের ভোটারদের মতানুসারে জনা আষ্টেক মেম্বর নির্ব্বাচিত হত। ভোটার বেশীর ভাগ ছিলেন ব্রাহ্মণ। কাজেই আট জনের মধ্যে অন্ততঃ ছয় জন মেম্বর হতেন ব্রাহ্মণ। আর বাকী দুজন তাঁদেরই মুখাপেক্ষী অন্য জাতির লোক। এতে অত্যাচার অবিচারও হত নানা রকমের। কারণ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা ইতরজাতির ইষ্টানিষ্টের বড় বেশী খবর রাখেন না। আর একটা কথা, মিউনিসিপালিটীর মূলে ত স্থানিক স্বরাজের তত্ত্ব নিহিত! সত্যিকারের স্বরাজ দুর্লভ হলেও স্বরাজ নিয়ে খেলাটা খুবই সুলভ তা, সে খেলা খেলার অধিকার সকলেরই সমান। শুধু ব্রাহ্মণই বা খেলবে কেন, শুধু বড় লোকই বা খেলবে কেন? কাজেই আমি মহা উৎসাহে লেগে গেলাম পেণ মিউনিসিপালিটীর শুধরানোর কাজে। প্রথমটা একটু ঘেবড়ে ছিলাম, কারণ ব্রাহ্মণেরা প্রতিপত্তিশালী লোক, তাঁরা এ ব্যাপারে বেজায় নারাজ হবেন! কিন্তু ও বয়সে ত একটা কর্ত্তব্য করার মোহ থাকে! ভেবে চিন্তে পেণ শহরটাকে গোটাচারেক ওয়ার্ডে ভাগ করালাম। তার দুটো ওয়ার্ডে ব্রাহ্মণ ভোটার বেশী। অতএব চারজন ব্রাহ্মণ মেম্বর ঢুকবেই। বাকী দুটোর একটাতে ব্রাহ্মণেরা রফা করে একজন মেম্বর পেলেও পেতে পারেন। কিন্তু চতুর্থটা, বাজার মহল্লা, একেবারে অন্যান্য জাতের হাতে। আমার ত মনে হল এটা, বেশ সুব্যবস্থা! আমার উপরওয়ালা কর্ত্তাদেরও এই ভাবে ওয়ার্ড বিভাগ বেশ পছন্দ হয়েছিল। অথচ ব্রাহ্মণেরা ভীষণ আন্দোলন জুড়ে দিলেন। খবরের কাগজে লেখালেখি করতে লাগলেন। আমি চেষ্টা চরিত্র করে লোকমান্য তিলকের কেশরীর মুখ কোনও রকমে বন্ধ করে রেখেছিলাম। কিন্তু অন্য অনেক কাগজ খুব গালাগালি করলে—অবশ্য আমাকে নাম ধরে নয়, গভর্ণমেণ্টকে। যাই হোক ইলেকশন হয়ে গেল। মেম্বার হলেন চারজন ব্রাহ্মণ ও চারজন ব্রাহ্মণেতর জাতি। তার পর পেণে ও আলিবাগে দুচারটে সভা-সমিতি করে ব্রাহ্মণ মেম্বরেরা একজোট হয়ে ইস্তফা দিলেন। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও তাঁদের মত ফেরাতে পারলাম না, অগত্যা তাঁদের স্থানে চারজন নূতন মেম্বর সরকার তরফ থেকে নিযুক্ত করলাম। চারজনই ব্রাহ্মণ, তবে একজন রাও সাহেব, আর তিনজন পেনশনার! অবশ্য এ সমস্তই,

ইংরেজীতে যাকে বলে, চায়ের বাটিতে তুফান। কারণ শহরের সত্যি কাজকর্ম্ম আমার আপিস থেকেই বরাবর হচ্ছিল, এখনও হতে থাকল।

এইবার পনবেল-এর কথা। সেখানকার গলদটা ছিল একটু অন্য রকমের। ব্রাহ্মণ বা কোনও জাতিবিশেষের আধিপত্য সেখানে ছিল না। তবে একটা Triumvirate সকলকে শাসিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল। তার একজন ছিল পনবেল-এর পুলিস দারোগা, অন্যজন মিউনিসিপালিটীর সহকারী অধ্যক্ষ। আর তৃতীয় জন এক মাড়োয়ারী মহাজন। কলেকটর সাহেব আমাকে বলে দিয়েছিলেন যে এই ত্রিমূর্ত্তির প্রভাব নষ্ট করতেই হবে। প্রথম দারোগাকে বদলী করালাম। তার পর মাড়োয়ারীটীকে ডেকে বল্লাম, আমি খবর পেয়েছি যে আপনি ইনকম ট্যাক্স কম করাবার জন্য ঝুটো হিসেবের বই দাখিল করেছেন, বোধ হয় ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাবার দরকার হবে। তার বন্ধু দারোগাবাবু বদলী হয়ে যাওয়াতে সে একটু অসহায় বোধ করছিল। অতি সহজেই ভয় পেয়ে হাতে পায়ে ধরতে লাগল। বেশী মুস্কিল হল তৃতীয় ব্যক্তি, ভাইস-প্রেসিডেন্টকে নিয়ে। তিনি ছিলেন উকীল, রোজগারও বেশ করতেন, আমাকে ছেলে মানুষ জেনে আমলই দিলেন না। স্বয়ং কলেকটর তাঁকে ডেকে বোঝালেন পড়ালেন, কিন্তু তাঁর সেই একই জবাব "আপনারাই বিশ্বাস করে আমায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট করেছেন; এখন বলেন ত ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর আমি থাকব না।" সামনেই মেম্বর নির্ব্বাচনের পালা, নূতন দারোগার মারফৎ আমি খবর পেয়েছিলাম যে এই ভদ্রলোক মিউনিসিপালিটীতে সব নিজের দলের লোক ঢোকানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তখন আমি বড় কর্ত্তাদের মতামত নিয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলাম। পনবেল শহরে দশ দিন বসে এক নূতন Rate-payer's Association-এর পত্তন করলাম, ও শহরের তিন চার জায়গায় বক্তৃতা করে বোঝালাম যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের যথার্থ অর্থ কি। এই শহরে নানা রকমের মুসলমান সওদাগর ও দোকানদার ছিল। তাদের মধ্য থেকে চারজন নির্ব্বাচন-প্রার্থী দাঁড় করানো গেল। এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ মাত্র একজন মুসলমান নির্ব্বাচিত মেম্বর থাকত। এই ব্যাপার নিয়ে V.P. মহাশয় একটু সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতেও চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাজে কিছু হল না। ইলেকশনে তিনজন মুসলমান মেম্বর নির্ব্বাচিত হলেন। V.P.-র দলের মাত্র দুজন ঢুকলেন। তিনি স্বয়ং,ও আর একজন—তাঁর এক মোসাহেব। V.P -র নিজের

ওয়ার্ডে তাঁর যে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছিল, তাকে ইলেকশনের ঠিক আগের দিন আমি সরিয়ে নেওয়াতে ভদ্রলোক আমার উপর বড় খুশী হয়েছিলেন। নূতন মিউনিসিপালিটী বসলে পর তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হতে বেশী সময় লাগল না। কিছুদিন পরেই আমি বদলী হয়ে গেলাম থানা জেলায়, পনবেল হতে বেশী দূরে নয়। সেখান থেকে শুনতাম যে Triumvirate-এর দৌরাত্ম্য শেষ হয়ে পনবেলের লোক বেশ শান্তিতে আছে। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প আছে, এইখানেই বলি। আমার একটুখানি সমাজ সংস্কারের বাতিক বরাবরই ছিল। তাই করলাম কি, অস্পৃশ্য-জাতির একজন পেনশন-প্রাপ্ত সুবেদারকে পনবেল মিউনিসিপালিটীর মেম্বর করলাম সরকার তরফ থেকে। তখনকার দিনে ও অঞ্চলে এরকম ব্যাপার অভূতপূর্ব্ব। সুবেদার সাহেব খুব উৎসাহ সহ রাজী হলেন, তলোয়ারের মুঠ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সামরিক প্রথায় কৃতজ্ঞতা জানালেন। আমার সেরেস্তাদার কিন্তু আমাকে আগের থেকে সাবধান করে দিয়েছিল যে কাজটা ভাল হবে না, ব্রাহ্মণেরা ভয়ঙ্কর চটে যাবেন। ভেতরে ভেতরে কি হল জানি না, কিন্তু দিন দুই তিন বাদে সুবেদার গঙ্গাজী নায়ক স্বয়ং এসে অনুনয় বিনয় করে বললেন—আমায় ক্ষমা করবেন হুজুর, আমি মেম্বর হয়ে সভায় বসলে নানা গোলযোগ উঠবে। আমি অনেক বক্তৃতা করলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের মন টলাতে পারলাম না। সে যাত্রা সমাজ সংস্কার মূলতুবী রইল। আজ সেই গঙ্গা নায়কের স্বজাতি ডাক্তার সাহেব কি গণ্ডগোলটাই না বাধিয়েছেন!

কুলাবা জেলায় আর একটা সম্পূর্ণ নূতন রকম কাজের সংস্পর্শে এসেছিলাম। আগেই বলেছি যে এই জেলার সর্ব্বত্র বন জঙ্গল। এই সব খাস জঙ্গল ছিল জঙ্গল-বিভাগের সাহেবের তাঁবে। মুখ্যতঃ আমাদের কিছু সম্পর্ক ছিল না এগুলোর সঙ্গে। কিন্তু আমার গ্রামবাসীদের সরকারী খাস জঙ্গলেও নানা রকমের হক্ ছিল। তার মধ্যে একটা প্রধান হক, যাকে বলে, "টাহাল" কাটা। এই হকের জোরে সরকারী গ্রামের চাষীরা মাঘ ফাল্গুনে বনের সীমার মধ্যে ঢুকে নানা গাছ থেকে ছোট ছোট ডালপালা কেটে এনে সেগুলোকে আপন আপন ধানক্ষেতে বিছিয়ে দিত। তার পর ক্ষেতের ওপরেই সেই ডালপালা গুলো যখন রোদে পুড়ে বেশ শুকিয়ে আসত, তখন তারা তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। এই আগুনে ক্ষেতের মধ্যের ঘাস আগাছা, ধানের খুঁটো, সব জ্বলে পুড়ে যেত। আর, একটা পরিষ্কার

ছাইএর ঢাকা পড়ত মাটির উপরে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই চাষীরা লাঙ্গল দিয়ে সেই ছাই মাটির মধ্যে চষে মিশিয়ে দিত। এই হল তাদের ক্ষেতে সার দেওয়া। এই প্রক্রিয়াকে ওদেশে রাব জ্বালানো বা ক্ষেত ভাজা বলে। কাজেই জঙ্গলে ঢুকতে না পেলে তাদের ক্ষেতে সার দেওয়া বন্ধ হয়, এটা ত বোঝাই যাচ্ছে। এই টাহাল কাটার অধিকারের কোন ব্যতিক্রম ঘটলে চাষীরা ক্ষেপে আগুন হয়ে যেত। আগের বৎসর এই নিয়ে নিকটের এক জেলায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়ে দু-একজন জঙ্গলের সেপাই মারা পড়েছিল। জঙ্গল বিভাগের তরফে নালিশ এই ছিল যে ক্ষেত ভাজার জন্য বড় বড় মোটা মোটা ডাল কাটার ত কোনও প্রয়োজন নেই, দরকার মত সরু সরু ডাল ওরা কেটে ছেঁটে নিলেই হয়, কিন্তু তা ত ওরা করে না! অনর্থক বড় বড় ডাল কাটে, কখন কখন এক একটা সারা গাছ কেটে ফেলে জঙ্গলের স্থায়ী লোকসান করছে। জঙ্গল বিভাগের একজন সাহেব, Mr. T, আমার এলাকায় এসে আমাকে এই সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম কথাটা সত্য। অধিকাংশ ইনামদারী গ্রামের জঙ্গল এই করে ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানকার লোকেদের এখন বাধ্য হয়ে পয়সা খরচ করে অন্য সারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আমি T-কে বললাম যে এই সমস্ত গ্রামের চাষীরা ছোট ছেলেদের মতন, এরা ত বোঝে না কিসে নিজের মঙ্গল অমঙ্গল হয়। এদের শুধু সাজা দিয়েই বা কি হবে! চল, কয়েকটা গ্রামে তুমি আর আমি গিয়ে সভা করে এদিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। তারপর তুমি নিজের কাজে চলে যেও, আমি ঘুরতে ঘুরতে সব গ্রামেই এই বিষয়ে দুচার কথা বলব। তিন চারটে বড় বড় গ্রামে আমরা সভা করলাম। তার পর পাহাড় চড়ে জঙ্গলে গিয়ে গ্রামের লোকেদের হাতে কলমে আমরা বুঝিয়ে দিলাম, কি ভাবে টাহাল কাটা উচিত। এখানে সেখানে দু-পাঁচটা লোককে ধরে কিছু কিছু জরিমানাও করলাম। এই রকম মিঠে কড়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তখনকার মত গোলযোগটা কেটে গেল। একটা কথা বলা দরকার। সব গাছ থেকে কিছু রাইয়ৎরা টাহাল কাটতে পেত না। টাহাল কাটার জন্য কতকগুলো গাছ নির্দ্দিষ্ট ছিল। শাল সেগুনের মত দামী গাছ গ্রামের লোকের ছোঁবার হুকুম ছিল না। তবে তারা ছুঁতে চাইতও না। জঙ্গল আইনটা যে খারাপ, তা কেউ বলে না। আসল কথা সব জায়গায় যা, জঙ্গলেও তাই। সেপাইগুলো জুলুম করলেই লোকে ক্ষেপে উঠত, নইলে কোন গোলই হত না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

আধুনিক বাংলা কাব্য

সাহিত্যের নানাবিভাগেই আমি লেখনী চালিয়েছি তার কারণ সে সব দিকে আমার মনের সহজ প্রবণতা ছিল। কেবল সাহিত্য যাচাইয়ের কাজে আমার মন ভেড়েনি। সাহিত্য বিচারে একেবারে হাত দিইনি তা বলতে পারিনে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তার বিষয়গুলি ছিল দূরবর্ত্তী। তাদের সম্বন্ধে অনেকখানি দায়িত্ব কাল নিয়েছে স্বয়ং,তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়েছে সুদীর্ঘ কালের সম্মিলিত সম্মতিতে। বহু যুগের অভিজ্ঞান-পত্রে আমিও দিয়েছি একটা স্বাক্ষর।

উপস্থিত কালের বিচারে সাহিত্য-রচনা মাত্রই কখনো সমাদর কখনো অনাদর পেয়েছে। কিন্তু বারম্বার দেখা যায় উলটিয়ে গেছে বিচারের রায়। তার প্রধান কারণ বর্ত্তমান কালে যথোচিত সংখ্যক জুরি মেলে না। অতিদীর্ঘ কাল লাগে জুরির দল জোটাতে। ব্যক্তিগত খেয়াল পেরিয়ে বিচার বিশুদ্ধ করতে বহুকালের বহু লোকের মধ্যে দিয়ে খেয়ালকে ফিকে করে আনতে হয়। বর্ত্তমান কালের মেজাজ অনেক আকস্মিক উত্তেজনার দ্বারা বিশেষ মূর্ত্তি ধরে প্রবল হয়ে ওঠে। সেই উত্তেজনা সকল সময়ে কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা অর্থ নৈতিক আবেগ থেকে ঘটে না, অনেক সময়ে বিদেশী সাহিত্যের আকস্মিক প্রভাব বা অনুকরণ তার মূলে থাকে। তার মধ্যে স্থায়িত্বের লক্ষণ আছে কি না জীবিতকালে তার প্রমাণের অবসর পাওয়া যায় না। এই রকম ক্ষণকালের সীমানায় সংশয়িত অবস্থার মধ্যে আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশের কাজ আমার কাছে রুচিকর হয় না।

আমাকে বলা যেতে পারে ভীরু। ভীরুতা আমার আছে। আমার ভয় পাছে ভুল করি। যেটা চোখে পড়েছে তার আড়ালে হয়তো অনেকখানি চোখে পড়েনি। যাকে অঙ্কুরে দেখছি তাকে হয়তো পরিণত রূপের আদর্শে বিচার করছি। শেষ পর্য্যন্ত দেখবার অবকাশ আমার নেই। যে প্রবর্ত্তনার ভিতর দিয়ে আগামী কাল রূপ নিয়ে উঠছে আমার অন্তরে তার নিকট স্পর্শ না থাকবারই কথা, সেইজন্যে তার অন্তর্নিহিত অনাগতকে আমি স্পষ্ট দেখতে না পেতে পারি। আধুনিক কালের

ধ্যানের মধ্যে যা বিকাশোন্মুখ তার সমগ্র মূর্ত্তি তারাই কম বেশি উপলব্ধি করতে পারে যাদের চিত্ত সেই ধ্যানলোকের অন্তর্গত।

আমার সাহিত্য-যাত্রা পথের পূর্ব্ব অংশের দিকে যখন মুখ ফিরিয়ে দেখি তখন আমার সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পারি। সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীত যখন প্রকাশিত হয় তখন দুই একজন সাহিত্য-রসিক তৎকালীন সাহিত্যের সঙ্গে তার অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রশংসা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ-সভার দ্বারদেশে বঙ্কিম সন্ধ্যাসঙ্গীতের সন্ধ্যা কবিতার বিশেষ উল্লেখ করেই আমাকে মালা পরিয়েছিলেন। তখনো যা দেখা দেয়নি—তাই বোধ হয় তাঁর চোখে পড়েছিল। আমার নিজের মধ্যে আজকের দিনের যে বিচারক আছে সে যদি সেই সভাদ্বারে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবির দেখা পেত তাহোলে তাকে মালা দিত না। যে-রূপটি ফুটে ওঠেনি সে যে ভাবীকালে পূর্ণ হয়ে উঠবে সে-কথা আন্দাজ করে আগাম মূল্য দিতে পারে ক'জন যাচনদার ?

আজ বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটা নতুন রূপের প্রকাশোদ্যম দেখতে পাচ্চি। কিছুকাল পূর্ব্বে সেই প্রথম চেষ্টার মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিল, হয়তো এখনো বা কিছু আছে। যে স্বপ্ন অপ্রীতিকর, তার থেকে কোনোমতে জেগে ওঠবার প্রয়াসে মানুষ যেমন নিদ্রাবেশের বিরুদ্ধে ঝুটোপুটি করে সেদিন সেই রকম একটা অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যে একটা উষ্মা ছিল। যে-প্রচলিত প্রভাব তখনো প্রবল ছিল তাকে অস্বীকার করবার উত্তেজনায় তাকে অসম্মান করবার চেষ্টা উগ্র হয়েছিল ; এই বিদ্রোহের অবস্থায় অবিচার স্বাভাবিক।

বন্ধন মোচনের এই প্রয়াসের বাইরে আমার নিজের রচনার ক্ষেত্র। এ অবস্থায় আমার কাজ চুপ করে তাকিয়ে দেখা। যখন নিজের উপর আঘাত এসে লাগে তাকে সহ্য করা। আমার রুচিতে যখন অদ্ভুত কিছু লাগে তখন নিজেকে বোঝাই আদ্যলীলায় আমিও ছিলাম অদ্ভুত। সেদিনের কথা মনে পড়ে যখন এখনকার অধিকাংশ পরিচিত কবির চেয়ে আমার বয়স অনেক কম ছিল। তখন একদিন কাজ-কামাই-করা নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমাদের তেতালার ঘরে বসে প্রবল খেয়ালের প্রমত্ততায় স্লেট হাতে করে একটা কবিতা লিখেছিলুম। সেকালের ভদ্র আদর্শে তার এলোমেলো ক্ষ্যাপাটে আচরণ নিতান্তই ছিল সৃষ্টিছাড়া। তার বাক্য

ছিল যা-খুসি-তাই, তার অগোছালো লাইনগুলোর আয়তন কারো সঙ্গে কারো মিল রেখে চলেনি। কিন্তু সেটা লেখবামাত্র নিবিড় আনন্দ পেলুম। জিনিষটা ছিল নিরতিশয় কাঁচা কিন্তু নিঃসন্দেহ অকৃত্রিম। মন বলে উঠল এইবার আমার নিজের রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে, আর আমার ভয় নেই। অর্থাৎ ভয় নিজের কাছে ঘুচল, বাইরের কাছে বেড়ে উঠল ভয়ের কারণ। সেই বাইরের লোক বেদস্তুরকে অসত্যর চেয়ে বড়ো পাপ বলে মনে করে। পাঠকের কৌতূহল মেটাতে পারব না, সেই আমার সবপ্রথম আপন লেখাটি অন্তর্ধান করেছে। নিজের কাছে অত্যন্ত যা সত্য তাকে নির্ম্মম লোকচক্ষে প্রকাশ করতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করেছিলুম। এখনকার মতো বুকের পাটা ছিল না।

সেই লেখাটার রূপ যদি নিঃসংসক্ত ভাবে দেখবার শক্তি আমার থাকত তাহোলে হয়তো তাকে অন্যদের মতোই বিদ্রূপ করতুম, কিন্তু তার বেগ আপনার মধ্যে একান্তই অব্যবহিতভাবে অনুভব করেছিলেম। সেই বেগের মধ্যে ভাবী সৃষ্টির প্রেরণা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। নীহারিকামণ্ডলকে তার বেগের সঙ্গে এক ক'রে দেখলে বোঝা যায় তা নিরর্থক বাষ্পপুঞ্জ নয় তা নিত্য বিকাশোদ্যত জগৎ।

বাংলাসাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আজ একটা নব উদ্যম জেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চেষ্টা প্রচলিত বিধানের বাঁধন ভাঙতে প্রবৃত্ত ব'লেই ক্ষণে ক্ষণে স্থানে স্থানে অতিকৃতি অতিভঙ্গীতে গিয়ে পৌঁছয়। আন্তরিক বেগের থেকেই যে তার স্বাভাবিক উৎপত্তি তা সকল ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে বলা যায় না। কোথাও কোথাও তার উদ্ভব আত্মপ্রচারের অতিশয় স্পর্দ্ধা থেকে, কোথাওবা ব্যর্থ বিদেশী অনুকরণ থেকে। অপেক্ষা করতে হবে। অতিসজাগ ঔদ্ধত্য ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে। তখন রূপসৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেবে। অনেক কিছু লুপ্ত হবে, আলোড়িত সমুদ্রের জলবিম্বের মতো। আবার অনেক কিছুই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে নবযুগের বাণীকে নূতন ভাষায় বহন ক'রে। ক্রমশই এই কথাটা স্ফুটতর হয়ে উঠতে থাকবে যে, গায়ে-পড়ে ধাক্কা দেওয়া নূতনত্ব,—আত্মশক্তিতে গভীর অবিশ্বাসেরই প্রমাণ। যার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে সে পুরাতনকে জোর ক'রে এড়িয়ে যায় না, পুরাতনের ভূমিকাতেই সে নূতনকে উদ্ভাবিত করতে পারে।

সবশেষে একথা আমি স্বীকার করব যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বারম্বার আমাকে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে এবং আশান্বিত করে তোলে। জানি এই

ভিড়ের মধ্যে প্রতিভার সঙ্গে এসে জুটবে অনেক অভাজন, আসবে তারা আধুনিকতার উদগ্র ছাপমারা ভেক ধারণ ক'রে—তারা মেঘের মতো জমা হয়ে জ্যোতিষ্কদের আচ্ছন্ন করতে থাকবে। এরাই লোককে ভুলিয়ে দেয় দলবাঁধা সাম্প্রদায়িকতা সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়, সাহিত্য বিশেষ কারখানার প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন মার্কামারা বস্তাবন্দী মালের ভাণ্ডার নয়, সাহিত্যে প্রতিভার আত্মপরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য আত্মসমাহিত। সাহিত্যিক পত্রিকায় যখন একত্রে জমাট-করা বহু কবিতার পিণ্ড দেখতে পাই তখন ভয় হয় শ্রেণীগতভাবে আধুনিক মেল-বন্ধনের সংজ্ঞা গ্রহণ ক'রে পাঠকদের মনে পাছে তারা বিভ্রম জন্মাতে থাকে এবং সমষ্টির কলঙ্ক লাগায় বিশিষ্টদের উপরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবর্ত্ত

৪

বাসা বদলাতে দু'দিন গেল। এবার একটি পৃথক বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। রমলাদেবী সুজনকে তাঁর সঙ্গে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সুজনের আপত্তি স্বল্প কথায় উচ্চারিত হলেও তার গুরুত্বের দাবীর জোরে সেটি অতি সহজেই মঞ্জুর হোলো। রমলাদেবী বলেছিলেন, 'সেই ভাল সুজন। তুমি সমাজকে অবহেলা করতে পার না, তোমার সে স্বভাব নয়।' সুজন উত্তর দেয়, 'তাও বটে, তা ছাড়া তুমি ত আমাকে চাও না বলেছ।' 'কবে?' বলে জিজ্ঞাসু নয়নে রমাদেবী খানিকক্ষণ চেয়ে থাকেন, তারপর স্মরণ হয়েছে পাছে সুজন বুঝতে পারে ভেবে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেন। 'সেই ভাল, সুজন।' সুজন বিকেলে ক্লান্ত মনে অক্ষয়ের বৈঠকখানায় ফিরে আসে। টেবিলের ওপর বিজনের চিঠিটা চোখে পড়ল। পুনরায় পড়বার পর সুজন চিঠি লিখতে বসলে। টেবিলের ওপর বুদ্ধদেবের শান্ত মূর্ত্তিকে কৃত্রিম মনে হয়।

'বিজন, তোমার চিঠির উত্তর যথাসময়ে দিতে পারিনি বলে লজ্জিত। তোমার রমলাদি নতুন বাড়িতে উঠে গেলেন, পুরানো বাড়িতে অসুবিধা হচ্ছিল, এখনকার বাড়িও ভাল নয়, তবে কাশীর পক্ষে, এবং একলা মানুষের পক্ষে একরকম চলনসই। সেই সব হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলাম। আমি অক্ষয়ের সঙ্গেই আছি। উনি বলছিলেন সঙ্গে থাকতে। কিন্তু আমি ভাবি,—কেন! প্রয়োজন পড়লে আমি ত কাছেই রয়েছি। প্রয়োজনের সীমা জানাটাই আমার সহজে আসে—কারণ সেটা আমার স্বভাব! তোমার স্বভাব ছাপিয়ে পড়া—আমার আবার ভিন্ন ধরণের। যার যা শিক্ষা। কি বল?

সেই জন্যই ত তোমার টেনিস খেলার উন্নতি শুনে উল্লসিত হলাম। মিক্‌সড্‌ ডব্‌লসের খেলায় তুমি অদ্বিতীয় হবে—এই আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল। তার সফলতায় অন্ততঃ আমার আনন্দ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে নিজগুণে মার্জ্জনা কোরো।

তুমি সোশিয়ালিষ্ট হয়েছ লিখেছ। সংবাদটি চমকপ্রদ নয় লিখলে আশা করি ক্ষুণ্ণ হবে না। দীন দুঃখীর জন্য কাতর হওয়ার রীতি ভারতীয় রাজবংশে সুপ্রচলিত ছিল। ভগবান তথাগত রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, জরা, মৃত্যু, শোক তিনি নিজের জীবনে ভোগ করেন নি, তবু স্রেফ্ পরের জন্য স্ত্রীপুত্র দাস দাসী ও অন্যান্য বিভব ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। তোমার মধ্যে ঘরছাড়া একটা পাগল জন্মলাভ করেছে, সেইটাই বিংশ শতাব্দীর বোধিসত্ত্ব, অতএব ভারতীয় পরিশীলনের ধারা তোমার মধ্যে প্রবাহিত। যখন আকর্ষণ নেই তখন মহানিষ্ক্রামণই সহজতম পন্থা। নয় কি? তবে তোমার আছে টেনিস—যেটি ভগবান বুদ্ধের ছিল না। তাই মনে হয়, বুদ্ধের অপেক্ষা তোমার বাধা বিপত্তি বেশী।

অন্য পার্থক্যও আছে, অবশ্য তাইতেই তোমার কৃতিত্ব। তিনি বহু আশ্রম ও সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা; অন্ততঃ আশ্রমবাসের জনপ্রিয়তা তাঁরই দৃষ্টান্তে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুমি আশ্রমবিমুখ ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষী। তুমি ধর্ম্মকে আফিম এবং আশ্রমকে আফিমের (গুলির বোধ হয়, আফিম ও গুলি একই বস্তু, তবে আড্ডা জমে গুলির প্রসাদে) আড্ডা ভাব। অনেক হিন্দু দার্শনিক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে জড়বাদ, শূন্যবাদ প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছেন, শুনি, তবু যেন মনে হয়, তোমার মতে যে-জড়বাদ সোশিয়ালিজমের প্রাণবস্তু, যা বিহনে সোনার ভারতের মুখে আজ এত কালি পড়েছে, তার সঙ্গে নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের জড়বাদের কোনো আন্তরিক মিল নেই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পিছনে ছিল যাচঞা, তন্‌হা, ইচ্ছাকে ধ্বংস করবার প্রবৃত্তি, তোমার নবধর্ম্মের তাগিদ হোলো ঐ সবকে ক্রমবর্দ্ধমান করবার সমবেত প্রচেষ্টা। বৌদ্ধধর্ম্ম মানবমনকে ইহজগৎ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু তোমার ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কথাটির প্রয়োগে ক্ষুব্ধ হোয়ো না, এই জগতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। মাটির পৃথিবীটাই হোলো তোমার ধর্ম্মের একমাত্র ভূমিকা। আমাদের বৌদ্ধধর্ম্মের ভূতে পেয়েছে। আমরা হলাম শিক্ষিত সম্প্রদায়, তাই হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস হারিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশকেই শিক্ষার নিদর্শন ভাবি। সাহেবরাও তাই ভাবেন যে! হিন্দুরা যে বড় বিরক্ত করে ওঁদেরকে!

কিন্তু আদৎ কারণ হোলো—টেবিলের ওপর একটা বুদ্ধের মৃন্ময় মূর্ত্তি রয়েছে। সারনাথের সেই গুপ্তবংশের বিখ্যাত মূর্ত্তিটি। এর সুখ্যাতি সর্ব্বমুখে। কিন্তু, বিজন, এ মূর্ত্তি বড় বেশী মিষ্টি, ভদ্র, যেন ড্রয়িংরুমের শোভা বৃদ্ধিরই জন্য, মনে হয়

যেন চারপাশে আমেরিকান মহিলা ভিড় জমিয়েছে এবং বাণী চাইছে; তিনিও দিচ্ছেন। তার চেয়ে কঠিন পুরাতন মূর্ত্তির শক্তি আছে। সাবিত্রী দেবীর চেয়ে রমলা দেবীকে তোমার ভাল লাগে না?

তবু যেন বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সোশিয়ালিজমের কোথায় মিল রয়েছে। তথাগত এবং মার্ক্‌স-লেনিনের পূজায়, প্রচার-ধর্ম্মে, সঙ্ঘবদ্ধ ও নির্ব্বাচিত একটি বিশেষ শ্রমণ ও শ্রমিক-শ্রেণীর বিশ্বকল্যাণের গুরুভার বহনে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধতায় দুটি ধর্ম্মের ঐক্য আমার চোখে পড়ে। একাধিক বোধিসত্ত্বও তোমাদের রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের পূজা-অর্চ্চনা জোরেই চলছে। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার থেকে বিমুক্ত হবার প্রয়াসে নতুন সংস্কার সৃষ্টিকেও একটি সাধারণ গুণ হিসেবে ধরতে পার। কোনোটিতেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বালাই নেই, সঙ্ঘের চাপে, তোমাদের পার্টির চাপে খগেন বাবুর মতন লোক নাস্তানাবুদ হতে বাধ্য। তোমার খগেন্দ্র-ভীতি অতিশয় স্বাভাবিক। সোশিয়ালিজমকে এখনও ভারতবাসী পুরাতন ভারতেরই দান, কিংবা বৌদ্ধ ধর্ম্মের পুনরুত্থান বলছে না কেন ভেবে পাই না।

একটি প্রশ্নের অনুমতি দেবে? সঙ্ঘে ভিক্ষুণী প্রবেশে বুদ্ধদেবের ভীষণ আপত্তি ছিল। অবশ্য তবু তাঁরা গৃহীতা হন। তোমাদের সোশিয়ালিজমে কামিনীর স্থান কোথায় ও কতটুকু? সব স্থানটাই কি কাঞ্চন অধিকার করেছে? তোমাদের সর্দ্দার যদি কখনও প্রেমে পড়ে তবে কি তাঁর অন্তর দশা হবে?

তোমার সঙ্গে নানা বিষয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে করছে। তর্ককে তুমি ঘৃণা কর। তবু বিশ্বাস হয় যে খগেন বাবুর অভাবে এখানকার অক্ষয় এঞ্জিনীয়ারের ও ওখানকার তোমাদের কর্ম্মপ্রবণতা আমার বুদ্ধিকে জাগর রাখতে পারবে। কর্ম্মরহিত চিন্তা তোমাদের মতে অশুদ্ধ, নয়? আমার কোনো কর্ম্ম নেই এখানে।

রমলা দেবী তাঁর গাড়ি ব্যবহার করতে অনুমতি দিচ্ছেন। তাঁর খবর বোধ হয় তাঁরই কাছে শোনাই সঙ্গত। তিনি দিব্যি আছেন। যদি দেশের কাজ করবার পর কিছু সময় পাও—বিকেলে টেনিস খেলে—তবে দীর্ঘপত্র দিও। আমি মামাকে চিঠি দিচ্ছি কোচ্‌-এর বন্দোবস্ত করতে। কোচিংএ আমার বিশ্বাস বাড়ছে।

কেমন আছ?

সুজন

তুমি এখানে এলে মন্দ হয় না, অন্ততঃ শুক্রবার রওনা হয়ে সোমবার পৌঁছতে পার কোলকাতায়, যদি আমাদের বুর্জ্জোয়া-সঙ্গ না ভাল লাগে।

স্বঃ'

তাড়াতাড়ি চিঠিটা খামে পুরে সুজন বেরিয়ে আসছে এমন সময় দীপা এসে হাজির। দীপা গম্ভীর মুখে টেবিলের পাশে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে কি দেখলে, তখনই ছুটে চলে গেল। সুজন বেরুল, চিঠিটা নিকটের ডাক-বাক্সে দেওয়া হল না, পরেরটায় দিলে হবে, তার চেয়ে ভাল সেই ছোট ডাকঘরের বাক্সে—রমা দেবীর নতুন বাড়ির কাছে, সেই ভাল, রাস্তার চিঠি কখন যাবে তার ঠিক নেই। একটা ইট্ পড়ে আছে, সুজনের পায়ে লাগল। হাঁসি আসে মনে করে যে সে যন্ত্রের মতন চলেছে, থান ইটটা চোখে পড়েনি। কেউ দেখে নি বাঁচোয়া। পথিক যখন কলার খোলায় পিছলে ধরাশায়ী হয় তখন রাস্তার লোকে হাঁসে কেন? নিজেরা পড়েনি বলে? নিষ্কাম-ধর্ম্মের জোরে? বেশী বুদ্ধিমান বলে? তাই যদি হয় তবে হাঁসি হোতো বাঁকা, কিন্তু দর্শকবৃন্দ হো হো করে হাঁসে। তা নয়। অন্যমনস্ক ব্যক্তি যখন পিছলে পড়ে তখন সে হয় জড়, অন্যে তখন মানুষ। একটা মাত্র প্রবৃত্তি কিংবা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হওয়া মানুষের ধর্ম্ম নয়, যন্ত্রের কর্ম্ম। বড় বড় জাতি যন্ত্রের মতন চালিত হচ্ছে। চলেছে সকলে চোখে ঠুলি দেওয়া বলদের মতন, ঘানিতে ঘুরছে; হাঁসি পায় ওদের গাম্ভির্য্যে। সুজন নিজেকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল, কোনো একমুখী প্রবৃত্তি নিজের অন্তরে আবিষ্কার করতে পারলে না। খগেন বাবু হলে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতেন। নাঃ, রমলা দেবীর বাড়ি যাওয়া হবে না—কি প্রয়োজন! সুজন পোষ্ট অফিসের লাল বাক্সে চিঠি ছাড়লে। রমলা দেবী খগেন বাবুকে গিলে হজম করে ফেলবেন, আত্মসন্ধানীর সর্ব্বনাশ হবে, এখন খগেন বাবুর কর্ত্তব্য কাশী না আসা। পরীক্ষা তাঁর চলুক আরো কিছুদিন। ভদ্রলোক দুর্ব্বল চিত্ত···। আত্মসন্ধানী বটে কিন্তু আত্মজ্ঞানী হন নি। উচিত তাঁর—কি উচিত অন্যের কে জানে! বিজনের চিঠির উত্তরে বিদ্রূপ আছে—দুঃখ হবে তার। হোক্ একটু দুঃখ···কত পোড় খেতে হবে তাকে, কত পোড় খেতে হয় মানুষকে! সুজন হাঁটতে হাঁটতে মাসীমার বাড়ির মোড়ে পৌঁচেছে। বৃদ্ধা কি অপ্রস্তুতে পড়েছেন অনুরোধ রক্ষা করতে না পেরে? বৃদ্ধা বাড়ি আছেন।

'এস বাবা, এই খাটেই বোসো। খগেনের চিঠি এসেছে—আসছে সপ্তাহে আসবে লিখছে। মুকুন্দ ঘর দোর পরিষ্কার করতে গেল।'

'আসছেন নাকি? কোথায় থাকবেন?'

বৃদ্ধা খগেন বাবুর বাড়ির ঠিকানা বলতে পারলেন না, পাড়া বলে দিলেন। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলেন—

'সেই মেয়েটির কি হোলো?'

'কোনো গোলমাল হয় নি, বাড়ি পেয়েছেন।'

'সে-রাত্রে কোথায় রইলেন?'

'সে-রাত্রে? এক আত্মীয়ের বাড়ি।'

'তোমার কে হন?'

'আত্মীয়া, জানা-শোনা খুব। আপনার বৌমার খুব বন্ধু ছিলেন।'

'মুকুন্দ যাকে মেম-সাহেব বলে তাকে তুমি চেন?'

সুজন হেঁসে উঠল, বৃদ্ধা চেয়ে রইলেন···

'ওঃ···মুকুন্দকে ত জানেন, মাসীমা! যে-মেয়ে জুতো পরে সেই ওর কাছে মেমসাহেব। মুকুন্দ বুঝি পছন্দ করে না তাঁকে? মুকুন্দটা একটা আস্ত ভূত!'

'খগেনকে ভালবাসে।'

'কে? নিশ্চয়ই···তা জানি মাসীমা, ও যে আপনার চাকর।'

'আজকালকার হালচাল জানে না অবশ্য'।

'তা না জানুকগে। পুরানো চাল ভাতে বাড়ে। খগেন বাবু কতদিন থাকবেন কিছু লিখেছেন?'

'লিখেছে তো মাসখানেক থাকবে—তার যা মর্জ্জি হবে সে তাই করবে।'

'অত মর্জ্জিমাফিক কাজ করাও ভাল নয়। আপনি তাঁর কাছে থাকুন না? তিনি আপনার সঙ্গে ভালই থাকবেন।'

'না বাবা, আমাকে আর কেন? যদি ছেড়েই এলাম এতদূর তবে আবার জড়ান কেন?'

'সে হয় না, মাসীমা। আপনার বয়স হচ্ছে।'

'আমার! আমি খুব শক্ত আছি, তোমাদের চেয়েও। অসুখ করলে সেবাশ্রমে মেয়েদের হাঁসপাতালে যাব। ম'লে মণিকর্ণিকায় তিন টাকা চার আনা খরচ করে

ওঁরাই যে হোক, পাঠিয়ে দেবেন। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ আমার কাউকে করতে হবে না— সে সব আমি বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

'কি যে বলছেন মাসীমা! আপনার বাঁচবার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। বয়স ত বেশী হয়নি।'

'অনেক হয়েছে, বাবা। খগেন এলে তুমি মধ্যে মধ্যে এস।'

বৃদ্ধার চিবুক নামল দেখে সুজন বল্লে, 'আচ্ছা, এখন আমি যাই। এখনও রোদ্দুর রয়েছে। এক গেলাস জল দিন না মাসীমা।'

জলের গেলাস হাতে নিয়ে সুজন প্রশ্ন করলে—

'মাসীমার কতদিন কাশীবাস হোলো?'

'দশ বছরের ওপর।'

'এতদিন! আমি আপনাকে কোলকাতায় কখনও দেখিনি খগেন বাবুর বাড়িতে।'

'যখন খগেন আমার কাছে থাকত তখন বোধহয় তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি। তখন যারা আসত তারা এখন কোথায় গেল কে জানে!'

'যে যার ধান্দায় ঘুরছে। আমার পরিচয় অল্প দিনের, এখন বোধহয় মাত্র বছর খানেক সবে হয়েছে।'

'তাই হবে। তুমি অনেক ছোট তার চেয়ে। কি করে আলাপ হোলো!'

'নেহাৎ ছোট নই মাসীমা। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। আচ্ছা, আপনার একলা থাকতে কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট কিসের?'

'এই আত্মীয় স্বজন ছেড়ে?'

'তাঁরাই ছেড়েছেন। ঐ খগেনটুকুই আছে। তাও আর কৈ বল।'

'ঐটুকু ছাড়াই ত শক্ত। শেষের বাঁধনই কঠিন।'

'মায়া কি কাটতে চায়! জোর করে কাটাতে হয়।'

'যা বলেছেন মাসীমা! কিন্তু সে জোরই বা ক'জনের থাকে! আমি ত দেখেছি, আমাদের দেশের মেয়েরা কেবল গিন্নী হতে চায়, আর গিন্নী হলেই নিজে জড়িয়ে পড়ে, পরকেও জড়ায় সংসারে··কি যে সুখ পায়! শেষে নাতিপুতির বিয়ে না দিয়ে মরতে চান না।'

'যার যা স্বভাব। খগেনের বিয়ের পর ঘর-সংসার পাতিয়ে দিয়ে চলে এলাম। চোখের সামনে ঐ ব্যাপার ঘটেনি আমার বহু পুণ্যে। আর নয়! এখন একটু নিশ্চিন্ত হতে চাই · বাবা!'

'আমরা দিলে ত!' বৃদ্ধা হাসলেন, দৃষ্টি উদাসই রইল।

'আচ্ছা, মাসীমা, খগেন বাবুর বিবাহের জন্য আবার নাকি আপনি ব্যস্ত হয়েছিলেন?'

'না। মুকুন্দ বলেছে বুঝি! ওর ধারণা বিয়ে থা করলেই খগেন ঘরমুখো হবে, আর বিবাগী হবে না। তোমার বিবাহ হয়েছে?'

'না।'

'তোমার মা নেই?'

'মাও নেই বাবাও নেই। ও-সব চুকিয়ে দিয়েছি ছেলেবেলায়।'

'মেসে থাক?'

'আমার মামা আমাকে মানুষ করেছেন।'

'মামীমা আছেন?'

'না। সেও ঘুচে গিয়েছে অনেক দিন। থাকবার মধ্যে আছে আমার ছোট্ট মামাতো ভাই—এই মাত্র উনিশ কুড়ি বছরের।'

'তাই।'

'তাই কি মাসীমা?'

'কে দেখাশুনো করে?'

'মাসীমা আপনার দেখাশুনোর প্রয়োজন নেই, আর আমি পুরুষ মানুষ, আমার আছে! বেশ বন্দোবস্ত যা হোক!'

'তোমাদেরই এই বয়সে দরকার। মুকুন্দ কি যে ছাই গোছালে জানিনা!'

সুজন জল খেয়ে বল্লে, 'যাব আমি? ঠিকানা?'

'জানি না। ওই যা হয় করে আসবে, তারপর বকুনি খাবে। ওর কপাল!'

'কপাল কেবল নয়, বুদ্ধিরও একটু দোষ আছে।'

'সেবা করবার জন্য বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না।'

'খগেন বাবুর মতন মানুষের সেবার জন্য বুদ্ধি চাই।'

'কারুর জন্যেই নয়। ইচ্ছে থাকলেই বুদ্ধি খোলে।'

'আপনাদের কালে খুলত হয়ত, আজকাল কেবল নিজের ইচ্ছায় খোলে না।'

'তার মানে এখন ইচ্ছের জোর নেই। দেখছ না, যত ইচ্ছের জোর কমছে ততই বাড়ছে দাস দাসী, তাদের মাইনে, মেয়েদের সাজসজ্জা? ছেলেকে এ-ওষুধ ও-ওষুধ, এ-ডাক্তার, ও-ডাক্তার, গরম জল ভিন্ন খাওয়ায় না মায়েরা। ফলে, সারছে ত খুব! সব ক'টা চির-রুগ্ন! সেবা হবে না কেন? খুব হয়। কিন্তু সেবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চেহারা সব দড়ি পাকাচ্ছে, তখন লেয়াও বিলেত ফেরৎ ছোকরা ডাক্তার! পেটের ছবি তোলো, হাওয়া বদলাও।'

'ঠিক তাই কি, মাসীমা? আমি অবশ্য জানি না···ইচ্ছে কমেনি মোটে মাসীমা, বেড়েছে, আমার মতে।'

'আমি যা দেখেছি তাই বলছি। মেয়েরা আজকাল সেবা করতে চায় না, তাই পারে না। চায় সেবা আর আদর খেতে।'

'স্বামীকেও চায় না?'

'জানি না বাপু, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কি ধরণের!···আমি বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি? খগেন এলে কোরো। মুকুন্দটা এখনও এল না। এসে যে বাবু কি খাবেন, কোন পথ্যির ফরমাস হবে বিশ্বনাথই জানেন। বেলা ঢলে পড়ল এধারে।'

সুজন নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

চৌরাস্তার ঠিক মধ্যখানে মাটি খোঁড়া হয়েছে, তার চারধারে দড়ি দিয়ে ঘেরা। জলের নল মেরামৎ হচ্ছে। পাশেই অক্ষয় এঞ্জিনিয়ার দাঁড়িয়ে, মুখে পাইপ, খাকি শর্ট্‌স্ পরা।

'এখনও রোদ্দুর পড়েনি, কোথায় বেরিয়েছিলে? দাঁড়াও, মোটরে চল। সন্ধ্যায় কোনো কাজ নেই, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব। এই উল্লু···এই শূয়ার, তুম্‌সে কেয়া কহা? দেড় ইঞ্চ লাগানে কহা নেই? বেহুদা গঁাওয়ার! ব্যাটাদের নিয়ে কাজ চলে না—ওধারে আবার কমিশনারের রিপোর্ট আছে! যাক্ মিউনিসি-প্যালিটি উঠে! মরুকগে! আর পারি না, চল। আবার স্বরাজ চাইছে—এই সব অপদার্থ লোক নিয়ে দেশ চালাবে! বুঝেছ সুজন, একজন ইংরেজ কুলি এদের দশটার সামিল। আবার, আবার উল্টো বসিয়েছিস! এই ছাখ···' অক্ষয় গর্ত্তের মধ্যে নেমে পড়ল। নলের ছেঁদা দিয়ে শাণিত তীরের মত জল বেরুচ্ছে, সাদা ও

শক্ত। সুজন পুরানো বইয়ের দোকানে ছেঁড়া ফিজিক্সের বইএ একটা ছবি দেখেছিল—ঐ রকম একটা ফোয়ারার মুখে তলোয়ার ভেঙ্গে যাচ্ছে। অথচ জল, রুদ্ধগতি একাগ্রতায় লোহা-ইস্পাত চুরমার হয়, খগেন বাবু ত কোন ছার! জল লাগল অক্ষয়ের মুখে, জামা কাপড়ে, জুতো কাদায় বসে গেল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই জলের তোড় বন্ধ হোলো। সুজনের হাত ধরে অক্ষয় উঠল রাস্তায়···'লেও, মাট্টি ভরো। লাল বাত্তি জ্বালায়কে রাখ্না। সাম্ তক্ হোনা চাহিয়ে, নেহি ত ঠোক্কর খায়োগে। ইয়াদ রাখ্খো লাল বাত্তিকা। চল সুজন, নিজে হাতে নাতে করলেও ব্যাটাদের আক্কেল হয় না—এমন পাঁটাও নিয়ে কাজ করতে হয়! চল, আজ তোমাকে ভাল গান শোনাব। যাবে ত? না, ব্রাহ্ম গুড্ বয়?'

'গান? আমি বুঝি না। আমার সঙ্গে শুনলে তোমার ভাল লাগবে কি? আগে বাড়ি চল, জামাকাপড় ছাড়, কাপড়জামা ভিজেছে। মোটরে ভিজেকাপড়ে যেতে ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'আমরা তোমাদের মতন কবি মানুষ নই যে ফুলের গন্ধে মূচ্ছো যাব। জল কাদা নিয়েই আমাদের ঘরকন্না। তাতে আপত্তি নেই—কিন্তু যে সব অপদার্থ লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হয় সে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। কেবল জুতোর তলায় রাখ, তবে ব্যাটারা জব্দ হয়ে কাজ দেবে—এমন বিশ্রী!'

'সত্যি, ভারি বিশ্রী। কিন্তু না হলেও যে চলবে না।'

'কি না হলে! ওদের না হলে? তবেই মা আমার গঙ্গা পেয়েছেন!'

একজন কুলি একটুকরো কাপড় দিয়ে অক্ষয়ের জুতো মুছিয়ে দিলে। কুলির দল সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল ··'সেলাম সাহাব···সে সে সে লা লা ম ···'

'লেকেন্ কাম হোনা চাহিয়ে, নেহি ত জরমানা হো যায়গা'।

'বহুৎ আচ্ছা, হুজুর'।

সুজন অক্ষয়ের গাড়ীতে উঠল, সামনের সীটে সুজন, পিছনে চাপরাশি। 'অক্ষয়, তোমার কুলিরা ধর্ম্মঘট করে না?'

'বেটারা করতে গিয়েছিল এক কংগ্রেসওয়ালার পাল্লায় পড়ে। ওধারে দুশ কুলি গ্রাম থেকে এসে হাজির। তখন ফিরতে পথ পায় না। খাওয়াবে কে? ধর্ম্মঘট করবে না ছাই!'

'এদেশে বাঙ্গালীদের ওপর মনোভাব কেমন?'

'সে আর বোলো না। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। না হলেও চলে না, অথচ হিংসেয় জ্বলে মরে।'

'কতদিন বাঙ্গালীর আধিপত্য এ-অঞ্চলে চলবে? একা মালব্যজীর বিদ্যালয় থেকেই হাজার হাজার ছেলে বেরুচ্ছে। তারা কি খাবে?'

'জানি, বেশী দিন চলবে না। ভারী অকৃতজ্ঞ এ দেশের লোকেরা। এমন নেমকহারাম!'

'যেমন সাহেবরা বাঙ্গালী-হিন্দুদের বলে, নয়?'

'সে-কথা যদি তোলো তবে চুপ করাই ভাল। ছ্যাখ না, রাস্তা হাঁটতে জানে না, ঠিক লাফাতে লাফাতে গাড়ির সামনে আসবেই আসবে। সাফ্ বাৎ এই—ভারতবর্ষের যেমন ইংরেজ, এ-অঞ্চলের তেমনই বাঙ্গালী।'

আমরা যেমন স্বরাজ চাইছি ওরা তেমনই যদি প্রাদেশিক স্বরাজ চায়?'

'আমরাও যেমন পাচ্ছি ওরাও তেমনই পাবে। আমরাও যেমন উপযুক্ত, ওরাও তেমনই উপযুক্ত'!

'তবু চেষ্টার ত্রুটি হবে না। উপযোগিতার বিচারক কে?'

'চেষ্টা! কোথায় চেষ্টা? বিচারক এই মুখ্খুরা!'

'যদি শিক্ষিত হয়?'

'ততদিনে আরেকটা ভূমিকম্প হবে। কাশীতে ও-সব বালাই নেই এই যা বিপদ। আমার বিশ্বাস—আমি বাপু ইতিহাস পড়িনি—কিন্তু বলছি আমার স্থির বিশ্বাস যে বাঙ্গালী ইম্পিরিয়ালিষ্টের জাত। সেদিন একটা কাগজে দেখেছিলাম যে বাঙ্গালীরা সর্ব্বত্র, তিব্বত, জাপান, সিংহল, জাভা, বলি, সুমাত্রায় সর্ব্বত্র উপনিবেশ গেড়েছে। সে তেজ ও ক্ষমতা এখনও আছে আমাদের।'

'থাকলেই ভাল', বলে সুজন মুখ ফিরিয়ে নিলে। ভিড় ফুঁড়ে মোটর চল্‌ছে। এই অত্যাচার, এই দম্ভ কতকাল সাধারণ লোকে, কতদিন এই দেশের লোকে সইবে? বাঙ্গালী এসেছে এদেশে পরের তাঁবেদার হয়ে, ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তারাই প্রথম ইংরেজী শিখে হোলো কেরাণী। অন্যের প্রাধান্য স্বীকার করতে ও প্রচার করতে তাদের বাধে নি—বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন কোনো সংস্কার ছিল না, এই মুক্তিই হোলো তাদের সুবিধা, গ্রহণ ও সামঞ্জস্য-বিধান তাই তারা সহজেই করলে। আরো কিছু তারা শিখে নিলে—কেরাণিগিরির সঙ্গে সঙ্গে তাও

ছড়ালে তারা। বাহাত্নরী ঐ-টুকু, কিন্তু সে মূলধন ভাঙ্গিয়ে কতদিন খাবে? এখন অন্য প্রদেশের লোকে ইংরেজী শিখেছে, তারা হোলো উকীল, ডাক্তার, কেরাণী। দুই মধ্য-শ্রেণীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসতে বাধ্য। যতই বাঙ্গালী হটে যাচ্ছে ততই বাড়ছে তাদের গুমোর। বাঙ্গালীকে সমঝে চলতে হবে—নতুবা নতুন রাস্তা খুঁজতে হবে। কে আগে কে পিছে ইংরেজী শিখেছে এ নিয়ে গরব শোভা পায় ছেলে মানুষদের মধ্যে; বুড়োদের মধ্য অচল। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নেই প্রবাসে। স্বদেশেও নেই। কোন শ্রেণীর নেই?

উচ্চপদকেই বা কতকাল মানুষে খাতির করবে? দানধ্যান, সাহেবিয়ানা ও মোটরের মহিমায় কতদিন নিম্নশ্রেণী আচ্ছন্ন থাকবে? দুদিনেই যাবে খসে। সর্ব্বত্র পচ্ ধরেছে, নোনা লেগেছে।

এই রাস্তার কুলিরা এখনও অভিভূত রয়েছে—এঞ্জিনীয়ার সাহেবের সাহেবিয়ানায়, কর্ম্মতৎপরতায়, তার উচ্চ শিক্ষায়। কিন্তু দুদিন পরে? যোগ্যতা, এফিশিয়েন্‌সী—সেটা কষ্টিপাথর মাত্র চাকরী পাওয়ার। কিন্তু চাওয়ার? চাইছে সকলে, আরো চাইবে পরে। অধিকার, সমবেত অধিকার, সচেতন অধিকার ও চাহিদা। রমা দেবী কেমন জোরে চাইছেন, দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তবু সেইটাই সত্য। তবু সে-চাওয়া একার। এ পৃথিবীতে শক্তির জয়, তাই মানুষে-মানুষের সম্বন্ধ নির্ভর করে শক্তির বাটোয়ারায়। গরীব দুঃখীকে আহা বলা নয়, তাদের দান খয়রাৎ নয়, চোখের দু ফোঁটা জল নয় তাদের জন্য। থুতুতে চিঁড়ে ভেজে না। আগে আসুক অধিকার-জ্ঞান, তার পর আসুক অধিকার, সেই অধিকার অর্জ্জন ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ফুটবে কর্ম্মকুশলতা, যোগ্যতা। জলে না নেমে সাঁতার কাটা যায় না। ঘাটে প্রবেশ নিষেধ লেখা, অথচ সাঁতার জানে না বলে ঘৃণা! যোগ্যতা বড়মানুষদের আবিষ্কার, আধিপত্য রক্ষার ফন্দী, অন্যকে বঞ্চিত করবার কৌশল। সুজন সীটে নড়ে বসল। সোনা মুখে কালি পড়বে—চমৎকার রসিকতা!

তবে কি শক্তিমন্ত্রের প্রয়োজন? আর মন্ত্র নয়, তন্ত্র ঢুকবে। চাই শক্তি-অর্জ্জন। দেশের মেকী সোশিয়ালিষ্টরা মন্ত্রই আওড়াচ্ছেন। কিন্তু কোথা থেকে শক্তি আসবে? কামের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। মেয়েরা সত্যই শক্তি, তাই রমলা দেবী খগেন বাবুকে মুগ্ধ করেছেন। খগেন বাবু কি ভাবে রমা দেবীকে চেয়েছিলেন, রমাদেবীর মতে, তিনি নিজেই বুঝতে পারেন নি, তাই তাঁর অত বুদ্ধির

কারচুপী। এবার রমাদেবী ভাল করেই বুঝিয়ে দেবেন। মানুষের মধ্যে অন্য কোনো শক্তি যদি থাকে, তার বল যদি কামের চেয়েও বেশী হয় তবেই মানুষ রক্ষা পেতে পারে। আত্মজ্ঞানের স্পৃহার সে-জোর নেই মনে হয়। খগেন বাবু কি পুরুষ হয়েছেন? আত্মশক্তি হয়ত সে-ক্ষমতা ধরে, কিন্তু খগেন বাবুর দুরাশা নেই, তাই রক্ষার আশা কম। তন্ত্রসাধনায় কাম বিজিত হয়, কিন্তু তার প্রক্রিয়ার প্রথমে আছে ভোগ। খগেন বাবুর একবার ভোগ সুরু হলে আর বাঁচবেন না। তার চেয়ে তাঁর দূরে থাকাই ভাল, তার চেয়ে রমলা দেবীর চাওয়ার কষ্টও ভাল, অক্ষয়ের কর্ম্মঠ কাঠিন্যও ভাল। সুজন অক্ষয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লে,

'কোথায় গান?'

'স্থানটি কুস্থান। অর্থাৎ, ভদ্র ব্যবহার পাবে। শোনই না, কাশী এলে, ভাল চীজ্ দেখবে না শুনবে না, কোলকাতা ফিরে কি কৈফিয়ৎ দেবে?'

সুজন চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। অক্ষয় রাস্তায় লোকজনের ও এক্কার ওপর চোখ রেখে বল্লে, 'ঠাট্টা করছিলাম, কি ঠাওরাও? একেবারে ব'কে গেছি, নয়?'

'তুমি যাও।' গাড়ি বাড়ি পৌঁছল।

দীপা ছুটে এসে বাবার কোলে উঠল। অক্ষয় গাল ঘষে দিলে তার গালে।

'কি শক্ত বাবা, লাগছে যে! ছেড়ে দাও, দাও বলছি!'

'তোর বরের যদি দাড়ি থাকে!'

'ছিঁড়ে দেব না!'

সুজন চমকে উঠে ইংরেজীতে বল্লে, 'কি শিক্ষাই দিচ্ছ!'

'ভোকেশন্যাল ট্রেনিং বাবা, সাহিত্যিক ডিগ্রীধারীরা বুঝবে না। কপোল-কল্পনা নয়, কপোল-বিজ্ঞান একেবারে, পুরুষের কপোলে দাড়ি গজায়, না কামালে মেয়েদের কপোল ছড়ে যায়, তাই কামান উচিত, রোজ সন্ধ্যায়। কিন্তু সময়ের অভাব, কষ্ট, পয়সা খরচ নাপিত রাখতে, তাই প্রথম থেকেই শিক্ষা দিচ্ছি। তুমি বুঝি খবরের কাগজে দেখ নি দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে শিক্ষার দোষে? কেবল কবিতা আর ইতিহাস! আমিও কবিতাটা আস্‌টা লিখতাম ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে। তার পর শিবপুরে র‍্যাঁদা ঘষে, হাতুড়ি পিটে সব প্লেন্ হয়ে গেল। দুদিন পরে মেয়ে যাবে শ্বশুর বাড়ি···'

দীপা বলে উঠল, 'সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে'।

'একটু ভুল বলেছিস খুকী। কেউ সঙ্গে যাবে না। বাড়িতে হুলো নেই, সেখানেই আছে। কোনো ভয় নেই, খুব মাছ খেতে দিবি, বুঝলি? মাছ রাঁধতে শেখ্ খুকী—তোর ইস্কুলে গিয়ে কাজ নেই, খুকী আমার পুতুল খেলবে, আর রান্না করবে…'

'বাবা, আমি তত্ত্ব পাঠাব।'

'নিশ্চয়ই, ফর্দ্দ তৈরী কর।'

'আমার একটা ঘড়া চাই, আর পুতুল।'

'কিসের ঘড়া রে?'

'পেতলের'।

'বেটির মেজাজ আছে! বেশ, কালই কেনা হবে। সুজন, কাল মনে করিয়ে দিও ত হে।'

অক্ষয় সেরোয়ানী ও চুড়িদার পরে বেরিয়ে এল, মাথায় গোল টুপি। 'কি হে যাবে না কি?'

'না, যাব না।'

'থাক, তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

'চল না, খুকীকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'খুকীকে! না থাক্, ঠাণ্ডা লাগবে। কাশীতে এ-সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। তুমি বুঝতেই পারবে না, এ-অঞ্চলের হিমকে বিশ্বাস করতে নেই, তুমি জান না, তুমি নিজে যখন বেরুবে তখন একটা গরম কিছু জড়িয়ে নিও। ফ্ল্যানেল বড় ভাল জিনিষ—লু চলছে, তবু আমাদের কাজ করতে হয়, তখন যদি ফ্ল্যানেল পর, আর কোনো ভয় নেই, আবার শীত যখন পড়েছে, তখন আর ত কথাই নেই। তবে বিলেতী ফ্ল্যানেল পোরো। এখানে কখনও ঠাণ্ডা লাগাবে না। বলে, তাত সয় ত বাত সয় না। যাও খুকু, ঝির সঙ্গে গল্প করগে। কালই পিতলের ঘড়া আসবে। ঠাণ্ডা লাগাবি নি, বুঝলি।' দীপা চলে গেল। সুজন বল্লে, 'দীপার ওভারকোট নিলেই চলত না কি?' প্রগল্ভভাবে অক্ষয় উত্তর দিলে,

'না, না, ও-সব ফ্যাশান ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস করান ভাল নয়। ওভার-কোটেও ঠাণ্ডা আট্‌কায় না, কোথা থেকে যে ঠাণ্ডা লাগে বোঝবার জোটি নেই। ওর মা রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার বায়না করত। একটা ফার্‌ দেওয়া লম্বা কোট কিনে দিলাম। তাতে শানাল না, তার পর মোটর চাইলে। কিন্তু মাইনে ছিল কম, ধুত্তোর বলে ধারেই কিনে ফেল্লাম, সেইতেই ত এলাওয়েন্স্‌ বাড়িয়ে দিলে, চাকরীর উন্নতি হোলো। এ-দেশে চাল বাড়িয়ে যাও, মাইনেও বাড়বে। মোটর চড়লেই ফ্যাঁচ্‌ ফ্যাঁচ্‌ করত, গলায় ব্যথা হোতো। একদিন রাত দুটো করলে—নবমীর রাতে থিয়েটার দেখে ফিরতে, তার পরের দিনই জ্বর, বল্লে, "ওভারকোট ছিল, তবু কি করব জ্বর হলে? আমার দোষ না কি! বারে!" আর তখন কি করব? সেই যে নিউমোনিয়া হোলো···না, না, ও-সব বদভ্যাস মেয়েদের··· তুমি জান না, ওভারকোটে শীত আটকায় না। আচ্ছা, তুমি না হয়, ওর সঙ্গেই গল্প গুজোব কর—সেও ভাল লাগবে না, তার চেয়ে ঘাটে ঘুরে এস, অনেক চীজ্‌ চোখে পড়বে···আজ রাতে একটু গল্প গুজোব করা যাবে, কি বল?'

'কখন ফিরছ?'

'একজন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কংগ্রেসের চাকরী যেন কেউ না করে! কেবল খোসামোদ আর ঘুষ! যখন মর্জ্জি হবেন তিনি ফিরবেন।'

'ও, তা হলে গান শোনা হবে না তোমার?'

'কি করে হবে বল ভাই! যে-সব কথা তুললে! তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম। বেশী লেখা পড়া করলে লোকে ঠাট্টা ধরতে পারে না!'

এই হোলো রিয়ালিষ্ট! কড়াপাকের মধ্যে নরমপুর। লজ্জা ঢাকবার আবরণ মাত্র। খানদানী ইংরেজের বাড়ির করিডারে মুখোস ও বর্ম্ম পরে বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট ছেলেদের দুঃস্বপ্নের খোরাক যোগাতে। খগেন বাবুর মুখোস বুদ্ধিবাদ, হাঁপিয়ে উঠলেন তাই। অন্তঃসারশূন্যতার জন্য একটানেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, মুখোস গেল টুটে, তার পর দে ছুট্‌। আবার নতুন কি মুখোস পরবেন কে জানে! কেবল মুখোস পরিবর্ত্তনই চলছে। রমলা দেবীর মুখোস ছিল আধুনিক সমাজের ভদ্রতা, খসে গেল খগেন বাবুর এক হ্যাঁচকা টানে। প্রকাশিত হোলো দুর্নিবার প্রবৃত্তি—দুজনের আবরণহীন মূর্ত্তি।

ঘরের ভেতর চোখে পড়ে না স্পষ্টভাবে কোনো কিছু, কিন্তু সবই রয়েছে

অভ্যাস মত। আকাশে এখনও আলোর রেশ টানা। সন্ধিক্ষণ একটি বিশেষ মুহূর্ত্ত, অনন্ত প্রবাহ থেকে চ্যুত। তার নিজের সত্তা আছে, কিন্তু অন্তরে সচেতনতার অধৈর্য্য নেই, দৈহিক মিলনের চরমক্ষণসম, ভাস্কর্য্য-ঘন নিশ্চলতা, নির্ব্বাত-প্রদীপবৎ স্থিরশিখা, শান্ত কোমল মধুক্ষণ। পুরাতনের স্মৃতিও ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা-বিহীন এই সান্ধ্য মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান সকল অভিজ্ঞতাকে গ্রথিত করে বিশ্বের গোপন কথাটি জেনে নেয়। যার বর্ত্তমান স্থির সেই মানুষই সম্পূর্ণ। বর্ত্তমানকে স্থায়ী করা যায় কি ভাবে ? স্থায়ী করার নামই যোগ-সাধনা।

সম্বিৎ ফিরে আসে রোমাঞ্চের সঙ্গে। গালে কে যেন হাত বুলিয়ে দিলে। সে দিনকার রাত্রির অভিজ্ঞতা—এমন আর কি অদ্ভুত! এমন আর কি অস্বাভাবিক! 'এস, স্বাভাবিক করে দিই।' সুজনের বুকটা মুচড়ে যায়। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ে একটা চাদর নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্লান্ত হয়, পোষ্ট অফিসের সামনে হাজির হয়েছে দেখে হঠাৎ ইচ্ছে হয় বিজনকে টেলিগ্রাম করতে। বিজন আসুক, এসে রক্ষা করুক, সকলকে, অক্ষয়কে, খগেনকে, তার রমাদিকে। তার সে-শক্তি আছে। আসুক সে। ওঃ তাই উনি চান না যে বিজন আসে··· ওঃ তাই! ভয়ে, পাছে বাধা ওঠে। সুজন পোষ্ট অফিসের মধ্যে ঢুকে একটা এক্‌স্‌প্রেস্ তার করলে, 'চলে এস, প্রয়োজন আছে তোমার উপস্থিতির।'

ঘরে ফিরে সুজন অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে পড়ে। বড় কঠিন। আরাম কেদারায় ব'সে অপেক্ষা করে বিজনের আসার। বিজনের ওপর অনেক আশা তার। কেন চিঠিতে ঠাট্টা প্রবেশ করল! মনের ওপর হাত নেই মানুষের।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

কোথা শেষ ?

ভালবাসা ? সে তোমার লাগিবেনা ভালো,
অমৃত তোমার কাছে জানি আমি লাগিবে বিস্বাদ,
অতল পাতাল তলে ডুবিয়া রয়েছ অন্ধকারে
তোমার নয়নে জানি সহিবেনা এই স্নিগ্ধ আলো।
সমুদ্র-বেলায় তুমি বার বার বাঁধ খেলাঘর,
সে ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে ভেসে যায় যে দুর্ব্বারস্রোতে
তাহারে বাঁধিতে ব্যর্থ ব্যগ্র বাহু নিষ্ফল আক্রোশে
আপন বক্ষের 'পরে হানিছে আঘাত নিরন্তর !

তুমি ত চাহনা প্রেম, প্রেমিকে এড়ায়ে তুমি চল,
বাঁধ যারে বাহুপাশে, গোপন বিলাস-কুঞ্জতলে
যাহারে টানিয়া আন নিষ্ঠুর খেলার ছলনায়.—
নিঃশেষে সে প্রাণ দেয় বিষদিগ্ধ পঙ্কিল পল্বলে।
জল নাই, ছায়া নাই, মৃগতৃষ্ণিকার মিথ্যা মায়া,
ধূ ধূ করে চারিদিকে, তুমি শুধু দাঁড়াইয়া হাস ;
কখনও নিকটে আসি নিপীড়িয়া তপ্ত বক্ষতলে
নিঙাড়িয়া শেষ বিন্দু ফেলে যাও পথে বা প্রান্তরে,
বর্ণহীন রসহীন পাণ্ডুর মৃত্যুরে ভালবাস !
নখরে নখরে জ্বলে যে উদগ্র হিংস্র কামনা,
পরশ-কাতর প্রতি অঙ্গুলির মুখে বহ্নি-শিখা,
অধরসীমায় বহ্নি, তপ্তবক্ষে দহে বহ্নিদাহ
তাহারে সহিবে কেবা, কে এমন করেছে সাধনা ?

নব প্রভাতের আলো, সন্ধ্যার সুন্দর আলোছায়া,
শ্রাবণ গগনতলে নব মেঘে উৎসব-উল্লাস,
মাধবী পূর্ণিমা নিশি, নীল যমুনার জলোচ্ছ্বাসে
যুগ যুগান্তের প্রেম রচে নিত্য অলকার মায়া।
সে কেন লাগিবে ভাল ? তুমি চাহ ইন্ধন তৃষ্ণার,
ভোগোচ্ছল পান-পাত্রে বিচ্ছেদ-বিহীন আস্বাদন,
হৃদয় নাহিক যার অনুভূতি মিথ্যা তার কাছে,
আরণ্য পশুর মত স্থূল দেহে বিলাস তাহার।

মধুর স্বপ্নের ঘোরে কোনও দিন নিশীথ শয়নে
আসে নাই প্রিয়জন, নিদ্রা সে ত মদির আবেশ,
প্রলাপে তাহার ওঠে প্রগল্‌ভ মনের চঞ্চলতা,
কামনা কলঙ্করেখা টেনে দেয় নিমীল নয়নে।
মদিরাক্ষী অঞ্জনার যুগ্ম ভুরু বঙ্কিম সুঠাম
ভুলায় তোমার মন, আত্মহারা আবেগ-চঞ্চল
উন্মত্ত তৃষ্ণার জ্বালা ফুটাইয়া রক্তিম অধরে
দুদণ্ডে ভুলিয়া যাও কে সে নারী, কি তাহার নাম।

প্রেম ত চাহনা তুমি, ভাল তুমি বাস নাই কারে ;
দুহাতে লুণ্ঠন কর যৌবনের কুসুম-সম্ভার ;
নিষ্ঠুর দস্যুতা তব চলিতেছে উন্মত্ত কৌতুকে,
দু'পায়ে দলিয়া চল নিরাশ্রয় মৌন বেদনারে।

কখনও নয়নে তব পড়ে নাই কোনও অবসরে
মৌন মূক দুটি আঁখি অবগাঢ় স্নিগ্ধ মমতায় ?
প্রেমে ঢল ঢল মুখ, নিবিড় সে মেঘময়ী শোভা
আচ্ছন্ন করেনি তোমা কোনওদিন দুদণ্ডের তরে ?
এমনি অভাগ্য তুমি, করিলনা কামনা তোমারে
স্বেচ্ছায় কামিনী কেহ, প্রেম দিয়ে করিলনা পূজা,
প্রাণ দিয়ে ভালবেসে কা'রে তুমি আনিলে না ঘরে।

মধু যামিনীর স্বপ্ন বিফল করেছ বারে বারে
জীবনে তোমার তাই বিষকন্যা ঢালে হলাহল ;
আকণ্ঠ করিয়া পান মত্ত তুমি নামিছ পাতালে
পাতালের শেষ আছে ? কামনার পরিতৃপ্তি কোথা ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আনমনা

দিন আমার চলেছে নীরবে।
প্রাত্যহিকের ঠাসা কাজের
বিরল একটু ফাঁকে
মনে পড়ে তোমাকে—
অনেক দূর থেকে
অকারণেই।

হঠাৎ অতীত থেকে দমকা হাওয়া এসে
জাগায় মনে ঢেউ—
তোলে নিস্তরঙ্গ পাহাড়ী হ্রদের বুকে
কুঞ্চিত শিহরণ।
সোনালী রোদ চক্‌চক করে ওঠে আনত নীল আকাশে।

বসে চেয়ে দেখি ফেরাতে পারিনা চোখ।
ভুলে যাই আপন হাতের কাজের কথা
হৃদয় আমার উন্মনা—অতীত দিনের জাল বুনে যায়
স্বপ্ন আর কল্পনার ছায়াময় আলো দিয়ে।

ভাবি আজ বুঝি তোমার তোরণ-দ্বার জনতা-মুখর।
পুড়ছে ধূপ, জ্বলছে দীপ, তোমায় ঘিরে আরত্রিকের পালা,

নৈবেদ্যের থালা সাজানো থরে থরে,
তুমি আজ পরিপূর্ণ ; আত্মরত—
নিঃসঙ্কোচ ক্ষোভহীনতায় গ্রহণ করছো ভোগ।

কিন্তু একদিন ছিল বিপরীত।
তখন তুমি ছিলে পূজারী,—
যে-দেউলে নিত্যপূজার ছলে
তোমার ছিলো নিত্য আনাগোনা,
সে-দেউল আজ ভাঙা
অলোকের বেদী গেছে টুটে'
প্রাচীর চিরেছে অশথের চারা
ফাটলে থাকে অজস্র প্রাণী,
নিরালোকের নৈরাজ্যে তাদের
অন্ধকার খেলা।

শ্রীছায়া দেবী

"দেহের দাবীর তীরে"

দেহের দাবীর তীরে পাশাপাশি বসি' দুইজনা—
তুমি আর আমি—
নেহারি কিসের স্বপ্ন ? মিটাইব বল কী কামনা
দেহ-নীরে নামি' ?
সম্মুখে উদ্দাম সিন্ধু, পশ্চাতে উত্তপ্ত বালু-রাশি,
উদ্দাম-উত্তপ্ত নেশা মধ্য-পথে বেগে যায় ভাসি',
দুরন্ত যৌবন বুকে, মুখে জাগে দুর্জ্জয় পিপাসা
সাহারার মত—
এ সময়ে এইখানে বল জাগে কোন তীক্ষ্ণ আশা
মনে অবিরত ?

দেহের দাবীর তীরে সাধ যায় পেতে দেহ মোর ?
স্তব্ধ কেন তবে ?
সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গি' ওঠে কই উষ্ণ উচ্ছ্বাসের ঘোর
উত্তাল-গরবে ?
অশ্লীল-অসভ্য-স্বপ্ন নেত্রে কই উঠেছে রসিয়া ?
সযত্নে-জড়িত-বস্ত্র ত্রস্তে কই প'ড়েছে খসিয়া ?
কোমল-কামনা-কুম্ভে টলে কই তরল সরস
তীব্র মাদকতা ?
ক্ষুধিত পশুর মত ওষ্ঠে কই বর্ব্বর হরষ—
মত্ত-লোলুপতা ?

দেহের দাবীর তীরে আরএক দেহের পাশে বসি'
দেহ-লতা তব
জড়া'য়ে ধরিতে তা'রে নাহি চায় আহ্লাদে উচ্ছ্বসি' ?
এ কী অভিনব !
এই সিন্ধু, এই বালু, কাছাকাছি এই বুক মুখ,
কামনা-তরঙ্গ পায়ে আছাড়িয়া মারিতে উৎসুক—
ইহা ল'য়ে এতদিন স্বপ্ন-সৌধ রচিয়া দু'জনা
ক'রেছি যে খেলা,
কী বল, এনেছি তাহে আপনার আত্মার বঞ্চনা ?
অন্ধ অবহেলা ?

দেহের দাবীর তীরে দেহাতীত কোন দাবী জাগে ?
এ কোন উৎপ্রাস ?
মদ-মত্ত পশু কেন অকস্মাৎ আত্ম-নতি মাগে,
মাগিছে বিনাশ ?
কিছু বুঝি, কিছু যেন বুঝেও বুঝি না ভালো ক'রে ;
কিছু পাই, কিছু যেন পেয়েও রাখি না কাছে ধ'রে ;

দেহের দাবীর তীরে যে দাবী পরমতম ছিল
তোমায় আমায়—
আরএক রুচির স্পর্শে পরাজয় কেন মানি নিল
কে বুঝাবে হায় ?

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায়

রাত্রির কবিতা—

সন্ধ্যা তা'র পক্ষপুটে নিয়ে এসেছে সুন্দর অন্ধকার।
দুই পাখা বিস্তীর্ণ ক'রে এসে' বস্‌ল কালো সাগরের জলে—
স্রোতে গা-ভাসানো সাগর পাখীর মতো।
আর সমুদ্র, তার মুখ দেখ্‌ছে সন্ধ্যার অসিত আরশিতে—
তাই, সমুদ্রের গুপ্ত মণিময় স্বপ্ন
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে আকাশের তারাময় স্তব্ধতায়!
দুঃস্বপ্নের মতো এই স্তব্ধতা, অসহ্য হ'য়ে উঠেছে সাগরের—
প্রেয়কে কাছে পেয়ে চুপ ক'রে থাক্‌তে না পেরে
ছলছল ক'রে কথা ক'য়ে উঠ্‌ল সাগর।
মাঝে মাঝে সাগর পাখীরা
অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন ক'রে চলেছে ডানা ঝাপ্‌টে—
তীক্ষ্ণ তাদের চীৎকার, নিস্তরঙ্গ আকাশ সাগরে
করছে তরঙ্গ সঞ্চার—
যেন মৌন এই প্রেম নিবেদনের করুণ অভিব্যক্তি!
ঘুমের কালো সমুদ্রে উড়ে চলেছে স্বপ্নপাখী
—আমার চিন্তার মণি তারা হ'য়ে ফুট্‌বে না তোমার আকাশে?

সুশীলকুমার ঘোষ

ট্রায়াড্‌স্‌

(Sreshta-র ইংরাজী কবিতা হইতে)

১

আলোর দিব্য—তোমার নয়নে দিব্য আলোর ভাতি।
রাতের দোহাই— তোমার কেশেতে ঘনায় নিশার ছায়া,
গোলাপ সাক্ষী—তোমার ওষ্ঠে শোভিছে গোলাপী মায়া।

হেরি ও আঁখিতে প্রদোষ-স্বপন মদির মধুমাসের।
কেশেতে নেমেছে শেষ নিদাঘের হিরণ গোধূলিছায়,
হেন ফুল নাই তুলনা যাহার অধরের লালিমায়।

ভালোবেসেছিনু একদা দিনের রাতের সন্ধিক্ষণ।
ঘুরিছে পরাণ তোমারে কেন্দ্রে কর্ষণ-ভারাতুর,
জেনেছি এবার কোথা ফোটে মোর গোলাপেরি অঙ্কুর।

২

পলক ফেলিতে দৃষ্টির সাথে দৃষ্টির বিনিময়।
এলায়িত কেশকুণ্ডলী তব বিমূঢ় সর্পকায়,
ওষ্ঠের বাণী কেঁপে ওঠে সুবে মৃদু অঙ্গুলি-ঘায়।

তোমার চোখেতে খুঁজেছি গোপন আত্মারি সন্ধান।
নামায়ে দিয়েছি বিলোল তোমার গরবী কবরী-ভার,
তোমার অধরে জাগায়েছি মধু উন্মনা কামনার।

হেরি চঞ্চল নয়নমণিতে আমারি আকুল প্রাণ।
তোমার চিকুরে সর্ব্বদা দিবা-রাত্রি মূরছি' রয়,
তোমার ওষ্ঠ, অধর সে মোর বাসনাবহ্নিময়।

৩

কি নীল স্বপন আঁখি-তারকায় তোমারে দিই গো, রাণি !
সাজাবো কেমনে সবুজ পাতায় তোমার শ্যামল কেশ ?
তোমার অধর-বিম্বে বিফল রাঙা মদিরার রেশ !

খোলো মায়াময় অনুমানে-ভরা কোমল চাহনি মৃদু।
অলকগুচ্ছ বিথারি' শিথিল সাজাও শয্যা তব,
চুম্বনযোগে নিয়ে যাও মোরে চেতনায় অভিনব।

রভস বিবশ,—সমাধি-সমান অতল সংজ্ঞা-তলে।
সুখবন্ধন,—নির্ম্মম তব কৃষ্ণ কেশের ফাঁস,
মরণ মোহন,—হোক্ অকরুণ শাণিত অধর-পাশ।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পুস্তকপরিচয়

A History of the German Republic—By Arthur Rosenberg. (Methuen)—15s.

The Fall of the German Republic—By R. T. Clark (George Allen & Unwin Ltd.)—15s.

১৯৩৩-এর নাৎসি-বিপ্লব জার্ম্মান জাতির কাহিনীতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, ইয়োরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসেও এর ফলে একটা যুগের অবসান হল। হিট্‌লারের স্থায়ী প্রভাব বিচার করবার সময় এখনও আসে নি, নাৎসি-প্রচেষ্টার স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আজকের মতভেদ বিভিন্ন সামাজিক আদর্শ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যেরই পরিচায়ক ; কিন্তু জার্ম্মানি যে আবার ইয়োরোপীয় আবর্ত্তের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এ-কথা সকলেরই স্বীকার্য্য। পুনরুত্থিত জার্ম্মানি উত্তর-সামরিক অবসাদ থেকে মুক্তি পেয়েছে প্রধানতঃ তিন দিকে—জাতীয় আত্মনির্ভর ভাবের পুনঃপ্রতিষ্টা, রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতাপ্রসার এবং দেশব্যাপী ঐক্যের সঞ্চার অনেকের মতে নূতন জীবনের বিশিষ্ট নিদর্শন।

কিন্তু যে-আভ্যন্তরিক সমস্যা আধুনিক সকল সমাজকে ক্লিষ্ট করছে সেই শ্রেণীবিরোধ যে সহসা প্রোপাগাণ্ডার যাদুমন্ত্রে জার্ম্মানিতে বিলীন হয়ে গেল একথা বিশ্বাস করা শক্ত। সাময়িক উত্তেজনা দেশব্যাপী ঐক্যবোধকে জাগিয়ে তোলে নিশ্চয়, যুদ্ধকালে প্রাথমিক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ; কিন্তু কিছুদিন পরে স্বার্থের সজ্ঘাত পুনরায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ক্লান্তি, অসন্তোষ, সন্দেহ আবার ফিরে আসে। আর্থিক অবস্থা উন্নততর হবার যুগে অবশ্য শ্রেণীবিরোধ প্রচ্ছন্ন থাকাই স্বাভাবিক, কারণ তখন সকলের দাবীই অনেকখানি মেটাবার সামর্থ্যের অভাব হয় না। কিন্তু জার্ম্মানির আর্থিক উন্নতি কি এখন থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই যাবে ? ধনতন্ত্রের যে-দৌর্ব্বল্য আগে প্রকাশ পেয়েছিল, ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট আমলে তার কোন মূলগত সংস্কারের চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নি—শুধু সোশ্যালিষ্ট নামে কোন মন্ত্রশক্তি থাকতে পারে না। বরং ১৯৩৪ সালের জুনে গ্রেগর্ ষ্ট্রেসার এবং 'ঝঞ্ঝা-বাহিনী'র নেতাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসিদলের অভ্যন্তরে আর্থিক সংস্কারের সমর্থক মতপ্রভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। জার্ম্মানিতে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞেরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেন। রুষ জাতির বর্ব্বরতা ও বল্‌শেভিক্ যথেচ্ছাচারের বিষয়ে নাৎসিদের ঘৃণার অন্ত নেই ; অথচ নাৎসি জার্ম্মানিতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জনগণের আত্মকর্ত্তৃত্ব বিন্দুমাত্র বেশী নয়। য়িহুদীদের প্রতি অত্যাচার

জার্ম্মানির অবস্থা ফেরাতে পারবে এ-বিশ্বাসও ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয়; আসলে জনসাধারণের য়িহুদী-বিদ্বেষে ঘৃতাহুতি দিতে পারলে অন্য অনেক প্রশ্নের দিকে লোকের চোখ না পড়বার সম্ভাবনা বাড়ে। এ-প্রসঙ্গে একথা বলাই বাহুল্য যে দুর্নীতি শুধু য়িহুদীদের একচেটিয়া নয়, জার্ম্মানিতে খাঁটি নর্ডিক ধনিকপ্রবরদের প্রভুত্বের কিছুমাত্র অভাব নেই এবং মার্ক্সবাদও য়িহুদীদের নিজস্ব সম্পত্তি হ'তে পারে না।

জার্ম্মানির ভিতরকার অবস্থার কথা বাদ দিলেও নাৎসি-আমল অশান্তি ও শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানিব অশেষ দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হয়েছিল এবং প্রতি-শোধস্পৃহা সে দেশে এজন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ফ্রান্সেব বৈদেশিক নীতি এখন আর ক্লেমাসোঁ কিম্বা পয়ঁকারের যুগের মতন উগ্র নয় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ফরাসীরা যে এখন জার্ম্মানি আক্রমণ করবে এর সম্ভাবনা খুবই কম। ভের্সাই-সন্ধিতে জার্ম্মানির প্রতি যে-অবিচার হয়েছিল তার অনেকখানি এখন সংশোধিত হয়েছে আর বাকী অন্যায়ের প্রতিকার সাধনের জন্য যুদ্ধের আশ্রয় নিলে অন্য অনেক অমঙ্গল ও অবিচারের পথই প্রশস্ত হবে। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বে সুবিচারের চাইতে স্বার্থসিদ্ধিই বরাবর আসল লক্ষ্য হয়ে এসেছে—অতীতের থেকে এখন তফাৎ শুধু এই যে আধুনিক প্রথায় যুদ্ধের ফলে সভ্যতা ও সামাজিক জীবন ধ্বংসোন্মুখ হয়। হিট্‌লারের পক্ষে তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ এবং সমরসজ্জার বিপুল আয়োজন নিন্দনীয়, তাতে নাৎসিদের সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে বহির্শত্রুর প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি আভ্যন্তরীণ সমস্যা থেকে জনসাধারণের মন অপসারিত করাবার প্রাচীন ও সুবিদিত পদ্ধতি।

যে-গণতান্ত্রিক রেপাব্লিকের ধ্বংসের উপর হিট্‌লারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অবসান এই সব কারণে অনেকের কাছেই নিতান্ত ক্ষোভের কথা। গত চার বছরে জার্ম্মানি সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ দু'খানি এদের মধ্যে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে যদিও এ দুটিকে ঠিক প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক রচনা বলা চলে না। ডক্টর রোজেন্‌ব্যর্গ নিজে জার্ম্মান-য়িহুদী; সোশ্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্ট দলের তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন—বার্লিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং স্বদেশ ত্যাগ করে তাঁকে এখন লিভারপুল্‌ বিদ্যাপীঠের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এ-সত্ত্বেও তাঁর লেখার মধ্যে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ কিম্বা অশোভন উষ্মা প্রকাশ না পাওয়া অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ইংরাজ লেখক ক্লার্ক বারো বৎসর জার্ম্মান রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা করেছেন, 'পোলিটিকাল্‌ কোয়ার্টার্লি'তে জার্ম্মানি সম্বন্ধে তাঁর লেখা অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন। বই দুখানি একসঙ্গে পড়লে জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রের সূচনা থেকে শোচনীয় পরিণাম পর্য্যন্ত সমগ্র কাহিনীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়—বহু জ্ঞাতব্য কথা আখ্যায়িকা দুটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে যার সম্বন্ধে আমরা প্রায় কোন খবরই রাখি না। রোজেন্‌-ব্যর্গ, রেপাব্লিকের প্রথম দিকের ইতিহাসের উপর জোর দিয়েছেন—বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্রের গোড়া-পত্তন প্রথম থেকেই কাঁচা ছিল এ-বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নয়। তিনি ১৯৩০ সালের পরের

ঘটনার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নি, কারণ তাঁর মতে হ্বাইমার নগরীতে প্রবর্ত্তিত জার্ম্মান্ গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির অপঘাত মৃত্যু ঘট্‌ল সেই মুহূর্ত্তেই যখন প্রধান মন্ত্রী ব্রুইনিং ব্যবস্থাপরিষদকে উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরিত অর্ডিনান্স্-সমূহের সাহায্যে দেশ শাসন আরম্ভ করলেন। পক্ষান্তরে ক্লার্ক্ রেপাব্লিকের শেষ কয় বছরের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন—ষ্ট্রেসমানের মৃত্যুর পর কি ভাবে একে একে গণতন্ত্রের সকল নির্ভর বিলীন হ'ল তার বিচিত্র কাহিনী এখন পর্য্যন্ত ডিমক্রেসিতে যাঁদের বিশ্বাস আছে তাঁদের সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। আমার কাছে বই দুখানির শুধু একটি ত্রুটি উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে—গ্রন্থকার দুজনে এক এক জায়গায় জার্ম্মান্ নেতা বা দলবিশেষের মূর্খতা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে ভবিষ্যৎ এই সব নেতা বা দলের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল।

১৯১৮ সালে কাইজারের পতন থেকে ১৯৩৩ এ হিট্‌লারের প্রভুত্বস্থাপন পর্য্যন্ত যে-যুগে ডেমক্রাটিক্ জার্ম্মান রাষ্ট্রসংগঠনের প্রচেষ্টা চলেছিল তার এই পরিণাম এবং সে উদ্যমের পরাজয়ের কারণ কি? আটশ পৃষ্ঠার ইতিহাসের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু পুস্তক দুটিতে বর্ণিত কারণগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা চলে। সেই তিন জাতীয় কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে এ সমালোচনা শেষ করা উচিত।

জার্ম্মান সমাজতন্ত্রীদের দুর্ব্বলতা প্রথমেই চোখে পড়ে। সোশ্যাল্ ডিমক্রাট দল বহুদিন ধ'রে জার্ম্মানিতে অন্য যে-কোন দল অপেক্ষা সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিল; কিন্তু তাদের বিশ্বাসের জোর এবং কর্ম্ম-পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের শ্রদ্ধা রাখা সহজ নয়। যুদ্ধান্তে সৈনিক-বিদ্রোহ সোশ্যালিষ্টদের হাতেই রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত করে; কিন্তু সেই প্রথম কয়েক মাসে জার্ম্মানির তথা-কথিত মার্ক্সীয়দল শুধু ডিমক্রাসি স্থাপনের বিধিব্যবস্থাই করেছিল, সামাজিক পুনর্গঠনের কোন উদ্যমই তাদের তখন অনুপ্রাণিত করে নি। জার্ম্মানির বিশাল শ্রমিকশ্রেণী এতে হতোৎসাহ ও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। তারপর অনেক বছর সোশ্যাল্ ডিমক্রাটেরা মধ্যশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় দলগুলির সহযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই করে উঠতে পারে নি, তাতে তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিপত্তি খর্ব্ব হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক হয়েছিল। ষ্ট্রেসমানের মৃত্যুর পর যখন দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসছিল তখন ট্রেড্ ইউনিয়ন্ প্রভৃতি প্রবল প্রতিষ্ঠানগুলি আয়ত্তে থাকলেও সোশ্যাল্ ডিমক্রাটেরা নিশ্চেষ্ট থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই স্থির করে রাখে নি। সোশ্যাল্ ডিমক্রাটদের শান্তিপ্রিয় হতাশ ভাব কমিউনিষ্টদের বিদ্রূপের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিপ্লবী সাম্যবাদীরাও কার্য্যক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। রুষদেশের মতন শাসনযন্ত্র অধিকার করার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করে উঠতে পারে নি, এবং নাৎসি-বিপ্লবের গতি প্রতিরোধের বিশেষ কিছু চেষ্টাও তাদের কার্য্যকলাপের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ক্লার্ক ও রোজেনবার্গের মতে জার্ম্মান সাম্যবাদীদল সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্যই জার্ম্মানিতে কোন সাহসিক প্রচেষ্টা থেকে বরাবর বিরত থেকেছিল এবং রুষনেতাদের অন্ধ

অনুবর্ত্তিতাই তাদের দৌর্ব্বল্যের কারণ। এ অভিযোগ সত্য না হতেও পারে; কিন্তু কমিন্‌টার্ণ পর্য্যন্ত পরে স্বীকার করেছে যে জার্ম্মান্ শ্রমিক মহলে অন্তর্বিরোধের প্রশ্রয় দিয়ে সাম্যবাদীরা ফাশিষ্টদেরই সুবিধা করে দিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে অবশ্য গণতন্ত্রের রক্ষাই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জার্ম্মানিতে ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের মতন সবল সুপ্রতিষ্ঠিত উদারনীতির বিশেষ অভাব বহুদিন থেকেই দেখা গিয়েছে। বিসমার্ক যখন সদর্পে নির্দ্দিষ্ট শাসনপদ্ধতি লঙ্ঘন করেছিলেন তখন জার্ম্মান্ শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী তাঁর সে ব্যবহার মেনেই নিয়েছিল। শাসককে জাতির প্রতীক জ্ঞান করা এবং রাষ্ট্রশক্তির পূজা প্রাশিয়ার ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। ক্ষণস্থায়ী হ্বাইমার যুগে তাই উদার মনোভাব স্ফূর্ত্তি পাবার বিশেষ অবকাশ পায় নি। তদুপরি ঠিক সেই সময় বৈদেশিক পীড়নে জার্ম্মান্ জাতির মধ্যে চরমপন্থাই প্রসার লাভ করছিল। জার্ম্মান্ রাষ্ট্রক্ষেত্রে মধ্যস্থানীয় দলগুলির ভিতর সেণ্টার পার্টিই প্রধান। তাদের কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ডিমক্রেসি নয়, ক্যাথলিক চার্চ্চের স্বার্থরক্ষাই তাহাদের মূলমন্ত্র। ১৯২৯এর পর আর্থিক সমস্যা যখন জার্ম্মানিতে রুদ্র রূপে দেখা দিয়েছিল তখন তাই ক্ষীণ-উদার মতবাদ নূতন মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে বিলম্ব করল না এবং তার এ পরিণতিকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বলাও চলে না।

হিট্‌লারের সম্মোহনী শক্তি এবং তাঁর সহযোগীদের দক্ষতাও এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না। নাৎসি-আন্দোলনের সাফল্যের একটি প্রধান কারণ তার অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ভাব—জার্ম্মানির পুঞ্জীভূত অসন্তোষ তাই তার মধ্যে সহজেই আশ্রয় পেয়েছে। নেতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস দুর্ব্বল জনগণকে আশ্বস্ত করেছে—অন্ততঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত এ আস্থা থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু নাৎসিদের কর্ত্তৃত্ব যে শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রধান নির্ভর নিশ্চয় এই বিশ্বাস যে জার্ম্মানির বর্ত্তমান সঙ্কটে গণতন্ত্রের সহজ সরল পন্থা অচল এবং বল্‌শেভিক বিপ্লব থেকে ধনতন্ত্রকে বাঁচাবার এখন সে দেশের আর অন্য উপায় নেই।

শ্রীসুশোভন সরকার

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা—অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী প্রণীত—"প্রকৃতি" কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-পুস্তকাদি আজ বহুকালযাবৎ লিখিত হইয়া আসিতেছে। ডারউইন হক্সলীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর মত ভাবপ্রবণ জাতির মনেও প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় জগৎ সম্বন্ধে একটা সাধারণ অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তবে বর্ত্তমান শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত সেই অনুসন্ধিৎসা বিশেষ কিছু ফল প্রসব করে নাই। কোন উল্লেখযোগ্য

নূতন তথ্যের আবিষ্কারও হয় নাই, প্রকৃতিবিজ্ঞানের রহস্য সাধারণের অধিগম্য করিবারও কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। এই বিফলতার কারণ ঠিক উদ্যমের অভাব নহে। যথার্থ কারণ এই যে তখনকার দিনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহ আমাদের মনপ্রাণকে এমনই ভরপূর করিয়া রাখিয়াছিল, যে তাহার মধ্যে অপর কোন দুরূহ বিষয়ের ঠাঁই ছিল না। আজ, আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালীর উদ্যম ও প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সেই জন্যই জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এত আশান্বিত।

আলোচ্য পুস্তকখানি আমাদের বর্ত্তমান যুগের এই নানামুখী উদ্যমের নিদর্শন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলায় লিখিতে গেলেই প্রথম অন্তরায় পরিভাষার অভাব। বঙ্কিম, ভূদেবের যুগ হইতে নানা সময়ে নানা মনীষী পরিভাষা রচনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত হওয়ায় পরবর্ত্তী লেখকগণ কেহ বা তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা করেন নাই। আজ এই সমুদয় খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার সময় আসিয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর নিয়োগ করিয়া এই কার্য্যে রত হইয়াছেন। কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর কার্য্যক্রম কিরূপ, কি উপায়ে ইঁহারা আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন সে সম্বন্ধে আমরা ইতরজন কিছুই জানি না। আর কিছু না জানিয়া বঙ্গীয় জনসাধারণ উক্ত সিদ্ধান্তগুলি মানিয়া লইবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প।

পরিভাষা রচনার কোন বাঁধা ধরা পদ্ধতি নাই, আমরা স্বীকার করি। তবে খামখেয়ালী মানুষের দ্বারাও এ কার্য্য সুসাধিত হইবার নয়। কারণ একজনের বা দুইজনের খামখেয়াল অন্যলোকে ভক্তিভরে মানিয়া লইবে কেন! অন্ততঃ এদেশে লইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আতাতুর্ক কামালের কথা স্বতন্ত্র। তিনি একচ্ছত্রী ডিক্‌টেটর। তাঁহার হুকুমে লিপি বদলাই-তেছে, বানান বদলাইতেছে, নতুন অভিধান ব্যাকরণ লিখিত হইতেছে, নবীন তুর্কী ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের অবস্থা অন্যরূপ। বস্তুতঃ পরিভাষা একদিনে গড়িয়া উঠে না। কোন দেশে উঠে নাই। বহুদিন যাবৎ ব্যবহৃত শব্দগুলিকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইংরেজের দেশে রসায়ন চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে যবক্ষার বা সোরার নাম Nitri বা Nitrate of Potash বা Potassium Nitrate দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যথার্থ ইংরেজী শব্দ salt-petre (নোনা পাথর)কে আজও কেহ সরাইতে পারে নাই, পারিবেও না। আমাদের পরিভাষা রচনার সময়ে প্রথমেই বিবেচ্য যে লৌহ, পারদ, গন্ধক, অঙ্গার, কর্পূর, মনছাল, সেঁকো, নিশাদল ইত্যাদি বাঙ্গলা শব্দগুলির দশা কি হইবে, তাহারা গৃহীত হইবে না তাড়িত হইবে। দ্বিতীয় কথা, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, ব্রোমিন-এর মত শব্দ যেমন আছে তেমনি বাঙ্গলায় হওয়া উচিত, না এই সমস্ত পদার্থের অনুবাদমূলক নূতন নাম-করণ হওয়া উচিত :—যথা উদজন, অম্লজন, হরিতীন, পুতীন ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ অপেক্ষাকৃত সরল বিদেশী শব্দ গ্রহণ করা হইবে কি না? অর্থাৎ gas, acid ইত্যাদি ব্যবহৃত হইবে না বায়বীয় পদার্থ, দ্রাবক ইত্যাদির মত দুরূহ বা অপ্রচলিত বা শ্রুতিকঠোর শব্দ

প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান বা চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে চয়ন করিতে হইবে। তারপর, ঘরোয়া দেশজ বাঙ্গলা শব্দগুলিকে কি একেবারে অপাংক্তেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিব? অর্থাৎ কবজী, খুলী, ইত্যাদি সহজবোধ্য কথাগুলির স্থানে কি মণিবন্ধ, করোটী, ইত্যাদি ব্যবহার করিব। এ সম্বন্ধে মুসলমানদিগেরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে ত! তরুণ ছাত্রছাত্রীদের কি ইংরেজী কিডনী অপেক্ষা সংস্কৃত বৃক্ক শেখা সহজ হইবে? সমস্ত বিষয়টীর যত আলোচনা হয় ততই ভাল।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিভাষা রচনা পদ্ধতি অতি সুন্দর। তাঁহার প্রত্যেক সিদ্ধান্ত মানিয়া না লইলেও এ কথা পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহার যুক্তিতর্ক ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত। তিনি দেশাভিমানের বশীভূত হইয়া ইংরেজী শব্দমাত্রকেই বর্জ্জন করিতে বলেন নাই। খামখেয়ালের বশে নূতন উদ্ভট শব্দও চালাইতে চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গলা দেশজ শব্দগুলিকেও অবজ্ঞাভরে বহিস্কৃত করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মতামতের প্রতিও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা জানি এই তরুণ অধ্যাপক দুই তিন বৎসর যাবৎ প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা রচনার জন্য কিরূপ একাগ্র সাধনা করিয়া আসিতেছেন। বঙ্কিম, ভূদেবের যুগ হইতে অদ্যাবধি এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তৎসমস্তই তিনি অতুল অধ্যবসায় সহ সংগ্রহ করিয়াছেন। শুধু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা নহে। আলোচ্য গ্রন্থখানির প্রতি পৃষ্ঠা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকমণ্ডলীর মতামত গভীর শ্রদ্ধাসহকারে বিচার করিয়াছেন। বিচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও আপন মতামত প্রকাশ বিষয়ে সঙ্কোচ করেন নাই।

প্রত্যেক বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দটী লইয়া প্রথমে Monier Williams বা আপটের অভিধান হইতে তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিয়াছেন। পরে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী লেখকগণের রচনাতে ব্যবহৃত শব্দগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তার পর এই শব্দগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ বিচার করিয়া আপন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পন্থা আর কি হইতে পারে! উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী শব্দের উল্লেখ করিব। Heart অঙ্গটিকে সাধারণতঃ বাঙ্গলায় আমরা হৃৎপিণ্ড বলিয়া থাকি। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেকেই হৃৎপিণ্ড শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। মানুষের হৃদয় পিণ্ডাকার হইলেও এমন অনেক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী আছে যাহাদের হৃদয় Tubular অর্থাৎ নলের মত। জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "সুতরাং সমগ্র প্রাণিবিজ্ঞানের পক্ষে 'হৃৎপিণ্ড' অচল না হইলেও ভ্রমাত্মক অর্থ বা ভাব ব্যঞ্জনা করিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।" এই ভাবিয়া গ্রন্থকার হৃদয় শব্দটী মনোনীত করিয়াছেন।

আবার এমন শব্দও অনেক আছে যাহার ভাষান্তর করা হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ Nerve শব্দটীর উল্লেখ করিতেছি (৯১ পৃঃ)। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের প্রায় দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী ফিরিস্তি দিয়া গ্রন্থকার তাহার এইরূপ synopsis করিয়াছেন। পূর্ব্বে nerveএর পরিভাষা স্নায়ু প্রচলিত ছিল (এখনও আছে)। ইদানীং নাড়ী শব্দটী চালাইবার প্রচেষ্টাও হইতেছে।

অতঃপর স্নায়ু ও নাড়ী ও নার্ভ এই তিনটী শব্দের কোনটী গ্রহণীয় গ্রন্থকার তাহার ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী বিচার করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিতর্ক আমাদের ন্যায়ানুমোদিত বলিয়াই মনে হইয়াছে। সুশ্রুতের মতে স্নায়ুর অর্থ ligament বা বন্ধনী। নাড়ী শব্দের বাংলাতে একটা বিশেষ অর্থ হইয়া গিয়াছে pulse। অতএব এই দুইটী শব্দকেই গ্রন্থকার বাতিল করিয়াছেন। নার্ভ মূলতঃ ইংরাজী শব্দ হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রুতিকঠোর নহে। নাড়ী শব্দের সহিত উচ্চারণ-সাম্যও আছে। অতএব এই কথাটীকেই গ্রন্থকার মনোনীত করিয়াছেন। আর এক প্রকারের একটী শব্দের উল্লেখ করিতেছি। Kidney-র প্রাচীন প্রতিশব্দ বৃক্ক, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় বহুকাল যাবৎ মূত্রাশয়, মূত্রযন্ত্র ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এই শব্দ গ্রহণ করিলে bladder ও kidneyর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে—এই ভাবিয়া জ্ঞানেন্দ্র-বাবু সূচনা করিয়াছেন যে বৃক্ক বা কিডনী ইহার যে কোনটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। আমরা তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। মূত্রাশয়, মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি শব্দ নাম রূপে ব্যবহার না করিয়া বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। কেন না, ইংরেজীতেও ত কিডনীকে urinary organ বলিবার কোনও বাধা নাই!

আর অধিক উদাহরণ দিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। গ্রন্থখানি শুধু বৈজ্ঞানিক কেন, সকলেরই পড়িয়া দেখিবার মত। বাঙ্গলা ভাষায় আজ নানা বিষয়ে পুস্তক লেখা হইতেছে। পরিভাষা যে শুধু প্রাণি-বিজ্ঞানের বা অন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা ত নহে। ইতিহাস, রাষ্ট্র-নীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, এমন কি চিত্রকলারও, পরিভাষা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই কার্য্যে বহু লোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য বলিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় আপন কার্য্য আপন সুবিধামত করিবেন। কিন্তু বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত মাত্রেরই এ বিষয়ে একটা কর্ত্তব্য আছে। জ্ঞানেন্দ্রবাবু যে একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় সহ আপন কার্য্য করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা (প্রথম খণ্ড) ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য ডি. টি. এম. সঙ্কলিত : প্রকাশক দি বুক কোম্পানী লিমিটেড ৪।৩ বি কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা : মূল্য ৬৲।

আমাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। এই দুর্দ্দশার প্রধান ও অপ্রধান নানা কারণও বর্ত্তমান। ইহার মধ্যে একটি প্রধান কারণ জ্ঞানবিমুখতা। আমরা কোন জিনিষ ভাল করিয়া জানিতে চাহি না এবং কোন জিনিষ ভাল করিয়া না জানিয়াই সে সম্বন্ধে বিজ্ঞতার ভান করি এবং কেহ

আমাদের সেই ছদ্মবেশ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলে তাহার উপর চটিয়া যাই। সেই জন্য ভয় হইতেছে যে পশুপতি বাবুর এমন সুন্দর বইখানি এ দেশে হয়ত তত আদর পাইবে না। আমাদের দেশে রোগের অন্ত নাই কিন্তু ভাল চিকিৎসকের অভাব আছে। স্কুল-কলেজের ডিগ্রীধারী বহু চিকিৎসক আছেন যাঁহারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—যাঁহারা ব্যবসায়ী কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। ডিগ্রীধারী কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছাড়াও অনেক শহরে এবং প্রায় প্রতি পল্লী-গ্রামে অনেক 'কোয়াক্' অর্থাৎ অডিগ্রীধারী ডাক্তার প্রাক্‌টিস্ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ইংরাজী ভাষার জ্ঞানও অতি সামান্য। কোন কৃতবিদ্য ডাক্তারের কাছে কিছুকাল কম্পাউণ্ডাররূপে শিক্ষানবিশী করিয়া ইঁহারা চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং বহু রোগীর জীবন-মরণ ইঁহাদের উপর নির্ভর করে। এ দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে দশ পনের মাইলের মধ্যে এই কোয়াক্ ডাক্তার ছাড়া অন্য কোন ডাক্তারই নাই। সুতরাং আমাদের দেশে ডাক্তারী জ্ঞান প্রচার করার প্রয়োজন আছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে এখনও এ দেশে কু-চিকিৎসার জন্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, এমেবিক্ ইন্‌ফেক্‌শন প্রভৃতি চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধিতেই বহুলোক প্রতি বৎসর মারা যায়। ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর—টাইফয়েড, বলিয়া বহুক্ষেত্রে চিকিৎসিত হইতে দেখিয়াছি। কোলাই ইন্‌ফেক্‌শন যক্ষ্মা বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে কৃতবিদ্য চিকিৎসকের হাতেই এই সব কাণ্ড অহরহ ঘটে। ভুল ভ্রান্তি অবশ্য সকলেরই হয়। কিন্তু যে সব ভুল সংশোধন করিবার সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সংশোধন না করা অন্যায়। পূর্ব্বে অনেক রোগ নির্ণয় করিবার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় ছিল না। অনেক রোগ নির্ণীত হইয়াও উপযুক্ত ঔষধের অভাবে সারিত না। আজকাল সে সব রোগ সুচিকিৎসিত হইতে পারে। কি করিয়া হইতে পারে আলোচ্য পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

এলোপ্যাথিক মতে ভারতীয় ব্যাধিগুলির কারণ, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক পরিচয়, রোগ নির্ণয়ের বিজ্ঞানসম্মত উপায়, এই ব্যাধিগুলির সম্পর্কে যে সব মনস্বী গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ প্রভৃতি সহজ অনাড়ম্বর বাঙলা ভাষায় একত্রে গ্রথিত করিয়া ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্ঞানপিপাসু বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই বিষয়ে এমন একখানি সুলিখিত গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় আর আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

এই পুস্তকে "রোগের বীজ", "রোগের বাহন", "রোগের ক্ষেত্র" প্রভৃতি অধ্যায়ে ডাঃ ভট্টাচার্য্য স্বচ্ছ ভাষায় অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি অতিশয় প্রাঞ্জল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বীজাণুগুলির সহিত রোগের কি সম্পর্ক, বীজাণুগুলির শ্রেণীবিভাগ, বীজাণুগুলিকে জ্বরের কোন অবস্থায় ধরা যায়, রক্তাদি পরীক্ষা করিবার রীতি সহজ বাঙলা ভাষায় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তারী বিষয় যে এমন চমৎকার করিয়া বাঙলায় লেখা যায় পশুপতি বাবু তাহা হাতে কলমে দেখাইয়া দিয়াছেন।

'জ্বর-পরিচয়' এবং 'জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা'—এই অধ্যায় দুইটি এই পুস্তকের অতি মূল্যবান অংশ। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ডাক্তার ইহা পড়িয়া উপকৃত হইবেন। আমি অন্তত হইয়াছি এ কথা আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি। 'বসন্তরোগ' ও 'ব্লাকওয়াটার ফিভার' সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে।

ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার ফিবার, কালাজ্বর, টাইফয়েড জাতীয় জ্বর, কোলাই বীজাণুর জ্বর, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাসের জ্বর, ষ্টাফাইলোকক্কাসের জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ, রিউমাটিক ফিবার, ডেঙ্গু, সর্দ্দিকাসি জ্বর ও নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মেনিন্‌জাইটিস, পেলিওমায়েলাইটিস্‌ এন্‌কেফালাইটিস, বসন্তরোগ, ফাইলেরিয়া ও তৎঘটিত অন্যান্য উপসর্গ, ইঁদুর কামড়ানো জ্বর, তাত-লাগা (হিট ষ্ট্রোক)—এই বিষয়গুলি অতি নিপুণভাবে অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য মণ্ডিত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

'ম্যালেরিয়া', 'কালাজ্বর'—বিশেষ করিয়া এই ব্যাধি দুইটি এত বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে যে ইহা পড়িলে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করা যায়। অন্য কোন পুস্তক আর না পড়িলেও চলে। ম্যালেরিয়ার মহৌষধ কুইনাইনের আবিষ্কার, গুণাগুণ, প্রয়োগ-প্রণালী অতিশয় সুষ্ঠুভাবে লিখিত হইয়াছে।

এই বহিখানিতে আর একটি মূল্যবান জিনিষও আছে। জ্বরের পথ্য কতপ্রকার হইতে পারে এবং সেগুলি কি করিয়া সহজভাবে যে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে প্রস্তুত করা যায় তাহার বিস্তৃত এবং প্রয়োজনমত সচিত্র বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। আরোগ্য অবস্থার পথ্য, জ্বরের পরিচর্য্যা, আরোগ্য অবস্থার সাবধানতা—পশুপতি বাবু বহিটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে কিছুই বাদ দেন নাই এবং তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

এমন একখানি সুলিখিত, সুপ্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পুস্তকের সমাদর হওয়া উচিত। যদি না হয় তাহা হইলে এ দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

বহিখানির ছাপা সুন্দর। বাঁধাই বেশ মজবুত ও শোভন। প্রায় ৬০।৬৫ খানি বিষয়োপযোগী সুমুদ্রিত ছবি আছে। সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে ৬৲ দাম কম বলিয়াই মনে হয়। এই আকারের এই জাতীয় ইংরাজী পুস্তকের দাম ১৫৲ টাকার কম নয়।

ডাঃ নীলরতন সরকার ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুইজনে দুইটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্যকে যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাহা মোটেই অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইতেছে না।

এইরূপ একটি শ্রমসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য উৎসুক রহিলাম।

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

রাজহংস—শ্রীসজনীকান্ত দাস। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা। দেড় টাকা।

শক্তিশালী লেখক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস একদা 'অতি-আধুনিক' তরুণ সাহিত্যিকদের সংহারকল্পে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া গদ্যে ও পদ্যে সুতীব্র রচনা প্রকাশ করিয়া খ্যাতি—বিশেষণ বর্জ্জন করিয়া বলিতেছি—অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রধান অভিযোগ ছিল কুরুচি, এবং এই অভিযোগের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি গদ্য বা পদ্য যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা রুচির উৎকর্ষে না হইলেও রচনার উৎকর্ষে নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু তবু তাহা ছিল সাময়িক রচনা। পড়িয়া কেহ তারিফ করিত, কেহ করিত না, কিন্তু একথা বোধহয় কেহ মনে করে নাই যে এই জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে ভাবী কালের অমৃতের খোরাক হইয়া বিরাজ করিবে।

এই সকল কথা আজ প্রাচীন ইতিহাসের পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু তবু ইহার উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নহে, কেননা খ্যাতনামা লেখক সজনীকান্তের আধুনিকতম পুস্তক 'রাজহংস' যে-বিবর্ত্তন-ধারার চরম পরিণতি তাহার আলোচনা বাংলা সাহিত্যের পাঠক, সমালোচক, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, এমন কি অন্যান্য লেখকগণের পক্ষেও, অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়। ক্ষুদ্র সমালোচনার পরিসরে ইহার সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব, তাই শুধু ইহার আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। কিন্তু সজনী-কান্তের দুইটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, সজনীকান্তের অসাধারণ এবং অতি সহজ ছন্দ-দক্ষতা। দ্বিতীয়ত, সকল তীব্রতা সত্ত্বেও তাঁহার কবিতায় স্থানে স্থানে যথার্থ গীতিকাব্যের স্ফুরণ। সজনীকান্তের 'পথ চলতে ঘাসের ফুল' যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই কথার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মতো অতি লঘু, সহজ ও অনিবার্য্য ইহার কবিতাগুলি, এবং যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের বিষয়বস্তু ব্যঙ্গরসাত্মক, তথাপি গীতি-কবিতার মর্ম্মস্থলে তাহাদের উৎস।

রাজহংসের কবিতার আর যাহাই গুণাগুণ থাকুক, তাহাদের বিরুদ্ধে লঘুত্বের অভিযোগ কেহ আনিতে পারিবে না। বিষয়বস্তুর গুরুত্বে তাহারা মর্য্যাদাবান্ এবং এই মর্য্যাদা ছন্দকেও স্পর্শ করিয়াছে। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর দুরন্ত প্রবাহ আজ মন্থর গতিতে পরিণত হইয়াছে এবং রবীন্দ্র-নাথ-প্রবর্ত্তিত অসম, অ-মিল ছন্দ আজ প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর একাধিক বেশে হইয়াছে সজনী-কান্তের কাব্যলক্ষ্মীর বাহন। কিন্তু, হায়, রাজহংসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আজ দেখিতেছি শুধু এই বাহনেরই গৌরববিস্তার, যাহাকে বহন করিতে হইবে পথমধ্যে সে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান কবি রাখেন না, রাখিবার জন্য কোনো ব্যগ্রতাও তাঁহার নাই। আপন কাব্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া কবি লিখিয়া চলিয়াছেন, কখনো রাজহংসের পক্ষবিস্তার:

উড়িয়াছে রাজহংস মেঘাস্তৃত সুনীল আকাশে,
দুই পক্ষ বিস্তারিয়া শূন্যে করি স্থিতির নির্ভর—
গতির নির্ভর করি আকাশের লঘু বায়ুস্তরে,...

কখনো সূর্য্যমুখীর মর্ম্মবেদনা ঃ

অবোধ সূর্য্যমুখী—
নিন্দা রটেছে, সূর্য্যের পানে চেয়ে কাটে দিন তার,
রবিহারা রাতি ঘুমের বিকারে কাটে...

কখনো রামবাগানের জাঁদরেল বাড়ি-উলির বর্ণনা ঃ

গোলাপী ভাড়াটে তার ;
শীতের দুপুরে এসে গেছে ওস্তাদ,
পান খায় আর পিক ফেলে, আর গান সাধে গলা ছেড়ে,
গোলাপী সে গরবিণী।

আকাশ পাতালের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কবি মানবের ও প্রকৃতির কোনো রহস্য তাঁহার কবিতা হইতে যাহাতে বাদ না পড়ে তাহার জন্য রাজহংসের পক্ষবিস্তার হইতে আরম্ভ করিয়া ওস্তাদের পানের পিক্ পর্য্যন্ত লঘু গুরু প্রীতিকর অপ্রীতিকর কোনো বস্তু বা অভিজ্ঞতারই বর্ণনা করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু কেহ যেন এই ভুল না করেন যে এই সকল অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি বিকৃত নৈতিক রুচির পরিচয় দিয়াছেন। সজনীকান্ত যদি পেট্রোল, পানের পিক্ বা পাপের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা শুধু সার্ব্বভৌমিক আধুনিকতার শিরোপা পাইবার জন্য—যে-আধুনিকতার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

কিন্তু বিষয়বস্তু যাহাই হউক তাঁহার রচনার একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাঁহার ছন্দ—পাঠকের মনকে এই ছন্দের স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করে না। কিন্তু এই স্পন্দন শুধু যন্ত্রের স্পন্দন, তাহাতে প্রাণের সাড়া নাই। তাই একই ধরণের ছন্দের ও ভাষার পুনরাবৃত্তিতে 'রাজহংস' অসহ হইয়া উঠে। মাঝে মাঝে দুই এক স্থানে সেই পুরাতন সজনীকান্তকে ক্ষণেকের জন্য পাওয়া যায়, যথা, 'তমসা-জাহ্নবী'র এই কয়টি পংক্তিতে ঃ—

আজ সখী, আপনারে ভুলাবনা আশার আলোকে ;
প্রেমের উৎসব শেষ ; আলোর উৎসাহ গেছে চলি'—
পর্ব্বতের গুহাগর্ভে ধূমে বহ্নি নির্ব্বাপিত প্রায় ;
তার কথা থাক্ আজি।

কিন্তু গীতি-কাব্যের এই দীপ্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই আবার :—

আলোহীন, শব্দহীন, দিশাহীন, স্তব্ধ অন্ধকারে
বিশ্রাম লভিব মোরা ; আলো আর শব্দের আঘাত

সহিতে পারে না প্রাণ ; আলো শব্দে লোভের সংঘাত—
চোখে লাগে, বাজে কানে; শিহরিয়া চমকিয়া উঠি,
খ্যাতির লালসে মন, তলে তলে উঠে গুমরিয়া,
আলোক ঝলসি ওঠে, প্রাণে প্রাণে হিংসার আকারে।

ইহা কবিতা নহে নিশ্চিত, বিজ্ঞান না দর্শন তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। রবীন্দ্রনাথের এত ব্যর্থ অনুকরণ আর কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না!

বাংলা দেশের কবিদের মধ্যে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অসাধারণ ছন্দ-নৈপুণ্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্যরস অপেক্ষা ছন্দই তাঁহার রচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া তিনি কোনো দিনই প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া গণ্য হইবেন না। কিন্তু একথা অস্বীকার্য্য যে সত্যেন্দ্রনাথ যাহা লিখিতেন তাহা একান্তই তাঁহার স্বকীয় প্রেরণায় এবং আপন মনের সহজ আনন্দে। যদি প্রথম শ্রেণীর কবিতা তিনি না লিখিয়া থাকেন, তাহার জন্য দোষ তাঁহার ছন্দ-নৈপুণ্যকে দিলে চলিবে না—তাহার একমাত্র কারণ তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

সজনীকান্তের সহিত সত্যেন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে সজনীকান্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহা মনের আনন্দে লেখা নহে, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা কৃত্রিম ও প্রাণহীন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাহিত্যের আসরে আপন মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা, তাই তাহা একান্তই পরমুখাপেক্ষী। এই পরমুখা-পেক্ষিতার বশেই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয় আজ রাজহংসে আরোহণপূর্ব্বক অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বেশে গম্ভীর বদনে বাংলাদেশের পাঠকবর্গের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া প্রাণপণে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে তিনি আদার (ও লঙ্কার) ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি অর্ণবপোত কিম্বা বোধহয় বিমানের দালালী আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে বিমানের বায়না দেওয়া না হউক, অভিজাত সাহিত্যের পংক্তি-ভোজন হইতে যেন বাদ দেওয়া না হয়।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

যৌন-বিজ্ঞান—আবুল হাসানাৎ আই, পি, কর্ত্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য—৪।৷৹ টাকা।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্যের দিক দিয়ে এই বইখানিকে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-পুস্তকের সংখ্যা এখনো খুবই কম। তথাকথিত স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানের বই অনেক আছে, কিন্তু সে সব ছেলেভুলানো লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের ভাগ খুবই কম, এবং যাও থাকে তাও বিকৃত। বাংলা অক্ষরের মধ্যে কিছু দুর্ব্বলতা আছে কি না জানি না, কিন্তু এই অক্ষরগুলি দিয়ে বিজ্ঞানের কথা কিছু লিখতে গেলেই অতি বড় বৈজ্ঞানিকও

অবৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েন, সত্যপ্রকাশের নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলেন, কেমন অসংযত হ'য়ে পড়েন, এবং নানারকম বাজে কথা লেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফলে বিজ্ঞান রচনা আর হয় না, হ'য়ে ওঠে এক খিচুড়ি। সুতরাং যৌন ব্যাপার নিয়ে বাংলা ভাষায় যে সত্যিকার বিজ্ঞান-পুস্তক দেখতে পাওয়া যাবে এটা আমরা আশা করতে পারি নি। পাশ্চাত্য দেশে মানুষের যৌনবৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ওটা গোপনীয় বস্তু এবং কেবল রসসাহিত্যের মধ্যেই ও বস্তুর অস্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে যৌনবিজ্ঞানের নাম দিয়ে কয়েকখানা বাংলা বই বাজারে বেরুতে দেখা গেছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো গুণই তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই বইখানি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি এই জন্য যে এতে যৌনব্যাপারের মত এমন উত্তেজনাপ্রদ জিনিষ নিয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অথচ উত্তেজনার অবকাশ কোথাও নেই, আগাগোড়া সংযত ভাবে সত্যের বিবৃতি করা হয়েছে, যেমন বিজ্ঞান রচনার নিয়ম; অথচ যিনি বইখানি লিখেছেন বিজ্ঞান তাঁর পেশা নয়, কেবলমাত্র জ্ঞানের নেশায় তিনি কঠোর পরিশ্রম ক'রে বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি এক সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন। এ বড় কম কথা নয়। লোভের কথা নির্লিপ্ত ভাবে বলে যেতে পারে কেবল বৈজ্ঞানিকে, অন্য জনের পক্ষে তা দুঃসাধ্য। লেখক সেই দুঃসাধ্য সাধনায় কৃতকার্য্য হয়েছেন।

বইখানিতে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই ঃ—যৌনবোধ সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাস, যৌনবোধের সংজ্ঞা, যৌন ইন্দ্রিয়, যৌনবোধের প্রকৃতি, যৌনবোধের বিকাশ, যৌনবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ, বেশ্যা-প্রথা, দাম্পত্য জীবন, দম্পতির রতিজীবন, প্রজনন, জন্মনিয়ন্ত্রণ, ইউ-জেনিক মতবাদ, ইত্যাদি। সমস্তই জটিল বিষয়, কিন্তু সমস্তগুলিই খুব সরল ভাবে আলোচিত হয়েছে।

বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু। ইনি বলেছেন, একে 'কাম-সংহিতা' বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। এঁর মত নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিনা কারণে এ সুখ্যাতি করেন নি। তা ছাড়া ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিক-চিকিৎসক এবং আরো কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেছেন।

আলোচ্য বইখানি সর্ব্বাংশে সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কয়েকটি সামান্য দোষের কথা আমাদের উল্লেখ করবার আছে।

গ্রন্থকার তাঁর 'মুখবন্ধে' প্রথমেই লিখেছেন—"যে সমস্ত কারণে আমি এই পুস্তক প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি, তন্মধ্যে কৌতুহল এবং অনুসন্ধিৎসাই প্রধান। আমি শৈশব হইতেই অতি-প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের অর্থ আবিষ্কারে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দুর্নিবার কৌতুহল অনুভব করিতাম। ঝাড়ফুক, যাদুমন্ত্র, প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও তাহাদের অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য নানাপ্রকার সাধ্যসাধনাও করিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি সুফীবাদ

সম্বন্ধে একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলাম……" ইত্যাদি। এই সকল অবান্তর কথা এই বিজ্ঞানপুস্তকের ভূমিকায় লেখা লেখকের উচিত হয় নি। এতে পাঠকের মনে পুস্তকের ভিতর-কার মূল্যবান উপকরণগুলি সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে। বিজ্ঞানপুস্তকে ব্যক্তিগত ইতিহাসের কোনো স্থান নেই। আর বিজ্ঞানপুস্তক রচনার প্রধান কারণ কৌতূহলও নয়, অনুসন্ধিৎসাও নয়,—ওর প্রধান কারণ হচ্ছে জ্ঞান প্রচারের প্রেরণা। আশা করি উপরের কথাগুলি লেখক পরবর্তী সংস্করণ থেকে বাদ দিয়ে দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি ভুল কথা এই পুস্তকের মধ্যে দেখলাম। ৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্ব এই উভয়ের মিশ্রণেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।" তার পর ৪০৭ পৃষ্ঠায় আছে—"জরায়ুর দুই পার্শ্বে দুইটি অণ্ডাধার অবস্থিত। ঋতুকালে এই অণ্ডাধার ফাটিয়া অসংখ্য অণ্ড ডিম্ববাহী নলের ঝালরসদৃশ মুখে পতিত হইয়া নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে।" আবার ঐ পৃষ্ঠাতেই আছে—"প্রত্যেক নারী সাধারণতঃ মাসে দুই একটি মাত্র ডিম্ব স্খালন করিয়া থাকে।" দেখা যাচ্ছে লেখক 'অণ্ড' আর 'ডিম্ব' শব্দ সম্ভবতঃ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু একই পৃষ্ঠার মধ্যে দুবার দুরকম কথা বলেছেন। একবার বলেছেন 'অসংখ্য অণ্ড ফাটিয়া বাহির হয়', আবার তৎপরেই বলেছেন 'মাসে দুই একটি মাত্র ডিম্ব স্খালন হয়'। অথচ ৯০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন—"প্রতি সাতাইশ দিন আট ঘণ্টা অন্তর এক একটি (মাত্র) ডিম্ব পরিপক্ক হইয়া ডিম্বকোষ (এখানে অণ্ডাধার বা ডিম্বাধার শব্দ নাই) ফাটিয়া যায়।" সুতরাং পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, এর মধ্যে কোনটা যথার্থ? অসংখ্য ডিম্ব ফাটে, না দুই একটি ফাটে, না একটি মাত্র ফাটে? আর অণ্ডাধার থেকে ফেটে বেরোয়, না ডিম্বকোষ থেকে ফেটে বেরোয়? বস্তুতঃ আল্গা ভাবে এ সব কথা বলা উচিত নয় এবং যথেচ্ছামত শব্দ ব্যবহার করাও উচিত নয়। এখানে 'ডিম্বাধার' অর্থে যে 'ওভারী' এবং 'ডিম্বকোষ' অর্থে যে 'গ্রাফিয়ান্ ফলিক্‌ল্', তা পরিষ্কার করে দিলে ভাল হোতো। আর স্পষ্ট ক'রে একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে ওভারির মধ্যে প্রায় ৩০।৪০ হাজার oocytes বর্ত্তমান থাকে,—সেইগুলোই কালক্রমে গ্রাফিয়ান্ ফলিক্‌ল্ হয়, এবং এক একটি ফলিক্‌ল্ এক এক মাসে ফাটে, তার থেকে একটিমাত্র ওভাম্ (ডিম্ব) প্রসব হয়, এবং বহুসংখ্যক শুক্রকীটের মধ্যে একটি যদি তার সঙ্গে মিলিত হয় তবে তার থেকে একটি মাত্র সন্তান জন্মায়। ওভারির মধ্য থেকে অসংখ্য অণ্ডও কখনো কেটে বেরোয় না, আর 'ঋতুকালে'ই যে তা ফাটবে সে কথা ঠিক নয়। সাধারণতঃ দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তীকালে (inter-menstrual period) এক একটি ওভাম্ প্রসব হয়, এবং তার ১০।১২ দিন পরে ঋতুর আবির্ভাব হয়। Ovulation আর menstruation সমসাময়িক প্রক্রিয়া নয়।

এমনি টেক্‌নিক্যাল ভুল আরো কয়েক জায়গায় আছে। যেমন ২৬৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় গণোরিয়া রোগ সম্বন্ধে লিখিত আছে—"দূষিত-যোনি বেশ্যা-সহবাসেই এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্য কোনও কারণে নহে।" এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক কথা। 'বেশ্যা' ব্যতীত আর

কারো দ্বারা এই রোগের সংক্রমণ হবে না সে কথা কখনো বলা যায় না। যার শরীরেই রোগের বীজাণু আছে তার দ্বারাই ও-রোগ সংক্রামিত হবে, এই কথাই বলা উচিত। আর গণোরিয়াকে 'ঔপসর্গিক মেহ' নাম কেন দেওয়া হয়েছে তা বোঝা গেল না। ঐ নামে এ রোগকে লেখক ছাড়া কেউই চিনবে না, কিন্তু গণোরিয়া বললে আপামর সাধারণ সকলেই অনায়াসে চিনবে। এটা একটা বিশিষ্ট রকম ব্যাধি এবং বিশিষ্ট বীজাণুর দ্বারা এর সৃষ্টি, সুতরাং একে 'ঔপসর্গিক' বলা কখনই উচিত নয়।

এর পর ২৬৮ পৃষ্ঠায় সিফিলিস্ বা উপদংশ রোগ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—"উপদংশ রোগ দুই প্রকার,—হার্ড্ শ্যাঙ্কার ও সফট শ্যাঙ্কার।" একেবারে মারাত্মক ভুল; সফ্ট শ্যাঙ্কারের সঙ্গে উপদংশ বা সিফিলিস্ রোগের কোনো সম্পর্ক নেই, ওটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাধি এবং স্বতন্ত্র রকমের বীজাণুব দ্বারা সৃষ্ট। ওটা এক প্রকার 'ভিনিরিয়াল্' ব্যাধি বটে, কিন্তু উপদংশ নয়।

তারপর ঐ পৃষ্ঠাতেই আছে—"দূষিত যোনি রমণীর সহিত সহবাস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর অঙ্গ ধৌত না করা অথবা ক্ষার মিশ্রিত জলে অঙ্গ ধৌত করা, এই সমস্ত কারণে উপদংশ রোগ জন্মে।" এও মারাত্মক ভুল। সিফিলিস্ বিশিষ্ট প্রকারের জীবাণু-ঘটিত ব্যাধি, এবং কেবলমাত্র ঐ জীবাণুর সাক্ষাৎ সংক্রমণ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়েই ও-রোগ জন্মাতে পারে না,—দূষিত রমণীর দ্বারাও না বা কোন রকম অত্যাচারের দ্বারাও না। দেশের জনসাধারণ এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নানারকম ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পোষণ করে, সুতরাং লেখকের এ বিষয়ে সাবধানে কথা বলা উচিত ছিল। এমন উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানপুস্তকে এই সব কথা পড়ে লোকে ঐ কথাই অভ্রান্ত সত্য রূপে মেনে নেবে, তাতে বই লেখার মহৎ উদ্দেশ্য একেবারেই বিফল হয়ে যাবে। এ-সকল রোগপ্রসঙ্গ এ-পুস্তকে উত্থাপন না করলেও চলতো, কিন্তু যখন করা হয়েছে তখন তা নির্ভুল ভাবেই করা উচিত।

আরো একটি বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে। লেখক এই পুস্তকে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তার অধিকাংশই লেখকের নিজের সৃষ্টি। এতে লেখকের কৃতিত্ব থাকতে পারে কিন্তু পাঠকের পক্ষে এতে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করতে হয়। যে সকল ইংরেজী শব্দেব বদলে বাংলা পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তার অনেকগুলিব সঙ্গেই আজকালকার বাঙালী পাঠক অল্প বিস্তর পরিচিত। ইংরেজী নামগুলো তাঁদের কাছে যত সহজ, পারিভাষিক নামগুলো তেমন সহজ হয় নি, বরং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। Pubic hair বলতে যা বোঝায় যৌনকেশ বললে তা বোঝায় না, বরং একটা জটিলতার সৃষ্টি করে। Erotic zones বল্লে যা বোঝা যায়, যৌন প্রদেশ বললে ঠিক তা বোঝায় না। যৌন-বিকল্প (Perversion) এবং যৌন-নির্ব্বিশেষত্ব (Promiscuity) প্রভৃতি শব্দ নিতান্তই কষ্টকল্পিত। ফ্যালোপিয়ান টিউবকে ডিম্ববাহী নল এবং ক্লিটোরিস্‌কে ভগাঙ্কুর বলায় কোনোই লাভ নেই। পুস্তকের বিষয়বস্তু যে উপায়ের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য হয় বিনা দ্বিধায় সেই উপায় অবলম্বন করাই উচিত, পরি-

ভাষার গোঁড়ামি রক্ষা করতে গিয়ে পাঠকের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়ে কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া কতকগুলো অস্বাভাবিক পরিভাষা নিয়ে লেখকও অনেক সময় তাল সামলাতে পারেন না, সেগুলো প্রয়োগ করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেন। এর উদাহরণ পূর্ব্বে দেখানো হয়েছে। আর মোটের উপর প্রত্যেক গ্রন্থকারের আপন আপন পরিভাষা রচনায় কোনো সার্থকতা নেই, কারণ সাধারণে সেগুলোকে গ্রহণ করতে চায় না। ইংরেজী যে সকল নামের কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, আপাততঃ তার ইংরেজী নামগুলোই ব্যবহার করা উচিত, যতদিন পর্য্যন্ত তার সর্ব্বানুমোদিত পরিভাষা না জন্মায়। কিম্বা নিতান্তই যদি নূতন পরিভাষা ব্যবহার করতে চান, তা হলে প্রত্যেক বার তার পাশে পাশে ইংরেজী প্রতিশব্দটি ব্রাকেটের মধ্যে উল্লেখ করে দেওয়া উচিত, তাতে পাঠকের বোঝবার পক্ষে কষ্ট হয় না। পাঠকের সুবিধাই লেখকের আগে দেখা দরকার।

আমরা যে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করলাম তা বইখানির প্রয়োজনীয়তা ক্ষুণ্ণ করবার জন্যে নয়, ভবিষ্যতে যাতে এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হয় কেবল সেই উদ্দেশ্যে। এই সকল সামান্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পুস্তকখানি সত্যই মূল্যবান এবং অনেক শেখবার জিনিষ এর মধ্যে আছে। অনেক পরিশ্রম না করলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির যৌন রীতিনীতি এবং যৌন চরিত্র সন্নিবেশ করা যায় না এবং শিক্ষণীয় যৌন বিষয়গুলি সম্পূর্ণ ভাবে পরিবেশন করা যায় না। লেখক সেই কার্য্যই করেছেন, এবং এ পরিশ্রমের একটা সুফল নিশ্চয় আছে। আমরা কেবল এই বলতে চাই যে তাঁর পরিশ্রম এখনো শেষ হয়নি, এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণ যাতে সর্ব্বাংশে নির্ভুল হয়, এখন থেকেই তাঁর সে চেষ্টা করা উচিত।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

অপরিচিতা—রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। কারেণ্ট পাব্লিশিং হাউস।
মজনু—বাসবেন্দ্র ঠাকুর। ফিউচারিষ্ট পাব্লিশিং।
প্রেম—তুলসী দেবী, পারুল দেবী, পীযূষকান্তি। ষ্টাণ্ডার্ড বুক ষ্টল্।
নতুন কবিতা—হরপ্রসাদ মিত্র, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়। বনফুল সাহিত্য সমিতি।

ওপরের চারখানি কবিতার বইয়ে আট জন নবীন লেখক লেখিকার রচনা স্থান পেয়েছে। বাজারে কবিতার বই কাটে না; কাজেই প্রকাশকও সাহস ক'রে কবিতা প্রকাশে অগ্রসর হন্ না—কবিতা শুধু সাময়িক পত্রিকার ফাঁক পূরণের কাজে লাগে। এ অবস্থায় এক সঙ্গে চার চার খানা কবিতার বই প্রকাশিত হতে দেখে সত্যিই বিশেষ আনন্দ হল—কিন্তু এই আনন্দ বইগুলির অন্তর্সম্পদে পরিপুষ্ট হলে আরো খুসী হ'তে পারতাম।

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে প্রথম তিনখানিতে আছে গতানুগতিক প্রেমের কবিতা—অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের চির পরিচিত দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুপাতের জারকরসে পুষ্ট এই কবিতাগুলোর মধ্যে বিশেষত্বের চিহ্ন কুত্রাপি সুলভ নয়। এদের সুদৃশ্য মলাট এবং ততোধিক সুদৃশ্য ছাপার অন্তরাল থেকে যে তরুণ তরুণীদের চিত্ত উঁকি দিয়েছে, তা এতই কাঁচা এবং এতই অকর্ষিত যে মনে হয় একমাত্র সৌখীন করতালির লোভেই লেখকরা অর্থ ব্যয় ক'রে বইগুলি বাজারে ছেড়েছেন। বস্তুতঃ যে রসিক ভদ্রলোক তাঁর বেয়াড়া ছেলেকে বলেছিলেন, "বাপুরে লেখাপড়া না শিখিস্ ত অন্ততঃ একটা কবিই হ', যে বংশের মুখ থাকে" তিনি প্রকারান্তরে যে তরুণ বাংলার এই কবি-যশঃপ্রার্থী মনোভাবকেই ইঙ্গিত করেছিলেন, সে কথা ক্রমেই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

প্রথম বইয়ের প্রত্যেকটি কবিতাই প'ড়বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে হাল্ ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'য়েছি। 'অন্যথা মানস-পুতলি', 'সোণালী পথের চৌমাথা', 'জ্যোৎস্না শতধা', 'ঝরা মুকুলে সাজে পুলোকে (?)', 'শত আহরি আলো চুম্‌কি' ইতি চটকদার কথা পাতায় অজস্র আছে, কিন্তু ছন্দ-সঙ্গতি এবং অর্থ-সঙ্গতির অভাব সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় বইয়ে 'হাঁড়িয়ার হাঁড়ি কাড়িয়া ক'রেছি পান' আছে, 'সুর্কি বিছানো তুর্কি' আছে, 'সিরিয়ার বুক চিরিয়া' আছে—আর আছে অসংখ্য অসংলগ্ন কাম-ক্লিষ্ট প্রলাপোক্তি! তবে একটা কবিতা আমার ভালো লেগেছে, সে হ'চ্ছে আটত্রিশ পৃষ্ঠার কবিতাটি—আর সমস্ত বইটির ভেতর দিয়ে কণ্টকিত অনুপ্রাস ও অর্থ-হীনতার উজান কাটিয়েও একটি সকরুণ পথ-যাত্রার সুর বেজেছে, যা মোটের ওপর মন্দ লাগেনি। তৃতীয় বইয়ের পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় আগেকার বই 'বেদুইনে' কিছু শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে-ছিলেন—একটি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী তাঁর তৎকালীন রচনায় প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বই সে সম্ভাবনীয়তাকে নির্ম্মূল ক'রে দিয়েছে। বর্ত্তমান বইয়ের অপর দুই মহিলার রচনা সম্বন্ধে কোন কথাই বল্‌তে ইচ্ছা করি না। তবে এটা ঠিক যে কোন কবিতাই বিশেষ উপভোগ্য মনে হয়নি। মলাটের ছবিও সুরুচির পরিচায়ক নয়।

চতুর্থ বই "নতুন কবিতা" সম্বন্ধে বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো। এই চটি বইখানি প'ড়ে একটু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়—আধুনিক সমালোচকের পক্ষে এও বড় কম কথা নয়। তিন জন লেখকই নবীন এবং তিন জনেরই কবিতার হাত আছে—এঁদের মধ্যে প্রথমের রচনা বেশ আশাপ্রদ। তবে এঁদের অবলম্বিত গদ্যভঙ্গী সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গদ্য টেক্‌নিকের সঙ্গে সম্ভবতঃ বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধ ঘনিষ্ট, নচেৎ গদ্যের সার্থকতা কি? এই সমস্ত কবিতা ছন্দেও লেখা যেতো এবং তাতে কিছুমাত্র রসের হয়নিও হ'ত কি না সন্দেহ—এই বইয়ের 'নীলপাখী' কবিতাটাই ধরা যাক্। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত যে কোন জিনিষই সর্ব্ব-সাধারণের অন্ধ অনুকৃতির বিষয় হ'য়ে ওঠে, এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

The Letters of John Keats—Edited by Maurice Buxton Forman (Oxford)

ফরম্যান্-সম্পাদিত কীট্‌স্-এর পত্রাবলী এর পূর্ব্বে দু' খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিলো। দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক নূতন পত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। কীট্‌স্-এর চিঠি আগে এমন ধারাবাহিক অথবা সুসংবদ্ধ ভাবে ছাপানো হয়নি। যাঁরা সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে নজর দেন, তাঁরা হলেন সিড্‌নি কল্‌ভিন ও হ্যারি ফরম্যান্। কল্‌ভিনের নাম ইংরিজি সাহিত্যে সুপরিচিত। তিনি শুধু কীট্‌স-এর কাব্যের সুদক্ষ সমালোচক নন্, কবির পত্রাবলী সম্পাদনাও তিনি করেছেন, কিন্তু ফ্যানি ব্রন-কে লেখা চিঠিগুলি তাঁর সংস্করণে স্থান পায়নি। হ্যারি ফরম্যান-ই ১৮৯৫ সালে সর্ব্বপ্রথমে ফ্যানি ব্রন-সম্পর্কিত চিঠিগুলি সম্পাদিত করেন। কীট্‌স্-এর পত্রাবলী ছিলো তাঁর আজীবন গবেষণার বস্তু। মরিস ফরম্যান্ তাঁর পৈতৃক নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখে এই সংস্করণটিকে আরো পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত করেছেন।

য়ুরোপীয় সাহিত্যে পত্রাবলীর যে স্থান ও সমাদর, আমাদের দেশে তা' বিরল। বাংলা সাহিত্যের পুরা-কথা এমন কিছু প্রাচীন নয়, যার যথাযথ বিবৃতির জন্য কবি অথবা সাহিত্যিকদের চিঠি ও ডায়েরী অনুসন্ধান করতে হয়। য়ুরোপীয় সাহিত্য অথবা ইতিহাসে চিঠির মূল্য অনেকখানি এবং সে হল একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। অষ্টাদশ শতাব্দী ছিলো পত্র-সাহিত্যের যুগ এবং সে সব পত্র বেশীর ভাগ লিখতেন উচ্চ বংশের মহিলারা। তাঁরা যে অভিজাত সম্প্রদায়ে ঘুরতেন ও মিশতেন, তাঁর মধ্যে যে সংকীর্ণতা অথচ সূক্ষ্ম রসবোধ ছিলো, তার একটা সত্যকল্প পরিচয় পাই ঐ চিঠির সাহায্যেই। এই সম্পর্কে মাদাম সেভিনী ও মাদাম ডার্বেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংযত লেখনীতে তাঁরা যে অতি উপাদেয় 'গসিপ' পরিবেশন করে গেছেন তার সন্ধান পরবর্ত্তী যুগের পত্রাবলীতে মেলে না।

কবি অথবা সাহিত্যিকদের পত্র রচনার কথা উঠলে সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে কুপার ও চেষ্টারফিল্‌ডের কথা। পাঠ্যপুস্তকের গন্ধ মেশানো বলে বোধ হয় এঁদের পত্র তেমন জনপ্রিয় অথবা হৃদয়গ্রাহী নয়, যদিও তার মধ্যে অনেক সারবান্ তথ্য নিহিত আছে। তাঁদের পরবর্ত্তী অল্পবিস্তর সকল বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকেরই চিঠি আছে কিন্তু পত্রাবলী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে মাত্র কয়েক জনের। বর্ত্তমান যুগে লরেন্স ও ক্যাথরিন্ ম্যান্‌সফিল্‌ডের চিঠির সুনাম বেশী। এঁদের ঠিক সামাজিক জীব বলা যায় না, তবুও সমাজের কথা, বিশেষ করে যে পরিস্থিতির মধ্যে এঁদের মন ও চরিত্র অন্তর্দ্রোহী বিরোধের সুরে ফুটে উঠেছে তার পরিচয় আমরা তাঁদের পত্রের মধ্যে পেয়ে থাকি। আর পাই লরেন্স-এর অ-সামান্য স্বকীয় প্রতিভা ও সততানিষ্ঠা এবং ক্যাথরিন-এর চরিত্রের দৃঢ়তা ও মনের ঋজু দৃষ্টি। এই সব সাহিত্যিকদের রচনা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পত্রাবলীও পড়া উচিত, নতুবা তাঁদের চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ উপলব্ধি

সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে পত্র-সাহিত্যের সেরা হল রবীন্দ্রনাথের চিঠি। কিন্তু এখানে একটা কথা বোধ করি বলা চলে। তাঁর 'ছিন্নপত্র' তাঁর কবি-মনের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও কাব্য-রচনার উৎকৃষ্ট ভাষ্য। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' সরসতায় ও সরল অবলীলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা যেতে পারে। তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি'তে পাই একটি ভিন্নমার্গ বিদেশীয় সংস্কৃতির সূক্ষ্ম ও সজাগ সমালোচনা। কিন্তু তাঁর প্রকাশিত পত্রাবলীতে কাব্যিক আবরণের পিছনে লুকানো আসল মানুষটির রূপ সহজে মেলেনা। তাঁর চিঠিতে পাবো প্রকৃতির বিচিত্র লীলা আর কবি-মনের অফুরন্ত খেয়াল, কিন্তু পাবো না খোশ খবর অথবা ব্যক্তিগত অন্য কিছু, যা' জানতে পেলে মন উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাঁর পত্র সাহিত্যের মণি-বিশেষ, কিন্তু পত্র-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ হলেন নিরাসক্ত, সংযত ও সাবধানী লেখক।

কীট্‌স-এর কাব্যের অনেক অভিজ্ঞ ও ব্যুৎপন্ন সমালোচক আছেন। ম্যাথু আরনল্ড, স্যুইনবার্ন থেকে আরম্ভ করে কলভিন, সেলঁক্যুর, ব্রাডলি, ব্রিজেস্ প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর কবিতার বিচার করেছেন। কিন্তু কীট্‌স্-এর চিঠি সম্বন্ধে সে কথা ঠিক বলা চলে না। মাত্র দু চার জন সমালোচক যা' বিচার করেছেন, তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনে হয়না এবং তা থেকে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। তা ছাড়া ইংরেজী ভাষায় পত্র লেখকের মধ্যে কীট্‌স্-এর স্থান কোথায়, তা নিয়েও অনেক মতদ্বৈধ আছে।

আমার ত মনে হয় ব্যক্তিগত পত্র-সাহিত্যের মধ্যে কীট্‌স্-এর চিঠিগুলি প্রায় অতুলনীয় বলা চলে। কীট্‌স্-এর প্রতিভা ও তাঁর কাব্যের স্বরূপ তাঁর কবিতা পাঠেই বোধগম্য হলেও, তাঁর ব্যক্তিগত আশা, ভরসা, কল্পনা ও খেয়াল জানতে হলে এবং সর্ব্বশেষে তাঁর হৃদয়বৃত্তি ও কবি মনের নিয়ত প্রকাশোন্মুখ পরিণতি বুঝতে হলে তাঁর চিঠি না হলে চলে না। Hyperion, Odes এবং আরো অন্যান্য কবিতাগুলির রসোপলব্ধি অবশ্য চিঠির সাহায্য ছাড়াও সম্ভব; কিন্তু Endymion, এবং কয়েকটি পূর্ব্বেকার অথবা সমকালিক কবিতা উপভোগ করতে হলে কীট্‌স্-এর পত্রগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁর কবিতায় তাঁর মনের ও চিন্তার যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়, তা আরো স্পষ্ট প্রতিভাত হয় চিঠিগুলিতে। তা ছাড়া, আগেকার যুগে কীট্‌স্-এর চারিত্র্য সম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ছিল, সেটা দূর হয় চিঠিগুলো পড়লে। তিনি যে মাত্র দুর্ব্বলহৃদয় ভীরু ও ভাবপ্রবণ মানুষ ছিলেন না, যাঁকে বিরুদ্ধ সমালোচনার আঘাতে ভূমিসাৎ করা হয়েছিলো, কিংবা শুধুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর উপাসক ছিলেন না, যিনি মদিরা ও ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত্তের উন্মাদনায় আসক্ত, এ কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় তাঁর পত্রাবলী থেকে। জীবনের শেষ চার পাঁচ বছর ধরে এ চিঠিগুলো লেখা হয়েছিলো এবং পঁচিশেই যাঁর জীবনে যবনিকা পড়েছিলো, তাঁর পত্র-রচনায় তাঁর দুর্ব্বলতা ও দোষ ধরা পড়তে বাধ্য। কিন্তু মোটের ওপর তাঁর পত্র তাঁর চরিত্র-গুণই সূচিত করে। তাঁর হৃদয়ের প্রসার ও মহত্ত্ব এবং উচ্চ শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও বুদ্ধির বিকাশ তাঁর পত্রের ছত্রে পরিস্ফুট। আরনল্ড কীট্‌সের মনুষ্যত্ব ও চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু শেলীর

কাব্যালোচনায় তাঁর ব্যক্তিগত মতামত যেমন পক্ষপাত-দুষ্ট, ফ্যানি ব্রন্-কে লেখা কীটসের চিঠিগুলির প্রতিও তিনি তেমন সুবিচার করেন নি ; বরঞ্চ অবিচারই করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ফ্যানির প্রতি কীট্সের আসক্তির দুর্ব্বোধ্যতা অঙ্গীকার করেও, আরনল্ড কীট্স্-এর চরিত্রে অপরাপর গুণের যথাযথ প্রশংসা করে বলেছেন কবি 'had flint and iron in him'। সত্যিই তাই! কীট্স্ একজন মস্ত সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁর হৃদয় স্নেহ-বৎসল ছিলো। কিন্তু তবুও তাঁর চিঠির মধ্যে তিনি বন্ধুদের সম্বন্ধে, নিজের রচনা সম্বন্ধে এবং বাইরের সমাজের সাহিত্যিক সম্প্রদায় সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোলরিজ ও তাঁর কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে কীট্সের মন্তব্য পরম উপভোগ্য ও সমালোচনাপূর্ণ। শেলীর সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময়ের কথা প্রসিদ্ধ। Endymion পড়ে শেলী কীট্সের কবি-প্রতিভার সুখ্যাতি করে' তাঁর কাব্যে একটা অর্থহীন, অস্ফুট উচ্ছ্বাসেব কথা উল্লেখ করেছিলেন। কীট্সের প্রত্যুত্তর (Letter 227) পড়লে বোঝা যায় শেলীর প্রতিভা সম্বন্ধেও তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো এবং তার দোষগুণ সম্বন্ধে কীট্স্ বেশ ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন। শেলীর প্রশংসা তিনি বেশ নির্ব্বিকাব চিত্তেই প্রত্যর্পণ করে বলেছিলেন—"My imagination is a monastery, and I am its monk"। ওযার্ডস্ওয়ার্থ-এর প্রতিভা এবং মিলটনের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায়, তা কীট্স্ বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন। রেনল্ডস্-কে ও উডহাউসকে তিনি যে চিঠি লিখেছেন (No 63 ও No 93) তাতে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের দার্শনিকতা এবং egotistical sublime নিয়ে মৃদু রসিকতা করলেও কবির যথোচিত মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হন্নি। তারপর মিল্টনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—"Milton ...did not think into the human heart, as Wordsworth has done—Yet Milton as a Philosopher, had sure as great powers as Wordsworth"—মিলটনের প্রভাব শেষ পর্য্যন্ত কীট্সের জীবনে টেঁকেনি এবং শেক্স্পীয়রের প্রভাব জয়ী হয়েছিলো কি ভাবে ও কোথায় তা' মিডলটন ম্যরী তাঁর গ্রন্থে The Return to Shakespeare শীর্ষক অধ্যায়ে বিশদরূপে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্যিক আদর্শের কথা বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই অন্ততঃ একটা দিক্ থেকে কীট্স ও শেক্সপীয়রের মধ্যে সাদৃশ্য ছিলো। দুজনেরই শিক্ষা-দীক্ষা ছিলো না ভালো রকমের। য়্যুনিভার্সিটি উইট্স-এর মধ্যে পড়ে শেক্সপীয়রের যে অসুবিধা, কেতাদুরস্ত সাহিত্যিক সমাজের আবহাওয়ায় কীট্সেরও তদ্রূপ অবস্থা। একবার তিক্তমনে তিনি ঐ সমাজের নামকরণ করেছিলেন—'jabberers about pictures and books'। কিন্তু উভয়েরি প্রতিভা ছিলো মৌলিক ও স্বয়ং-স্ফূর্ত্ত। যাঁরা ভাবেন কীট্স কবিতা লিখতেন ভালো, তবে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এমন কিছু উচ্চ স্তরের ছিলো না তাঁদের ধারণা চিঠিগুলো পড়লে রূপান্তরিত হবে। তাঁর চিঠিতে তাঁর মন যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তা বয়সের তুলনায়

বিস্ময়কর। সে মন শুধু কল্পনা-বিলাসী, ভাবপ্রবণ ও কাব্য-পিয়াসী নয়,—সূক্ষ্ম, পর্য্যবেক্ষণশীল, রসবোধযুক্ত এবং অনুসন্ধিৎসুও বটে। তাঁর চিঠিতে কেবল 'indistinct profusion' নেই, আছে বাস্তবতার সহজ প্রকাশ। তাঁর মনের বিকাশ ও চিন্তার ধার ছিলো বহুমুখী, কখনো গম্ভীর, কখনো চপল। কখনো তিনি চিন্তাশীল কথার অবতারণা করছেন, আবার কখনো বা শুদ্ধ ননসেন্স লিখছেন, কখনো তাঁর চৈতন্য বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যের আকস্মিক উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এক কথায় তাঁর পত্রাবলী তাঁর মনের সরল প্রকাশ—ইচ্ছাকৃত বাধাবন্ধ অথবা কৃত্রিম আবরণ তাতে নেই। কীট্‌স্‌-এর পত্রাবলী খুললে তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক সহজেই নজরে পড়ে, সেটি হ'ল তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্যের ছায়াপাত হলেও, কীট্‌স কখনো তাঁর কবি জীবনের আদর্শ হারান নি। ভবিষ্যতে তাঁকে একজন কবি হতে হবে ছোটো খাটো নয়, বড় দরের, এ আশা তিনি পোষণ করতেন। আপন প্রতিভার সম্বন্ধেও তাঁর একটা যথোচিত ধারণা ছিল। Letter 123-এ জর্জ্জকে তিনি লিখছেন—"I have not said in any letter yet a word about my affiairs—in a word I am in no despair about them—my poem has not at all succeeded—in the course of a year or so I think I shall try the public again...I should suffer my pride and my contempt of public opinion to hold me silent...I have no doubt of success in course of years if I persevere"। এই প্রসঙ্গে ৯০নং চিঠি সবিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

কবি জীবনের উচ্চ আশা ও আদর্শ কীট্‌স-এর হৃদয় পূর্ণ করে রেখেছিলো মিলটনের মতই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছাড়া অন্য কোনো সমকালিক কবির চেয়ে তিনি আপনাকে নিকৃষ্ট মনে করতেন না। বায়রণের তখন য়ুরোপ-বিশ্রুত খ্যাতি, কীটসের বাল্যকালে বায়রণই ছিলেন তাঁর দেবতা। কিন্তু কাব্য-শক্তির প্রগতিশীল বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হয়েছিলো এবং বায়রণ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—"A man's life of any worth is a continual allegory...Lord Byron cuts a figure—but he is not figurative —Shakespeare led a life of Allegory: his works are the comments on it"।

কিন্তু আত্মপ্রত্যয় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলেও কীট্‌সের চরিত্রে ক্ষুদ্রতা বা নীচতা ছিলো না। তাঁর বিনয় ছিলো স্বাভাবিক এবং সে বিনয়ের পরিচয় তাঁর চিঠিতেই মেলে।

কীট্‌সএর বহুমুখী প্রতিভার কথা লিখতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। তাঁর জীবনের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাগুলিও মোটামুটি পাঠকেরা জানেন। তাঁর কাব্য ও মনের অনুরাগী বিচক্ষণ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করেন যে কীট্‌স ছিলেন শেক্‌সপীয়রের সমজাতীয় কবি। ম্যাথু আরনল্ড কীট্‌স-এর প্রেম-পত্রের যথোচিত কদর না করলেও একটি মহামূল্য কথা বলে গিয়েছেন যেটি ভুলবার নয়—"He is ; he is with Shakespeare"।

পূর্ব্বে বলেছি যে কীট্‌সের চিঠি তাঁর কাব্যের ওপর অনেক নতুন আলোক দান করে যাতে তাঁর সেই সময়কার মনের গতি ও ধারা সহজে ও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বিশেষ করে ছিন্ন পত্র, যেমন অনেক স্থলে তাঁর সমকালিক রচনার গদ্য বিকাশ, কীট্‌স-এর চিঠিও সেই রকম অনেক কবিতার অঙ্কুর বিশেষ। একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে যে তাঁর চিঠিতে তাঁর কবিতার প্রথম রূপ ও ভাব কিরূপে ধরা পড়েছে। Letter 123 এই কারণে একটি মূল্যবান্ দলিল। ১৯শে মার্চ্চ তারিখে কীট্‌স লিখছেন—"I am in a sort of temper indolent and supremely careless...My passions are all asleep from my having slumbered till nearly eleven and weakened the animal fibres all over me to a delightful sensation about three degrees on this side of faintness—if I had teeth of pearl and the breath of lilies I shall call it langour—but as I am I must call it Laziness...Neither Poetry, nor Ambition, nor Love have any alertness of countenance as they pass by me: they seem rather like three figures on a greek vase—a Man and two women whom no one but myself could distinguish in their disguisement"। শেষোক্ত পংক্তিটী পড়বার পর Ode on Indolence-এর অর্থ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উপরের ঐ চিঠিখানাতেই কীট্‌স অনেকগুলি সদ্য-রচিত কবিতার নকল করেছেন। তার মধ্যে Why did I laugh tonight? ও La Belle Dame Sans Mercir নাম উল্লেখ-যোগ্য। এবং "And there I shut her wild wild eyes With kisses four"—এই দুটি লাইন প্রসঙ্গে কীট্‌স্-এর সরস মন্তব্যও উপভোগ্য। এ রকম আরো অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে যাতে কীট্‌সের কাব্য-প্রেরণা, তাঁর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, উদ্‌ঘাটিত হয়। সে হিসেবে সমালোচকবর্গের বক্তব্যের চেয়ে কীট্‌সের নিজের কথা অনেক বেশী দামী।

মরিস ফরম্যান বর্ত্তমান সংস্করণে মূলতঃ পিতৃ-সম্পাদিত সংস্করণ অনুসরণ করেছেন। হ্যারি ফরম্যানই সর্ব্ব প্রথমে ফ্যানি ব্রনকে লেখা চিঠিগুলি প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান সংস্করণে সেই উনচল্লিশখানি চিঠিই স্থান পেয়েছে। প্রেমপত্র লেখক হিসেবে কীট্‌সের কৃতিত্ব এই থেকেই বোঝা যাবে। আরনল্ড ও প্যাটমোর যাই বলুন না কেন, কীট্‌সের হৃদয় দুর্ব্বল এবং তাঁর প্রণয় নিবেদন অপৌরুষেয় ছিলো না। কিন্তু হ্যারি ফরম্যান সমস্ত পত্রাবলী একত্র সন্নিবেশিত করতে পারেন নি—অনেক চিঠি তিনি খোঁজ করে বেড়িয়েছিলেন যেগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। ১৯৩১ সালে মরিস ফরম্যান সবশুদ্ধ ২৩১খানি চিঠি একত্র করেন কিন্তু এই সংস্করণে তিনি আরো দশখানি নতুন চিঠি প্রকাশিত করেছেন। চিঠিগুলি নকল নয়,—সম্পাদক পরীক্ষা করে নিয়েছেন প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, তারা খাঁটি না জাল। সম্পাদকের কার্য্য এই কারণে নির্ভুল হয়েছে। নতুন চিঠিগুলি অনেক নতুন লোকের সন্ধান এনেছে। টমাস রিচার্ডস, উইলিয়ম মেয়র ও মিসেস ওয়াইলি সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছুই জানতুম না, কিন্তু ফরম্যানের

অনুসন্ধানের ফলে তাঁদের কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়েছে। চিঠিগুলি সাজানো হয়েছে তারিখ অনুসারে এবং বইএর অগ্রভাগে কীট্‌সের সঙ্গে যাঁরা পত্র বিনিময় করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়ার ফলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হয়েছে প্রচুর। জেফ্রিস্‌, চার্লস ব্রাউন ও ফ্যানি ব্রন্‌-এর সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত অত্যন্ত পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে এবং বিশেষ করে শেষ দুজনের মধ্যে পত্র ব্যবহার প্রকাশিত করে ফরম্যান পাঠকের উপকার করেছেন। এতে কবির প্রতি ফ্যানির মনোভাব আরো নতুন করে প্রকটিত হয়েছে। টেক্‌সট-এর দিক থেকে ফরম্যান-এর চেষ্টা সফল হয়েছে। কেননা মূলের ওপর তিনি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেন নি। কীট্‌সের অদ্ভুত বানান্‌ ও মুদ্রাদোষগুলি সংশোধিত না করে তিনি বজায় রেখেছেন, উপরন্তু তাদের একটি বিধিবদ্ধ তালিকাও দিয়েছেন। সূচী, নির্ঘণ্ট, ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ একখণ্ডে প্রকাশিত কীটস্‌-এর বিশাল পত্রাবলী এই কারণে সাধারণ পাঠকের অনেক উপকারে লাগবে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পাঠক-গোষ্ঠী

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস

বিগত শ্রাবণ সংখ্যার 'পরিচয়ে' আমি 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখি। পরিচয় ত্রৈমাসিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হওয়ায়, আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাকে প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত করতে হয়—ক'জ্জেই আমার সমুদয় বক্তব্য বিস্তারিত ক'রে উক্ত প্রবন্ধে ব'ল্‌তে পারি নি, কতকগুলো কথা সূত্রাকারেই রেখে যেতে বাধ্য হই—ইচ্ছা ছিল পরে আর একটি প্রবন্ধে সেগুলোর বিশদ আলোচনা ক'র্‌বো। ইতিমধ্যে আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদে ঐ নামেই একটি প্রবন্ধ 'পরিচয়ে' লিখে, আমাকে পুনরায় বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনার সুযোগ দিলেন, এ জন্যে তাঁর কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ!

কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ প'ড়ে আমি আদৌ খুসী হতে পার্‌লাম না—তিনি আমার প্রতিবাদ ক'রেছেন ব'লে নয়, আমাকে স্কুলের পড়ুয়া জ্ঞানে নানাবিধ মোহধ্বান্তনাশন উপদেশ দিয়েছেন ব'লে নয়—লেখক যে প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রছেন সে প্রবন্ধই আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করেন নি ব'লে। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি শুন্‌বার মতো সহিষ্ণুতা অবশ্য সকলেরই থাক্‌বার কথা, এবং প্রতিপক্ষ মাত্রকেই অরসিক ব'লে ঘোষণা করার মতো বর্ব্বরতাও কারুরই না থাকা উচিত। কিন্তু যে প্রতিবাদ কেবলমাত্র প্রতিবাদের জন্যেই, যার পেছুনে নেই কোন গঠন-মূলক উদ্দেশ্য, নেই কোন বিচারবুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্ত—যা গতানুগতিক বিশ্বাসের দ্বারা পুষ্ট এবং ততোধিক গতানুগতিক ভাষায় উচ্ছ্বাসে ভাবাবেশে সঞ্জীবিত, তাকে প্রতিবাদ ব'লে মনে করি কি ক'রে?

লেখক তাঁর প্রতিবাদের একেবারে গোড়ার দিকেই 'যুক্তি পরম্পরা' নিয়ে একটু গর্ব্ব প্রকাশ ক'রেছেন—কিন্তু তাঁর সমগ্র প্রবন্ধের ভেতর যুক্তি-শৃঙ্খলার অভাবই যে সব চেয়ে বেশী পীড়াদায়ক হ'য়েছে, এ কথা অপ্রিয় হ'লেও না ব'লে উপায় নেই। তিনি ধ'রে নিয়েছেন আমার প্রবন্ধে বঙ্কিমের বিরুদ্ধতা করা হ'য়েছে—অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সনাতন মনোভাব যা, তারই অনুসরণে তিনি মাত্রাবোধ লঙ্ঘন ক'রে, মূল প্রবন্ধের বক্তব্যকে বিকৃত ক'রে, নানা স্থানে অর্দ্ধ-উক্তি উদ্ধৃত ক'রে, উক্ত প্রতিবাদ খাড়া ক'রেছেন। গোয়ালে বাঘ ঢুক্‌তে দেখে হিন্দু ধর্ম্ম গোল্লায় গেলো ব'লে কাঁদার মতো, বঙ্কিম-সাহিত্যের ওপর সমালোচকের অস্ত্রাঘাত মাত্রেই আঁৎকে ওঠার লোক দেশে অনেক আছেন···তাঁরা সম্মিলিত ভাবে দল পাকালে মদ্বিধ সমালোচকের পার্থিব অস্তিত্বই বিলুপ্ত হ'তে পারে—কিন্তু তাতে ত কোন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয় না, কোন বিরুদ্ধ যুক্তিরও খণ্ডন হয় না। এই ধর্ম্মধ্বজিতার ঊর্দ্ধে উঠে বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু প্রভৃতি তদানীন্তন সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আজকের লেখক যদি বিরুদ্ধ সমালোচনাতেই প্রবৃত্ত হন্‌

ত তাতে হাহাকার করবার কি আছে, অনেক ভেবেও তা স্থির ক'রতে পারি নি। সাহিত্য ত নিগুর্ণ ব্রহ্ম নয়, যে তার পক্ষে পরিবর্ত্তনটা অপ্রাসঙ্গিক হবে! আর তা হ'লেও উত্তেজনা বশে প্রতিপক্ষকে বিদ্রূপ না ক'রে, তাঁর সঙ্গে শিষ্ট রীতিতে তর্কে প্রবৃত্ত হবার সহবৎ কি প্রত্যেকেরই থাকা উচিত নয়?

অবশ্য সুবোধ বাবুর সঙ্গে বিবাদ চালানোই আমার উদ্দেশ্য নয়। বঙ্কিম-সাহিত্য তাঁর হয়ত অত্যন্ত প্রীতির বস্তু, হয়ত তিনি বঙ্কিমের রচনায় এমন কিছু পেয়ে থাক্‌বেন যা তাঁকে চিরদিনের মতো সম্মোহিত ক'রে রেখেছে, যার ফলে তাঁর বিশ্লেষণী-শক্তি বঙ্কিম-সম্পর্কে চির-নিরস্ত হয়ে গিয়েছে···কাজেই তাঁর উষ্মায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হ'ইনি। আমি শুধু এইটুকুই ব'লতে চাই যে আমার মূল বক্তব্য কি সেটা তিনি প্রণিধান করার চেষ্টা না ক'রে আমার বক্তব্যের শাখা প্রশাখাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়ে, এ জাতীয় অসংলগ্ন প্রতিবাদ উপস্থিত না করলেও পারতেন!

আমার বক্তব্য ছিল এই যে বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পী অপেক্ষা সংস্কারকের প্রাবল্য ছিল···তাঁর সাহিত্য প্রধানতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে-উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই এত সুস্পষ্ট যে রস-বোধকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, সম্ভাবনীয়তাকে লঙ্ঘন ক'রে, বাস্তবতাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, তা সর্ব্বত্রই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় অবহিত হ'য়ে থাকে। আমি বলতে চেয়েছিলাম, উপন্যাসের পক্ষে এ ক্রটি অতি মারাত্মক··· কারণ অবাস্তবতার চোরাবালিতেই প্রধানতঃ এই ধরণের আখ্যায়িকার তরী অতর্কিতে বানচাল হ'য়ে থাকে এবং তাই হয়েছে কৃষ্ণকান্তের উইলে, দেবী চৌধুরাণীতে, আনন্দ মঠে। সব বই নিয়ে বিশদ আলোচনা আমি করিনি—তার উপযুক্ত অবকাশ ছিল না বলেই! শুধু কৃষ্ণ-কান্তের উইল নিয়েই আমি বিস্তারিত আলোচনা ক'রেছি এবং তাতে মোটা কথা যা ব'লতে চেয়েছি তা হচ্ছে এই যে ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল, এই তিন জনকে উপলক্ষ ক'রে যে ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের ওপর এই উপন্যাসের স্থিতি, তার মধ্যে দুষ্টক্ষত রূপে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে বঙ্কিমের তথাকথিত নৈতিক শুচিতা-প্রীতি—অর্থাৎ বিধবা রোহিণীর পদস্খলনের যতই সমর্থন থাক তাকে ছাড়া হবে না, গোবিন্দলাল যে পথেই হাঁটুক শেষটা তাকে অনুতপ্ত হয়ে সন্ন্যাস নিতেই হবে, ভ্রমরের প্রাত্যহিক জীবন যতই বিশেষত্বহীন হোক্, তার ভেতর দিয়ে অসাধারণ সতী-মাহাত্ম্য ফোটাতেই হবে··! এই যন্ত্রবদ্ধ আদর্শবাদের ফলে সমস্ত চরিত্রই চ'লেছে অস্বাভাবিক পথে, তাদের প্রারম্ভ ও পরিণতির মধ্যে নেই সামঞ্জস্য, নেই অনিবার্য্যতা! মনে হ'য়েছিল, শিল্প-সৃষ্টির দিক থেকে এর চেয়ে অসার্থকতা আর কিছুই হ'তে পারে না। কারণ শিল্পী সমাজ-সংস্কারক নন্, তা হবার দরকারও নেই তাঁর।

লেখক মহাশয় এতেই রুষ্ট হ'য়েছেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ত কৈ প্রতিপন্ন ক'রতে পারেন নি যে বঙ্কিম সত্যিই ওস্তাদ শিল্পী। বরং পরোক্ষ ভাবে তিনি যে সমস্ত অংশ বঙ্কিম থেকে উদ্ধৃত ক'রেছেন শিল্প-সৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে, তাতে বঙ্কিমকে ত তিনি আমার চেয়ে ঢের বেশী খেলোই ক'রে ফেলেছেন! বস্তুতঃ ফাঁকা ভাবোচ্ছ্বাস বা তথাকথিত কবিত্বই যদি তাঁর মতে 'রস'

হয় ত আমি নারাজ। কিন্তু আমার ত এই বিশ্বাস যে সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে ক্ষতি-কারক আর কিছুই নেই!

আসল কথা কাব্যের রস ও উপন্যাসের রস ঠিক এক জাতীয় হবার কথা নয়—হয়ও না। উপন্যাসের সঙ্গে বাস্তবতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, সুতরাং প্রত্যক্ষ সংসারের পটভূমিতেই তার প্রাণবস্তু নিবদ্ধ···এই প্রত্যক্ষতাকে সজীব, সুন্দর, মনোজ্ঞ ক'রে ফোটানোই হ'চ্ছে উপন্যাসের আর্ট। সে আর্টে বঙ্কিমের উৎকর্ষ কদাচিৎ দেখা গেছে। বঙ্কিম মানুষকে তাঁর নীতিজ্ঞান ও আদর্শের বাহন ক'রে এঁকেছেন, কাজেই তারা নামে মানুষ, আসলে তারা অবাস্তব চিত্র! এই অবাস্তবতাকে কি বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা দিয়ে বা ভ্রমরের যৌবনপুষ্ট নিটোল লাবণ্যের বর্ণনা দিয়ে ঢাকা যায়? বা তথাকথিত রসিকতার জোরে তাকে রক্ষা করা যায়? এ যে তাঁর উপন্যাসের প্রাণগত দৌর্ব্বল্য! বরং এই নীতিবোধ-পরিচালিত আবহাওয়ায় কবিত্বের আবাদ আরো বিসদৃশ ব'লেই মনে হ'য়ে থাকে।

বঙ্কিম-সাহিত্যের এই মৌলিক ত্রুটির উৎস কোথায় তাও আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম, অবশ্য তাতে বঙ্কিম-সাহিত্য রক্ষা পায় না, কিন্তু বঙ্কিমের সমর্থন হ'য়ে যায়। কিন্তু এখানেই প্রতিবাদ-কর্ত্তার সঙ্গে আমার সত্যিকারের বিরোধ···সংস্কারক বঙ্কিমকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং মনে করি বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্থান বিশেষ ঊর্দ্ধে—সাহিত্যের সাহায্যে জাতি গঠনের কাজে তিনি যে সাফল্য লাভ ক'রেছেন, তা হয়ত শিলার প্রমুখ জার্মান লেখকদের অনুরূপ। অবশ্য তাঁদের সমপর্য্যায়ভুক্ত শিল্পী তিনি নন্—কারণ শিল্প-সৃষ্টির পথে তাঁর প্রধান অন্তরায় ছিল চিত্ত-ধর্ম্ম।

বঙ্কিম ইংরাজ রাজত্বের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং তৎকালীন তরুণ-সমাজের মুখপাত্র হ'লেও, তাঁর চিত্তে ছিল কাঁটালপাড়ার কুলীন সমাজের তথাকথিত গোঁড়ামি। তাই বঙ্কিম মদ্যপান করলেও এবং পাশ্চাত্য আদর্শে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না ব'লে, আদর্শ মানব বল্লেও, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের অজুহাতে কিন্তু বিষবৃক্ষে স্পষ্ট ক'রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্খ ব'লেছিলেন। আর শশধর পণ্ডিত মহাশয়ের সহযোগে হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থানের সেই সব রোমাঞ্চকর প্রপাগ্যাণ্ডা চালিয়েছিলেন! এই শিক্ষা ও সংস্কারের দ্বন্দ্বেই বঙ্কিম-চিত্ত ভরপূর ছিল···তিনি সমগ্র জীবনেও এর সুস্পষ্ট সমন্বয় করতে পারেন নি। ফরাসী আদর্শে যিনি 'সাম্য' লিখেছিলেন এবং গোস্বামী আদর্শে 'প্রচার' চালিয়েছিলেন, তাঁর আদর্শ-বিপর্য্যয় ত সহজেই ধরা যায়। এইখানেই তাঁর উপন্যাস-সাহিত্যের বীজও নিহিত—তিনি উপন্যাস গড়তেন বিলিতি ধাঁচায়, কিন্তু তা ধারণ করতো দেশী চেহারা! দেবী রাণীই হোক্ আর সন্তান দলই হোক্, তাঁর কল্পনায় এসেছিল সাগরপার থেকে—কিন্তু কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম তাঁদের এক জনকে পুকুরে বাসন মাজিয়ে, অপরদের 'হরে মুরারে' ব'লে কাঁদিয়ে তবে ক্ষান্ত হ'য়েছেন; এরই নাম অবাস্তবতা!

এই বৈসাদৃশ্যের সমাধান-কল্পে প্রতিবাদ-কর্ত্তা কি বল্তে চান? তিনি সুকৌশলে পাশ

কাটিয়ে চ'লে যেতে চেষ্টা না ক'রে শিল্পে ও সংস্কারে জগাখিচুড়ী পাকিয়ে বঙ্কিম যে অদ্ভুত পরমান্ন প্রস্তুত করেছিলেন, তা নিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রে দিলেই পারতেন।

বঙ্কিমের এই অন্তর-হিন্দু বহির্সাহেবী মনোভাবের উদাহরণ হিসাবে আর একটা কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক নাও হ'তে পারে। সেটা আমার প্রতিবাদের অঙ্গ না হ'লেও, আমার প্রতিপাদ্যের অনুপূরক হবে আশা করি। বঙ্কিম-সাহিত্যে যেখানেই স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-সম্বন্ধ সমাজ নির্দ্দিষ্ট ধারার বিরুদ্ধে যায়, সেখানেই তিনি প্রধানতঃ দুটি কৌশলের আশ্রয় নেন্—হয়, শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হ'য়ে যায় যে নায়িকাগুলি নায়কগুলির পূর্ব্ব-বিবাহিত স্ত্রী; যেমন মতিবিবির ব্যাপার, ইন্দিরার ব্যাপার, দেবী রাণীর ব্যাপার, শান্তির ব্যাপার···আর নয়ত, ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়ে নায়িকাকে নরকে নিক্ষেপ ক'রে, অথবা হত্যা ক'রে, (এবং নায়ককে সন্ন্যাসী ক'রে) বঙ্কিম গোলমালের নিষ্পত্তি করে ফেলেন—যেমন শৈবালিনীর বা রোহিণীর ব্যাপার! কিন্তু এই বিশেষ কৌশল দুটিই বঙ্কিমকে এমন ক'রে পেয়ে বসেছিল কেন? তিনি বিদেশীয় উপন্যাসের আদর্শে প্রণয়-বৃত্তান্ত নিয়ে উপন্যাস ফাঁদ্‌তেন, কিন্তু তাঁর সনাতনী মন শিউরে উঠতো সমাজের কথা ভেবে—অম্নি তিনি গঙ্গাজলে নিষিদ্ধ মাংসকে শোধন ক'রে নেওয়ার মতো বিবাহের বা সন্ন্যাসের নামাবলী মুড়িয়ে তাকে ঢাকা দিতেন—যদিও সত্যিকার সুনীতি এতে রক্ষা পায়নি—যেখানে তারও উপায় থাকতো না, সেখানেই তিনি দণ্ড ধারণ ক'রতেন। কিন্তু এই দণ্ড নায়ক-নায়িকাদের ওপর না প'ড়ে, তাঁর শিল্প-সৃষ্টির ওপর প'ড়ে তাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে ফেল্‌তো! জগতে পরস্পরের অজ্ঞাত পূর্ব্ববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় এমন পায়কারি রেটে আম্‌দানি করার মতো উদ্ভট ব্যাপার আর কি হ'তে পারে? তা ছাড়া, যে কোন সমাজ-বিরুদ্ধ প্রেমের পরিণামই লোমহর্ষণ হয়, এ কথাই বা কে ব'ল্‌তে পারেন?

এই জিনিষকেও বলা যেতে পারে বঙ্কিমের আদর্শ-নিষ্ঠা এবং তাঁর উপন্যাসের অবাস্তবতা। বাস্তবতা কথাটায় প্রতিবাদ-কর্ত্তার দেখলাম ঘোরতর আপত্তি! তিনি কি বলবেন, এখনও এ কথাটা তাঁর কাছে খুব ধোঁয়াটে ঠেকছে? সমাজহিতে বা বিশ্বহিতে কি ব্যবস্থা প্রযোজ্য, সে চিন্তা উপস্থিত ক্ষেত্রে দূরে সরিয়ে রেখে, শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখা যাক্ জগতে প্রতিনিয়ত কি ঘটে বা ঘটেছে! এই ঘটা-না-ঘটার ওপরই উপন্যাস! কাজেই কুলটা হ'লেই অম্নি ডুকরে ওঠাও যেমন ভুল, সন্ন্যাসী হ'লেও ধেই ধেই করে নৃত্য করা তেম্নিই ভুল! স্বাভাবিক উপায়ে সাহিত্যে কুলটা আসে আসুক, সন্ন্যাসী আসে আসুক—কিন্তু জগতের উদ্ধার সংসাধনের জন্যে বা পাপের সঙ্গে পুণ্যের তফাৎটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যে দু'য়ের যে কোনটার আমদানিই রস-সাহিত্যের পক্ষে অর্থহীন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে বঙ্কিমের লক্ষ্য মূলতঃ সংস্কারকের লক্ষ্য, Aesthetics অপেক্ষা Ethics-এই তিনি সমধিক শ্রদ্ধাবান! কাজেই জাগতিক ব্যাপারের যাথার্থ্য বা স্বাভাবিকতা অপেক্ষা ঔচিত্যই তাঁর বিবেচনায় বড়। এই বিবেচনা থেকেই তাঁর দেশ-প্রেমেরও উদ্ভব, তাই তার ভেতরও জাতি-বিদ্বেষের অশোভন আধিক্য থেকে গেছে, থেকে

গেছে নৈর্ব্যক্তিক আচার-নিষ্ঠার কষ্টকর আড়ষ্টতা ; আমি বলতে চেয়েছি এই সমস্ত জিনিষ তাঁর রস-সৃষ্টির পথে বিশেষ অন্তরায় স্বরূপ হয়েছে।

দেশ-প্রেমের প্রসঙ্গে আর একটা কথা—বঙ্কিমের দেশপ্রীতির সমগ্র পরিকল্পনা কি? সীতারাম, রাজসিংহ, আনন্দমঠ…কি একটা সাধারণ জাতীয় চেতনার স্ফুরণ ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তর মহত্তর আদর্শকে ফোটাতে পেরেছে? জাতি-দ্বন্দ্বের ধূমায়িত আবর্ত্তে আত্ম-প্রশংসার লজ্জাজনক আতিশয্য এবং ভাবান্ধ প্রাদেশিক মনোভাবের সগর্ব্ব উক্তিকে দেশপ্রেম বলে ভুল করতে পারিনে। সন্ন্যাসবিড়ম্বিত ত্যাগতিতিক্ষার জ্বলন্ত বর্ণনাও কোন মতেই বড়দরের চিন্তার মর্য্যাদা দাবী করতে পারে না। কাজেই ও নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। তবে দেশীয় চিন্তায় আত্মমর্য্যাদা-বোধকে জাগিয়ে তোলার যে প্রপাগ্যাণ্ডা সংস্কারকেরা করে থাকেন, বঙ্কিম তাতে আশাতীত শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং বাঙালী জাতির মধ্যে এবিষয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এবং সে কারণে নমস্য। সে জন্যে অরবিন্দপন্থীরা বা কংগ্রেসীরা তাঁকে ঋষি বলে থাকেন—আমাদের তা নিয়ে বিবাদ নেই, কিন্তু এতে ক'রে বঙ্কিমের শিল্পী হিসাবে দাবী কিছু বাড়ে কি? টুর্গেনিভ বা গোর্কির মতো—যদিও তাঁরাও প্রপাগ্যাণ্ডার পটভূমিতেই শিল্প গড়েছিলেন?

কিন্তু এবার আমার বক্তব্য শেষ করে আনার দরকার। সুবোধ বাবুর প্রতিবাদে ধারাবাহিকতার এতই অভাব যে একটার পর একটা ক'রে তাঁর উক্তিকে খণ্ডন করা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়—তিনি দু'চারটি কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতবার এত রকমে বলেছেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বক্তব্যের চরম লক্ষ্য কি তা বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য! তবু যথাসম্ভব আমি তাঁর জবাব দেবার চেষ্টা করেছি, যদিও জানি এতে সুবোধ বাবু অবহিত হবেন না, বরং তাঁর ক্রোধই উদ্রিক্ত হবে এবং এর পরও যদি তিনি লেখনী ধরেন ত তাঁর ভাষা অনেক দূর নেমেও যাবে। কিন্তু তা যাক, সে জন্যে দুঃখ করার মতো অখণ্ড অবসর আমাদের কোথায়?

শুধু শেষকালে সুবোধ বাবুর একটা ছোট টিপ্পনীর আমি জবাব দিয়েই এবারের মতো বিদায় নেব। তিনি রোহিণীর প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের দরদ দেখে বড়ই খুসী হয়েছেন এবং প্রকারান্তরে যে ইঙ্গিত করেছেন তা কি জাতীয় রুচির পরিচায়ক সে-কথা আর নাই বললাম! কিন্তু এই রোহিণীরা বাংলার ঘরে ঘরে—সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা অভাগিনীদের কুলটা আখ্যা দেওয়া তাঁর মতো মরালিষ্টের পক্ষে শোভন হলেও এবং তাদের গুলি ক'রে মারা বিষয়ে তাঁর ষোল আনা সমর্থন থাকলেও, আমাদের মতো "অসার" ব্যক্তি অতটা তুরীয় মার্গে উন্নীত হতে সাহস ক'রবে না…কিন্তু তাই বলে এই রোহিণীদের নিয়েই আমাদের যা কিছু সাহিত্যিক বেসাতী মনে ক'রে যাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে থাকেন, তাঁদেরকেও আমরা একেবারে চিনতে পারিনে এমন নয়। মানুষের দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতার প্রতি উদাসীন হবার মতো যোগধর্ম্মী হ'তে পারবো না ব'লেই যদি নিন্দার ভাজন হই ত তাতে আমাদের দুঃখ কি? কিন্তু কুলবধূ সম্বন্ধে আমাদের সহানুভূতির অভাবটা কি লেখকের মৌলিক আবিষ্কার নয়? যেমন বঙ্কিমের 'পড়াশুনাও খুব উঁচুদরের ছিল না'

কথাটাও তাঁর মৌলিক আবিষ্কার! কুকুরকে দুর্নাম দিয়ে ফাঁসি লট্‌কানোর কথা আছে বটে, কিন্তু সে কি সুবোধ বাবুর মতো সুধী ব্যক্তির জন্যে?

কিন্তু এই পর্য্যন্ত থাক। বিগত শতাব্দীর সাহিত্য-সম্রাট নামে খ্যাত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হ'তে থাক, এই আমার ইচ্ছা। ভাবাবেগের কুয়াসা ঢাকা দিয়ে তাঁকে দিনের পর দিন প্রচার ক'রে যাওয়ার চেয়ে, তাঁর সাহিত্যের বিতর্কমূলক আলোচনা হয়ে তাঁর সত্যকার মূল্য নিরূপিত হয়, এই উদ্দেশ্যেই উক্ত প্রবন্ধ লেখা! সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যে আমি 'পরিচয়ে'র কাছে কৃতজ্ঞ—যদিও সুবোধ বাবুর মত যে এরকম 'অসার'কে এ-সুযোগ দেওয়া ঠিক হয় নি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
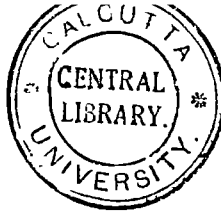
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৪৩

পরিচয়

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব

(১)

বিশ্বজগতে সবই সুন্দর; শিশুর হাস্য-রোদনের ন্যায় মানবের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, জয়-পরাজয় এবং প্রকৃতির গ্রীষ্মবর্ষা ও স্নেহরৌদ্র; স্বয়ং বিশ্বপতির কারুণ্য ও সংহারমূর্ত্তি—সকলই সুন্দর, কেবল দেখিবার চক্ষু চাই। আর যিনি দেখেন তিনিও সুন্দর,—ভাবিবার কেবল বুদ্ধি চাই।

এ দ্বন্দ্ব কেন? সবই যখন সুন্দর তখন দুঃখের এ দুর্ব্বহ ভারে জগৎ জর্জ্জরিত কেন? পরমপণ্ডিত দার্শনিকগণও জীবনকে মারামারি বলিয়া বর্ণনা করিবেন কেন? সবই যখন সুন্দর তখন সৌন্দর্য্যের অঞ্জনপূত চক্ষুরই বা অভাব কেন? —'এক' যেদিন 'বহু' হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেইক্ষণই এ দ্বন্দ্বের আরম্ভ হইয়াছে,—উৎক্ষিপ্ত উপলখণ্ডের স্বস্থান প্রত্যাবর্ত্তনের মত এই বহু হইবার ইচ্ছা যেদিন মৌলিক-একত্বের প্রভাবে অভিভূত হইবে সেইদিনই সৃষ্টিধ্বংসের আরম্ভ হইবে ও তাহার পর সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের অবসান হইবে। এ-তত্ত্ব দেখিবার চক্ষু দুর্লভ বটে, কিন্তু একেবারে নাই তাহা নহে,—"ঘুড়ি লক্ষের মধ্যে একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" আর দোষও চক্ষুর নহে, চক্ষুষ্মাণের, যিনি দেখিতেছেন গোড়াতেই তিনি আপনাকে বিশ্ব হইতে ও বিশ্বপতি হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছেন,—সমস্তই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহার চক্ষের সুখ মনের দুঃখে চলিয়া যাইতেছে,—সুন্দর অসুন্দর হইয়া পড়িতেছে। আর জগৎকে যাঁহারা জীবনযুদ্ধে পরিণত করিয়াছেন তাঁহারাও ঐ সংকীর্ণ-দৃষ্টি স্থূলদর্শীর দল,—উদর-দার্শনিক মাত্র।

এ দ্বন্দ্ব কবে ঘুচিবে?—যবে অহঙ্কারের নাশ হইবে। 'আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যাঁহাদের ঘুচিয়াছে তাঁহাদের চক্ষে সকলই সুন্দর, তাই দিব্যশক্তি-সম্পন্ন হইয়াও তাঁহারা নিষ্ক্রিয়,—তাঁহারা বলেন "সবই ত বেশ, অনর্থক হাঁপাহাঁপি কেন?" এই নির্ব্বিকার ভাব অনেকের চক্ষে বড়ই পৌরুষহীন, কিন্তু অতি বিরাট পুরুষেরও গন্তব্যস্থান এই শান্তি, যতদিন দূরে ততদিনই কেবল কামনা হইতে কামনান্তরে নীয়মান হইয়া ভোগ্য সঞ্চয়দ্বারা আপনাকে অভাবাদির পীড়ন হইতে চিরমুক্তি দিবার ব্যর্থপ্রয়াস। অনেক কষ্ট পাইয়া তবে কর্ম্মের মোহ কাটে ও জীবনে চাঞ্চল্যের স্থানে শান্তি, প্রীতি, সৌন্দর্য্য বিরাজ করে। জানি বা না জানি, আমরা সকলেই সেই পথের পথিক,—কোন কোন শুভমুহূর্ত্তে এখনও বুঝিতে পারি যে কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র তৃপ্তি ত্যাগে,—আত্মদানে ও ভালবাসায়—ভোগে বা বিজয়ে নহে। তাই নলের পরিণতি পলে, সনাতনের পরিণতি গোস্বামিত্বে,—এই কারণেই অর্থী ব্রাহ্মণের স্পর্শমণি প্রত্যাখ্যান ও বুদ্ধপূজার লোভে পূজারিণীর প্রাণদান। জানি বা না জানি, আমরা সকলেই সেই শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—কে জানে কোন্ অজ্ঞাত আঘাতে জীবনের কার্য্যক্রম সব ওলট্ পালট্ হইয়া যাইবে। এই আঘাত দিবার জন্যই কবি ও কলাবিতের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

এ সৌন্দর্য্যস্পৃহা মানুষেই সীমাবদ্ধ নহে। অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণ, শারীর প্রতি শুকের আকর্ষণ, এ সকলের মূলে কোন্ তত্ত্ব নিহিত আছে কে বলিতে পারে? মানুষে এই তত্ত্ব ভাষায়, শিল্পে ও শিষ্টাচারে অভিব্যক্ত। যে মানুষ পাখীর কথা বুঝিতে পারেন, যিনি বৃক্ষে নিদ্রাবেশ লক্ষ্য করেন, তিনি হয়ত তাহাদের মধ্যেও এই তত্ত্বের কিছু কিছু বিকাশ দেখিতে পাইবেন। আবার মানুষ ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় একটী স্তর মাত্র; মানুষের মধ্যে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি লইয়া আমরা উদ্ভিজ্জাদি হইতে আপনাদের বিশেষত্ব কল্পনা করি,—দেবাদি কোন উচ্চতর জীব হয়ত নিজেদের তুলনায় মনুষ্যাদি নিম্নস্তরের মধ্যে সে ভাবের কোন বিকাশই না দেখিতে পাইয়া নিরাশ হইতেন। একটা কথা বুঝিতে পারি;—যাহা ছিল না তাহা আইসে না,—যাহা আসিয়াছে তাহা মূল হইতেই আসিয়াছে। Chaos বলিয়া কিছু ছিল না,—তাহা Cosmosএর আবশ্যিক পূর্ব্বাবস্থা, এবং Cosmos তাহারই আবশ্যিক পরিণাম। সেইরূপ সৌন্দর্য্যতত্ত্বও হঠাৎ আসিয়া

পড়ে নাই, ইহা বীজরূপে গোড়া হইতেই ছিল, মানুষ নিজ জাতির মধ্যে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, উপরে বা নীচে,—দেবস্তরে বা পশুস্তরে—কোথায় কি আছে বা না আছে, তাহা তাঁহার দৃষ্টির অগোচর হইলেও বুদ্ধির অগোচর নহে,—এই তত্ত্ব প্রথম হইতেই আছে, এবং বিশ্বজগতের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই—এ তত্ত্বের রহস্য কি? সৌন্দর্য্যের প্রাণ কোথায়? সুন্দর কিছু দেখিলেই 'বাঃ' বলিয়া আরামের নিঃশ্বাস স্বতঃই বাহির হইয়া আসে। যেন আমাদের রোগ, শোক, অভাব-সন্তপ্ত ক্ষুব্ধচিত্ত একটা আশ্রয় লাভ করিয়া স্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কেবল দুর্ব্বলতার আশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন মাত্র নহে। তাহা হইলে বড় মনিবের সখের চাকর হওয়া অপেক্ষা সুন্দর অবস্থা আর থাকিত না। কিন্তু সৌন্দর্য্যে আশ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জিনিষ দেয়,—তাহা আত্মীয়-বুদ্ধি, নিজের বলিয়া জ্ঞান। যেখানে আমরা আশ্রয়ের গুরুভারে মুহ্যমান হইয়া পড়ি, সেখানে এই আত্মীয়-বুদ্ধি আইসে না,—সেখানে আমরা সম্ভ্রম করিতে পারি, কিন্তু আপন বোধ করিতে অর্থাৎ ভালবাসিতে পারি না। সুন্দর কিছু দেখিলে মনে হয়, অপূর্ণ 'আমি'র একটা অংশ এতদিন বাহিরে ছিল, অবশেষে আসিয়া মিলিত হইয়া 'আমি'র অপূর্ণতা কিছু পূর্ণ করিয়া দিল। ফলতঃ সৌন্দর্য্য-বোধের আছে আত্মপ্রসারণ-জ্ঞান। যাহা একের চক্ষে সুন্দর তাহা হয়ত অন্যের চক্ষে অসুন্দর;—ইহার কারণ প্রথম ব্যক্তি বিবর্ত্তনের ঠিক যে স্তরে দ্বিতীয় সে স্তরে নহেন, প্রথমের পূর্ণতাবোধ যেখানে দ্বিতীয়ের পূর্ণতাবোধ সেখানে নহে। তবে পূর্ণ কোন জিনিষ যদি কেহ উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দিবে। প্রেমাবতার যীশুর ক্রুশোপাখ্যান সত্য কি না জানি না, কিন্তু তপোবনে সিংহ মৃগের একত্র বিচরণ, অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ের হস্তে জগাই মাধাইয়ের পুনর্জ্জন্ম লাভ, ক্ষমাবতার বুদ্ধদেবের সম্মুখ হইতে রণোন্মত্ত হস্তীর পলায়ন যে বিশ্বাস্য ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শত্রুতা ও বিরোধ-ভাব যেখানে নাই, সেখানে কে কাহার হিংসা করিবে?—সেখানে বরং জাগতিক ক্ষুদ্রতার অবসান দেখিয়া সকলেই একটা স্বস্তির আরাম অনুভব করিবে—ইহাই সৌন্দর্য্যভোগ—যাহাতে হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়। তৃপ্তির পরিমাণ ত্যাগ দ্বারা অনুমেয়। কিন্তু সৌন্দর্য্য-ভোগার্থ সকলে ত এত ত্যাগ করিতে পারে না! তাহার

কারণ সে ভোগে তাহার আত্মার বিরাট ক্ষুধা শান্ত হয় না। সামান্য যেটুকু মিটে তাহার অনুরূপ ত্যাগই সম্ভব। বিবর্ত্তনের স্তর-ভেদে ক্ষুধার পরিমাণ বা প্রকৃতিও সকলের একরূপ নহে। (কিন্তু যে বংশীধ্বনিতে কুলনারী কুলমান বিস্মৃত হন, যমুনা উজান বহিয়া যায়, বনমধ্যে বসন্তের আবির্ভাব হয়—তাহাতে যে কোন রূপের ক্ষুধা, যে কোন পরিমাণের ক্ষুধা যে উপশান্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?) কেহ অর্থের, কেহ বীর্য্যের, কেহ বিদ্যার, কেহ বা মুক্তির ভিখারী। মর-জগৎকে ফাঁকি দিয়া, অমৃতের সন্ধানেই সকলে ফিরিতেছে,—বিকারশীল অসত্যকে ছাড়িয়া সকলেই নিত্য সত্যের সন্ধানে ফিরিতেছে,—যে যেখানে যে পরিমাণে পাইতেছে, সে সেখানে সেই পরিমাণে তৃপ্ত হইতেছে। তাই মনে হয় স্বস্তিপূর্ণ নিজত্ববোধই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ, এবং শাশ্বত সত্য ইহার প্রাণ।

কিন্তু সৌন্দর্য্যের এই সব পারমার্থিক স্বরূপ দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যাহা কিছু সত্ত্বগুণের চিত্র তাহাই শ্রেষ্ঠ—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি ভ্রান্ত। এখানে Macaulayর উক্তিটা স্মরণ রাখিতে হইবে,—I would prefer a gipsy's head drawn by Sir Joshua Reynold to a prince's head drawn by a dabbler। সত্য একটা বই দুইটা নয়। যিনি ধ্যান-নেত্রে নিজ ভাব্য বিষয়ের যতটা স্বরূপ দর্শন করিতে পারেন তাঁহার চিত্র তত সত্য হইবে। সে ধ্যানলব্ধ সত্য যিনি প্রকাশ করিতে না চাহেন তিনি নিজেই চিত্র হইয়া পড়েন, —He is himself a poem। আর ধ্যানলব্ধ অনুভূতি চরম হইলে অবশ্য একরূপই হয়, কিন্তু সেই চরম সৌন্দর্য্য ও তাহার প্রকাশের ভাষা বা রং মানুষের ক্ষমতার বাহিরে, সে সমুদ্রে যে ডুবে সে উঠে না,—যে উঠে সে সমুদ্রের তল দেখিতে পায় না, এবং তাহার অপূর্ণ উপলব্ধিই চিত্রাদি ভাবে প্রকাশ করে। যিনি শিক্ষাদি গুণে কবি তাঁহার প্রকাশ পদ্যে, যিনি চিত্রকর তাঁহার প্রকাশ বর্ণে, যিনি ভাস্কর তাঁহার প্রকাশ প্রস্তরে, যিনি সঙ্গীতজ্ঞ তাঁহার প্রকাশ সুরে। (সুরই শ্রেষ্ঠ, কারণ সুরেই সৃষ্টি, বিশ্বরহস্যের আদিম উৎসের অতি নিকটে এই শব্দতত্ত্ব)।

কলা-বিদ্যা তবে কি ? সত্য ত ধ্যানলব্ধ প্রকাশ! সত্য-দর্শন মহাপুরুষের বরের মত অব্যর্থ, ইহাতে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিবেই,—সত্য দর্শককেই সুন্দর করুক বা তাঁহার চিত্রকেই করুক। যিনি নিজে মধুময় হন তাঁহার মধ্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির ভার ভগবান নিজ হস্তে রাখিয়াছেন,—সে সৌন্দর্য্যে বুদ্ধদেব বা চৈতন্যের আবির্ভাব

হইবে। যিনি দৃষ্ট সত্য প্রকাশ করিবার অভিমান রাখিবেন, তাঁহার কথা এখানে আলোচ্য। যাঁহার উপলব্ধি নিঃসংশয় হয় নাই, তাঁহার বিকাশ-চেষ্টা একটা ব্যর্থ আড়ম্বর মাত্র হইবে। আর যাঁহার উপলব্ধি সম্বন্ধে সংশয় নাই, তিনি ভিতর হইতেই প্রকাশের জন্য একটা প্রেরণা ও আদেশ অনুভব করিবেন, এবং যতদিন না সে আজ্ঞা তিনি পালন করেন ততদিন তাঁহার নিস্তার নাই। হইতে পারে তিনি নিঃসম্বল, কিন্তু সম্বল তাঁহার আসিয়া জুটিবে,—Bede সাহেব Caedmon সম্বন্ধে এইরূপ কহেন। রামায়ণকারের পূর্ব্বেতিহাস তস্করতা, শকুন্তলাকারের পূর্ব্বেতিহাস সম্বন্ধেও জনশ্রুতি বিশেষ গৌরবের নহে,—কিন্তু তথাপি তাঁহারা বাল্মীকি ও কালিদাস ত হইয়াছিলেন! 'হঠাৎ কবি' দেখা যায়,—সে সব পূর্ব্ব-সংস্কার,—হিন্দুর চক্ষে তাহার অন্যবিধ ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কবিত্বাদি এ জন্মের সাধনার ফল। যাঁহাদের লিপিকুশলতা বা বর্ণসমাবেশ ও সংস্থান জ্ঞান আছে তাঁহারা নিখুঁত করিয়া আঁকিতে পারেন,—কিন্তু এই দোষশূন্যতা একটা কায়দা মাত্র,—যাহার ভিতরে বস্তু নাই উপরে অলঙ্কার তাহার কুশ্রীতা বৃদ্ধি করে মাত্র,—আর যাহা ভিতরে সুন্দর তাহা অলঙ্কারহীন হইলেও সুশ্রীই দেখায়, —অবশ্য জহুরীর কাছে, যাঁহার প্রাণ সেইরূপ সৌন্দর্য্যের একটা অনির্দ্দিষ্ট (vague) আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাদেরই কাছে। তবে এটা ঠিক প্রকাশার্থী কাজ হাতে লইয়া যদি শ্রমে কৃপণতা করেন, সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে নিজের যাহা ধারণা—তাহা নিরলঙ্কার বা সালঙ্কার যে দিকেই হউক—ঠিক সেই ধারণানুযায়ী যদি তিনি কাজ করিতে অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই সুখী হইতে পারিবেন না। কলা-সাফল্যের মানদণ্ড আত্মতৃপ্তি। পরকে দেখাইবার বা শুনাইবার জন্য নহে, নিজের ধ্যানদৃষ্ট বস্তু নিজের নিকট সর্ব্বসময় লক্ষ্য করিয়া রাখিবার জন্য যে প্রয়াস তাহাই তাঁহার প্রসাধন। কারণ নিজের জন্য যাহা করা যায় তাহাই খাঁটী, পরের জন্য যাহা করা যায় তাহা অন্ধকারে ঢিল মারা মাত্র; এ সম্বন্ধে Poloniusএর কথা চিরস্মরণীয় ঃ—

To thy own self be true
and thou can'st not be false to any man.

এখানেও মানদণ্ড নিজের হাতে। যদি সে পরিমাপ অপরের পক্ষে উপযোগী না হয়—তাহা হইলে আর তিনি কি করিবেন? ভবভূতির মত তাঁহাকে মনের

মানুষের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে ও বলিতে হইবে "কালোহ্হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী," সাধকের এ প্রতীক্ষা কালে ত সার্থক হয়ই, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সঙ্গে সঙ্গেই ফলপ্রসূ হয়, কারণ চিত্রটী তাঁহার অন্তর্দেবতার আদেশ পালন, and a good work rewards itself।

(১)

সৌন্দর্য্যের কোন নির্দ্দিষ্ট অবযব আছে বলিয়া বোধ হয় না। অতি বড় কুৎসিত ব্যক্তিও তাহার পুত্রকন্যার নিকট সুন্দর,—সে কুৎসিতকে ছাড়িয়া তাহারা অতি বড় সুশ্রী ব্যক্তিরও অনুসরণ করিবে না। এইরূপ অনেক আছে। ফলকথা সৌন্দর্য্য দেহবদ্ধ নহে, মনের রং তাহাকে রাঙ্গাইয়া তুলে। তবে যে অরুণোদয়, সূর্য্যাস্ত প্রভৃতিকে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুন্দর বলিয়া থাকি, সেখানেও দৈহিক আদর্শের একতা তাহার কারণ নহে। অরুণদেব রজনীর তমিস্রার সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতের জাড্য দূর করিয়া বিশ্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন,—মানুষ এই অলৌকিক ব্যাপারে মুগ্ধ হইয়া নিজের কথা ভুলিয়া যায়, ঊষাকালকে সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া মনে করে। সূর্য্যদেব যখন অস্তোন্মুখ হইয়া কর্ম্মক্লান্ত জগৎকে বিশ্রামের আশ্বাস দান করেন তখনও মানুষ ঐরূপ অভিভব অনুভব করিয়া সূর্য্যাস্তকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করে। পিতামাতার আবির্ভাব শিশুসন্তানের পক্ষে যে কারণে আনন্দের সূর্য্যাস্তাদিও সেই কারণেই বিশ্বজগতের আনন্দের বস্তু। সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যবোধের মূলে সেই একই কথা—আত্মবিস্মৃতি ও ক্ষুদ্রতা অতিক্রম

সামঞ্জস্যের সহিত সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। মানুষ চায় বিশ্বজগতের আনন্দ, কাহারও অসুখ বা নিরানন্দ চাহে না,—যখন চাহে তখন হয় সে দ্বেষান্ধ, নয় সংকীর্ণতা-বুদ্ধিতে বিমূঢ়চিত্ত। এই সামঞ্জস্যের বাহ্যমূর্ত্তি প্রতিসাম্য—symmetry। ভাবমূর্ত্তিকে দৃশ্যমূর্ত্তিতে পরিণত করার নাম শিল্প, ইহার সমস্ত নিয়ম নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

মানুষ সৌন্দর্য্যের প্রাচীন উপাসক। সৌন্দর্য্যবোধ জিনিষটী খুব পুরাতন, মানুষ নাকি বসনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভূষণের পক্ষপাতী। এ পক্ষপাতের জের আজিও মিটে নাই। তাই লজ্জা ও শীতবস্ত্র অপেক্ষা বস্ত্রবিলাসেই অত্যধিক ব্যয় হইয়া থাকে। মনে হয় জীবন যেন সৌন্দর্য্য-সীমায় অভিযান—তাহাই সভ্যতা।

অথচ সৌন্দর্য্যের একটা বাহ্য আদর্শ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। প্রবাদ আছে এক পেচক সুন্দরশ্রেষ্ঠের অনুসন্ধানে জগৎ পর্য্যটন করিয়া শেষে কোটরস্থিত শাবকটীকেই তাহার মুক্তাহার পরাইয়া দিয়াছিল। গলগণ্ডের দেশে সহজ মানুষ নাকি এক বিস্ময়কর বস্তু। এ যেন মরুক্ষেত্রে মরীচিকার অনুসরণ, গন্ধোন্মত্ত কস্তুরীমৃগের কস্তুরী সন্ধানে ছুটাছুটী। তাই কি বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন—

"জনম জনম হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

একি বিকৃত মস্তিষ্কের চিন্তার ছিন্নসূত্র গ্রথিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস? সহজকে হারাইয়া জটিলতার সৃষ্টি? এ যেন অন্ধের চিত্র-দর্শন প্রয়াস।

সৌন্দর্য্যের যে উপাসক নহে সে নির্জ্জীব ও জড়। সে নির্জ্জীবতা জনসমাজে দুর্লভ। কোন না কোন রূপ সৌন্দর্য্যের অনুশীলনে মানুষ মাত্রেই আত্মহারা। তবে যে যে পরিমাণে দেহবুদ্ধি তাহার সৌন্দর্য্যদর্শনও সেই পরিমাণে দেহনিষ্ঠ। (১) মনে অভাববোধ নিরাকৃত হইলে সর্ব্বত্রই যেন আনন্দের হাওয়া বহিতে থাকে, সব জিনিষের মধ্যেই আমরা সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া থাকি। ইহা কল্পনাই বটে, কিন্তু কৃপা ভিন্ন তাহা আইসে না, এবং কল্পনার মধ্যেই বোধহয় সৌন্দর্য্যের বসতি—যিনি যে পরিমাণে ভগবৎ কৃপার অধিকারী তিনি সেই পরিমাণে সৌন্দর্য্যভোগেরও অধিকারী। (২) কতকগুলি জিনিষ আছে,—সেগুলি যেন চিরসুন্দর। তাহারা নিজেদের বিরাটত্বে আমাদিগকে নিজ নিজ ক্ষুদ্র চিন্তা ভুলাইয়া দিয়া হৃদয়ে নূতন সুরের সৃষ্টি করে,—যাহার হৃদয় অত্যন্ত অভিভূত সে-ই কেবল এই সমস্ত বিরাট সুন্দরের আকর্ষণেও বিচলিত হয় না। বিরাটত্ব কখনও কখনও ধারণা-শক্তির অতীত হইয়া পড়ে—কখনও বা তাহাকে পীড়িত করে—এ উভয় ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য্যবোধ তিরোহিত হয়। শব্দ ও আলোক-তরঙ্গের ক্ষিপ্রতা এক একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই কর্ণ ও চক্ষুর অগোচর হইয়া যায়। সেইরূপই একটা নিয়ম মন সম্বন্ধেও খাটে। শুনা যায় একজন গরীবলোক জুয়াখেলায় হঠাৎ একলক্ষ টাকা লাভ করিয়া পাগল হইয়া গিয়াছিল। একজন লক্ষপতি বা কোটীপতির ত কথাই নাই, একজন সহস্রপতিও এরূপ ভাগ্যোদয়ে অতদূর বিচলিত হইতেন না। আমরাও বিরাটত্ববোধের যে স্তরে সেই স্তরের অল্প উপরে হইলেই অভিভব এবং অত্যন্ত উপরে হইলে মূঢ়তা অনিবার্য্য। বিরাটের মধ্যেও একটা আকর্ষণ,—যাহা মানুষের

চিরজীবনের কামনীয়, তাহার মধ্যে যে সত্য আছে তাহাই সুন্দররূপে আবির্ভূত হয়,—এই জন্যই প্রভাত, সন্ধ্যা, ঝঞ্ঝা, সমুদ্র ও আকাশ আমাদিগকে যে কেবল মূঢ়ই করে তাহাই নয়, বিচলিতও করে। (৩) সৌন্দর্য্যের অব্যবহিত ফল যে তৃপ্তিবোধ তাহা কাম্যলাভের মধ্যেও আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে স্বর্গনরক প্রভেদ। দুয়েই অতৃপ্তি আইসে, সৌন্দর্য্য সেবকও বলেন "জনম জনম হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" কিন্তু ইহার মধ্যে যে অতৃপ্তি তাহা অনন্তকে নিঃশেষ করিতে না পারার অতৃপ্তি, যাহা নিতুই নূতন—joy for ever—তাহার মধ্যে সদাই নূতন কিছু দেখিতে পাওয়ার জন্য কৌতূহলপূর্ণ অক্লান্ত অনুসরণ। ইহাতে পুরাতনের উপর বিরক্তি নাই, বরং গাঢ়তর অনুরক্তিই হইয়া থাকে। কিন্তু কামীর অতৃপ্তি অবসাদ ও ঘৃণাজন্য,—তাহার ভোগ্য দুইদিনেই পুরাতন হইয়া যায়, তখন সে আবার এক নূতনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। (৪) সৌন্দর্য্যের আর এক কারণ নূতনত্ব। নবোঢ়া বধূ যে সৌন্দর্য্যে চিরজয়ী হইয়া থাকেন ইহার প্রধান কারণই এইখানে। কিন্তু নূতনত্ব অধিক দিন টিঁকে না, অত্যন্ত পরিচয়ের ফলেও যেখানে আকর্ষণের ন্যূনতা হয় না সেখানে সুন্দর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া সত্য ও শিবময় হইয়া উঠে। কিন্তু কাব্য বা চিত্রে এ সৌন্দর্য্য বজায় থাকে কিরূপে? সেখানে ত আর প্রেমের আবির্ভাব কল্পনা করা যায় না? এখানে বাহাদুরী কলাবিতের,—তিনি ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়া যে বৃহতের পরিচয় দেন তাহা আমাদের চির আদরের সামগ্রী,—তাহা পুরাতন হওয়া অসম্ভব। "মা নিষাদ"—কবিতা এই জন্যই আদি কবিতা,—ইহাতে কবির পুনর্জ্জন্মের পরিচয় আছে। বাল্মীকি রত্নাকরকে যে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ এখানে আছে। নতুবা সুপ্রাচীন নর-ঘাতকের চক্ষে পক্ষীঘাতকের শরত্যাগ এত বিসদৃশ বোধ হইবে কেন? অভিশাপ অপরূপঃ—"রে নিষাদ তুই প্রতিষ্ঠালাভ করিবি না"; নিষাদ যেন প্রতিষ্ঠার জন্য কতই লালায়িত। কোপে এই কোমলতা ঋষিত্বের লক্ষণ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পরিচয় "কাম-মোহিতং" শব্দটীর মধ্যে। পরপারের অপূর্ব্ব আনন্দে যাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ তিনি এ পারের ক্ষুদ্র সুখের সম্বন্ধেও কেমন সহানুভূতিসম্পন্ন! "Let them enjoy their little bliss"—ইহাই যেন তাঁর গানের ধূয়া। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিতা বা চিত্র যাঁহারা অঙ্কিত করিতে পারেন তাঁহারা জগতের চিরবন্ধু, মহোপকারক,—রোগ-শোক-দুঃখ-সন্তপ্ত জীবকে ক্ষুদ্রতা ভুলিবার এক এক মহোপকরণ তাঁহারা

যোগাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে ভুলিবে তাহার নিজের মধ্যে অন্ততঃ একটু স্থিরতা ও শান্তিভাব চাই ('শান্ত' ভাবই ধর্ম্মপথের প্রথম ভাব)। নতুবা দেখিবে কে? রেলে চড়িয়া যে ছুটিতেছে কোন্ সৌন্দর্য্য তাহার চোখে পড়ে? সংসারের চিন্তা লইয়া দিনরাত্রি যাহারা নিমগ্ন তাহারা উচ্চ চিন্তা করিবে কখন? অন্ততঃ একটীক্ষণও নিজের মধ্যে ফিরিবার উপায় থাকা চাই।

কিন্তু ব্যবচ্ছেদের ন্যায় সৌন্দর্য্যনাশী আর কিছুই নাই। "মা নিষাদ" শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে আর তাহার সৌন্দর্য্য থাকে না। জগতে ঐ শ্লোকটীর পরিবর্ত্তে তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাটী মাত্র যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে বোধহয় তাহার পাপতাপ-নাশিনী শক্তি থাকিত না। ধর্ম্মপ্রচারক জগতে অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশে বা নীতি-প্রবন্ধে সাধারণ জগতের কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ উপদেশ চায় না, চায় উপদেশ-সাফল্যের পূর্ণ চিত্র। তাই সাহেবরা বলেন, nothing succeeds like success। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের উপদেশ ও উপদেষ্টাকে অভিন্নভাবে না পাইলে আমরা কেবল উপদেশে জ্ঞান লাভ করিতে চাহি না। এই synthesis কেবল শিল্পের অংশগুলির সমাহার নহে, উপদেশ ও উপদেষ্টার সমাহার—ইহাই শ্রেষ্ঠ শিল্পের লক্ষণ। Art যাহাকে বলে তাহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ইহাই। ইহাও ভগবদ্দত্ত। Selection ও collection—analysis ও synthesis লইয়াই art। আদর্শের একটা অস্পষ্ট কাঠামো মাত্র শিল্পীর মনশ্চক্ষে হাজির থাকে, সহস্র চেষ্টায় তাহাকে মূর্ত্ত করাই তাঁহার কার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাই artএর সাধনা। ঐরূপ মানস চিত্র (অবশ্য অস্পষ্ট) যেখানে নাই সেখানে চিত্র ও শিল্প অসম্ভব, এবং যেখানে আছে সেখানে অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকা, মানসা-দর্শ চিত্রে সম্যক্ পরিস্ফুট না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং artকে ভগবদ্দত্ত ও সাধনায়ত্ত মনে করিতে হইবে।

অনেকে বহুবিধ সুন্দর জিনিষের একত্র সমাবেশ করিয়া এক নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধন করিতে চাহেন। কিন্তু অংশের সহিত অংশীর এক অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন গাছের ফুল আনিয়া এক সঙ্গে সাজাইলেই একটা অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয় না। যে কোন দুই রাসায়নিক দ্রব্যকে মিশাইয়া যেমন একটী জীবন্ত ও স্থায়ী যৌগিকের সৃষ্টি হয় না সেইরূপ যে কোন সৌন্দর্য্য-সমবায় হইতেই এক পূর্ণতর সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হয় না। দ্রব্য দুটীর

ন্যায় যে কোন দুই জাতীয় উদ্ভিদ্, পুষ্প, পশুপক্ষী বা মানবের মিশ্রণেও স্থায়ী কোন নূতন জীবনের সৃষ্টি করে না। তবে যদি কোন বৈজ্ঞানিক তাহাদের জীবনের গূঢ় মন্ত্রটী আবিষ্কার করিয়া অপরিচিতের মধ্যে সম্মিলন স্থাপন করেন সে বন্ধন স্থায়ী হইতে পারে। সৌন্দর্য্য ও জীবন অভিন্ন। ভারতীয় ভাবের সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষার যেমন একটা মৌলিক পার্থক্য আছে উভয় স্থানের সুরের মধ্যেও সেইরূপ। ভারতীয় দুই সুরের মধ্যেও যথেচ্ছ মিলন কায়দার সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বত্র জীবনের সৃষ্টি করিবে না। ইমন ও কল্যাণের মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছে বলিয়া যে ঐরূপ সর্ব্বত্রই মিশ্রণ সম্ভব হইবে তাহা নহে। সুরের গূঢ়তত্ত্ব ও তৎ-সম্বন্ধে বিশ্বপতির অভিপ্রায় যিনি অবগত নহেন তাঁহার পক্ষে মিশ্রণ-প্রয়াস অনধিকার চর্চ্চা।

৺অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ

আবর্ত্ত

৫

বিজন দুদিন পরে বেলা ৯৷৷০ টায় এসে উপস্থিত! সঙ্গে মাত্র একটি স্যুটকেশ, একটি 'কুশান' ও গরম জল রাখবার বোতল। টাঙ্গা থেকে নামতেই সুজন টের পেয়ে নিজের হাতে স্যুটকেশটি নিয়ে বিজনকে ভেতরে আনলে।

বিজন বল্লে, 'সুজনদা, তার পেয়েই চলে এলাম। কোনো অসুখ বিসুখ করে নি ত? রমাদি কেমন আছে?'

'সকলেই ভাল আছেন। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।'

'তা আমি আগেই ভেবেছি। অসুখ করলে আমাকে ডাকবে কেন? আমারই অসুখ করলে তোমরা আসবে।'

সুজনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল দেখে বিজন অপ্রস্তুতে পড়ে বল্লে, 'দেখতে ইচ্ছে করছিল, না ছাই! শুকনো দেশে এসেও বাঙ্গালী যে রোমান্টিক সেই রোমান্টিক! তোমার চিঠি আমার মোটে ভাল লাগেনি কিন্তু।'

সুজন কপালে হাত ঠেকিয়ে হতাশার ভান দেখালে।

'তোমার চিঠি রওনা হবার ঠিক আগে পেলাম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম টর্ম্ম বুঝি না, সুজন দা। তুমি আমার অবস্থা নিয়ে খোঁটা দিলে কেন? আচ্ছা, সে হবে'খন। রমাদি কোথায়?'

'বাসা নিয়ে বড় গোলমাল চলছে। আপাততঃ একটা ছোট বাড়িতে আছেন। তুমি এসেছ, শীঘ্রই একটা ভদ্র বাড়ি সন্ধান করতে হবে।'

'এখন আমি কোথায় থাকব, বা রে! ছোট বাড়িতে আমার কোনো কষ্ট হবে না।'

'আপাততঃ এইখানেই থাক। অক্ষয় আমাদের আত্মীয়। অবশ্য এই বাড়িটাও বড় নয়।'

'কেন, আমি সব জায়গায় থাকতে পারি। এ ত বেশ ঘর!'

'তুলনায় অবশ্য, ভাব দেখি বিজন এক এক পটিতে কতগুলো কুঁড়ে ঘর, তার মধ্যে দশ বারো জন লোক, মায় বাছুর বক্‌রিটা পর্য্যন্ত।'

'ও-রকম ঠাট্টা বই পড়ে সকলেই করতে পারে, দেখতে যদি নিজের চোখে—টিটেগড়ে, কাঁকনাড়ায়, খিদিরপুরে। ঘর দশ ফুট বাই আট ফুট, ছ জন মানুষ, স্বামীস্ত্রী এক জোড়া, বড় ছেলে, বিবাহিতা মেয়ে, জামাই গেছে জেলে মাৎলামি ও

মারপিট করে একজনের সঙ্গে, সে লোকটা না কি মেয়েটার সঙ্গে ভাব করছিল, ছটো বাচ্ছা, আফিম মাখিয়ে চোষায় যাতে সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে, বিরক্ত না করে কাজে—তার ওপর আবার একটা ছাগলী ও তার বাচ্চা, সেই দুধ খায়, আবার বেচে।'

'কে অস্বীকার করছে! মুখ হাত পা ধুয়ে নাও।'

সুজন বিজনকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল, ঝিকে খাবার তৈরী করতে বল্লে। দীপা উঁকি মেরে পালিয়ে গেল।

সুজন তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর ফর্সা চাদর পেতে, টেবিল সাজিয়ে রাখলে। বিজন স্নানের ঘর থেকে এসে সুটকেশ খুলে কাপড় চোপড় বার করতে বসল।

'একটা গরম কিছু বার কর, পুল্-ওভার আননি? শাল এনেছ? আমারটা নাও। এখনকার জন্য বলছি না, সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পড়ে। টেনিসের কাপড় আননি কেন? টেনিস চলছে কেমন? মামাকে চিঠি লিখব লিখব করে লেখা হয় নি।'

'লিখতে হবে না। এ সীজনটা খেলব না। কেমন ভাল লাগছে না।'

'শরীর খারাপ নয় আশা করি। অভ্যাসটা রাখ, নইলে ওঠবার মুখে ছেড়ে দিলে ঝুলে যাবে খেলা।'

'শরীর খুব ভাল, সে জন্য নয়, কেমন যেন মন চাইছে না।'

'মনের আবার কি হল?'

'তোমায় ত লিখেছিলাম, উত্তরে কেবল বিদ্রূপই করলে।'

'তুই একটা আস্ত পাগল!'

'না সুজন দা, মনে হয় আমার কোনো অধিকার নেই। সাউথ ক্লাবের সবুজ ঘাস, তার ওপর দুধের মতন সাদা বল, ফেনার মতন ফ্ল্যানেল ট্রাউজার্স আর খেলার শার্ট দেখলে আমার কষ্ট হয়। আমার টেনিস খেলে বাবুয়ানা করা উচিত নয়।'

'অধিকার নেই, না, উচিত নয়?'

'যাই বল। তফাৎ করছ কেন?'

'অধিকার মানে জোর জবরদস্তী করে কেড়ে নেওয়া—বোধ হয়, রমাদিকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

'চল তাঁর কাছে যাই।'

'আগে কিছু খেয়ে নাও।'

'তাঁর ওখানেই চা খাব'খন।'

ঝি চা ও খাবার নিয়ে এল, গরম জিলিপী দেখে বিজন লোভ সম্বরণ করতে পারলে না।

'সুজন দা, এখানে কোলকাতার জিলিপী পাওয়া যায়?'

'এখানে অনেক বাঙালী থাকে কি না, তাই। ফিরীওয়ালারা 'বাঙালী মিঠাই' ও 'কলকাত্তিয়া কেলা' বলে হেঁকে যায়। এদেশের জিলিপী খুব বড়, নাম 'জিলেয়বী', আমাদের অমৃতী গোছের। বিজন মনে আছে ফিরিঙ্গিরা কেমন জিলিপী ভালবাসে? তোমার রুচিটা একটু সাহেবী ধরণের।'

'তুমি জান না, কুলিদের ছেলে মেয়েগুলোকে জিলিপী দিলে লাফিয়ে কোলে আসে। চল, রমাদির বাড়ি যাই।'

'বিকেলের দিকে যাওয়া যাবে। তা হলে, তোমার টেনিস খেলায় বিবেকের আপত্তি?'

'যাই বল, এবার খেলব না, ধরই না বিবেকের দংশন, আপত্তিটা কি?'

'বিবেক মানতে কেমন খচ্ খচ্ করে।'

'তোমার সাহেবরা আজকাল মানছেন না বুঝি, না, খগেন বাবুর আধুনিকতম মত?'

'খগেন বাবু এখানে থাকেন না।'

'ভদ্রলোক কি করছেন আজকাল?'

'ভ্রাম্যমাণ, পর্য্যটক বলতে পার।'

'স্বামীজি! ঐরে! হিঁদুয়ানীর রোগে ধরেছে!'

'এখানে আসবেন শুনছি।'

'কবে? তার আগেই পালাতে হবে।'

'তাঁর আসা পর্য্যন্ত না হয় থাক! রমাদি একলা।'

'কেন তুমি আছ ত!'

'আমি! আমি আর কত সঙ্গ দেব?' বলেই সুজন মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বিজনের মুখে আশ্চর্য্যের চিহ্ন ফুটে উঠল। সুজন তাই দেখে বিজনকে স্নান করবে

কিনা প্রশ্ন করলে। বিজনের চুলে কয়লা জমেছে, তার গরম জলে সাবান দিয়ে স্নানের প্রয়োজন। সে হাত, মুখ ও মাথা ধুয়েছিল, তাই আবার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিজন বল্লে, 'ব্যাকব্রাশই ভাল, হাঙ্গামা নেই, একটু য়্যাঞ্জোরা মাখলেই সারাদিন চুল ঠিক থাকে। রাত্রে খিদিরপুর থেকে এসে স্নান করি—সেই সুবিধে।'

'তা বেশ কর। তাদের সামনে একটা আদর্শ ধরা চাই। তা ছাড়া, রাত্রে স্নানের কত সুবিধা, ঘুম হয়!'

'ঘুমের কোনো কষ্ট হয় না।'

'এখনও হল না! এই বয়সেই সুরু হয়। এত ভাবো, অথচ সুনিদ্রা হয়, আশ্চর্য্য লাগে কেমন!'

'আজকাল ঠাট্টাটা তোমার বেশ আসছে দেখছি! তোমার চিঠিটা আমার মোটে ভাল লাগে নি। যদি না তার করতে এমন কড়া চিঠি পেতে, দেখতে তখন কেমন মজা! আর একটু চা খেলে মন্দ হয় না।'

'এখন খেয়ো না। ভাত খেয়ে ঘুমোও। ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুর জন্যে যদি চিঠিটা ভাল না লেগে থাকে তবে সেটি জানবার বাসনা আছে।'

'কি জানি কেন মনে হল, যেন বিনিয়ে বিনিয়ে লিখেছ। ও-রকম আমার পোষায় না, মনে এক, মুখে এক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম টর্ম্ম বুঝি না, অতএব তার সঙ্গে সোশিয়ালিজমের সম্বন্ধ কতটুকু তাও জানি না। তুমি খগেন বাবুর মতন লম্বা লেক্‌চার দিলেও আমি যে ইডিয়ট্ সেই ইডিয়টই থাকব। তুমি খগেন বাবুর মতনই একটি বুর্জ্জোয়া। কেবল প্রশ্ন আর সমস্যা, সমস্যা আর প্রশ্ন। দোষ দিচ্ছি না তোমাদের। যে সোশিয়ালিষ্ট সে কখনও রাগ করবে না, কারুরই ওপর। কারণ সে বুঝবে—বোঝা মানেই মাপ করা—তোমরা একটি বিশেষ যুগের ধনোৎপাদন-পদ্ধতি থেকে উৎপন্ন এবং তারই শেষ ফসল। সে-যুগের, সে-পদ্ধতির এককালে অনেক কিছু দেবার ছিল, আমরা লাভবানও হয়েছি। কিন্তু এখন তার দেবার বেশী কিছু নেই, যেমন, আসতে আসতে কাশীর পথে লালমাটি দেখলাম, একটা ঘাস পর্য্যন্ত নেই, অথচ গরু চরছে, কি যে খাচ্ছে সেই জানে। এখন নতুন যুগ এসেছে. নতুন পদ্ধতি এসেছে, তার ফলে সমাজ-শক্তির নতুন ভাগ হওয়া চাই, তাই হতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাসের এই স্বাভাবিক গতিকে বাধা

দিচ্ছে পুরাতনের জের। তোমরা এই মোটা কথাটি জান না, তাই তোমাদের ওপর রাগ নেই, দয়া হয় কেবল, আর বুঝিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। যত বেশী সোজা জিনিষ না বুঝবে ততই কথা বাড়বে। তোমরা কিছুই দেখবে না চোখ খুলে, আর বলবে, চিন্তা করছি।'

'চোখ খুলতে আমি সদাই প্রস্তুত।'

'মোটেই নও। খরগোস, একদম্।'

'ওরে, নারে না, চোখ খুলেছে।'

'তবে ঝুলে পড়।'

'চোখ খুলেই থাকব। ঝোলা হবে না, ধাতে নেই।'

'তা হয় না। কাজ না করলে চোখ খোলে না। কাজ করা আর ভাবা আলাদা নয়। জানি, বিশ্বাস হবে না, যতক্ষণ খগেন বাবু ইংরেজী বই থেকে বচন উদ্ধার করে ঘাবড়ে না দেন।'

'আমাকে বুঝি খগেন বাবুর শিষ্য ভাবিস?'

'শিষ্য কেবল! রেকর্ড, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস!'

সুজনের মুখটা সিটিয়ে গেল, কিন্তু সংযত হয়ে বল্লে, 'এইখানে তুই খাঁটি সোশিয়ালিষ্ট! তোদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা একেবারে বাজে নয়।'

'তোমরা দুজনেই বুর্জ্জোয়া।'

'তা জানি না, তবে চিন্তার সাহসের সঙ্গে বোধ হয় আর্থিক অবস্থার যোগ আছে।'

'না, না, সে কথা নয়। ছ্যাখ না, খগেন বাবু, তিনি ত চাকরী করেন না, কিন্তু তাঁর যে দাসমনোভাব আমি জোর গলায় বলব।'

সুজন একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'রমাদির সম্মুখে ওসব আলোচনা নাই করলে!'

'কেন ভয় নাকি! নিশ্চয়ই বলব।'

'তোমার সৎসাহস উপভোগ্য।'

অক্ষয় ঘরে এল। অক্ষয় প্রথমে বিজনকে চিনতে পারেনি, কিন্তু পরিচয়ের পর সে উল্লসিত হোলো। তার পিতার জন্য সে আজ যা কিছু তা হয়েছে, তাঁর মতন সদাশয়, আপনভোলা লোক অক্ষয় জন্মে দেখেনি। ভাগ্যিস, আজ

সে সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে, মন তার যেন বলছিল বাড়িতে তার কি একটা প্রয়োজন রয়েছে। বিজনকে সুজন খাতির করেছে নিশ্চয়, বাড়ি তার নয়, সুজনেরই, অতএব বিজনেরই, কোনো সঙ্কোচ যেন সে না করে, যখন যা দরকার তখনই সে যেন হুকুম করে। মহারাজ, ঝি, আর্দালিকে ডেকে সে বলে দিলে যেন তারা সদা সর্ব্বদা মজুদ থাকে সাহেবের হুকুম তামিলের জন্য। বিজনের বাবার প্রতি সে কৃতজ্ঞ, তাঁর কর্ম্মদক্ষতাই তার আদর্শ। তাঁর ওপরওয়ালা এক বড় সাহেব তাঁকে বলেছিলেন, 'তোমার সাহেব হওয়াই উচিত ছিল।' মেজাজ যেন মাটির, অথচ কাজ একটুকরো পড়ে থাকবার জো নেই, এধারে রাশভারী কেমন! সামনে দাঁড়াক দেখি কেউ! হাঁ, ওকেই বলে সাহেব!

বিজন হেঁসে জিজ্ঞাসা করলে,' আপনি বুঝি···'

কিন্তু মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অক্ষয় জোরগলায় প্রতিবাদ জানালে···'না, সে মানতেই হবে। ইংরেজদের চরিত্রে এমন একটি দৃঢ়তা ও এফিশিয়েনসী পাওয়া যায় যেটা অন্য কোনো জাতে দুর্লভ। হাজার বার মানব যে ইংরেজ বড়, তাদের কাছে বাঙ্গালীদের অনেক শেখবার আছে।'

বিজন গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে—'সব স্বাধীন জাতিরাই কাজ করে, সে কাজ ভালও হয়।'

'অমনটি হয় না। হাঁ, জার্ম্মানরা পারে বটে, কিন্তু তাদের গুণ অর্জ্জন করবার সুযোগ আমাদের নেই। ভগবান যা দিয়েছেন তাইতেই আমি কৃতজ্ঞ আর সন্তুষ্ট।'

'কৃতজ্ঞ!'

'নিশ্চয়ই। যার গ্র্যাটিচ্যুড্ নেই সে কি একটা মানুষ! আপনার বাবা একদিন যদি আমার উপকারটি না করতেন তা হলে আজ আমি ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতাম।'

'সে কথা বোলোনা অক্ষয়, তুমি বড় হতেই।'

'তা ঠিক বলা যায় না। অন্ততঃ দেরী হোতো। আমরা কৃতজ্ঞ হতে বাধ্য। ইংরেজ না এলে কি হোতো ভাব দেখি! এ চালাকি নয়, মানতেই হবে ভগবানের নিয়মকে।'

বিজন পায়চারি করছে দেখে অক্ষয় খাবার যোগাড় করতে গেল। সুজনের

তাগিদে খাবার ইতিপূর্ব্বেই তৈরী হয়েছিল। অক্ষয় সকালেই স্নান করে নেয়। নিজ হাতে আসন ও জলের গেলাস রেখে সুজনকে স্নান করতে পাঠালে।

'আজ আপনি এসেছেন, ছুটি নিই, দিই ব্যাটাদের লিখে মাথা ধরেছে। আর পারি না মশাই খেটে খেটে। চলুন আপনাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক।'

অক্ষয় একটা কাগজে ছুটির দরখাস্ত লিখছে দেখে বিজন আপত্তি জানালে। তার আপত্তির ভাষা একটু জোরালো শুনে অক্ষয় আর লিখলে না। অক্ষয় ভেতরে গিয়ে ঝিকে চাপা গলায় হুকুম করলে সে যেন দীপাকে ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, যদি না ঘুমোয়, তবে যেন পাশের বাড়ি নিয়ে যায়, যেন একটুও বিরক্ত না করে। দীপা অপ্রস্তুতে পড়ে পুতুল খেলা বন্ধ করলে।

'ও কে জানিস দীপা? তোর কাকা। একদম অসভ্যতা করিস নি, বুঝলি?'

সুজন স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছে শুনে অক্ষয় তাড়াতাড়ি নেমে এল। একত্রে খাওয়ার সময় আতিথ্যের ত্রুটি মার্জ্জনা করে যতদিন ভাল লাগে ততদিন তার বাড়ি থাকতে বিজনকে অক্ষয় পুনরায় অনুরোধ করলে। খাবার দাবার পর অক্ষয় অনিচ্ছা প্রকাশ করতে করতে কাজে বেরুল।

'চল, সুজন দা, রমাদির বাড়ি যাই।'

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। পথে সুজন বিজনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার চিঠিতে একটা প্রশ্ন ছিল, তার উত্তর কি?'

'কোনটা?'

'ঐ প্রেমটা? তোমাদের সমাজে ওর কিছু কি স্থান আছে?'

'তা জানি না। এখন থেকে কি করে বলব? জ্যোতিষী নই। তবে আমি একটি কথা জানি তোমাদের প্রেম, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, ও-সব বুর্জ্জোয়া। কোথায় স্বামী-স্ত্রী সুখে ঘরকন্না করছে, দেখেছ? একধারে তোমার অক্ষয় বাবু, অন্যধারে আমাদের দিদিটিকে দেখ। কেন সকলে অসুখী জান? এ বলে "তুমি আমার", ও বলে, "তুমি আমার"। বেশ মিষ্ট লাগে, কবিতা লেখা চলে। কিন্তু তার মানে কি? মানে, তুমি আমার ঝি, আর না হয় তুমি আমার খানসামা, বেয়ারা। চাকর-প্রভুর সম্বন্ধকে গিল্‌টি করে সোনা বলে কতদিন চালাবে? আগে দোঁহা-হুঁহু, তার পরে এ ওকে গিলছে, ও একে গিলছে।'

একটু অপ্রস্তুতে পড়ে বিজন ঢোক গিলে বল্লে, 'আচ্ছা, সোজা করে বুঝিয়ে

দিচ্ছি। ব্যাপারটাকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখতে হবে, সুজনদা। চাষবাসের যুগে স্ত্রীর একটা আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। ঘরেও কাজ করছে, আবার মাঠের কাজও করছে। কিন্তু নিজের কোনো আয় নেই, কর্ত্তা টাকা দিত না। কর্ত্তা যত বেশী তাকে বলদের মতন ঘরে বাইরে খাটায় ততই গিন্নীর খাতির বাড়ে। কিন্তু পয়সা দেবার বেলা ঢুঢু, সেটি চলছে না। অবশ্য রক্ষণাবেক্ষণও করতেন কর্ত্তা। কিন্তু কলকব্জার যুগে স্ত্রীজাতটা নিজে রোজগার করছে, এবং আরো করবে। সে এখন দাসী নয়। স্বামীরও দাবী সেজন্য কমতে বাধ্য, স্ত্রীও স্বামীকে আঁচলের চাবি করে ঝুলোতে পারবে না। স্ত্রীজাতি আর অবলা নয়,— কে বলে মা তুমি অবলে!' বিজন নিজেই হো হো করে হেসে উঠল···।

'কি হে! ব্যাপার কি?'

'সে একটা ভীষণ মজার ব্যাপার, দারুণ কাণ্ড, সুজন দা।'

বিজনের হাসি আর থামে না, সেই অবস্থাতেই তুজন রমলা দেবীর বাড়ি পৌঁছল।

সিঁড়ির ওপরে রমা দেবী দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ হয় তুজনের পদশব্দ শুনে কারা আসছে দেখতে এসেছিলেন। তিনি হাত ধরে বিজনকে ওপরের ঘরে আনলেন।

'রমাদি, স্বর্গের সিঁড়ি যদি এমনি হয় তবে আমি মর্ত্ত্যেই যেন চিরকাল থাকি। এক একটা বাড়ি যেন কেল্লা: এই সব বাড়িতে থেকেই তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে, পরিষ্কার দেখছি। কি হয়েছে তোমার! রঙ ফ্যাকাশে হয়েছে, চোখের কোণের চামড়া কুঁচকেছে। চল কোলকাতায়, সেখানে তোমাকে আমার খুব দরকার, সে তুমি না হলে আর কেউ পারবে না। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের কর্ম্ম নয়।'

রমলা দেবী অজানিতে চোখের কোণে হাত দিলেন, যতদূর পারা যায় তারা তুটি পাশে এনে দেখতে চেষ্টা করলেন কোথায় ও কতটুকু ত্বকের মসৃণতা নষ্ট হয়েছে। বিজন তাই লক্ষ্য করে আবার হো হো করে হেসে উঠল।

সুজন ব্যাখ্যা করলে, 'সে ভারি মজার কথা।'

'কেমন আছ, বিজন? কাশী আসছ খবর পাইনি কেন? এখানে খেলা আছে?'

সুজন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, 'কেন খেলা ছাড়া বিজনের অন্য কোনো কাজ থাকতে পারে না? বিজনের এখন কত কিছু দেখতে হয়। সত্যি বলছি, ঠাট্টা নয়। বিজন এসেছে এখানে মিশনারি হিসেবে।'

রমলা দেবী হাঁসছেন দেখে সুজন বল্লে, 'নিশ্চয়ই। বিজন আমাদের সকলেরই ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের জন্য এসেছে। ওর নতুন সমাজে আমাদের মতন পাষণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীর স্থান দেওয়া চলবে কি না পরীক্ষা করাটাও ওর আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে পুনর্গঠিত করার দুরভিসন্ধিও ও গোপনে পোষণ করছে মনে করা অসঙ্গত হবে না। আমাদের দেখতে আসার মতন রোমান্টিক কিংবা বুর্জ্জোয়া মনোভাব ওর নেই।'

রমলা দেবী হেসে ফেল্লেন, কিন্তু বিজন গম্ভীর হয়ে রইল।

'বিজন আমি তোমাকে সরবৎ পর্য্যন্ত দিতে পারছি না।'

'সেজন্য ব্যস্ত হওয়াটাও বিজন প্রত্যাশা করে না। পছন্দ করে কি না ঠিক জানি না।'

বিজন স্থির দৃষ্টিতে সুজনের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে রমলা দেবীর অস্বস্তি হোলো, কিন্তু সুজন যেন নিশ্চিন্ত। রমলা দেবীর ভদ্রতায় কোণের মেঘ সারা আকাশ ছড়ায় না। তিনি কোলকাতার টেনিসের পার্টনারের কথা তোলেন, কিন্তু বিজন কোনো কথাই যেন গায়ে মাখে না। মন তার ভারী ঠেকে, সুজনদার বিদ্রূপে, রমলা দেবীর অন্তঃসারশূন্য ভদ্রতায়। হঠাৎ মুখে এক পশলা বিরক্তি নামে অক্ষয়ের মতামত স্মরণ করে ; তবু সেটা স্বাভাবিক মনে হয় এই কৃত্রিমতার অবকাশে। রমলা দেবী শোবার ঘর থেকে একটা ছোট কুশান এনে বিজনের পিঠে গুঁজে দিলেন। বিজন আরামে ঠেস দিয়ে বসল। সুজন চোখ নামালে। মেঘ যখন আকাশের একদিকে কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়েছে, তখন বাকী আকাশ অকস্মাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়, নীলে কাচা ধোপদোরস্ত কাপড়ের মতন একটু যেন অতিরিক্ত শুভ্র, কিন্তু পাখীরা টের পায়, ঝাঁকে ঝাঁকে কাক চিলের দল কুলায়ে ফেরে, হালকা তাদের গতি, প্রমথ চৌধুরীর ফরমায়েসী গল্পের মতন, হাওয়ার মুখে ওড়ে, লাট খায়, ভাসে, আবার ফেরে, বর্ষণের পূর্ব্বে নীড়ে চলে যায়।

সুজন গলা খাঁকারি দিয়ে বল্লে, 'আমার চিঠিতে বিজন বিরক্ত হয়েছে।'

'অন্যায় লেখ কেন, সুজন ?'

'প্রশ্ন করেছিলাম।'

'কি ?'

'লিখেছিলাম, তোমাদের সর্দ্দার যদি প্রেমে পড়েন ? বিজনের মতে প্রেম,

সাহিত্য একপ্রকার ভাববিলাস মাত্র, ওর নতুন ভাষায় বুর্জোয়া-বৃত্তি—যদি বিজনদের সর্দ্দার প্রেমে পড়েন তবে কি হবে? সমস্যাটি মনে উঠেছে চার-অধ্যায় পড়বার পর।'

'আমাদের ও-ছাড়া অনেক কর্ত্তব্য আছে! যদি প্রেমে পড়েন তবে সন্দেহের চক্ষে দেখব, একবার, জোর তিনবার ক্ষমা, তার পর ভোট আউট। তবে বৌ নিয়ে যদি জয়মাকালী বলে ঝুলে পড়েন তবে না হয়…'

'জয়মাকালী!'

'দু'বার তিনবার ক্ষমা করবে…! সুজন, জয়মাকালীতে আপত্তি কোরো না।'

'ওদের সবই জয়মাকালী, ধরতাই বুলি!'

'সে থাক। আচ্ছা, বিজন, তোমার বিশ্বাস হয় মেয়েরা পারবে?'

'পারবে বোধ করি, আবার ওদের দেখলে মনে হয় উঁহুঁ পারবে না। অন্তকে উচ্ছন্ন দিলে ঐ এলিটা। পোড়ার মুখী বলতে ইচ্ছে হয়—কেবল লম্বা চওড়া কথার ঝুড়ি! সকলে অবশ্য তা নয়।'

'তা কি করে হবে ভাই। ভাঁড়ার ঘরে যাওনি, নইলে দেখতে, ধামি ধামা ঝোড়া সবই আছে।'

'যতই থাক না কেন, সকলেই নাকের ডগার দিকে চায়, তুমিও যেমন চাইলে রমাদি। আরে বাপু, নিজের চোখ দিয়ে কখনও চোখের চার ধারের চামড়া কুঁচকেছে কিনা দেখা যায়? সকলে নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে সুড়ুক করে দেখে নেয়। আমি কিন্তু ধরে ফেলি।'

রমা দেবী উপদেশ দিলেন, 'আর ধোরো না'। সুজন রমলা দেবীকে আশ্বাস দিলে—'এখনও বিজনের পর্য্যবেক্ষণশীলতা সুপ্রসিদ্ধ নয়, নচেৎ…'

'এবার আমার চোখ খুলেছে, সুজনদা, তোমার আর রমাদির অবর্ত্তমানে। সর্দ্দি হলেও গলাবন্ধ পরি না। বাবাঃ তোমরা দুটিতে মিলে আমাকে খোকা করে রেখেছিলে। এখন আমার চোখে তোমাদের দেওয়া ঠুলি নেই। বেশ ঝাড়া হাত পা—খুব ধরে ফেলি আজকাল।' বিজন বলতে বলতে হাঁসতে লাগল।

'বিজন একটু বিশ্রাম করবে না? কাল ট্রেনে ঘুম হয় নি নিশ্চয়।'

'বিজনের ঘুম হয়।'

রমাদেবী ঘাড় বেঁকিয়ে সুজনকে বল্লেন, 'তুমি না হয় একটু বিশ্রাম কর।' সুজন হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিলে।

'আজকাল সুজনদা, বেশ দিবানিদ্রা হচ্ছে বুঝি? আমার বেলা যত পাপ! আমি আজকাল দুপুর বেলা ঘুরে বেড়াই। রোদ্দুর, বৃষ্টি গ্রাহ্য করি না। বেশ মজা পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে।'

'কি মজারে বিজন?'

'তোমরা ঠাট্টা করবে নিশ্চয়, বিশেষতঃ সুজনদা। কিন্তু কেয়ার করি না। ভয় কিসের? আমি কিছুই করিনি। সেদিন ভারি মজা হয়েছিল—এখনও চলছে। আচ্ছা বলছি, কিন্তু কোনো অর্থ বার করতে পারবে না, বলে দিলাম।'

সুজন ও রমাদেবীর প্রতিশ্রুতি পাবার পর বিজন বলে চল্‌ল—আমাদের সঙ্ঘে দু চারজন মেয়ে কর্ম্মী আছেন। তাঁরা সপ্তাহে দু তিনবার পালা করে খিদির-পুর অঞ্চলে যান। তাঁদের ওপর মজুরীনদের শিক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সকলেই অবশ্য পাশ করা মেয়ে নন, যেমন হয়, জোর ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছেন। আমাদের কর্ত্তাদের বিশ্বাস যে মেয়ে কর্ম্মীদের দ্বারা খুব ভাল কাজ হওয়া উচিত, কারণ তাঁরা "শক্তিস্বরূপিণী"। ভাষাটা যে ভদ্রলোকের তিনি এককালে সন্ন্যাসী ছিলেন, তাই এখনও সকলে তাঁকে স্বামীজি বলে। হিন্দুশাস্ত্র, বিশেষতঃ, তন্ত্রটা তাঁর ঠোঁটস্থ। তাই তাঁর ধারণা যে মেয়েরা খুব মনোযোগ সহকারে কর্ত্তব্য পালন করছেন। আমরা, ব্যাটাছেলেরা যে ক'দিন যাই সে ক'দিন ওঁরা আফিসের কাজ করেন। আমাদের নিয়ম ভারি কড়া। একদিন ভাবলাম, কিছুই হচ্ছে না কোনো দিকে, দেখেই আসি না ওঁরা কি করেন। মনে আমার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোনো প্রকার কুসংস্কার নেই। তাই গেলাম, ভরদুপ্‌পুর বেলায়। আমি একটা খাপরার ঘরে কথা কইছি, ঠিক পাশেই শুনতে পেলাম বাঙ্গালী মেয়ের ভাঙ্গা হিন্দী। খাঁটি বাঙ্গালী, কারণ বাঙ্গাল টান রয়েছে। সে কি অদ্ভুত উচ্চারণ আর ভাষা! শুনলাম কি জান? শুনলাম চুড়ির কথা চলছে পুরোদমে, তার নক্‌সা, ডায়মণ্ড কাটা বুঝলে না, তাই বাঙ্গালী মেয়েটি বল্লে, বরফি বলিস, তোর আদমী সমঝে যায়েগা। সে সব কত কি গয়না জানিও না, হাঁসৌলি, বেসর পরতে মানা করছে সেই মেয়েটা। দশ মিনিট ধরে শুনে গেলাম, ভাবছি এইবার নিশ্চয় সোনা-রপ্তানি, কিংবা স্বর্ণমানের সরল ব্যাখ্যা শুনব। ভাগ্য আমার কখনই সুপ্রসন্ন নয় ছেলে বেলা থেকে, তাই চুড়ির পর চলল বাগেরহাট, ঢাকেশ্বরী মাদ্রাজী, গুজরাটি, আমেদাবাদী···কি বল দেখি সুজনদা? ঠিক বলেছ···ও সব

সাড়ি, ভূগোল নয়। খুব শিখেছ ত! তখনও আশায় বুক বেঁধে আমি ভাবছি এইবার কি করে ধনিক-সম্প্রদায় কাপড়ের কল থেকে টাকা লুটছে মেয়েটি শেখাবে। কোথায় কি! কাকস্য পরিবেদনা। চুড়ির নক্সার পর সাড়ির পাড়···তার পর বিয়ে থা, বাচ্ছা কাচ্ছা। মজুরীন বল্লে, এত বড় ধাড়ি মেয়ে অথচ বিয়ে হয় নি, তার ও-বয়সে দুটো বাচ্ছা হয়েছে, গিয়েছে, তাই আদমী আরেকটা সঙ্গী করতে চায়। আমার ও-সব সাবজেক্ট নয়, ধুত্তোর মেয়েরা···চলে এলাম চটে।

খিদিরপুরের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, দেখি একটি মেয়ে খদ্দরের সাড়ি পরে ছাতা মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ বুঝলাম উনিই। আমি ও-ধারে চাইনি, আমার মুখ তখন অন্য ধারে, গা আমার তখন রিশ রিশ করছে, ওপরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর···এমন সময় শুনতে পেলাম, 'আপনার নাম বিজন বাবু?'

'হ্যাঁ'।

'ছাতা আনেন নি কেন?'

'বেশ করেছি।' তার দিকে চেয়ে জবাব দিই নি, তেমন পাওনি আমাকে, কিন্তু সন্দেহ হোলো মেয়েটা হাঁসছে।

'আপনি এসপ্ল্যানাডে যাবেন ত?'

'হুঁ'—ট্র্যামে উঠলাম। দুপুর বেলাকার সস্তা ভাড়ার জন্য ট্র্যামে খুব ভিড়। যেই একটি ভদ্রলোক পুলের কাছে নেমে গেল অমনি বসে পড়লাম। পাশের ভদ্রলোকটিও যেই নামা, অমনি সটাং মেয়েটা আমার পাশে। তারপর ট্র্যাম চলছে, হঠাৎ আমার জুতোর ওপর এক খোঁচা, ছাতার, সত্যি বলছি হঠাৎ নয়, ইচ্ছে করে। আমি তখন কি করি! সমস্ত ট্র্যামশুদ্ধ লোকের সামনে চটতেও পারি না, তাই একটু হেঁসে ফেল্লাম, কিন্তু লেগেছিল খুব! মেয়েটাও নির্লজ্জের মতন হেঁসে বল্লে, 'এবার থেকে ছাতা নিয়ে দুপুর বেলা বেরোবেন।' আমি ধন্যবাদ জানিয়ে গড়ের মাঠ দেখতে লাগলাম। এসপ্লেনেডে নেমে এত তেষ্টা পেল যে কি বলব! ভাবছি হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর ওপরে গিয়ে একটু আইসক্রীম খাই। মেয়েটির মুখ তখন আম্‌সী, একে বসন্তের দাগ, তায় কুচকুচে রঙ, তার ওপর খদ্দরের মোটা সাড়ি। ভদ্রতারক্ষার জন্য বল্লাম, 'চলুন, আইসক্রীম খাওয়া যাক'।

'আমি আইসক্রীম খাই না।'

'সোডা ফাউন্‌টেনে কোন্ খাবেন?' বুঝলাম, কোন্ কাকে বলে জানে না।

'আচ্ছা, ডাব ?'

'না'।

আপনি কি খান ?'

'বরফ, কাঁচা বরফ।'

সুজনদা, কাঁচা কথাটি যে ভাবে উচ্চারণ করলে তাইতে মনে হলো যে তিনি কাঁচা বরফ নয়, কাঁচা মাথা খান। আঃ···শোন না তোমরা। আমি বল্লাম, 'বাড়ি গিয়ে যা ইচ্ছে খাবেন, রাস্তায় কাঁচা বরফ খেলে কলেরা হবে।'

'তখন সেবা করতে ডাকা হবে না মশাইকে!' বলে নীচের ঠোঁটটা উল্টে দিলে।

আমি সেই মুখের ওপরই জবাব দিলাম, 'ডাকলেই যাচ্ছি যেন! আপনি ত খুব শিক্ষা দেন ওদের! কাজের নামে সাড়ি চুড়ির গল্প করা।'

'ওরা শুনতে চায়।'

'ওরা চায়, না আপনি চান ?'

'ওরাই জিজ্ঞাসা করে।'

'কি প্রশ্ন করে তাও শুনেছি!'

'আপনার ত আজকে পালা ছিল না, কি করতে গিয়েছিলেন ? নিয়ম জানেন ?'

'নিয়ম টিয়ম জানি না। আমি স্বামীজিকে রিপোর্ট করব।'

'আমিও করব। লুকিয়ে শোনা থেকে লাগানো পর্য্যন্ত সবটাই পুরুষোচিত।'

ওধারে ট্রাম এসে গেল, আলিপুরের উকীলের ভিড় ভাঙ্গছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, এবার ভিন্ন সীটে। বউ বাজারের মোড়ের কাছে একবার চেয়ে দেখলাম, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছে···খুব ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আমি কিন্তু রিপোর্ট করতাম না, ঠাট্টা করছিলাম। আমি দেখছি কি রকমে বুঝতে পেরে জোর করেই যেন ঘাড় বেঁকিয়ে রইল। সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা ছোকরা যাচ্ছিল—এমন ছোটলোকের মতন হাঁ করে দেখতে দেখতে। তখন যাবেন কোথায় ? বাধ্য হয়ে সেই ঘাড় ফিরাতে হোলো—ভাবটা, রক্ষা কর। ভাবটা ঐ, কিন্তু ভঙ্গিটা যদি দেখতে! কেবল নাকের ডগা দেখছে। যেন কত লক্ষ্মী, অথচ ইনিই দশ মিনিট আগে কাঁচা মাথা বরফের মতন চিবিয়ে খেতে চেয়েছিলেন। ঐ সব নাকের ডগা দেখা মেয়েদের নিয়ে সোশিয়ালিজম হয়! ও-সব ১৯০৫ সালে চলত! এখন

দেখছি ওদের বাদ দিতে হবে। তোমার দ্বারা রমাদি হতে পারত, কিন্তু তুমিও কেন নিজের মুখটা চোখ বেঁকিয়ে দেখলে ? বল।

রমা দেবী আস্তে আস্তে বল্লেন, 'তা হলে আমি বাদ !'

'তাই ত বিজন ভাবছে। কিন্তু বিজন,...'

রমা দেবী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'কিন্তু আর কি ! তোমার মতে বিজন ভালই করেছে, সংযমী ছেলে।'

বিজন এই প্রকার ব্যাখ্যায় হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—'আমার কি উচিত ছিল ? তার ছাতা নেওয়া ? কিন্তু তার পর কোথায় দাঁড়াত ভেবেছ ?'

'তা হলে দাঁড়ায় নি কিছু ? বাঁচলাম ! যা ভয় পাইয়েছিলে ! তুমি যে বল্লে, এখনও চলছে।'

'চলছে মানে খারাপ নয়। কথাবার্ত্তা বন্ধ।'

'তবু চলছে !'

'রাগারাগি চলছে, তার মানেই চলছে, এটুকুও বোঝাতে হবে আমাকে !'

রমা দেবী মন্তব্য করলেন, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর, বিজন।'

'না রমাদি আমি রিপোর্ট করিনি। কিন্তু এমন ব্যবহার করছে যাতে মনে হয়, যেন আমারই দোষ ! আমি বাবা ও-সবের ভেতর নেই। সোজাসুজি এস, হাঁ, বুঝি, কিন্তু ও সব কি ! নিষ্ঠুরটি কেন হলাম ?'

সুজন বল্লে, 'রমাদি, সোশিয়ালিষ্টদের নিষ্ঠুর না হলে চলে না। যাদের ভাঙ্গতে হবে তাদের কখনও সেন্টিমেন্টাল হলে চলে !'

বিজন অস্থির হয়ে হাত মুখ ধুতে চাইলে। বিজনকে ঘরে পৌছে দিয়ে রমা দেবী ঘরে এসে সুজনকে প্রশ্ন করলেন। 'কেন এনেছ ওকে এখানে ?'

'যদি তোমার ভাল লাগে ?'

'সে-জন্য তোমার অত ভাবতে হবে না, কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই। তা নয়, তুমি এনেছ অন্য মতলবে।'

'মতলব ! যা ভাববে তাই ঠিক।'

'কতদিন রাখবে মনঃস্থ করেছ।'

'ওর যতদিন ইচ্ছে। আমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই খবরটুকু বার বার না দিলেই পারেন, কারণ নিজের কাছেই সেটা পুরাতন, বহু পুরাতন।'

'ভুল বোঝবার ক্ষমতার শেষ নেই তোমার। ওরই কষ্ট হবে।'

'নিজেকে অন্ততঃ ঠকাবেন না। ওর কষ্ট হবে কি না ঐ বুঝবে, এখন ওর বয়স হয়েছে।'

বিজন ঘরে প্রবেশ করে বললে, 'জলটা খুব ঠাণ্ডা ত! তোমাদের আবার কি হল!'

রমাদেবী বল্লেন, 'কিছুই না। এ বাড়িতে তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে সুজন বলছিল। তুমি সুজনের সঙ্গেই থাক না হয়।'

বড় বড় চোখে বিজন সুজনের দিকে চেয়ে বল্লে, 'আমি রিটার্ণ টিকিট কিনেছি। তুমি কি চাও সুজনদা আমি আজই চলে যাই?'

'না। তুমি...'

'আর তুমি, রমাদি?'

'আমি! যেন আমার ইচ্ছেয় সব হচ্ছে!'

'তার মানে তোমারও তাই। তোমাদের কি হয়েছে বল ত? যেন থমথম্ করছে। তোমাদের ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

রমাদেবী চমক ভেঙ্গে বল্লেন, 'কিছুই হয় নি, কেবল বয়স হয়েছে এই যা!'

'রাগ করলে ত চামড়া কুঁচকেছে বলে! তোমার কি সুজন দা?'

'যে একলা তার বয়স একটু জোর কদমে চলে। আমি জন্ম থেকেই বুড়ো, জানিসনে তুই?'

বিজন উত্তেজিত হয়ে বললে—'কেবল হেঁয়ালি আর ঠাট্টাই শিখেছ—বোধ হয় ভাব কালচারের চিহ্ন। ও-সব কালচার বুর্জ্জোয়াদের। তোমাদের ব্যাধি আমি ধরেছি। খগেন বাবুর ইগোয়িজম তোমাদের ধরেছে, সর্ব্বনাশ করবে। থাকগে। অক্ষয় বাবুর সঙ্গে কাশী দেখে কাল কোলকাতা যাব, চল সুজন দা! রমাদি, তুমি আর আজ খেতে বোলো না, এখনও সংসার গোছাও নি।'

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাসলীলা

রাসের রূপকতা

২

গতবারের 'পরিচয়ে' রাসের রূপকতার আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, পরমাত্মার সংসর্গে জীবাত্মার যে অত্যন্ত সুখানুভূতি—তাহা অকথ্য-অবর্ণ্য বলিয়া সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের মিষ্টিকগণ ঐ অনুভূতির ইঙ্গিত করিতে প্রতীক বা symbol-রূপে মদ্য ও মদনের—বিশেষতঃ মদনের প্রচুর প্রয়োগ করেন। এ প্রয়োগ একরূপ সার্ব্বভৌম—সুফি, খৃষ্টান মিষ্টিক ও বৈষ্ণব প্রেমিক—সকলেরই ভূমানন্দের বর্ণনা কামসঙ্কুল, কামায়ন-প্রচুর। এই মদনপ্রতীক প্রয়োগের যে একটা নিগূঢ় কারণ ও উপযোগিতা আছে, প্রসিদ্ধ দার্শনিক উস্‌পেন্‌স্কির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনঘটিত প্রধানতম যে রূপক—রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা—তাহার মধ্যে যে অবাধ কামক্রীড়া প্রবিষ্ট হইবে, ইহা সহজ ও স্বাভাবিক। অতএব আর ভূমিকা না করিয়া এইবার বিশেষ করিয়া রাসের কথা বলি।

আমরা জানিয়াছি, 'রস' হইতে রাসশব্দ—কারণ, রাস সেই ক্রীড়া, যেখানে রস পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, যেখানে মাধুর্য্যের পারমিতা।

> পরমরসকদম্বময়ো ব্যাপার-বিশেষঃ রাসঃ—সনাতন গোস্বামী
>
> দামোদর কহে কৃষ্ণ রসিকশেখর
>
> রস-আস্বাদক, রসময় কলেবর—চরিতামৃত

রাসলীলায় রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ রসময় নায়ক এবং রাসেশ্বরী রাধিকা রসবতী নায়িকা।

> রাধা রাসেশ্বরী রাসবাসিনী রসিকেশ্বরী।
>
> কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিনী॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

আর সখীরা ঐ রসের পুষ্টিকারিণী—উত্তর-সাধিকা—

> রাধাসহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ
>
> আর সব গোপীগণ রসোপকরণ।

রাসলীলার রঙ্গভূমি কোথায়? 'নিধুবন কানন, গুপ্ত বৃন্দাবন'—খৃষ্টান মিষ্টীকের 'the secret garden on which the desire of the soul is ever set'.

বৃন্দাবন ভৌগোলিক স্থান নহে—

বৃন্দাবনের সাহজিক যে সম্পৎ সিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥
পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী সেই বৃন্দাবন ধাম॥
চিন্তামণিময় ভূমি, চিন্তামণি ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণভূষণ॥—চরিতামৃত

এই বৃন্দাবনকে লক্ষ্য করিয়া আর একজন মিষ্টিক লিখিয়াছেন :—

Orison draws the great God down into the small heart: it drives the hungry soul out to the full God. It brings together the two Lovers, God and the Soul, into a joyful room, where they speak much of love.

—Mechthild of Magdeburg

আমরা বলিয়াছি রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক রূপক—(the greatest allegory of the world)। শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়স্ এবং শ্রীরাধা প্রেয়সী। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, আরাধ্য—আর শ্রীরাধা আরাধিকা—

অনয়া রাধিতো* নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ—ভাগবত, ১০।২৮।৩০

She is 'the Soul thirsting for God'.

তিনি—মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী—উজ্জ্বল নীলমণি

প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী॥

'মহাভাবরূপা'—মহাভাব কি? বৈষ্ণব আচার্য্যেরা বলেন, মধুরা রতি যখন 'নিজসুখ-তাৎপর্য্য' সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যান্বিত' হয়, তখন তাহার নাম হয় সমর্থা রতি। এই 'সমর্থা' রতি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হইয়া প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া চরমে মহাভাবে পরিণত হয়। অর্থাৎ রতির ঐ আটটি দশা; দৃষ্টান্ত যথা—বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও সিতোপল।

---

* ইহার সহিত ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪ তুলনীয়—অপি সংরাধনে

অথ সমর্থা প্রথমদশায়াং রতির্বীজবৎ, প্রেমা ইক্ষুবৎ, স্নেহো রসবৎ, ততো মানং গুড়বৎ, ততঃ প্রণয়ঃ খণ্ডবৎ, ততো রাগঃ শর্করাবৎ, ততোঽনুরাগঃ সিতাবৎ, ততো মহাভাবঃ সিতোপলবৎ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উজ্জ্বল নীলমণি-কিরণ

ঐ মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ—

কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র, স রূঢ়ো মহাভাবঃ।

কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্ত সুখং যস্য সুখস্য লেশোপি ন ভবতি, সমস্ত বৃশ্চিক-সর্পাদিদংশ-কৃত দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতি, সোঽধিরূঢ়ো মহাভাবঃ।

অধিরূঢ় মহাভাবের আবার মোদন ও মাদন—এই দুই ভেদ।

মোদনোঽয়ম্ প্রবিশ্লেষদশায়াং (অর্থাৎ বিচ্ছেদের দশায়) মাদনো ভবেৎ × × প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মাদনোঽয়ং উদঞ্চতি। মাদনস্য এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ—যত্র উদ্‌ঘূর্ণ্যা চিত্র-জল্পাদয়োঃ প্রেমময্য অবস্থাঃ সন্তি। × × এষ মাদনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়ামেব, নান্যত্র।

অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাবের চরম 'মাদন'। ঐ মাদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ভাব' এবং ঐ মাদনভাব এক শ্রীরাধা ভিন্ন আর কোন পাত্রে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এ প্রসঙ্গে চরিতামৃতকার বলিয়াছেন ঃ—

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥

রসপ্রবণ চিত্তের যে দ্রব, তাহাই 'ভাব'। রতি যখন 'ভাবে' পরিণত হয় তখন কি হয়?

Love was born with them,
in them so intense
It was their very spirit—
not a sense.
—Byron's Don Juan.

ঐ ভাবের যে পারমিতা, তাহারই নাম মহাভাব—

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।

ভাব অতি দুর্ল্লভ বস্তু—সেই জন্য প্রাচীনেরা বলিতেন—ভাবগম্যোহি কেশবঃ। মহাভাব সুদুর্ল্লভ। বোধ হয় এক শ্রীরাধা ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। সেই

জন্য বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে—'ভাবিনী ভাবের দেহা' বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি Person নন—Principle।

অষ্টসাত্বিক, হর্ষাদি, ব্যভিচারী আব।
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥
× × ×
এত ভাবভূষায় ভূষিত রাধা অঙ্গ।
দেখিয়া উছলে কৃষ্ণের সুখাদিতরঙ্গ।

অন্যত্র কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধা-তত্ত্ব বিবৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন :—

মহাভাব-চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তার কায়বূ্যহ রূপ।
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃতধারার স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।
নিজলজ্জা শ্যাম পট্টশাটী পরিধান ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাবভূষণ প্রতি অঙ্গে ভরি ॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল্।
প্রেমবৈচিত্র্য রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ-প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণে পূর্ণ কলেবর ॥

ইহা হইতে যদি বলি, শ্রীরাধা ভক্তের ভাবমূর্ত্তি, প্রেমিকার মানসপ্রতিমা—তবে কি খুব অসঙ্গত হয় ?

শ্রীরাধার প্রেম আদর্শ প্রেম—পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত মানবীয় প্রেম—'Earthly love raised to the nth degree.—সেই 'Endless love that was without beginning, and is, and shall be ever'.

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥

× × ×

অধিরূঢ় মহাভাব সদা রাধার প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবান্ হেম ॥

সেই জন্য কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা

এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া এই ভাবে রাধাভাবের বর্ণনা করিয়াছেন,—

রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ান।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগে-আন ॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ ॥
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥

মানবীয় প্রেমকে সহৃদয় বোদ্ধারা 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বলিয়াছেন—'that august passion in which the merely human draws nearest to the divine'. মানবীয় প্রেমের যে উন্মাদনা বিড়ম্বনা—ব্যাকুলতা বিপুলতা—মিষ্টিকদিগের ভগবৎ-প্রেমের অনুভূতিতে সে সমস্ত লক্ষণই প্রোজ্জ্বল ভাবে দৃষ্ট হয়। সেই জন্য তাঁহারা ভগবৎ-প্রেমকে—'a desire that is insatiable'—'a glorious folly'—'a heavenly madness' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রেম বিষামৃত—'poisoned cup of love'.

বিষেতে অমৃতে মিলন একত্রে, কে বুঝে মরম তার ?
বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত ঘটন।
এই প্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ॥

আরাধিকা St. Teresa নিজের অনুভূতির এই ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :—

The pain was so great that it made me moan, and yet so surpassing was the sweetness of this excessive pain that I could not wish to be rid of it.

The pain is not bodily but spiritual; though the body has its share in it, even a large one.

অপর মিষ্টিকেরা এই প্রেমকে 'pleasant wound, it burns to heal' ইত্যাদি বলিয়াছেন।

শ্রীরাধার প্রেমে আমরা এই সকল বিশেষণ ও বিবরণের সার্থকতা বুঝিতে পারি। শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি এই ঃ—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম
যেন জাম্বুনদ হেম
　　এই প্রেমা নৃলোকে না হয়। × ×
বাহিরে বিষজ্বালা হয়—
ভিতরে আনন্দময়—
　　কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন
তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
　　মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে
তার বিক্রম সেই জানে
　　বিষামৃতে একত্র মিলন।

রূপ-গোস্বামী কৃষ্ণপ্রেম এই ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥

পীড়াকটুতায়—
নবকালকূটমান করি তিরস্কার,
আনন্দধারায়
সুধার মাধুর্য্যগর্ব্ব করিয়া ধিক্কার—
কৃষ্ণপ্রেমা জাগে সখি! যাহার অন্তরে
বক্র ও মধুর হায়! বিক্রান্তি তাহার
সেই জন মরমে তা' অনুভব করে!

রাধা এই কৃষ্ণ-প্রেমার আর এক বিশেষত্ব অনুভব করেন—ইহা নিতুই নব।

কানুক পীরিতি অনুভব বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়!

শেক্‌সপিয়রের ভাষায়,

Age doth not wither
Nor custom stale *his* infinite variety.

এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ দার্শনিক উস্‌পেনস্কির কয়েকটি বাক্য প্রণিধান-যোগ্য।

Women of the first category (of whom there are very few for each man) arouse in him the maximum feeling, desire, imagination and dreaming. They attract him irresistably, regardless of any barriers and obstacles, often to his great astonishment and in case of mutual love, arouse in him the maximum of sensation; such women remain ever new and ever unknown. A man's curiosity about them never weakens and their love never becomes for him ordinary, possible or explicable. There always remains in it an element of the miraculous and thei mpossible. And there is no fading of his own feeling.

—Ouspensky's A New Model of the Universe. p. 528,

এ সম্পর্কে আধুনিক কবির একটী গীতের উল্লেখ করিতে চাই। কংসবধের পর নন্দ-বিদায় উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সখাদিগকে বলিতেছেন—

আর ত' ব্রজে যাব না ভাই! যেতে প্রাণ নাহি চায়,
ব্রজের খেলা সাঙ্গ হল, তাই এসেছি মথুরায়।

কিন্তু ব্রজবাসীদিগের কি উপায় হইবে?

কেন? খুব সহজ—

আমার মতন বাঁকা হয়ে দাঁড়িও রে ভাই কদমতলায়।

একেই বলে 'রসাভাস'। কবির জানা উচিত ছিল, বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াইলেই 'বঙ্কিমবিহারী' হওয়া যায় না—জগতে এ অবধি একজন মাত্র 'ত্রিবঙ্কিম-ঠাম বনমালী' হয়েছেন।

'আমার হ'য়ে 'মা' বলে ভাই ভুলিয়ে রেখ মা যশোদায়'

—তাই নাকি? যশোদা নীলমণি ভিন্ন কারও ভোলে ভোলেন না! কিন্তু রসাভাসের চরম গোপী সম্বন্ধে—'ননী খেও গোঠে যেও— প্রেম বিলাও গোপিকায়!'

চাতকী তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও নীরদ ভিন্ন কারও জল স্পর্শ করে না—গোপীরা এক গোপীরমণ ভিন্ন আর কার প্রেম গ্রহণ করিবে ?

শ্রীরাধা কি কল্পলোকের রূপকাদর্শ (idealisation) অথবা রাধাভাব কোন দিন এই মরজগতে শরীর গ্রহণ করিয়াছিল ? এ সম্পর্কে ১৩০৭ সালে আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম ঃ—

'এদেশেও মধুর ভাব ভাগবতের সংস্কৃতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী মহাজনেরা অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহাকে সুগম করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সুমধুর পদাবলীতে ভগবানের মধুর ভাব জীবের বোধায়ত্ত করেন। বাঙ্গালী সুস্বর তানে ভগবানের নাম গান করিয়া কবিতার সাহায্যে তাঁহার মাধুর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু আদর্শের অভাবে ভগবান্‌কে মধুর ভাবে ভজন তাহার নিকট কবি-কল্পনা বলিয়া বোধ হইত; দেহধারী রাধা সে কল্পনার চক্ষেও দেখিতে পাইত না। সেই সময় শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া সেই আদর্শ তাহার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করেন। যে সকল মহাভাবের প্রসঙ্গ লোকে ভাগবতে পাঠ করিয়াছিল, মহাজনের পদাবলীতে সঙ্গীতে শুনিয়াছিল, সে সকল তাঁহাতে বিদ্যমান দেখিতে পাইল। শ্রীরাধার যে অবস্থা (অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ, উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র প্রলাপাদি) সাধারণে অলীক কল্পনা মনে করিত, এখন তাহাই শ্রীচৈতন্যে বিকশিত দেখিতে লাগিল।'*

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান।

*   *   *

তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন॥

*   *   *

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ।

*   *   *

'কাঁহা করো কাঁহা পাঙ্‌ ব্রজেন্দ্রনন্দন
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন
কাহারে কহিব কেবা জানে মোর দুঃখ
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাঁটে মোর বুক।'

---

* উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব, পরিশিষ্ট।

* * *

অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমমাধুর্য্য মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥

বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা বলেন, গৌরাঙ্গ অবতারের ইহাই নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কিদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥
অতএব রাধাভাব অঙ্গীকার করি
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥—চৈতন্যচরিত

আমরা দেখিয়াছি, রাস মুখ্যতঃ হল্লীশ—নায়ককে কেন্দ্র করিয়া নর্ত্তকীদের চক্রাকারে নৃত্য। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আমরা 'Divine Dance about Him'-এর কথা শুনিতে পাই—ঐ Dance আমাদের সেই 'হল্লীশ'।

But when we do behold Him, then we obtain the end of our wishes, and rest. Then also we are no longer discordant, but form a truly divine *dance* about Him; in the which dance, the soul beholds the fountain of life, the fountain of intellect, the Principle of being, the cause of good, the root of soul.—Plotinus, Ennead vi. 9.

হল্লীশের নায়ককে গ্রীকেরা Choragus বা Corypheus (the leader of a Chorus) বলিতেন। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া ঐ হল্লীশের প্রসঙ্গে Mysticismএর গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন :—

As a chorus about its choragus, says Plotinus in a passage which strangely anticipates Boehme's metaphor, so do we all perpetually revolve about the Principle of all things. But because our attention is diverted by looking at things foreign to the choir, we are not aware of this * * * Our minds being distracted from the corypheus in the midst, the 'energetic Word' who sets the rhythm, we do not behold Him.

এই গ্রীক হল্লীশের সহিত খৃষ্টীয় রাসের তুলনা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 'Hymn of Jesus' নামক apocryphal খিল গ্রন্থে যিশুখৃষ্ট ভক্তমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থ হইয়া বলিতেছেন :—

"I am the Word who did play and dance all things." "Now answer to my dancing." "Understand by dancing what I do." Again, "who danceth not knoweth not what is being done." "I would pipe, dance ye all !" and presently the rubric declares, "All whose nature is to dance, doth dance !"

'Hymn of Jesus' হইতে উক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া Miss Underhill বলিতেছেন—

Compare with this (Greek) image of the rhythmic dance of things about a divine corypheus in the midst, these strikingly parallel passages in the apocryphal Hymn of Jesus.—Mysticism p., 281.

পরবর্ত্তী খৃষ্টীয় সাহিত্যেও আমরা নানা ভাবে এই রাসের উল্লেখ পাই। খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা বলেন—The transfigured souls move to the measures of a 'love-dance' which persists in mirth without comparison.

কিন্তু কবিগুরু দান্তে (Dante) প্রেমপূত দিব্যদৃষ্টিতে গোলোকে যে নিত্য রাস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা অতি চমৎকারী।

Dante, initited into paradise, sees the whole universe laugh with delight as it glorifies God : and the awful countenance of Perfect Love adorned with smiles. Thus the souls of the great theologians *dance* to music and laughter in the Heaven of the Son ; the loving seraphs, in their ecstatic joy, whirl about the Being of God.

আমরা দেখিলাম, কি এদেশে কি বিদেশে রাস প্রধানতঃ হল্লীশ—

মণ্ডলেন চ যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীশকং তু তৎ।

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন

মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥—চরিতামৃত

যিনি 'নটরাজ', তাঁহার আরাধক-আরাধিকারা যে নৃত্য করিবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী—"All whose nature is to dance doth dance". সেই জন্য দেখিতে পাই নারদ, প্রহ্লাদ, চৈতন্যদেব নৃত্য করেন।

আনন্দ ধ্বনি করি, মুখে বলি হরি হরি

নারদ-ঋষি রত সুললিত নটনে।

প্রহ্লাদের সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন—বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ। চৈতন্যদেবের চিত্তমোহন নৃত্যের কথা কে না শুনিয়াছে—কখনও উদ্দণ্ড নৃত্য, কখনও এমন ভাব-

ময়, মধুময় নৃত্য যাহা দেখিয়া পাষাণও বিগলিত হইত। খৃষ্টান মিষ্টিকদিগেরও নৃত্যগীতের কথা আমরা শুনিয়াছি। এ প্রসঙ্গে St. Francis, St. John of the Cross এবং St. Catherine of Genoaর নাম উল্লেখযোগ্য।

Drunken with the love and compassion of Christ, blessed Francis * * sometimes picked up a branch from the earth and laying it on his left arm, he draw in his right hand another stick like a bow over it, as if on a viol or other instrument, and, making fitting gestures, sang with it in French unto the Lord Jesus Christ.

St. John of the Cross wrote love songs to his Love. St. Rose of Lima sang duets with the birds. St. Teresa, in the austere and poverty-stricken seclusion of her first foundation, did not disdain to make rustic hymns and carols for her daughter's use in the dialect of old Castile.

– Underhill's Mysticism, pp. 526-527.

বস্তুতঃ প্রকৃত রাসলীলা মাটির কঙ্করে নয়, ভক্ত হৃদয়ে—বাহিরে নয়, অন্তরে—ভৌমবৃন্দাবনে নয়, মনঃ বৃন্দাবনে।

অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করে মানি
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা জানি।—চরিতামৃত

খৃষ্টানের মুখেও শুনি—

Tho' Christ a thousand times in Bethelham be born,
Unless He be born *in* you, you are forlorn.

সেই জন্য ভক্ত কালী-কালার অভেদ করিয়া বলেন—

আমার হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে
অসি ফেলে বাঁশী নে মা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

যখন এরূপ হয়, তখনই সত্যকার নিত্যকার রাসের অভিনয় হয়—নতুবা নয়। কবে আমাদের হৃদয় সেই রাসের রঙ্গভূমি হইবে?

ইহাই রাসের রূপকতা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিধাতার বিচার

(সমার্সেট্ মোম্ হইতে)

বিধাতার বিচারালয়ে ওরা তিনজনে এসে অপেক্ষা করছিল, কখন ডাক পড়বে। ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা ক'রে থাকা ওদের পক্ষে নতুন নয়; গত ত্রিশ বছর ধরে ওরা তিনজনে প্রাণপণ শক্তিতে ধৈর্য্য ধরে থাকাই অভ্যাস করে এসেছে। যে মুহূর্ত্তটির জন্য প্রস্তুত হতে ওরা জীবনব্যাপী সাধনা করেছে, আজ সেই মুহূর্ত্ত উপস্থিত; যদিও বিচারক্ষেত্রে পরিণাম সম্বন্ধে খুব নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা যায় না, তবু আশা করবার এবং সাহস রাখবার যথেষ্ট কারণ ওদের আছে। পাপের মোহনীয় পুষ্পবীথিকা ওদের চোখের সাম্‌নে প্রসারিত হয়ে যথেষ্টই প্রলুব্ধ করেছে, তবু ওরা বরাবর তার পাশ কাটিয়ে দুর্গম অলিগলি দিয়ে কষ্টের পথেই চলেছে। বুক ফেটে গেছে, তবু ওরা মাথা উঁচু করে প্রলোভনকে জয় করে এসেছে। এখন সেই দুর্গম পথের প্রান্তে উপস্থিত হ'য়ে ওরা সুখের স্বর্গপ্রাপ্তি প্রত্যাশা করে। বাক্যালাপের কোনো প্রয়োজন নেই, পরস্পরের কথা পরস্পরেই জানে; তিনজনেই জানে ওদের কায়াবিহীন আত্মা বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আনন্দে কত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। যে দুর্নিবার মোহ ওদের জীবনে উপস্থিত হয়েছিল, তাকে যদি ওরা প্রশ্রয় দিত তবে এখন কি তীব্র অনুশোচনাই ভোগ করতে হোতো! যে স্বর্গীয় জীবন ওদের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, মাত্র কয়েক বছরের সুখভোগের জন্যে তা হয়তো একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হোতো! কেউ একটা আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলে যেমন বোধ করে, নিজের হাত-পা-গুলোকে নতুন ক'রে অনুভব করে, বিস্ময়ের সঙ্গে এদিক ওদিক চায়, ওরা এখন সেই রকম বোধ করছে। মনে কোনো দ্বিধা নেই; স্বর্গদূত যখনি ডাক দেবে তখনি ওরা স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হবে। পৃথিবীর জীবন এখন পশ্চাতে রইলো, কর্ত্তব্যপালনে ওদের কোনো রকম ত্রুটি হয় নি। বিচারালয়ে লোকের বড় ভিড়, তাই ওরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে কয়েক বছর ধরে যে মহাযুদ্ধ চলেছে তারই ফলে নানাদেশের সৈনিক পুরুষরা আর উন্নত বয়স্ক যুবারা দলে দলে আসছে বিচারকের বেদীতলে। মেয়েরাও আসছে, ছেলেরাও আসছে বহু

সংখ্যায়,—তাদের মৃত্যু ঘটেছে উৎপীড়নে বা অত্যাচারে, কিংবা শোকে, রোগে, অন্নাভাবে। স্বর্গের বিচারগৃহে তাই বিস্তর লোকসমাগম।

ওদের প্রেতাত্মাও ঐ মহাযুদ্ধের ফলে আজ অন্তিম বিচারের জন্য এসে উপস্থিত। জন্ এবং মেরী যে জাহাজের যাত্রী ছিল, সেখানা ডুবুরি জাহাজের টর্পিডোর আঘাতে ডুবে যায়। আর রাথ্ মেয়েটি পৃথিবীতে সেবার কাজে তার জীবন উৎসর্গ করেছিল, অমানুষিক পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, তার ওপর হঠাৎ প্রাণাধিক প্রিয়ের মৃত্যুর সংবাদ শুনে সে সহ্য করতে পারলে না, ঐ আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটে। জন্ অবশ্য সাঁতার জানতো, স্ত্রীকে সে বিশেষ ভালোও বাসতো না; ত্রিশ বৎসর ধরে বরং তাকে ঘৃণাই করে এসেছে; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে সে কখনো বিমুখ হয় নি, এই দারুণ বিপদের সময়ও কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে সে প্রাণ হারালে।

অনেকক্ষণ পরে স্বর্গদূতরা এসে তাদের ডেকে নিয়ে বিধাতাপুরুষের বেদীতলে উপস্থিত করলে। বিধাতাপুরুষ কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ওদের প্রতি লক্ষ্য করলেন না। দেখা গেল, তখন তিনি কিছু বিচলিত। এর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই বিচার হচ্ছিল একজন যশস্বী বৃদ্ধ দার্শনিকের,—সে ব্যক্তি বিধাতাপুরুষের সুমুখে দাঁড়িয়ে তেজের সঙ্গে বল্‌ছিল যে বিধাতার ওপর তার কিছুমাত্র আস্থা নেই। যিনি সর্ব্বরাজরাজেশ্বর তাঁর এতে কিছুই বিচলিত হবার কথা নয়, বরং তাঁর পক্ষে এটা হাসির কথা। কিন্তু পৃথিবীতে তখন যে ভয়ানক মহাযুদ্ধ চলেছিল তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিয়ে ঐ দার্শনিক আস্ফালন করে বল্‌লে যে বিধাতাকে যে একযোগে সর্ব্বশক্তিমান এবং সর্ব্বমঙ্গলময় বলা হয়, আর তাঁর মধ্যে যে ঐ দুই গুণের একত্র সমন্বয় হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়, সে সব গুণের প্রমাণ কোথায়, আগে নিরপেক্ষ ভাবে সেই কথার মীমাংসা করা হোক।

সে খুব জোরের সঙ্গে বলতে লাগলো—"অমঙ্গল যে আছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুতরাং ভগবান যদি তা নিবারণ করতে অক্ষম হ'য়ে থাকেন তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি সর্ব্বশক্তিমান নন, আর যদি তিনি সক্ষম হয়েও তা না করেন তা হ'লে কিছুতেই তাঁকে সর্ব্বমঙ্গলময় বলা যায় না।"

যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁর কাছে এ তর্ক কিছু নতুন নয়, কিন্তু কোনো কালেই তিনি এর কোনো স্পষ্ট উত্তর দেন নি; আসল কথা এই যে যদিও তিনি সবই বোঝেন

এবং সবই জানেন, তবু এ প্রশ্নের জবাব তিনি জানেন না। স্বয়ং ভগবানও দুই আর দুইয়ে যোগ দিয়ে পাঁচ করতে পারেন না। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাওয়াতে ঐ লোকটির ভারী সুবিধা হয়ে গেল, সে দার্শনিকসুলভ ন্যায় এবং যুক্তিতর্কের দ্বারা একটা বিশ্রী রকমের সিদ্ধান্ত এনে উপস্থিত করলে, আর শেষ কালে এমন একটা কথা বল্‌লে যা ওরকম অবস্থায় বলা অতি মারাত্মক।

সে বল্‌লে—"যে-ভগবান সর্ব্বশক্তিমানও নয় সর্ব্বমঙ্গলময়ও নয়, তাকে আমি কিছুতেই মানি না।"

ওদের তিনজনের আত্মা এতক্ষণ আশান্বিত হৃদয় নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। দার্শনিকের কথা শেষ হলে যেন কতকটা নিষ্কৃতি পেয়ে বিধাতাপুরুষ ওদের দিকে ফিরে চাইলেন। পৃথিবীতে নশ্বর মানুষের আয়ুস্কাল কত অল্প, তবু তারা যখন নিজের কথা বলতে আরম্ভ করে তখন অনেক কথাই বলে ফেলে; কিন্তু মৃত আত্মার সুমুখে যখন অনন্ত কাল প্রসারিত, তখন সে এতই বাচাল হয়ে ওঠে যে কেবল স্বর্গদূত ছাড়া আর কেউ তা ধৈর্য্য ধরে শুনতে পারে না। যাই হোক ওরা তিন জনে নিজেদের কাহিনী যা বলে গেল তা সংক্ষেপে এই। জনের সঙ্গে মেরীর বিবাহ হয়, পাঁচ বছর পর্য্যন্ত ওরা সাধারণ দম্পতীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায়, পরস্পর পরস্পরকে আন্তরিক স্নেহ ভক্তি করে, তার পরে হঠাৎ রাথ্‌-এর সঙ্গে জনের পরিচয় ঘটে। রাথ্‌ মেয়েটির বয়স তখন আঠারো বছর, জনের চেয়ে দশ বছরের ছোট, চমৎকার রূপ, মরালের মত ভঙ্গী, সর্ব্বজয়ী আকর্ষণশক্তি; তার চেহারাটিও যেমন সুন্দর মনটিও তেমনি সুন্দর; আত্মার সৌন্দর্য্য সর্ব্বদেহের লাবণ্যে অনির্ব্বচনীয় মহিমায় উজ্জ্বল, জীবনের আনন্দ সারা অঙ্গে টলমল করছে। জন তাকে ভালোবাসলে, সেও জনকে ভালোবাসলে। কিন্তু এ সাধারণ ভালোবাসা নয়; এ এমন এক সর্ব্বনাশা জিনিষ যে ওদের বোধ হোলো যেন পৃথিবীর অতীতকালের যত সুদীর্ঘ ইতিহাস আজকের দিনে এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দ্দিষ্ট কালে এসে ওদের দুজনের মিলন ঘটিয়ে দিয়েই সার্থক হোলো। ওরা পরস্পরকে ভালোবাসলে, নল যেমন ভালোবেসেছিল দময়ন্তীকে, শকুন্তলা যেমন ভালোবেসেছিল দুষ্মন্তকে। কিন্তু প্রথম মোহটা কেটে যাবার পর ওরা যখন পরস্পরের হৃদয়ের পরিচয় পেলে তখন খুব ভয় হোলো। দুজনেই ভদ্র পরিবারস্থ, দুজনেরই আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান আছে, যে সমাজ এবং সংস্কারের মধ্যে এতদিন মানুষ হয়েছে

তার প্রতি ওদের শ্রদ্ধা আছে। জন্‌ই বা জেনে শুনে কেমন করে একটি নিরীহ মেয়ের সর্ব্বনাশ করে, আর রাথ্‌ই বা কেমন করে একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সংস্রব রাখে ? কিন্তু তার পর ওরা টের পেলে যে মেরীর কাছেও ওদের প্রেমের বার্ত্তা গোপন নেই।

স্বামীর প্রতি তার যে অবিচল স্নেহ এবং অটল বিশ্বাস ছিল তা এখন ভেঙে গেল। তার মনে মনে এত রকমের ভাব উদয় হতে লাগলো যা পূর্ব্বে সে কখনো কল্পনাও করে নি। কখনো হোলো দারুণ ঈর্ষা, কখনো স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হবার ভয়, কখনো তার অধিকারে অন্যের হস্তক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনায় বিজাতীয় ক্রোধ, কখনো বা এক আশ্চর্য্য রকমের আন্তরিক ক্ষুধা যা ভালোবাসার চেয়েও অনেক যন্ত্রণাদায়ক। তার মনে হোলো বুঝি স্বামী তাকে ত্যাগ করলেই সে মরে যাবে ; অথচ এটুকু সে মনে মনে বুঝেছে যে অপরকে তার স্বামী যদি ভালোই বেসে থাকে তা হ'লেও সে ভালোবাসা আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়েছে, সেটা তার ইচ্ছাকৃত ঘটনা নয়। স্বামীকে সে কোনো রকম দোষ দিলে না। নীরবে, নিঃশব্দে সে বড় কান্নাই কাঁদলে, ভগবানের কাছে এ দুঃখ সহ্য করবার শক্তি প্রার্থনা করলে। জন আর রাথ্‌ দেখলে মেরী তাদের চোখের সুমুখে ক্রমশঃ রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। ওদের মনে তখন যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হোলো তা যেমনি করুণ তেমনি দীর্ঘব্যাপী। মধ্যে মধ্যে ওদের হৃদয় দুর্ব্বার হয়ে উঠতো, তখন ভয় হোতো, যে গুপ্ত বাসনা ওদের অস্থিমজ্জাকে নিয়ত দগ্ধ করছে তাকে বুঝি আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবু ওরা তাকে ঠেকিয়ে রাখলে। মন্দের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ক'রে অবশেষে ওরা জয়ী হোলো। বুক ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো, তবু নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষিতার গর্ব্ব নিয়ে ওরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হোলো। জীবনের যত আনন্দ, যত আশা, পৃথিবীর যা কিছু সৌন্দর্য্য, সমস্তই ওরা নিঃশেষে চিরদিনের জন্যে ঈশ্বরে সমর্পণ করলে।

রাথ্‌ একান্তভাবেই ভালোবেসেছিল, তার পক্ষে আর দ্বিতীয়বার ভালোবাসা সম্ভব নয়, সে হৃদয়কে পাষাণ ক'রে নিয়ে ধর্ম্মের দিকে আর জনসেবার দিকে মনোনিবেশ করলে। অক্লান্ত পরিশ্রম। পীড়িতের শুশ্রূষা আর দরিদ্রের সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত। বহু অনাথ আশ্রম খুল্‌লে, বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভার নিলে। অযত্নে অত্যাচারে তার পূর্ব্বেকার সৌন্দর্য্য ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হোলো, মুখের লালিত্য

ঘুচে গিয়ে এখনকার হৃদয়ের মত তা কঠিন হ'য়ে উঠলো ; তার ধর্ম্মপথ এখন অত্যন্ত অপরিসর, ক্ষুরধারের মত তীক্ষ্ণ ; তার দয়াও এখন নিষ্ঠুর, কারণ প্রেমের ওপর তার কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, তার প্রতিষ্ঠা কেবল শুষ্ক যুক্তির ওপর ; সে হয়ে উঠলো এক ছিদ্রান্বেষী অসহিষ্ণু প্রভুত্বপ্রিয় অত্যাচারী।

আর জন একটা নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করলে, অন্তরে অন্তরে দারুণ ক্ষোভ নিয়ে মুক্তির আশায় কেবল মৃত্যুর পথ চেয়ে সে তার নিরানন্দ জীবনটাকে টেনে টেনে বৎসরের পর বৎসর পার করতে লাগলো। জীবন ধারণের আর তার কোনো অর্থ রইলো না ; আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা জয় করবার ফলে সে নিজেই হোলো পরাজিত ; হৃদয়বৃত্তির মধ্যে অবশিষ্ট রইলো কেবল এক অবিচলিত আন্তরিক ঘৃণা, স্ত্রীর দিকে চাইলেই সেটার উদ্রেক হোতো। কিন্তু তবুও সে তাকে বরাবর যত্ন এবং আদর করেই এসেছে। একজন ধর্ম্মপ্রাণ ক্রিশ্চান ভদ্রলোকের স্ত্রীর প্রতি যে রকম ব্যবহার করা উচিত, সে তার কিছুমাত্র ত্রুটি করে নি। সে তার প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্যই করেছে।

মেরীও সাধ্বী স্ত্রী, এমন পতিপ্রাণা আদর্শ পত্নী সচরাচর দেখা যায় না। তার স্বামীকে যে হঠাৎ উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল তাতেও সে একটি দিনের জন্যে তাকে তিরস্কার করে নি ; সে জানে যে স্বামী কেবল তার জন্যেই এতটা ত্যাগ স্বীকার করেছে, কিন্তু তা হলেও মনে মনে সে স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে নি। সে তিক্ত হ'য়ে উঠলো, কটুভাষী হয়ে উঠলো। এর জন্যে নিজেকেই সে যথেষ্ট ঘৃণা করতো, কিন্তু তবু কিছুতেই সামলাতে পারতো না, সময় সময় এমন কতকগুলো কথা বলে ফেলতো যা তার স্বামীর পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মান্তিক। স্বামীর জন্যে সে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কাতর ছিল না ; কিন্তু যখন সে নিদারুণ মনঃকষ্টে দিনান্তে সহস্র বার নিজের মৃত্যুকামনা করেছে, তখন যে তার স্বামী নিশ্চিন্ত হয়ে মনে মনে আপন ত্যাগের সুখ উপভোগ করতে থাকবে, এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। যাক্, এখন সেও মরে বেঁচেছে, ওরাও মরে বেঁচেছে ; জীবনের দিন-গুলো ছিল বড় নিরানন্দ, বড় নিরস, কিন্তু সে দিন এখন পার হয়ে গেছে ; ওরা তিন জনেই নিষ্পাপ ভাবে জীবন কাটিয়ে এসেছে, এতদিনে তার উপযুক্ত পুরস্কার পাবার সময় এলো।

ওদের বক্তব্য শেষ হলে চারিদিক নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। স্বর্গের বিচারালয়

একেবারে নিঃশব্দ হোলো, কোনোদিকে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। বিধাতাপুরুষের ইচ্ছা হোলো তিনি বলেন তোমরা নরকে যাও, কিন্তু সে কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না, কারণ ও কথার এমন একটা বিশ্রী অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যেটা বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের উপযোগী নয়। কিন্তু তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হোলো, মুখখানা ভার হ'য়ে গেল। মনে মনে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, এই জন্যেই কি তিনি অনন্ত সমুদ্রের বুকে সূর্য্যোদয়ের রক্তিমা ফলিয়ে দেন, উচ্চ গিরিশিখরে হিমানীর খেলা দেখান? আর কেনই বা তবে পাহাড়ের গা বেয়ে তটিনীর জল এত গান গেয়ে ছোটে, কেনই বা মাঠে মাঠে সোনার ধানের শীষগুলো সন্ধ্যাবাতাসের ঢেউ লেগে এমন নুয়ে নুয়ে পড়ে?

আপন মনে তিনি বলতে লাগলেন—"সময় সময় আমার বোধ হয় যে আকাশের নক্ষত্রগুলো যখন পথের নর্দ্দামার পঙ্কিল জলে প্রতিবিম্বিত হয় তখনই তাদের সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল দেখায়, এমন উজ্জ্বল আর কখনো দেখায় না।"

কিন্তু ঐ তিনজনের আত্মা এখনো সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দুঃখের ইতিহাস বলা হয়ে গেছে, মনে মনে তাই আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, তবু ওরা কর্ত্তব্যপালন করেছে, এই কথাই কেবল ভাবছে। বিধাতা তখন সামান্য একটু ফুৎকার দিলেন, দেশলাই কাঠির আলো নেবাতে মানুষ যেমন সামান্য একটু ফুৎকার দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেখানে তিনটি আত্মা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে আর কিছুই নেই। বিধাতা তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন লোপ করে দিয়েছেন।

তখন তিনি এই কথাই বল্‌লেন, "স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে যে বৈচিত্র্য সংসারে রয়েছে, সেই দিকেই যেন আমার সব চেয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মানুষ যে কেন এই কথাই ভেবে নিয়েছে তা জানি না। যদি ওরা একটু মন দিয়ে আমার সৃষ্টিকার্য্যগুলো দেখে তা হলে অনায়াসেই বুঝতে পারে যে এই মানবীয় দুর্ব্বলতাটুকুর আমি চিরকালই সমর্থন করি।"

এইবার বিধাতাপুরুষ দার্শনিকের দিকে ফিরে চাইলেন। তার কথার এখনো উত্তর দেওয়া হয় নি।

তাকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—"যাক্‌ এটা তুমি স্বীকার করবে যে এইবার অন্ততঃ তুমি বিধাতার শক্তির প্রভাবের সঙ্গে মঙ্গল প্রচেষ্টার একত্র সমন্বয় দেখতে পেলে।"

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেকালের মুনিঋষিরা "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্" ইত্যাদি লিখে গেলেও একালে আমরা অর্থকে মোটামুটি পরমার্থ স্থির করেছি, এটা নিঃসন্দেহ। তবে পাড়াপড়শী কারও অপ্রত্যাশিত অর্থাগম হলে মনে যে একটু কষ্ট পাই, তাকে ভুঁইফোড়, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ ইত্যাদি নানা আখ্যা দিয়ে খাটো করতে চেষ্টা করি, সেটাও স্বাভাবিক। অক্ষম সক্ষমকে একটু হিংসার চোখে দেখবেই ত! বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি। তথাকথিত ভুঁইফোড় আমিও দুচারজন দেখেছি, দেখে এটা বেশ উপলব্ধি হয়েছে যে তাঁরা সাধারণ মানবের চেয়ে বুদ্ধি, চরিত্রবল ও সাহসে শ্রেষ্ঠ। কেউ কেউ বলেন যে এই সব হঠাৎ বড়মানুষের পয়সার গরম অসহ্য। কিন্তু যে এক পুরুষে আপন উদ্যমে, আপন বুদ্ধিবলে, অগাধ ঐশ্বর্য্য লাভ করেছে তার একটু আধটু দেমাক হবে না! দুনিয়াতে কত রকমের দেমাকই ত আমরা নিত্য বরদাস্ত করছি। নিগুর্ণ নিষ্কর্ম্মা জমীদারের জাঁক, বিদ্যাহীন পৈতাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের জাঁক, কালো সাদা সাহেব-সুবোর জাঁক, ভেকধারী খদ্দরওয়ালার জাঁক—না হয়, ধনীর জাঁকও একটু সয়ে গেলাম! কথায় বলে বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্, কিন্তু নাক-উঁচু বিদ্বানের দৌরাত্ম্যও ত জগতে কম নয়! আসল কথা বিনয় কারও একচেটে নয়। বনেদী নবাব ও হঠাৎ নবাবের মেজাজে বিশেষ কিছু তফাৎ আছে কি? আজ দুই একজন ছোট বড় কৃতকর্ম্মা পুরুষের গল্প করব। পাঠক দেখবেন যে আমি যা বলছি, তা নিতান্ত বাজে কথা নয়।

বছর ষাটেক আগে আমার বাবার এক তরুণ খানসামা ছিল। তার নাম সীতারাম। বেশ চালাক চতুর ছেলে, চেহারা সুন্দর, একটু আধটু লিখতে পড়তেও জানত, স্বভাবও ছিল বড় নম্র, তাই সবাই তাকে ভালবাসত। খুব বেশী দিন কিন্তু আমাদের বাড়ী থাকতে পারে নেই। কিছুকাল কাজ করেই একদিন হঠাৎ বাবার অনুমতি নিয়ে দেশে চলে গেল। বলে গেল, আমাকে ছুটী দেন; এইবার একটু

নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা দেখব। এ সব কথা আমার নিজের কিছুই মনে নেই, তবে ছেলেবেলায় এই সীতারামের নানা রকম গল্পই শুনতাম। মা বলতেন, "সে কি আর চাকরের মতন ছিল রে। একেবারে যেন ভদ্র ঘরের ছেলে।" মাঝে মাঝে দেখতাম কোথা থেকে খুব ভাল চা আসে। শুনতাম সীতা দাদা পাঠিয়েছে। একটু বড় হবার পর একবার বাবার সঙ্গে দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছি। শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই দেখি এক দীর্ঘকায় সুপুরুষ ভদ্রলোক প্লাটফর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে। সেকেলে বেনিয়ানদের মতন পোষাক। সঙ্গে একজন সাহেব, জন দুই মাড়বাড়ী বাবু ও চাপরাশ আঁটা চাকরবাকর। আমরা নামতেই ভদ্রলোক দৌড়ে এসে, "ধর্ম্মাবতার!" বলে হাঁটু গেড়ে বসে বাবার পা জড়িয়ে ধরলেন ও কত কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "হুজুর কেমন আছেন, মা ঠাকরুণ কেমন আছেন, দিদিরা কেমন আছেন?" বাবা তাঁকে, "ছিঃ, ওঠ, ওঠ, সীতারাম!" বলে তুলে কোলাকুলি করলেন। আমাকে বললেন, "বাবা, ইনি তোদের সীতা দাদা।" সীতারাম আমাকে জোরে জাপটে ধরে বলতে লাগলেন, "আমাকে তোমার মনে নেই, দাদা। তুমি যে বড্ড ছোট ছিলে তখন!" সঙ্গের সাহেবটীকে বললেন, "এঁরা আমার মনিব, সেলাম কর।" সাহেব একটুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল। বোধ হয় ভাবলে—সীতারামবাবুর আবার মুনিব! তার পর সসম্ভ্রমে সেলাম করে বাবাকে পথ দেখিয়ে ছোট রেলের দিকে নিয়ে গেল। সীতা দাদা আমাকে ছাড়লেন না, যতক্ষণ না ট্রেণ ছুটল। দেড় মাস পরে ফেরবার পথে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল, খুব ভাল চা কয়েক কৌটা, আরও কি কি সব, দিয়ে গেলেন। এর পর আমি বহু বৎসর দার্জ্জিলিঙের পথে যাই নেই। সীতা দাদাকেও আর কখন দেখি নেই। কতদিন বেঁচেছিলেন জানি না। তাঁর ছেলেপিলে কেউ আজও আছে কি না, তাও জানা নেই। তবে থাকে ত' আশা করি তারা বাপের মতন বিনয়ী ও উদার হয়েছে। পয়সার কথা কিছু বলছি না, পয়সা ত' অনেকেরই থাকে!

কুলাবা জেলাতে সেকালে দু'জন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। একজন, হাজী কাসেম আগবোঠওয়ালা। আগেকার দিনে Shepherd Liners বলে যে জাহাজগুলো বোম্বাই থেকে পশ্চিম ভারতের সব বন্দরে যাওয়া আসা করত, সেই সমস্ত জাহাজের মালিক ছিলেন এই কাসেম সাহেব। তাঁর জন্ম হয়েছিল আমার এলাকার মধ্যের শেবে-নাবে দ্বীপে। অতি অল্প বয়সে তিনি সাধারণ মাল্লাগিরি

করতে আরম্ভ করেন, আর সেই সামান্য অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে আপন চেষ্টায়, আপন বুদ্ধির জোরে অত বড় একটা নৌবহরের সর্ব্বেসর্ব্বা হ'য়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। কথায় বার্ত্তায় চাল চলনে কতকটা uncut হীরকখণ্ডের মত হলেও একজন যথার্থ হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। সকলেই তাঁর সুখ্যাতি করত, বিশেষ করে তাঁর গ্রামের গরীব গুরবো লোক। মানুষটী জবরদস্ত ছিলেন। জবরদস্ত না হলে অতগুলো জাহাজই বা চালাবেন কি করে। কিন্তু কখনও কারও কাছে তাঁর বিরুদ্ধে জুলুম কি দাগাবাজীর কোন অভিযোগ শুনি নেই।

কুলাবা জেলার দ্বিতীয় কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন উরণের শেঠ হোরমসজী। হাজী কাসেমের মত তিনিও জীবন আরম্ভ করেছিলেন একেবারে নীচের ধাপে। আর, যখন আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল ১৯০৪ সালে, তখন তাঁর মাসিক আয় ছিল অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত, এই তিন এলাকা জুড়ে সর্ব্বত্র তাঁর আবকারী ও নিমকের ঠিকেদারী ব্যবসা ছিল। জেলায় জেলায় তাঁর আপন কর্ম্মচারী ও সিপাহীর দল মোতায়েন থাকত, আর স্বয়ং তিনি সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে তাদের কাজের তদারক করে বেড়াতেন। ভদ্রলোক ইংরাজী জানতেন না, তবে তাঁর আপন ভাষা গুজরাটী খুব ভাল রকমই লিখতে পড়তে পারতেন। তাঁকে অশিক্ষিত মোটেই বলা চলে না, কারণ রোজ হু'তিনখানা খবরের কাগজ আগাগোড়া পড়তেন, এবং পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে তার সব খবরই রাখতেন। মরাঠী ও উর্দ্দু দুই ভাষাতেই খুব ভাল কথাবার্ত্তা কইতে পারতেন। বেশভূষা, ধরণ-ধারণ, পুরানো পারসী শেঠদের মত আড়ম্বরবিহীন ছিল। সেকেলে পারসী আদব কায়দা আমার বড় ভাল লাগত। তার একটা কেমন বিশেষত্ব ছিল! কেবল মিষ্ট কথার বহর ও সেলামের ঘটা নয়, বেশ বোঝা যেত যে তাদের আদর অভ্যর্থনা সত্যি আন্তরিক।

যেদিন আলিবাগ পৌছলাম, হোরমসজী সেখানে ছিলেন না। তাঁর দুই ভাই, দুটী বেশ smart পারসী যুবক, বহুমূল্য হার-তুররা নিয়ে বন্দরে তাঁদের দাদার নামে আমাদিগকে স্বাগত করলেন। বললেন, শেঠজীর হুকুমে আমরা হুজুরের খিদমতে হাজির, যা যখন প্রয়োজন হবে জানাবেন। আমি তাঁদিকে মামুলী ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ী চলে গেলাম। পরে কাজ কর্ম্মের ভিড়ে আর তাঁদের কথা মনে রইল না।

মাসখানেক বাদে একদিন সকাল বেলায় আপিস কামরায় বসে আছি। চাপরাসী এসে এত্তেলা দিলে যে উরণের হোরমসজী শেঠ এসেছেন। আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম। তবু বললাম, "নিয়ে আয়।" একজন বয়স্থ পারসী শেঠ এসে উপস্থিত হলেন। কাপড়-চোপড় সাদাসিধে, মুখে অমায়িক হাসি। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বুঝতে পারলাম যে মানুষের মত মানুষ। দোরগোড়া থেকেই নীচু হয়ে সেলাম করে হিন্দুস্থানীতে বললেন, "হুজুরের সময় নষ্ট করব না। আজ আমাদের নওরোজ, একবার মুবারক বলতে এসেছি।" চাপরাসী টেবিলের উপর একখানা রুমাল ঢাকা বারকোশ এনে রাখলে। আমি উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আসুন শেঠ, বসুন।" ভদ্রলোক সন্তর্পণে আমার হাত ছুঁয়ে আবার সেলাম করে বললেন, "সামান্য কিছু মিষ্টি এনেছি।" রুমাল খুলে দেখি সাহেব বাড়ীর এক বিচিত্র কেক্। ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি। তার পাশে দাঁড়িয়ে কুড়াল হাতে এক কাঠুরে। দম দিলে কুড়ালটা ওঠে আর নামে সেই গুঁড়ির উপর। সবটা বিলেতী মিঠাই দিয়ে তৈরী। কুঠারখানা চাঁদির। দাম টাকা তিরিশের কম হতে পারে না। আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললাম, "শেঠজী, এত দামী কেক কেন এনেছেন। এ আমি নিতে পারি না।" বৃদ্ধের মুখে সেই মৃদু হাসি, "সাহেব, এ অতি সামান্য জিনিষ। আপনি ফিরিয়ে দিলে আমার মান থাকবে না।" আমি উত্তর দিলাম, "আপনার ঘরের তৈরী কিছু মিষ্টান্ন পাঠিয়ে দেবেন। এটা নিয়ে যান, শেঠ।" কিন্তু হোরমসজী নাছোড়বান্দা, বলতে লাগলেন, "সাহেব, ভগবানের কৃপায়, সাহেব সুবোর মেহেরবানিতে, আমার আজ কিছুরই অভাব নেই। তবে আমি গরীবগুরবো সবাইকে দিয়ে খাই। ক্রমশঃ সব জানতে পারবেন। এ সামান্য কেক কি আপনাদের পদ-মর্য্যাদার যোগ্য! ইত্যাদি।" বৃদ্ধের সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক হল। শেষ, তিনি কথা দিলেন যে আর আমাকে কখন কিছু ভেট পাঠাবেন না। আমি হার মানলাম। শেঠ ভিতরে গিয়ে কেকটা আমার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এলেন। এসে দু'দণ্ড বসে গল্প করে গেলেন। আমাকে হেসে বললেন, "হুজুর আমার কার্য্য উদ্ধারের জন্য দরকার হলে কি আমি কাউকে এক টুকরো কেক্ ভেট দিই। অনেক টাকা আমার বছরে বেরিয়ে যায় ঐ বাবতে। তবে তোমাদের চিনে গেলাম, সাহেব! মানুষ চেনাই ত' আমার কাজ। আর কখন ভেট দিতে আসব না। তবে বুড়ো আছে মনে রেখো, কিছু দরকার হলেই ইয়াদ

কোরো।" আমি মোটের উপর একটু বোকা ব'নে গেছলাম। আমতা আমতা করে বললাম, "শেঠ, আমরা ছেলেমানুষ, অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি।" বৃদ্ধ যাবার সময় একটু হেসে বলে গেলেন, "কলেকটর সাহেবকে জিজ্ঞাসা কোরো, কি হয়েছিল।"

সন্ধ্যাবেলা ব্রাউনকে ঘটনাটা বললাম। ব্রাউন খুব হেসে বললে, "তোমাকে কেক নিইয়ে ছাড়লে ত! ভারী ধূর্ত্ত ঐ বুড়ো। কিন্তু কি জান, লোকটা ভাল। আমারও যে ওর সঙ্গে এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল।" কি হয়েছিল বার বার জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাউন এই গল্পটা করলেঃ—আমি মাস তিনেক হল এখানে এসেছি ত! সকালে পৌঁছেই চার্জ্জ নিলাম, X বিকেলের বোটে বেরিয়ে গেল। পরদিন সকাল বেলায় বারান্দাতে বসে আছি, বয় এসে বললে যে উরণের হোরমসজী শেঠ কিছু ফলফুল্‌রী পাঠিয়েছেন। আমি কার্ডখানা দেখলাম, খান বাহাদুর, অনারারী মেজিষ্ট্রেট ইত্যাদি। বললাম, "আচ্ছা, রেখে দে।" খানিক বাদে বয় একটা প্রকাণ্ড টুকরী এনে আমার পাশে নামিয়ে বললে, "সাহেব, এর ভেতরে ফল, তরীতরকারী, মাছ, মাংস, মায় পাঁউরুটী পর্য্যন্ত রয়েছে।" আমি রেগে চেঁচিয়ে উঠলাম, "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা, সব ফেলে দে!" বয় হাত জোড় করে বললে, "শেঠের কারকুন এখনও যায় নেই, হুজুর। তাকে দিয়ে দিই!" হোরমসজীর সেই ছুঁচোমুখো মুসলমান গোমস্তাকে দেখেছ ত! ব্যাটা আসবামাত্র হুঙ্কার ছাড়লাম, "এখনই নিয়ে যা এ সব, বদমায়েশ কোথাকার!" লোকটা ভয়ে কথা কইতে পারলে না, টুকরী তুলে নিয়ে পালাল। বিকেল বেলা তোমার শেঠজী এসে হাজির। একেবারে নম্রতার মূর্ত্তি, জোড় হাত করে মাপ চাইলেন। আমি বললাম, "খবরদার খান বাহাদুর, এ রকম বেয়াদবী ফের কখনও না হয়। আমি তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি।" বুড়ো মাথা হেঁট করে উত্তর দিলে, "আর কখনও হবে না সাহেব। আমারই গলতি হয়েছে। মেহেরবান X সাহেবের কাছে একদিন অন্তর এই রকম টুকরী আসত কিনা, হুজুর। তাই বুঝতে পারি নেই। তাঁর জন্য ঘোড়ার ডাক বসিয়ে রোজ সমুদ্রের তাজা মাছ ক্যাম্পে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।" আমি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে, "Well, good bye, Khan Bahadur", বলে ঘরের ভেতর পালালাম। সেই থেকে আমাকে কখনও কিছু পাঠায় নেই। আজ সকাল বেলা এসে নওরোজ মুবারক বলে গেল। বেশ সমজদার বুড়ো। তুমি কিন্তু সাবধান!

দরকার ছিল না কিন্তু সাবধান হবার! বৃদ্ধ আমাকে কখনও ফাঁসাতে চেষ্টা করেন নেই। দেখা করতে এসে কোন দিন কারও নামে কিছু বলেন নেই। কিন্তু ব্রাউনের কি হল, শুনুন।

কিছুদিন পরে ব্রাউনের বদলীর হুকুম এল। শেঠজী তাঁকে লাঞ্চ খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। বিদায়ী ভোজ। ঠিক হল যে সাহেব হোরমসজীর বাড়ী থেকে সোজা বন্দরে গিয়ে জাহাজ ধরবেন। নূতন কালেক্টর তখনও আসেন নেই, তাই লাঞ্চের অতিথি আমরা তিন জন—ব্রাউন, পুলিশ সাহেব ও আমি। তিন জনে যখন হোরমসজী শেঠের বাঙ্গলাতে গিয়ে পৌছলাম দেখি এলাহি ব্যাপার! সামনের বাগানটাতে গাছ গাছড়া যা কিছু ছিল সব তুলে ফেলে দিয়ে সমুদ্রের ধারের উৎকৃষ্ট বালি ও কাঁকড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। তার উপর বোম্বাই থেকে আনানো সব পাথরের চাঙ্গড়া, ফুল গাছ, পাতবাহার ও পাম-এর টব সাজিয়ে পাহাড়, নূতন ফুলের কেয়ারী, রাস্তা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। মাঝখানে ছোট খাট এক শামিয়ানা, তার ভেতরে জরীর কাজ করা কাল রেশমের অস্তর। চারিদিকে লাল রেশমী পরদা, বাগানের পথগুলোর ওপর লাল শালু ঢাকা। শামিয়ানাতে খাবার টেবিল সাজানো। আমরা তিন জনে খেতে বসলাম, শেঠজী কিছুতেই বসতে রাজী হলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহেবদের গেলাসে শাম্পেন ঢালতে লাগলেন। খাবার রেঁধেছিল বোম্বাই-এর Cornaglia কোম্পানী। তাদেরই একজন সাহেব ও ছ-জন খানসামা খাবার পরিবেশন করলে। অত জাঁকাল ও সুন্দর লাঞ্চ আমি আর কখনও খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। বোম্বাই থেকে String Band এসেছিল, তারা সারাক্ষণ বাজনা বাজাচ্ছিল! খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বোম্বাই-এর একজন বড় পারসী Florist স্বয়ং মালা ও তোড়া নিয়ে এলেন। তোড়াগুলোতে দামী গোলাপ ও বহু মূল্য অর্কিডের ছড়াছড়ি। আমরা প্রথমটায় এই সব আলিফ-লয়লা ব্যাপার দেখে থমকে গেছলাম। কিন্তু ক্রমশঃ সবই সয়ে গেল। দুশো আড়াই শো টাকার ফুল দেখেও আর আশ্চর্য্য লাগল না। যখন বন্দরের পানে তিনজন হেঁটে বেরোলাম তখন কারও মুখে কথা সরছিল না। হোরমসজীর অতিথিসৎকারের ফলে শরীর ও মন বিকল হয়ে গেছল। ব্রাউন শুধু এইটুকু বললে, "এর চেয়ে যে রোজ ওর মাছ-মাংস পাঁউরুটী খাওয়া ছিল ভাল।" সেদিন হোরমসজী যে কত টাকা খরচ করেছিলেন তার আন্দাজ করাও কঠিন।

আর সমস্তটাই একজন সামান্য একটিন কালেক্টরের জন্য, যার কাছ থেকে হোরমসজীর মত বড় শেঠের আর কি লাভের আশা থাকতে পারে! আমাকে তিনি পরে বলেছিলেন, "লাভের আশায় ত করি নেই, সাহেব। ব্রাউন একজন মানুষের মতন মানুষ। তাকে আমার শ্রদ্ধা জানালাম মাত্র।" আরও কতকগুলো গল্প বাকী রইল। আসছে বারে করব।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

অধ্যাপক আঁতোয়ান্ মেইয়ে
ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ব

(১)

সম্প্রতি পারিসের কলেজ দ'ফ্রান্সের বিখ্যাত অধ্যাপক আঁতোয়ান্ মেইয়ের (Antoine Meillet) তিরোধান হয়েছে। তিনি ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রায় ৪০ বৎসর ধরে পারিস বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দ'ফ্রান্সের অধ্যাপনা করেছেন। হয়ত তাঁর নাম আমরা খুব কম শুনেছি, তার কারণ তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন নি। তাঁর কর্ম্মজীবন এমন একটা বিষয়ের অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়েছিল যার আলোচনা এ দেশে এখনো সুরু হয় নি বল্‌লেই চলে। সে বিষয় হচ্ছে Indo-European linguistics অর্থাৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব। এই ভাষাতত্ত্বকে যাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোটায় তুলেছেন তাঁদের মধ্যে মেইয়ে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

মেইয়ের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে গেলে মুখবন্ধ হিসাবে কিছু না বললে চলে না। কারণ যে বিজ্ঞানে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন সে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। অনবধানতাবশতঃ আমরা philology ও linguistics অনেক সময় একই অর্থে প্রয়োগ করি অথচ এই দুই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ নির্দ্দেশে প্রযুক্ত হয়। 'ফিললজি' হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিশেষ ভাষার, শব্দপ্রয়োগ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, ব্যাকরণ প্রভৃতি উদ্ধার করা। তাই ফিললজিষ্ট কোন বিশেষ ভাষার আভ্যন্তরিক ঘটনাবলীকে লিপিবদ্ধ করেন মাত্র। অপরপক্ষে 'লিংগুইষ্টিক্‌স'এর উদ্দেশ্য হল নানাভাষার ঘটনাবলীর তুলনামূলক বিচার করা। সুতরাং একটী হচ্ছে কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব, অন্যটী হচ্ছে তুলনামূলক ভাবাবিজ্ঞান। যাঁরা linguistics চর্চ্চা করেন তাঁদের ফরাসী ভাষায় linguiste বলা হলেও ইংরাজীতে linguist বলা চলে না, কারণ ইংরাজী ভাষায় ও-কথার অর্থ হচ্ছে 'ভাষাজ্ঞ'; সেই কারণে ইংরাজী ভাষায় তাঁদের linguistician আখ্যা দেবার কথা হচ্ছে।

অধ্যাপক মেইয়ে মুখ্যতঃ linguistician হলেও প্রকৃত ছিলেন উভয়-পদবাচ্য। তিনি যখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করেন তখন সেই ভাষা-গোষ্ঠীর অনেক ভাষার ভাষাতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নি—যেমন প্রাচীন পারসিক, আর্ম্মেনীয়, রুশীয় প্রভৃতি ভাষা। সুতরাং এ সব ভাষার আলোচনাও তাঁকে philologist হিসাবে করতে হয়েছিল, কারণ সে আলোচনা না হলে ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এ কথা সত্য যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা সুরু হতেই পণ্ডিতেরা বুঝতে পারলেন যে গ্রীক্, লাতিন, জার্ম্মানিক্, প্রভৃতি ও সংস্কৃত একই প্রাচীন ভাষার নানা শাখা, এবং একথাও সত্য সংস্কৃত ভাষার নানা প্রাচীন ব্যাকরণের সাহায্য না পেলে হয় ত বহুদিন ধরে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান গড়ে উঠতো না। তার কারণ প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণিকেরা সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় যে উপায় অবলম্বন করেছিলেন তা বর্ত্তমানকালেও প্রশংসনীয়। তাঁরা প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষার নানা বর্ণের উচ্চারণের যথাযথরূপে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন, এবং তাদের ক্রমবিবর্ত্তনের না হলেও পরিবর্ত্তনের কারণও যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া এখন যাকে morphology (শব্দের রূপতত্ত্ব) বলা হয় সেদিক দিয়েও সংস্কৃত ভাষার বিচার তাঁরা সুসঙ্গত ভাবে করেছিলেন এবং সেই কারণে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের প্রথমে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ হতেই সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের পন্থানুসরণ করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর নানা ভাষার আলোচনা সুরু হ'ল। কিন্তু তাই বলে বর্ত্তমান কালের তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব যে ভারতীয় বৈয়াকরণিকদের দান একথা মনে করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। সংস্কৃত ভাষার আলোচনায় তাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সে ভাষাকে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন স্থাণু, কোন ভাষার যে ক্রমবিবর্ত্তন হতে পারে এবং সেই বিবর্ত্তনের ফলে যে ভাষার নূতন নূতন রূপ জন্ম গ্রহণ করে, এ ধারণা তাঁদের আদৌ ছিল না; সে ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে বর্ত্তমান যুগের অবদান।

বর্ত্তমান যুগে এ বিজ্ঞানের জন্ম যে জার্ম্মাণীতে তাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর নানা ভাষার তুলনামূলক আলোচনা আরম্ভ করেন সর্ব্ব প্রথমে বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত বোপ (Franz Bopp)। তিনি প্রাচ্য দেশের

পুরাতত্ত্ব আলোচনার জন্য কিছুকাল পারিসে অবস্থান করেন এবং সেই সময়েই সামান্য পুঁথিপত্রের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পরিচয় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ইতিপূর্ব্বেই হয়েছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পাদ্রি ক'রদু (Cœurdoux) এবং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জোন্স ও প্রায় সেই সময়েই জার্ম্মাণ ধর্ম্মযাজক সেণ্ট বার্থেলেমি (Saint Berthelemy) সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে গ্রীক, লাতিন ও জার্ম্মাণিকের জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে সে কথা স্পষ্ট করে বলেন এবং এই তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃত ভাষা হতে কি সাহায্য পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল (Schlegel) পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোপ পারিস হতে দেশে ফিরে গিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে গ্রীক, লাতিন, পারসিক ও জার্ম্মাণ ভাষার ধাতুরূপের তুলনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থ ও পরবর্ত্তী নানা গ্রন্থে একই প্রণালী অনুসৃত হয়। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই তুলনা করে ধাতুর প্রাচীন রূপ নির্দ্ধারণ করা। এই কারণে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দেন নি। কোন্ কোন্ নিয়মানুসারে ভাষার উচ্চারণমূলক পরিবর্ত্তন (phonetic evolution) ঘটে কিংবা শব্দের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বা বাক্যের গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থে কোন আলোচনাই নেই।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর উচ্চারণমূলক পরিবর্ত্তন আলোচনা সুরু হল যাঁদের হাতে তাঁরা কেহই সংস্কৃত জানতেন না। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন জাতিতে দিনেমার, নাম রাস্ক (Rask), অন্যজন হচ্ছেন জার্ম্মাণ, নাম গ্রীম (Grimm)। রাস্ক ও গ্রীম উভয়েই ছিলেন philologist, উভয়েই প্রাচীন জর্ম্মাণিক ভাষার ব্যাকরণ গভীরভাবে আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল, শব্দের প্রাচীন রূপ খুঁজে বের করবার বৃথা চেষ্টা নয়, প্রত্যেক শব্দ কি কি রূপে নানা জর্ম্মাণিক ভাষায় বর্ত্তমান রয়েছে তা' নির্দ্ধারণ করা এবং প্রাচীন ভাষাসমূহ, অর্থাৎ গ্রীক লাতিনে, তাদের প্রাচীন রূপ পাওয়া গেলে যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে তুলনা করা। এই কারণে রাস্ক ও গ্রীমের কাজ হয়েছিল বোপের কাজের চাইতে বেশী বিজ্ঞানসম্মত। রাস্ক ১৮১৬ সালে প্রমাণ করলেন যে গ্রীক লাতিন, প্রাচীন জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষায় প্রধান ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ধ্বনি-বিজ্ঞানের বিশেষ

নিয়মাবলী অনুসারে সামান্য রূপ পরিবর্ত্তন করেছে যথা জার্ম্মাণ p,t,k,—লাতিন, b, d, g, কিম্বা গ্রীক b' d' g' ইত্যাদি। রাস্কের এই সিদ্ধান্তানুসারে ১৮২২ সালে গ্রীম এ-বিষয় পুনরালোচনা করেন ও ধ্বনি-তত্ত্বে (phonetic) ব্যঞ্জনবর্ণের পরিবর্ত্তনের নিয়মাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ আবিষ্কার মূলতঃ রাস্ক করলেও গ্রীমের নামেই Grimm's Law হিসাবে তা চলে আসছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষার তুলনা-মূলক আলোচনা বোপের পরে, কুন (Kuhn), শ্লাইখের (Schleicher), প্রভৃতি নানা পণ্ডিতের হাতে ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, কিন্তু সে আলোচনা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের কোটায় উন্নীত হলো আরো পরে। এ বিলম্বের প্রধান কারণ ছিল নানা প্রাচীন ভাষার philological studies-এর অভাব। বিগত শতকের মধ্যভাগে নানা পণ্ডিতদের হাতে বিভিন্ন প্রাচীন ভাষার philology সুপ্রতিষ্ঠিত হল,—ফ্রান্সে বুর্ণুফ আবেস্তা ও প্রাচীন পারসিক শিলালিপির গভীর আলোচনা করলেন, এবং প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান গড়ে তুললেন। এই সময়ে জার্ম্মাণীতে নানা পণ্ডিত গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও রুশদেশে রুশীয় পণ্ডিতেরা শ্লাভনিক ভাষার ভাষাতত্ত্বের সুসঙ্গত আলোচনা করলেন এবং এই সব আলোচনার ফলে Indo-European linguistics সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণ-সমূহ ও তাদের ক্রমপরিণতির ধারা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারিত হল। কিন্তু কোন ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে (phonology) ব্যঞ্জনের চাইতে স্বরবর্ণের স্থান নির্দ্ধারণ করাই হচ্ছে বেশী আবশ্যকীয়; সে আলোচনা এইবার আরম্ভ হল এবং ফরাসী পণ্ডিত দ'সস্যুর (De Saussure) ১৮৭৮ সালে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরবর্ণ-সমূহ ও তাদের ক্রমপরিণতির ধারা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারণ করলেন। দ'সস্যুরের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যে কেউ না ভেবেছিলেন তা' নয়, তবে তাঁরা এ সম্বন্ধে কেহই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন নি; দ'সস্যুর তা পৌছেছিলেন। প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় স্বরবর্ণের রূপ নির্দ্ধারিত হতেই ইন্দোইউরোপীয় নানা ভাষার তুলনা-মূলক বিচার সহজসাধ্য হল এবং সে সম্বন্ধে ধারাবাহিক কাজ সুরু হল। এ কাজে অগ্রণী হলেন ব্রুগমান্ (Brugmann) ও তাঁর সহকর্ম্মী দেলব্রুক (Delbruck) এবং তাঁদের হাতে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ গড়ে উঠলো। এই সময়ে মেইয়ের আবির্ভাব।

(২)

অধ্যাপক মেইয়ে ছিলেন দ'সস্যুরের, ছাত্র ; তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন অধ্যাপক লেভির নিকট এবং সেই হিসাবে তিনি লেভিরও ছাত্র। অধ্যাপক মেইয়ের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। পূর্ব্বেই বলেছি যে তিনি ছিলেন একাধারে philologist ও linguistician। তাঁকে philologist হিসাবে কাজ করতে হয়েছিল ; তার কারণ অনেক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তখনো বাকী ছিল। সেই দিকে মেইয়ের দৃষ্টি প্রথম পড়ে ও ১৮৯৭ সালে তাঁর যে প্রথম বই প্রকাশিত হয়—সে-বইয়ের নাম Recherches sur l'emploi du genitif-accusatif en vieux-slave, অর্থাৎ "প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষায় সম্বন্ধ ও কর্ম্মকারকের প্রয়োগ"। যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানের ছায়া মাড়ান নি তাঁরা হয় ত ভাববেন যে—কোন ভাষায় এ দুটী কারকের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, প্রশংসারও বস্তুও নয়। কিন্তু সে মতবাদে আমাদের আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত হবে না। ভাষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে একথা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, কোন ভাষার morphology বা শব্দের রূপতত্ত্বে সম্বন্ধ ও কর্ম্মকারকের ব্যবহারই বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য, কারণ সে ব্যবহারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে পারলে সমস্ত morphology বোঝা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আর প্রাচীন শ্লাভনিক বলতে আমরা এমন একটা ভাষা বুঝি যার প্রচলন ছিল খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্ব্বে। এ ভাষায় লিখিত খৃষ্টীয় নবম শতকের ধর্ম্মশাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে এবং সেই সব শাস্ত্রের সাহায্যে প্রাচীন ভাষার রূপ কতক পরিমাণে ধরা যায়। কিন্তু তার সম্পূর্ণ ছবি আঁকতে হলে ঐ ভাষা-গোষ্ঠীর আধুনিক নানাভাষার তুলনামূলক বিচার করা আবশ্যক।

শ্লাভনিক ভাষাগোষ্ঠী বর্ত্তমানে ত্রিধাবিভক্ত—(১) দক্ষিণ-প্রবাহ—(ক) মাকিদনীয় ও বুলগার (Macedonian, Bulgarian), নবম শতকে এই ভাষায় খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি গ্রন্থ অনূদিত হয় এবং সে সব অনুবাদ খৃষ্টীয় একাদশ শতকের পুঁথিতে সংরক্ষিত হয়েছে। (খ) ক্রোয়াত (Serbo-croatian) বর্ত্তমানে যুগোশ্লাভ প্রদেশে নিবদ্ধ। (গ) শ্লোভান (Sloven), ঐ ভাষা হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের কথ্য ভাষা এবং তা ইতালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের নানাস্থানে নিবদ্ধ। (২) পশ্চিম-প্রবাহ—শ্লাভনিক ভাষাগোষ্ঠীর পশ্চিম-প্রবাহের প্রধান

ভাষা হচ্ছে—পোলিশ ও চেক্ (Polish ও Czech) বর্ত্তমানে পোলাণ্ড ও চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাষা। (৩) মূল প্রবাহ—রুশীয় ভাষা। সুতরাং ত্রিধা বিভক্ত হবার পূর্ব্বে প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার স্বরূপ কি ছিল এবং সে ভাষায় 'সম্বন্ধ ও কর্ম্ম-কারকের ব্যবহার' কি প্রকার ছিল তা' নির্দ্ধারণ করতে হলে কেবলমাত্র খৃষ্টীয় নবম শতকের পুঁথির সাহায্য নিলেই চলবে না, কারণ সে পুঁথির ভাষা হচ্ছে যাকে দক্ষিণ-প্রবাহ বলেছি; অন্যান্য প্রদেশের নানা ভাষারও সাহায্য নিতে হবে। অধ্যাপক মেইয়েকেও তাই করতে হয়েছে। প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার এ আলোচনা তিনি নানা কাজের মধ্যে বরাবরই চালিয়েছিলেন; ১৯০৫ সালে তাঁর Etudes sur l'etymologie et le vocabulaire du vieux-slave, (প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষায় শব্দ ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়), ১৯২২ সালে Grammaire de la langue polonaise (পোলিশ ভাষার ব্যাকরণ) এবং পরিশেষে ১৯২৪ সালে Le slave commun (সাধারণ শ্লাভনিক)। প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর কাজের পরিসমাপ্তি হয়েছে এই শেষ গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থে ত্রিধা-বিভক্ত হবার পূর্ব্বে প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার যে রূপ ছিল তার চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার প্রাচীন ধ্বনিবিজ্ঞান (phonology), ব্যাকরণ ও শব্দের রূপতত্ত্ব (morphology) বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

প্রাচীন শ্লাভনিক ভাষার স্বরূপ নির্দ্ধারণেই মেইয়ের তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান নিবদ্ধ ছিল না। তিনি গ্রীক ও লাতিন ভাষার তুলনামূলক আলোচনাও বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ—De quelques innovations de la declinaison latine (লাতিন ভাষার শব্দরূপের কতকগুলি নূতনত্ব) ১৯০৬ সালে এবং ১৯১৩ সালে Apercu d'une histoire de la langue grecque (গ্রীক ভাষার ইতিহাসের প্রথম খসড়া) প্রকাশিত হয়। গ্রীক-লাতিনের তুলনা-মূলক বিচারের পরিসমাপ্তি হয় এক বিরাট গ্রন্থে—Grammaire comparée des langues classiques (গ্রীক ও লাতিন ভাষার তুলনা-মূলক ব্যাকরণ)। এ গ্রন্থ তিনি তাঁর প্রধান ও প্রথম শিষ্য ভাঁদ্রিয়েসের (Vendryes) সহায়তায় শেষ করেন। শ্লাভনিক ও গ্রীক লাতিন ছাড়া তিনি ইউরোপের আর একটী ভাষাগোষ্ঠীর আলোচনা করতেও পরাঙ্মুখ হন নি। সে ভাষাগোষ্ঠী হচ্ছে জর্ম্মাণিক। এ ভাষা নিয়ে বহু আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা করলেও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের

দিক দিয়ে সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের বক্তব্য ছিল এবং সেই কারণে তিনি ১৯২৭ সালে তাঁর Caractères généraux des langues germaniques (জর্ম্মাণিক ভাষা সমূহের সাধারণ স্বরূপ) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে এশিয়ার নানা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে তিনি সংস্কৃত নিয়ে কোন বিশেষ কাজ করেন নি সত্য (কারণ সে দিকে অনেক কর্ম্মী ছিলেন), কিন্তু প্রাচীন ইরাণীয়, পারসিক, আর্ম্মেনীয় প্রভৃতির ভাষার আলোচনায় তিনি শীর্ষ-স্থানীয় হয়েছিলেন। প্রাচীন আর্ম্মেনীয় (Aremenian) ভাষা সম্বন্ধে তাঁর পূর্ব্বে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নি, অথচ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর তুলনামূলক আলোচনায় আর্ম্মেনীয় ভাষাকে বাদ দেওয়া চলে না। কারণ একথা ঠিক যে আর্ম্মেনীয় ভাষা ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার উপশাখা নয়, এ হচ্ছে একটা পৃথক শাখা। এ ভাষার প্রাচীন কোন নিদর্শন নাই ; খৃষ্টীয় নবম শতকে এ ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মের পুঁথি-পত্র অনূদিত হয় আর সেই অনুবাদই হচ্ছে এ ভাষার প্রধান প্রাচীন নিদর্শন। এই সব প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনিক আর্ম্মেনীয় ভাষার সাহায্যে অধ্যাপক মেইয়ে তার প্রাচীন রূপ নির্দ্ধারণ করতে দৃঢ়-সংকল্প হলেন। ১৯০৩ সালে তাঁর Esquisse d'une grammaire comparée de l'armenien classique (প্রাচীন আর্ম্মেনীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ) এবং ১৯১৫ সালে Altarmenisches Elementarbuch প্রকাশিত হয়।

আবেস্তা ও বিশেষভাবে আবেস্তার প্রাচীন অংশ গাথা নিয়ে মেইয়ের অনেক আলোচনা আছে। এ সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা হচ্ছে—Trois conférences sur les gáthá)। কিন্তু সে আলোচনাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তিনি প্রাচীন পারসিক ভাষায় তুলনামূলক আলোচনা করেন। প্রাচীন ইরাণীয় ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ আমরা পাই না, কালক্রমে এ ভাষা নানা শাখায় বিভক্ত হয় যথা—জেন্দ (যে ভাষায় আবেস্তা লিখিত), সুগ্দীয় (Sogdian)—সমরকন্দ অঞ্চলের প্রাচীন কথ্য ভাষা ও পহ্লবী—যা হতে ফার্সী ভাষার উৎপত্তি। প্রাচীন পারসিক হচ্ছে সেই ভাষা যা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে ইরাণীয় সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশের কথ্য ভাষা ছিল।।

এই ভাষাতেই দরায়ুস (Darius), জারক্সেস (Xerxes) প্রভৃতি সম্রাটদের শিলালিপি লিখিত হয়েছিল। এই সব উপাদানের সম্পূর্ণ আলোচনা

না হলে প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার স্বরূপ নির্দ্ধারিত হবে না এ কথা মেইয়ে বুঝেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি ১৯১৩ সালে তাঁর Grammaire du Vieux Perse (প্রাচীন পারসিক ভাষার ব্যাকরণ) প্রকাশ করেন। এবং তাঁরই নির্দ্দেশানুসারে তাঁর একজন প্রধান শিষ্য গোথিও (Gauthiot) মধ্য-এশিয়া হতে আবিষ্কৃত পুঁথি-পত্রের সাহায্যে প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার ব্যাকরণ আলোচনা করেন। গোথিওর সুগ্দীয় ব্যাকরণের প্রথম ভাগ মাত্র (Grammaire Sogdiane) প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে কাজ সম্পূর্ণ করবার পূর্ব্বেই ইউরোপের মহাযুদ্ধে তাঁর ডাক পড়ে ও তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। যুদ্ধে যোগদান করবার পূর্ব্বে তিনি সমরকন্দ ও পামির অঞ্চলে প্রাচীন সুদ্গীয় ভাষার আধুনিক নানা শাখা-ভাষার আলোচনা করেছিলেন। মেইয়ের অন্য এক কৃতী ছাত্র বেনভেনিস্ত (Benveniste) সম্প্রতি গোথিওর অসম্পূর্ণ গ্রন্থ শেষ করেছেন এবং মেইয়ের অনুপ্রেরণায় প্রাচীন সুগ্দীয় ভাষার তুলনামূলক সম্পূর্ণ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, মেইয়ের ধারণা ছিল এই সব ইরাণীয় ভাষার স্বরূপ উদ্ধার করা হলে প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হবে। শুধু আবেস্তার সাহায্যে সে কাজ হতে পারে না, তার কারণ আবেস্তার ভাষা হচ্ছে প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার একটী শাখা মাত্র। আর সে ভাষাও যে লিপিতে সংরক্ষিত হয়েছে সে লিপিতে কোন ভাষার নিজস্ব রূপ বজায় থাকতে পারে না ; কারণ সে লিপিতে স্বরবর্ণ লিখবার কোন উপায় নেই, লেখা চলে শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ। এই কারণে বৈদিক যুগের ভারতীয় আর্য্য ভাষার রূপ আমরা যত স্পষ্টভাবে ধরতে পারি, প্রাচীন ইরাণীয় ভাষার তা' পারি না।

পরিশেষে ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে মেইয়ে আর এক নূতন ভাষার আলোচনাও অতি দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। মধ্য-এশিয়া হ'তে পল পেলিও যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগ্রহ করে আনেন তন্মধ্যে কতকগুলি পুঁথি হতে লেভি এক নূতন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সন্ধান পান, তার উদ্ধার সাধন করেন ও অর্থনির্ণয় করেন। এ ভাষাকে পূর্ব্বে Tokharian B বলা হত কিন্তু সম্প্রতি তার প্রকৃত নাম যে কুচীয় তা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে। মেইয়ে এই ভাষার তুলনামূলক বিচার করে নানা প্রবন্ধে প্রমাণ করেন যে এ-ভাষা হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটী নূতন ভাষা, যা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে।

(৩)

এ পর্য্যন্ত মেইয়ের যে সমস্ত কাজের উল্লেখ করেছি তা হতেই সম্পূর্ণ বোঝা যাবে যে তাঁর প্রতিভা কতটা বহুমুখী ছিল। কিন্তু এ সব বিভিন্ন ভাষা নিয়ে গভীর আলোচনা করবার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে। এ বইয়ের নাম হচ্ছে—De indo-europea radice **men** "mente agitare" এবং এ বইয়ে তিনি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় একটী মূল ধাতুর নানা দিক দিয়ে আলোচনা করেছেন। ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বই এবং এক হিসাবে সে বিজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সাল। এ গ্রন্থ হচ্ছে তাঁর প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। এ বইয়ের নাম—Introduction a l'étude comparative des langues Indo-Européennes—অর্থাৎ "ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের তুলনামূলক আলোচনার ভূমিকা।" পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতদের এবং মেইয়ের নিজের অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর এ বই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতদের আলোচনার ভিতর অসঙ্গত ও আনুমানিক যে সব সিদ্ধান্ত ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করেছেন, এবং ইতিমধ্যে তাঁর নিজের ও অন্যের নানা নূতন অনুসন্ধানের ফলে নূতন নূতন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান প্রসার লাভ করবার জন্য পূর্ব্বে যে সব সিদ্ধান্ত ছিল হাল্কা সেগুলিকে তিনি বিজ্ঞানের কোটায় সুদৃঢ় ভাবে স্থাপিত করেছেন।

ইন্দো-ইউরোপীয় linguistics সম্বন্ধে এখানে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার স্বরূপ যে ভাবে নির্দ্ধারিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর হবে না। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-সমূহের তুলনামূলক বিচারে যে সমস্ত ভাষার কথা ওঠে সেগুলি হচ্ছে—

(১) ইন্দো-ইরাণীয়—(ক) বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এবং সে ভাষা হতে উদ্ভূত মধ্যযুগের প্রাকৃত ভাষা ও আধুনিক ভাষা। (খ) ইরাণীয়—আবেস্তার ভাষা, যাকে বলা হয় জেন্দ, পহ্লবী, পারসিক (খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের শিলালিপির ভাষা), সুগ্দীয় ও পামির এবং ককেসাস্ পর্ব্বতের অন্তঃপাতী নানা স্থানের কথ্য ভাষা।

(২) গ্রীক্—প্রাচীন গ্রীক খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকে যে চারটী প্রধান শাখায়

বিভক্ত হয়েছিল তা ঐ সময়ের নানা শিলালিপির ভাষা হতে জানা যায়; হোমারের কাব্য গ্রীক সাহিত্যের সব চাইতে প্রাচীন গ্রন্থ হলেও তার ভাষা অবিভক্ত গ্রীক ভাষার নিদর্শন নয়।

(৩) ইতালো-কেল্‌তিক্ (Italo-celtic)—(ক) লাতিন, এবং ইতালীর অন্যান্য স্থানের প্রাচীন ভাষা, (খ) কেল্‌তিক,—প্রাচীন গলদেশে, বৃটানী, কর্ণওয়াল প্রভৃতি প্রদেশের ভাষা এবং আইরিশ।

(৪) জর্ম্মাণিক,—এ ভাষা বহু শাখায় বিভক্ত, এবং বর্ত্তমান কালে জার্ম্মাণী, নরওয়ে, সুইডেন, দেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংলাণ্ডে প্রচলিত।

(৫) শ্লাভনিক ও বাল্‌তিক; শ্লাভনিক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলেছি; বাল্‌তিক হচ্ছে লিথুয়েনিয়ার ভাষা এবং প্রুশিয়া দেশে এ ভাষা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে দেশে তা অধুনা লুপ্ত।

(৬) আলবানীয়

(৭) আর্ম্মেনীয়

(৮) কুচীয়-তুখারীয় (এই নূতন আবিষ্কৃত ভাষাকে অনেকে ইতালো-কেল্‌তিকের অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও এর প্রকৃত স্থান এখনো নির্দ্দিষ্ট হয় নি)।

এই সব ভাষা যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হতে উদ্ভূত তা'তে কোন সন্দেহ নাই। তাদের মধ্যে সমজাতীয় শব্দ আছে বলেই যে এ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তা নয়; তাদের প্রত্যেকের ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonology), এবং শব্দের রূপতত্ত্বের (Morphology) পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেই এ সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করা হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক দিয়ে আলোচনা করলে এ সব ভাষাকে প্রধানতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি ভাষায় 'একশত' বল্‌তে আমরা সংস্কৃত "শতম্" জাতীয় শব্দ পাই (সংস্কৃত শতম্, জেন্দ সত'ম, শ্লাভনিক সুতো, বাল্‌তিক শিমৃতস্ ইত্যাদি) এবং অন্যান্য ভাষায় পাই কেন্তুম্ জাতীয় শব্দ (লাতিন্ কেন্তুম, কুচীয়-তুখারীয় কন্ত, গেলিক কান্ত, গ্রীক্—এ-খাতোন্ ইত্যাদি)। এ থেকে সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা কালক্রমে দুটী প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়, একটীকে বলতে পারি কেন্তুম-শাখা অন্যটী শত'ম শাখা। প্রথম শাখা হ'তে গ্রীক, ইতালো-কেল্‌তিক, জর্ম্মাণিক, কুচীয়-তুখারীয় ইত্যাদি; অন্যশাখা হতে, শ্লাভনিক, ইন্দো-ইরাণীয় প্রভৃতি উদ্ভূত হয়েছে।

কেন্তুম ও শত'ম শাখার নানা ভাষার ক্রমবিবর্ত্তন অনুসন্ধান করে ও তাদের তুলনামূলক বিচার করে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব উদ্ধার করা হয়েছে এবং সে ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সমূহের রূপ ধরা পড়েছে। একটী উদাহরণ দিলেই এ কথা স্পষ্ট ধরা পড়বে। সংস্কৃত শতম, জেন্দ-সত'ম্, শ্লাভনিক সুতো, বাল্তিক-শিম্তস্ ও লাতিন, কেন্তুম্, কুচীয়-তুখারীর কন্ত্, প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি তুলনা করলে বোঝা যায় এই শব্দসমূহের প্রথম ব্যঞ্জন আমরা বিভিন্নরূপে পাই, শ, স, ক ইত্যাদি। সুতরাং মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এ স্থানে এমন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ ছিল যা শ, স, ক, এর কোনটীই নয়। অথচ তা' ছিল এমন একটী বর্ণ যা-হতে শ, স, ক প্রভৃতি ব্যঞ্জন উদ্ভূত হয়েছে এবং সেই কারণে তার রূপ ধরা হল k', এই জাতীয় তুলনার দ্বারা মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় সমস্ত ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের রূপ উদ্ধার করা হল। এই ধ্বনিতত্ত্ব হতে, সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে যে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ধ্বনি পরবর্ত্তীকালের কোন ভাষাই সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে পারে নি, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে নূতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তা' বহুপরিমাণে বদলেছে। যথা সংস্কৃতে আমরা স্বরের অ পাই, অথচ সেই 'অ'য়ের স্থানে, শ্লাভনিক ভাষায় e, o এবং আর্ম্মেনীয়, ইতালো-কেল্তিক প্রভৃতি ভাষায় e, o, a পাই। এই তুলনায় স্পষ্ট ধরা যায় যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় এমন তিনটী স্বরবর্ণ ছিল—*e, *o, *a যার প্রাচীন রূপ সংস্কৃতে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে মাত্র একটী স্বর 'অ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই একই প্রণালীতে নানা ভাষায় শব্দের বিভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ তুলনা করে মূল-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার morphology-ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নানা ধাতুর রূপ তুলনা করলে আমরা প্রাচীন বিভক্তির রূপের খোঁজ পাই। যথা—তৃতীয় পুরুষ, বহুবচনে সংস্কৃত অভরন্ত, গ্রীক eponto, লাতিন sequo-ntu-r প্রভৃতি হতে বুঝতে পারি যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয়তে ধাতুর তৃতীয় পুরুষ বহুবচনে বিভক্তি ছিল -ento।

এ সম্বন্ধে আর বেশী কথা বলবার আবশ্যক নেই। পূর্ব্বে যা বলেছি তা হ'তে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞানের নানা সমস্যার জটিলতা বোঝা যাবে। প্রাচীন ইতিহাসে এ ভাষাবিজ্ঞানের অবদান তুচ্ছ নয়। মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নানা শাখায় ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধীয় যে সব সমজাতীয় শব্দ

আছে সেগুলির তুলনা করলে আমরা প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগ্রহ করতে পারি তার দ্বারা একটী প্রাচীন জাতির সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করতে না পারলেও বৈদিক যুগের সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচলিত নানা অদ্ভুত মতবাদের ভ্রমপ্রমাদ সহজেই ধরতে পারি। এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার প্রসার এবং সে প্রসারের ধারা ও কাল সম্বন্ধেও যে অনুমান করতে পারি সে অনুমান কোন দিন পরম সত্যে পরিণত না হলেও ব্যবহারিক সত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। এবং এই ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে একথাও আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে বেদ খৃষ্টের জন্মের সত্তর হাজার কেন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও রচিত হয় নাই। এই বিজ্ঞানের নানা দৃঢ় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের অনবধানতার জন্যই তথাকথিত পণ্ডিতসমাজে এখনো বহু হাস্যকর মতবাদ চলে আসছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আর একটী শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে সাধারণ ভাষা-বিজ্ঞান বা general linguistics সম্বন্ধে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার ধ্বনির ও রূপের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটে সে সম্বন্ধেও স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। সেই ভাষা-গোষ্ঠীর বহু ভাষার তুলনা করতে হয়েছে এবং সেই কারণে general linguistics অনেক পরিমাণে লাভবান হয়েছে। এই দিকে পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যই মেইয়ে ১৯২১ সালে তাঁর Linguistique historique et linguistique générale নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মেইয়ের নানা প্রবন্ধের কথা এপর্য্যন্ত বলি নাই, বলবারও আবশ্যক নাই। যা বলেছি তা থেকেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভাষাতত্ত্ব ও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে মেইয়ের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীপ্রবোধ বাগচী

দীপ্তির মোহ

যদি আশুকে জিজ্ঞাসা করা যায়—তুমি দীপ্তির মধ্যে এমন কি অপূর্ব্ব গুণের সমাবেশ দেখিয়াছিলে যে ভালোবাসিয়া, মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মাত্র সাতদিনের নোটিসে ঘরের গৃহিণী করিয়া আনিলে? তাহা হইলে আশু সহসা উত্তর দিতে পারিবে না। অর্থাৎ এক কথায় সংক্ষিপ্ত জবাব জোগাইবে না।

এমনি কথার কথা বলিতেছিলাম। তাই বলিয়া সত্যই কোনো বন্ধু আশুকে এ রকম হাস্যকর ও বেকুব প্রশ্ন করিবে না। কারণ অতি প্রত্যক্ষ। যে বুদ্ধি লইয়া সাধারণ মানুষেও অতি নির্বিবাদে অর্থ উপার্জ্জন করে, সংসার প্রতিপালন করে, আর ভালো মন্দের বিচার করে, সেইটুকু বোধশক্তি থাকিলেই হইল। চোখ খুলিয়া রাখিলেই প্রথম নজরে পড়িবে দীপ্তির মসৃণ ও নিটোল দেহ এবং তাহার গায়ের বর্ণের উজ্জ্বলতর দীপ্তি। কান সজাগ রাখিবার প্রয়োজন হয় না; এমনি অন্যমনস্কতার ভান করিলেও তাহার মিহি, নরম কণ্ঠস্বর অবাধে প্রবেশপথ খুঁজিয়া লয়। আর কথা বলিলে, একটু অন্তরঙ্গ হইলেই ধরা পড়িবে তাহার মার্জ্জিত রুচি, শিক্ষা-দীক্ষা ও সতর্ক শোভনতা। এতগুলি লোভনীয় বিশেষণ যেখানে একত্র হইয়াছে, সেই বিশিষ্ট বস্তুটির চারিপাশে যে অবিরত মধু গুঞ্জন চলিতে থাকিবে, তাহাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হওয়ার নাই। সুতরাং আশুর বন্ধু-বান্ধবেরা কখনো এ ধরণের অসঙ্গত প্রশ্ন করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিবে না, বিশেষ করিয়া উত্তর যেখানে জীবন্ত ও চাক্ষুষ প্রমান।

তবু এমনও ত হইতে পারে যে তর্কে ও আলোচনায় অনেক স্বয়ংসিদ্ধ সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। রজনী প্রভাতকল্প জানিয়াও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ভোরের পাখী ডাকিতেছে, না? অতএব যদি ধরিয়া লওয়া যায় কোনো অসতর্ক মুহূর্ত্তে মক্ষীরাণীর একজন স্তুতি-গুঞ্জনকারী এই প্রশ্নই করিয়াছে, তাহা হইলে আশুকে নীরব থাকিতে হইবে! শুনিয়াছি কাব্যের রসোপলব্ধি নাকি ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর। তাহা হইলে যে ব্যক্তি শরীরিণী কবিতার রসাস্বাদন করিয়াছে, সে সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মের স্বরূপবর্ণনা কি করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিবে?

আত্মানুভূতির আবেগ ও প্রখরতা যখন অতিমাত্রায় তীব্র ও অসহন হইয়া উঠে, আত্মস্থ মানুষ তখন আপনা হইতেই বিস্তৃত প্রকাশের ক্ষেত্র বাছিয়া লয়। আশুর বেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না!

তাহাদের বিবাহের কিছুদিন পরেই দীপ্তির অবর্ণনীয় মোহের আকর্ষণে ধরা পড়িয়া যে কয়জন বন্ধু মধুর দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, আমি তাহাদেরই অন্যতম একজন। কি করিব, সময় কাটিতে চাহিত না। অবিবাহিত জীবনের বৈচিত্র্যবিহীন বিস্বাদ দূর করিবার জন্য প্রথমে মধ্যে মধ্যে তাহাদের কাছে হাজির হইতাম। তাহার পর কখন হইতে যে সেই সাময়িক অবসরবিনোদন অভ্যাসে দাঁড়াইল, অবশেষে সরকারী চাকরীর নেশায় পরিণত হইয়া গেল, নিজেই তাহা খেয়াল করি নাই!

সেদিন আশু একলাই ছিল জানিতাম। দীপ্তি কিছুদিনের জন্য কি একটা জরুরী সাংসারিক কাজে বাপের বাড়ী গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম দশ পনেরো দিনের মধ্যে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। তথাপি যাইতে হইল। এমন কোনো আশু প্রয়োজনীয় ব্যাপার আমার জীবনে ঘটে না ও ঘটিতে পারে না যাহাতে কিছুদিনের জন্যও আশুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে পারি। তাহা ছাড়া বন্ধুর নিকটে ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটা জিনিস আছে ত?

গিয়া দেখিলাম আশু বৈঠকখানার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ভিতরেই আছে। ঠেলিবামাত্র দরজা আপনি খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমি ত সম্পূর্ণ হতবাক্। আশু চঞ্চল শিশুর মত সারা ঘরময় ছুটাছুটি, লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম—যে কার্ণিশের উপরে ঘুলঘুলির মধ্যে যে সন্ত্রস্ত ও কম্পমান চড়াই পাখীটি ঠোঁট বাহির করিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাকে সে না ধরিয়া ছাড়িবে না। হাতে তাহার অনুরূপ অস্ত্র-শস্ত্র; ঝুল্ ঝাড়িবার একটা লম্বা লাঠি, আর ফরাস্ ঢাকিবার একখানা প্রকাণ্ড চাদর।

বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকাইতেই আশু সশব্দে হাসিয়া ফেলিল। কতকটা লজ্জা গোপন করিবার জন্য হইলেও, সে হাসি অকৃত্রিম। বলিল—"পাখীটা বড়

জ্বালাতন করছিল। তাই ভাবলুম ওটাকে ধরি। তোর বোধ হয় মনে হচ্ছে, এ এক আচ্ছা ছেলেমানুষি জুড়েছি—না? কিন্তু জানিস্ ত, সঙ্গদোষে স্বভাব নষ্ট হয়। আমি ত শুধু এই করেছি আর..... ”

অর্থাৎ দীপ্তি থাকিলে দেখিতে ব্যাপারটা কতদূর গড়াইত! হয়ত বাড়ীর যাবতীয় টুল চেয়ার জড়ো করিয়া আনিয়া পর পর সাজাইয়া চটক-স্বর্গের সিঁড়ি বানাইত। নয়ত শেষ পর্য্যন্ত হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকার ঘরে কানামাছি খেলিতে সুরু করিয়া দিত।

চা-পান পর্ব্ব সমাধা হইলে আশু আপনা থেকেই কথা তুলিল। বলিল—“ছাখ, আগে ভাবতুম যে বিয়ে করলেই আমার স্বাধীনতা হবে লুপ্ত, অন্ততঃ উহ্য। অনেকটা সেই ভয়েই গড়িমসি করে ও ব্যাপারটা পিছিয়ে রেখেছিলুম। তারপর হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়, উচ্ছ্বাসের বশে কাজটা করে ফেলে দেখছি যে নেহাৎ মন্দ নয়।”

ঘোর ব্যক্তিত্ববাদী আশুর এ-হেন স্বীকারোক্তি শুনিতে ঠিক্ প্রস্তুত ছিলাম না। বাধা দিয়া বলিলাম—“কিন্তু, একদা তুই বলেছিলি—যতদূর স্মরণ হচ্ছে—যে বিয়ে করা একেবারেই উচিত নয়। তা' হলে স্ত্রী গ্রাস করে ফেলবে। সম্পূর্ণ ও পরিপাটীরূপে কবলিত হয়ে পড়লে আর কোনো স্বতন্ত্র বোধ-শক্তির বালাই থাকবে না—বোঝাই যাবে না আছি কি নেই!”

আশু একটু কুণ্ঠিত হইয়া আমার দিকে চাহিল। তারপর গলাটা ঝাড়িয়া মতামতগুলো যেন পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—“কি জানিস্, আগে যা বলেছিলাম তাও ঠিক্; আবার এখন যে কথা ব্যক্ত করছি তাও ঠিক্। সত্যাসত্য জিনিসটা নিতান্তই আপেক্ষিক। তা ছাড়া, যে লোক অভিব্যক্তিতে আস্থা রাখে, তার অপরিণত, পুরানো মত আঁকড়ে ধরে থাকা চলে না। একদা কবিগুরু এক ধরণের লেখা লিখেছিলেন, একদা গান্ধিজী এক ধাঁচের কথা বলেছিলেন। তাই বলে অন্য রচনা বা কথান্তর বন্ধ করে রাখতে হবে?”

“তর্কের ক্ষেত্রটা কিন্তু প্রসারিত হচ্ছে।”

“হওয়া উচিত। কিন্তু ফিরে আস্‌ছি। স্ত্রীর অভাব-প্রসঙ্গে প্রাগ্-বিবাহিত জীবনে যে উক্তি করেছিলুম সেটা এক প্রকার শিষ্ট প্রয়োগ বলতে পারিস্। কিন্তু

কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যি, এটা এখনো স্বীকার করি, যদিও আমার মত বদ্‌লেছে অন্যান্য অনেক বিষয়ে। ব্যাপারটা কি জানিস—সত্যিই ওরা আমাদের গ্রাস করে। তবে ধীরে ধীরে। সাপের ইঁদুর-ব্যাঙ্‌ ধরা দেখিছিস মন দিয়ে কখনো? তা হলে বুঝতে পারবি। প্রথমটা অবিশ্যি একটু নাড়া-চাড়া, ছট্‌-ফটানি, আওয়াজের আড়ম্বর হয়ে থাকে। শেষকালে বেমালুম্‌ হজম। চিহ্নটি পর্য্যন্ত থাকে না। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে আগু-পেছু হয়, এই যা। কারুর বেলায় তাড়াতাড়ি সারা হয়, আবার কোনো জায়গায় বা প্রক্রিয়া কার্য্যকরী হতে বেশী দেরী হয়। সে সব পুরুষের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে। দীপ্তির মতামত এরি মধ্যে আমার মনে বেশ ছায়াপাত করেছে, এমন কি সেগুলো আমি ভালো বলেই সমর্থন করছি। তবে তার স্বভাবটা উগ্র রকমের গ্রাসেচ্ছু নয়, তাই রক্ষে। আমার মনে হয়, এই ভাবে চল্‌লে বছর চল্লিশেক পর্য্যন্ত টান্‌তে পারবো। কেননা এখনো খাওয়া-খাওয়ি সুরু হয়নি।”

“সে দেখতে পাচ্ছি। এখন শুধু মনের মেশামিশি। পাশাপাশি থাকতে থাকতে……”

“কি হবে ঠিক এত আগে বলা যায় না। কিন্তু ও কথা থাক্‌। বলছিলুম যা', তাই বলি। ঝোঁকের মাথায় দীপ্তিকে পরমাত্মীয়া করে ফেললুম।”

“তাই ত সবাই করে জান্‌তুম।”

“না-রে-না, সে হ'ল ঝুঁকি। ঝোঁক অন্য জিনিস। এ হল কি যেন একটা বিশেষ মোহ মনকে পেয়ে বসে। হয়ত একটা তুচ্ছ কথা, নয়ত একটু সামান্য ছেলেমানুষি, ওইতেই মেরে দেয়। তখন মন তৈরী করে ফেলতে দেরী হয় না। আমারও তাই হ'ল। আমি কখনো ছেলেমানুষ ছিলুম না—ছেলে বয়সেও না। অতি অল্প বয়স থেকেই ভারী ভারী কেতাব পড়ে যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলুম তাকে মেয়েরা আড়ালে পেচক শ্রেণীর সমভুক্ত করে। দীপ্তির বাড়ীতে যে দিন প্রথম গেলুম সেইদিন দেখলুম ওর হাস্যপ্রিয়তা। যত দিন যেতে লাগল, ততই নব নব পরিচয় পেতে লাগলুম ওর মধুর চপলতার। তারপর এক রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে,—মহা মুস্কিল! কিছুতেই ভুলতে পারি না—তার ডান দিকের গালের টোল। যতই বিছানায় শুয়ে চোখ বুজি, ততই সে টোল আমার মনকে দোল দেয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আরও নতুন নতুন আবছা-দেখা বিশেষত্ব,—

ঘন কালো চুলের মধ্যে ভয়ানক শাদা সীঁথি, এলো খোঁপার নীচে সূক্ষ্ম দু একটা চুলের কোয়া, একটা দাঁতের ওপর আর একটা দাঁত এসে পড়েছে—এই সব। আর সব সময়ে মনে পড়তে লাগল—দীপ্তির কৌতুকোজ্জ্বল মুখ ও তার মৃদু কণ্ঠ-স্বরের জড়িত আবেশ! ওর স্বভাব আমার স্বভাবেরর ঠিক্ উলটো,—বিপরীত বিপরীতকে আকর্ষণ করলে।"

"কাজেই ছেলেমানুষ কবলিত করলে জ্ঞানবৃদ্ধকে—"

"এক প্রকার তাই। তার ওপর হল একটা মজার ব্যাপার। দীপ্তির বড়দি এক-দিন আমায় একটা কাহিনী শোনালেন—যেটা তার ছেলেবেলাকার জীবনের কথা।"

"কৈ, সে রহস্য ত কোনোদিন শুনিনি!"

"দীপ্তি সেদিন বাড়ীতে ছিলোনা। আমি নিয়ম মত নিত্য বৈকালিক হাজিরা দিতে গিছলুম। বড়দি আমায় বসালেন তাঁর নিজের ঘরে। এ-কথায় সে-কথায় দীপ্তির ছেলেমানুষির কথা উঠল। সেই প্রসঙ্গে তিনি পুরানো দিনের স্মৃতি শোনাতে লাগলেন। বয়স্থা মহিলা—সসম্ভ্রমে তাঁর অমৃত-কথা কর্ণাধঃকরণ করছিলুম। দীপ্তির কিশোর-কালের জীবনের কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগছিল, বলতে হবে। বড়দির সগৌরব বর্ণনায় মনে হচ্ছিল, যেন কোনো ঐতিহাসিক মহীয়সীর বাল্যচরিত জানতে পারছি।

দীপ্তি নাকি ছেলেবেলায় দারুণ রকমের অভিমানী মেয়ে ছিল। একটু কিছু হলেই ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে আড়ালে সরে যেত, কাঁদবার জন্যে। সেই কারণে বাড়ীর লোকে ওকে বড় একটা বকুনী দিত না। ধমক খাবার মেয়েও দীপ্তি ছিল না। অতি অল্প বয়স থেকেই ওর গোছালো স্বভাব। ঘর-দোর নোংরা করে রাখা ছিল দু চক্ষের বিষ। সারাদিন ধরেই ঘরের টুকিটাকি নাড়ছে, সরাচ্ছে বা গোছাচ্ছে। বাবা কাজ থেকে ফিরবার আগেই, তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সব ঠিকঠাক করে রাখত। কাজেই দীপ্তি ছিলো সুয়ো মেয়ে, বাবার ত বটেই, এমন কি মার-ও। কিন্তু সকলের সোহাগী হলেও, আদরে বা প্রশ্রয়ে সে একটুও মাটি হয়নি। খারাপ হবার মেয়েরা হল অন্য জাতের। আদর যাদের প্রাপ্য, সকলের স্নেহ যাদের অতি সহজ আবেষ্টনী, তারা নতুন করে বদ্‌লায় না।

কিন্তু অন্য সব সাংসারিক বিষয়ে ফিটফাট, গোছালো আর বুদ্ধিমতী হলে কি হয়, দীপ্তির স্বভাবে দু একটা আলগা বাঁধন ছিলো। সেইটেই তার বিশেষত্ব। তা ছাড়া, শরীরে তার দয়ামায়া ছিলো অসম্ভব রকমের—সে কখনো ভিখিরী ফেরাত না। রবিবার হলে, দূর গাঁ থেকে ভিখিরীর দল জটলা করে আসত। এসে কেউ ডাকত না অন্য কারুকে, সবাই চাইত দীপ্তিকে। মা ঈষৎ ঝাঁঝের সুরে বাবাকে বলতেন—নাও, এইবার তোমার ধর্ম্মিষ্ঠা মেয়ের পুণ্য সামলাও! বাবা হাসতেন, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ভিখিরীদের ভিক্ষা বিলোতেন।

পাড়ার লোকেরাও দীপ্তি বলতে অজ্ঞান। জীবনে সে কাউকে অসন্তুষ্ট করেনি, কেউ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয় নি। চক্ষুলজ্জা তার ভীষণ, কাউকে সে বিমুখ করতে পারেনা। অবিশ্যি অনেক কোমল-হৃদয়ের মেয়েদেরই মধ্যে এ সব গুণ তুই দেখতে পাবি। এতে অবাক হবার কিছু নেই বটে, কিন্তু আমি হয়েছিলুম। সেটা বড়দির গল্পের গুণে। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে দীপ্তির মত এত নম্র, এত কোমল, এত সহৃদয় মেয়ের কথা কখনো শুনিনি, শুনবো না। কিন্তু এর চেয়ে আরো জবর খবর বাকী ছিল। তবে মুখপাতের জোরে আমার মনটা বেশ উন্মুখ হয়েছিল।

দীপ্তির মেধাশক্তি ছিল ভালো। ছোট বয়সে বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দোকানের সাইন বোর্ডের হরফ দেখে দেখে ইংরিজী অক্ষর শিখে ফেলেছিল মাত্র দু দিনে। আর দেয়ালপঞ্জীর তারিখ থেকে ইংরিজী সংখ্যাগুলো চিনেছিল এক ঘণ্টায়। পড়াশুনায় তার অখণ্ড মনোযোগ ছিল। পণ্ডিত মশাই পড়াতে এলে সব চেয়ে খুসী হত দীপ্তি, তবে গল্পের আশায়, কি বাদাম দেওয়া লজেঞ্চুস-এর লোভে, তা' ঠিক বলা যায় না।

আর রাতে পণ্ডিত মশাই চলে গেলেও সে খেয়ে দেয়ে একলা নিজেই পড়তে বসত। তবে কোথায়, সেটা একটা সমস্যা বটে। হয়ত সারাবাড়ী তোলপাড়, দীপ্তি কোথায় গেল, এইমাত্র এইখানে ছিল, অথচ মেয়েকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—দীপ্তি কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত স্বাভাবিক মুখে বেরিয়ে এল খাটের পাশে কোণের জানালার আড়াল থেকে; অথবা নতুন কুটুম্ব এসেছে, অভ্যাগত অতিথির সঙ্গে দীপ্তির মা তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আগ্রহে অধীর হয়েছেন, খুঁজে বেড়াচ্ছেন চারিদিক অথচ পাত্তা মিলছে না, দীপ্তি নিতান্তই সহজ ও সপ্রতিভ ভাবে

ঘরে ঢুকল। অনুসন্ধানে হয়ত জানা গেল, সে এতক্ষণ সিঁড়ির পাশে চোর-কুঠুরীতে বসে বই পড়ছিল। মা অবশ্য চটে ওঠেন মেয়ের কাণ্ড দেখে, বাবা কিন্তু হাসেন। কিছু না বলে কাছে টেনে নিয়ে নীরব স্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, মস্তক আঘ্রাণ করেন। কাজেই, মধ্যে মধ্যে এই খোঁজাখুঁজি নিয়ে বাড়ীর লোককে বিব্রত হতে হয়।

আমার কাছে, কি জানি কেন, এই জিনিসটা ভারী মজার ঠেকল! কল্পনা নেত্রে স্পষ্ট দেখতে পেলুম—আমারি বাড়ীতে যেন দীপ্তিকে খুজঁছে সবাই, অথচ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বাড়ী ফিরে এলে সকলের মুখ ভার দেখে ব্যাপারটা যেন জেনে নিলুম। তারপর টেনে বার করলুম দীপ্তিকে, আমার ঘরের আলমারীর পিছন থেকে। শুনতে শুনতে আর ভাবতে ভাবতে, এই আত্মগোপন প্রিয় শাদা খরগোশটির ওপর একটা গভীর মমত্ববোধ মনের কোণে জমে উঠতে লাগল।"

"আসলে দীপ্তির স্বভাবের একটা দিক তোকে আকৃষ্ট করেছিল, কারণ তোর গম্ভীর মন তার কৌতুককর অভ্যাসগুলোর মধুর হাওয়ায় নাড়া পেয়ে সজীব ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। আর·········

"কিন্তু সব চেয়ে যে জিনিসটায় আমি কৌতুক বোধ করেছিলুম, আর যেটা আমার জীবনে একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন এনে দিলে—সেই কথাটাই এবার বলি। দীপ্তি ছেলেবেলায় যে সব বই পড়তে ভালোবাসত তার একটি তালিকা বড়দির প্রসাদে পাই। 'চারু ও হারু', 'কঙ্কাবতী', 'ঠাকুমার ঝুলি', 'কিশোর' আরো অন্যান্য পুরানো বই তার বড় প্রিয় ছিলো! বড় হয়ে সে কিছু উপন্যাস পড়েছিল বিয়ের আগে, লুকিয়ে। বলা বাহুল্য বইগুলো নববিবাহিত মেজদির বাক্স থেকে চুরি করা। সে সব বই এখন না কি আর কেউ পড়ে না। তবে একটা তথ্য আবিষ্কার হয়েছিলো—বঙ্কিম ছিলেন দীপ্তির প্রাণ, আর প্রভাত মুখুজ্যে তার এক মাত্র বিশ্বস্ত সহচর। আর একখানা বই সে সব চেয়ে ভালোবাসত, যার চেয়ে কোনো উপাদেয়, কোনো লোভনীয় সামগ্রী না কি তার জীবনে আজপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। আন্দাজ করতে পারিস্ কি?"

"রামায়ণ?"

"নাঃ—পাঁজি। অবিশ্যি রামায়ণও খুব ভালো লাগত। তবে পাঁজির কাছে কিছু নয়। দিন নেই রাত নেই,—সময়, অসময়ে দীপ্তি পাঁজি নিয়ে উপুড় হয়ে

থাকত। পাঁজিটা ছিল তার কাছে সমুদ্র বা পাহাড়ের মত, যতই দেখা যায় ততই তার দেখার জিনিস বেড়ে যায়, আশ মেটে না। বড়দি ভাবতেন,—কি এত পাঁজি পড়ে, একদিন দেখতে হবে।

একদিন রাত্রে শোবার ঘরে, কাঠের প্রকাণ্ড সিন্দুকের ওপর দীপ্তি পাঁজি নিয়ে পড়েছে। সামনে বাতিদানে বাতি জলছে। ছবিটা ভালো করে মনের মধ্যে এঁকে নে। ভীরু দীপশিখা নড়ে নড়ে উঠছে—দূরে দেয়ালের কোণে সহসা ছায়াবাজীর খেলা দেখে মনে কেমন একটা অজানা আতঙ্কের সৃষ্টি হচ্ছে! সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, তখুনি দ্বিগুণ উৎসাহে দীপ্তি তার অমূল্য নিধির সন্ধানে অতল সাগরে ডুবে যাচ্ছে। রাত বেশ গভীর হয়ে এসেছে। বড়দি পা টিপে টিপে পিছনে উঁকি দিয়ে দেখেন দীপ্তি পাঁজির বিজ্ঞাপন পড়ছে আর চোখ বুজে বিড় বিড় করে আপন মনেই বকে যাচ্ছে—সচিত্র আরব্য রজনী, এক। সচিত্র পারস্য দেশের রাজ-কাহিনী, দুই। কনোজ-কুমারী হল তিন। ইলাবতী, বসন্তসেনা, মৃত্যু-রঙ্গিণী—নাঃ একখানা হলেই চলবে। তারপর রঘু ডাকাত···অদ্ভুত প্রতিশোধ, দীপ্তি অন্যমনস্ক হয়ে গণনার খেই হারিয়ে ফেলে। আবার নতুন করে সুরু করে। অথচ ছোট দুটি হাতের আঙুলে বই-এর সংখ্যা কুলিয়ে ওঠে না। চন্দ্রকেতু বাদ দিয়ে বনদেবী কিনবে, না অদ্ভুত রামায়ণ ছেড়ে কামাখ্যা প্রদেশের অপূর্ব্ব রহস্য কিনবে? ওই যাঃ—ইন্দ্রজাল, গুপ্ত-রত্নোদ্ধার ধরা হয়নি ত! দীপ্তি আর ভাবতে পারে না···উত্তেজনায় মাথার শির দপদপ করে ওঠে, ঘাড় টনটন করে—আবার নতুন উৎসাহে কাগজ কলম নিয়ে ফর্দ্দ বানাতে থাকে। হাতে পয়সা হলে কোন্ কোন্ অপরিহার্য্য বই কিনে ঘরময় আলমারীতে সে ভরে রাখবে। তারই হিসাব নিকাশ চলে। ভগবানের কাছে তার এই অকিঞ্চিৎ প্রার্থনা যেন এই অপরূপ বইগুলি কেনার সামর্থ্য তিনি তাকে দান করেন। আর কিছু সে বড় ভিক্ষা করবে না—একটি বড় পুতুল ছাড়া, সখারামের শো-কেসএ যেমনটি সাজানো আছে।

বড়দি বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়েন। আমার মন ততক্ষণে প্রস্তুত। মনে হল, এই রকম মনের নাগাল পাই ত বেঁচে যাই। যে মেয়ের জীবনে একটা ছেলেমানুষির দিক আছে, তার সরলতা কখনো যাবে না, তার মনের বিচিত্র লীলা আমার মনে অফুরন্ত কল্পনা-বিলাস জাগাবে। দীপ্তি বাড়ী ছিল না সেদিন, কিন্তু

চোখের সামনে দেখতে পেলুম—তার তন্ময় মূর্ত্তি। চোখে অপার কৌতূহল, বিস্রস্ত বসনাঞ্চল, আর এলো খোঁপা ভেঙ্গে পড়েছে আলগা হয়ে সারা পিঠের ওপর, ওষ্ঠে কিশোরীর কৌতুককর অর্থহীন মুখরতা। তার পর বাড়ীতে এসে সাতদিনের সময়-বিজ্ঞাপন……”

“আশ্চর্য্য। পাঁজি নিয়ে এত সময়ও কাটানো যায়! কিন্তু একটা কথা, দীপ্তির ত পাঁজির ওপর ভয়ানক বিরাগ জানতুম। বাড়ীতে বোধ করি খুঁজলেও একখানা পাতা মিলবে না……”

“হাতে পয়সা জমিয়ে একদা নিমু গোস্বামীর লেন থেকে ডাকযোগে মাশুল খরচ করে দুখানা বই সে আনিয়েছিল। সে অভিজ্ঞতার পর থেকে আর সে পাঁজি পড়ে না। এখন সামুদ্রিক, জ্যোতিষামৃত এই সব নিয়ে মেতেছে!”

“তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে—দীপ্তির মধুর ছেলেমানুষির মোহেই ব্যক্তিত্ববাদী আশুবাবুর সচেতন সত্তা জলসই করা হল। হঠাৎ তাই শুনে ও দেখে, একটা গুরুতর নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হল, এই ত?”

“কিছু পরিমাণে সত্যি নিশ্চয়ই। প্রথমটা ছিল বন্যার সময়কার দেশের অবস্থার মত। কিন্তু মনের ওপর দিয়ে তুমুল বিপর্য্যয় কেটে গেলে বছরখানেক পরে স্থির হয়ে ভেবে দেখলুম—দীপ্তির আকর্ষণ এতটুকু ম্লান হয় নি। মোহ কেটে যাবার পর যেটুকু রইল সেটুকু সহজ ও ……সনাতন। ক'টা মেয়ের সম্বন্ধে এ কথা খাটে?”

“সেটা তার মনের ও দেহের গুণ বলতে হবে। আর সেই সঙ্গে তোর মত জ্ঞানবৃদ্ধের যে স্বভাব-পরিবর্ত্তন হচ্ছে……”

“সে কথা ত আগেই বলেছি। দীপ্তির স্বভাব আমার ভালো লাগে। তার অনেক মত আমি সজ্ঞানে সমর্থ করি। ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার হচ্ছে বুঝতে পারি। কিন্তু এখনও আমার একটা আলাদা মন বলে জিনিস আছে। সেটা আরও কিছুদিন থাকবে বলে মনে হয়।”

“অর্থাৎ দীপ্তির ছেলেমানুষিটাই হল আসল কারণ। তার চেহারা, তার কণ্ঠস্বর, তার রূপ এগুলো……?”

“মস্ত ভুল করছিস। কবিতা বিশ্লেষণ করা যায়, ভালো ভাবেই তার রস-বিচার করা যেতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। অখণ্ড উপলব্ধি মনের ও কল্পনার কারবার। সেখানে চুপ করে থাকতে হয়। নীরবতার রাজ্য। তা ছাড়া আমরা

কাকে ভালোবাসা দিই বল্? একটা কোনো বিশিষ্ট সুন্দর মুখের অধীশ্বরীকে, —না তার নিরবয়ব মানসিক পরিমণ্ডলকে? কোন্‌টা বেশী ভালোবাসি—দীপ্তির প্রখরতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, কেশের দীর্ঘতা,—না আঁখি-পল্লবের নম্র পেলবতা? কোনোটাই নয়, অথচ সবগুলোরই কিছু কিছু প্রভাব আছে। যতই বুদ্ধি-রাজ্যে সমস্তক্ষণ বাস করি না কেন, যখনই ভালো লাগে—নিছক ভালো লাগে কোনো মেয়েকে—নিশ্চয়ই মুগ্ধ হব না তার কথার বাঁধুনীতে, তার ক্যুটো স্মার্টনেস্-এ, তার হিল্লোলিত উগ্র ভঙ্গীতে, অথবা বুদ্ধির প্রখর চতুরতায়। যে জিনিসটি হৃদয় জয় করে নিয়ে চলে যাবে—উজাড় করে—সে এগুলোর কোনোটিই নয়। সে হল একটা অপ্রস্তুতের হাসি, অথবা ছেলেমানুষির পরিচয়—কি একটা লোভনীয় মুদ্রা-দোষ। কড়ে আঙ্গুলের নখটা কি ভাবে ছোট দাঁত দিয়ে চেপে ধরে, কিংবা সুডৌল বাহু তুলে কি ভাবে মাথা চুল্‌কোয়, চোখের কোণে চাপা দুষ্টুমির চকিত স্ফুরণ, —এইগুলোই অপার বিস্ময়………”

আত্মস্থ আশুতোষ নৈরাত্মের নীরবতায় মগ্ন হয়ে গেলো।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

চিনি

মনে আছে
সেদিন বাড়ীর সাম্‌নের সিধে রাস্তার দুধারে
ঝাউগাছে উঠেছিলো ঝড়।
সবুজ পাতার আড়াল থেকে
উড়লো এক ঝাঁক হরিয়াল
আচম্‌কা দমকা হাওয়ার ধমকে।

পুকুর-পাড়ে ফল-বাগান,
আতা-বাতাবী-শপেদা-গোলাপজামে জংলা।
নিভৃতে, তারই সুনিবিড় সুমিষ্ট আশ্রয়ে
কালক্ষেপ করছিলেম সদলবলে,
খ্যাঁদা ও হরিলাল, বুধো আর আমি।

টোপা গোলাপজাম একটা ছুঁড়ে মুখে
বুধো বলছিলো,—
জানিস্, তারিণী উকীলের মেয়ে, কলকেতার স্কুলে পড়ে,
অ্যায়সা চাট্‌নী বানায়, শলুপ মেখে টোকোকুলের,
আর গাঁথে বৈঁচির মালা,—
কাল এয়েচে।
আর জানিস্, গ্র্যাণ্ড গান গায়,
নাম তার চিনি।

খ্যাঁদা বলে, ছাই গায়।
কেউ তো শোনো নি তার নতুন কাকীর গান
কলের একতারা বাজিয়ে।

বিশেষ করে,
কান্নু কহে রাই আর আজু রজনী হাম।
কোথায় লাগে পান্না কীর্ত্তনউলি।
কাইজার কে পর্য্যন্ত বাজী রাখতে রাজী,
যদি তারিণী উকীলের মেয়ে
চিনি না বিনি না মিনি
তার কাকীর সাথে পারে।

বুধোর নেই কাইজার, কিন্তু গাঁট্টাতে ওস্তাদ।
অতঃপর
খ্যাঁদাতে বুধোতে বালী সুগ্রীব,
গোলাপজামের গোছ ভুঁয়ে লুটোপুটি।
হরিলাল
বিজ্ঞের মতো সেগুলো কোরলো কোঁচড় জাত,
এবং বস্‌লো একটু সরে।
বললো, উঁহু! হোলো না বুধো,
রদ্দা মারবি কাণ সেঁটে,
নইলে কি আর রদ্দা হোলো!

মনে পড়ে,
অচিন দেশের ন-চিন মেয়ের নামে
উধাও হোলো মন।
ভালো নাম হয়তো চিন্ময়ী,
হয়তো বা নেত্যকালী।
চিনি নামটা পুঁটি টেঁপীর মতো
নেহাৎ অহৈতুক।
তা হোক্।
সেই আমার অভিজ্ঞান,
চিনি বলতে চিনলুম চির অচেনাকে।

ঢাললো মনে মধু।
কেন,—কে জানে।
শুধু বাজতে লাগলো বুকে ছোট্ট একটু নাম,—
সে যেন কৈশোর-সীমান্তে যৌবনের
বিজয় অভিযানের তূর্য্যধ্বনি।
আলো, হাওয়া, মাটি, আকাশ
হঠাৎ যেন মনে হোলো,
অনেক দিনের চেনা, অনেক দিনের আত্মীয়।
ডাক্‌লো প্রাণে খামোখা-খুশীর বান,
উঠলো ভরে দিক্‌ উন্মেষের সম্মোহনে।
কখন যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শেষে
লুটের মাল নিয়ে পলায়মান হরিলালকে তাড়া করে
ছুটেচে বুধো ও খ্যাঁদা, চোখেই পড়েনি।
চোখের সাম্‌নে,
রোজকার জগৎ গেছে মুছে,
নেমেচে সেখানে সৃষ্টির সমস্ত সুষমা,
অননুভূত সমন্বয়ে।

হায়রে, সেদিনকার মধুর উৎস,
আজ আর নয় অজানা।
মোহের দামে জ্ঞান কিনেচি।
অন্তরে
অনুভূতির দিন সাঙ্গ হোলো,
এখন বস্‌চে সমস্যা-সমাধানের বৈঠক।
তাইতে ত আজ শিউরে উঠি টোকোকুলের নামে,
ওরে বাবা, তাতে আবার শলুপ মাখা ?
বৈঁচির মালা,—শুনলে পায় হাসি।

মনেও আসে না

কোথায় ?

কবে ?

কোন বাড়ীর সে মেয়ে ?

কিই বা তার নাম।

কেবল আজও

ঝাউয়ের ঝাড়ে ঝড় তুলে

যখন চলে হাওয়ার হুহুশ্বাস,

বুকটা হঠাৎ শিরশিরিয়ে ওঠে।

ভুলে যাওয়া কোন এক দিনের আবছা ছবির ছাপ

চোখে ভাসে।

মন বলে,

এ যে চেনা, এ যে চিনি !

—যুবনাশ্ব

'সেদিনো এমনি রাতে……"

সেদিনো এমনি রাতে উঠেছিল পূর্ণিমার শশী

বিশ্বের সুষমা নিয়া আমার নিরালা গেহে আসিলে মানসী

প্রবৃত্তির প্রলোভনে প্রেমের সৌরভ

জন্ম নিলো মোর বুকে আঁকি দিয়া স্রষ্টার গৌরব ;

সে লগনে প্রেম-স্বর্গ মোর আঙিনায়

নেমে এলো মহোৎসবী নিশি-নিরালায় !

সে উৎসব-রজনীতে দিকে দিকে জেগেছিল কিসের আহ্বান

আকাশের ফাঁকে ফাঁকে তারারা শুনেছে পাতি' কান !

সেদিনো এমনি রাতে মোদের নয়নপাতে জাগেনিকো ঘুম
হেলেনের আঁখিসম ফুটেছিল নভ-কোণে তারকা-কুসুম।
সুপ্তিহারা মুগ্ধরাতে বেদনার বিহ্বল স্পন্দনে
তৃতীয়ের স্মৃতিটুকু জেগেছিল বুঝি তব মনে
তাই তুমি চলে গেলে পুনঃ স্বপ্নলোকে
প্রাগুষা-মধুর-ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে নিঠুর আলোকে ;
স্বপ্নালস ঘুমের মতন
তবু জেগে আছে প্রাণে মিলনের ক্লান্তি-শিহরণ !

সেদিনো এমনি ছিল স্বচ্ছ জ্যোৎস্না-রাত
সমুদ্র-সৈকতে আসি' কেঁদেছিল ডিডো বুকে হানি' করাঘাত।
ট্রয়ের পাষাণ-পুরী ঘুমায়ে পড়েছে আজ পরিশ্রান্ত পশুর মতন
হয়তো দেখিছে কত সুখের স্বপন ;
নিষ্প্রভ তারার মত শুধু জেগে আছে সখি হেলেনের চোখ
প্রমত্ত ঝড়ের বেগে মরুভূর মাঝে কোথা ঝরে গেছে পাখীর পালক ?
কার্থেজের স্বপ্ন নিয়া আজো কি কেঁদিছে ডিডো ? কাঁদে হা হা রাতের বাতাস
আমার বিষাক্ত রক্তে সমুদ্র-তরঙ্গ-সম উচ্ছ্বসিছে দূরাগত স্পর্শের নিঃশ্বাস।
ডিডো সে ঘুমায়ে থাক, আর থাক সীমাহীন সমুদ্র অতল,
বাতাসে ভাসিয়া আসি' ফসলের পৃথিবীর ঘ্রাণ যেন কারো আঁখি দুটি না করে সজল।
জনহীন বালুতটে যদি জাগে রাত-চরা পাখীদের ডানা—
জাগরণে একান্তই মানা ;
সে রাতি ফুরায়ে গেছে, জুলেখা মরিয়া গেছে, মরে গেছে তার ভালবাসা
ইস্তুফ্ তবুও কেন জাগে রাত বুকে নিয়া নবতম আশা ?

শেলী দত্ত

অধ্যায়

বিস্মৃতির বরষায়
মনে নেই কোন্ ছুটীর দিনে
আকাশে মেঘ ক'রেছিলো বিকেলের দিকে ;
কোন কারণে বা অকারণে
তোমার সঙ্গে আমার অফুরন্ত আলাপের
ঘটেছিলো সাময়িক বিচ্ছেদ।
তোমার চোখেতে বিরাগের বন্যা
এসেছিলো নেমে,
জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে
হয়ত বা দেখেছিলে মেঘের মাধুর্য্য ;
আর আমি আকস্মিক অধ্যবসায়ে
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটাকে
উল্‌টিয়ে দেখছিলাম, বিনা উদ্দেশ্যে।

দু'জনের সেই মুহূর্ত্তগুলোর মাঝে
নেমেছিলো নিঃশব্দতার নগ্নতা,
অন্যায়ের মতো অর্থহীন।

চোখ না ফিরিয়ে দেখেছিলাম,
তোমার চুলগুলো যেন সন্ধ্যার আকাশ,
গুচ্ছগুলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাতাসে ;
সহজে অথচ সহজে নয়।
আর বাতাসের একটা ঠাণ্ডা ঝলক
হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠেছিলো অন্তরে,
যদিও দুঃসহ স্পর্দ্ধায় হয়েছিলো মনে—

তুমি তো কাছেই আছ এই অলস মুহূর্ত্তে
আমার ছোঁবার সীমানায়।
ভাল লেগেছিলো বুঝি এই নিঃশব্দতা,
নিরানন্দ নমনীয়তায় কাটুক একটি
উত্তেজনাহীন বর্ষার সন্ধ্যা ;
তোমার চোখের পল্লব
ঘন হ'য়ে এসেছিলো অদ্ভুত আবেশে,
আমার চিন্তার সেটা উদ্ধত আভাস।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ ঝলকে
চিড়-খাওয়া আকাশ উঠলো আর্ত্তনাদ ক'রে ;
সঙ্গে সঙ্গে সে আলোর দ্যুতিশিহরণে
তোমার অধ্যবসায় গেল তলিয়ে।
বিদ্যুৎকে এতো ভয় কর
সেটা কে জানতো বল ?
মুহূর্ত্তের জন্যে নেমে এলো আমার চোখের ওপর
তোমার চুলের বন্যা ;
সে স্পর্শের উষ্ণ উদারতায়
ছিঁড়ে গেলো আমার স্বপ্নের সঙ্গীত,
হাতের হতচ্ছাড়া টাইমটেবিলটা···

মনে নেই কিছু ?
অসামান্য অনিয়মানুবর্ত্তিতার সেই উহ্য ইতিহাস
এখন অস্বীকার ক'রবেই তো !

শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পুস্তকপরিচয়

পাশ্চাত্য ভ্রমণ, জাপানে পারস্যে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

আমরা রবীন্দ্রনাথের তৈরী সাহিত্য-ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি। আমাদের সঙ্গে যখন থেকে সাহিত্যের সম্বন্ধ তখন গদ্য পদ্যে রাবীন্দ্রিকতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হ'য়ে গেছে। পূর্ব্বতন আদর্শ, বিরুদ্ধ আদর্শ, সমস্ত রবীন্দ্র-আদর্শের বৃহৎ শাখার মধ্যে তখন অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিশে গেছে, কাজেই কোন প্রতিকূল আবহাওয়াকেই আমরা চিন্‌তে বা বুঝ্‌তে সময় পাইনি। তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্য-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের একাধিপত্যই দেখে আসছি—তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ কত সামন্ত নরপতি ও পাত্র মিত্রেরই আবির্ভাব হ'ল, তাঁর প্রাধান্য ও গৌরবকে না মেনে চ'ল্‌বার শক্তি কারুরই হ'ল না। যাঁরা অক্ষম আত্মাভিমানে তাঁকে অস্বীকারের ভান ক'রলেন তাঁদের কৃত সাহিত্যই এই পিতৃঋণকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্‌তে লাগলো। বস্তুতঃ আমাদের বাল্য-কালে যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরই উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাঁরা সকলে চ'লেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তৈরী রাজ-রাস্তা দিয়ে। রবীন্দ্র-ধারা পরিহার না ক'র্‌লে, নবতর কোন ঐতিহ্য গ'ড়ে না তুল্‌লে যে আমরা চিরদিন রবীন্দ্র-শিষ্যই থেকে যাবো, স্বতন্ত্র ভাবে আমাদের কোন স্বীকৃতির দাবীই যে থাক্‌বে না—এ কথা আমরা হাল্ ফিল ব'ল্‌তে সুরু করেছি। কিন্তু উচ্চকণ্ঠে আমরা যারাই এই কালাপাহাড়ী প্রপাগ্যাণ্ডা চালিয়েছি, সতর্ক ভাবে তারাই ক'রেছি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্র-ধারা বাংলা সাহিত্যে আজও এম্নি ব্যাপক ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে র'য়েছে।

কিন্তু এখন থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর পেছু হটে যদি বঙ্কিম-যুগে চ'লে যাওয়া যায় তবে নবীন রবীন্দ্রনাথের স্থান কি? কি তখন তাঁর বাজার দর? বনফুল, ভগ্ন হৃদয়, কবি-কাহিনী, সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত প্রভৃতি কাব্য, প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি প্রভৃতি নাটক, উপন্যাস এবং ইউরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি প্রবন্ধ তখন বঙ্কিম-শাসিত সাহিত্য-গগনে একটি নূতন যুগের অরুণোদয় সূচনা করেছিল সত্যি, কিন্তু দেশ সেই লোভনীয় অরুণচ্ছটার পেছুনে রবির অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'র্‌তে পারেনি। তাই অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেদিন লাভ হ'য়েছিল কাব্যবিশারদ প্রভৃতির বক্রোক্তিকলুষিত অপভাষণ। দেশের সেই অতি প্রাচ্যতাক্লিষ্ট কুয়াসা ভেদ ক'রে যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়েছিলেন আমরা দেখেছি তাঁকে—কিন্তু উদয়-গোধূলির অধ্যবসায়ী কিশোর রবীন্দ্রনাথ আমাদের চির কল্পনার জিনিষ। কবির স্ব-রচিত জীবন-স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের হয় একটু

একটু পরিচয়। বাইরে উদ্ধত কণ্ঠে তিরস্কার ও নিন্দাবাদের তাণ্ডব—আর ভেতরে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ, লোকেন্দ্র পরিবেষ্টিত ভাব-মগ্ন নবীন সাধক···সেই অপূর্ব্ব সাহিত্য-প্রতিভা স্ফুরণের বিচিত্র সুন্দর পরিবেশ...বাঙালী সমালোচকের পক্ষে সে কল্পনা পরিহার করা বড়ই কঠিন। সেই জন্যেই তাঁর এই সময়ের রচনাও কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়।

এই সময়ের রচনাবলী (ব্যঙ্গ-কৌতুক এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত, ভানু সিংহের পদাবলীও) কবি নিজেই বেশীর ভাগ বাতিল ক'রে দিয়েছেন। সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত ও ভানুসিংহের দু'একটি ক'রে কবিতা ছাড়া আর সবই আজ প্রায় দুর্ল্ভ। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিকে পরে কবি নাটকে রূপান্তরিত ক'রে তাদের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের ওপরে যবনিকা টেনে দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এই বইগুলোর মূল্য কিছু কম নয়; কাব্যের দিক থেকে মানসী, নাটকের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ; উপন্যাসের দিক থেকে নৌকাডুবি দিয়ে সত্যি সত্যি যে রবীন্দ্রযুগের সুরু···এই বইগুলোই হ'চ্ছে তাদের প্রাথমিক ভিত্তি। এই বনিয়াদের ওপরেই তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক সৌধের স্থিতি·· যদিও পার্থিব বনিয়াদের মতোই এই ভাবগত বনিয়াদও আজ লোক-চক্ষে প্রায় অবলুপ্তই হ'য়ে গেছে। অবশ্য এদের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন অঙ্গহানি হ'তে পারে এমন কথা বেকুব ভিন্ন আর কেউ ব'লবে না, কারণ কবির নিজের কথাতেই 'ডিমের ভেতর যে শাবক র'য়েছে তাকে পাখী আখ্যা দেওয়া যায় না'—কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ডিমের ভেতর ছিল ব'লেই ভবিষ্যতে পাখীটি পাখী—সুতরাং তার অণ্ডজীবন তার পক্ষ-জীবনেরই ভূমিকা, সেটাকে বাদ দিয়ে তার অস্তিত্ব নয়।

এই পর্য্যায়ের বইগুলির মধ্যে ইউরোপ প্রবাসীর পত্রের দুর্ল্ভতা বহুদিন আমাকে একান্ত মানসিক কষ্ট দিয়েছে। অধুনা-দুর্ল্ভ হিতবাদী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে এই বইটি যখন পড়ি তখন আমি নিজে বালক—সুতরাং বালকের চোখ দিয়ে দেখা ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের সেই সুন্দর সতেজ কাহিনী তখন বিশেষ ভালো লেগেছিল। সেই পথযাত্রার বর্ণনা, সেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতি, সংস্কার ও সভ্যতার তুলনামূলক বিতর্ক মনকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ ক'রেছিল। তারপর আর এ বই চোখে দেখি নি। রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা সম্বন্ধে একটা আলোচনা ক'রবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকেই, কিন্তু এই বইটির অভাবই তার প্রধান অন্তরায় স্বরূপ হ'য়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য-বশতঃ এই বইটি এবং এরই সঙ্গে এর বারো বৎসর পরের লেখা আর একটি ছোট বই, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী, সংযুক্ত ক'রে কবি এই পাশ্চাত্য ভ্রমণ আমাদের উপহার দিয়েছেন। যতদূর মনে আছে পুরানো ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে পাদটীকায় ভারতী সম্পাদকের কিছু কিছু টিপ্পনী ছিল—বর্ত্তমানে সেগুলি পরিহৃত হ'য়েছে, আর দু' এক জায়গায় অল্প বিস্তর রিপুও করা হ'য়েছে মনে হ'ল। তা হোক্—তবু বইটি পেয়েই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে খুসী হ'য়েছি—এতে বা এর অনুগামী ডায়েরিতে যে পাশ্চাত্যের পরিচয় আমরা পাচ্ছি, সে আজ আর নেই—প্রাক্ মহাযুদ্ধের সেই শান্তিময় ইউরোপ আজ কবি-

কল্পনার ইউটোপিয়া—আজ আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক নানা সঙ্কটের আবর্ত্তে পাক খেয়ে তার প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে এসেছে—তবু এই লেখাগুলো পুরানো খবরের কাগজের মতো বাসি হ'য়ে যায় নি ; তার কারণ এদের জন্ম রবীন্দ্রনাথের শিল্পশালায়···প্রত্যক্ষ ইউরোপ আজ যতই বদ্‌লে গিয়ে থাক, ভিক্টোরীয় যুগের সেই প্রশান্তিময় ইংলণ্ডের ভাবস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে চির সজীব হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে প্রথম বিলাত যান, সে বয়সে বাঙালী ছেলের নাবালকতা ঘোচাই কঠিন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বাল্যেই বাঙালীত্বের পরিমিত গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে পেরেছিলেন সে কথা এই পত্রাবলীর প্রত্যেক পৃষ্ঠা থেকেই প্রমাণিত হয়। মাঝে মাঝে বয়সোচিত ঝাঁজ আছে, এবং অহেতুক বক্রোক্তি আছে সত্যি, কিন্তু এদেশীয় তরুণ সিভিলিয়ানদের মতো কোথাও অভিভূত হওয়ার বা অসূয়ান্বিত হওয়ার পরিচয় নেই এত কাঁচা বয়সের লেখাতেও। দ্বিতীয় অংশের রচনা-কাল অপেক্ষাকৃত পরের—তখন রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রায় বিকাশ হ'য়ে গেছে—কাজেই ওটুকু সম্বন্ধে আর নূতন ক'রে বিস্ময় প্রকাশ বাহুল্য।

এছাড়া ইউরোপ প্রবাসীর পত্র আর এক দিক থেকে বিশেষ ভাবে প্রণিধান করার যোগ্য। মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে ক্ল্যাসিকেল্ রীতিকে অবলম্বন ক'র্‌লেও সাহিত্যিক জীবনের একেবারে প্রারম্ভেই সহজ কথ্য ভাষাকে সম্যক রূপে আয়ত্ত ক'রেছিলেন এই বইয়ে। হুতোমের সঙ্গে এর প্রকাশ-ভঙ্গীর পারিপাট্যের বা গাঁথুনির তুলনা ক'রলেই বোঝা যায় সেই বাল্য বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের পঞ্চাশ বৎসর সামে এগিয়ে চ'ল্‌ছেন। এই হচ্ছে সবুজ পত্রের রবীন্দ্র-নাথের কৈশোর।

জাপানে পারস্যের মধ্যে জাপান অংশ পূর্ব্বে জাপান যাত্রী নামে প্রকাশিত হ'য়েছিল। বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে এর তুল্য বই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমাদের দেশে ভ্রমণ-কাহিনী লেখার যে চির পরিচিত পদ্ধতি প্রচলিত আছে—তা সাহিত্যাংশে প্রায় অকিঞ্চিৎ-কর এবং বিবৃতি-ব্যাপারেই তার প্রধান উৎকর্ষ—কিন্তু জাপান যাত্রীতেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আমাদের দেখালেন যে গন্তব্য স্থানের ভৌগলিক সংস্থানটার চেয়ে যাত্রাটাই বড় ; যে পরিবেশের ভেতর দিয়ে যাত্রা, যে সমস্ত সঙ্গীর মাঝ দিয়ে এই গতির প্রসার, যাদের সাহচর্য্য ও সংস্রবের মধ্য দিয়ে এর সত্তা সম্পূর্ণ, তাকেই আশ্রয় ক'রে ভ্রমণকে কত মনোজ্ঞ ক'রে তোলা যায়। স্থানটা জাপান না হয়ে মিশর হ'লেও আমাদের লোক্‌সান কিছুই ছিল না—কারণ সেখানে গিয়ে কবি কি দেখলেন, কি খেলেন, তা আমরা জানতে প্রস্তুত ছিলাম না—আমরা চেয়েছিলাম তাঁর যাত্রাটা। সেটা পেয়েছি ষোল আনা—সেখানেই আমাদের চরিতার্থতার চরম। প্রসঙ্গক্রমে জাপানী চিত্রকলা, সাহিত্য বা জীবন সম্বন্ধে যে সব কথা এসে প'ড়েছে, সেগুলোর বিচার রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে তাদের যে ভাবে রেখাপাত হ'য়েছে, সে দিক থেকেই ; ঐতিহাসিকের চুলচেরা বিচার এখানে অসম্ভব। সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাপানের সঙ্গে তুলনা ক'রলেই আমি কি ব'ল্‌তে চাইছি সেটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে মনে করি। অর্থাৎ এই কাহিনীর কদর সাহিত্য

হিসাবে—ইতিহাসের দিক থেকে বা ভূগোলের দিক থেকে এই বইকে আমরা পড়িনি। পারস্য অংশ বহু পরের লেখা। 'বিচিত্রা' থেকে সংগৃহীত হ'য়ে বর্ত্তমান পুস্তকে গ্রথিত হ'য়েছে—এই অংশের রচনা অনলঙ্কৃত, সাদাসিদে এবং স্থানে স্থানে বিবৃতিমূলক। অবশ্য রবীন্দ্র-সুলভ সরস কৌতুক ও কারুণ্য-মিশ্রিত ধারালো ভঙ্গীর অভাব কোথাও নেই; তবু জাপানের অপূর্ব্ব মাদকতা এতে নেই, নেই রাশিয়ার চিঠির তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য! এই দুটি ভ্রমণকে একত্র গ্রথিত করার পেছুনে হয়ত কবির একটা উদ্দেশ্য আছে—হয়ত প্রাচ্য সভ্যতার নবীন অভিব্যক্তির প্রতীক জাপান এবং প্রাচীন অভিব্যক্তির প্রতীক পারস্যকে পাশাপাশি রেখে একটা study বাঙালী পাঠককে দেখানোই কবির ইচ্ছা। সে দিক থেকে এ বই যে বিশেষ সার্থক হ'য়েছে তাতে আর সন্দেহ কি? এই সঙ্গে চীন এবং জাভা ভ্রমণ সম্বন্ধীয় রচনাগুলো গ্রথিত ক'রে এক সঙ্গে 'প্রাচ্যভ্রমণ' ক'রলেই বোধ হয় আরো ভালো হ'ত। পাশ্চাত্য ভ্রমণেও রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী ইউরোপ এমেরিকা ভ্রমণ সম্বন্ধী লেখাগুলির স্থান অনায়াসে হ'তে পারতো। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক বইই দেশবাসী কিনতে চায়, অথচ পৃথক পৃথক ভাবে সমস্ত বইয়ের মূল্যও বড় বেশী···তাই একথা বলা।

সব শেষে একটা কথা—ভ্রমণ-কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিভার একটা গৌণ দিক্; কিন্তু তাতেও তাঁর সাহিত্যিক শক্তির অসামান্যতা যে পরিমাণ সম্পদ পরিবেষণ ক'রেছে তা দেখলে মনে হয় তাঁর লেখনীর যাদুকরী শক্তির সিকির সিকিও যদি কেউ চুরি ক'রতে পারতো! কোন বয়সে, কোন ক্ষেত্রে, কোন বিষয়ে লেখনী তাঁর হাতে একটুকু দুর্ব্বল হ'য়ে আসে নি! বাল্যের ইউরোপ প্রবাসীর পত্র থেকে সুরু ক'রে বার্দ্ধক্যের পারস্য ভ্রমণ পর্য্যন্ত শুধু এই শাখাটা নিয়েই যদি ধারাবাহিক আলোচনা করা যায়, তাহ'লেও এই কথা নির্ব্বিঘ্নে প্রমাণ ক'রে দিতে পারা যায় না কি?

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Seven Red Sundays—Ramon J. Sender (Faber & Faber)
Days of Contempt—Andre Malraux (Gollancz)

প্রথম লেখক স্প্যানিশ এবং একজন নামজাদা আধুনিক সাহিত্যিক। বাল্যকালে পাদ্রীদের স্কুলে ও যুবা বয়সে মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষালাভ হয়। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবপন্থীদের সাযুজ্যে গোলমালে পড়েন, উদ্ধার পান নাবালকত্ব প্রতিপন্ন হবার ফলে। একটা প্রাদেশিক সংবাদপত্রের সম্পাদনার পর মরক্কোর এক সেনানিবাসে বছর তিনেক সেপাই শিক্ষানবিশী করেন। ফিরে এসে El Sol নামে বিখ্যাত লিবারেল কাগজে Primo de Rivieraর আধিপত্যের বিপক্ষে কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেজন্য তাঁকে জেল খাটতে হয়। পরে তিনখানি বই লেখেন—একখানি নভেল,

দ্বিতীয়টি মেক্‌সিকোর ধর্ম্ম-সমস্যা, এবং তৃতীয়টি সেণ্ট টেরেসা নাম্নী বিখ্যাত মহিলা মিষ্টিকের জীবন-চরিত। প্রথমটির অনুবাদ হয়েছে, এবং তারই সমালোচনা আমরা লিখছি। অন্য দু'টির অনুবাদ বোধ হয় এখনও হয়নি। বিলেতে নভেলটির খুব সুখ্যাতি হয়েছে।

অবশ্য সুখ্যাতি করবার মতন বই। বিষয় স্প্যানিশ বিপ্লবের একটি অধ্যায়, লিখন-ভঙ্গী মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বপূর্ণ, দৃশ্যগুলি স্থানে স্থানে সত্যই নাটকীয়, এবং অন্ততঃ দু'তিনটি চরিত্র চমৎকার ফুটেছে, যথা সামার এবং ষ্টার (নায়িকা)। মোটের উপর বইখানিতে ট্রাজেডি আছে। এ-বই বাঙ্গালী মাত্রেরই ভাল লাগবে।

পড়বার সময় আমার গোটাকয়েক কথা মনে উঠেছে। প্রশ্নই তাদের বলা চলে। বিষয় যদি বিপ্লবের উত্থান ও পতনের মতন এলোমেলো হয় তবে লেখকের কি কর্ত্তব্য ভাষা, চিন্তাধারা এবং অধ্যায়-বিভাগকেও অগোছালো করা? অন্ততঃ বিংশ-শতাব্দীর বিপ্লবী কিংবা বিপ্লবী-লেখক ম্যাৎসিনির মত আদর্শবাদী হতে পারেন না। অতএব রিয়ালিজমের দোহাইএ তাঁকে বাধ্য হয়ে নভেলের ধ্রুবপদী সামঞ্জস্যকে ছিন্নভিন্ন করিতে হবে। অতএব সেণ্ডারের নভেলে আমি তুর্গেনিভের কোন বইএর ধাঁচ পাব না নিশ্চয়। কিন্তু যিনি নিজে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করেন, যাঁর নায়ক, সামার, একবার ক্যাথলিক চার্চ্চের এবং অন্যবার এঞ্জিনের পরিকল্পনাকে সমাজের ও ব্যক্তির চূড়ান্ত আদর্শ বিবেচনা করে, তাঁর কাছে একটা শৃঙ্খলা প্রত্যাশা করা যায়। ক্যাথলিক চার্চ্চ ও এঞ্জিনের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক ঐ শৃঙ্খলাটুকুই। দ্বিতীয়তঃ, বোধ হয় স্পেন পুরোমাত্রায় ল্যাটিন নয়, ক্যাথলিকও নয়। স্প্যানিয়ার্ডের রক্তে আফ্রিকার বালি রয়েছে, তাই অত জ্বলে। নভেলখানিতে এমন অনেক মনোভাব আছে, বিশেষতঃ মেয়েদের, যা ঠিক বরদাস্ত হয় না। তবে কি ও-দেশটা ও সাহিত্যটা নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া? তাও ঠিক নয়, কারণ একাধিক দৃশ্য আমার মতন কুণো বাঙ্গালীকেও মোহিত করেছে। সাহিত্যের মধ্যে দেশকালের প্রতিপত্তি পাত্রের অপেক্ষা কম নয় কি?

তৃতীয় কথা, কম্যুনিষ্ট কিংবা অন্য যে কোনো বিপ্লবী সাহিত্যের রস যেন আজও ঘন হয়নি। ষ্টার এবং তার মোরগটি সত্যই বিপ্লবকন্যা ও বিপ্লবের প্রতীক, ষ্টারের ভাব বেশ সংযত, যদিও সেও বলে ফেল্লে—It is lovely to have a God। তারপর সামার ও আম্পারোর (একজন কর্ণেলের মেয়ে) প্রেম-কাহিনী অসহ্য, প্রথম দিকটা, যদিও শেষে একটু সামলেছে। হয়ত উদ্দেশ্য ছিল bourgeois প্রেমকে হেয় প্রতিপন্ন করা। আমার বক্তব্য—হেয়কে অবহেলা করলেই চলে, আর যদি হাস্যাস্পদ করতেই হয় তবে আরো ইকনমিক উপায় আছে। মোদ্দা কথা এই—বিপ্লবী মাত্রেই—কি ধ্যানী কি কর্ম্মী, প্রত্যেকেরই বিপদ বাধে ভাবসম্পদ নিয়ে। ধ্যানীর থাকে সে সম্বন্ধে ধারণা ও প্রত্যয়, অতএব তাদের ভাব তাঁকে পরিবর্ত্তিত করতে হবে, নচেৎ বাক্যবাগীশই থাকবেন তিনি। কর্ম্মীর ও বালাই নেই, তাঁর বিপদ ভাবের বিপরীত আকর্ষণকে কাজে লাগানো, আর না হয় ভাবাবেশকে দূরে রাখা। কেবল তাই নয়, নূতন ভাবসমাবেশের তাগিদে গোটা-

কয়েক moral principles খাড়া করা চাই। পুরানো ধর্ম্ম নয় নিশ্চয়, কিন্তু নূতন সমাজেরও ধারণ ও তার ধৃতিতত্ত্ব কি নেই? বিপ্লব কি এত নঙর্থক যে ভগবান ও পুরোহিতের বিপক্ষে গোটাকয়েক গালাগালি এবং বেশ সাফ সাফ কামোত্তেজক দৃশ্য থাকলেই বিপ্লবী সাহিত্য স্বতই রচিত হবে? সেগুার প্রেমের দৃশ্য নিয়ে ফাঁপরে পড়েছেন—এক ষ্টারকে নিয়ে ছাড়া। আমার মনে হয় বহু পূর্ব্বে, লঙ্কাবিজয়ের সময়, জনকয়েক বাঙ্গালী মহিলা ছটকে স্পেনে হাজির হন।

বইখানিতে স্প্যানিশ বিপ্লব সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই জানা যায়। বিপ্লবটি ভূমিকা মাত্র। সামার, ষ্টার ও ভিলাকাম্পা, (সামারের সিণ্ডিক্যালিষ্ট সহকর্ম্মী)—তিনজন গোটা মানুষ, বাকী সব প্রতীক মাত্র, এমন কি ষ্টারের নোরগটি পর্য্যন্ত। বইখানিতে অবশ্য নূতন সাহিত্যের আস্বাদ আছে, যদিও সেই সঙ্গে বাসী খাবারের গন্ধ পেয়েছি।

আমি আঁদ্রে মালরোর ভক্ত। আমার বিশ্বাস আধুনিকদের মধ্যে তাঁর মতন লেখক বিরল। বর্ত্তমান চীনদেশ সংক্রান্ত তাঁর লেখা দু'খানি বই যিনি পড়েছেন তিনিই আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমাদের সাহিত্যে এমন কোনো আধুনিক লেখক নেই যার নাম তাঁর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা যায়।

এই বইখানির বিষয় ন্যাৎসী জার্ম্মানীর concentration camp এবং ক্যাসনার নামে একজন কম্যুনিষ্ট নেতার দশ দিনের বন্দী-জীবন। বইখানি নিতান্ত ছোট, মালরোর অন্য রচনার তুলনায়। তাই এখানে চরিত্র-সমাবেশ এবং ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নেই। গল্পাংশও নেই বল্লে চলে। একজন সহকর্ম্মী ক্যাসনারকে বাঁচাতে নিজকে ক্যাসনার বলে ধরা দিলে। এত বড় আত্মবলির উল্লেখই আছে। ক্যাসনার ছাড়া পাবার পর চেকোশ্লোভাকিয়ায় স্ত্রী ও শিশুর কাছে হাওয়া জাহাজে চড়ে চলে এল। এর বেশী আর কিছু নেই।

প্রথম পাঠে মনে হয় বইখানি ন্যাৎসী জার্ম্মানীর বিপক্ষে প্রপাগ্যাণ্ডা মাত্র, নভেল নয়। কিন্তু মনোযোগ সহকারে পড়লে যাথার্থ্যটুকু ধরা পড়ে। প্রথমে দেখতে হবে, নায়ক এবং তাঁর জীবন সম্বন্ধে ধারণা জেলখানার মতন স্থানে, অর্থাৎ সমাজ হতে দূরে ও নিষ্ঠুরতার মধ্যে কিভাবে গড়ে উঠেছে। যন্ত্রণার সময় ক্যাসনার নিজের একাংশকে দেহ থেকে সরিয়ে রাখছেন, মনকে তাজা রাখছেন সঙ্গীতের আশ্রয়ে। তবুও তিনি ব্যক্তিবাদের এককত্ব অর্জ্জন করছেন না, জেলখানাতেও সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করছেন। তাঁর অজানিতেও সমাজ-সম্বন্ধ কার্য্যকরী রইল—প্রমাণ সহধর্ম্মীর চূড়ান্ত আত্মত্যাগে। যখন এরোপ্লেনে দেশে ফিরছেন তখনও চালকের সঙ্গে তাঁর যোগ অবিচ্ছিন্ন ও প্রাকৃত। দেশে এসেও স্ত্রীকে প্রথম দেখলেন এক সভায়, অর্থাৎ সমাজের অন্তরে। নিজের বাড়িতে এসে বুঝলেন যে স্ত্রীও সহধর্ম্মিণী হতে প্রস্তুত। সমাজের সঙ্গে যোগস্থাপন করেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ হয়। Sense of life-এর এই প্রকার অভিব্যক্তির বিবরণ হিসেবে দেখলেই বইখানির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হবে। নির্য্যাস প্রস্তুত করায় যত বাহাদুরী অমন আর কিছুতে নেই।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুতুলনাচের ইতিকথা, দিবারাত্রির কাব্য—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ডি এম্ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত।

একবার নদীনালা দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছিলাম। বাংলার পল্লীশ্রী ও অরণ্য-শোভায় দুচোখ ভরে উঠেছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির ভিতর তেমনি নিছক খাঁটি বাংলার গুটিকতক আবালবৃদ্ধবনিতার মনের অলিগলি দিয়ে আমার একটা চক্রপরিক্রমা হয়ে গেল। অথচ এই স্ত্রীপুরুষগুলির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। বৈশিষ্ট্য আছে অবশ্য, মানুষ মাত্রেরই আছে। কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে হৃদয়স্পর্শ ক'রে যে লেখক তাদের সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ও সহানুভূতির উদ্রেক করতে পারেন, তিনি যথার্থই কবি ও শিল্পী। এদের সুখ দুঃখ, ত্রুটি দুর্ব্বলতা, ঔদার্য্য হীনতা, ক্ষমতা অক্ষমতার একটা মোটামুটি তেরিজের অঙ্কপাত আমার মনে হয়ে গেল। গণিতজ্ঞের পরিভাষায় বলতে গেলে গুটি কত Definite Integrals within given limits, অর্থাৎ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের নানা বৈচিত্র্যের ভিতর তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অঙ্কফলের চিত্রগুলি চোখের সামনে ভাসছে।

আকাশের নক্ষত্রগুলি স্বয়ম্প্রভ, অসংখ্য। গ্রহ উপগ্রহরা পরের আলোয় পোদ্দারি করে, তারা গণনায় নগণ্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যের আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা বিরল, গ্রহ উপগ্রহ দুর্গ্রহের অন্ত নাই। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবোদিত জ্যোতিষ্ক বলে মনে হয়, জ্বলজ্বল্ করছে তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল করুণ দীপ্তি। তিনি কোন্ শ্রেণীর নক্ষত্র তা' সমালোচকরা আমাদের বুঝিয়ে দিন। কিন্তু তাঁর যে একটি নিজস্ব অগ্নি-কেন্দ্র আছে সে সম্বন্ধে আমার সংশয় নাই। কোনটা নকল, কোনটা আসল তা আমাদের মাণিকবাবুর ভাষাতেই বলি, বনের শেয়াল টের পায়। "ওরা টের পায়। কেমন করে টের পায় কে জানে!" এই কথাটি নিয়ে গেল আমাকে "পুতুলনাচের ইতিকথার" দোর-গোড়ায়।

বাল্যকালে পুতুল-নাচ অনেক দেখেছি। আজকালকার সহুরে ছেলেদের চোখে ও-নাচ এখন Dodo of Madagascar। তবে নিয়তির পুত্তলোবাজিতে মানুষ মাত্রেই যে পুত্তলিকা এ কথা আমরা জীবনে ক্রমশঃ বুঝি, যখন দড়ির টানগুলো টন টন করে। আমাদের উপন্যাসের বিধাতা-পুরুষ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাই বইখানির এই নামকরণ করেছেন এবং আমাদের ডেকেছেন তাঁর আসরে। আমাদের, অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত আমাদের, নিজেদের চলচ্চিত্র দেখবার জন্য নয়, কিন্তু বাংলার যে বনে গিয়ে আমরা মনে মনে অন্ততঃ বন-বিড়াল হতে পারি, সেই আদি অকৃত্রিম অজ্ঞাত আমাদের। তবে আমাদের সঙ্গে আছে একজন দো-ভাষী, শশী। সে গ্রামের ছেলে কলকাতায় ডাক্তারি পাশ করেছে। আর আছে কুমুদ, ছাত্রাবস্থায় তার guide, philosopher and friend। তার কাছে পেয়েছিল শেলির দুর্ব্বোধ্য কবিতার বা মোনালিসার হাসির

ব্যাখ্যা। এরা দু'জন হল এই গল্পের প্রধান নায়ক। এদের সঙ্গে যে মেয়ে দুটির জীবন জড়িত তাদের নাম মতি আর কুসুম।

মতির জন্য পাত্র খুঁজতে তার দরিদ্র পিতা হারু ঘোষ গিয়েছিল বাজিতপুরে। ফির্‌বার সময় পথ সংক্ষেপ করবার জন্য মাঠ ভেঙ্গে জঙ্গলে রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে হল তার বজ্রাঘাতে অপঘাত মৃত্যু খাল-ধারের বটগাছ-তলায়। ওপারেই তার বাড়ী গাওদিয়া গ্রামে। শশী এই গ্রামের ছেলে। খাল দিয়ে নৌকায় যেতে-যেতে এই দুর্গম স্থানে হারুর শব তার চোখে পড়ল। এই ঘটনা-সূত্রে হারু ঘোষের অন্তঃপুরে শশীর সঙ্গে আমরা প্রবেশ করলাম। দেখলাম তার পুত্রবধূ কুসুম আর কন্যা মতিকে। কিছুদিন পরে গ্রামে এল বি, এ পাশ করা কুমুদ এক যাত্রার দলের সঙ্গে। বাল্যবন্ধু শশীর বাড়ীতে এসে সে হাজির। তারপর হঠাৎ সাপের (ভাগ্যিস ঢোঁড়া সাপ) কামড় খেয়ে তালপুকুরের পাশে কুমুদের সঙ্গে মতির সাক্ষাৎ। অতঃপর প্রবীরের ভূমিকায় অভিনেতা কুমুদের অসামান্য নৈপুণ্যে বালিকা মতির মনে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার। ইতিপূর্ব্বে একদা ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত মতির ঘরে ডাক্তার শশী যখন এসেছিল তখন কুসুমের দু'চারটি ছুঁচোলো ব্যঙ্গোক্তিতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল সেই বেগুণ ক্ষেতের পাশে ওদের কথাবার্ত্তা। আমাদের মনের সংশয়টা পাকা হ'ল। প্রেম না থাকলে ঈর্ষা হবে কেন?

নানা ছোট বড় ঘটনার ভিতর দিয়ে জীবনের সূত্রটি গাঁথা হয়। নদীর ধারাকে জলস্রোতের হিসাবে দেখতে পারি। আবার দুইকূলের দৃশ্যপরম্পরা, উপরের আলো অন্ধকার ভরা আকাশ, খাতের গভীর অগভীর ঋজু কুটিল রেখা, এই ত্রিসীমা-বেষ্টিত পয়ঃপ্রণালীটিকেও নদীর বহিরাবরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। মাণিকবাবুর অঙ্কন-নৈপুণ্যে ছোটখাট ঘটনা, কথা ও দৃশ্যগুলির ধারাবাহিকতায় একটা অখণ্ড বৈচিত্র্যপূর্ণ সবাকৃচিত্র ফুটে ওঠে। মুখ্যতঃ যেটা দ্রষ্টব্য, তার পারিপার্শ্বিক নানা গৌণ ঘটনায় একটা জমাট প্লট বেমালুম গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে যায়। কিছু যেন অবান্তর নয়, বেখাপ্পা নয়, গানের তান-বৈচিত্র্যের মত লয়ে এসে পৌঁছয়। কোথাও কইফিয়ৎ নাই, ভাষ্য নাই, বক্তৃতা নাই; যেন নানা যন্ত্রের ঐক-তানে আছে একটা মধুর সমন্বয়। গাছের মতই নানা শাখা প্রশাখায় উপন্যাসটি দিকে দিকে পল্লবিত হয়ে উঠেছে, তবু সমস্তটা জড়িয়ে দিব্যি একটি সৌষ্ঠব আছে।

চীনে মেয়ের পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে তার উদার পদপল্লটিকে কুঁড়ি ক'রে তোলা হয়। আমাদের দেশে হৃদ্‌যন্ত্রটার জন্য একটা সামাজিক বজ্রমুষ্টি আছে। এই মুষ্টিবন্ধনে হৃদয়টার গতিবিধি পঙ্গু। বিধি-নিষেধের নানা চাপের ভিতর দিয়ে জীবনের সহজ ধারাটি কেমন করে মন্থর বা নিষ্পন্দ হয় গ্রন্থকার তা দেখিয়েছেন কুসুম আর শশীর জীবনে। গতির আবেগে বাইসিকেলটা কেমন করে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে মাথা খাড়া করে চলে যায়, এমনকি একজনকে পিছনে দাঁড় করিয়ে নিয়েও ধূলিসাৎ বা কক্ষভ্রষ্ট হয় না, সেটা দেখলাম কুমুদ আর মতির জীবনে। সেই গণ্ডগ্রামের একরত্তি মেয়ে মতি, ভদ্রগৃহস্থের সরল, সুসংযত আচার-নিষ্ঠ মতি, কুমুদের মত

একটা বেতুইনের সঙ্গে উল্কাযাত্রায় বাহির হল এবং তার উৎকেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত জীবনটার মধ্যে আপনাকে নিশ্চিন্তে এলিয়ে দিয়েই তাকে আস্তে আস্তে বেঁধে আন্‌তে পারল, এ-চিত্রটি যেমন স্বাভাবিক হয়েছে, তেমনি সেই সঙ্গে শশী আর কুসুমের দ্বারা যেন-ব্রাউনিংএর Statue and the Bust-এর দশবৎসরব্যাপী রিহার্সেল্‌টিকে তুলনায় জাজ্বল্যমান করে তুলেছে।

পিছনের প্রচ্ছদপটটিতে বিষয়ী কূটবুদ্ধি শশীর বাবা গোপাল এবং বৃদ্ধ যামিনী কবরেজের রূপসী পত্নী 'সেনদিদি'কে নিয়ে আর একটি আখ্যায়িকাব ভিতর দিয়ে শশীর জীবনের ট্র্যাজেডি ফুটে উঠেছে তার করুণ ও দারুণ আলোকে। দশচক্রেই ভগবান ভূত হয়।

কুসুমের চরিত্রটি একটি মৌলিক সৃষ্টি। বাপের আদুরে খামখেয়ালী মেয়ে। সচ্ছল ঘর থেকে পড়েছে গরীব গৃহস্থের কুটীরে। সেজন্য তার কোন দুঃখ নাই। তবে স্বচ্ছন্দানুবর্ত্তী দিব্যি একটা বেপরওয়া ভাব আছে। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হয়। বাড়ীতে বৌ আছে অথচ এখনও সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হয় নি। ঘাট থেকে কলসি কাঁকে জল নিয়ে এসে ধীরে সুস্থে প্রদীপটা জ্বালবার উদ্যোগ করছে। তার গাফেলি দেখে শাশুড়ি মোক্ষদা চটেমটে পিদিমটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেই রান্নাঘর থেকে জ্বেলে আন্‌তে গিয়ে খেলো উঠানে একটা আছাড়। কুসুম খিল খিল করে হেসে উঠল সশব্দে। তারপর শাশুড়িকে আড়কোলা করে তুলে আনল শোবার ঘরের সামনের দাওয়ায়। নীরবে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ মোক্ষদার গাল শোনে, তারপর যায় আবার দীপ জ্বাল্‌তে। এইখানে তার একটা রূপ দেখা গেল। মতিকে নিয়ে যাত্রা শুন্‌তে গিয়ে চরণ দত্তের গৃহিণীকে ধমক দিয়ে কেমন ক'রে নিজেদের বসবার জায়গাটুকু দখল করে নিল, তাতে তার আর একটু পরিচয় পাওয়া গেল। এই রকম ছোটখাট কত ঘটনা, দুষ্টামি করে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলার ভঙ্গী, ব্যঙ্গ-পরিহাসের রসপূর্ণ টিপ্পনীতে সে পাঠকের চক্ষে মূর্ত্তিমতী হয়ে ওঠে। জেদ আছে, দুষ্টুবুদ্ধি আছে, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আছে, আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, আর আছে পরাণের মত সহজ সরল বলিষ্ঠ গোবেচারা একটি স্বামী। তার প্রতি মমতা ও আনুগত্যের অভাব নাই। মনটা কিন্তু কম্পাসের কাঁটার মত শশীর দিকে ঘুরেই আছে। সর্ব্বদাই কেমন একটা আন্‌মনা ভাব। কতবার সে উনানে ভাত চড়িয়ে উধাও হয়। পোড়া হাঁড়ির দুর্গন্ধে বাড়ী ভরে যায়। শাশুড়ির গালাগালিতে চমক ভাঙে। নিঃশব্দে নির্ব্বিকার চিত্তে আবার নূতন হাঁড়িতে ভাত চড়ায়। দুচার দিনের খেয়াল নয়, দশ বৎসর ব্যাপী শশীর প্রতি এই আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রণয় হয়ে প্রস্ফুট হয় নি। মাঝে মাঝে শশীকে একটু নাড়া দিয়ে দেখে। কিন্তু শশীর প্রেমে 'রয়েছে দীপ, না আছে শিখা।' সুতরাং তা থেকেও না থাকা। শশী মাঝে মাঝে উৎসুক হয়, আবার হয় পশ্চাৎপদ। কর্ত্তব্যে অটল, পরাণকে বিস্মৃত হয় না। দশ বৎসর অপেক্ষা ক'রে এবং বারংবার বিফল মনোরথ হয়ে যখন কুসুম বুঝল, শশীর জাগ্রত প্রেম তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে না তখন সে পরাণকে নিয়ে চিরদিনের মত গাওদিয়া ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে গেল। বিদায়ের আগে শশীর প্রেম-যাচনা ব্যর্থ হল। ওদের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ দীর্ঘকালব্যাপী

সহজ প্রেমের যবনিকা পাত হ'ল যে কটি কথায়, তাতে সমাজ সংসার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হল বটে, কিন্তু দুটি ভগ্ন হৃদয়ের একটি সহমরণের চিতা নিঃশব্দে জ্বলে নিবে গেল। কুসুমের শেষ কথা ক'টি কি অকপট, স্বচ্ছ, উচ্ছ্বাসহীন অথচ অগ্নিময়! তার দীপ্তিতে রহস্যময় নারী-হৃদয়ের একটি ক্ষণিক আভাস পাওয়া গেল।

সেই বেগুন-ক্ষেতের পাশে গোধূলির আবছায়ে শশী আর কুসুমের দু দণ্ডের বাক্যালাপ মনে পড়ে। শশী চলে গেলে কুসুম একটু হাসল। লেখক বলছেন, "সামনের গাছের মাথায় একটু আলো হইয়াছে। কুসুম জানে ওখানে চাঁদ উঠিবে। চাঁদ উঠিলে চাঁদ উঠিবার আভাস দেখিলে কুসুম যেন শুনিতে পায়—

ভিন্ দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যা পরথম যৌবন।

কে সে কিশোরী ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান্ সে কুসুম নয়।" আমরা কিন্তু বুঝি সে কুসুমই বটে। হোক্ না শশী তাদের গ্রামের ছেলে। সে কলকাতার মায়াপুরী থেকে সুদূর স্বতন্ত্র হয়ে এসেছে তার শিক্ষা-দীক্ষার আভিজাত্যে। তাই চিরপরিচয়ের মাঝেও সে অচিন্ ভিন্-গাঁ-বাসী। বাহিরের হিসাবে কুসুম পরিণীতা বটে, অন্তরে সে এখনো কুমারী। পরাণের হাতে রূপার কাঠি, সোনার কাঠি ছিল শশীর হাতে। স্পর্শ পায়নি তবু দূর থেকে তার আভা লেগেছে কুসুমের চোখে। অবশ্য মাণিকবাবুর কথাও মিথ্যা নয়। কুসুম ময়মনসিংহ পল্লী-গীতিকার নীলহ্রদে ফুল্লনলিনী নয়, চির-বিরহের কাজলদীঘির অসিত কমল সে। সেই কুসুম ম্লান মুখে শশীর চিরায়মান শেষ নির্ব্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করল এই বলে "আপনাকে কি বলব ছোটবাবু, অপনি এত বোঝেন! লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্য কোনো সুখ চাই না। বাকী জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি, আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই! সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, এ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কি। কাকে ডাকছেন ছোটবাবু? কে, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।"

"দিবারাত্রির কাব্যে" দুশো পৃষ্ঠার ভিতর চারটি ট্র্যাজেডির চিতানল জ্বলছে। শেষেরটি উপমার নয়, সত্যকার জ্বলন্ত কাঠের চিতায় 'আনন্দের' পরীনৃত্যের বহ্নি-যবনিকা। কীট-পতঙ্গের থেকে মানুষ পর্য্যন্ত জীব মাত্রেই দেহরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রেরণায় চলে। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বিশিষ্টতা এবং নৈসর্গিক আবেষ্টনের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব এই উভযোগে আবহমানকাল ক্রমবিবর্ত্তনের ধারা বয়ে চলেছে বংশ-পরম্পরায়। মানুষ এই বিশ্ব-সৃষ্টির সেই অদ্ভুৎ জীব যে অপরাপর পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষের প্রভাব ও পরিস্থিতির প্রবর্ত্তনা স্বীকার করে

নিয়েও স্বকীয় অনন্যসাধারণ চেতনা ও অভিজ্ঞ স্মৃতির নির্দ্দেশে আপনার স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছে তার সমাজ ও সংসার, প্রবর্ত্তিত করেছে তার স্বরচিত বিধি নিষেধ আত্মীয় গোষ্ঠীর সৃজনে ও রক্ষণে। তার আইন কানুনের পদে পদে লড়াই বাধে নিসর্গের সনাতন বিধির সঙ্গে। ভবভূতি বলেছেন,—

অহেতু পক্ষপাতস্থ যস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্ম্মাণি সীব্যতি॥

এই অহৈতুকী স্বয়ম্ভূ অনিরাকরণীয় স্নেহাত্মক সূত্র অভেদ্য গ্রন্থিতে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ান্তরকে বাঁধে। দেশকালপাত্র বিশেষে এই অন্ধ অনপনেয় আকর্ষণের সঙ্গে মানুষের গড়া অলঙ্ঘনীয় রাজনীতির বাধে সংঘর্ষ। ট্র্যাজেডির জন্ম এই বিরোধে।

দিবারাত্রির কাব্যের প্লটটি সংক্ষেপতঃ এই। সত্যবাবুর কন্যা মালতী গৃহশিক্ষক অনাথের সঙ্গে যখন 'ইলোপ্' করল তখন প্রতিবেশী হেরম্ব ছোকরার বয়স বার বৎসর মাত্র। সে কিন্তু অনাথের ভক্ত এবং বয়োজ্যেষ্ঠা মালতীর বালক প্রেমিক। এই ব্যাপারটি প্রেমোন্মাদগ্রস্ত অকালপক্ক হেরম্বের শিশুহৃদয়ের উপর যে একটা সুগভীর ছায়াপাত করবে "সেটা বিচিত্র নয়। ওসব ব্যাপারে ছোট ছেলে মেয়েদের মনেই আঘাত লাগে বেশী। তারা খানিকটা শুনতে পায়, খানিকটা বড়রা তাদের কাছে চেপে রাখে। তার ফলে ছেলেরা কল্পনা করতে আরম্ভ করে দেয়। তাদের জীবনে এর প্রভাব কাজ করে।" হেরম্ব উত্তরকালে সাহিত্যের অধ্যাপক হল। সুপ্রিয়া পড়ল তার প্রেমে। হেরম্বের প্রতি সুপ্রিয়ার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, হেরম্বের বাণী ওর জীবনে বিধি। পোনেরো বছরের মেয়ে সুপ্রিয়া একেবারে স্থির করে ফেলেছিল, হয় হেরম্বের সঙ্গে বিয়ে হবে না হয় চাকুরী করে স্বাধীন ভাবে জীবন কাটাবে। তার বাবা দিলেন এক পুলিশের ছোট দারোগার সঙ্গে তার বিয়ে। জেদি মেয়ে, সে বিয়ে কিছুতেই হতে পারত না যদি হেরম্ব তাকে ফুসলিয়ে রাজি করতে না পারত। এই বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে রূপাইকুড়ার পার্ব্বত্য নিভৃতে ছোট্ট একটি বাংলায় হেরম্বের সঙ্গে সুপ্রিয়ার দেখা। তার স্বামী অশোক এখানকার থানার দারোগা, হেরম্ব এক রাত্রির জন্য অতিথি হয়ে এসেছে। কর্ত্তব্যপরায়ণা, সুগৃহিণী, মধুরস্বভাবা পত্নী হিসাবে শত্রুও সুপ্রিয়ার নিন্দা করতে পারিবে না। কিন্তু "জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড অনিবার হাসিতেই রহে, যত হাসে ততই সে দহে।" এই পাঁচ বৎসর ধ'রে সুপ্রিয়া তার আগুন ছাই চাপা রেখেছে এবং আত্মরোধের অতন্দ্রিত চেষ্টায় হয়েছে মূর্চ্ছারোগের উৎপত্তি। হেরম্বের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ হল। সে সুপ্রিয়াকে ছোট বোনটির মত দেখে, অন্ততঃ তাই দেখতে চায়। সস্নেহে 'তুই' বলে সম্বোধন করে এবং পদে পদে তার উপযাচনার আভাসে বাধা দেয়। সুপ্রিয়া একেবারে মরিয়া; হেরম্বের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হবে। ছ'মাস পরে একটা মীমাংসার আশা দিয়ে হেরম্ব পরদিন প্রস্থান করল। স্বামী অশোক স্ত্রীকে ভালবাসে, স্ত্রীর সেবা-যত্ন ও বাধ্যতায় তার প্রতি প্রসন্ন, কিন্তু স্ত্রীর হৃদয় পায় নি তা জানে।

রূপাইকুড়ার থেকে ফিরবার অল্পদিনের মধ্যেই পুরীতে হঠাৎ অনাথের সঙ্গে হেরম্বের দেখা, কুড়ি বৎসর পরে। মাঝে বছর বারো আগে একবার দেখা হয়েছিল, নচেৎ চিনতেই পারত না। এই সুদীর্ঘকাল অসামাজিক জীবন যাপনের ফলে মালতীর অধোগতি হয়েছে। ওরা কণ্ঠিবদল ক'রে যে নিম্নস্তরে বাস করে, তাতে মালতী ভদ্রগৃহিণীর লক্ষ্মীশ্রী হারিয়েছে। পুরীর একপ্রান্তে সমুদ্রের ধারে ওদের আশ্রম। সেখানকার ক্ষুদ্র মন্দিরের ও পূজারিণী। পেশায় বৈষ্ণবী হলেও শাক্ত গুরু শ্রীমৎ মশাল বাবার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে মালতী কারণ পান ক'রে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে গদ্গদভাষিণী। প্রগল্‌ভা, কলহপরায়ণা, কিন্তু অনাথের কাছে দেহমনে সতীত্ব রক্ষা করেছে। কিন্তু ওদের এখন নিত্য দাম্পত্য-কলহ। এই বিরোধের ভিতর বর্দ্ধিত হচ্ছে আটারো বৎসরের কন্যা, নাম তার আনন্দ। হেরম্ব অনাথের আশ্রমে গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করল এবং আনন্দকে দেখল। মালতীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেখল সুরবালিকার মূর্ত্তিতে তার কৈশোরের স্বপ্ন-প্রতিমাকে। আনন্দের নিঃসঙ্গ জীবন এ আশ্রমে সুরক্ষিত। নৃত্যকুশলিনী দেবদাসী সে। নৃত্য তার আত্মোপলব্ধি এবং প্রবীণ পিতার স্নেহ-বিগলিত গল্পে ও কথোপকথনে তার শিক্ষা। হেরম্বকে দেখেই মালতীর ইচ্ছা হয়েছে ওর সঙ্গেই আনন্দের মিলন হয় এবং ওরাও প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল। প্রথম প্রণয় বুঝি এমনি করেই মগ্ন চৈতন্যে ডুবে থাকে এবং অনুকূল দৈবযোগে ভেসে উঠে আত্মপ্রকাশ করে। সুপ্রিয়া যে কেন হেরম্বকে বিচলিত করতে পারেনি এবং তার শান্তস্বভাব সাধ্বী স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল তার গূঢ় কারণের সঙ্কেত পাওয়া যায়। হেরম্বের প্রাণের উপর এতদিন যে একটা কঠিন আবরণ পড়েছিল, সুপ্রিয়ার আত্মোৎসর্গ যা দীর্ণ করতে পারেনি, সেই অন্তরালটা বুঝি এবার ধূলিসাৎ হয়। কিন্তু এতদিনের নিষ্পিষ্ট হৃদয়ের অসাড়তা দূর হবার নয়। হেরম্বের মন কূট তার্কিক, সমালোচক, সিনিক্‌ হৃদয়টা তার দাগী টিকিটের মত অচল হয়ে গেছে। তার কাঠিন্য ও বিশ্লেষণ-প্রবণতায় উন্মেষোন্মুখ প্রাণ বেদনায় সঙ্কুচিত হল। হয়ত ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে ওরা পরস্পরকে ফুটিয়ে তুলতে পারত, কিন্তু নিয়তির নাট্যকৌতুক রুগ্ন স্বামীর বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যপদেশে অশোক আর সুপ্রিয়াকে ঠিক এই সময়েই পুরীতে আবির্ভূত করল। আশ্রমে আনন্দ সুপ্রিয়া আর হেরম্বের হল ত্র্যহস্পর্শ। সুপ্রিয়াকে বাসায় পৌঁছতে গিয়ে রুগ্ন অশোকের সঙ্গে হেরম্বের দেখা হল। স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষার সুখ্যাতি অশোকের মুখে আর ধরে না। তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজের পর হেরম্ব ওদের বাড়ীতে দিবা নিদ্রায় অচেতন, এমন সময়ে এল ভীষণ ঝড়। ঘুম ভেঙে গেল। অল্পক্ষণ পরেই সুপ্রিয়া ঘরে এল এবং তাকে জানাল, অশোক ঝড়ের তাণ্ডব লীলা দেখবার জন্য ছাদে উঠেছিল, সুপ্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। হঠাৎ তাকে ধাক্কা মেরে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল তার স্বামী। সুপ্রিয়া তার আক্রমণ এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে। বিকালে আবার আসবার অনুরোধ করে সুপ্রিয়া এখনকার মত হেরম্বকে বিদায় দিল।

সন্ধ্যার পরে সমুদ্রের তীরে ওদের শেষ দেখা। আর ঘরে ফিরবে না, হেরম্বের সঙ্গে সেখান থেকে পলাতকা হবে, সুপ্রিয়ার এই সঙ্কল্প। হেরম্বের পকেটে পয়সা নাই। আশ্রমে গিয়ে টাকা আন্‌তে হবে। সুপ্রিয়া বলে, কাজ নাই আমার গয়না আছে, তাতেই পাথেয় সংগ্রহ করা যাবে। হেরম্ব উত্তরে বলল, "শোন্ সুপ্রিয়া, তোর বিয়ের সময় তোকে একটা উপহার কিনে দিইনি। আর আজ তোর গয়না বিক্রীর টাকায় কলকাতায় যাব? এমন কথা তুই ভাবতে পারলি? একবার তোর ভয় হল না, লজ্জায় ঘৃণায় আমি তা'হলে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব?" যাওয়া আর হল না।

ইত্যবসরে আর এক ঘটনা হয়ে গেছে। মালতীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে অনাথ আশ্রম ছেড়ে পালিয়েছিল। শোকাতুরা মালতী দুদিন অসহ্য প্রতীক্ষার পরে হতাশ হয়ে দুপুর রাত্রে উঠে বাহির হচ্ছে অনাথের অন্বেষণে, অজানা বিপুল বিশ্বে। যাবার আগে যথাসর্ব্বস্ব হেরম্বের হাতে গছিয়ে দিয়ে মালতীর শেষ কথা এই—"আর শোন আনন্দকে বিয়ে করবে ত?" হেরম্ব প্রতিশ্রুতি দিল, করব।

আনন্দ একদিন পূর্ণিমা-রাতে খোলা তৃণ-ভূমির উপর হেরম্বকে চন্দ্রকলা নাচ দেখিয়েছিল। চন্দ্রকলা নাচটা কি? আনন্দের ভাষায়—"ধরুন, আমি যেন মরে গেছি। অমাবস্যার চাঁদের মত আমি যেন নেই। প্রতিপদে আমার মধ্যে একটুখানি জীবন সঞ্চার হল। ভাল করে বোঝা যায় না এমন এক ফোঁটা জীবন। তারপর চাঁদ যেমন কলায় কলায় একটু একটু ক'রে বাড়ে আমার জীবনও তেমনি করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণিমা এল, আমি পূর্ণ মাত্রায় বেঁচে উঠেছি।"

সুপ্রিয়াকে ফেলে সমুদ্রের তীর থেকে অপরাধীর মত মন্থর পদে হেরম্ব আশ্রমে ফিরে এল! ওদের কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় হেরম্বের ভালবাসার উপর আনন্দ আস্থা হারিয়েছে। অসীম দুঃখে সে দুঃখিনী। রাত্রি গভীর হল। হেরম্বের মুখের দিকে খানিকক্ষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আনন্দ চোখ বুজল। 'ঘুমবে?' হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল। আনন্দ বল্‌ল, 'না'। হেরম্ব বল্‌ল, 'না যদি ঘুমও আনন্দ, তবে আমাকে নাচ দেখাও। তোমার নাচের ভিতর আমাদের পুনর্জন্ম হোক।' 'কি নাচ নাচবে আনন্দ? চন্দ্রকলা?' 'না, সে নাচ পূর্ণিমার নাচ। আজ অন্য নাচ নাচব।'

এ নাচের নাম পরীনৃত্য। অগ্নিকুণ্ডের পাশে নাচতে হয়। আগুন জ্বলল। অগ্নি-পরিক্রমা ক'রে দ্রুতবেগে যে নৃত্যের পূর্ণ বিকাশ হল, তার শেষ হল আনন্দের আকস্মিক অগ্নি-সমাধিতে। আনন্দ অনেক আগেই মরেছিল। শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকু ছিল অস্তিমে।

তিনটি ভাবগর্ভ কবিতায় বইখানির তিন অধ্যায়ের নান্দীমুখ। বর্ণনায় বিশ্লেষণে সংযমে এই সমাজনীতিবিগর্হিত বিধিনিয়ন্ত্রিত ব্যর্থ জীবনগুলির নির্ম্মম ইতিহাস লেখক কারুণ্য ও নির্লিপ্ততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করছেন। এ ট্র্যাজেডি প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের, দেহাশ্রয়ী পশুর নয়।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল। সে জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করে এবং এই প্রতিভাবান তরুণ লেখকের রচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখনী নিরস্ত হোক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

France Today and the People's Front —by Maurice Thorez. English Translation by Emile Burns (Gollancz)

ফ্রান্সে পিপুল্‌স্‌-ফ্রন্ট আন্দোলনের সাফল্যের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরাসী ফ্যাশিষ্ট'দের Coup de force-এর চেষ্টা এবং গণ-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রতিরোধে তাহার বিফলতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ফ্রন্টের জয়লাভের সহিত ফ্যাশিজম্‌-এর সমস্যা দূর হইয়া যায় নাই। সেইজন্য Thorez-এর এই বইখানি সর্ব্বত্রই লোকে আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে। Thorez ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিরই আপ্রাণ চেষ্টায় ফ্রান্সে পিপুল্‌স্‌-ফ্রন্ট গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য একদিকে ফ্রান্সে ফ্যাশিজম্‌-এর উদ্ভব, বর্ত্তমান সঙ্কটের মধ্যে তাহার মতিগতি এবং জার্ম্মান নাৎসীদের অনুকরণে ক্ষমতালাভের চেষ্টা এবং অপরদিকে পিপুল্‌স্‌-ফ্রন্ট-এর সংগঠন ও সাফল্য, এই দুই বিষয়েই জানিবার পক্ষে Thorez-এর এই বইখানি অতুলনীয়।

Thorez তাঁহার বইটিকে চারিভাগ করিয়াছেন, প্রথমভাগে ফ্রান্সের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক অবস্থান বিচার করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান সঙ্কট কোন্ কোন সম্প্রদায়কে কি ভাবে আঘাত করিয়াছে বা লাভবান করিয়াছে তাঁহার আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে ফ্যাশিষ্ট আন্দোলনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস দিয়া বিখ্যাত ৬ই ফেব্রুয়ারীর (১৯৩৪ সাল) পিছনকার তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তৃতীয়ভাগে ফ্যাশিজম্‌-বিরোধী পিপুল্‌স্‌-ফ্রন্টের উদ্ভব এবং সফলতার বিবরণ পাওয়া যায়। চতুর্থভাগে ফ্যাশিষ্টদের এবং ফ্যাশিষ্ট বিরোধীদের মতবাদ ও ভবিষ্যৎ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করিয়া উপসংহারে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ফ্রন্ট তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সাফল্যের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন। ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচন এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে।

ফ্রান্সে চারি কোটী লোকের মধ্যে দুই কোটী দশ লক্ষ লোক কোন না কোন কাজকর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে এক কোটী ৩০ লক্ষেরও অধিক লোককে শ্রমিক আখ্যা দেওয়া যায়। ফলে ইহারা দুই দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়াছে, প্রথমতঃ ইহাদের পারিশ্রমিক অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অনেকে বেকর হইয়া পড়িয়াছে। ফ্রান্সের প্রায় দুই কোটী গ্রামের লোকের মধ্যে কৃষিসম্পর্কে নিজেরা কোন না কোন কাজ করে এমন লোকের সংখ্যা

ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণরূপে সফল হয় এবং "After February 12th, unity action had been cemented in a common sorrow, a common pride.

ফ্রান্সে পপুলার ফ্রণ্ট আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট পার্টিই প্রথম ও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা প্রথমে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলগুলির মধ্যে একতা সম্পাদন করে, তাহার পর নিপীড়িত ষক সাধারণ এমন কি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও অনেকাংশে এই আন্দোলনের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছে।

উপসংহারে Thorez বলিয়াছেন যে People's Front Government স্থাপিত হইলেও কহ যেন সংগ্রামের শেষ হইয়াছে বলিয়া না মনে করেন। The oligarchy will not surrender without a fight ; the reationary and Fascist onslaught will be brutal nd immediate. In any event, France is advancing towards great and mminent battles !" অর্থাৎ ফ্রান্সে civil war প্রত্যাসন্ন।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী

From Hegel to Marx—by Sidney Hook (Gollancz)

Dialectics—by T. A. Jackson (Lawrence & Wishart)

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক মহলে ভাববাদের অত্যধিক প্রসার দেখতে পাওয়া যায়; দেশী বেদান্ত বা পশ্চিমী কান্ট-হেগেলীয় চর্ব্বিত চর্ব্বণই আমাদের দার্শনিকদের মুখ্য উপজীব্য। আধুনিকতার নামে বের্গসঁ, রাসেল বা হোয়াইটহেডের উল্লেখও হয় বটে, কিন্তু চিন্তাসূত্রের পেছনে বেদান্ত বা হেগেলের অদৃশ্য হস্ত লুকিয়ে থাকে। এমন কি হেগেলীয় দর্শনের পরিণতিতে যে দক্ষিণ ও বামপন্থী হেগেলবাদের বিতর্কের আলোড়নের ফলে য়ুরোপের মনস্বীসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল তার পরিচয়ের ইঙ্গিতও এখানে প্রায়শঃ মেলে না, যদিও উত্তর-হেগেলীয় দর্শনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠতালিকার অন্তর্ভুক্ত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে পদার্থবিজ্ঞানের দ্রুত পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক বস্তুবাদ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও জার্ম্মানীতে প্রসার লাভ করেছিল; ভাববাদের সঙ্গে তার বিরোধের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাহিনী এদেশের পাঠতালিকা থেকে কার্য্যতঃ বিলুপ্ত হয়েছে। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ এই যে ডিরোজিও প্রবর্ত্তিত যুক্তিমূলক বস্তুধর্ম্মী ব্যাখ্যাপদ্ধতির পূর্ণ পরিণতির আগেই খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম অধ্যাপকেরা ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্তিবাদী দর্শনের একটা গোঁজামিল দেবার অছিলায় শুদ্ধ হেগেলীয় দর্শন বা হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গে বেদান্তের একটা জগাখিচুড়ী ছাত্রসমাজের ভোজে পরিবেশন করতে লেগে গেলেন; তার উপর আবার নবীন স্বদেশিকতা, গীতাধর্ম্ম প্রচার, বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তবাদ ও দয়ানন্দের আর্য্যসমাজ আন্দোলন সব মিলে এমন একটা ধর্ম্মগত আবহাওয়ার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি

করলো যে তার মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, শ্রীকৃষ্ণ, হেগেল, বেদান্ত, গীতা আমাদের মনস্বীদের ঝাপসা দৃষ্টিতে একাকার হয়ে গেল। ফলে সর্ব্ববুদ্ধিবিভ্রাটের সার্ব্বভৌ আধিপত্যের হাত থেকে আজও চিন্তার নিষ্কৃতি লাভের পথে আন্তরিক ও বাহ্যিক বাধা অন্ত নাই। আর সবার উপরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আমাদের আধুনিক মধ্যবি সমাজের লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের জোরে এতকাল সরকারী ও সদাগরী চাকরী পে আসাতে, চিন্তারাজ্যে এই করুণ অরাজকতা ভাবোচ্ছ্বাসের লীলাকৈবল্যলাভে সহায়তা করেছে। ভাবের নৈরাজ্য অতিক্রম করে চিন্তার স্বরাজ্যসিদ্ধির প্রশ্ন উঠেছে এখন, যখ অর্থনৈতিক সঙ্কটের চাপে মধ্যবিত্ত সমাজের স্থিতিশীল মনের গড়নে ফাটল ধরেছে।

ভাবাবেগ বস্তুগত জীবনকে এড়িয়ে চলে বলেই যতক্ষণ না দৈনন্দিন ব্যবহারের খুঁটিনা পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক সঙ্কট আক্রমণ করতে থাকে, ততক্ষণ সে নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে কিন্তু বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করতে হলেই ভাবগত অস্পষ্ট চিন্তা দিশেহারা হয়ে যায় তখনই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রয়োজন লোকে অনুভব করে। কারণ বস্তুগত অর্থ নৈতিক সমাজ-জীবনের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বিধিবহির্ভূত অদৃষ্ট-শক্তির লীলাক্ষেত্র নয় ধনোৎপাদনের ও ধনবণ্টনের পদ্ধতি সমাজের ঐতিহাসিক ধারার নিয়ামকরূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। ঐতিহাসিক বিধির পরিচয়লাভ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্য ব্যতিরেকে অসম্ভব; এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলনীতি তত্ত্ব ও ব্যবহারের সামন্বয়িক নিয়ন্ত্রণ—সুতরাং ভাববাদের ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা এক্ষেত্রে অচল। বস্তুবাদ সর্ব্বদা পার্থিবজগতের সত্তাকে স্বীকার করে তার আলোচনা আরম্ভ করে বলেই বস্তুগত সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার বিরোধের সম্ভাবনা কম; কিন্তু ভাববাদ জীবন ও চিন্তার মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে; তাকে অতিক্রম করার শক্তি ভাববাদের মূলনীতি অস্বীকার না করলে কিছুতেই লাভ করা যায় না। ভাববাদের সঙ্গে বস্তুবাদের এই বিরোধ সনাতন; দর্শনশাস্ত্রে এই বিরোধের বহু দৃষ্টান্ত মেলে। এমন কি এ কথাও বলা চলে যে দর্শনের ইতিহাসই এই দুই বিরুদ্ধ মতবাদের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইংলণ্ডে বেকন, হবস, লক, ও লামেৎরী, দিদারট, হলবাক প্রভৃতি ফরাসী এবং বুখনার, মোলখোট ও অন্যান্য জার্ম্মান দার্শনিকদের মধ্যে পাওয়া যায়। দেকার্ত্তের মধ্যে ভাববাদ ও বস্তুবাদ উভয়ই অমীমাংসিতরূপে বর্ত্তমান ছিল—ভাববাদের দিকের পরিণতি লাইবনিৎজে সমাপ্ত হয়। ভাববাদ কাণ্টের ও উত্তর-কান্টীয় বিশেষতঃ হেগেলীয় দর্শনে বিশেষ পরিণতি লাভ করে। হেগেলীয় দর্শনকে ধর্ম্মের আওতা হতে মুক্ত করবার জন্যই বামপন্থী হেগেলীয়গণ অভিযান করেন ও ফয়েরবাখ্ তাঁদের অন্যতম। ফয়েরবাখের নাম নানা কারণে আমাদের স্মরণীয়। ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার পূর্ব্বসঙ্কেত বলে গ্রহণ করা যায়। লাউইর মত বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও তুলনামূলক ধর্ম্মসমালোচনার প্রথম চিন্তানায়ক রূপে ফয়েরবাখের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

যে মার্কসবাদের ফলে আমাদের চোখের সম্মুখে পৃথিবীর বিরাট রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে, সেই মার্কসবাদের মূলেও আছে ফয়েরবাখের দর্শনের সমালোচনা। হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও বস্তুবাদকেই নিজের মতবাদ বলে প্রচার করেন। মার্কস ফয়েরবাখের মতাবলম্বী হন, কিন্তু কিছুকাল পরেই, (১৮৪৫ খৃঃ) তিনি "ফয়েরবাখ বিষয়ক প্রস্তাব" নামে এগারটী সূত্রাকার নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মার্কসের আজীবন বন্ধু ও সহকর্ম্মী এঙ্গেলস্ মার্কসের লেখা কাগজপত্রের মধ্যে একটা নোট বইয়ে এই এগারটী প্রস্তাব খুঁজে পান। এঙ্গেলস্ তার "লুড্ভিগ ফয়েরবাখ" পুস্তকের শেষে এগুলি জুড়ে দিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন যে "নূতন বিশ্বালোচনের বীজরূপ এই প্রথম লেখাটী অমূল্য।" এ বিষয়ে সকলেই এঙ্গেলসের সঙ্গে একমত। কিন্তু এই এগারটি সূত্রাকার প্রস্তাব এতই সংক্ষিপ্ত যে ব্যাখ্যা ভিন্ন এর অর্থবোধ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রস্তাবগুলিকে বুঝতে হলে মার্কসের জীবনে চিন্তার ও কার্য্যের সামঞ্জস্যিক পরিপূরণশীল ইতিহাস অবশ্যপ্রয়োজনীয়। মার্কসীয় বস্তুবাদ কেন এবং কোথায় প্রাক্‌মার্কসীয় বস্তুবাদ ও হেগেলীয় ভাববাদ থেকে পৃথক তা বুঝতে হলে আমাদের এই এগারটী প্রস্তাবের সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এ বিষয়ে আলোচনা অবশ্য মার্কসের লেখায় নানা জায়গায় ছড়ান আছে এবং এঙ্গেলস্‌ও এ বিষয়ে তাঁর অনেক বইয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং এ সমস্ত বইয়ের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত না হয়ে মার্কসীয় বস্তুবাদ সম্বন্ধে সমালোচনা করা চিন্তাহীন পল্লবগ্রাহিতা মাত্র। টি, এ, জ্যাকসনের "ডায়ালেক্‌টিকস্" বা অধ্যাপক সিডনী হুকের "হেগেল থেকে মার্কস" পুস্তকে যে রকম গভীর ভাবে বিষয়টীর আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রতি সুধীবৃন্দের দৃষ্টি-আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অপর পক্ষে বাংলায় এ বিষয়ে যে দু একটী লেখা অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে অগভীর চিন্তা ও অসার রসিকতা ভিন্ন আর কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। এটা বাঙ্গালী লেখক ও পাঠকদের লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কারণ, ইংরাজীতে উপরোক্ত দুটী বই ছাড়াও অনেক বই এবিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরাও এ বিষয়ের আলোচনায় যোগদান করে তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন। সব সিদ্ধান্তই যে আমাদের নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে হবে, এমন কোন কথা নাই ; কিন্তু সেগুলির অনুধাবন না করে স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বা দুর্ব্ব্যাখ্যা করে বাঙ্গালী সাহিত্যিকের নিন্দার ভাগী হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে মার্কসের "ফয়েরবাখ্ বিষয়ক প্রস্তাব" এমন সূত্রাকারে নিবদ্ধ যে সাধারণ পাঠকের কাছে তা প্রায় দুর্ব্বোধ্য ; সুতরাং এর প্রত্যেকটী প্রস্তাব নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ, এর প্রত্যেকটীতে মার্কস তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ফয়েরবাখ্ ও পূর্ব্বতন বস্তুবাদ ও ভাববাদের সমালোচনা করেছেন। সুযোগ ও সুবিধা হলে এই প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করবার ইচ্ছা আছে। সাধারণভাবে এখন এইটুকু বলা যায় যে পূর্ব্বতন বস্তুবাদে মনকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিষ্ক্রিয় গ্রাহকরূপে নেওয়া হয়েছে ; মনের কোন

ক্রিয়াশীলতা স্বীকার করা হয় নাই। মনের সক্রিয় শক্তির দিকটা কিন্তু কান্টীয়-হেগেলীয় দর্শনে বিশেষরূপে স্থান পেয়েছে। এই সক্রিয় মানসিক শক্তিকে ভাববাদের খোলস থেকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুবাদের সঙ্গে আত্যন্তিক সমন্বয়ে মার্কস তাঁর নূতন বস্তুবাদের ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন কিন্তু এই মানসিক শক্তিকে তত্ত্বের দিক থেকে মার্কস দেখেন নাই; ব্যবহারিক শক্তিরূপে মানুষের জীবনের কাজের সঙ্গে এক করে তিনি একে গ্রহণ করেছেন। এই বস্তুগত কর্ম্ম-শক্তিকে মার্কস বৈপ্লবিক-কর্ম্ম-রূপে পরিকল্পনা করেছেন। একাদশ প্রস্তাবের বক্তব্যই তাঁর মূল কথা "দার্শনিকেরা জগতের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন মাত্র; আমাদের কাজ একে পরিবর্ত্তিত করা।" বাকী দশটী প্রস্তাবকে এরই সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন দশম প্রস্তাবে সামাজিক মানবতার সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসারের সঙ্গে তাঁর নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক দেখিয়েছেন; এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রামাণ্যবাদ সম্পর্কে বলেছেন,—তাতে বলা হয়েছে (ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত সত্যের বিষয়ে বাদানুবাদ ন্যায়ের কূটতর্ক মাত্র।

তত্ত্ব ও ব্যবহারের সামন্বয়িক নিয়ন্ত্রণমূলক বৈপ্লবিক পদ্ধতিই তাঁর বস্তুবাদের মূলসূত্র। মার্কসী বস্তুবাদ গ্রহণ না করলে, হয় জড় বস্তুবাদ নয় অতীন্দ্রিয় ভাববাদ, এ দুয়ের একটা গ্রহণ না করে উপায় নাই। কিন্তু জড়বস্তুবাদ গ্রহণ করলে জ্ঞান, সত্য বা কর্ম্ম ও ব্যবহার দ্বারা জগতের পরিবর্ত্তনের বাস্তবতা, এর কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না; আবার অতীন্দ্রিয় ভাববাদ গ্রহণ করলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের সঙ্গে তার নিত্যবিরোধ ঘটে এবং জ্ঞান বা সত্যেরও কোন সুব্যাখ্যা হয় না। উপরন্তু বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করবার কোন সম্ভাবনার পরিচয় এই দার্শনিক মতবাদের মধ্যে নাই; ফলে এই মতবাদ গ্রহণ করার অর্থ অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার পক্ষে সাহায্য করা। সুতরাং "প্রাক্সিস" বা ব্যবহারের কষ্টিপাথরে যাচাই করা তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বাস্তব জ্ঞানের সন্ধান পেতে পারি; আর এই জ্ঞান প্রকৃতি ও সমাজকে পরিবর্ত্তিত করে সমাজের অগ্রগতির কাজে আমাদের সহায়ক হবে। মার্কসীয় বস্তুবাদের এ সুস্পষ্ট ধারণাটী মনে রাখতে হলে "ফয়েরবাখ্ বিষয়ক প্রস্তাব" জানা দরকার।

"হেগেল থেকে মার্কস" পুস্তকে অধ্যাপক সিডনী হুক হেগেলীয় দর্শনের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে "ফয়েরবাখ বিষয়ক প্রস্তাবের" বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায়। এই এগারটি প্রস্তাবে মার্কস নব্যবস্তুবাদের যে মূলসূত্র আবিষ্কার করেছেন তার পেছনে আছে পূর্ব্বগামী ও সমসাময়িক ব দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে বহুমুখী দ্বন্দ্বের বিচিত্র ইতিহাস। হেগেল ও মার্কসের অন্তর্ব্বর্ত্তী দার্শনিকদের মধ্যে কেবল ফয়েরবাখের নামের সঙ্গেই সাধারণের পরিচয় আছে; কিন্তু ষ্ট্রাউস্, ব্রুনো বাউয়ার, ম্যাকস্ ষ্টার্ণার, মোজেস্ হেস্ প্রভৃতির চিন্তাধার সঙ্গে বিরোধের মধ্য দিয়েই মার্কসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি পরিণতির পথে অগ্রসর হয় এবং ফয়েরবাখের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিত প্রস্তাবে তার দার্শনিক প্রকাশ সম্ভব হয়। সুতরাং মার্কসের অনেকান্ত বস্তুবাদের উপ

ই চিন্তাধাবার সঙ্গে বিরোধের ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন প্রভাবের বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনাব]ত্যন্ত প্রয়োজন ছিল ; দার্শনিক জগতের এই গুরুতর অভাব মোচন করে অধ্যাপক হুক সর্ব্ব]ধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আরও বহু বিষয়ের আলোচনায় পুস্তকখানি সমৃদ্ধ ; দৃষ্টান্ত-]রূপ হেগেল ও মার্কসের মিল ও অমিল এবং উভয়ের "ডায়ালেকটিক" পদ্ধতির বিভিন্নতার]লনামূলক আলোচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। পরিশিষ্টে মার্কসের "জার্ম্মান আইডিয়লজী"]থকে কাণ্ট ও বেন্থামের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা এবং "হোলী]ফ্যামিলী" থেকে হেগেলের "কংক্রিট ইউনিভার্সাল" বিষয়ক বিচার অনুবাদ করে উদ্ধৃত করে]দওয়াতে বইখানা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়েছে। আর "ফয়েরবাথ বিষয়ক প্রস্তাবে"র ৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী]খানুপুঙ্খ আলোচনায় গ্রন্থকারের গভীর বিচার ও বিশ্লেষণ এবং মার্কসের অন্যান্য লেখার সঙ্গে]মন্বয় স্থাপনের ঐকান্তিক চেষ্টা সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।

বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ের গুরুত্বে সমৃদ্ধ টি, এ, জ্যাক্‌সনের "ডায়ালেকটিকস্" পুস্তক-]খানিতে বিষয়-বস্তুর সামান্য অবতারণার পরই মার্কসের "ফয়েরবাথ বিষয়ক প্রস্তাব" সম্বন্ধে বিশদ]এবং সুদীর্ঘ আলোচনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পূর্ব্ববর্ত্তী]স্তুবাদ ও ভাববাদের সমর্থক দার্শনিকদের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করে মার্কসের নব্যবস্তুবাদের]সার্থকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রামাণ্যবাদের বিচারে সত্যজ্ঞান ও]আপেক্ষিক জ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর দর্শনশাস্ত্রে গভীর চিন্তা ও]প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিন তাঁর বস্তুবাদ বিষয়ক পুস্তকে যে মতবাদের]স্বপক্ষে বিচার করেছিলেন, গ্রন্থকার সেই ধারাকেই বিচার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা]করেছেন। আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে আলোচনাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও বর্ত্তমান প্রয়োজনোপযোগী]হয়েছে। প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, সমাজ, ও বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি মার্কস-এঙ্গেলস্-]লেনিনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন ; তার অনেকাংশ]পূর্ব্বাচার্য্যদের মতবাদের প্রাসঙ্গিক পুনর্ব্বচন, আর কিছু বিরুদ্ধ মতের নিরসন প্রসঙ্গে তাঁর]স্বকীয় আলোচনা ও বিচার। ম্যাকমারে, ইষ্টম্যান, পোষ্টগেট, ক্যাসি প্রভৃতির দুর্ব্বাখ্যার হাত]থেকে মার্কসীয় বস্তুবাদ রক্ষা করবার জন্য গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম এবং কষ্টস্বীকার করেছেন।]কিন্তু বাদানুবাদের আতিশয্যে বইখানির ভারসাম্য একটু ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়। বিদ্রূপ]এবং রসিকতার আধিক্যেও অনেক সময় পাঠকের মন মূল বক্তব্য থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে]পড়ে। রচনাভঙ্গির এ রকম সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ছেড়ে দিলে, বইখানিকে মার্কসীয় বস্তুবাদের]বিষয়ে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ তত্ত্ব ও ব্যবহারের পারস্পরিক সমন্বয়মূলক]অগ্রগতিশীল কর্ম্মপদ্ধতিই মার্কসবাদের মূলকথা ; এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-]ভঙ্গির সর্ব্বতোমুখী প্রসারের স্বপক্ষে গ্রন্থকার এত গভীর ও বিস্তৃত বিচার করেছেন যে,]পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত দুখানা বইতেই মার্কসের "ফয়েরবাখ বিষয়ক প্রস্তাবে"র উপর বিশেষ গুরু আরোপ এবং এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যান্য মার্কসীয় লেখার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন ক হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলির ভিত্তিতেই পরিশেষে "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো"তে লিখিত কর্ম্মপ পরিকল্পিত হয়। সুতরাং যাঁরা মার্কসীয় বস্তুবাদের সমগ্ররূপের সঙ্গে পরিচিত হতে চান তাঁদে পক্ষে উক্ত প্রস্তাবগুলি অবশ্যপাঠ্য এবং বহু আলোচনার যোগ্য। এই আলোচনায় হুক জ্যাক্‌সনের বইখানি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উভয়ের মধ্যে স্থা স্থানে মতানৈক্য থাকলেও পাঠক নিজেই তার একটা সমাধান করে নিতে পারবেন, যদি তি আলোচ্য বিষয়ের মূল গ্রন্থগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির সাহায্যে যাঁ সমসাময়িক সমাজের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ধারাকে বুঝতে চান, তাঁদের পক্ষে "ফয়েরবাখ বিষয় প্রস্তাব" এবং আলোচ্য বই দুখানিতে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য নৃত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, সাহিত্যে ও জীবনে আজ অস্তোন্মুখ সংস্কৃতির রঙ্গীন ভাবালুতার যে সমাজের চেতনাকে দিবাস্বপ্নের মায়াজালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; একমাত্র বস্তুবাদের আঘাতই তার স্বপ্নের পানপাত্রকে চূর্ণ করে জাগ্রত পৃথিবীর নিরাবরণ সত্যের সঙ্গে নূতন ক পরিচয় করে দিতে পারবে। শুভস্য শীঘ্রম্।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

এই সংখ্যায় যাঁহাদের ষাণ্মাসিক মূল্য শেষ হইল, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক দ্বিতীয় খণ্ডে মূল্য ২॥০ মনিঅর্ডারযোগে ২০শে পৌষের মধ্যে পাঠাইয়া দিবেন। ২০শে তারিখে মধ্যে টাকা না পাইলে, মাঘ সংখ্যা তাঁহাদের নিকট ভিঃ পিঃ-তে পাঠান হইবে

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।